ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসনকাল



কায় কাউস

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন কিছু সর্বব্যাপী বিপর্যয়কর সময় আসে–যখন তার অভিঘাত আর কূলপ্লাবী ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যায় পূর্বেকার সকল সংগ্রামলব্ধ ঐতিহ্য, অর্জন, স্বপ্ন আর সাথে তার ইতিহাসও। পরিবর্তে তার স্থান দখল করে–রক্তস্নাত উর্বর পলিভূমিতে রচিত বিজয়ীর নয়া ইতিহাস আর গৌরবগাথা। যে ইতিহাস সর্বদা সর্বাংশে রচিত হয় না সত্যানুসন্ধানী, নির্মোহ, নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের হাত ধরে। অনেক ক্ষেত্রেই তা রচিত হয় বাহুবলে, ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা ইতিহাসের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে আরোপিত একরৈখিক ইতিহাস হিসেবে। সে ইতিহাসের রচয়িতারা যে যার রাজনৈতিক চিন্তায়, বিশ্বাসে, শ্রেণি কিংবা ব্যক্তিস্বার্থে, যুগধর্মের প্ররোচনায়, তাদের ব্যাখ্যায়, বর্ণনায়, অভিজ্ঞতায় আনেন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিকৃতি। নবচেতনার চাদরে ঢেকে দেন বহু ত্যাগ-তিতিক্ষায় অর্জিত জাতিগত পরিচয়ের অতীত গৌরব আর সংগ্রামকে। জাতিকে বিচ্ছিন্ন করেন সেই পরিচয়ের উত্তরাধিকার হতে। জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে, পক্ষপাতিত্বে খণ্ডিত সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে চলেন অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ সত্য হিসেবে।

কালক্রমে সেই আরোপিত, খণ্ডিত, বিকৃত ইতিহাসই একদিন প্রতিষ্ঠিত হয় মূলধারার ইতিহাস হিসেবে। আর ক্ষমতাশ্রিত সেই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস ধীরলয়ে জনমানসে এমনভাবে তার সামাজিক সম্মতি উৎপাদন করে, যা অপর যেকোনো ভিন্ন বয়ানকে, সত্যানুসন্ধিৎসাকে সামাজিকভাবেই নিরুৎসাহিত ও অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। পরিণতিতে তা রুদ্ধ করে ইতিহাসের স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে, সত্যানুসন্ধানের স্বাধীন চর্চাকে, পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে, জাতিগত পরিচয়ের মূলধারার অন্বেষণকে। অতঃপর যা রূপ নেয় এক প্রশ্নাতীত, স্বতঃসিদ্ধ, পবিত্র কানুনে।

আরোপিত ইতিহাসের এই সর্বগ্রাসী বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে, হৃত জাতিগত গৌরবের উত্তরাধিকার ফিরে পেতে হলে, পরাজিত মানসিকতার হীনমন্যতাবোধ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আত্মপরিচয়ের অহংকারে উত্তরণ ঘটাতে হলে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে–ইতিহাসের বিনির্মাণ। যা এক দুরূহ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টা দাবি করে এক দীর্ঘস্থায়ী যূথবদ্ধ একনিষ্ঠ প্রয়াস। অবিরাম নিরলস এই যূথবদ্ধ সত্যানুসন্ধানী প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল আমরা সরাতে পারি আরোপিত ইতিহাসের জগদ্দল পাথরকে। আর সে লক্ষ্যাভিমুখেই এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ।

উৎসর্গ

ক্ষম অকৃতির এই স্পর্ধিত আত্মনিবেদন
ক্ষম অর্ঘ্যের ছলে এই নির্বোধ উচ্চারণ,
জানি, ধমনির প্রতি স্পন্দন জপে যদি তব নাম
প্রতি শোণিত বিন্দু যদি ভাবে মুহূর্তের প্রতিদান,
বৃথা। হয়নাকো শোধ তার কিছু অণু পরিমাণ।
হে অনান্তিক জনক-জননী আমার—
এ শুধুই ধুলোকালিমাখা মোর শিশুতোষ হাতে
ফের ছুঁতে চাওয়া তোমাদের অমেয় ভুবন।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইতিহাসের ছিন্নপত্র

(অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসনকাল)

কায় কাউস





গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ	১৫ আগস্ট, ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	কে এন্ড এন
আইএসবিএন	978-984-96968-7-2
ফিক্সড প্রাইস	৮০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস।
শব্দটা হামেশাই উচ্চারিত হয় মুখে মুখে। ইতিহাস আদতে কী? অতীত ঘটনা ও কার্যাবলির অধ্যয়ন—তাইতো? সেই সংজ্ঞামতে ইতিহাসের পাঠগুলোও এক-একটা ইতিহাস।

অতীতে একটা ঘটনা বারবার ঘটেছে—ইতিহাসের চোখে একটা কাঠের চশমা পরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। আমরা তো জানি, ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গন্ডগোলটা বেধেছে ঠিক এখানেই। স্ব-স্ব চিন্তা-কাঠামোর ইতিহাসবিদরা নিজেদের রঙে রাঙিয়েছেন ইতিহাসকে। যার যত দক্ষতা, ক্ষমতা ও মাধ্যম ছিল, সে তত বেশি ইতিহাসকে দখল করেছে। প্রচলিত একটা নিষ্ঠুর বয়ান আছে—ইতিহাস নাকি বিজয়ীর চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখায়।

দুনিয়ার সবাই স্রোতের দিকে ছুটতে স্বস্তি পায়। কিছু মানুষ থাকে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হিম্মত দেখায়। ইতিহাসের ধারাবাহিক স্রোতে অনেক সময় সত্যকে লুকিয়ে ফেলার একটা আয়োজন করা হয়, কিন্তু কিছু মানুষ মাটি ফুঁড়ে সে ইতিহাস দুনিয়াবাসীর সামনে হাজির করার কোশেশ করে। কায় কাউস ঠিক তেমনই একজন ইতিহাসবেত্তা।

‘ইতিহাসের ছিন্নপত্র’ গ্রন্থটি অতীত ইতিহাসেরই পুনর্পাঠ; নতুন ইতিহাসের সৃষ্টিকর্ম নয়। এখানে গ্রন্থকার নিজ থেকে বয়ান তুলে ধরেননি; স্রেফ ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া মণি-মুক্তোগুলোকে সংগ্রহ করেছেন পরম যত্নের সঙ্গে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের পরিশ্রম খুঁজে পাবেন।

‘ইতিহাসের ছিন্নপত্র’ তিন খণ্ডের গ্রন্থ। এর প্রথম খণ্ড ইতোমধ্যে আপনাদের হাতে শোভা পাচ্ছে। আপনাদের পাঠপ্রতিক্রিয়াই বলে দেয়, কত সমৃদ্ধ ছিল গ্রন্থটি। এবার তারই ধারাবাহিকতায় আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি দ্বিতীয় খণ্ড। সত্যই এ এক অনন্য কর্ম। সত্যের মুখোমুখি হয়ে ইতিহাসের এই বোঝাপড়া আপনাদের ভাবনার জগৎকে নতুন করে সাজাবে। ইতিহাসের চোখে পরানো কাঠের চশমাটা খুলে সেখানে ‘বাস্তব লেন্স’ লাগিয়ে দেওয়ার আয়োজনে আপনাকে স্বাগত। ছিন্নভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ পাঠকদের ঠিকানায় পোস্ট করা হলো ‘ইতিহাসের ছিন্নপত্র’ গ্রন্থিত চিঠির মাধ্যমে।

সম্মানিত লেখক এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থের কোথাও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। ভালো থাকুন সকলে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মুখবন্ধ

পরম করুণাময়ের অসীম কৃপায় "ইতিহাসের ছিন্নপত্র"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। বর্তমান খণ্ডে অবিভক্ত পাকিস্তানের চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে ঘটনাবহুল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কালপর্বের এক বহুমুখী বয়ান সংকলিত হয়েছে। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে সত্তরের নির্বাচন পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি।

সার্বিক আযাদী আর এক স্বতন্ত্র আবাসভূমির স্বপ্নে বিভোর উপমহাদেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘু মুসলমানদের বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা আর সংগ্রামলব্ধ পাকিস্তান মাত্র দু-যুগের ব্যবধানে কীভাবে এক ভঙ্গুর রাষ্ট্রে পরিণত হলো, কীভাবে বৃহত্তর মুসলিম জাতিসত্তার আবেগমথিত ধর্মীয় চেতনার স্থলে জন্ম নিল স্থূল আঞ্চলিকতাবাদ আর সংকীর্ণ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, কীভাবে ব্যর্থ হলো এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সকল সম্ভাবনা, কীভাবে দেশ থেকে দল, দল থেকে ব্যক্তি প্রাধান্যের নষ্ট রাজনীতির ঘটল উন্মেষ আর পরিণতিতে অনিবার্য হয়ে উঠল রক্তাক্ত বিচ্ছিন্নতা—আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই জটিল ঘটনাবহুল পরিক্রমাকে অনুসরণ করতে হলে, তার অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনাবলির উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের ইতিহাসের এই একটিমাত্র কালপর্বকেই গভীরভাবে পাঠ করা জরুরি। এই সময়টুকুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের রাজনীতির সমস্ত অধঃপতন, ব্যর্থতা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, শঠতা, মিথ্যাচার আর কদর্যতার বিষবৃক্ষের বীজ। এই কালপর্বকে পাঠ ব্যতিরেকে আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান তাই কখনোই পূর্ণতা পেতে পারে না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের জন্ম থেকে শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের অভিষেক পর্যন্ত কালপর্ব তাই আমাদের ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার পূর্ববর্তী আর পরবর্তী সকল রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত আর উত্থান-পতনের জবাব রয়েছে এই কালপর্বেই।

উক্ত সময়কালে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুলভ, দুর্লভ, প্রচলিত, অপ্রচলিত বয়ানের সারসংক্ষেপ সংকলনের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি পাঠককে সেই কালপর্বকে যথাসাধ্য অনুধাবনযোগ্য করতে। তাই বলাই বাহুল্য, সে অর্থে এটি সংকলনধর্মী আকর গ্রন্থ হয়ে উঠলেও কোনো ধ্রুপদী ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত বিপুল তথ্যমালা আগ্রহী পাঠকদের আরও গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করলেই আমি আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব।

পরিশেষে এই সংকলন প্রকাশে যারা অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ জুগিয়েছেন, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে পরম মমতা আর ভালোবাসায় ছায়ার মতো আমাকে জড়িয়ে রেখেছেন—তাদের সবার অপরিশোধ্য ঋণ গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। বিশেষভাবে বর্তমান বৈরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বইটি প্রকাশের ঝুঁকিপূর্ণ দুর্বহ দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আর বিনীতভাবে দায় ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সংকলনে উদ্ধৃত সকল তথ্যসূত্রের লেখক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীদের প্রতি।

বিপুল কলেবরের বইয়ে স্বভাবতই কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদ এবং ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে। আশা করি পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের আশা রাখি। ইতিহাসের পুনর্পাঠ আনন্দময় হোক। হার্দিক শুভকামনা।

কায় কাউস
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ইং

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাল : বিচ্ছিন্নতার শেষাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : ভাঙনের পূর্বাভাস

প্রথম পর্ব

বিভাগপূর্ব উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ

এক

"... ১৮৬৭ উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা আর টিকে রইলো না। এখান থেকেই ভারতে, বিশেষত: শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ফণা বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এখানেই দ্বিজাতি তত্ত্বের সূচনা হয়।

হিন্দুদের এই উর্দু-বিরোধিতা লক্ষ্য করে ফরাসী প্রাচ্য ভাষাবিদ গারসিঁ-ডি-ট্যাসী বলেছিলেন : '... শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য মূলত উর্দু-হিন্দি বিবাদেরই অপর নাম।' তিনি হিন্দি আন্দোলনের নায়ক বাবু শিব প্রসাদের উর্দু-বিরোধিতাকে হীনমন্যতা বলে অভিহিত করেন।

১৮৬৭ সালে বেনারসের কমিশনার মিঃ সেক্সপীয়ারের সাথে মুসলমানদের শিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন :

'... এখন আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, দুই জাতি (হিন্দু-মুসলিম) কোন কাজে আন্তরিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। এখন তো বিরোধ কমই দেখছেন। দিনদিন তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের (হিন্দুদের) ব্যবহারে এ বিরোধিতা ও শত্রুতা আরো বাড়তেই থাকবে। যাঁরা বেঁচে থাকবেন, দেখতে পাবেন।"

সেক্সপীয়ার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন : 'যদি আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয়, তবে তা হবে নিতান্ত দুঃখজনক ব্যাপার।' তখন স্যার সৈয়দ বলেছিলেন : 'আমিও এর জন্য দুঃখিত। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত।'

স্যার সৈয়দ হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পর্কে 'আলীগড় শিক্ষাসার্ভে রিপোর্টে' আরো বলেন :

'... ত্রিশ বছর ধরে আমি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে আসছি। উভয় জাতি মিলিতভাবে উভয়ের মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হোক - এটাই ছিল আমার নিত্য কামনা। কিন্তু যখন থেকে হিন্দু বাবুরা উর্দু ভাষা ও ফার্সী অক্ষরকে ভারতীয় মুসলিম শাসনের প্রতীক মনে ক'রে এর বিলুপ্তি সাধনের মতলব আঁটলেন, তখন থেকেই আমার নিশ্চিত ধারণা হলো যে, হিন্দু ও মুসলমান একযোগে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকল্পে আর কোন কাজ করতে পারবে না। আমি আমার অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কপটতা বিরাজ করছে, উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলেই তার সূচনা হয়েছে।'

'বাবায়ে উর্দু' ডক্টর আবদুল হক দ্বিজাতি তত্ত্বের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের উৎপত্তি হয় উর্দু-হিন্দি বিবাদ থেকে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্মও হয় এখানে। তিনি আরো বলেন, সাধারণত বলা হয় যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ একটি রাজনৈতিক ইস্যু এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' প্রতি স্যার সৈয়দের বিরোধিতার ফলেই এই ইস্যুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বস্তুত হিন্দুরা যখন উর্দুর বিলুপ্তি সাধনে উঠেপড়ে লাগলো, তখন থেকেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে॥"[১]

দুই

"... স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিলেও তাহা যখন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বিরত করিতে পারে না, তখন ইংরাজের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের এক বিরাট শক্তিশালী অংশ উর্দু ভাষার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা প্রচলনের দাবি করে এবং দেখা যায় ১৯০০ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে উক্ত প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচলন সরকারি সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মুসলমান ইহার বিরোধিতা করে। এই ভাষা প্রচলন করিবার আন্দোলন দীর্ঘ দিন চলে।

ইংরাজ শাসন আমলে উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিবর্তে সরকারি দপ্তর ও আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করিলে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা বয়কট করে কিন্তু তাহার পর তাহারা যখন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে তখন ইংরেজির পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহা যে কেবল মুসলমান সমাজ ও যুবকদের আরও দীর্ঘদিন ভারতের রাজনীতি হইতে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার বিরুদ্ধে ছাত্রীর নবাব মহসীন-উল-মুলক্ আলীগড়ে এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নবাব সাহেব তখন আলীগড় কলেজ পরিচালনা সমিতির কার্যসচিব। এই সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্বয়ং আলীগড় কলেজ পরিদর্শন করিতে যান এবং ট্রাস্টিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'নবাব সাহেব হয় উর্দু কনফারেন্সের সভাপতি থাকিবেন নতুবা কলেজের কার্যসচিবের কার্য করিবেন, যে কোন একটি পদ বাছিয়া লইতে হইবে।' ট্রাস্টিগণের চাপে এবং অনুরোধে ইংরাজ বিরাগভাজন নবাব সাহেবকে উর্দু কনফারেন্সের সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ কনফারেন্সকে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। 'খন্ডিত ভারতে' ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, 'কেবলমাত্র কলেজের কর্ম সচিব স্যার সৈয়দ আহমদ নহেন, অধ্যক্ষ মিঃ বেক পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস, লবণশুল্ক প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবির বিরোধিতা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা দেখাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু নবাব মহসিন-উল-মুলকের বেলায় উর্দু সভায় সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়।'

১৯০১ সালে নবাব মহসীন-উল-মুলক্ 'মহামেডান পলিটিক্যাল অরগেনাইজেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাহাতে তিনি কর্মচারী রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ অক্ষুন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকার এইরূপ সংস্থানের অননুমোদন দেন নাই। ইহার ফলে নবাব সাহেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়॥"[২]

---

[১] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ/স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা ॥ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - জুন, ১৯৮২। পৃ. ৩৮৭-৩৮৮]

[২] আবদুল ওয়াহিদ/উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান ॥ [ইসলামিক ফাউন্ডেশন - ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩। পৃ. ৫৬-৫৭]

তিন

"... ১৯০০ সালের ১৮ আগস্ট তারিখে লক্ষ্ণৌতে উর্দু প্রতিরক্ষা সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাষণ দানকালে নবাব মহসিন-উল-মূলক বলেন :

'যদিও আমরা কলম চালাই না এবং আমাদের কলম শক্তিশালীও নয় - যার জন্য অফিসেও আমাদের খুব কমই দেখা যায়, তবুও আমাদের তলোয়ার চালানোর শক্তি আছে এবং মহারানির জন্য আমাদের হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ। ... এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ভাবতে পারি না যে সরকার আমাদের পরিত্যাগ করবে বা উপেক্ষা করবে, যেসব জিনিসের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করে সেগুলোর ব্যাপারে এমন কিছু ঘটতে দেবে যাতে আমাদের জীবন শোকাবহ হয়ে উঠে। আমি বিশ্বাস করি না যে সরকার আমাদের ভাষাকে মরে যেতে দেবে। সরকার তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ওটা কখনো মরবে না। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, আমাদের ভাষাকে হত্যা করার জন্য অপর পক্ষ যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যেকোন সময় ওটা বাধার সম্মুখীন হবে। এইসব ভয়ের কারণেই আমরা আমাদের ভাষাকে জীবন্ত রাখার প্রয়াসে কিংবা ওটা না পারলেও এর মরদেহটাও না হলে সাফল্যের সাথে বয়ে নিয়ে যাবার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। যখন কিছু কিছু সমস্যার কারণে সমগ্র জাতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তখন কোন আন্দোলন গড়ে তোলা বা জনগণকে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হল জনমতকে একটি সহনীয় স্তরে নিয়ে আসা এবং মানুষের মন থেকে সরকারের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা থাকলে তা দূর করা।'

... ১৮ অক্টোবর, ১৯৩৭ তারিখে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে উর্দু সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব :

'যেহেতু উর্দু ছিল মূলত একটি ভারতীয় ভাষা এবং সেটার উৎপত্তি হয় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং এদেশের জনগণের একটা বড় অংশ এই ভাষায় কথা বলত, তাই একটা অখণ্ড জাতীয়তা গঠনে তা সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়, তাই এর স্থলে যেটা হিন্দুস্থানি ভাষা নামেও অভিহিত সেই হিন্দিকে প্রতিস্থাপন করলে উর্দু ভাষার আঙ্গিক ভিত্তিটাই তা উল্টিয়ে দেবে আর এই সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ভারতের সকল উর্দুভাষী মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি সকল ক্ষেত্রে তাদের ভাষার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাবার আহ্বান জানাচ্ছে এবং যেখানেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষা উর্দু সেখানেই সেই ভাষার ব্যবহার ও উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং যেসব এলাকায় সেটা প্রধান ভাষা নয় সেখানে ওটাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো এবং সকল সরকারি অফিস, আদালত, আইনসভা, রেলওয়ে ও ডাকবিভাগে এই ভাষার ব্যবহারের বিধান রাখা উচিত বলে মুসলিম লীগ মনে করে। উর্দুকে যাতে ভারতে সার্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে চেষ্টাও করা উচিত।'

প্রস্তাবক : রাজা আমির আহমদ খান সাহেব (রাজা সাহেব মাহমুদাবাদ, ইউপি)

সমর্থকবৃন্দ :

মওলানা করিমুর রাজা খান সাহেব, ইউপি।

হাসান রিয়াজ সাহেব, ইউপি।

গোলাম হাসান সাহেব, বেরার।

এস. এম. হাসান খান সাহেব, বোম্বাই॥"[৩]

---

[৩] পাকিস্তান আন্দোলন : ঐতিহাসিক দলিলপত্র/জি অ্যালানা (অনু : কে এম ফিরোজ খান) ॥ [খান ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮। পৃ. ১৯/১৩১-১৩২]

চার

"... কোন মাদ্রাসাপন্থী বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে বোধহয় রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখিয়াছিলেন। তিনি কি লিখিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় নাই। সুতরাং তাহার কথার যথার্থতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ১৩৪১-এর 'প্রবাসী' বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরের কয়েকটি লাইন এইরূপ :

'আজকের বাঙ্গলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তারা বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে উর্দ্দু গ্রহণ করতে পারেন।'

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বয়সেও তরুণ নহেন, বাঙ্গলার প্রবীণতম সাহিত্যিক। উপরে তাহার যে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে–তাহার ভিতরে যে উষ্মা ও অসংযম প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়াইয়া দিবে কিনা তাহার বিচার আমরা করিব না। ভাষা যে কাহারো আবদার বা নিষেধের অপেক্ষা রাখে না, তাহার প্রমাণ তিনি নিজেই। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম বাঙলা ভাষাকে যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন সে রূপ মুছিয়া গিয়া তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের তুলির রূপ। এ রূপও হয়তো চিরস্থায়ী হইবে না। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোন শক্তিশালী লেখকের প্রভাবে অথবা সাহিত্যিকদের শুধু নূতনত্বের মোহেই এ রূপ বদলাইবে।...

এসব কথা রবীন্দ্রনাথ যে জানেন না তাহা নহে। তবু কিন্তু তিনি মুসলমানদিগকে নোটিশ দিয়াছেন, 'আজকের বাঙ্গলা ভাষা যদি বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তারা বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে উর্দ্দু গ্রহণ করতে পারেন।' বিদ্যাসাগরের ভাষা যেদিন রবীন্দ্রনাথের ভাব 'সুস্পষ্টরূপে ও সহজভাবে' প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ কি সেদিন বাঙ্গলা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন, না নিজের মনের আনন্দে পথ কাটিয়া নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তবে আজ মুসলমানের উপর এ নোটিশ কেন?

রবীন্দ্রনাথ হয়তো ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন–নূতন ভাষা যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাহারই সম্পত্তি। তাহার উপর আর কেহ উপদ্রব করিবে ইহা তাহার সহ্য হয় না। তাই অধৈর্য হইয়া তাহাকে অসংযত উক্তি করিতে হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের মনের অনন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পদকে তিনি হারাইতে প্রস্তুত, তবু বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্তন তাহার অসহ্য। বাঙ্গালী মুসলমানও যদি রবীন্দ্রনাথকে নোটিশ দেয়–'আমরা যে ভাষায় কথা কহি তাহা নিতান্তই আমাদের। সেই ভাষায় আমাদের মনকে প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে। ইহাতে যদি কাহারো অসুবিধা হয় তিনি বাঙ্গলা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কোন ভাষার চর্চ্চা করিতে পারেন'–তবে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি কি?" (মাদ্রাসাপন্থী ও রবীন্দ্রনাথ : সম্পাদক / ছায়াবীথি, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ; ১৩৪১, আষাঢ়)[৪]

পাঁচ

"... ১৯১৮ সালে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দি সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলার দাবি পেশ করেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতীতেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ পন্ডিতগণ সে সভায় হাজির হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। প্রস্তাবে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথমে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে তাকে ভারতের অন্যতম সাধারণ ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চে। শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি একথা বলেননি। একজন ভাষাতাত্ত্বিক-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ মন্তব্য করেছেন।

(ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শতবর্ষ পূর্তি স্মারকগ্রন্থ/সম্পা. মুহাম্মদ আবু তালিব, পৃ. ৩৬১-৩৬৩)

[৪] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম/সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (দ্বিতীয় খন্ড) ॥ [বাংলা একাডেমী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। পৃ. ৩৫১-৩৫২]

পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই ১৯২১ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য লিখিতভাবে দাবি উত্থাপন করেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। দাবি নামায় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন :

'ভারতের রাষ্ট্রভাষা যা-ই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে।'

১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে মাওলানা আকরাম খাঁ সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন :

'বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায়ই তাদের লেখা ও কথা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন বাংলা ভাষা আজ রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠিত।"[৫]

ছয়

"... ১৯২৬ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ চালু হয়। আমি ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ ক্লাশে ভর্তি হই। কলকাতায় এটাই মুসলমানদের জন্য প্রথম কলেজ এবং একমাত্র কলেজ। কলেজটি সরকারি। নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কলেজের কাজ শুরু হয়। মিঃ এ এইচ হালে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে ইনি ছিলেন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। ইনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় এমএ ছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন জনাব আলতাফ হোসেন (পরে পাবলিসিটি বিভাগের পরিচালক ও 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক ও পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন), জনাব আবু হেনা, জনাব জহুরুল ইসলাম, উর্দু সাহিত্যের কবি 'তুতিয়ে বাঙ্গালা' খ্যাত রেজা আলী ওয়াহাসাত প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ।

কিছুকাল পরই কলেজ ছাত্র সংসদ গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। নির্বাচন নিয়ে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং ভীষণ প্রতিযোগীতা শুরু হয় বাংলা ও উর্দু ভাষী ছাত্রদের মধ্যে। দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী দল। শুরু থেকেই ভাষা ভিত্তিক প্রচারণা শুরু হয়। বিষয়টি ইসলামিয়া কলেজের ঘরোয়া ব্যাপার হলেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী ছিলো। পরবর্তীকালের ইতিহাস তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ব বাংলা) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

বাংলাভাষী ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও উর্দুভাষী ছাত্রদের বাইরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ বাংলাভাষী ছাত্রদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় কারণ এদের অধিক সংখ্যক ছাত্রই কলকাতার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত। কলকাতায় স্থানীয়ভাবে তাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ছিলো না। এছাড়া বহিরাগত উর্দুভাষী ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয় কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা উর্দুভাষী ছাত্ররা। কলকাতার বাসিন্দা বাংলাভাষী ছাত্রের সংখ্যা ছিলো কম। বাংলাভাষী ছাত্রদের মধ্যে পূর্বেকার পরিচয় না থাকায় সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদক মনোনয়নের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয়। এক বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে, এমন একজন ছাত্রকে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করতে হবে যিনি বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে অন্তত কিছুটা পরিচিত। অনেক আলোচনার পর হাবিবুল্লা বাহারের নাম উল্লেখ করা হয়। বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিক হিসাবে তিনি এর মধ্যেই পরিচয় লাভ করেন। শেষটায় সিদ্ধান্ত হলো যে তাকে চট্টগ্রাম থেকে এসে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম করা হয়। সঙ্গে ভর্তির ফরমও পাঠিয়ে দেয়া হয়। দু'দিন পরই টেলিগ্রামের উত্তর আসে যে তিনি অসুস্থ কিন্তু প্রেরিত ভর্তির ফরম পুরণ করে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং জানান হয় যে, অন্তত দু'এক মাসের মধ্যেই তিনি উপস্থিত হতে পারবেন।

---

৫ সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ/ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত ॥ [বিসিবিএস - জুলাই, ১৯৯৮। পৃ. ২৪৩]

এতে আমরা অনেকটা দমে গেলাম। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উঠে যে অনুপস্থিত ছাত্রকে কোনো পদে মনোনীত করা যাবে না। তাই পরবর্তী বৈঠকে সর্ব সম্মতভাবে দু'জনকে বিএ ক্লাশের সৈয়দুল হককে সহ সভাপতি আইএ ক্লাশের মো: ওয়াজেদকে সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

উর্দু ভাষীদের মধ্যে থেকে সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয় সৈয়দ মোহাম্মদ আলীকে। ইনি ময়মনসিংহের ধনবাড়ীয়ার জমিদার বাঙ্গালী নওয়াব নবাব আলী চৌধুরীর পৌত্র। কিন্তু তিনি উর্দুভাষী। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। পুরুষানুক্রমে ও বংশানুক্রমে বাঙ্গালী হলেও বাংলাভাষা শেখেননি। উর্দুই ছিলো তার কথ্য ভাষা এবং নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে ছিলেন নারাজ। আর সহ সভাপতি পদে মনোনীত করা হয় যদিও এখন সঠিক মনে পড়ছে না তবে খুব সম্ভব প্রিন্সিপাল কামাল উদ্দিন সাহেবের ছেলে এ. বি. জেড হান্নানকে। তিনি ছিলেন বিএ ক্লাশের ছাত্র।

প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব কলেজের বাইরেও প্রতিফলিত হয়। কলকাতার উর্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট দিনে তুমুল উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বাংলাভাষী প্রার্থীরা বহু ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়। প্রতিপক্ষের কেউই নির্বাচিত হতে পারেনি। এ জয় শুধু ইসলামিয়া কলেজের বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদেরই জয় ছিলো না, এ জয় ছিলো বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর॥"[৬]

সাত

"... ব্রিটিশ শাসনামলে এবং ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের বহু আগেই, ভারতের তথা উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর চল্লিশ কোটি মানুষের এবং বহু ভাষাভাষী জনগণের দেশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, সে বিষয়ে সাহিত্যিক-সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ১৯১৮ সালে মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত চেয়ে এক পত্র লেখেন। জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'The only possible language for inter-provincial inter course is Hindi in India'. অর্থাৎ হিন্দী ছাড়া ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক সাধারণ ভাষা হওয়ার যোগ্য অন্য কোনো ভাষা নেই। (রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬৮,পৃষ্ঠা ৭৮)

... উপমহাদেশ তথা ব্রিটিশ ভারত অবিভক্তরূপে স্বাধীন হলে–অর্থাৎ ব্রিটিশের পরাধীনতা মুক্ত হলে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দী হবে সেটা একরূপ নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধরে নিয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, এটাও একরূপ নিশ্চিতরূপেই ধরে নেয়া হয়েছিল যে, উপমহাদেশ তথা ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান–এই দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। যদিও সেকালেই বাংলা ভাষাকে ভারতের–যদি অবিভক্তরূপে স্বাধীন হয়, সাধারণ ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষারূপে মর্যাদা দানের এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটলে তার রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। যদিও একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কেউ কেউ উর্দুকেই উপমহাদেশের এবং প্রতিষ্ঠিতব্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানেরও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কারূপে উর্দুকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে হিন্দি এবং উর্দু ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবির প্রেক্ষাপটের সন্ধান মিলে এবং বাংলা ভাষা কেন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে পারেনি, ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেন একমাত্র উর্দু করার এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার

---

৬ খালেকদাদ চৌধুরী/শতাব্দীর দুই দিগন্ত ॥ [সুনেত্র - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫। পৃ. ৫৭-৫৮]

মর্যাদা না দেয়ার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র হয়, কেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন করতে হয়, কেন ১৯৫২ সালে রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এবং ভাষা শহীদদের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তারও পটভূমি এবং সূত্র-সন্ধান মিলে।

উল্লেখযোগ্য যে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ও সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও বহু আগে হিন্দি এবং উর্দুকেই অবিভক্ত ভারতের তথা এ উপমহাদেশের সাধারণ ভাষা তথা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা তথা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার যোগ্য আর দাবিদার হিসেবে গণ্য করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দিকেই যে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন সে-সম্পর্কে ১৩৪৫ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় : 'ভারতের মাতৃভাষাগুলি ঠিক রাখিয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বা উর্দুকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টা কংগ্রেস করিতেছেন।... পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রভৃতি, যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী এবং তাহারা সমগ্র ভারতে হিন্দী'র ব্যবহার চান।' উল্লেখ্য, হিন্দু পণ্ডিত সমাজ, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হিন্দীকে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালান, অন্যপক্ষে মুসলমান পণ্ডিত সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উর্দুকে ঠিক রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবি না জানালেও এই ভাষাকে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা রূপে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি উত্থাপন করেন। হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার কংগ্রেসের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে 'মাসিক প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বলা হয়, 'কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টায় মুসলমানদের সহিত ঝগড়ার আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। তামিল দেশে খুব বিরোধ চলিতেছে। অন্ধ্র প্রদেশে বিরোধিতাটা আপাতত চাপা আছে। হিন্দুস্থানী কে রাষ্ট্রভাষা করার একটা উপসর্গ এই হইয়াছে যে, ইহা শিখিয়া এই ভাষায় কে কি লিখিতেছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইলে নাগরী অক্ষর, আরবি, ফারসি অক্ষর এবং রোমান অক্ষর, এই তিন রকম অক্ষর উত্তমরূপে পড়িতে, শিখিতে হইবে। কারণ, কংগ্রেসের মুসলমান পুরোহিত মৌলানা আবুল কামাল আজাদ সাহেব পাঁতি দিয়াছেন যে, রোমান অক্ষরও শিখিতে হইবে॥"[৭]

আট

"... With increasing gusto, public leaders of the community took up the cause of Urdu. Fazlul Haq, in Assansol Muslim League Conference on 3 April 1938, put emphasis on the need of Urdu for preserving cultural unity and implored that Urdu should be made a compulsory second language for all Muslim boys. A few months later, during the 52nd session of the All-India Muslim Educational Conference held at Calcutta, on 29 December 1939, this esteemed leader of Muslim Bengal unequivocally declared,

'I am firmly of the opinion that Urdu should be made compulsory for all those Muslim students who take Bengali as their vernacular.'

Apart from Fazlul Haq there were other leaders like Mrs Hasina Murshed and H. S. Suhrawardy, who opined that,

'The name of Urdu and the Persian script of Urdu were like the two iron walls of defense of our cultural independence.'

Undoubtedly, Urdu could cast its spell over Bengal very effectively. From the end of the thirties, the Urdu movement obviously got fillip and began to draw more supporters from

---

[৭] মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ / বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলন যুগে যুগে ॥ [নওরোজ সাহিত্য সম্ভার - জানুয়ারি, ২০১৮। পৃ: ১৩৩-১৩৫]

different ranks of the Bengal Muslim society. Within a short period, Bengal witnessed the establishment of two important organisations devoted to the cultivation of Urdu in Bengal: 'North Bengal Urdu Association' (having its first session on 6 and 7 March 1943 at Dinajpur) and 'Anjuman-Taraqqi-e-Urdu Bangala' (inaugural meeting held on 5 December 1943, at Calcutta Islamia College), both the institutions being exclusively Bengal Muslims concerns."[৮]

নয়

"... The unifying influence of Islam in diverging localities was one of the characteristic features of the Muslim rule in India. For many centuries the unity of Indian history was lost until the Mussalman conquests again restored a Government strong enough to become the paramount power. The conception of modern India as one country was a distinct Muslim contribution and no doubt the earliest creation within the annals of recorded history. The resultant creation of this unity of conception of India as one country is the name Hindusthan given to this land. The Muslims evolved a common language for the whole of India and history does not record any single event which may in any way lead to the inference that this language was in any manner imposed upon the people. Yet it was under the patronage of the Muslim kings that the local languages of India had their modern revival and developed under encouragement from the Mughal court and from the many Muslim rulers and chiefs all over India. The Muslims of course accepted Urdu as their common language, whether they chose to settle and live in Trichinopoly or Guntoor, or far away at Delhi or Assam and in spite of the many vicissitudes of fortune, the Muslims in a large part of the South still retain this common language.

... But nothing created greater bitterness of feelings in the province than the proposal to introduce Hindusthani in elementary schools. Almost immediately after the Congress Ministry came to office, the Ministry decided as the first step to implement the spirit of the Wardha Scheme to introduce Hindusthani in elementary schools from Form I to Form III as a compulsory subject for study. They further decided to modify the curricula of studies and syllabuses in elementary schools. It appears that at the beginning there was no clear indication as to whether the language was Hindi or Hindustani. In any case the proposal evoked a storm of popular protests all over the province and specially in Tamil-speaking areas. Widespread anti-Hindi agitations followed and the Government took recourse to the provisions of the Criminal Law Amendment Act and other penal laws to deal with the agitation. Men and women were prosecuted and convicted for shouting anti-Hindi slogans or for delivering anti-Hindi speeches. Up to 31st December, 1938, the number of convictions was 507, of which 215 persons had convictions of 'six months' to 'three years' rigorous imprisonment. By the 31st of January, 1939, that is within a month the number rose to 752 including 36 women. Each month added to the role of convictions. Local attempts were organised in some places to forcibly stop meetings arrange for the purpose of ventilating anti-Hindi feelings; when the Police prosecuted 30 Congress-men for rioting and obstruction at an otherwise peaceful anti-Hindi meeting, the case was withdrawn by orders of Government.

This form of open agitation was almost entirely confined to the Hindu community as affecting the future of Tamil or other local languages. Bitter protests from various quarters were, however, voiced in the Madras Assembly where it was openly stated that the intentions of Government were not to introduce Hindustani but Hindi - a language which a

[৮] Dhurjati Prasad De / Bengali Muslims in Search of Social Identity (1905-1947) \ [UPL - 1998 | p. 134]

distinguished speaker speaking before the Assembly described in the following terms : 'And what is the language itself? A language for which Mr. Gandhi himself says, a dictionary has hereafter to come into existence, a grammar has hereafter to be made, a hybrid language - a language which these people do not want, a language which you want to force upon the Tamils.'

The grievances of the Muslim community were on different grounds. As has been said before, from the first there was no clear indication as to whether it was proposed to introduce Hindi or Hindustani. The public declarations of the Ministry were of course all in favour of Hindustani but almost every step taken from the inception of the proposal tended to create a feeling that the real intention was Hindi and not Hindustani. Hindustani or Urdu is the spoken language of the Mussalmans in the major part of the province. The large number of existing primary schools specially intended for the Muslims were all Hindustani or Urdu schools. Books in this language were thus already there duly prescribed by the Text Book Committee. But the Government declared their intentions to prepare fresh textbooks ostensibly with a view to standardise the language. It came out that in fact some persons belonging to the Hindi Prachar Sabha in Madras first prepared and compiled the proposed text-books. When scales of pay were laid down for Hindustani teachers in Secondary schools, the qualifications were mostly in favour of Hindi teachers, viz., 'Holders of Vidwan titles,' 'Graduates and Intermediates with Hindi as optional subject, etc.' The scheme was rushed through even before text-books as contemplated by Government were ready. The original proposal was to introduce the language in 125 schools; it was not possible to introduce the scheme in more than 65 schools as people with requisite qualifications were not even available. Immediately an order was promulgated by Government to the effect that where Hindustani teachers with full qualifications were not available, persons trained by 'Dakhin Bharat Hindi Prachar Sabha' would be appointed.

The Government decided that each book approved would be published in two scripts - Devnagri and Urdu, the first for Hindu students and the other for Muslim students. But in deciding as to whether a particular script should be read by Muslim students or not, local Muslim opinion was not to be consulted, no enquiry was to be made from the parents by the school authorities. The parents themselves were to apply if they wished to change the script, which was usually Devnagri, introduced in these schools. It is well known that due to illiteracy and ignorance prevailing in rural areas, very few parents are able to make any such representation in the matter of education. To ensure that the subject matter in the prescribed text-books may not contain anything inconsistent with Hindu or Muslim feelings, the Muslims proposed that the books to be newly prescribed should be approved by a committee of competent persons with 2 or 3 members from each community, but the proposal was not accepted by the Government. Rules were promulgated permitting teaching of Hindustani, both in Devnagri and Urdu scripts, but sufficient teachers were not provided for the teaching in Urdu script.

It transpired that in one district out of 1,056 Muslim students studying Hindustani under the new scheme only 325 were using Urdu script and when questioned as to the reason, the Minister replied, 'probably they do not like Urdu script.' In some of the Board schools, especially intended for the Muslims, the Muslim boys had to read in Devnagri script owing to the absence of provision for Urdu teacher. Attention of Government was drawn to this but without much effect."[৮]

---

[৮] Report of the Kamal Yar Jung Education Committee (1939)/Kamal Yar Jung \ [A. M. Kureishy - Jan, 1942, p. 6-7/57-61]

দশ

"... As part of the Wardha Scheme of education, the Congress efforts to establish Hindustani as a national language, which would replace English over a matter of time, became a hugely controversial affair. Congress attempts to justify Hindustani as occupying the middle ground between Hindi and Urdu backfired as it found itself in the firing range of both Hindi and Urdu enthusiasts. The indignation was felt not just among north Indian Urdu-speaking Muslims, for Fazlul Haq the Premier of Bengal was vociferous in his calls for Urdu being made the national language. The Lion of Bengal declared that under him the province would increase the number of madrasas to spread Urdu, Persian, and Arabic. Though Bengali was the mother tongue of his province and would be the medium of instruction, Haq insisted that Urdu needed to be made the compulsory language for Muslim students 'so that they may come in contact with the spirit of Islam.' In what now sounds like a far cry from the position taken by East Pakistanis in the aftermath of the Partition, Haq warned that unless Bengalis adopted Urdu for primary religious instruction, their boys and girls would be de-Muslimized through the anti-Islamic influences of the local environment. He further lamented that the reason why the Bengali Muslims were backward in pan-Islamist revival activities was that linguistically and culturally they were cut off from the rest of Muslim India due to their lack of proficiency in Urdu. Haq therefore wanted to make them full-fledged and active members of the Islamic fraternity by having them compulsorily learn the language.

Haq's views were supported by Maulana Saiyyid Sulaiman Nadvi, the rector of the Nadwatul Ulama of Lucknow, known for his sympathies for the ML. Nadvi wanted Urdu to be made the national language claiming that it was the joint creation of Hindus and Muslims. He argued that even if it were the language of Muslims alone, it needed to be accepted by the Hindus for it could never threaten the culture and traditions of the majority community, which could always assert itself in any case due to its numerical superiority. Nadvi dismissed Hindi as a newcomer, the product of British policy at College Fort William in Calcutta. Sanskritized Hindi, he insisted, needed to be given the same classical status as Arabic and its imposition in the name of Hindustani to be avoided at all costs or else it would lead to communal strife. He also rebutted Nehru's view that Urdu was understood in the towns and Hindi in villages, claiming that the Hindi found in newspapers and magazines was little understood in towns and even lesser in the villages. Finally, Nadvi pointed out that it was misleading to say that the use of Sanskrit words in Hindustani was necessary to carry along the south Indians or Bengalis since none of these languages had anything to do with Hindi. In this regard, he also noted that Tamil Muslims spoke Urdu while the songs of Sufi mystic Gisudaraz in the Deccan were also in Urdu.

Scholars such as Maulvi Abdul Haq, a doyen of Urdu who had been involved in the establishment of Osmania University at Hyderabad as an Urdu medium university, supported Nadvi's contention. He dismissed the claim that Hindi with its stock of words from Sanskrit would be better understood by south Indians by arguing that Sanskrit did not dominate the ordinary speech of south Indians. He further noted that the south Indians themselves had been vociferous in their protests against attempts to foist Hindi in the South. Delving into the history of the language problem, Abdul Haq pointed out that when Persian was replaced by Urdu in 1837, not a single voice had been raised. But later Hindus under Swami Dayanand Saraswati and his Arya Samaj began this whole controversy, which was given further fillip by Pandit Madan Mohan Malaviya through his shuddhi and sangathan movements. But the greatest villain of the piece according to him was Gandhi who had provided legitimacy to Hindi by accepting the Presidentship of the Hindi Sahitya Sammelan.

This move had led to Hindi making great progress in Madras, North Western Frontier Province (NWFP) and Punjab where earlier there was no affinity for Hindi. He also criticized Gandhi and his lieutenants such as Rajendra Prasad and Kakasaheb Kalelkar for increasing the use of Sanskrit words in their language on the grounds that people south of the Vindhyas would be able to understand them better due to the greater stock of Sanskrit words in the Dravidian languages.

Abdul Haq foresaw problems in creating a new language like Hindustani with a new canon along with a vocabulary that could accommodate modern and scientific ideas. Hindi and Urdu, he insisted, were separate languages and that was a reality that needed to be acknowledged. Writers in these languages were bound to fall back upon their parent tongues to absorb and express new ideas that were developing in the modern scientific world. Hindustani as a language at present served only basic conversational needs. But Haq also expressed his willingness to find the common ground for the creation of a national language. In order to tackle the problem he proposed the creation of a common dictionary consisting of all Persian and Arabic words that had passed into Hindi speech and literature and a list of Sanskrit words that Urdu had adopted. This dictionary could then be placed before a representative body of writers after whose approval it would be published as the basis for further development. This body would also be responsible for the incorporating new words from Hindi and Urdu necessary for the growth of Hindustani, which could then be given adequate publicity. Haq, like Nehru, boldly suggested that the script problem could be resolved by introducing the Roman alphabet so that all languages of the country could be written in the Roman script. He concluded that in case it was not possible to achieve these different tasks, Hindi and Urdu should be left to their own devices. Haq was therefore requested by the Bihar Government to participate in a project of compiling a dictionary with common words from Hindi and Urdu. In this regard, it must be noted that voices in favour of Urdu included non-Muslim Urdu enthusiasts and aesthetes such as the constitutional lawyer.

Sir Tej Bahadur Sapru. Sir Tej flatly declared that Hindustani was a cover for uprooting Urdu and replacing Urdu words in Hindustani with Sanskrit words. Sapru, however, opined that he was not in favour of creating a single national language and felt that the best thing would be to leave Urdu alone and allow it to occupy the same space it had over the past two hundred years. As Sapru sagely observed, Telugu, Bengali and other languages in India were as much national languages as Urdu, Hindi or Hindustani.

From the Congress side Maulana Abul Kalam Azad attempted to reassure Muslims in various ways about the Congress government's language initiative. Maulana Azad declared that the whole controversy had arisen due to indiscriminate use of the term Hindi by people from Bombay, Madras and Bengal. In a letter to Premiers of all the Congress-ruled provinces he therefore asked them to use the word Hindustani whenever the national language was mentioned. Attempting to reassure Muslims, Azad declared that the national language of India, though called Hindustani, was 'clear and simple Urdu which is generally spoken in the cities of northern India', which could be written in both Devanagari and Urdu scripts. He noted that a Hindustani reader was being prepared by the Jamia Millia Islamia and would be published by the Madras Government in both Urdu and Devanagari scripts for the primary classes. Azad also deplored the controversy being raised by Jinnah on the language question. Referring to Jinnah's address to the Memon community in Bombay wherein he accused the Congress of being in communal oranization seeking to impose Hindi over the country, Azad derisively declared that Mr Jinnah neither knew Hindi or Urdu for his mother tongue was Gujarati, while he had spent his entire life reading and

writing in English. Whatever Jinnah had said on the language question was based on hearsay or gossip in newspapers and hence irresponsible. The controversy however refused to die down and became one in the long list of Muslim grievances against Congress rule in the minority provinces."[১০]

এগারো

"... I would make an appeal to you. Of course, everyone must know his own language thoroughly well, and he should also know the great literature of other Indian languages through Hindi. But it is also the object of the Conference to stimulate in our people the desire to know languages of other provinces, eg., Gujaratis should know Tamil Bengalis should know Gujarati and so on. And I tell you from experience that it is not at all difficult to pick up another Indian language. But to this end, a common script is quite essential. It is not difficult to achieve in Tamil Nadu. For, look at this simple fact. Over 90 per cent of our people are illiterate. We have to start with a clean slate with them. Why should we not start making them literate by means of a common script? In Europe, they have tried the experiment of a common script quite successfully. Some people even go the length of saying that we might adopt the Roman script from Europe. After a good deal of controversy there is a consensus of opinion that the common script can be Devanagari and none else. Urdu is claimed as a rival, but I think neither Urdu nor Roman has the perfection and phonetic capacity of Devanagari.

Please remember that I say nothing against your languages. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada must be there and will be there. But why not teach the illiterate in these parts these languages through Devanagari script? In the interest of the national unity we desire to achieve, the adoption of Devanagari as a common script is so essential. Here it is a question of just shedding our provincialism and narrowness, there are no difficulties at all. Not that I do not like Tamil or Urdu scripts. I know both. But service of the Motherland, to which all my life is being given and without which life would be insupportable for me, has taught me that we should try to lift unnecessary burdens of our people. The burden of knowing many scripts is unnecessary and easily avoidable. I would appeal to men of letters of all provinces to resolve their differences on this point and be agreed on this matter of prime importance.

... Ultimately, when our hearts have become one and we all are proud of India as our country, rather than our provinces, and shall know and practice different religions as derived from one common source, as we know and relish different fruits of the same tree, we shall teach a common language (Hindi) with a common script (Devnagari) whilst we shall retain provincial languages for provincial use. The attempt to force one script of one form of Hindi on any province or distinct or people is detrimental to the best interests of the country. The common language question should be viewed apart from the religious differences;

Roman script cannot and should not be the common script of India. The rivalry can only be between Persian and Devanagari. Apart from its intrinsic merit, the latter (Devnagari) should be the common script for all India because most of the provincial scripts have their origin in Devanagari, and it is for them by far the easiest to learn. At the same time no attempt whatsoever should be made to foist it upon Mussalmans, and for that matter on those others who do not know it."[১১]

---

[১০] Venkat Dhulipala/Creating a new Medina : state power, Islam, and the quest for Pakistan in late colonial North India \ [Cambridge University Press - 2015, p. 77-80]

[১১] Mahatma Gandhi/Our Language Problem\ [Law Journal Press (Allahabad) - August, 1942, p. 29-30/36]

দ্বিতীয় পর্ব

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন : আন্দোলনের সূচনাপর্ব

এক

"... সক্রিয় ভাষা-আন্দোলনের আরম্ভ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। সেই প্রথম ছাত্র-সম্প্রদায় অন্যতম (বলা উচিত অন্যতর) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু এই আরম্ভেরও আরেকটি আরম্ভ ছিল, সেটি করেছিলেন লেখক-সম্প্রদায়। তাঁরাই রাষ্ট্রভাষার তত্ত্বগত দিকটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছিলেন। কেউ একক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে, কেউ অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এ আলোচনা আরম্ভ ১৯৪৭ সালের জুন মাসে, কেননা তখনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে শাসকদল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা। মুসলিম লীগের তখন অপ্রতিহত প্রভাব। শুধু তাই নয়, পূর্বপাকিস্তানের (সীমারেখা তখনও নির্ধারিত হয়নি) শিক্ষিতসম্প্রদায় - রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং অছাত্র - সমগ্রভাবে না হলেও অধিকাংশই একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষার সমর্থক ছিলেন, অথবা উর্দু ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রভাষার কথা চিন্তা করেননি। সেই সময়ে এদেশের লেখক-সম্প্রদায় রাষ্ট্রভাষী হিসাবে বাংলার দাবিও উত্থাপন করেছিলেন। এ নিয়ে অনেক দিন যাবৎ তাঁরা লিখেছিলেন, তারই ফলে ভাষা আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছিল।

... ভারতবিভাগ পরিকল্পনা ঘোষণার পর হিসাব করে দেখা গেল পাকিস্তান রাষ্ট্রে , বাঙালীরাই সংখ্যাগুরু হতে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটি বাঙালী মুসলিমমানসে এক ধরনের আস্থা সৃষ্টি করেছিল। ভাবী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে অনেক রোমান্টিক জল্পনা। সে জল্পনার মধ্যে বাঙালী মুসলমানের অনেক রঙিন স্বপ্নও মেশানো ছিল। সেই সময়ে কবি আবুল হোসেন একদিন বললেন পশ্চিমারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে যাচ্ছে, এই প্রয়াসের প্রতিরোধ দরকার। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ ছিল না। সংবাদ পত্রেও এই প্রয়াসের সংবাদ প্রকাশিত হলো। বাঙালীদের দিক থেকে দেখতে গেলে, পাকিস্তানের রঙিন জল্পনার উপর এই ছিল প্রথম আঘাত।

...জুলাই মাসে ঢাকায় মুসলিম লীগের বামপন্থীদের নিয়ে 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার ম্যানিফেস্টোতে বলা হয় বাংলা হইবে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তাদের এ প্রস্তাব ছিল গঠনোন্মুখ রাষ্ট্রের প্রাথমিক রূপরেখার একটি অংশ মাত্র। কিন্তু এর পরেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে ওঠে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দীনের একটি বিবৃতির ফলে। তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। জুলাই এর শেষদিকে দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ডঃ শহীদুল্লা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে, এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

আরবী এবং ইংরেজিকেও তিনি অনুরূপ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেই সময় তিনি যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন একথা বলা কঠিন। তবে এ প্রশ্নে তার অভিমতের গুরুত্ব এখানে যে তিনি একমাত্র উর্দু-রাষ্ট্রভাষার দাবিকে সমর্থন করেননি।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রতিষ্ঠানগতভাবে তমদ্দুন মজলিস বাংলার দাবির সপক্ষে প্রচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত এই সংস্থা ঐ মাসে বাংলা ভাষার দাবির সমর্থনে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে। এতে কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাসেমের রচনা সংকলিত হয়। তমদ্দুন মজলিসে ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাবের মূল কথা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং উর্দু এবং পূর্ব-পাকিস্তানের অফিস ও আদালতের ভাষা অর্থাৎ সরকারি ভাষা ও শিক্ষার বাহন হবে বাংলা।

একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লেখক-সম্প্রদায়ই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, প্রথমে কোলকাতা থেকে, তারপর ঢাকা থেকে। বাঙালী-অবাঙালী-নির্বিশেষে পূর্ব-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন উর্দুর সপক্ষে, শিক্ষিত-সমাজ এবং ছাত্র-সমাজেরও একটা বড় অংশ ছিলেন তাই। সমাজের এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে না পারলে ভাষা-আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হতো না; লেখকসমাজ এই মনোভাবের পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছিলেন। একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ববাংলার উপর কিরূপ অবিচার হবে এবং তার সংস্কৃতিজীবনে কিরূপ সঙ্কটের সৃষ্টি হবে সেদিকে তারা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির সপক্ষে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইসবই তারা করেছিলেন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে তাদের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বাসনা ব্যক্ত করার পূর্বেই। শাসক-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক-সমাজ এমনিতেই সচেতন ছিলেন; স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাস থেকে তাঁদের এই চেতনা এসেছিল। অধিকন্তু লীগ-নেতৃত্বের এবং সরকারি কাঠামোর সংগঠন তাঁদের এই চেতনাকে তীক্ষ্ণতর করেছিল। একাদিক্রমে কয়েক মাস ধরে বাংলা ভাষার সপক্ষে তাঁরা লিখেছিলেন; প্রধানতঃ তাদেরই প্রয়াসে শিক্ষিত ও ছাত্র-সমাজ বাংলা ভাষার দাবি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, এবং এভাবেই ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

লেখক-সমাজ একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষার সপক্ষে বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না, এবং প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাষা আন্দোলনের আগে এই আন্দোলনের লক্ষ্য নির্ধারণ হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু আগে থেকে প্রথম ভাষা-আন্দোলন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সরকারপক্ষীয় অভিমতসহ যে-সব অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল তা ছিল এই রকম :

১. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হবে একমাত্র উর্দু। এই ছিল জিন্নাহ সাহেব এবং পাকিস্তানের নীতি। সেই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব-বাংলার সরকারি ভাষা বাংলা হবে কিনা তা ঠিক করবেন এ দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। বংলাদেশের মানুষ এই নীতি মেনে নেয়নি; ভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল এ নীতির বিরোধিতা।

২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। এর অর্থ ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই দাবিই জানানো হয়েছিল। এ ছিল প্রায় চরম দাবি, দু'একজনের বেশী লেখক এরূপ দাবি জানাননি, কিন্তু উর্দুর প্রতি বাঙালীর মোহ ভাঙতে, ভাষা হিসাবে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তা এবং অন্ততঃ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবির সমর্থনে এই অভিমতের একটা ভূমিকা ছিল।

৩. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা, উর্দু, ইংরেজি এবং আরবী। পূর্ব বাংলার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা। ডঃ শহীদুল্লাহ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এটি অবাস্তব দাবি, এর ফলে বাংলার দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে একই সঙ্গে একমাত্র-উর্দুর দাবিও দুর্বল হয়, এই ছিল এ অভিমতের ভূমিকা।

৪. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারি ভাষা (রাষ্ট্রভাষা) এবং আন্তঃ প্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হওয়া উচিত উর্দু, উর্দুকে একটা সম্মান দেওয়া উচিত, কিন্তু পূর্ব-বাংলায় রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং 'সওগাত' এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। পাকিস্তান সরকারেরনীতির সঙ্গে এ অভিমতের বেশ খানিকটা সাদৃশ্য ছিল। এই অভিমত কার্যকর হলে পশ্চিম-পাকিস্তানের কারো বাংলা শেখার বাধ্যবাধকতা থাকত না। একমাত্র-উর্দু রাষ্ট্রভাষা পূর্ব বাংলায় চালানো অসঙ্গত হবে, এবং এখানে বাংলা হবে শিক্ষার মাধ্যম, মাত্র এইটুকু ছিল এ অভিমতের বক্তব্য।

৫. পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু এবং পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। প্রাদেশিক সরকার এই নীতি অনুসরণ করবেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও ভাষা কি হবে সে সম্বন্ধে এই অভিমত সুস্পষ্ট ছিল না। তবে এই অভিমত পরবর্তী ষষ্ঠ অভিমতের খুব কাছাকাছি।

৬. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। পূর্ব-বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বাঙালী উর্দু শিখবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর জন্য। একই প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তানীরা শিখবে বাংলা। এই ছিল (তমদ্দুন মজলিসসহ) অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর অভিমত। এইসব অভিমতেরই বিস্তারিত ভাষ্য সম্ভব।

মোটামুটিভাবে বলা চলে, ষষ্ঠ অভিমতই হয়ে উঠেছিল ভাষা-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য॥"[১২]

দুই

"... জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ঘটনারই পটভূমি ও পূর্বাপর সম্পর্ক থাকে। কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই পূর্বাপর রহিত নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনেই থাকে একটি পশ্চাৎপট, একটি বিস্তৃত পটভূমি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেরও রয়েছে তেমনি অতীতের ঐতিহাসিক পটভূমি ও পশ্চাৎপট। বস্তুত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামগ্রিক জাগরণ আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদদের আত্মদানের ফলে ভাষা আন্দোলন অবিস্মরণীয় মহিমা অর্জন করলেও, আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে এই আন্দোলনের সূচনা বায়ান্নের অমর একুশের বহু বহুকাল আগে থেকেই। বস্তুত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিদ্বজ্জনমহলে এমনকি রাজনৈতিক মহলেও আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখির সূত্রপাত ব্রিটিশ পরাধীনতার যুগে এবং বিশ শতকের বিশের দশকে। ১৯১৮ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষাকে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবি জানান। ১৯২১ সালে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষাকে বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন। সেই সূত্র ধরেই, দৈনিক আজাদ ১৯৩৭ সালে 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায় ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৭ তারিখ।

পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিগত শতকের চল্লিশের দশকেই অর্থাৎ সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিতব্য 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। সেকালের বহু পত্রপত্রিকায়, বিশেষত দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক মিল্লাত, মাসিক সওগাত, মাসিক মোহাম্মদীতে অনেকের রচনায়ই সেই দাবি বিধৃত।

---

[১২] আবদুল হক/ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব ॥ [মুক্তধারা - ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬। পৃ. ভূমিকা, ১০-১৫/৫১-৫৭]

... তবে একথা সত্য যে, ১৯৪৮ সালের আগে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তান-এর রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কলমীযুদ্ধে এবং আন্দোলনের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে এবং সংগ্রামে তা রূপ লাভ করেনি। বস্তুত ১৯৪৮ সালেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অতীতের ধারাক্রম হিসাবে ব্যাপকতা লাভ করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপ নেয়। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই নবপর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার এবং 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবি উত্থাপিত হয়। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী সংস্থা পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকা এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত এই পুস্তিকায় ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবি জানিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তবে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে পাকিস্তান গণপরিষদে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পেশ এবং তা নাকচ হওয়ার ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার প্রখ্যাত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ যিনি একাত্তরের শহীদ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

... শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য ও দাবির মর্মার্থ হলো এই যে, পাকিস্তানের জনসংখ্যার মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা দিলে চলবে না, বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য ও দাবির সপক্ষে অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের সপক্ষে গণপরিষদের কোন মুসলিম লীগ সদস্যই সমর্থন উচ্চারণ করেননি এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের প্রবল বিরোধিতার মুখে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব গণপরিষদে নাকচ হয়ে যায়।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের সংহতির নামে এমন অদ্ভুত বক্তব্যও রাখেন যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে উপমহাদেশের উর্দু ভাষাভাষী (Hundred Million) দশ কোটি মুসলমানের দাবির প্রেক্ষিতে। তিনি বলেন, The Language of a hundred Million Muslims is Urdu অর্থাৎ উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু। প্রকারান্তরে তিনি উর্দুকে মুসলিম জাতির ভাষা হিসাবেও আখ্যায়িত করেন। পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে সংহতির জন্য যে উর্দুকেই লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অর্থাৎ যোগাযোগের ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা রাখা উচিত, সে কথাও তিনি বলেন। লিয়াকত আলীর ভাষায় '...Pakistan is a Muslim State and its must have as its Lingua Franca the Language of the Muslim nation... Urdu can be the only Language which can keep the people of East Bengal or Eastern Zone and the people of Western zone joined together. It is necessary for a nation to have one Language and that Language can only be Urdu and no other Language.' অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা তথা সাধারণ যোগাযোগের ভাষা হওয়া উচিত একমাত্র উর্দু। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে গণপরিষদের কোন সদস্যই এমনকি পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি সদস্যও উচ্চবাচ্য করেননি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, বাঙালি রাজনীতিবিদ ও গণপরিষদের যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাদের বেশিরভাগই বাঙালি হলেও মনোভাবের দিক থেকে ছিলেন উর্দুপ্রেমিক এবং অনেকের গৃহেই ছিল উর্দু ভাষার প্রচলন। তবে গণপরিষদের বাঙালি তথা পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরা নীরবতা পালন করলেও, লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার ঘটনা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে তথা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল প্রতিক্রিয়া ও আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ এবং সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করে।"[১৩]

---

[১৩] মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ/বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলন যুগে যুগে।। [নওরোজ সাহিত্য সম্ভার - জানুয়ারি, ২০১৮। পৃ. ১৫১-১৫৪]

তিন

"... সকলেই জানেন, দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার মত লোক খুব কমই ছিল। শুধু তাই নয়, তখন অনেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উর্দুরই সমর্থক ছিলেন। তাহার কারণও ছিল। অখণ্ড ভারতে বর্ণহিন্দুরা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মারফত হিন্দীকে যেমন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নেওয়ার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চালাইয়াছিলেন–তেমনি মুসলমানরাও হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান লাভের সাথে সাথে বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার কথা আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকি। এই বিষয় আমি প্রথম আলাপ করি আমার বন্ধু অধ্যাপক এ. কে. এম. আহসান সাহেবের সাথে (পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশনের মেম্বার)। আমি ও তিনি তখন সেই বিখ্যাত ১৯নং আজিমপুরে এক বাসায় থাকিতাম। ইহার পর আলোচনা করি সলিমুল্লা হলের তখনকার ছাত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতা) ও শামসুল আলমের (বর্তমানে বিশিষ্ট কর্মচারী) সাথে। তাঁহারা সকলেই এ ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করেন। ইহাদের মধ্যে নজরুল ইসলাম সাহেব ও শামসুল আলম সাহেবকে নিয়া আমি কয়েকদিনের মধ্যে ১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বরে 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' নামক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করি। এই মজলিসে পরে আজিজ আহমদ (মরহুম), অধ্যাপক নুরুল হক ভুঞা, সানাউল্লাহ নুরী প্রমুখ যোগ দেন।

এই তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই আমি এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করি। ইহার পর ১৫ই সেপ্টেম্বরে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামক বইটি–আমার চেষ্টায় ও সম্পাদনায় তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক বলিয়াদী প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়।

এই বই-এর লেখক ছিলাম আমরা তিনজন–অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ও আমি নিজে। প্রবন্ধ গুলিতে নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা হয়–বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। বইটির মুখবন্ধে আমার যে প্রস্তাবটি সন্নিবেশিত হয়, তাহার হুবহু নকল নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রস্তাব:

১. বাংলা ভাষাই হবে–(বর্তমানে পূর্ব বাংলা)
   (ক) পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।
   (খ) পূর্ব-পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।
   (গ) পূর্ব-পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি–বাংলা ও উর্দু।

৩. (ক) বাংলাই হবে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা একশজনই এ-ভাষা শিক্ষা করবেন।

   (খ) পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃ-প্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হবেন শুধু তারাই ও-ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

   (গ) ইংরেজি হবে পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যারা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তারাই শুধু ইংরেজি শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানে হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক এই নীতি হিসাবে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে (স্থানীয় ভাষার দাবি না উঠলে) উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজি তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা
বাংলা — না উর্দু?

তমদ্দুন মজলিশ
প্রচার বিভাগ

- আমাদের প্রস্তাব
  —(মজলিসের পক্ষ হইতে লিখিত)
- রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা
  —অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন
- বাংলাই আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে
  —আবুল মনসুর আহমদ

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত
'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাঃ বাংলা - না উর্দু?' পুস্তিকা।

৪. শাসনকাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বছরের জন্য ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনকাজ চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার করতে হবে। দেশের শক্তির যাতে অপচয় না হয় এবং যে ভাষায় দেশের জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে, শিখতে ও বলতে পারে সে ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা। এই অকাট্য যুক্তিই উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রধান ভিত্তি।

আর না হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যেমন জনগণের মত না নিয়ে বা তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না রেখে ইংরেজিকে জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল–শুধু উর্দু কিংবা বাংলাকে সমস্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে ঠিক সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে। অথচ এই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক প্রচেষ্টাই আজ কোন কোন মহলে দেখা দিয়েছে। ইহা সত্যিই বড় লজ্জাকর ও দুর্বল মনের অভিব্যক্তি। একে সর্ব প্রকারে বাধা দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এরই সূচনা হিসাবে আমরা কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রবন্ধ প্রকাশ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

'প্রত্যেক স্কুলে, কলেজে এবং প্রত্যেক শহরে সভা করে অপর ভাষাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে কায়েদে আজম ও অন্যান্য নেতার নিকট পাঠাতে হবে। গণ-পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের নিকট ডেপুটেশন গিয়ে তারা যেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে মত দিয়ে বাঙালীর আত্মহত্যার পথ সুগম না করেন তা স্পষ্ট করে বুঝাতে হবে। কায়েদে আজম জিন্না প্রত্যেক প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন কি লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের নিজ নিজ প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।'

বলাবাহুল্য–এই পুস্তকটি কিনিবার মত ৫ জন লোকও প্রথমে পাওয়া যায় নাই। আমি মজলিসের কয়েকজনকে নিয়া বইটি লইয়া বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, কিন্তু ২/১টি ছাড়া প্রায় জায়গাতেই নিরাশ হইয়াছি। সবেমাত্র পাকিস্তান আন্দোলন সফল হইয়াছে, এই সময়ে একাধিক ভাষার প্রশ্ন তোলা যে কত 'ক্ষতিকর' আর বিশেষ করিয়া ২টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়া যে কত 'অবাস্তব' প্রস্তাব তাহাই সেদিন সকলে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র 'মুসলিম হল' ও 'ফজলুল হক হলেও' আমি বৈঠক করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। শুধু তাই নয়–আমরা রুমে রুমে গিয়া ব্যক্তিগত আলোচনাও চালাইয়াছি, কিন্তু ২/১জন ছাড়া প্রায় ছাত্রই ইহার প্রতি বিরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন। উর্দুই যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত–আর তাহা লইয়া যে তখন মাথা ঘামানো উচিত নয়, তাহাই তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন।

অতঃপর আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক ও কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া কিছুটা সাফল্য অর্জন করি। এই সময়ে দেশের নামকরা ব্যক্তিদের দস্তখত লইয়া একটি মেমোরেণ্ডাম তৈয়ার হয়; আর আমরা অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বহু কষ্টে এই দস্তখত সংগ্রহ করি। মেমোরেণ্ডামটি গভর্ণমেন্টের কাছে পেশ করা হয়–আর তাহার কপি কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। তখনকার স্থানীয় পত্রিকাগুলি ইহাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নাই। এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল কলিকাতার 'ইত্তেহাদ' (জনাব আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত) ও মরহুম আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন বিখ্যাত সমাজকর্মীর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ইনসাফ'। তখনো 'সৈনিক' বাহির হয় নাই। রেল কর্মচারী লীগের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর সহায়তায় আমি উহা ১৯৪৮ সনে প্রতিষ্ঠা করি। (ইহাদের মধ্যে জনাব মাহবুবুল হক, এম.এস. হক ও আবদুল হাই-এর নাম উল্লেখযোগ্য)।

একটি কথা মনে রাখার মত যে, যাঁহারা দস্তখত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সরকারি কর্মচারী। এমন কি পুলিশ বিভাগের আই-জি., ডি-আই-জিও (জনাব আবুল হাসনাত) ইহাতে দস্তখত করিয়া সমর্থন জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে কয়েকজন মন্ত্রীও গোপনে ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করিতে থাকেন।

যাহাতে ছাত্রদের মধ্যে এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য ফজলুল হক হলেও তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে আমি একটি মিটিং ডাকি। এই মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন তখনকার মন্ত্রী হাবিবুল্লা বাহার সাহেব, আর বক্তৃতা করেন কবি জসীম উদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রী।

মন্ত্রীদের মধ্যে এই প্রশ্ন লইয়া দুইটি দলের সৃষ্টি হয়–তদানিন্তন প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ও হামিদুল হক চৌধুরী সাহেবকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে ইহারা বাংলা ভাষার কথাই শুনিতে পারিতেন না; অন্যদিকে ছিলেন হাবীবুল্লা বাহার, আফজল সাহেব, আরো ২/১ জন। ইহারা বাংলাকে গোপনে সমর্থন করতেন–কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। ফজলুল হক হলের সভাতেই প্রথম আমার বার বার বিশেষ অনুরোধে তাহারা প্রকাশ্যে বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য স্থান দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাদের বক্তৃতা তখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আন্দোলন যখন দানা বাধিয়া উঠে তখন তাহারা অবশ্য সকলেই মুখ বন্ধ করিয়া ছিলেন। বলাবাহুল্য পরবর্তী যুগে সকলেই বাংলা ভাষাকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন।

আমাদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলন যে বিশেষ দানা বাঁধিয়াছিল তাহা বলা চলে না। কিন্তু সৌভাগ্য এই যে, এই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেব করাচীর প্রভাবে উর্দুর ওকালতী করিতে গিয়া বাংলা ভাষা ও আমাদের আন্দোলন সম্বন্ধে এমন কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্য করেন, যাহার জন্য বাংলাভাষীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তদুপরি বিভিন্ন সূত্র উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ইহাতে অনেকে আমাদের আন্দোলনকে আপন বলিয়া ভাবিতে শুরু করেন। এই সময় হইতেই ইউনিভার্সিটির নিকটে মজলিসের ভাঙ্গা অফিস ঘরটিতে (রশিদ বিল্ডিং-এ) লোকজন আসিতে আরম্ভ করে। আর এই অফিসেই মজলিস কর্মীদের এক বৈঠকে আমরা প্রথম 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করি। তখনকার মজলিস কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব নূরুল হক ভূঞা সাহেব সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর নির্বাচিত হন। তিনি এই সময় অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমাকেই কনভেনরের অনেক কাজ করিয়া যাইতে হইত।

সংগ্রাম পরিষদ গঠন করিয়া আমরা প্রথমেই ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে নাজিরাবাজার মওলা সাহেবের বাসায় সাক্ষাৎ করি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়। ফজলুর রহমান সাহেব আমাদের সঙ্গে অনেকটা অপমানজনক ব্যবহার করেন। ইহার পর সংগ্রাম পরিষদের নামে আমরা মেমোরেন্ডামটি পেশ করার জন্য কাজে নামিয়া যাই। কয়েক সপ্তাহের চেষ্টায় কয়েক হাজার সই সংগ্রহ হইয়া যায়, আর তাহা আমরা সরকারের নিকট পেশ করি। বিভিন্ন পত্রিকাতেও ইহা প্রকাশিত হয়।

এই পর্যন্ত মজলিসের পক্ষে আমরাই এককভাবে আন্দোলনটিকে আগাইয়া নিয়া যাইতেছিলাম। এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবার জন্য আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে যাই। কিন্তু লীগ, কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন (তখনকার বামপন্থী ছাত্র প্রতিষ্ঠান) ইহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই আমাদের নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। মুসলিম লীগ ইহাকে মোটেই আমল দেয় নাই, কংগ্রেস কর্মীরা ইহার নাম শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠেন। ঢাকা জজকোর্টের পিছনে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে বিরাট অফিস ছিল, তাহাতে একদিন কম্যুনিষ্ট পার্টির এক মিটিং ছিল। কমরেড মুজাফফর আহমদ এই বৈঠকে নেতৃত্ব করিতেছিলেন। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে আমি কয়েকজন কর্মীসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পার্টির তরফ হইতে আমাকে জানাইয়া দেন : এই আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু তাই নয়, তিনি মেমোরেন্ডামে দস্তখত করিতেও অস্বীকার করেন। ছাত্র ফেডারেশনও ইহাতে যোগদান করিতে অস্বীকার করে।

এই সময়ে লীগ রাজনীতিতে বিশেষ করিয়া ছাত্রলীগ রাজনীতিতে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বকে অস্বীকার করিয়া শামসুল হক, আজীজ আহমদ, নইমুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান, প্রমুখের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বলিয়া একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইহার কনভেনর ছিলেন জনাম নইমুদ্দিন সাহেব। এই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে একদল ছাত্র আমাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া সংগ্রাম পরিষদে যোগদান করেন। জনাব নইমুদ্দিন সাহেব (বর্তমানে এডভোকেট), জনাব আজিজ আহমদ সাহেব (মরহুম), জনাব কমরুদ্দিন সাহেব, অলি আহাদ সাহেব (তখন ছাত্র, বর্তমানে এন-ডি-এফের বিশিষ্ট নেতা) ও সলিমুল্লা হলের মজলিস কর্মী মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লা সাহেব আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে যথেষ্ট কাজ করেন। দুই-একজন ছাড়া বাকী সকলেই মজলিসের সদস্য হন।

এই সময়ে ফজলুর রহমান সাহেব ও অন্য কয়েকজন মন্ত্রীর বাংলা বিরোধী বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে। মনিঅর্ডার ফরমে ও টাকায় বাংলা ভাষা থাকিবে না বলিয়া এক খবর প্রকাশিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমি এক বিবৃতিতে উহার তীব্র প্রতিবাদ করি। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমরা ১৯৪৮ সনের জানুয়ারীর দোসরা সপ্তাহে ইউনিভার্সিটির সম্মুখের লনে এক মিটিং ডাকি। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় ফেব্রুয়ারীতে একটি প্রতিবাদ দিবস পালন করা হইবে।

বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই সময় টাকার দারুণ অভাব দেখা দেয়। দুই আনা চারি আনা করিয়া চাঁদা উঠানো হয়। সরকারি কর্মচারীরা, এমন কি কয়েকজন মন্ত্রীও সেখানে গোপনে কিছু চাঁদা দেন। (অবশ্য কয়েকজন মন্ত্রীর বাসায় গিয়া আমরা অপমানিতও হই)। যাই হোক, এই সামান্য অর্থে আমরা পোস্টার, ইশতেহার প্রভৃতি ছাপাই এবং বিভিন্ন জেলার সংগঠনের জন্য ছাত্র কর্মী পাঠাইয়া দেই।

কিন্তু এই সময়ে উপরতলার সরকারি কর্মচারীদের উপর চাপ আসিতে থাকে। আন্দোলন যতই আগাইয়া যাইতে থাকে, ইহারা ততই আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িতে থাকেন।

আন্দোলন এইভাবে দানা বাধিয়া গড়িয়া উঠার সাথে সাথে ইহাকে মূলেই পন্ড করিয়া দিয়া ইহার মধ্যদিয়া স্বার্থোদ্ধারের জন্য জোর প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। সরকারি এজেন্ট বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল এমন কয়েকজন লোক বড় বড় সংগ্রামী কথা বলিয়া সংগ্রাম পরিষদে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে থাকে–তাহারা নানা রকম অবান্তর কথা তুলিয়া ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

অন্যদিকে কয়েকজন এম.এল.এ. এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া মন্ত্রিত্ব পাইবার জন্য মাতিয়া উঠেন। ইহাদের অনুসারী বহু ছাত্রও এই কাজে নিযুক্ত হয়। ভাষা-আন্দোলনকে তলাইয়া দিয়া ইহাকে 'মন্ত্রিত্ব সঙ্কট আন্দোলনে' পরিণত করার জন্য ইহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যায়। বলা বাহুল্য, কিছুদিন আগেও ইহারা ভাষা আন্দোলনকে অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিত। এই সময়ে বড় বড় বক্তৃতা দিয়া মোহাম্মদ আলী সাহেব, তোফাজ্জল আলী সাহেব ও নছরুল্লা সাহেব প্রমুখ এম.এল.এ. বাংলা-ভক্ত হইয়া ছাত্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হইতে চেষ্টা করেন ও অন্যদিকে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে এই জনপ্রিয়তা দেখাইয়া ও আন্দোলনকে থামাইবার শক্তি রাখেন বুঝাইয়া মন্ত্রিত্ব পাইবার তদবির করিতে থাকেন।

তৃতীয় আর একদল এই আন্দোলনকে সেবোটাজ করার চেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য ইহারা কমবেশী ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য ছিলেন। এতোদিন ইহারা কোন কাজেই আগাইয়া আসেন নাই। অথচ আন্দোলন যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন ইহারা গোপনে পাকিস্তান-বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কয়েকটি হ্যাণ্ডবিল ও পোস্টার দিয়া জনগণকে আন্দোলন-বিরোধী করিয়া তোলে। জনসাধারণ তখন সন্দেহ করিতে শুরু করে যে, এ আন্দোলন নিশ্চয়ই ভারতের প্ররোচিত। এমনও হইয়াছে যে, কয়েকজন ছাত্র ফেডারেশন কর্মীকে উত্তরবঙ্গে প্রচারের জন্য যাতায়াত খরচ দিয়া পাঠানো হইয়াছিল; কিন্তু কর্মীরা ভাষা আন্দোলনের জন্য তো কোন কাজই করে নাই, বরং সেই টাকার কোন হিসাবও তারা দিতে পারে নাই।

এইভাবে সরকারি গুপ্তচররা, মন্ত্রিত্বলোভীরা আর তথাকথিত প্রগতিশীলরা একজোট বাঁধিয়া ভাষা-আন্দোলনকে সেবোটাজ করার বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার কাজে লাগিয়া যান–আর নানারূপ অবান্তর প্রচার করিয়া জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। অনেক এম.এল.এ. বড় বড় কথা বলিয়া নেতা বনিয়া যান–আর তারা আন্দোলনের সুযোগে রাষ্ট্রদূতের পদ বা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ইহারাই মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রকাশ্যভাবে বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই।

ইতিমধ্যে সংগ্রাম পরিষদে বিভিন্ন গ্রুপ এবং বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধি নিয়া ইহাকে আরও সমপ্রসারিত করা হয়। সত্য কথা বলিতে কি, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র ও কর্মীদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। তাহার সঙ্গে যোগ হয় সরকারি প্রচার। অতি প্রগতিশীলদের কয়েকটি গোপন পোস্টারকে ভিত্তি করিয়া নির্লজ্জভাবে সরকার প্রচার করিতে থাকে যে, ইহা রাষ্ট্রের শত্রুদের কাজ। ফলে, জনসাধারণ আরো ক্ষেপিয়া উঠে। এই সময়ে ইউনিভার্সিটির নিকটস্থ তমদ্দুন মজলিসের অফিসটি স্থানীয় লোকেরা লুট করে। প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অফিসটি উঠাইয়া দেয়। বলাবাহুল্য যে, এই মজলিস অফিসই ছিল সংগ্রাম পরিষদের তথা ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় অফিস।

ঢাকার জনসাধারণ ভাষা আন্দোলনের ফলে খুবই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। মজলিস কর্মীদের ও ছাত্রদের তখন শহরে প্রবেশ একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মজলিস কর্মী মোঃ সিদ্দিকুল্লা (সলিমুল্লা হলের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী) ছদ্মবেশে বলিয়াদী প্রেসে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইতে গিয়া কসাইটুলীতে বন্দী হন এবং তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার মুহূর্তে জনৈক দয়াশীল ব্যক্তির দ্বারা মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। আমার উপরও কয়েকবার হামলা হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এ. কে. এম. আহসান সাহেবকেও মারপিট করা হয়। এইভাবে ছাত্র ও কর্মীরা রমনাতে 'অবরুদ্ধ' হইয়া পড়ে।

এইদিকে উর্দু সমর্থক আন্দোলন গড়িয়া উঠে। স্বনামখ্যাত মওলানা দীন মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহল্লায় ও মফস্বলের বহুস্থানে উর্দুকে সমর্থন করিয়া বহু সভা হয়। ইহারা কয়েক লাখ দস্তখত যোগাড় করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কাছে এক মেমোরেন্ডাম পেশ করেন। পথে ঘাটে, ষ্টীমারে এই সই সংগ্রহের কাজ চলে। এই 'সই' সংগ্রহের পর কয়েকজন নামকরা লোক এরোপ্লেনে চড়িয়া করাচীতে তাহা পেশ করিয়া আসেন।

তখনকার ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' ও সিলেটের 'যুগভেরী' জঘন্যতম ভাবে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকে। মর্নিং নিউজ সম্পাদকীয়তেও চিঠিপত্র বিভাগে মজলিসকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করে। 'যুগভেরী' একদিন এমনও লিখে যে, তমদ্দুন মজলিস একটি ভয়ঙ্কর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। ভাষা আন্দোলনে ইহা ঢাকাতে সমান্তরাল গভর্ণমেন্ট (parallel government) স্থাপন করিয়া ট্যাক্স আদায় করিতেছে। অপরদিকে কলিকাতার 'ইত্তেহাদ', ঢাকার সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ও 'ইনসাফ' ভাষা আন্দোলনকে জোর সমর্থন জানাইয়া বিরাটভাবে সাহায্য করিতে থাকে।

ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশও তখন উর্দু সমর্থক আন্দোলনে যোগ দেয়। রায় সাহেব বাজার হইতে এইরূপ এক ছাত্র মিছিল বাহির করিয়া ঢাকা কলেজে আনা হয়। আন্দোলনের সময় ফজলুল হক হল হইতেও ছাত্রনেতা শামসুল হুদা সাহেবের নেতৃত্বে বাংলা বিরোধী এক ছাত্র মিছিল বাহির করা হয়। এক সময় ঢাকার নবাব সাহেব ফুলবাড়ীতে (ঢাকা স্টেশনে) আমাদের এক মিছিলে লোক লেলাইয়া দিয়া লাঠিপেটা করান। ইহাতে বিখ্যাত সমাজকর্মী নাজির আহমদ ও আমরা অনেকে আহত হই।

১৯৪৮ সনের প্রথম দিক। এত বিপত্তি সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতে থাকে। ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য রেল-শ্রমিকের সঙ্গে ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমিতির সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করি। নির্দিষ্ট দিনে ১১ই মার্চ ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে মিটিং হয়–মিটিং-এর পর মিছিল বাহির হয়। মিছিলকে হাইকোর্ট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে আগাইয়া নেওয়া হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রিত্বলোভীদের সমর্থকেরা অন্যান্য সেবোটিয়ারদের সঙ্গে মিলিয়া কতকগুলি অশোভন কাজ করিয়া বসে।

এইভাবে সরকারি গুপ্তচররা, মন্ত্রিত্বলোভীরা আর তথাকথিত প্রগতিশীলরা একজোট বাঁধিয়া ভাষা-আন্দোলনকে সেবোটাজ করার বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার কাজে লাগিয়া যান–আর নানারূপ অবান্তর প্রচার করিয়া জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। অনেক এম.এল.এ. বড় বড় কথা বলিয়া নেতা বনিয়া যান–আর তারা আন্দোলনের সুযোগে রাষ্ট্রদূতের পদ বা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ইহারাই মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রকাশ্যভাবে বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই।

ইতিমধ্যে সংগ্রাম পরিষদে বিভিন্ন গ্রুপ এবং বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধি নিয়া ইহাকে আরও সমপ্রসারিত করা হয়। সত্য কথা বলিতে কি, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র ও কর্মীদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। তাহার সঙ্গে যোগ হয় সরকারি প্রচার। অতি প্রগতিশীলদের কয়েকটি গোপন পোস্টারকে ভিত্তি করিয়া নির্লজ্জভাবে সরকার প্রচার করিতে থাকে যে, ইহা রাষ্ট্রের শত্রুদের কাজ। ফলে, জনসাধারণ আরো ক্ষেপিয়া উঠে। এই সময়ে ইউনিভার্সিটির নিকটস্থ তমদ্দুন মজলিসের অফিসটি স্থানীয় লোকেরা লুট করে। প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অফিসটি উঠাইয়া দেয়। বলাবাহুল্য যে, এই মজলিস অফিসই ছিল সংগ্রাম পরিষদের তথা ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় অফিস।

ঢাকার জনসাধারণ ভাষা আন্দোলনের ফলে খুবই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। মজলিস কর্মীদের ও ছাত্রদের তখন শহরে প্রবেশ একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মজলিস কর্মী মোঃ সিদ্দিকুল্লা (সলিমুল্লা হলের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী) ছদ্মবেশে বলিয়াদী প্রেসে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইতে গিয়া কসাইটুলীতে বন্দী হন এবং তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার মুহূর্তে জনৈক দয়াশীল ব্যক্তির দ্বারা মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। আমার উপরও কয়েকবার হামলা হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এ. কে. এম. আহসান সাহেবকেও মারপিট করা হয়। এইভাবে ছাত্র ও কর্মীরা রমনাতে 'অবরুদ্ধ' হইয়া পড়ে।

এইদিকে উর্দু সমর্থক আন্দোলন গড়িয়া উঠে। স্বনামখ্যাত মওলানা দীন মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন মহল্লায় ও মফস্বলের বহুস্থানে উর্দুকে সমর্থন করিয়া বহু সভা হয়। ইহারা কয়েক লাখ দস্তখত যোগাড় করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কাছে এক মেমোরেন্ডাম পেশ করেন। পথে ঘাটে, ষ্টীমারে এই সই সংগ্রহের কাজ চলে। এই 'সই' সংগ্রহের পর কয়েকজন নামকরা লোক এরোপ্লেনে চড়িয়া করাচীতে তাহা পেশ করিয়া আসেন।

তখনকার ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' ও সিলেটের 'যুগভেরী' জঘন্যতম ভাবে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিখিতে থাকে। মর্নিং নিউজ সম্পাদকীয়তেও চিঠিপত্র বিভাগে মজলিসকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করে। 'যুগভেরী' একদিন এমনও লিখে যে, তমদ্দুন মজলিস একটি ভয়ঙ্কর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। ভাষা আন্দোলনে ইহা ঢাকাতে সমান্তরাল গভর্ণমেন্ট (parallel government) স্থাপন করিয়া ট্যাক্স আদায় করিতেছে। অপরদিকে কলিকাতার 'ইত্তেহাদ', ঢাকার সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ও 'ইনসাফ' ভাষা আন্দোলনকে জোর সমর্থন জানাইয়া বিরাটভাবে সাহায্য করিতে থাকে।

ছাত্র সমাজের এক বিরাট অংশও তখন উর্দু সমর্থক আন্দোলনে যোগ দেয়। রায় সাহেব বাজার হইতে এইরূপ এক ছাত্র মিছিল বাহির করিয়া ঢাকা কলেজে আনা হয়। আন্দোলনের সময় ফজলুল হক হল হইতেও ছাত্রনেতা শামসুল হুদা সাহেবের নেতৃত্বে বাংলা বিরোধী এক ছাত্র মিছিল বাহির করা হয়। এক সময় ঢাকার নবাব সাহেব ফুলবাড়ীতে (ঢাকা স্টেশনে) আমাদের এক মিছিলে লোক লেলাইয়া দিয়া লাঠিপেটা করান। ইহাতে বিখ্যাত সমাজকর্মী নাজির আহমদ ও আমরা অনেকে আহত হই।

১৯৪৮ সনের প্রথম দিক। এত বিপত্তি সত্ত্বেও আন্দোলন চলিতে থাকে। ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য রেল-শ্রমিকের সঙ্গে ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমিতির সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করি। নির্দিষ্ট দিনে ১১ই মার্চ ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে মিটিং হয়–মিটিং-এর পর মিছিল বাহির হয়। মিছিলকে হাইকোর্ট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে আগাইয়া নেওয়া হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রিত্বলোভীদের সমর্থকেরা অন্যান্য সেবোটিয়ারদের সঙ্গে মিলিয়া কতকগুলি অশোভন কাজ করিয়া বসে।

বহুঘণ্টা ধরিয়া সেক্রেটারিয়েট ঘিরিয়া রাখা হয়। জনৈক মন্ত্রীকে সেক্রেটারিয়েট হইতে বাহির করা হয় এবং তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে না পারিলে পদত্যাগ করিবেন বলিয়া লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন ও আগাম পদত্যাগপত্র লিখিয়া দেন। সেই পদত্যাগপত্র আমার কাছে দেওয়া হয়। আমি নিজে আগাইয়া গিয়া সেক্রেটারিয়েটের সামনের উঠান হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করি।

মন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ সাহেবের বাগান নষ্ট করা হয়। আর একজন মন্ত্রীর দাড়ি ধরিয়া অপমান করা হয়, সেক্রেটারিয়েটের জনৈক নিরীহ পুলিশকে আধমরা করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাহারা ছাত্রদের মারার জন্য সলিমুল্লা হল ও ফজলুল হক হল আক্রমণ করিবে বলিয়া খবর আসিতে থাকে। ছাত্রদের নিয়া আমরা সারারাত গেট বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া পাহারা দিতে থাকি। এক বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যে কয়েকদিন সকলকে সময় কাটাইতে হয়।

ইতিমধ্যে এই খবর শহরে ছড়াইয়া পড়ে। এক খবর আসে যে, কয়েকজন লুঙ্গিপরা শহরের গুণ্ডা সেক্রেটারিয়েটে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তখন তাদের আক্রমণের ভয়ে ছাত্রেরা সেক্রেটারিয়েট ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই সময়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়।

পরদিন আবার মিছিল হয়। সেক্রেটারিয়েটের নিকট পুলিশ বাধা দেয়। জনতা-পুলিশে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে, লাঠিচার্জ করে ও শত শত কর্মীকে গ্রেফতার করে। অনেককে জেলে পুরা হয় আর অনেককে বাসে করিয়া তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জে লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ঢাকায় আন্দোলন বিরাট ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠে। এইদিকে খবর আসে আহসান মঞ্জিলে (নবাব বাড়ীতে) নবাব সাহেবের নেতৃত্বে বৈঠক হইয়া গিয়াছে, এবার ঢাকার লোকেরা ছাত্রদের শায়েস্তা করার জন্য আমাদের বাসস্থান ও হলগুলি আক্রমণ করিয়া বসিবে।

এই সময় সেক্রেটারিয়েটে ধর্মঘট করানোর চেষ্টা করা হয়। তাহা আংশিক সফল হয়। দ্বিতীয়দিন ভোরের বেলা ঢাকাগামী ২/৩টি ট্রেন ধর্মঘটের ছলে বন্ধ থাকে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমিতি ও রেল কর্মচারী লীগের সাথে বহুদিন ধরিয়া আমাকে গোপনে কাজ করিতে হয়।

মফস্বলের নোয়াখালী ও যশোহরে প্রধানতঃ মজলিসের প্রচেষ্টায় হরতাল ও মিছিল সফলভাবে সমাধা হয়। রাজশাহীতে ছাত্রেরা দুই দলে বিভক্ত হয়। দলাদলিকে ভিত্তি করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ বাংলাভাষা সমর্থকদের উপর দারুণ নির্যাতন চালায়। অনেকে গ্রেফতার হয়। দুইদল ছাত্রের মধ্যে মারামারি হয়। ইহাতে অনেকে আহতও হয়।

চট্টগ্রামে আমরা যে প্রতিনিধিদল পাঠাইয়াছিলাম তাহারা কোন কাজ করারই সুযোগ পায় নাই। অধিকন্তু কয়েকজন মজলিস-কর্মী লালদীঘির পাড়ে ও মেডিকেল স্কুলে সভা ও মিছিল করিতে গিয়া বাংলা-বিরোধীদের হাতে দারুণভাবে মার খায়।

সিলেটে গোবিন্দ পার্কে তখনকার তমদ্দুন মজলিস এক মিটিং ডাকে। মিটিং-এর সময় স্থানীয় লোকেরা হামলা করিয়া মিটিং-এর উদ্যোক্তাদের দারুণ ভাবে প্রহার করে এবং মাইকটি ভাঙ্গিয়া ফেলে।

অন্যান্য স্থানেও আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা কোথাও জন সাধারণের তেমন সক্রিয় সমর্থন পায় নাই। কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যেই বিশেষ করিয়া ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করি এবং আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ি।

ইতিমধ্যে খবর আসে যে, কায়েদে আজম ঢাকায় আসিবেন। আরো শোনা যায় যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবকে গণ্ডগোল মিটমাট করার নির্দেশ দিয়াছেন।

গভর্নমেন্ট ভাষা আন্দোলনের দাবি মানিয়া লইতে রাজী–এই মর্মে আলোচনা করার জন্য নাজিমুদ্দিন সাহেব আমার কাছে কয়েকটি চিঠি লিখেন। এই চিঠি সংগ্রাম পরিষদের কাছে আমি পেশ করি। সংগ্রাম পরিষদ প্রথমে ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে দাবি মানিয়া লওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আমি আলোচনা করিতে সম্মত হই।

নাজিমুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের (সংগ্রাম পরিষদের) দুইটি বৈঠক হয়। আমরা নীচের শর্তগুলি নাজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে পেশ করি।

১. অবিলম্বে বাংলাকে পূর্ববঙ্গের (তখন পূর্ববঙ্গ বলা হইত) সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

২. কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যাহাতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া নেন, সেজন্য পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের নিকট তাহা পাঠাইতে হইবে।

৩. ভাষা আন্দোলনের সময়ে যাঁহারা বন্দী হইয়াছেন তাহাদিগকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হইবে।

৪. ভাষা আন্দোলনের সময়ে 'ইত্তেহাদ', 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার' 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া লইতে হইবে।

৫. ভাষা আন্দোলনে জড়িত ছিল বলিয়া কোন সরকারি কর্মচারীকে কোন রকমের শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

৬. প্রেসনোট বাহির করিয়া সরকার ঘোষণা করিবেন যে, ভাষা আন্দোলন কোন মতেই রাষ্ট্রের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই।

৭. ভাষা আন্দোলন দমাইবার জন্য সরকার যে কার্যক্রম লইয়াছে তজ্জন্য প্রকাশ্যভাবে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে ক্ষমা চাহিতে হইবে।

বহু বাদ-প্রতিবাদের পর নাজিমুদ্দিন সাহেব ২, ৪, ৫ ও ৭ ছাড়া অন্য চারটি দাবি মানিয়া নেন। ২নং দাবি সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের এখতেয়ারের বিষয়–ইহা লইয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের কিছু করা সম্ভবপর নয়। ৪নং শর্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন, কয়েকটি পত্রিকা বন্ধ করা হইয়াছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লিখিয়াছে বলিয়া, ভাষা আন্দোলনের জন্য নয়। ৫নং শর্ত সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য ছিল–সরকারি কাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়, না হলে রাষ্ট্র চালনা সম্ভবপর নয়। ৭নং সম্বন্ধে তিনি বলেন–প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অবমাননাকর। তিনি সংগ্রাম পরিষদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিতে রাজী আছেন।

আমরা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে ঘোষণা করি–সমস্ত শর্ত মানিয়া না লইলে কিছুতেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইবে না। ইহাতে প্রথম বৈঠকের আলোচনা ব্যর্থ হয়। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আন্দোলন চালাইয়া লইবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি।

পুনরায় নাজিমুদ্দিন সাহেব সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আমাকে চিঠি লিখেন। দ্বিতীয় বৈঠকেও অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি চলে। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের সাতদফা শর্তে অনমনীয় থাকি। ফলে, নাজিমুদ্দিন সাহেবকেই সংগ্রাম পরিষদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই ৭ দফা শর্তকে কেন্দ্র করিয়া এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একদিকে গভর্ণমেন্টের পক্ষে নাজিমুদ্দিন সাহেব অন্যদিকে আমরা চুক্তিপত্রে দস্তখত করি। এই চুক্তির কথা ঘোষণা করার ভার আমার উপর পড়ে। মেডিকেল কলেজের পাশে বর্তমান শহীদ মিনারের পেছনে তখন বিরাট মাঠ ছিল। সেখানে বিরাট জনতার সামনে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে আমি এই চুক্তির কথা ঘোষণা করি। ইহাতে প্রায় সকলেই খুশী হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মন্ত্রিত্ব শিকারী ও তাদের অনুসারী ইহাতে মন্ত্রিত্ব লাভে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। পরে শুনি তারা নাকি আমাকে ও সংগ্রাম পরিষদকে

গালাগালিও করিয়াছিল। বলাবাহুল্য, সংগ্রাম পরিষদের শর্তগুলি এত তাড়াতাড়ি যে নাজিমুদ্দিন সাহেব মানিয়া লইবেন তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

যে কয়েকশত লোককে বন্দী করা হইয়াছিল, চুক্তির পর তাহাদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। ভারতের যে সমস্ত পত্রিকার উপর নিষধাজ্ঞা ছিল তাহাও উঠাইয়া লওয়া হয়। সরকারের পক্ষ হইতে ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে নাজিমুদ্দিন সাহেব তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিবৃতি দেন। আন্দোলনটি যে রাষ্ট্রদ্রোহীদের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই তাহাও তিনি বিবৃতিতে স্বীকার করেন। সরকারি কর্মচারীদের শাস্তির জন্য যে কর্মনীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা তিনি বাতিল করিয়া দেন। পরন্তু তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী (বাজেট) অধিবেশনেই বাংলাকে পূর্ববঙ্গের সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব এবং ইহাকে কেন্দ্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ গৃহীত হইবে।

চুক্তির শর্তাবলী বিভিন্ন পত্রিকায় বড় বড় হেডলাইনে প্রকাশিত হয়। প্রায় পত্রিকাই এই সাফল্যের জন্য সংগ্রাম পরিষদকে অভিনন্দন জানাইয়া সম্পাদকীয় লিখেন। আন্দোলনের অন্যতম সমর্থনকারী 'ইত্তেহাদ' তাহার প্রধান সম্পাদকীয়তে বলেন : বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাংলাভাষা-আন্দোলনকারিগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে সোনার হরফে লিখিত থাকিবে। ইত্তেহাদ বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে এই আন্দোলনে মজলিসের নেতৃবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

অতঃপর কায়েদে আজম ঢাকায় আগমন করেন। রেসকোর্স ময়দানে কয়েক লাখ লোকের সামনে বক্তৃতায় তিনি পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা এখানে জনসাধারণই ঠিক করিবে বলিয়া মন্তব্য করেন চুক্তি অনুসারেই; কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা যে উর্দু হইবে তাহা জোরের সহিত বলিয়া যান। রেসকোর্সের এই জনসমাবেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানাইয়া মজলিসের পক্ষে আমরা একটি ইশতেহার বিলি করি।

এই সময়ে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কায়েদে আজমের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকেও গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি দিতে থাকিলে কায়েদে আজমের সঙ্গে আমাদের বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হয় ও শেষে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সময়ে কার্জন হলের কনভোকেশনেও কায়েদে আজম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর সমর্থন করিলে সভাস্থলেই কয়েকজন প্রতিবাদ করেন।

ইহার পরই এসেম্বলির অধিবেশনে খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব সরকারের পক্ষ হইতে চুক্তির অন্যতম দাবি অনুযায়ী এক প্রস্তাব পেশ করেন। ইহাতে বাংলাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা, আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস সদস্যগণ সহ সকলে এ প্রস্তাব সমর্থন করার পর একমতে তাহা গৃহীত হয়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট-এর নিকট বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে প্রস্তাব পাশ করার কথা ছিল তাহা নাজিমুদ্দিন সাহেব উত্থাপনই করেন নাই। সংগ্রাম পরিষদ তাহার কাছে ইহার কৈফিয়ত দাবি করিলে নাজিমুদ্দিন সাহেব আমাদের বলেন–কায়েদে আজম, যাহাকে জাতির পিতা বলা যায়–তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে। অতএব তিনি যদি এ প্রস্তাব পাস করেন তাহা হইলে কায়েদে আজমের প্রতি অসম্মান দেখানো হইবে। সুতরাং চুক্তির এই ধারা পালনে তিনি অক্ষম। সংগ্রাম পরিষদ চুক্তি ভঙ্গের জন্য নাজিমুদ্দিন সাহেবকে দায়ী করেন।

ইহার পর সংগ্রাম পরিষদ ও মজলিস কেন্দ্রেও যাহাতে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায় তজ্জন্য আন্দোলন করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু এবার আন্দোলনে অনেকে আগাইয়া আসিতে রাজী হইল না। ইহার কারণ হইল–

১. কায়েদে আজমের আগমনের পর তাঁহার বক্তৃতায় ও ব্যক্তিত্বে ছাত্রদের অনেকে এবং জনসাধারণ আন্দোলনের বিরোধী হইয়া পড়ে।

২. অনেকে তখন মনে করিতে থাকে যে, আবার আন্দোলন করা মানে কায়েদে আজমকে অপমান করা।

৩. ছাত্রদের মাঝে নানা অপপ্রচার করা হয়। মন্ত্রিত্ব শিকারী, সরকারি গোয়েন্দা ও অতি প্রগতিশীল ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

৪. চুক্তি অনুযায়ী ১টি ছাড়া বাকী সব দফা পালিত হওয়ায় আন্দোলনের তেজ কমিয়া যায়।

'৪৮ সাল হইতে '৫২ সালের মধ্যে ভাষা লইয়া আর বিশেষ কোন আন্দোলন হয় নাই। '৪৮ সনে এসেম্বলিতে বাংলাকে এখানে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার স্বীকৃতি দেওয়ায় কর্মীরা অনেকটা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন। বছরের শেষে ১১ই মার্চে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ থাকে।

... একথা সত্য যে, ভাষা আন্দোলন চলিবার সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দু-একটি বেনামী হ্যান্ডবিল ছাপাইয়া সীমাবদ্ধ কয়েক স্থানে গোপনে বিলি করে। ইহাদের এ কাজকে নেতৃত্বের শামিল করার মত মিথ্যা ও বেওকুফী আর কিছুই হইতে পারে না।

অবশ্য কলিকাতার কম্যুনিস্ট মুখপত্র 'স্বাধীনতা' গর্ব করিয়া তখনকার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন সাহেবের মতই প্রকাশ করে যে, কম্যুনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের জন্ম ও নেতৃত্ব দিয়াছে। ইহা যে কতদূর মিথ্যা তাহা যাঁহারা বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহারা পূর্ণভাবে জানেন। নানা কারণে পূর্ব বাংলায় কমুনিষ্ট পার্টির কোন প্রভাব তখন বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। অথচ ইহার বাহবা লুটিবার জন্য যে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা একদিকে যেমন জঘন্য, অন্যদিকে তেমনি ইহা পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতামূলক। কারণ এই মিথ্যা প্রচার দ্বারা 'স্বাধীনতা' প্রকৃতপক্ষে নুরুল আমিন সরকারকেই সাহায্য করিয়াছিল। ইহা উদ্ধৃত করিয়া নূরুল আমিন সাহেব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের শত্রুরাই বাহির হইতে ভাষা আন্দোলন চালাইয়াছে। এই প্রচারে ভাষা আন্দোলনের যে বিরাট ক্ষতি হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা ভাষা আন্দোলনে আগাইয়া আসে না, আসিতে ভয় পায়–যাহারা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা করা হইলেও বাংলা ভাষার পক্ষে টু শব্দটি করে না, যাহারা ভারতে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে নাই, তাহাদের এভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনকে সেবোটাজ করার মধ্যে যে কত হীন মনোবৃত্তি লুক্কায়িত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়॥"

(সাক্ষাৎকার : অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবুল কাসেম)[১৪]

চার

[১৯৪৮ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে আসেন। এ সফরকালে ২৭শে নভেম্বর তারিখে লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারক লিপিটি প্রস্তুত করেন বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী এবং ছাত্র সভায় স্মারকলিপিটি পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর তৎকালীন জি. এস গোলাম আযম। স্মারকলিপিটি এ দেশবাসীর স্বাধিকার চেতনার এক ঐতিহাসিক দলিল। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে স্মারকলিপিটির অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হলো।]

পাকিস্তানের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানকে প্রদত্ত স্মারকলিপি

[১৪] একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ/সম্পা : গবেষণা ও সংকলন বিভাগ ॥ [বাংলা একাডেমী - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০, পৃ. ১-১৭/২৪]

জনাব,

আমাদের হৃদয় আজ আনন্দ আর আবেগে উদ্বেলিত। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই নবীন, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। এমনকি এই আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে থেকেও সেদিনের কথা আমরা আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মাত্র কয়েক মাস আগে যেদিনটিতে আমরা বরণ করে নেয়ার গৌরব অর্জন করেছিলাম আমাদের প্রিয় কায়েদ-ই-আযমকে। যদিও আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই; কিন্তু তার বাণী এবং কর্ম আমাদের ভবিষ্যত চলার পথে এক মূল্যবান ঐতিহ্য এবং দিশারী হিসেবে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। তার স্মৃতির প্রতি আমরা সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো যদি আমরা এই দেশকে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি।

জনাব,

আযাদীর এই উষালগ্নে এক মহান দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। আমরা জাতির জন্যে যে অমূল্য সম্পদ পেয়েছি সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে আপনাকে এ আশ্বাস দিতে পারি এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যত কল্যাণ আমাদের উপরই নির্ভরশীল। এখন থেকে দেশ গড়ার দায়িত্ব তাদের, যারা সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে এ দায়িত্ব পালন করবে। আমাদের চিন্তা-চেতনায় অবশ্য বিপ্লব ঘটাতে হবে, নতুন জীবনধারা অনুযায়ী আমাদের চিন্তা চেতনাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা বৃটিশরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবর্তন করেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের প্রাদেশিক সরকারের দুঃখজনক ব্যর্থতা এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সরকার প্রদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যে আমরা বাধ্য হচ্ছি এ ব্যাপারে আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে। বিভাগ পূর্বকালে মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যে অমুসলিম শিক্ষকের সংখ্যাধিক্য ছিল, তাদের অনেকে চলে যাওয়ার পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, এখনো তা পূরণ হয়নি। এটা যে শিক্ষার উপর একটা প্রচন্ড আঘাত তা স্বীকৃত সত্য। শিক্ষার বিভিন্ন কারিগরি শাখা যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা এবং কৃষি বিভাগে দক্ষ শিক্ষক এবং কারিগরি সরঞ্জামাদির তীব্র সংকট। এক্ষেত্রে কারিগরি যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ শিক্ষকের যে অভাব রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে, প্রয়োজনাবোধে বিদেশে থেকে এনেও এ অভাব পূরন করা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণ করে এসব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারী শিক্ষা, যার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। দেশ সেবার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাঙ্গনে আমাদের যে সব বোন ক্রমবর্ধমান হারে এগিয়ে আসছেন তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং অধিকতর সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে আরো সক্রিয় হতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন অপরিহার্য। এ সুযোগ ছাত্রীদের জন্যও যাতে সম্প্রসারিত হয়, আপনার কাছে আমাদের এই নিবেদন। দেশ বিভাগের পর ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা প্রকট হয়েছে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই আবাসিক সংকটের সম্মুখীন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এ সংকট নিরসনে হিমসিম খাচ্ছেন।

AN ADDRESS OF WEL-COME

To The Hon'ble Janab Liaquat Ali Khan, Prime Minister of Pakistan.

Sir,

It is with a heart, throbbing with joy and emotion that, we, the students of the University of Dacca, welcome you in our midst as the first Prime Minister of our new, free and sovereign State of Pakistan. Even in the midst of these joyful surroundings our thoughts naturally go back to the day when only a few months back we had the honour and privilege of welcoming the beloved Quaid-e-Azam in our midst. Though he is no more with us his message and his work are our most precious heritage which shall continue to guide and inspire us in future. The most fitting homage that we can pay to his memory is to build up our State in accordance with the Islamic ideals of equality, brother-hood and justice.

Sir, with the dawn of independence a great responsibility has devolved on us. We can assure you that, we, who have contributed our mite to the national cause, are quite alive to the fact that the future wellbeing and stability of the state rest on us. Hence the task of building up those, who will build up the state should be given the utmost importance. We must revolutionise our outlook and reconstruct our thought to shape ourselves in the new order of life. The present system of education, which was introduced by the Britishers to suit their requirements should be thoroughly reorganised in the light of the altered circumstances. The lamentable failure of our Provincial Government to give any lead in the matter till now and the present pitiable plight of primary, secondary and University education in our province have compelled us to draw your kind attention to the matter. The exodus of non-Muslim teachers who formed the bulk of the teaching staff in pre-partition period in the secondary and the University stages, coupled with the dirth of efficient substitutes, has been a serious blow. The technical branches of education, viz., the Engineering, the Medical and the Agricultural which should be given the utmost care are also badly suffering for want of efficient teachers and technical equipment. Steps should be taken to secure efficient teachers and technical equipment, if necessary, from abroad, and more students from East Pakistan should be sent overseas for higher education and training. Female education is another subject which is also not receiving its due attention. More facilities and encouragement should be given to our sisters who are now coming forward in increasing number to avail themselves of every opportunity of education and serving the country. We also urge on you sir, to introduce compulsory free military training in all the colleges and the Universities with facilities for our sisters too. The problem of accommodation is getting more and more acute since the partition. Both students and teachers are greatly suffering on this account and the authorities are also experiencing great difficulties in accommodating the growing number of students in different educational institutions. We therefore appeal to you to use your good offices to remedy the present deplorable state of affairs affecting the growth and future wellbeing of the nation.

Sir, the magnificent efforts that you are making to strengthen the defence of Pakistan has evoked the admiration of all. We however beg to impress upon you with all the emphasis at our command that to encourage our youth to join the armed forces we need Army, Naval and Air Academies in this province. The only cause for this rather slow response from our youth is not lack of enthusiasm or determination on their part but the absence of these facilities in this province. We pledge our whole-hearted support and can assure you that given proper facilities you shall have from amongst us the best in every branch of the armed forces.

Sir, the food problem is causing us a great concern. The price of essential commodities and cloth have gone beyond the purchasing power of the average citizen and perhaps the cost of living here in East Pakistan is the highest in the world except in China. Steps should be taken to increase our food production to make ourselves self-sufficient. This can only be made possible by abolishing the Permanent Settlement without compensation and thoroughly re-organising our land tenure system and by the introduction of co-operative farming on a scientific basis.

Let us tell you, Sir, that we greatly appreciate your determination to ruthlessly deal with corruption and blackmarketting. Here in East Pakistan the anti-corruption department was doing splendid work. But unfortunately the department has been amalgamated with another department and the work has alarmingly slowed down though the corruption here is still as rampant as ever. We hope you will kindly see that the work and efficiency of the department is not allowed to be hampered by interested individuals however big they may be.

Sir, there can not be any economic progress in the country unless it is industrialised. We hope, Sir, that, in any industrial planning of the country, East Pakistan would legitimately get a major share.

Sir, though the two parts of our state happen to be separated by nearly two thousand miles we are one with our brethren of West Pakistan in their joys and sorrows happiness and tribulations. Provincialism is a word unknown to us and quite foreign to our sentiment. We take this opportunity of conveying through you our best wishes and most sincere greetings to our brethren in West Pakistan and the youth in particular.

Sir, the policy of the Britishers to impart education through the medium of a foreign language accounts for the poor percentage of literacy amongst our people. The best way to impart education is through the medium of the mother tongue, and we are glad that our Provincial Government has already accepted this principle. The introduction of Bengali as the medium of instruction and as the official language has opened before us a great opportunity of educating our people and developing ourselves according to our own genius. We are happy to note that our Central Government, under your wise guidance, has given Bengali an honoured place. This is a step in the right direction which shall go a long way to further strengthen our cultural ties with our brethren in West Pakistan. Interchange of thoughts and ideas and mutual understanding are essential if we have to develop a homogeneous and healthy national outlook. We have accepted Urdu as our Lingua Franca but we also feel very strongly that Bengali, by virtue of its being the official language of the premier province and also the language of the 62% of the population of the state, should be given its rightful place as one of the state languages together with Urdu. Otherwise we in East Pakistan shall always be under a permanent handicap and disadvantage. Thus alone we shall have full scope of development and forge closer affinity with our brethren of the other part and march forward hand in hand.

Sir, you are aware of the pitiable plight of the people of East Bengal, and Muslims in particular, who were victims of the worst kind of political oppression and economic exploitation. We are confident, Sir, that our legitimate claim in our Armed Forces and the Central Services on the basis of population-percentage shall be given effect to immediately.

Sir, we appreciate the tremendous odds that you had to surmount and we are also alive to the difficulties that face us to-day. We would however take this opportunity of requesting you most earnestly to see that the framing of our constitution is not delayed any further. The last general elections were in fact a plebiscite on the issue of Pakistan and now that we need more able men and fresh blood to come in and shoulder responsibility, we beg to impress upon you the necessity of having an early general election on a wider basis.

Sir, we have been watching with increasing grief and concern the repressions to which our student friends, most of whom are tried Muslim League workers with admirable record of service and sacrifice, are being subjected. Many of us are being harassed and even put under detention without trial in our attempt to fight out corruption and injustice and bring them to the notice of the Government. The bogey of communism is raised to justify these injustices but we assure you most sincerely that, all other "isms" excepting Islamic message of peace, equality and social justice are quite foreign to our outlook.

We hope, Sir, and we are confident that the points we have raised shall receive your earnest attention and sympathetic consideration.

Sir, we are afraid that we have taxed you long enough but we could not help expressing our feelings. Sir, we have been frank to you even at the risk of being misunderstood only out of our sincere and intense love for the future wellbeing of the State. We are happy that the reins of administration of our State are in the able hands of one who enjoys the full confidence and love of all the Pakistanis. We have watched with admiration and regard your services and sacrifice to the cause of the nation. We pray to the Almighty for your sound health and long life to enable you to lead us through the critical times ahead. We thank you most cordially for the honour you have done to us in consenting to come and address us. PAKISTAN ZINDABAD.

DACCA
The 27th November, 1948.

We beg to subscribe ourselves,
The students of the University of Dacca.

২৭ শে নভেম্বর, ১৯৪৮ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান'র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকলিপি।

জাতির ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য এবং বর্তমান সংকট নিরসনকল্পে আপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

জনাব,
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার ব্যাপারে আপনি যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। আমাদের এই অংশের যুবকদের সশস্ত্র বাহিনীতে অধিক হারে যোগদানের জন্য আপনি যেন উৎসাহ প্রদান করেন সে নিবেদন রাখছি। এই প্রদেশে সেনাবাহিনী, নৌ এবং বিমান একাডেমী আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের যুবকদের মধ্যে উদ্যম এবং সংকল্পের যে ঘাটতি দেখা যায় এটাই একমাত্র কারণ নয় যে, তারা দেশ রক্ষার ডাকে সাড়া দেয় না বরং মূল কারণ হচ্ছে এই প্রদেশে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানেরই অভাব রয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক বিভাগে তাদেরকে উপযুক্ত সুযোগ দেয়া হলে যুবকরা চমৎকার ভূমিকা যে পালন করবে সে অঙ্গীকার ও আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

জনাব,
আমাদের খাদ্য সংকট তীব্র। কাপড়সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। একমাত্র চীন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জীবন নির্বাহ ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিনা খেসারতে বিলুপ্ত করতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমবায় কৃষি খামার গড়ে তুলে ভূমি সংস্কার করতে হবে।

চোরাকারবারী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার আপোসহীন সংগ্রামে আমরা মুগ্ধ। পূর্ব পাকিস্তানে দুর্নীতি দমন বিভাগ চমৎকারভাবে কাজ করছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই বিভাগকে অন্য একটি বিভাগের সাথে সংযুক্ত করায় দুর্নীতি এখানে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরা আশা করবো, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এদিকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে এ বিভাগ কোন ব্যক্তির স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার দক্ষতা ও সুনাম হারিয়ে না বসে, সেসব ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন।

দেশ শিল্পায়িত না হলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। আমরা আশা করি দেশের শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পূর্ব পাকিস্তান যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে সর্বাধিক প্রাধান্য পায়।

জনাব,
যদিও আমাদের দেশের এই দু'অংশের মধ্যে দু'হাজার মাইলের ব্যবধান, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের সুখ দুঃখের ক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন। প্রাদেশিকতা এমন একটি শব্দ যা আমাদের কাছে অপরিচিত এবং তা আমাদের চেতনার খেলাপ। আপনার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের কাছে বিশেষ করে যুবকদের কাছে আমাদের শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানাচ্ছি।

জনাব,
বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করেছে। একারণেই আমাদের জনগণের মধ্যে শিক্ষিতের হার নগণ্য। সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান। আমরা আনন্দিত যে আমাদের প্রাদেশিক সরকার এ নীতি মেনে নিয়েছেন। বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম এবং সরকারী ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করায় আমাদের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা আরো আনন্দিত যে, আপনার নেতৃত্বে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে একটি মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। এ পদক্ষেপ পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে নেবে।

একটি সুস্থ ও অভিন্ন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সাথে আমাদের ভাবের আদান প্রদান এবং পারস্পরিক সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন। উর্দুকে আমরা লিংগুয়া ফ্রাংকা হিসেবে গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমরা গভীরভাবে অনুভব করি যে, বাংলা ভাষা এই প্রদেশের সরকারী ভাষা হওয়ার ফলে এবং এই রাষ্ট্রের শতকরা ৬২ জন মানুষের ভাষা হওয়ার কারণেই উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যথার্থ স্থান দেয়া উচিত। অন্যথায় আমরা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানীরা সর্বদাই স্থায়ীভাবে অনগ্রসর এবং প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে থাকবো। একমাত্র এভাবেই আমরা দেশের অন্য অংশের ভাইদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে দেশ উন্নয়নের সুযোগ পাব এবং পরস্পর আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবো।

জনাব,

পূর্ব বাংলার জনসাধারণ বিশেষ করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক নির্যাতনের দুঃসহনীয় অবস্থা সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন।

সশস্ত্র বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে আমাদের বৈধ দাবী জনসংখ্যা হারের ভিত্তিতে অতিসত্বর কার্যকর হবে বলে আমরা আস্থাশীল।

জনাব,

যে দুরূহ বাধা বিপত্তি আপনি অতিক্রম করেছেন সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত এবং দেশের বর্তমান সংকট সম্পর্কেও আমরা ওয়াকেফহাল। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারটি বিলম্বিত না করার জন্য আমরা আপনার নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলো ছিল পাকিস্তান ইস্যুর ওপর গণভোট মাত্র। এখন প্রয়োজন অনুভব করছি যে, এই নবীন রাষ্ট্রের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার জন্য দক্ষ ব্যক্তি।

নতুন নেতৃত্বের এগিয়ে আসা দরকার। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী অতিসত্বর একটি সাধারণ নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দুঃখ এবং উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছি যে, অনেক ছাত্র বন্ধু যাদের অধিকাংশেই মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে আজ তারা আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান। এদের অনেকেই হয়রানীর শিকার। অনেনে দুর্নীতি, অবিচার-অনাচার জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টার জন্য বিনা বিচারে বন্দী জীবন যাপন করছে। তাদের উপর অবিচার করা হচ্ছে কম্যুনিজমের অভিযোগ তুলে। কিন্তু আমরা সততার সাথে এ আশ্বাস দিতে পারি যে, ইসলামের শান্তি, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শ ছাড়া আমাদের কাছে সকল প্রকার ইজম অগ্রহণযোগ্য।

জনাব,

আমরা এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, আমাদের উত্থাপিত বিষয়গুলো আপনার আন্তরিক দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সহানুভূতিশীল বিবেচনা লাভে সক্ষম হবে।

জনাব, আপনাকে এতক্ষণ ধরে বিরক্ত করার ব্যাপারে আমরা দুঃখিত কিন্তু তবুও আমাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। সে জন্যে তাতে আমাদেরকে ভুল বুঝার ঝুঁকি থাকা সত্বেও আমরা কেবল দেশের ভবিষ্যত উন্নতির স্বার্থেই আপনার কাছে খোলাখুলি সব বলছি। আমরা এ জন্যে আনন্দিত যে, দেশে প্রশাসনের লাগাম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত যার প্রতি পাকিস্তানবাসীর পূর্ণ আস্থা এবং ভালবাসা রয়েছে। আমরা প্রশংসা এবং শ্রদ্ধার সাথে জাতির জন্য আপনার ত্যাগ ও অবদান লক্ষ্য করেছি। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি, যাতে আপনি আগামী দিনে জাতির ক্রান্তিলগ্নে আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারেন। আমাদের মাঝে এসে এবং আমাদের সামনে বক্তৃতা করতে সম্মত হয়ে আপনি যে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সে জন্যে আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাকিস্তান-জিন্দাবাদ
ঢাকা
২৭শে নভেম্বর, ১৯৪৮ সাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
(দৈনিক সংগ্রাম, ভাষা দিবস সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮)[১৫]

---

[১৫] আসাদ বিন হাফিজ / ভাষা আন্দোলন ও ডান-বাম রাজনীতি ॥ [প্রীতি প্রকাশন - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ । পৃ: ৮২-৮৬]

তৃতীয় পর্ব

কায়েদ-এ-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ঢাকা আগমন ও রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক

এক

"... ২১শে মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকার নাগরিকেরা রেসকোর্সের ময়দানে কায়েদে আজমকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন। ৫-১৫ মিনিটে কায়েদে আজম উপস্থিত হওয়ার পর সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি নবাব হাবিবুল্লাহ একটি মানপত্র পাঠ করেন। এরপর কায়েদে আজমের বক্তৃতা শুরু হয়। প্রায় এক ঘন্টাকাল বক্তৃতার মধ্যে ভাষার প্রশ্ন এবং ভাষা অন্দোলন সম্পর্কে নানা বক্তব্য তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন।

ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং আন্দোলনকারীদের চরিত্র সম্পর্কে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন–

'... কিন্তু আমি একথা আপনাদের বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সীর অর্থ সাহায্যপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। আপনারা সাবধান হয়ে চলুন আমি তাই চাই; আমি চাই আপনারা সতর্ক থাকুন এবং আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। তারা বলছে যে পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলা সরকার সর্বতোভাবে আপনাদের ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়। মানুষের পক্ষে এর থেকে বড় মিথ্যা ভাষণ আর কিছু হতে পারে না। সোজাসুজিভাবে আমি একথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট এবং বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্থ হবেন। পূর্ব বাঙলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য।

... পাকিস্তান এবং বিশেষ করে আপনাদের প্রদেশ এখন পর্যন্ত যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন সে সম্পর্কে আবার আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে না পেরে, পরাজয়ের দ্বারা বাধাগ্রস্থ ও হতাশ হয়ে পাকিস্তানের শত্রুরা এখন পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রাদেশিকতার উস্কানী দানের মাধ্যমেই তাদের এই প্রচেষ্টাকে তারা অব্যাহত রেখেছে। যে পর্যন্ত না এই বিষকে আপনারা রাজনীতি থেকে বর্জন করছেন, সে পর্যন্ত আপনারা নিজেদেরকে একটা সত্যিকার জাতি হিসাবে গঠন করতে সক্ষম হবেন না। আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী, পাঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। ইউনিট হিসাবে সেগুলির অবশ্য একটা অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি : চৌদ্দশো বছর পূর্বে আমাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো আমরা কি তা ভুলে গেছি? আমার মতো আপনারা সকলেই এখানে বহিরাগত। বাংলার আদি অধিবাসী কারা? যারা এখন এদেশে বাস করছে তারা নয়? কাজেই আমরা বাঙালী বা সিন্ধী বা পাঠান বা পাঞ্জাবী একথা বলার প্রয়োজন কি? না, আসলে আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।



১৯ শে মার্চ, ১৯৪৮ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কায়েদ-এ-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র প্রথম এবং শেষ ঢাকা সফর।

... একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রীও একটি সদ্য প্রকাশিত বিবৃতিতে যথার্থভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সরকার এদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক অথবা তাদের এজেন্টদের যে কোনো চেষ্টাকে কঠিনভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি খুশী হয়েছি। বাংলা এই প্রদেশের সরকারি ভাষা হবে কিনা সেটা এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে যথাসময়ে এই প্রদেশের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

... আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদেরকে জানাতে চাই যে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে এ কথার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই, চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন আপনাদের দেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই এক সুত্রে গ্রথিত হয়ে কার্যনির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অতএব, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, এ প্রসঙ্গ পরে আসবে।

... আমি আবার আপনাদেরকে বলছি, রাষ্ট্রের দুষমনদের ফাঁদে পড়বেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনাদের মধ্যে ঘরোয়া শত্রুরা আছে এবং আমাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে তারা বাইরের থেকে অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত মুসলমান। কিন্তু তারা একটা মস্ত ভুল করছে। আমরা ভবিষ্যতে অন্তর্ঘাতকদেরকে আর কিছুতেই সহ্য করব না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতক ঘরোয়া শত্রুদেরকে সহ্য করবো না। এসব যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে আমি নিশ্চিত যে আপনাদের সরকার এবং পাকিস্তান সরকার এই বিষাক্ত শক্তিকে নির্দয়ভাবে দমন করার জন্য কঠিনতম ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

... আমাকে জানানো হয়েছে যে এই প্রদেশের কোনো কোনো অংশে অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব বর্তমান আছে। এই প্রদেশের এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কিছু উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি শুনেছি যে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা প্রশাসনকে বিব্রত করার উদ্দেশে ছাত্রসম্প্রদায়কে ব্যবহার করেছে।'

... ২৪শে মার্চ সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কায়েদে আজমের সম্মানে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেন। আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডক্টর মাহমুদ হাসানকে কায়েদে আজম বলেন যে সময়ের অভাবে লিখিত বক্তৃতা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই তিনি নিজের বক্তব্য ছাত্রদের সামনে মৌখিকভাবেই বলবেন।

কার্জন হলে আয়োজিত এই সমাবেশে শৃঙ্খলা, কর্তব্য, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা বাস্তব অসুবিধা ইত্যাদির উল্লেখ করার পর কায়েদে আজম জিন্নাহ ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে রাষ্ট্রশত্রুদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তার বক্তব্য আবার উপস্থিত করতে গিয়ে বলেন :

'... ইদানিং আপনাদের প্রদেশের উপর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। আমাদের শত্রুরা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে, পাকিস্তানকে দুর্বল করে এই প্রদেশকে পুনরায় ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে প্রাদেশিকতার উস্কানী দিতে নিযুক্ত হয়েছে। যারা এই খেলা শুরু করেছে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা তাদের চেষ্টা থেকে বিরত হবে না। এই রাষ্ট্রের মুসলমানদের সংহতিকে খর্ব করে জনগণকে আইন ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করার জন্য প্রত্যহ মিথ্যা প্রচারণার বন্যা বইছে। আমি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে

আপনাদের প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরও আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সাম্প্রতিক ভাষা বিতর্কের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য উপায়ের মতো একটা প্রাদেশিকতার বিষয় এই প্রদেশের মধ্যে সযত্নে ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা সূক্ষ উপায়। এটা কি আপনাদের কাছে বিসদৃশ মনে হয় না যে ভারতীয় প্রেসের এক অংশ যাদের কাছে পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত একটা অভিশাপের মতো, তারাই ভাষার বিতর্কের প্রশ্নে আপনাদের 'যথার্থ অধিকার' আদায়ের জন্য আজ উঠে পড়ে লেগে গেছে? এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে অতীতে যারা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথবা আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তারাই আজ আকস্মিকভাবে আপনাদের অধিকার রক্ষার নাম করে ভাষার প্রশ্নে আপনাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধতা করার জন্যে উস্কানী দিচ্ছে? এই সব পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি।

আমি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আবার বলছি। এই প্রদেশের সরকারি কাজের জন্য এই প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে। যথাসময়ে এবং এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে একটি ভাষা থাকবে। এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু যা এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, যা পাকিস্তানের এক থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং সর্বোপরি যার মধ্যে অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষার থেকে ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বাস্তবরূপ লাভ করেছে এবং যে ভাষা অন্যান্য ইসলামী দেশগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।

... ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে উর্দুকে যে বিতাড়িত করা হয়েছে এমনকি উর্দু বর্ণমালার সরকারি ব্যবহারও যে সেখানে বন্ধ করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন নয়। জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য যারা ভাষার বিতর্ককে ব্যবহার করছে এসব ঘটনা তাদেরও অত্যন্ত ভালোভাবে জানা আছে। আন্দোলনের কোনো যুক্তিই এক্ষেত্রে ছিলো না কিন্তু এটা স্বীকার করা তাদের মতলব হাসিলের পক্ষে সহায়ক হতো না। এই বিতর্ককে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। বস্তুতঃ এ কাজের জন্য তারা খোলাখুলিভাবেই অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা উদ্রেকের যথেষ্ট চেষ্টা করছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী করাচী থেকে ফিরে এসে ভাষা বিতর্কের উপর বিবৃতি মারফত এ প্রদেশের জনগণকে তাদের ইচ্ছানুসারে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহারের অধিকার দেওয়ার কথা বলার পর আন্দোলনের আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করলো। তারা এরপর বাংলাকে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালো এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হিসাবে উর্দুর স্বাভাবিক দাবি অনস্বীকার্য দেখে বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাকেই তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুললো। এ সম্পর্কে কোনো ভুল করা চলবে না। এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।

... রাষ্ট্রকে ধ্বংস এবং সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দুষমন ও কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরা যে কৌশল গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে সাবধান করার জন্যই আমি এ বিষয়ে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। আপনাদের মধ্যে যারা জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের এ জাতীয় লোকজন সম্পর্কে সাবধান থাকা প্রয়োজন। যাদেরকে এখনো কিছুদিন পড়াশোনা করতে হবে তাদের উচিত কোনো রাজনৈতিক পার্টি অথবা স্বার্থপর রাজনীতিকের দ্বারা নিজেদের ব্যবহৃত হতে না দেওয়া।

... প্রথমত: আমাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে সাবধান থাকুন। দ্বিতীয়ত: স্বার্থপর লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন কারণ তারা নিজেরা সাঁতার কাটার জন্য আপনাদেরকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। তৃতীয়ত: রাষ্ট্রের সত্যিকার নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ খাদেম, যারা সর্বতোভাবে জনগণকে সমর্থন করে এবং তাদের সেবা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে চিনতে শেখা দরকার। চতুর্থত: মুসলিম লীগ পার্টিকে শক্তিশালী করুন কারণ তা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থেকে এক মহৎ ও গৌরবময় পাকিস্তান গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। পঞ্চমত: মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেই পবিত্র আমানতের হেফাজতকারী হিসাবে পাকিস্তানকে গড়ে তোলা মুসলিম লীগেরই কর্তব্য। ষষ্ঠত: আমাদের সংগ্রামের সময় যারা অনেকে নিজেদের কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত নাড়েনি, এমনকি নানাভাবে আমাদের বিরুদ্ধতা করেছে এবং পদে পদে সবরকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছে এবং যাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের শত্রু শিবিরে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারা এখন এগিয়ে এসে নানা আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলি আওড়াতে পারে এবং আপনাদের সামনে নানাপ্রকার আদর্শ ও কর্মসূচী হাজির করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এখনো নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে এবং মনের মধ্যে কোনো সত্যিকার পরিবর্তন এসেছে কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো নোতুন নোতুন পার্টি গঠন না করে মুসলিম লীগকে সমর্থন এবং তাতে যোগদান করতে হবে॥"[১৬]

দুই

[National Consolidation / Speech of Quaid-e-Azam at a public meeting attended by over three lakhs of people at Dacca on March 21, 1948]

"... Now I ask you to get rid of this provincialism, because as long as you allow this poison to remain in the body politic of Pakistan, believe me, you will never be a strong nation, and you will never be able to achieve what I wish we could achieve. Please do not think that I do not appreciate the position. Very often it becomes a vicious circle. When you speak to a Bengali, he says: 'Yes you are right but the Punjabi is so arrogant'; when you speak to the Punjabi or non-Bengali, he says 'Yes, but these people do not want us here, they want to get us out'. Now this is a vicious circle, and I do not think anybody can solve this Chinese puzzle. The question is, who is going to be more sensible, more practical, more states man-like and will be rendering the greatest service to Pakistan? So make up your mind and from today put an end to this sectionalism.

About language, as I have already said, this is in order to create disruption amongst the Mussalmans. Your Prime Minister has rightly pointed this out in a recent statement and I am glad that his Government have decided to put down firmly any attempt to disturb the peace of this province by political saboteurs or their agents. Whether Bengali shall be the official language of this province is a matter for the elected representatives of the people of this province to decide. I have no doubt that this question shall be decided solely in accordance with the wishes of the inhabitants of this province at the appropriate time.

Let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to be touched or disturbed so far as your Bengali language is concerned. But ultimately it is for you, the people of this province, to decide what shall be the language of your province. But let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one State Language, no Nation can remain tied up solidly together and

[১৬] বদরুদ্দীন উমর/পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খন্ড) ॥ [আনন্দধারা প্রকাশন (কলিকাতা) - ১৯৭০। পৃ. ১০৭-১১৫]

function. Look at the history of other countries. Therefore, so far as the State Language is concerned, Pakistan's language shall be Urdu. But, as I have said, it will come in time."[১৭]

তিন

[Student's Role in Nation-Building / Speech of Quaid-e-Azam at the Dacca University Convocation on 24th March, 1948.]

"... Let me restate my views on the question of a State language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can chose any language they wish. This question will be decided solely in accordance with the wishes of the people of this province alone, as freely expressed through their accredited representatives at the appropriate time and after full and dispassionate consideration. There can however, be only one lingua franca, that is, the language for inter-communication between the various provinces of the State, and that language should be Urdu and cannot be any other. The State language, therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million Muslims of this sub-continent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan and above all, a language which, more than any other provincial language, embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that even the official use of the Urdu script has been disallowed. These facts are fully known to the people who are trying to exploit the language controversy in order to stir up trouble. There was no justification for agitation but it did not suit their purpose to admit this. Their sole object in exploiting this controversy is to create a split among the Muslims of this State as indeed they have made no secret of their efforts to incite hatred against non-Bengali Mussalmans. Realizing, however, that the statement that your Prime Minister made on the language controversy, on return from Karachi, left no room for agitation, in so far as it conceded the right of the people of this province to choose Bengali as their official language if they so wished, these persons changed their tactics. They started demanding that Bengali should be the State language of the Pakistan Centre and since they could not overlook the obvious claims of Urdu is the official language of a Muslim State; they proceeded to demand that both Bengali and Urdu should be the State languages of Pakistan. Make no mistake about it. There can be only one state language, if the component parts of this State are to march forward in unison, and that language, in my opinion, can only be Urdu. I have spoken at some length on this subject so as to warn you of the kind of tactics adopted by the enemies of Pakistan and certain opportunist politicians to try to disrupt this state or to discredit the Government. Those of you who are about to enter life, be on your guard against these people. Those of you, who have still to continue your studies for some time, do not allow yourselves to be exploited by any political party or self seeking politician. As I said the other day, our main occupation should be in fairness to yourselves, in fairness to your parents and indeed, in fairness to the State, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your State. Only thus, can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world."[১৮]

---

[১৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (প্রথম খণ্ড)/সম্পা : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮২ । পৃ. ৭৯-৮৫]

[১৮] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (প্রথম খন্ড)/সম্পা: হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮২ । পৃ. ৮৬-৮৯]

চার

"... রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দুর পক্ষে তার মতামত শোনার পর রেসকোর্সের জনসমুদ্রে প্রতিবাদের গুটিকয় বুদবুদের বেশি কিছু দেখা যায়নি। জনসভায় উপস্থিত কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যে অবশ্য মতের মিল পাওয়া যায় না। সাঈদ হায়দারের মতে, প্রতিবাদ উচ্চারণের বদলে ছাত্রসমাজের একাংশ সভাস্থল ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার পথে সাজানো তোরণে কিছু ভাঙচুর করে। অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া তার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে জিন্নাহ সাহেবের ভাষাবিষয়ক বক্তব্যের পর তাদের কিছু কর্মী ও ছাত্র 'নো নো' বলে চিৎকার করে ওঠে এবং সভায় হইচই শুরু হয়ে যায় (একুশের সংকলন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০)।

কিন্তু ওই জনসভায় উপস্থিত কমিউনিস্ট কর্মী সরদার ফজলুল করিম সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন। একুশের সংকলনে প্রকাশিত স্মৃতিচারণায় (১৯৮০) তিনি বলেন : 'জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার দিন আমি রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলাম।...জিন্নাহ সাহেব উর্দুতে ভাষণ দেন। বক্তৃতা করতে করতে এক জায়গায় তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আছে, তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর আছে, তোমাদের তারা বিভ্রান্ত করছে। আমি বলছি, ভাষার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতে উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহ সাহেবের ভাষণ শোনার পর ছাত্ররা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে হলে ফেরার পথে (সংবর্ধনার জন্য তৈরি) তোরণ তারা ভেঙে ফেলে। অনেকে বলেছেন, জিন্নাহ সাহেব রেসকোর্সে ভাষণ দানকালে ভাষার প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার প্রতিবাদ সেখানেই হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। আমি একজন সচেতন কর্মী হিসেবেই সেখানে গিয়েছিলাম...সেখানে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ করিনি।'

কিন্তু ২৪ মার্চ কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে জিন্নাহ সাহেব আবারও যখন উর্দু রাষ্ট্রভাষার পক্ষে কথা বলেন, তখন উপস্থিত ছাত্রদের একাংশ থেকে প্রতিবাদ উচ্চারণ নো নো নো সবাইকে চমকে দেয়। কার্জন হলে উপস্থিত সরদার ফজলুল করিমও একই কথা বলেছেন। কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেব ইংরেজিতে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রতিবাদ উচ্চারণের মুখে একটুক্ষণ চুপ থেকে যথারীতি তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন।

কার্জন হলে 'নো নো' উচ্চারণ পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ককে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ছাত্রসমাজে তার একাধিপত্যের অবসান ঘটতে চলেছে। ঢাকার রাজনৈতিক মহল তাদের কায়েদে আযমের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা মুখ বুজে হজম করেছিল, কোনো প্রতিবাদ করেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। জিন্নাহ সাহেবের অগণতান্ত্রিক ও বাংলাবিরোধী বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে হক সাহেব ২৩ মার্চ এক বিবৃতি দেন। দৈনিক আজাদ তির্যক শিরোনামে (হক ছাহেবের হুঙ্কার / কায়েদে আজমের প্রতি জঘন্য আক্রমণ) তা ছাপে।

সেদিন সন্ধ্যায় জিন্নাহ সাহেব সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করেন, কিন্তু তিনি তার অবস্থান থেকে একটুও সরে আসেননি। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, মহম্মদ তোয়াহা, শামসুল হক, অলি আহাদ প্রমুখ। এরপর তিনি ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন, কিন্তু অবস্থা আগের মতোই। পূর্ববঙ্গ সফরের শেষ পর্যায়ে বেতার বক্তৃতায় তিনি পূর্বোক্ত বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন॥"[১৯]

পাঁচ

"... পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকা ও চট্টগ্রামের কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদককে করাচীতে আমন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে আলোচনা

---

[১৯] আহমদ রফিক/ভাষা আন্দোলন ॥ [প্রথমা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ. ২৩-২৪]

করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। রাত্রে হোটেল মেট্রোপোলে নৈশ ভোজ-সভায় প্রধানমন্ত্রী ও বড়লাট আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং ভাষা-প্রশ্ন ছাড়া অনেক কিছুই আলাপ করলেন।

পরদিন নাজিমুদ্দীন সাহেবের বাসভবনে অবশ্য ভাষা-সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বাংলা ভাষা যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হবে, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়তা দান করেন।

করাচীতে গিয়ে আমি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং ডা: এলাহী বখশের বাড়ীর ঠিকানা জানবার চেষ্টা করলাম। কেউ তার ঠিকানা দিতে পারলো না। অবশেষে জিন্না মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ডা: এলাহী বখশের সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছিল। হোটেলে ফিরে একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে পাঠালাম তার গাড়ী নিয়ে আসবার জন্য। ডা: এলাহী বখশকেও ফোন করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, এক্ষুণি আসুন, আমি আপনার জন্য বাড়ীতে অপেক্ষা করছি। আমি বিকালে যাবো বলায় তিনি জানালেন যে, তার সঙ্গে যেন চা পান করি।

ডাঃ ইকবাল তার বিরাট একখানা গাড়ী নিয়ে হোটেলে এলেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে ডা: এলাহী বখশের বাড়ী হাজির হলাম। ডাক্তার সাহেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চায়ের টেবিলে বসে বেশীর ভাগ রাজনীতি আলোচনা চলল। ডাক্তার সাহেব একুশে ফেব্রুয়ারীর গুলি চালনার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পুলিসের নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালনার তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন। এক সময় তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন : পূর্ব-বাংলার ছাত্ররা কায়েদে আজমের প্রতি বিক্ষুব্ধ, কিন্তু কায়েদে আজম এ ব্যাপারে নির্দোষ। সব ব্যাপার আমি কায়েদে আজমের মুখে শুনেছি। তিনি বললেন, জিয়ারতে যাওয়ার আগে একদিন সিদ্দিক আলী খাঁ ও আমি কায়েদে আজমের শয্যার পাশে বসে আছি। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন : 'পূর্ব-বাংলার নেতাদের কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, এই প্রদেশের সকলেই উর্দু জানে। ফজলুর রহমান ও নাজিমুদ্দীন একমাত্র উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য জোর দেয়। ওরা আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। এই একটি ক্ষেত্রে আমি অপরের কথা শুনে ভুল করেছি।' ডাঃ এলাহী বখশ আরো বললেন যে, কায়েদে আজম লাহোর প্রস্তাব অনুসারে দুই স্বাধীন পাকিস্তানের পক্ষে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে তিনি শক্তিশালী কেন্দ্র অপেক্ষা শক্তিশালী দুইটি বন্ধু রাষ্ট্রের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গুরমানী, লিয়াকত আলী, নাজিমুদ্দীন প্রভৃতি তার কথায় বিশেষ কান দেননি। তবে কায়েদে আজম বেঁচে থাকলে তার ভুল তিনি নিশ্চয়ই সংশোধন করতেন॥"[২০]

ছয়

"... As regards his (Quaid-E-Azam's) Dacca speech, it was not an announcement but just expression of one's opinion. He might have been mislead by the then administration and the leaders of the Muslim League of East Bengal. Indeed, I was subsequently told by a reliable friend that Quaid on his return from Dacca actually rebuked the persons concerned for their misrepresentation to him that the majority of Bengalees not only wanted Urdu but themselves spoke and read Urdu at home. In the case of at least some of them, this might have been their genuine misreading the situation in view of the fact that there were innumerable Madrasas not only in cities and towns but also in mafassil of East Bengal where Urdu was not only taught and learnt, in practice, Urdu itself was their medium of instruction. This report of Quaid's subsequent reproof is further supported by the fact that after his Dacca speech Quaid never again spoke a word about state Language." (Quaid-E-Azam the Democrat / Observer - December 25, 1964)[21]

---

[২০] মোহাম্মদ মোদাব্বের/সাংবাদিকের রোজনামচা ॥ [বর্ণমিছিল - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। পৃ. ২৭৬-২৭৮]

[২১] Abul Mansur Ahmad/End of A Betrayal and Restoration of Lahore Resolution \ [Khoshroz Kitab Mahal - January, 1975| P. 237-238]

সাত

"... His first very visit to Dhaka, as the Governor-General of Pakistan in 1948, sparked so much heat, that it twisted, turned and twirled not only the face of Pakistan, but changed the whole gamut of India-Pakistan-Bangladesh history.

In addressing a mammoth public rally at the Dhaka Gymkhana Race Course (Now Surwardy Uddan), Jinnah made a fateful declaration: 'urdu shall be the only state language of Pakistan.'

It is true that Jinnah ought to have waited and assessed public opinion before he made that controversial pronouncement. His unilateral declaration on such a vital issue as state language of Pakistan, it would seem, was dictatorial in manifestation, albeit, one must also see the backdrop and history of Indian Muslims vis-à-vis Jinnah and the Muslim League.

Jinnah was the leader of Muslims of India, but he did never belong to them. He was never one of them. He took the other Muslim League leaders, not as colleagues, but as followers. He wouldn't mix with the Muslim mass, but meticulously kept a distance between himself and emaciated people whom he led. Jinnah accepted the brief of the Indian Muslims as a lawyer, hardly as a politician. Gandhi would travel in third-class railway compartment in order to be with people; Jinnah never below first class, in order to avoid his followers. Gandhi, with his loin-cloth, would identify himself as one of the mass, Jinnah would be impeccably dressed in western attire and would change his suits four times a day in order to feel fresh. Jinnah was a reluctant leader of his followers.

It was the Muslims of India who implored him to lead them; he only obliged. Jinnah would use his own judgment; any suggestion by his Muslim League working committee colleagues was only concomitant in nature. His colleagues would remain gratified with their status; never question his prudence and authority.

The Muslim leaders who would transform themselves later into critics of Jinnah, were the persons responsible, for good or bad, for preparing him into a 'supernova'- high enough not to be within their reach. Besides Jinnah's own rigid personality, it was the behavior of the people around him, that made him almost omnipotent and nearly all pervading.

As we have found earlier, Jinnah did never visit Dhaka before 1948. Before he came, the question as to what would be Pakistan's State language, was being seriously mooted everywhere. It should be relevant to remember that Urdu was not spoken any province of Pakistan. Sind, N.W.F.P., Punjab, Baluchistan and East Pakistan, had all their own different languages distinct from Urdu. So, how the question of Urdu as the state language arose in the first place? All speeches Jinnah ever made throughout his political career in English including the speech at Dhaka Race Course. If English was the common language throughout India, Urdu/Hindi, however, had always remained to be a common, loose lingua franca for the northern Indian people. Jinnah was led led to believe by his advisors that Urdu was a language, commonly understood by all the people of Pakistan, including Bengolees of East Pakistan. Jinnah's advisors from Bengal were, most important of all, non-bengolees and Urdu speaking. Having no knowledge about Bengal whatsoever, Jinnah had to depend entirely on those advisors. Those advisors like Nazimuddin, Suhrwardy, Md. Ali Bogra and, most importantly, tycoon Ispahani, Jinah's financier from Bengal, were all Urdu speaking and unequivocally advocated and advised Jinnah to make Urdu the state language of Pakistan. The rumor that Sher-E-Bangla A K Fazlul Haque also opted for Urdu, doesn't warrant credibility, since after moving the 1940 Lahore Resolution, he drifted away

Jinnah's inner circle. The basis of such story rested on the fact that A K Fazlul Haque's second wife was a Urdu-speaking lady and Fazlul Haque's house-hold language was Urdu.

Beside such important and sole advisors from Bengal, Jinnah was also in possession of yet another important document. In 1946, the elite Muslim leaders of Dhaka, led by late Hakim Ertezaur-Rahman, son of late Hakim Habibur Rahman, launched a massive, vigorous campaign, and after procuring hundreds of thousands of signatures of the Muslims of Dhaka and the adjacent areas, submitted them to Jinnah. The signatories in the papers implored that All-India Radio authority in delhi must relay Urdu news bulletin to All-India Radio Dhaka- along with English and Bengolee bulletins. Such resolutions were sent to Jinnah, besides copy to All-India Muslim League Convention to be held in October 1946 at Delhi M.L. Convention, as was demanded by the Bengolee Muslims, because he himself was not sure, about the efficacy of making Urdu as the state language of futuristic-Pakistan. He could hardly think in terms of any other language other than English.

Although Jinnah had announced in 1948 about Urdu being Pakistan's state language, he did never press the matter or implemented his declaration. This was probably because of the protestations he encountered at Dhaka. Had he decided to put deaf ears to East Pakistan's demonstrations about state language, the only thing he required to do was to make a telephone call to Prime Minister Liakat Ali Khan and order him to place and pass the legislations in the Constituent Assembly making Urdu Pakistan's State Language. There was absolutely nothing in his way to deter him from doing so, had he wanted it to be done. But he refrained from doing it, which might go in his favour for a change, as inaction democratic in nature.

... We had been talking about Mr. Jinnah. A little digression took us little away. We had seen Jinnah's unilateral declaration on language issue, the beginning of the end of Pakistan in this part of the globe.

An impression generally carried and spewed constantly these days that the state language movement meant to make Bangla as the only state language of Pakistan. This is far from the actual state of the affairs. Recalling, I can categorically jot down that the first series of posters I wrote carried chants like this:

'Urdu Bangla Bhai Bhai
Rashtra Bhasha Dui-e Chai'

which meant that Urdu and Bangla languages were brotherly and we wanted both as state languages.

If the minority West Pakistani wanted to impose their will, the East Pakistanis behaved like a responsible majority, in not trying to impose their will on the west Pakistanis merely because they were minorities. This could be clearly located, even at much later a time, in 1954, when the twenty-one-points Joint-Front election charter was given, the very first point of the charter was that the Bangla should be made one of the state languages of Pakistan. In fact it was basically a fight of rights between East and West Pakistanis and , when language issue appeared as God-sent, it was grabbed with all ferocity which proved to impregnant with all kinds of history making chemistry.

Starting from 1948 and moving through 1952, had the language issue not become that fueled and fattened a history, as has been stated earlier, different maps could have been drawn in Indo-Pak subcontinent. Like Kashmir issue, language movement inflicted an equal,

if not more, impact on the sub-continents's history. And, in all this as if umbilical, India was a necessary party and had definite roles to play. To an ardent observer, what language movement would offer, was not only the craving for Bangla as the state language of Pakistan (Bangla, till 1953 was the tongue of 66% of the populace), but a movement for democracy and fundamental rights. Language was an issue; just as there could be any other issues for a democratic movement. Had Jinnah said, instead of language, that no one from East Pakistan would be taken in Pak military or no industry would be developed in East Pakistan. I am certain, instead of writing the posters I wrote for the State Language movement, I would have switched over to write on military or industrial issues, albeit, going to jail for whatever issue would have been as painful and as glorious."[২২]

আট

"... আমরা আজ ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছি। ভৌগলিক দিক দিয়া পাকিস্তান একটি বিচিত্র রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বিশ্বে এর দ্বিতীয় নজির নাই। পনেরো শত মাইল দূরত্বে অবস্থিত দুইটি অঞ্চল নিয়াই শুধু পাকিস্তান গঠিত হয় নাই, ভাষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা এবং আচার-আচরণেও দুইটি অঞ্চলে ভিন্নতা রহিয়াছে। অথচ এই বিচিত্র রাষ্ট্রটি জনগণের ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ জোর করিয়া চাপাইয়া দেয় নাই।

... কায়দে আজমের বক্তৃতা-বিবৃতি হইতে তার গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু পাকিস্তান আন্দোলনকালেই নয়, পাকিস্তানের জন্ম দিবসেও তিনি পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার নীতিই ঘোষণা করেন। অবশ্য রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে 'উর্দু' এবং 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে' বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা আদৌ গণতন্ত্রসম্মত ছিল না। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত যুক্তি ও জনমত বিচার করিয়া এই প্রশ্নেও তাহার মত পরিবর্তিত হইতে পারিত। এই ধারণা অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেই দিন ঢাকার ছাত্রসমাজ তার মুখের উপর প্রতিবাদ করিলেও জাতির জনকের অধিকারী হইয়া অন্য কাহারও মতো তিনি অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন নাই এবং এই প্রতিবাদ করার কারণে কাহাকেও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন নাই।"[২৩]

নয়

"... 'কায়েদে আযম' ঢাকায় প্রথম এসেই রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। সেখানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। আমি কিন্তু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ আমি মনে করেছিলাম দেশের এ পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে চাকুরী করা সঙ্গত হবে না, আমার দায়িত্বের কথা চিন্তা করে ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পদত্যাগ করে চলে যাই। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতার দিন আমি রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলাম। জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা শোনার জন্য ঢাকা শহরের অসংখ্য লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল। জিন্নাহ সাহেব উর্দুতে ভাষণ দেন। আমি এর পূর্বে জিন্নাহ সাহেবকে দেখিনি। ক্ষীণ দেহ, বেশ দীর্ঘ, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ বেশ বলিষ্ঠ। তিনি বক্তৃতা করতে করতে এক জায়গায় বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আছে, তোমাদের মধ্যে গুপ্তচর আছে, তোমাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করছে। আমি বলছি ভাষার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতে উর্দু কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' একথা বলেই তিনি বক্তৃতা শেষ করেন কিংবা তার বক্তৃতায় এটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।

---

[২২] Iqbal Ansari Khan/The Third Eye : Glimpses of the Politicos\ [UPL - September, 1991| P. 116-118/136-137]

[২৩] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)/পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর ॥ [বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ- মে, ১৯৮১। পৃ. ৩৭-৩৮]

সে সময় ছাত্ররা বিশেষ করে, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা সম্বর্ধনার তোরণ জিন্নাহ সাহেবের নামে তৈরী করেছিল। জিন্নাহ সাহেবের ভাষণ শোনার পর ছাত্ররা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে, হলে ফেরার পথে সে তোরণ তারা ভেঙ্গে ফেলে। অনেকে বলেছেন–জিন্নাহ সাহেব রেসকোর্সে ভাষণ দানকালে ভাষার প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার প্রতিবাদ সেখানেই হয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমি একজন সচেতন কর্মী হিসাবেই সেখানে গিয়েছিলাম এবং জিন্নাহ সাহেব কি বলেন, না বলেন, তার প্রতিক্রিয়া কি হয় এসব জানার জন্য সেখানে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে কোন বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ্য করিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় কার্জন হলে। কার্জন হল মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে যেসব ছেলেমেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাশ করেছেন তাদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। আমি ১৯৪৬ সনে পাশ করেছি। কিন্তু ইতিপূর্বে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিনি। চিঠি পেয়েছিলাম উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু আমি ছাত্রদের নির্দিষ্ট জায়গায় না বসে শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসি। হলের মধ্যে পেছনের দিকে একটা অংশে ছাত্রদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সার্টিফিকেট বিতরণ পর্ব শেষে জিন্নাহ সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিতে উঠেন। তিনি ইংরেজিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের এক জায়গায় এসে আবার স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেন : Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan.

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চমকে উঠলাম–আমরা পেছনে তাকাতে বাধ্য হলাম। পেছনে ছাত্রদের যে ব্লক ছিল হয়তো ডিগ্রী গ্রহণকারী ছাত্ররাই সেখানে ছিল। সেখান থেকে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে তিনটি শব্দ উচ্চারিত হ'ল 'নো, নো, নো'। এ তিনটি শব্দই মাত্র উচ্চারিত হয়েছিল। এ ছাড়া কোন আওয়াজ বা শ্লোগান সেখানে উচ্চারিত হয়নি। এ তিন শব্দই জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। তিনি মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়েছিলেন। তারপর স্বভাবসুলভভাবে ভাষার বিষয়ে আর কোন বক্তব্য না রেখে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন। জিন্নাহ সাহেব হল থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত হলের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের কাউকেই বের হতে দেয়া হয়নি। ভাষা আন্দোলনের এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জিন্নাহ সাহেব আরও কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। কোন কোন জায়গায় বিক্ষোভের কথা শুনেছি। কিন্তু তার কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়॥' (সাক্ষাৎকার : সরদার ফজলুল করিম)[২৪]

দশ

"... ১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম ঢাকায় আসেন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে এটা ছিল তার প্রথম ঢাকা সফর। এটা তাঁর শেষ সফরও ছিল। কারণ করাচী ফিরে গিয়ে তিনি আর বেশীদিন হায়াত পাননি।

আমি তখন ঢাকা মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। জিন্নাহ সাহেব ঢাকা আসবেন শুনে আমাদের সবার মন আনন্দে নেচে ওঠে।

যে নেতার কথায় পাকিস্তান আন্দোলন করেছি, যার অসাধারণ নেতৃত্বের সামনে কংগ্রেসের জাঁদরেল নেতারা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পর্যন্ত পাকিস্তান দাবি কবুল করতে বাধ্য হয়েছিল, যার অসাধারণ বলিষ্ঠতার মুখে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমান পেয়েছিল তাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি, তিনি এলে আমাদের মনের অনুভূতি যে এমনিতেই উল্লাসমুখর হয়ে উঠবে তাতো স্বাভাবিক। আমার মনে আছে বিভিন্ন সুযোগে আমি তার সাথে ৭ বার হাত মিলিয়েছিলাম। আমরা মনে করতাম তার মত মানুষের সাথে হাত মিলাতে পারাটা রীতিমত একটা গৌরবের ব্যাপার। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি পুরোপুরি না জানলে আমাদের এই মানসিক অবস্থাটা কেউ ধরতে পারবে না।

---

[২৪] একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ/সম্পা : গবেষণা ও সংকলন বিভাগ ॥ [বাংলা একাডেমী - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০। পৃ. ৭০-৭২]

কায়েদে আযমের ঢাকা সফর পুরোপুরি সফল করবার জন্য আমরা সর্বাত্মক সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করি। ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহকে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব সাহেব তখন মুসলিম লীগে পুনরায় ফিরে এসেছেন। আমি অভ্যর্থনা কমিটির প্রচার সম্পাদক। আমার মনে আছে সমগ্র প্রদেশে তখন কয়েক লক্ষ পোষ্টার ও লিফলেট বিলি করা হয়েছিল আমার নামেই। এয়ারফোর্সের দুটো ছোট বিমানে করে আমি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারপত্র ছড়িয়েছিলাম।

কিছু প্রচারপত্র ঢাকা কোর্ট বিল্ডিং এর উপরে এসে পড়ে। তখন আদালতের অধস্তন কেরানীরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমার আব্বার কাছে পৌঁছে দেয়ার সময় বলেছিল আপনার ছেলের নামেই এতসব কান্ডকারখানা চলছে। আব্বা বোধ হয় খুশী হয়েছিলেন। কায়েদে আযম যেদিন আসেন সেদিন ঢাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। তেজগাঁও থেকে ঢাকার রাস্তায় দুইধারে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়েছিল কায়েদে আযমকে দেখার জন্য। তিনি ঢাকায় এসে মিন্টু রোডের একটা বাড়ীতে ওঠেন। পরবর্তীকালে আইয়ুব খান এটির বহু সংস্কার করে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন বানিয়েছিলেন।

আমরা বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলাম। 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে পুরো ঢাকা সেদিন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। রেসকোর্স ময়দানে কায়েদে আযম প্রথম জনসভা করেন। অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে বিরাট প্যান্ডেল সাজানো হয়েছিল। সুদৃশ্য ডায়াস তৈরী করা হয়েছিল। কায়েদে আযম বক্তৃতা দেন বিকালের দিকে। সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে সর্বস্তরের হাজার হাজার লোক জনসভা স্থলে জমায়েত হতে থাকে। আমার কাছে মনে হল বিরাট এক জনসমুদ্র। আসলে কায়েদে আযম তখন মুসলমানদের জন্য একটি গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলা থেকে প্রবীণ ও নবীন সব মুসলিম লীগ নেতাই কায়েদে আযমের জনসভায় হাজির হয়েছিলেন। সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে আব্বাস উদ্দিন ও কবি গোলাম মোস্তফা কায়েদে আযমকে অভিনন্দন জানিয়ে গান গেয়েছিলেন।

তখন ছিল গরম কাল। মুসলিম লীগ কর্মীরা হাজার হাজার মাটির কলস ভর্তি পানি তৃষ্ণার্ত শ্রোতাদের পান করিয়েছিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে কায়েদে আযম পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ কর্মী সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। এছাড়া কার্জন হলে ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এবং ঢাকা ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। রেসকোর্স ময়দানে এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার উপর সুস্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করবার পক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করেন।

প্রকৃতপক্ষে উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রাদেশিক ভাষা ছিল না। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রদেশেই উর্দুর ব্যবহার হত না। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নিজস্ব ভাষা প্রচলিত ছিল। জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রাদেশিক ভাষার স্থলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার কথা কায়েদে আযম ভেবেছিলেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেকেই পরবর্তীকালে দাবি করেছেন কায়েদে আযমের ভাষণের একটি কথিত উক্তি Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan উচ্চারণ করার সময় তারা নাকি No No বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এটা একটা স্রেফ মিথ্যাচার এবং গালগল্প মাত্র। তাঁরা মনে করেছিলেন মিথ্যা বলে তারা গৌরবের অধিকারী হবেন। এটাকেই বলা যায় ইতিহাসের চুরি। এই গৌরব দাবিকারীদের মধ্যে নাইমুদ্দীন, তোয়াহা, আজিজ আহমেদ প্রমুখের কথা শুনেছি।

রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় কায়েদে আযমের ভাষণের প্রতিবাদ করতে যাওয়া ছিল রীতিমত কল্পনাতীত ব্যাপার। তখন কায়েদে আযমের যে বিপুল জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের যে বিশালতা

তার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে জনতার রুদ্ররোষেই সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কনভোকেশন বক্তৃতা সম্বন্ধেও একই কথা চলে আসে। ওখানেও নাকি তারা 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অথচ এই প্রতিবাদের কথা উপস্থিত কেউ শোনেনি। তখনকার পত্র পত্রিকায় এ ধরণের কথা প্রকাশ পায়নি। পেছনের দিক থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ করে থাকলেও জিন্নাহ সাহেব নিজে শোনেননি, যারা সামনের দিকে বসা ছিলেন তাঁদের কানেও পৌছেনি।

এটা সত্য যে, মুসলিম লীগ তখন দুটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম লীগের মধ্যে দুটো উপদল ছিল নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ। এরা ছিল তাঁদের অনুসারী। ছাত্র নেতাদের অনেকেই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু করেন। কায়েদে আযমের ঢাকা অবস্থানকালে নাইমুদ্দীন, তোয়াহা প্রমুখ ভাষার দাবি নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর তার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ে লিখেছেন এরা নাকি কায়েদে আযমের সাথে ভাষার প্রশ্নে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। এটা একটা কল্প কাহিনী বৈ অন্য কিছু নয়। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর মত জননেতাকেও কায়েদে আযমের সাথে দেখা করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

যারা রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আমাদের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে এ সময় একটা রূপান্তর আসতে শুরু করল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাঁদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায় - আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায় - ইত্যাকার কথা তাঁদের মুখে শোনা যেতে লাগল।

এ সমস্ত শ্লোগান দিয়ে সরল অথচ আবেগপ্রবণ বাঙ্গালী মুসলমানের অনুভূতিকে তারা বিষিয়ে দিতে শুরু করল। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন উর্দুর কোন প্রচলন ছিল না তেমনি কায়েদে আযমের মাতৃভাষাও ছিল না উর্দু। তাঁর মাতৃভাষা ছিল গুজরাটী। উর্দুর সাথে তিনি তেমন ঘনিষ্ঠও ছিলেন না। কায়েদে আযম নিজেও বলেছিলেন এই প্রদেশের ভাষা কি হবে তা এখানকার জনগণই নির্ধারণ করবে। তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবেই মেনে নিয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। একারণে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত ভাষা নিয়ে কাউকে মাততে দেখা যায়নি।

আন্দোলনকারীরা ভাষা সমস্যা নিয়ে মিছিল মিটিং পিকেটিং শুরু করল। পরিষদ ভবন, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন এগুলো আন্দোলনকারীদের ঘেরাওয়ের শিকার হতে লাগল প্রায় প্রতিদিন। এরা মুখে বাংলা ভাষার প্রতি দরদ দেখাত অথচ মিছিল মিটিং-এর নামে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, কর্মচারীদের তাদের নিজ নিজ দফতরে যেতে বাধা প্রদান নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অথচ তাদের এ সমস্ত অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিরোধ করতে যখন পুলিশ নামান হত তখনই প্রচার করা হত মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের অত্যাচারে নাকি দেশ জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে।

আমার মনে আছে আন্দোলনকারীরা এতদূর জঙ্গি হয়ে উঠেছিল যে একবার তারা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে উপস্থিত প্রাদেশিক মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। আফজাল ছিলেন ফজলুল হকের ভাগ্নে। তিনি নিজেও বাংলা ভাষার সমর্থক ছিলেন। আমার তখনই মনে হয়েছিল এটা শুধু নিছক রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন হতে পারে না। এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। ভাষা আন্দোলনকারীরা এ সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে প্রদেশে নতুন প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিল। ভাষার মত একটি আবেগপ্রবণ ব্যাপারকে পুঁজি করে তারা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে অনেকখানি হেনস্থা করতে পেরেছিল। মিছিল মিটিং-এ তারা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিত।

নতুন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে কলকাতার পরিষদ ভবনে ভোটাভুটি হয়েছিল। ঐ নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী নাজিমুদ্দীনের কাছে হেরে যান। প্রদেশে যখন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন তাঁর

মন্ত্রীসভায় সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কেউই স্থান পায়নি। স্বাভাবিকভাবে তাদের একটা ক্ষোভ ছিল। পরিষদে এরাও নাজিমুদ্দীনের বিরোধীতা করা শুরু করে এবং ভাষা আন্দোলনকারীদের পিছন থেকে উৎসাহ যোগাতে থাকে। এঁদের মধ্যে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, কুমিল্লার টি আলী এবং কুষ্টিয়ার ডাঃ এ এম খালেক ছিলেন। ভাষার ব্যাপারটা নিয়ে এঁরা যে খুব গভীরভাবে ভাবতেন এমন নয় কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির জন্য তারা এসব করেছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু এর ফল যা হয়েছিল তার জন্য আমাদের পরবর্তীকালে চড়া মূল্য দিতে হয়।

ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেসের একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সেটা কখনও প্রকাশ্য ব্যাপার হতে পারেনি। আমি নিজে লক্ষ্য করছি ভাষা আন্দোলনকারীদের মিছিল-মিটিং চলাকালে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ও লাইব্রেরীগুলো বিশেষ তৎপর হয়ে উঠত। কংগ্রেসী নেতাদের মনে হত খুব কর্মচঞ্চল। ভাষা আন্দোলনকারীদের লিফলেট-ইশতেহার ও অন্যান্য প্রচারপত্র তারা নিজেরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় বিলি-বাটোয়ারা করে দিত। ভাষা আন্দোলনের নেতা তোয়াহা, মতিন এঁরাতো কমিউনিষ্ট পার্টির সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির অনিল রায়, লীলা রায় এবং কংগ্রেসের শিরিশ চট্টোপাধ্যায় ও ভবেষ নন্দীরা ভাষা আন্দোলকারীদের সব রকমের সহযোগীতা করতেন। এঁরা নিশ্চয়ই সেদিন কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়াননি।

কায়েদে আযম ঢাকায় এসে আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে আমরা যারা নাজিমুদ্দীন গ্রুপের বলে পরিচিত ছিলাম তাদের মধ্যে একটা ঐক্য তৈরী করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ আন্দোলনকারীরা তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি নিয়ে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তাদের সাথে আমাদের চিন্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কায়েদে আযম বলেছিলেন বিভিন্ন গ্রুপের ঐক্য ছাড়া পাকিস্তান টিকবেনা। সে কথা অবশ্য পরে নির্মমভাবে সত্য হয়েছিল।

তখনকার মত কায়েদে আযম সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কয়েকজন নেতাকে খুশী করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়। ডা. এ এম মালেক লিয়াকত আলী খানের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন এবং মোহাম্মদ আলী ও টি আলী বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন।

কায়েদে আযম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। শুনেছি তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলনকারীদের খবর ফলাও করে প্রচার করত কলকাতার কংগ্রেসী পত্রিকাগুলো। এসব পত্রিকা পড়লে মনে হত পত্রিকাগুলো ভাষা আন্দোলনের দাবিকেই সমর্থন করছে। আমার কাছে এ জিনিসটা চিরদিনই অদ্ভুত ঠেকেছে যে কলকাতার বাঙ্গালী হিন্দুরা এদেশের বাংলাভাষার আন্দোলনকে সমর্থন করছে অথচ নিজেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে গ্রহণ করেছে - এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দোহাই পেড়ে। সেখানে তাদের বাংলা প্রেমের মোটেও ঘাটতি হয়নি। অথচ পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষার দাবির কথা শুনে তারাই আবার হৈ চৈ করে উঠেছে এবং এদেশের কিছু আত্মবিক্রিত নেতা ও বুদ্ধিজীবীর ভাষার দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে তাঁরাই সমর্থন দিয়েছে। পাকিস্তান হয়েছিল ১৪ই আগষ্ট। অথচ ১লা সেপ্টেম্বরেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির দুজন লেকচারার, আবুল কাশেম ও নূরুল হক ভূঁইয়া তমুদ্দুন মজলিসের জন্ম দেন। এই সংগঠনটী ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে ভাষার ব্যাপারে কাজ করতে শুরু করে। যার পথ ধরে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ ছিল পাকিস্তান টিকবে কিনা। ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চলকে একত্রিত করে রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। শুধুমাত্র মুসলিম জাতীয়তার আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রটির কোষাগারে তখন কোন টাকা ছিল না। বাউন্ডারী কমিশনের কাছে

পাকিস্তানের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা ভারত আটকে দিয়েছিল। লাখ লাখ মুহাজির হিন্দুদের হাতে নির্যাতিত হয়ে পাকিস্তানে ছুটে এসেছিল। এ সমস্যা মোকাবিলা করতে তখন পাকিস্তান সরকারের অচল হয়ে পড়ার মত অবস্থা। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। হিন্দুরা চলে যাওয়ায় প্রশাসন অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিল। পুলিশ ও আর্মি তখনও ঠিকমত গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সরকারের প্রত্যেকটা বিভাগই ছিল অপূর্ণ। এরকম একটা নাজুক অবস্থায় ভাষার দাবি নিয়ে যারা নতুন দেশে ঐক্যের পরিবর্তে ঘৃণা ছড়ানো শুরু করল, তাদের উদ্দেশ্যে সততা কতদূর ছিল তা বলা মুশকিল।

এক হতে পারে রাজনৈতিক স্বার্থে সেদিন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের বুনিয়াদকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য ভাষার প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল। এটা সত্য পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বাংলাভাষী। কিন্তু বৃটিশের দুশো বছরের রাজত্বে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং রাজনীতিতে ডমিনেট করেছে হিন্দুরা। বাংলার মুসলমানদের তারা কখনও বাঙ্গালী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। বাঙ্গালী বলতে বাংলাভাষা কিংবা বঙ্গের অধিবাসী বুঝিয়ে সেকালে হিন্দুদের বুঝানো হত। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের বহু বিখ্যাত 'স্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমানের মধ্যে ফুটবল খেলা চলিতেছে' - উক্তিটি মনে করবার মত।

এ অবস্থা থেকে মুসলমানদের বাঁচার জন্যই পাকিস্তান আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। অথচ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীরা এমন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনীতির মাঠ গরম করলেন যা মুসলিম জাতীয়তার বুনিয়াদকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে অগ্রসর হল।

তারা যে এ জিনিসটা বুঝতেন না তা নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার পরিচয়টা যখন মুসলমান পরিচয়ের চেয়ে তারা বেশী করে দিতে লাগলেন তখনই পাকিস্তানের আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অনেক নেতাকে বলতে শুনেছি ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু। তখন আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয় যে আসলে ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ারই একটি আন্দোলন।

সেই উনিশ'শ আটচল্লিশেই মুসলিম লীগ কর্মীদের সাথে ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রায়শই মারামারি হত। এবার শুনতে পেলাম কোর্ট হাউস স্ট্রিটে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে বসে ভাষা আন্দোলনকারীরা মিটিং করছে। ফিরোজ আহমদ ডগলাস বলে আমাদের এক তরুণ কর্মী ছিল। আমাদের একটা সুবিধা ছিল ফিরোজ আবার কমিউনিস্টদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করত। সে আমাদের কাছে কমিউনিস্টদের গোপন খবর পাচার করত। সেই এসে জানাল মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে ভাষা আন্দোলনকারীরা মর্নিং নিউজ, সংবাদ এবং আজাদ পত্রিকা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেবে। এসব পত্রিকা তখন মুসলিম লীগকে সমর্থন করত। তখন ঢাকা নগর মুসলিম লীগের অফিস ছিল ৩৩, জনসন রোডে বর্তমানে যা লিয়াকত এভিনিউ। আমি তাড়াতাড়ি করে সেখানে চলে যাই। আমরা সিদ্ধান্ত নেই আগুন দেয়ার আগেই আমরা তাদের প্রতিহত করব। কিন্তু তারা ততক্ষণে মর্নিং নিউজ অফিস জ্বালিয়ে দেয়। রায় সাহেব বাজারে এসে আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দু'পক্ষই মারামারি করার জন্য এক রকম প্রস্তুত হয়ে ছিল।

আমার মনে আছে প্রতিপক্ষ সেদিন মিছিল করে আমাদের দিকে আসছিল আর শ্লোগান দিচ্ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ইত্যাদি। দু'পক্ষেই সেদিন হতাহত হয়েছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে এবং গুলিও চালায়। গুলিতে আমাদের একজন ভীষণভাবে আহত হয়। তাকে হাসপাতালে নেয়ার সময় সে মারা যায়।

ভাষা আন্দোলনকারীরা চেয়েছিল এ ঘটনার সূত্র ধরে তার পরের দিন ঢাকায় হরতাল ডাকতে। প্রতিরোধের মুখে তাদের সে চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। আমি মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীদের নিয়ে জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে যাই। গিয়ে দেখি পিকেটাররা জটলা করছে। এর মধ্যে মুসলিম লীগ কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' শ্লোগান দেয়ায় তাদের উপর আমাদের ক্ষোভ ছিল প্রচন্ড। তাছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে এরা আন্দোলন উস্কে দিচ্ছিল।

কোর্ট হাউস ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল কাপ্তান বাজার এবং ফুলবাড়ী রেল স্টেশনের বিপরীত দিকে। তিনটি অফিসই বিক্ষুব্ধ জনগণ জ্বালিয়ে দেয়। এদের দুটো পার্টি লাইব্রেরী ছিল। একটি ঢাকা কোর্টের বিপরীতে নাসিরুদ্দীন সরদার লেনের মাথায় অন্যটি নওয়াবপুরে। এ দুটো লাইব্রেরী ছিল সেকালে পাকিস্তান বিরোধী প্রকাশনা ও প্রচারণার তীর্থস্থান। কমিউনিস্টদের এ দুটো আখড়াও জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

কমিউনিস্ট রাজনীতি ছিল আমার কাছে এক রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার। অনেকেই জানেনা এরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, রণেশ দাশের মত প্রথিতযশা কমিউনিস্ট নেতারা সেকালে পাকিস্তান আন্দোলনকে রীতিমত নিপীড়িত মানুষের আন্দোলন বলে বক্তৃতা-বিবৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন। অথচ পাকিস্তান হবার পর এঁরাই আবার বলতে শুরু করলেন এটা নাকি একটা ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক দেশ। পাকিস্তান হচ্ছে সর্ব প্রকার প্রগতিবিরোধী মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার কারখানা। আমার মনে আছে কোর্ট হাউসের পিছনে যে অফিসটা সেদিন পুড়িয়ে দেয়া হয় সেটা কয়েকদিন পরেই হোটেল হিসেবে চালু করেছিল ভাষা আন্দোলনের এক নেতা কামরুদ্দীন আহমদের ছোট ভাই বদরুদ্দীন আহমদ রুকু। কামরুদ্দীন ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন আরমানীটোলা হাই স্কুলের মাস্টার। পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন তাকে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেন।

কমিউনিস্ট পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেবার পর কলকাতায় কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় মুসলিম লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছিল। এ সময়ে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ফজলুল হক হলে মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটা সভা আহ্বান করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে মুসলিম লীগের অবস্থান ব্যাখ্যা করা। তখন ভাষা আন্দোলনকারীরা মুসলিম লীগ নেতা আবু সালেক, সুলতান হোসেন খান, কাজী আউলাদ হোসেন, এটি সাদী প্রমুখকে ঘেরাও করে ফেলে। আমাদের কাছে খবর আসে তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। খবরটা এনেছিল ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমাদের কর্মী আখতার আহাদ ও আসলাম। আমি মুসলিম লীগের শখানেক কর্মী নিয়ে ফজলুল হক হলে পৌঁছে যাই। আমাদের সবার মধ্যে তখন যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। এসময় ইউনিভার্সিটির ভিসি মাহমুদ হাসান ছুটে আসেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় ভাষা আন্দোলনকারীরা মুসলিম ছাত্রলীগের নেতাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। মাহমুদ হাসান না আসলে হয়ত সেদিন রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটত!

ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে কায়েদে আযম মাত্র ছ'মাস বেঁচেছিলেন। তখন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নাজিমুদ্দীন। সেই সাথে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন নূরুল আমীন॥"[২৫]

---

[২৫] ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৪১-৪৯]

চতুর্থ পর্ব

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : প্রেক্ষিত ও পর্যালোচনা

এক

একুশে ফেব্রুয়ারীর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

০১.

"... ১৯৪৯ সাল থেকে ঢাকার ছাত্রমহলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। পূর্ববর্তী বৎসর ঢাকায় কায়েদে আজমের ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর পরই এই প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়েছিল। কায়েদে আজম বুঝতে পেরেছিলেন যে, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। ঢাকায় বক্তৃতার পর তিনি এ সম্পর্কে আর কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই। এর কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ফলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রশ্নটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা হিসাবে খাজা নাজিমুদ্দীনের এক বক্তৃতায়। সম্ভবতঃ ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় এক জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন আকস্মিকভাবে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এতেই আবার ধামাচাপাপড়া আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায়।

ঢাকার ছাত্রসমাজেই সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন অত্যন্ত উগ্র আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ক্রমে মফস্বল শহরগুলির স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও এ বিষয়ে সচেতন হয় এবং তাদের কণ্ঠ উর্দুর সঙ্গে বাঙলাকেও রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করতে হবে এই রবে মুখর হয়ে ওঠে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সারা পূর্ব-পাকিস্তানের রাস্তা-ঘাটে হাটে-বাজারে অগণ্য জনসমাবেশের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে : "রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই"।

তদানীন্তন প্রাদেশিক নুরুল আমিন সরকার এই প্রশ্নটিকে খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। তারা সম্ভবত এটাকে একটা পাসিংফেজ হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। কিন্তু এটা যে পাসিংফেজ ছিল না, অল্পদিনেই ক্রমবর্ধমান ছাত্র-বিক্ষোভের ভিতর দিয়েই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠল। ঢাকার স্কুল এবং কলেজগুলিতে এই উপলক্ষে ধর্মঘটের হিড়িক পড়ে গেল। শহরের রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র-বিক্ষোভের মিছিলের পর মিছিল বের হতে লাগল। ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্যের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলল। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের গ্রেফতারও যে না চলল, এমন নয়। প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশনের সময়ে ১৪৪ ধারা জারি করে ছাত্র-মিছিলের আইন পরিষদ-ভবনের সান্নিধানে যাওয়া নিষিদ্ধ হল।

অবস্থা চরমে উঠল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী, মুতাবিক ১৩৫৭ সালের ৮ই ফাল্গুন তারিখে। সেদিন ঢাকার স্কুল-কলেজগুলিতে হরতাল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এক বিরাট ছাত্র-মিছিল ছাত্র জনতার উপর আইন পরিষদ-ভবনের সম্মুখে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পুলিশের গুলী ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে।

শোনা যায়, পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে গমনকারী কয়েকজন মোটরবাহী পরিষদ-সদস্যকে নাকি ছাত্র-মিছিলের তরফ থেকে পথে আটকাবার চেষ্টা হয়েছিল। এতেই গোলমাল পেকে ওঠে। পুলিশ বাধা দিতে চেষ্টা করে। ছাত্র-মিছিলের উপর পুলিশ নাকি লাঠিচার্জ করে এবং কিছুসংখ্যক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতারও করা হয়। ফলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং জনতার পক্ষ থেকে নাকি পুলিশের উদ্দেশে ঢিল ইত্যাদি ছোঁড়া হয়। ক্রমে অবস্থা একরূপ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

পুলিশ প্রথমে কাঁদুনে গ্যাস এবং পরে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ শুরু করে। ফলে জনতার বেশ কিছুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। হতাহতের সংখ্যা কি ছিল এবং তাদের মধ্যে ছাত্রই বা কতজন ছিল সে-সম্পর্কে নানা ধরণের কথা শুনা গিয়েছিল। সঠিক হিসাব যে-কারণেই হোক পাওয়া যায় নাই - পাওয়ার উপায় ছিল না।

এ-সংবাদ যখন পেলাম, তখন আমি 'আজাদ' অফিসে কর্মরত অবস্থায় ছিলাম। এই মর্মন্তুদ খবরে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি তখন তখনই আমার আইন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করে গভর্নর মালিক ফিরোজ খান নুনের কাছে এক পত্র পাঠিয়ে দিলাম। পদত্যাগের কারণ হিসাবে তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া পুলিশী গুলীবর্ষণকে আমি জাতীয় সরকারের শাসনব্যবস্থার এক চরম কলঙ্কময় ঘটনা বলে মনে করি। এ সরকারের আইন উপদেষ্টা দলের একজন সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট থাকতে আমি দারুণ মনঃপীড়া অনুভব করছি। কাজেই এর সংশ্রব ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হলাম।

পুলিশী গুলীবর্ষণ ও আমার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদত্যাগের খবর নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আজাদের এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গুলীবর্ষণের নিন্দা করে সে-সংখ্যায় অগ্নিবর্ষী ভাষায় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ঢাকার নাগরিক মহলে, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বলে শুনেছি। পরদিন গুলীবর্ষণে নিহতদের স্মৃতিতে যে শোকসভা আহ্বান করা হয়, তাতে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন এসে আমাকে সে সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য এমন চেপে ধরেন যে, শোক-বিহ্বল চিত্ত নিয়েও আমার পক্ষে তাদের অনুরোধ রক্ষা না করে উপায় ছিল না। মেডিক্যাল কলেজের পাশে, বর্তমানে যেখানে শহীদমিনার অবস্থিত, সেখানেই পরদিন সে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে স্থানেই পুলিশী গুলীবর্ষণে কয়েকজন নিহত হয়েছিলেন। আমার চিত্ত সে-সময় এতই শোক-বিহ্বল ছিল যে, সভায় দীর্ঘক্ষণ ধরে ভাষণ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমার মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিলাম এবং যতদূর মনে পড়ে, পরদিন 'আজাদে' তা প্রকাশিত হয়েছিল।

এর পরদিন সংবাদ পেলাম, আর একজন এম-এল-এ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি জনাব আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তিনি অবশ্য আমার মতো এম-এল-এ-শীপ ত্যাগ করেন নাই, শুধু লীগ পার্লামেন্টারী দলই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার অনেক বন্ধু আমাকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনিও কেন তেমন করলেন না? এম-এল-এ-শীপ ত্যাগ না করলেও পারতেন। আমি তাদের বলেছিলাম : না, আমি তা পারতাম না। লীগ টিকেটে যেহেতু আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম, তাই পরিষদে আসন বজায় রেখে সেখানে লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সাথে অসহযোগিতা করা আমি নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে না করে পারি নাই। তাদের আরো বলেছিলাম, লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ত্যাগ করেছি বটে, কিন্তু তাই বলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ ত্যাগ করি নাই। কারণ যে-প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের জন্ম সম্ভব করেছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার এ কথায় তখন আমার অধিকাংশ বন্ধুই সায় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কিছুসংখ্যক বন্ধুদের কাছে আমার এ কথা যে ভালো লাগে নাই তা আমার বুঝতে দেরী হয় নাই। পরবর্তীকালেও দেখেছিলাম, আমি যেহেতু পার্লামেন্টারী পার্টি ত্যাগ করেছি, তাই মুসলিম লীগের সাথেও আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে,

এরূপ ধারণা অনেকের ছিল। কিন্তু তা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ, আমি পরবর্তী নির্বাচনেও মুসলিমলীগ-টিকিটে সদস্যপদপ্রার্থী হয়েছিলাম।

বাঙলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করুক বা না করুক, কিন্তু এ-ভাষার সময়োপযোগী সংস্কার যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তা তখন পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্বজ্জন মহলে গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারও তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। শুধু বাঙলা ভাষা সংস্কার নয়, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও প্রাদেশিক সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে দু'টি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়–(১) শিক্ষা-সংস্কার-কমিটি এবং (২) ভাষা-সংস্কার-কমিটি। উভয় কমিটিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব সভাপতি ছিলেন। আমাকে ভাষা-সংস্কার-কমিটিতে সদস্য হিসাবে নেয়া হয়েছিল। শেষোক্ত কমিটিতে ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল, আবুল হাসান, মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার, ডক্টর এনামুল হক এবং আরো কয়েকজন। কমিটির দু'একটি বৈঠকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাঙলা বিভাগের তদানীন্তন হেড গণেশবাবুকেও যোগ দিতে দেখেছি।

মওলানা মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরেই সাধারণতঃ ভাষা সংস্কার-কমিটির বৈঠক বসত। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে কয়েকটি বৈঠকে ভাষা-সংস্কার-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তানী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাঙলা ভাষাকে নবরূপ দেয়ার জন্য এর কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা নিয়ে কমিটির সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হত। আমি ছিলাম এর বহুল সংস্কারের পক্ষপাতী। বর্ণমালা থেকে শুরু করে ব্যাকরণ পর্যন্ত এর আদ্যন্ত সংস্কার দরকার, কমিটির অধিকাংশ সদস্যেরও অভিমত ছিল এই ধরনের। আমাদের মতে, বাঙলা ব্যাকরণ নামে যা প্রচলিত রয়েছে, তা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙলা ভাষাকে যেহেতু সংস্কৃতের দুহিতা, কিংবা দৌহিত্রী বলে আমরা স্বীকার করি না, তাই সংস্কৃত ব্যাকরণকে আমরা বাঙলা ব্যাকরণ বলে মানতে পারি না। আমাদের এই ধরনের অভিমত শুনে গণেশবাবু অবশ্য একটুখানি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এই বলে যে, ব্যাকরণ সম্পর্কে আমরা যেনো কোনো অভিমত প্রকাশ না করি, কারণ সে সম্পর্কে অধিকারী মাত্র তাদের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ! আমরা এর উত্তরে গণেশবাবুকে জানিয়েছিলাম : দেখুন গণেশবাবু, বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের আওতা থেকে মুক্ত করে আমরা যেভাবে এর সংস্কার করতে চাইছি, তাতে আপনার মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি কোন কথা না বললেই সম্ভবতঃ শোভন হয়। এরপর গণেশবাবু আর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই এবং তাকে ভাষা-সংস্কার-কমিটির পরবর্তী কোনো বৈঠকে আর দেখাও যায় নাই।

যাহোক, কয়েকটি বৈঠকে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর আমরা ভাষা-সংস্কার সম্পর্কে যে সুপারিশ সর্বসম্মতিক্রমে প্রণয়ন করেছিলাম, তাতে বর্ণমালার সংস্কার করা হয়েছিল বিপুল এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক বিধিনিষেধই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বরবর্ণের ঈ, ঊ, ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ঙ, ঞ, ণ অন্তস্থ য, ষ, ক্ষ প্রভৃতি বর্ণ একদম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। ডক্টর শহীদুল্লাহ 'য়্যা' নামক নতুন একটি বর্ণ সংযোজনের সুপারিশ করেছিলেন। ব্যাকরণ সম্পর্কেও বিপুল সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণের খোল-নলচে বদলিয়ে বাঙলা ব্যাকরণের একটা নবরূপ দানের সুপারিশ আমরা করেছিলাম।

বাঙলা ভাষা-সংস্কার-কমিটির এই সুপারিশ দীর্ঘদিন কি কারণে যেনো সরকারি দফতরে ধামাচাপা পড়ে থাকে। দীর্ঘ সাত-আট বছর পরে সে সুপারিশ লোকচক্ষুর গোচরে আনা হয় বটে, কিন্তু তা নানা কারণে কার্যকরী করার সরকারি চেষ্টা হয় না। তবে তারও বহুদিন পরে বাঙলা একাডেমী ভাষা-সংস্কার সম্পর্কে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং তাদের সুপারিশ অনুসরণ করার জন্য শিক্ষা ও সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান জানায়। বাংলা একাডেমীর সুপারিশের সাথে ভাষা-সংস্কার-কমিটির সুপারিশের খুব বেশী তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না।

... ভাষা-আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তান আইন-পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হন, যার সারমর্ম ছিল এইরূপ : পূর্বপাক সরকার কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদকে রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কিত পূর্বপাকিস্তানবাসীর মনোভাব যথাসময়ে জানাবেন। বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া না হলে বিক্ষুব্ধ পূর্বপাকিস্তানবাসী যে শান্ত হবে না এ-সত্যও তারা গণপরিষদকে অবহিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তা তারা করেছিলেন এবং গণপরিষদে এ-ব্যাপার নিয়ে তুমুল আলোচনাও তখন হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ-সম্পর্কে কোনো ফয়সালা হয় নাই। তবে মনে হয়, গণপরিষদের সবাই এ-কথা ক্রমে সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বিষয়টাকে ধামাচাপা দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী কালে বাঙলা ভাষাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে তারা বাধ্য হয়েছিলেন।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পাক-বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে একটা নতুন চিন্তাধারা ও নয়া জীবনবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্যসেবীরা ক্রমে উপলব্ধি করছিলেন যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা শুধু এদেশবাসীর রাজনৈতিক জীবনেরই একটি পরিবর্তন সূচিত করে নাই, বরং এর সাহিত্যক্ষেত্রেও এ একটা নয়া জীবনবোধের বাস্তবতা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর নিয়ে এসেছে। কিন্তু যারা পাকিস্তান-আন্দোলনের গভীর মূলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, শুধু মাত্র তাদের উপলব্ধিতেই এ সত্য ধরা পড়েছিল। তারা সংখ্যায় খুব বেশী ছিলেন বলে আমার মনে হয় নাই। বরং পাকিস্তান নিছক একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়, সাধারণভাবে এ ধারণাই ছিল রাজনীতিবিদদের অধিকাংশের এবং সাহিত্যসেবীদের অনেকের। এই কারণেই তখনকার সাহিত্যসেবীদের একশ্রেণীর মধ্যে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, দেশ ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু ভাষা ভাগ হয় নাই। মনে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির লেখায় আমরা তখন পড়েছিলাম : 'বাঙলা দেশ ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু বাঙলা ভাষা একই রয়েছে।' এটা যারা বলতে পেরেছিলেন তারা যে পাকিস্তানকে একটা রাজনৈতিক ভাগাভাগি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন নাই, তা স্বতঃই বোঝা যায়। কিন্তু বৃহত্তর দেশবাসী জানে, পাকিস্তানের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রই ছিল না, রাজনীতির সাথে জাতি, দেশ, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত স্বাতন্ত্রও এর মূলে সক্রিয় ছিল।

তখনকার এক সাহিত্য-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে আমি বলেছিলাম 'পলাশীর বিপর্যয়ে জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ার ফলে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গৌরবময় ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের শিক্ষানীতির গণতান্ত্রিক ও অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা। আমরা ভুল পথে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এইসব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে সত্যকার পথের সন্ধান। জাতির চিত্তলোক ফুঁড়ে উত্থিত হয়েছে পাকিস্তানের বাণী। এক মুহূর্তে জাতি স্বস্থতা ফিরে পেয়েছে। পরাণুকরণের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে।'

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান লীগ সরকারের ভূমিকা খুব সুচারু ছিল না, সে-কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার কারণ হয়ত প্রধানতঃ উপরতলার রাজনৈতিক চাপ, আর কিছুটা এখানকারই একশ্রেণীর লীগনেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মানসিক বিভ্রান্তি, দুর্বলতা ও সুবিধাবাদিতা। কারণ যাই হোক, এই আন্দোলনের ফলে তখনকার লীগসরকার জনপ্রিয়তা একেবারে হারিয়ে ফেলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর পক্ষে ইন্ধন যোগানোর লোকেরও অভাব তখন ছিল না। ক্ষমতা ও গদীলোভী কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তো ছিলেনই, তার উপরে পাকিস্তান আন্দোলনকে যারা গভীরভাবে বুঝতে পারেন নাই বা বুঝতে চেষ্টা করেন নাই, তারাও এর মূলে ইন্ধন যোগানোর সুযোগ ত্যাগ করলেন না। ফলে লীগ সরকার-বিদ্বেষ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। ক্রমে সরকারবিদ্বেষ এমন চরমে পৌছল যে সোজাসুজিভাবে মুসলিম লীগ-বিদ্বেষেই তা পরিণতি লাভ করল। সরকার-বিদ্বেষ একেবারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান-বিদ্বেষে পরিণত হল।

এটা ছিল নয়ারাষ্ট্র পাকিস্তান ও পাকিস্তানী জাতির পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। যে প্রতিষ্ঠান নয়া রাষ্ট্রের পত্তন সম্ভব করেছে, তার পক্ষে এত অল্পদিনে জনপ্রিয়তা হারিয়ে বসা নয়া জাতি ও শিশু-রাষ্ট্রের পক্ষে

একটি গুরুতর দুর্লক্ষণ বইকি। অতীতে কোনো নয়ারাষ্ট্রেই এমনটি দেখা যায় নাই। নবীন তুরস্কে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতা কামালের দল ও প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর জনপ্রিয়তা হারায় নাই। লেনিনের কম্যুনিষ্ট পার্টি এখনো সোভিয়েট রাশিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে-এমন কি, ভারতের কংগ্রেস দল এই সেদিন পর্যন্তও দীর্ঘ কুড়ি বৎসর জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই পাকিস্তানের পত্তনকারী মুসলিম লীগ ভাগ্যচক্রে জনপ্রিয়তা একেবারে হারিয়ে ফেলল। তার ফলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা কতটা চরমে পৌছেছিল, সে দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস এখন সর্বজনবিদিত।

সে-সময় অনেক পূর্ব-পাকিস্তানী জনসাধারণের এই বিশৃঙ্খল মনোভাব ও আচরণকে তাদের রাজনীতি-সচেনতা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিল। পশ্চিম-পাকিস্তানী জনসাধারণের চাইতে পূর্ব-পাকিস্তানী জনসাধারণ যে অধিকতর রাজনীতিসচেতন, এ বিশৃঙ্খল আচরণ নাকি তারই প্রকাশ, এ ধরণের প্রচারণার বাহুল্য তখন দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আমি কখনো এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারি নাই। আমার মনে হয়েছিল, রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতারই এ আরেক রূপ এবং রাজনীতি-সচেতনতা নয়, বরং হুজুগপ্রিয়তাই এর মূলে সক্রিয়॥"[২৬]

০২.

"... ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হই। বর্তমান শহীদ মিনার এলাকায় আমাদের ছাত্রাবাস ছিল। জগন্নাথ হলের মিলনায়তন তখন প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে জড় হইত এবং মিছিল করিয়া রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই শ্লোগান দিয়া প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হইত এবং পুলিশের সাথে প্রায় সংঘর্ষ হইত। আমি প্রায় মিছিলে শরীক হইতাম। মাঝে মাঝে টিয়ার গ্যাসে চোখ জ্বালা করিত এবং দৌড়াইয়া চোখ ধুইতাম। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবি কোন রাজনৈতিক দলের দাবি ছিল না। কারণ তখন মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল কোন মেনিফেস্টো দিয়া মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মাঠে নামে নাই। এই দাবি ছিল সর্বস্তরের ছাত্রদের। কিছু কিছু সাধারণ মানুষ ছাত্রদের সাথে মিছিলে যোগ দিত কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল নগন্য।

রাষ্ট্র ভাষার দাবির মিছিলে পুলিশ অনেককে লাঠি দিয়া পিটাইত এবং ধরিয়া নিয়া যাইত। জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকজন আইনজীবী ছাত্রদের মামলা তদবির করিতেন। এই মামলাগুলি বিনা পারিশ্রমিকে করিতেন।

... একুশে ফেব্রুয়ারী বলিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আমরা বুঝিয়া থাকি। আসলে একুশে ফেব্রুয়ারী শুধু একুশ তারিখই নহে। একুশ তারিখ হইতে শুরু করিয়া তিন-চার দিন ধরিয়া যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, সব মিলিয়াই একুশে ফেব্রুয়ারী ঘটনা।

একুশে ফেব্রুয়ারী সকাল হইতে ছাত্ররা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে জমা হইতে থাকে। এখান হইতে মিছিল করিয়া জগন্নাথ হলে অবস্থিত প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে যাইয়া বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা মর্যাদার দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই সময় আর্মড পুলিশ প্রাদেশিক পরিষদের চারিদিকে অবস্থান নেয়। আমি তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীর বেলা ২ ঘটিকা হইতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত আমার জরুরী বিভাগে ডিউটি ছিল। আমি ডিউটিতে যাইবার সাথে সাথে পুলিশের সহিত মিছিলকারীদের সংঘর্ষ বাধে। মিছিলকারীরা আগাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে পুলিশ বাধা দেয়। কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে এবং পরে রাইফেলের গুলি ছোঁড়ে। সংগে সংগে কিছু ছাত্র জখম নিয়া জরুরী বিভাগে আসে

[২৬] আবুল কালাম শামসুদ্দীন/অতীত দিনের স্মৃতি ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮। পৃ. ৩২৯-৩৩৯]

এবং কয়েক জন ছাত্র রোগী বহনকারী স্ট্রেচার নিতে আসে। মোঃ রফিককে মৃত অবস্থায় প্রথম নিয়া আসে। তাহার কপালের মাঝ দিয়া একটি বুলেট বিদ্ধ হইয়া মাথার পিছন দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহার মাথার খুলি মগজসহ মাটিতে পরিয়া যায়। শুকনা ঘাস এবং মাটি ভরা মগজ মাথার খুলিতে রাখা অবস্থায় রফিকের লাশের পাশে স্ট্রেচারে করিয়া আনা হয়। আবুল বরকতকে দ্বিতীয় জখম ব্যক্তি হিসাবে স্ট্রেচারে করিয়া আনা হয়। একটি বুলেট তাহার বাম দিকের উরু ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ফলে তাহার বাম দিকের ফিমোরেল রক্তনালী দুইটি ফাটিয়া সজোরে রক্তপাত হইতে থাকে। প্রেসার ব্যান্ডেজ লাগাইয়া রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। সংগে সংগে অপারেশন থিয়েটারে পাঠানো হয়। সার্জারির প্রফেসার মেজর এলিনসন এফ,আর,সি,এস, বরকতের বাম পা কাটিয়া ফেলেন। কয়েক বোতল রক্ত দেওয়া হয় কিন্তু বরকত শেষ রাত্রে মারা যায়। অপারেশনের পর বরকতের জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। আবদুস সালামকে তৃতীয় জখম রোগী হিসাবে গ্রহণ করি। তাহার বামদিকের পেটের উপরে একটি গুলি বিদ্ধ হয়, তাহার এসপ্লিন জখম হয়। তাহাকে অপারেশন করেন ক্লিনিক্যাল সার্জারির প্রফেসার নোভাক সাহেব। এসপ্লেনেকটমি করা হয়। সালাম একমাস পর মারা যায়। এলিনসন সাহেব ইংরেজ ছিলেন এবং নোভাক সাহেব জার্মান ছিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা শহীদ মিনার তৈয়ারের কাজে লাগিয়া যায়। সেই জায়গায় শহীদ মিনারের তৈয়ার-এর কাজ শুরু হয় যে জায়গায় এই তিন যুবক গুলিবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই জায়গাটি ছিল ১২ নম্বর ব্যারাকের ৬ নম্বর কামরার দক্ষিণে এবং হোস্টেলের পূর্ব দিকের গেটের উত্তরে। মেডিক্যাল কলেজের বর্হিবিভাগে কিছু কাজ হইতে ছিল। ঠিকাদারের ইট, বালি এবং সিমেন্টের গুদাম নিকটেই ছিল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা কয়েকজন লেবারের সাহায্যে রাত ভরিয়া কাজ করে এবং সকালে শহীদ মিনার তৈয়ার সমাপ্ত করে। এখানে বলা প্রয়োজন মোঃ রফিক অছাত্র ছিল এবং তাহার বয়স প্রায় ২২-২৩ বছর ছিল। আবুল বরকত এম. এ. ক্লাশের ছাত্র ছিল এবং বয়স ২৩-২৪ বছর ছিল। আবদুস সালাম অছাত্র ছিল এবং বয়স প্রায় ২৪ বছর ছিল।

শহীদ মিনার তৈয়ারের সাথে মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্র নেতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তাহাদের মধ্যে ভি, পি, গোলাম মাওলা, প্রাক্তন জি, এস, ইঞ্জিনিয়ার সরফুদ্দিন, জি, এস, আবুল হাসেম, আলীম চৌধুরী, মোঃ জাহেদ, মোঃ রফিক এবং আরো অনেকে। গোলাম মাওলা সাহেব ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র এবং এম, এস, সি পাশ ছিলেন। ডাক্তারি পাশ করিয়া মাদারিপুর হইতে আওয়ামী লীগের টিকেটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং কিছু দিন পর হঠাৎ মারা যান। সরফুদ্দিন সাহেব একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ১৯৪৩-৪৭ পর্যন্ত রেলওয়ের লোকোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়া পাশ করেন এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম লগ্নে সৈয়দপুর ওয়ার্কসপে পোস্টিং হয়। সেখানে উর্দু ভাষীদের সাথে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর বিরোধে চাকুরী ছাড়িয়া ১৯৪৮ সালে আমাদের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। পাশ করিয়া প্রথমে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন এবং দেড়-দুই বছর পর মিলিটারীতে যোগদান করেন। চাকুরী করিতে থাকেন এবং প্রাইভেট পড়িয়া ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ করেন। ১৯৭০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি,এস,সি পাশ করেন। আবার ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এল, বি পাশ করেন। তিনি কর্নেল পদবী পর্যন্ত লাভ করেন। আর্মি মেডিক্যাল কোরে চাকুরী শেষ করিয়া লিবিয়া সরকারের অধীনে কয়েক বছর সেখানকার হাসপাতালে চাকুরী করেন। লিবিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি শুরু করেন। বর্তমানে এডভোকেট হিসাবে প্র্যাকটিস করিতেছেন। আলীম চৌধুরী আমাদের সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তীতে চক্ষুবিশেষজ্ঞ হিসাবে প্র্যাকটিস করিতেন। পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের কয়েকদিন আগে ডাঃ আলীম চৌধুরী অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে শহীদ হন।

শহীদ মিনার প্রায় ১৪-১৫ ফুট উঁচু ছিল। প্রায় ছয় বর্গফুট মেঝে ছিল এবং সেইটা দেড়-দুই ফুট উঁচু ছিল। সেই মেঝে হইতে একটি কলাম প্রায় চার বর্গফুট হইতে আস্তে আস্তে উপরের দিকে সরু হইয়া উঠে এবং প্রায় দেড় দুই বর্গফুট ব্যাসার্ধে যাইয়া শেষ হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল হইতে লোকজন শহীদ মিনার দেখিতে আসে। অনেকে শহীদ মিনারের মেঝেতে টাকা-পয়সা দিতে থাকে। এমনি একজন ২০/২২ বছরের মহিলা অশ্রুভরা চোখে কোলে এক শিশুকে নিয়া আসিয়াছিল এবং নিজের গলার হার খুলিয়া বেদীর উপর রাখিয়া গেল। সেই দিন ঢাকার সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বাঙ্গালী কর্মচারীরা অফিস এবং আদালত হইতে মিছিল করিয়া বাহির হইয়া আসে। মিছিলের ঢল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে আসিয়া শেষ হয়। বেলা এগারটার সময় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা হয়। সেই জানাজায় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং আরো অনেক সরকার বিরোধী নেতা ছিলেন।

গায়েবানা জানাযা শেষ করিয়া ছাত্র জনতা মিছিল করিয়া প্রাদেশিক সচিবালয়ের দিকে যাইতে থাকে। পুরাতন হাই কোর্টের নিকট পৌছিলে পুলিশ বাধা দেয়। লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস এবং পরে গুলি ছোঁড়া হয়। হাই কোর্টের চৌরাস্তায় পুলিশের গুলিতে হাইকোর্টের কেরানী সফিকুর রহমান মারা যান। আমি সফিকুর রহমানের মরদেহ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে দেখিয়াছি। ফর্সা এবং সুগঠন শরীরের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন তাহার স্ত্রী প্রথম অন্তঃসত্তা ছিলেন। সেইদিনই দুপুর বেলার নবাবপুরের মানসী হলের সম্মুখে স্কুলের ছাত্রদের একটি মিছিলের উপর টহল মিলিটারী গাড়ী হইতে গুলি ছোঁড়া হয়। সেই জায়গায় সফিউল্লা নামে ১০-১২ বয়সের একটি ছাত্র গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যায়। তাহার লাশ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে দেখিয়াছি। বুকের পকেটে তাহার নিজ হাতে আঁকা প্রজাপতি সম্বলিত এক টুকরা কাগজ ছিল। সেই দিন ঢাকায় সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। রেডিও অফিস উর্দু ভাষীদের দ্বারা রেকর্ডের সাহায্যে চলিতে ছিল। মিলিটারী বিভিন্ন জায়গায় টহল দিতে থাকে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ভোর চারটার সময় আমরা ৮-১০ জন ছাত্র (দুই জন, দুইজন করিয়া) প্রত্যেককে একটি করিয়া সাইকেল নিয়া কারফিউকে অবজ্ঞা করিয়া শাহবাগ হইয়া ফার্মগেটের দিকে যাই এবং কৃষি কলেজের ফার্মের ভিতর দিয়া (বর্তমান মানিক মিয়া এভেনিউ) মিরপুর রোডে পৌছি। এই ছাত্রদলে আমিসহ মুন্সিগঞ্জের কাজী শাহজাহান হাফিজ এবং হামিদুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ফরিদুল হুদা এবং আরো ৩-৪ জন ছিল। উদ্দেশ্য ছিল রেডিও কর্মচারীদের বাধা প্রদান করা। যাহাতে মিরপুর যাইয়া ট্রান্সমিটার না খুলিতে পারে। কিছুক্ষণ পর একটি গাড়ী ঢাকা হইতে আসে। আমরা আগেই সাইকেলগুলি রাস্তার উপর রাখিয়াছিলাম। গাড়ী আসার সাথে সাথে তাহাদেরকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহারা ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক ছিল আমরা তাহাদের গাড়ীর চাকা ছিদ্র করিতে উদ্যত হওয়ায় তাহারা সবেগে গাড়ী চালাইয়া ঢাকার দিকে ফিরিয়া যায়। আমরা প্রায় এক ঘন্টার মত সেখানে ছিলাম। তাহারা নিশ্চয় আর্মড গার্ড লইয়া আসিবে এই ভাবিয়া ফিরিয়া আসি। সেই দিন ঢাকা রেডিও দেড় ঘন্টা পর শুরু হয়।

সেই দিন বিকালে পুলিশ এবং মিলিটারী শহীদ মিনার এলাকা ঘেরাও করে এবং মোটা দড়ির সাহায্যে টানিয়া শহীদ মিনার ভাংগিয়া ফেলে। নীচের অংশ টুকরা টুকরা করিয়া ভাংগিয়া ফেলে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমিন সাহেব। শহীদ মিনারকে ভাংগিয়া সেই সময়ের শাসকরা বাঙ্গালী জাতিকে অমর একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের সুযোগ করিয়া দিল॥"[২৭]

---

[২৭] ডা: মেজর (অব:) আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহফুজ হোসেন/আমার জীবনের সত্তর বছর ॥ [সেবা পাবলিশার্স - ডিসেম্বর, ১৯৯২ । পৃ. ২১-২৯]

০৩.
এলিস কমিশন রিপোর্ট

[ঢাকাস্থ হাইকোর্ট অব জুডিকেচারের মাননীয় বিচারপতি থমাস হোবার্ট এলিস কর্তৃক প্রণীত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন (সংক্ষেপিত)]

পূর্ববঙ্গ সরকার

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগ

প্রস্তাব (Resolution)

নং-২১৪৮ পিএল, ৩ জুন, ১৯৫২

"পঠিত যে, সরকারি প্রজ্ঞাপন নং-৯৪৩-পিএল, ১৩ মার্চ, ১৯৫২-এর মাধ্যমে এই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে, সেই বিষয়ে মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত ঢাকা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি কর্তৃক তদন্ত হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে,

১) পুলিশের গুলি করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল কি না; এবং

২) পরিস্থিতির বিবেচনায় পুলিশের শক্তি প্রয়োগ করা যথার্থ ছিল কি না।

পঠিত যে, ১৯৫২ সালের ২৭ মে তারিখ সংবলিত প্রতিবেদনটি পেশ করেছেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্বাচিত এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত মাননীয় বিচারপতি জনাব টি. এইচ. এলিস। পূর্ব বাংলার সরকার তদন্তকারী বিচারপতি কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য থেকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে,

১) পুলিশের গুলি করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল; এবং

২) পরিস্থিতির বিবেচনায় পুলিশের শক্তি প্রয়োগ করা যথার্থ ছিল।

এই মর্মে আদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, এই প্রস্তাবের একটি কপি তদন্তকারী মাননীয় বিচারপতি টি. এইচ. এলিসকে অবহিত করার জন্য পাঠাতে হবে। আরও আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই প্রতিবেদনের একটি কপিসহ প্রস্তাবটির এক কপি অবহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিভাগের কমিশনার এবং পূর্ববঙ্গ পুলিশের মহাপরিচালককে পাঠাতে হবে। অধিকতর আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতিবেদনসহ প্রস্তাবটি "ঢাকা গেজেটে"র একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে।

আজিজ আহমেদ
মুখ্যসচিব

প্রেরক
মাননীয় বিচারপতি জনাব এলিস,
হাইকোর্ট অব জুডিকেচার
ঢাকা।

প্রাপক
মুখ্যসচিব
পূর্ববঙ্গ সরকার,
ঢাকা।
তারিখ, ঢাকা, ২৭ মে, ১৯৫২

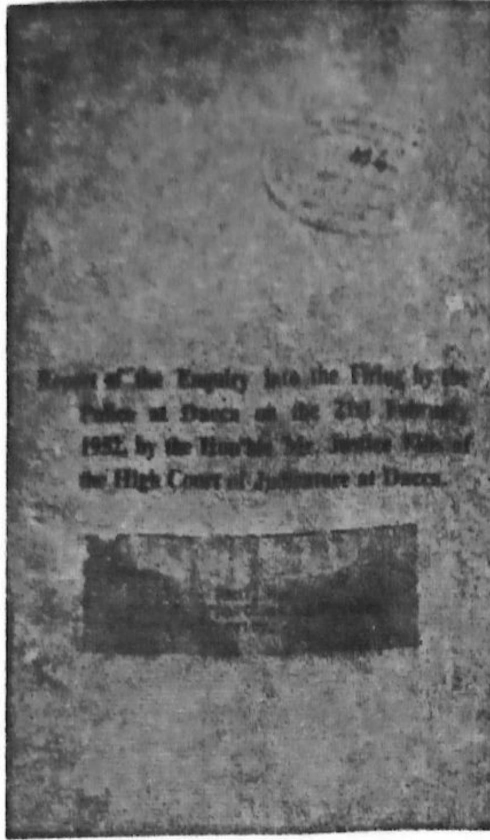
জনাব, আমি এই মর্মে ১৯৫২ সালের ১৩ মার্চ জারিকৃত ও ১৯৫২ সালের ১৩ মার্চের বিশেষ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত ৯৪৩ পিএল নং প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের বিষয়ে আমার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করছি।

আপনার অতি অনুগত সেবক হিসেবে সম্মানিত

টি. এইচ. এলিস

১৩ মার্চ ১৯৫২ তারিখের ৯৪৩ পিএল নং প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-তে ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের বিষয়ে ঢাকা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি জনাব এলিসের তদন্ত প্রতিবেদন (সংক্ষেপিত)।

"৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' (All-party Committee of Action) নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পূর্ব বাংলায় উত্তেজনা সৃষ্টি করা। এই কমিটি এই আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে বলে দাবি করে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি একটি বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এবং তারা একই দিন সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলও একই দিনে একটি মিটিং আয়োজন করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে আশঙ্কা করেন যে, শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের বিকাল ৫টায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব অনুমতি ছাড়া সারা শহরে মিছিল, বিক্ষোভ এবং ৫ জন বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেন। সারা শহরে ঢোল পিটিয়ে আদেশটি প্রচার করা হয়। একটি প্রচার গাড়ি সহযোগে সারা শহরে মাইক্রোফোনের সাহায্যে এটি প্রচার করা হয় এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে এর অনুলিপি দেওয়া হয়। যেকোনো ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সকাল ৭.৩০টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সকালে এক ঘণ্টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণকক্ষ ও বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনে খবর আসে যে দোকানপাট বন্ধ করে, যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্ত করে ট্যাক্সি, রিকশা ও ভাড়াটে গাড়ি থেকে যাত্রীদেরকে নামিয়ে হরতাল কার্যকর করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সারা দিন ধরে পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পুলিশ বিকাল ৩টা ২০ মিনিটের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেইটে সরাসরি গুলি বর্ষণ করে। যার ফলে একজন ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং তিনজন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরে মারা যায়। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আবুল বরকত নামে একজন ছাত্র ছিল।


Report of the Enquiry into the Firing by the Police at Dacca on the 21st February 1952, by the Hon'ble Mr. Justice Ellis of the High Court of Judicature at Dacca.

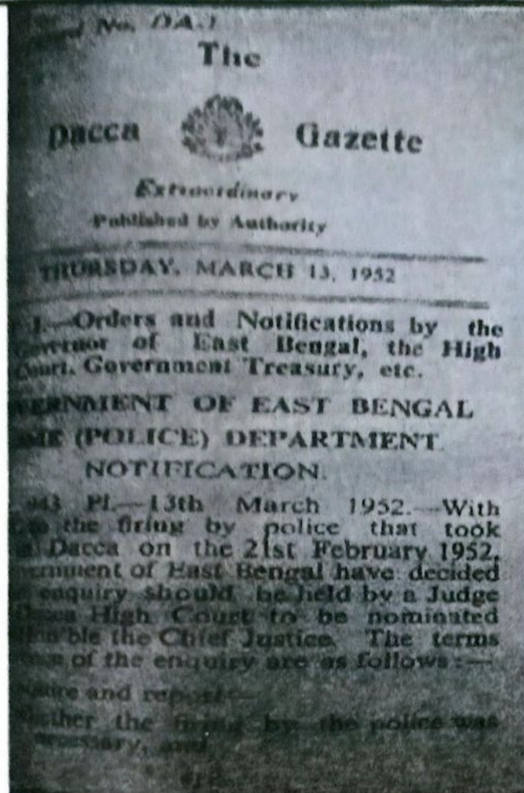
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে বিশেষভাবে বাঁধাইকৃত এলিস কমিশন রিপোর্টের একটি গেজেট কপি। সেই কপির প্রচ্ছদ-প্রতিলিপি। প্রচ্ছদের উপরে সাঁটানো নোট থেকে ধারণা করা যায় যে, এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন রিডার আহমদ হাসান দানীর কাছে পাঠানো হয়েছিল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে।

ছবি সূত্র : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ঢাকা



কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত
বিচারপতি টমাস থমাস হোবার্ট
(টি.এইচ.) এলিস

ছবি সূত্র : *Waqar A. Khan, Dhaka Club Chronicles, Dhaka Club Ltd., 2009*



No. DA-1

The

Dacca Gazette

Extraordinary

Published by Authority

THURSDAY, MARCH 13, 1952

I.—Orders and Notifications by the Governor of East Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL

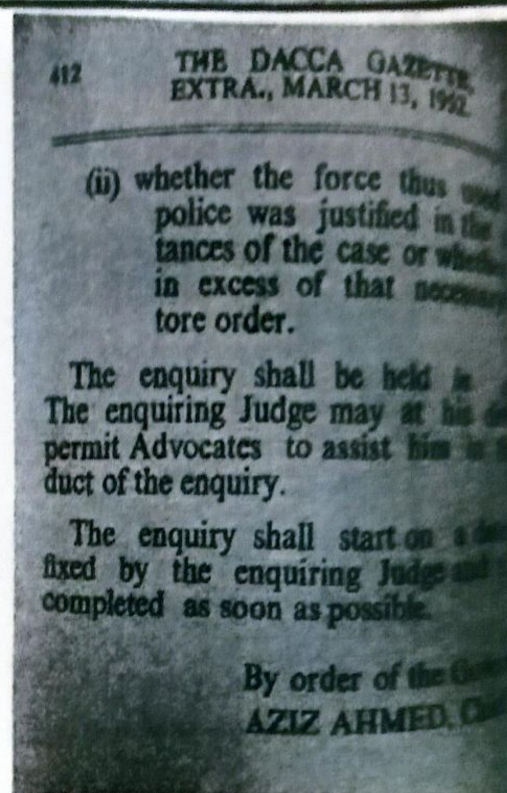
HOME (POLICE) DEPARTMENT

NOTIFICATION.

943 Pl.—13th March 1952.—With regard to the firing by police that took place at Dacca on the 21st February 1952, Government of East Bengal have decided that an enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court to be nominated by the Hon'ble the Chief Justice. The terms of reference of the enquiry are as follows:—

To enquire and report—

(i) whether the firing by the police was necessary, and



412 THE DACCA GAZETTE, EXTRA., MARCH 13, 1952

(ii) whether the force thus used by the police was justified in the circumstances of the case or whether it was in excess of that necessary to restore order.

The enquiry shall be held in ... The enquiring Judge may at his discretion permit Advocates to assist him in the conduct of the enquiry.

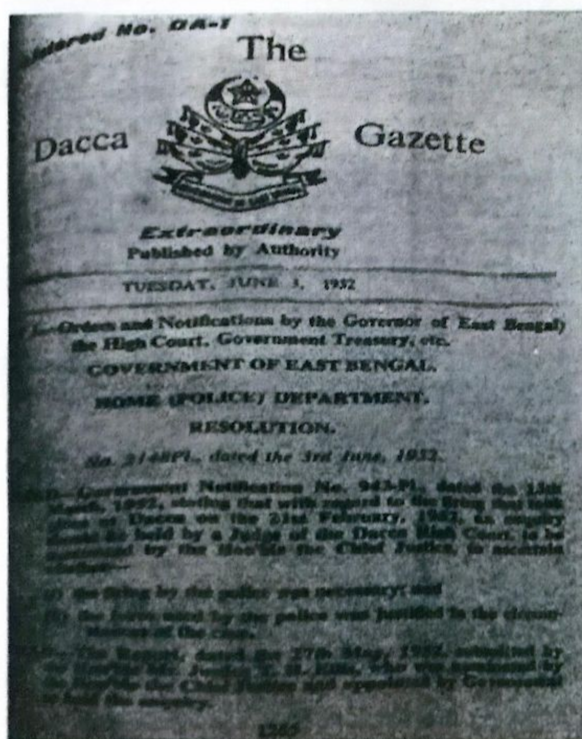
The enquiry shall start on a date to be fixed by the enquiring Judge and shall be completed as soon as possible.

By order of the Governor,

AZIZ AHMED, Chief Secretary.

১৩ মার্চ ১৯৫২ বিশেষ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণ বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের আদেশ

ছবি সূত্র : বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, ঢাকা



Registered No. DA-1

The

Dacca Gazette

Extraordinary

Published by Authority

TUESDAY, JUNE 3, 1952

I.—Orders and Notifications by the Governor of East Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF EAST BENGAL.

HOME (POLICE) DEPARTMENT.

RESOLUTION.

No. 2148Pl., dated the 3rd June, 1952.

Government Notification No. 943-Pl., dated the 13th March, 1952, stating that with regard to the firing that took place at Dacca on the 21st February, 1952, an enquiry should be held by a Judge of the Dacca High Court, to be nominated by the Hon'ble the Chief Justice, to ascertain whether—

(i) the firing by the police was necessary; and

(ii) the force used by the police was justified in the circumstances of the case.

The Report, dated the 27th May, 1952, submitted by the Hon'ble Mr. Justice T. H. Ellis, who was nominated by the Hon'ble the Chief Justice and appointed by Government to hold the enquiry.

1365

৩ জুন ১৯৫২ বিশেষ ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত এলিস কমিশন রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠা

ছবি সূত্র : বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, ঢাকা

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণ সম্পর্কিত ঘটনাবলির ব্যাপারে যাদের কিছু বলার আছে, নোটিশের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে লিখিত বিবৃতি আহ্বান করা হয়। আমি সর্বমোট ২৮টি বিবৃতি পাই। তার মধ্যে ১টি ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি সংক্রান্ত, যা আমার তদন্তের আওতাবহির্ভূত এবং ফলে তা বিবেচনা করা হয়নি। এর মধ্যে ১১ জন বিবৃতি পাঠিয়েছেন যাদের কাছে ঐদিন পুলিশের গুলিবর্ষণ ন্যায়সংগত মনে হয়নি। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে দুটি বিবৃতি আসে। তারা স্মারকলিপির মাধ্যমে এই মর্মে তাদের নিজ নিজ দলের অবস্থান ঘোষণা করেন যে, তারা তদন্তে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন, এবং তারা এর পরিধি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ছাত্র এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি অজ্ঞাতনামা বিবৃতি আসে। এতে অভিযোগ করা হয়ে যে, যে সকল ছাত্রনেতা ও জননেতা আন্দোলনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন তারা জেলে বন্দি আছেন। ফলে তাদের দ্বারা পুলিশ কর্তৃক গুলি বর্ষণের বিষয়ে কোনো বিবৃতি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ময়মনসিংহের সাইদুল হকের নিকট থেকে একটি বিবৃতি আসে। তিনি তার বিবৃতিটি ছাপানোর জন্য পত্রিকায় পাঠানোর অনুরোধ করেন। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রত্যাশায় ভারাক্রান্ত এই ব্যক্তির এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ আছে এবং তিনি কিছুটা সস্তা ও নিরাপদ জনপ্রিয়তা পেতে উন্মুখ। ২৮ মার্চ ১৯৫২ তারিখ সংবলিত বাংলায় লেখা একটি বিবৃতি পাওয়া যায় মো. আব্দুল মতিন নামক ঢাকা কলেজের এক ছাত্রের কাছ থেকে। কিন্তু পরে ৯ এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখে তিনি ও তাঁর উল্লিখিত সাক্ষীদের পক্ষ থেকে একটি চিঠির মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করে নেন। ৯ এপ্রিল ১৯৫২ সালে একটি বিবৃতি পাঠানো হয় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি জনৈক আক্তারুদ্দীনের কাছ থেকে। যার ঠিকানা ছিল ২৪, এস. এম. হল, ঢাকা। বিবৃতি পাঠানোর সময় শেষ হওয়ার ১দিন পর ১৯৫২ সালের ১ এপ্রিল এটি আমার কাছে পৌছায়। এই বিবৃতির মাধ্যমে একটি বিস্ময়কর বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, বর্ধমান হাউজ থেকে বের হয়ে আসা একটি প্রাইভেট কার থেকে পুলিশের কাছে গুলি করার লিখিত আদেশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এর সঙ্গে তদন্তের সীমাবদ্ধ পরিধি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে একটি চিঠিও ছিল। তাতে আশঙ্কা করা হয়েছে, ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে, কিংবা ইতোমধ্যে অসম্ভব করে তোলা হয়েছে।

বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা পুলিশের গুলিবর্ষণের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দেওয়ান হারুন মো. মুনীরদ্দিন নামক ঢাকার জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্র। তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিজেকে গুলিবর্ষণের সরাসরি সাক্ষী হিসেবে দাবি করেছেন। ১৯৫২ সালের ২১ মার্চ তিনি একটি বিবৃতি দাখিল করেন। সেখানে তিনি আরও ৫ জন সাক্ষীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু দুদিন পর ২৩ মার্চ ১৯৫২ তারিখে তিনি আরেকটি বিবৃতি দাখিল করেন যা আগের চেয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু বক্তব্যের দিক থেকে লক্ষণীয়ভাবে আগেরটার মতোই যেখানে তিনি আরও ১৭ জন সাক্ষীর নাম যুক্ত করেন।

১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের অরাজকতার শিকার হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১৬টি বিবৃতি পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ছিলেন বাসের কন্ডাক্টর, চালক ও রিকশাওয়ালা। তাদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, তদন্তটির একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে - যাদের যানবাহন ভাঙচুর করা হয়েছে, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। গুলিবর্ষণের সমর্থনে প্রধান বিবৃতিটি এসেছে পূর্ব বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে। এ বিবৃতিতে ২১ জন সাক্ষীর নাম যুক্ত করা হয়, যারা তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দেয়ার মতো অবস্থানে ছিলেন।

বিভিন্ন বিবৃতিতে যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, আমি তাদের সকলের বিবৃতি নেয়া জরুরি বলে মনে করি এবং সেই অনুযায়ী তাদের তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের আদেশ কিংবা অনুরোধ জানিয়ে নোটিশ জারি করি। পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা না থাকায় তালিকায় থাকা ৮ জনের কাছে নোটিশ পাঠানো সম্ভব হয়নি। নোটিশ পাওয়া ৭ জন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাজির হননি। তাদের কেউ কেউ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে জবাব দিয়েছেন কিংবা কেউ নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো সাক্ষ্য দেয়ার মতো বক্তব্য তাদের নেই।

১৩ মার্চের সরকারি প্রজ্ঞাপন আমাকে তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে আমার মর্জি অনুযায়ী আইনজীবীদের সহায়তা নেয়ার অনুমোদন দিয়েছে। আমার অনুমতি সাপেক্ষে জনাব হামুদুর রহমান তদন্তে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের পক্ষে হাজিরা দিয়েছেন। অন্য কোনো আইনজীবী হাজিরার অনুমতি প্রার্থনা করেননি। কিংবা অন্য কোনো পক্ষই আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্ব চায়নি। যদিও পূর্ববঙ্গ সরকার একটি বিবৃতি দাখিল করেছিল কিন্তু তারা নিজেদেরকে তদন্তের কোনো পক্ষ বলে বিবেচনা করেনি এবং আইনগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করেনি। যাহোক, আমার অনুরোধক্রমে জনাব সৈয়দ আব্দুল গণি সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত হয়েছেন তদন্তকাজে আমাকে সহায়তা করার জন্য।

গোপন শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল ১৯৫২ সালের ৭ এপ্রিল। কিন্তু কিছু প্রাথমিক আয়োজন সময়মতো সম্পন্ন না হওয়ায় ওই দিন সাক্ষীদের জেরা শুরু করা সম্ভব হয়নি। সাক্ষীদেরকে জেরা করা শুরু হয়েছে মূলত ৮ এপ্রিল।

গুলিবর্ষণ যৌক্তিক ছিল এবং প্রয়োজনের তুলনায় বাড়াবাড়ি ছিল না-পুলিশের এই দাবির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন, এমন সাক্ষীদের জেরা করা হয় ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল অর্থাৎ ৭ দিন। গুলিবর্ষণকে অননুমোদন করে বিবৃতিদানকারী হিসেবে চিহ্নিত সাক্ষীদের জেরাও ৭ দিন, এপ্রিলের ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮ ও ৩০ তারিখ, ধরে চলে। সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর যুক্তিতর্কের জন্য দুদিন সময় দেওয়া হয়। ২ মে জনাব হামুদুর রহমান তার মক্কেলদের পক্ষে মামলাটি উপস্থাপন করেন এবং জনাব আব্দুল গণি তার মামলা লড়েন ৩ মে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাই। গুলিবর্ষণের ঘটনাস্থলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (টপোগ্রাফি) আমার জানা থাকলেও তদন্তসংশ্লিষ্ট ভবন ও সীমানাসমূহের অবস্থান ও আকৃতির ব্যাপারে নিজের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেয়া এবং মেডিকলে কলেজ হোস্টেলে গুলির চিহ্নগুলো স্বচক্ষে দেখার জন্য তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আমি সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করি।

তদন্তে রেকর্ডকৃত সাক্ষীদের বিবৃতিসমূহকে সহজেই ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে আছেন ১ থেকে ২১ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ অফিসিয়াল সাক্ষীগণ এবং ৩৬নং সাক্ষী আশরাফ আলী ওয়াহিদী, মেসার্স জাইদী অ্যান্ড কোং-এর একজন ফটোগ্রাফার, যিনি ঘটনার পরে পুলিশের সহায়তায় কিছু ছবি তুলেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণির সাক্ষীদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন কর্মকর্তা। ৩য় শ্রেণির সাক্ষীদের মধ্যে আছে ১০ জন ছাত্র যাদের মধ্যে ৭ জন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের বাসিন্দা এবং ৩ জন বহিরাগত। চতুর্থ শ্রেণির সাক্ষী, মেডিকেল কলেজ থেকে এসেছেন বলা যায়, তাদের মধ্যে চারজন ডাক্তার। পঞ্চম এবং শেষ শ্রেণির সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন এমন ব্যক্তিগণ, যাদেরকে জনসাধারণ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করাটাই সুবিধাজনক।

সকালের ঘটনাবলি সম্পর্কে পুলিশ সাক্ষীগণ দাবি করেন যে, সেদিনের শুরুই হয় সকাল ৭.৩০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্বাভাবিক যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। পুলিশ আশঙ্কা করে, ২১ ফেব্রুয়ারিতে পূর্বঘোষিত হরতালের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণ্ডগোল হতে পারে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। সকাল ৭.৩০টার মধ্যে পূর্বপ্রস্তুতি অনুযায়ী পুলিশ বাহিনী তাদের অবস্থান নেয়। ঢাকা সিটি ডি.এস.পি. জনাব সিদ্দিক দেওয়ানকে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের দায়িত্ব দেয় হয়। সকাল থেকেই অতিরিক্তি পুলিশ সুপার, সিটি জনাব মাসুদ মাহমুদ টহলে বের হন এবং পুলিশের অস্থায়ী ফাঁড়িগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি দেখতে পান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীরা যান চলাচল বন্ধ করে যাত্রীদের বাস, ট্যাক্সি, রিকশা ও গাড়ি থেকে নেমে যেতে বাধ্য করছে এবং টায়ারের হাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, যাতে পরে সেগুলো আর চলতে না পারে। গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করলে, তাদেরকে নোংরা ভাষায় গালাগাল করা হয়। বিশেষত অতিরিক্ত এস.পি. সিটি শিক্ষার্থীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। ৭.৪৫ টায় পুলিশ সুপার মো. ইদ্রিসের কাছে

খবর আসে যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ভেতরে ও বাইরে এবং মেডিকেল ছাত্রাবাসে প্রচুর শিক্ষার্থী জড়ো হচ্ছে। এবং তারা পূর্বঘোষিত হরতাল কার্যকর করার লক্ষ্যে গাড়িচালকদের থামতে এবং যাত্রীদের নামতে বাধ্য করছে। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট দ্রুত পদক্ষেপে সকাল ৮.১৫ টায় গোলযোগপূর্ণ স্থানে পৌছান এবং দেখতে পান শিক্ষার্থীরা যান চলাচল থামাতে সহিংস আচরণ করছে, যে ব্যাপারে আগেই তাকে রিপোর্ট করা হয়েছিল। এস.পি. যথাসাধ্য চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীদের এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ না হওয়ায় তিনি গোলযোগের আশঙ্কায় নির্দিষ্ট এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করেন। ৯টার সময় তিনি, ডি.এস.পি. সিটি, ১ জন ইন্সপেক্টর, ২ জন প্রধান কনস্টেবল, এস.এ.এফের ২০ জন কনস্টেবল, ইন্সপেক্টর, ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ১ জন সার্জেন্ট, ২ জন প্রধান কনস্টেবল এবং লাঠিসজ্জিত ১৪ জন কনস্টেবল বিশ্ববিদ্যালয় গেইটে অবস্থান নেন। মেডিকেল কলেজ গেটে ১ জন হেড কনস্টেবলসহ ১০ জন এস.এ.এফের কনস্টেবল এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল গেইটে ১ জন প্রধান কনস্টেবলসহ ১০ জন অস্ত্রসজ্জিত কনস্টেবল নিয়ে গঠিত তার বাহিনী অবস্থান নেয়।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অল্প অল্প করে মানুষ জড়ো হতে থাকে। শিক্ষার্থী এবং বহিরাগতরা ছোট ছোট দলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢুকতে থাকে। সকাল ১০টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশাল সংখ্যক মানুষ সমবেত হয় এবং জনসভা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সকাল ১০টার দিকে পরিস্থিতি এতই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কুরাইশীকে খবর পাঠানো হয় এবং দ্রুত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গেইটের দিকে আসেন। ঘটনাস্থলে পৌছে জনাব কুরাইশী দেখতে পান বিশ্ববিদ্যালয় গেইটের ভেতরে-বাইরে বিশাল জমায়েত, যারা পুলিশকে অপদস্থ করছিল এবং গণহারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জনাব কুরাইশী উপাচার্যের ফোনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে পান এবং অনুরোধ করেন তিনি যেন শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলেন তারা যেন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসার কিছুক্ষণের মধ্যে ডক্টর জুবেরী এবং ডক্টর গণিকে নিয়ে উপাচার্য ঘটনাস্থলে পৌছান। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কুরাইশী তাদেরকে অনুরোধ করেন তারা যেন ছাত্রদের বুঝিয়ে বলেন তারা যেন বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধ করে এবং রাজপথে যান চলাচল বাধাগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকে। উপাচার্য যখন ছাত্রদের মুখোমুখি হন, তখন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজারের বেশি। তারা প্রথমেই তাকে আইন লঙ্ঘন করে তাদের সমাবেশে নেতৃত্ব দিতে বলে। তিনি ছাত্রদের প্রস্তাব করেন যে, তারা একটি সভা আয়োজন করতে পারে যেখানে তারা একটি প্রস্তাব পেশ করবে এবং এরপর ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাকে এই সভায় নেতৃত্ব দিতে ও সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করে। তিনি তাতে সম্মত হননি। তবে তিনি বলেন যদি তারা এই নিশ্চয়তা দেয় যে তারা শান্তিপূর্ণ আচরণ করবে এবং সভা শেষে শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে তাহলে তিনি তাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই নিশ্চয়তা কখনোই দেওয়া হয়নি, যদিও কিছু নেতৃস্থানীয় শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। বরং উপাচার্যকে সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয় এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এটি খুবই সুস্পষ্ট ছিল যে শিক্ষার্থীরা কোনো যৌক্তিক পরামর্শ গ্রহণের অবস্থায় ছিল না এবং তারা স্পষ্টভাবে কোডের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী জারিকৃত আদেশ ভঙ্গ করবে বলে মনস্থির করে রেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভাটি শেষ হয় বেলা ১১টার দিকে। ড. জুবেরীর মতে, 'ভয়ানকভাবে উত্তেজিত' শিক্ষার্থীরা তখন বিশ্ববিদ্যালয় গেটের দখল নেয়। উপাচার্য এবং তার দুজন সহকর্মীর মতে, পুলিশের হাতে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ছাত্ররা ৫ জন, ৭ জন অথবা ১০ জনের একেকটি ছোট ব্যাচ করে একই সাথে গেট থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে না পারে। পুলিশ পক্ষের সাক্ষীরা বলেন, তারা ২৫ অথবা ৩০ জনের ব্যাচ করে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, একটি নোটবুক থেকে তালিকা ধরে ধরে ছাত্রদের নাম ডাকা হচ্ছিল এবং তারা গেইটের বাইরে যাচ্ছিল–পরিস্থিতি এমন ছিল তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছিল যে, সভাটি একটি পরিষ্কার ভণিতা

এবং ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সব পূর্বপ্রস্তুতি সেরে রেখেছিল। কারা আইন ভঙ্গ করবে তাদের নাম নির্ধারণ করা ছিল এবং কোন সুনির্দিষ্ট ছাত্র কখন সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করবে এই ক্রমও সাজানো ছিল। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইট দিয়ে বের হলে ছাত্রীদেরকে বাদ দিয়ে পুলিশ তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে এবং কিছু ছাত্র নিজে নিজেই পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়ে। সব মিলিয়ে ৯১ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং ততক্ষণে পুলিশের যানবাহনের ধারণক্ষমতা পূর্ণ হয়ে যায়। পুলিশ আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারছিল না বলে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। পুলিশের এই বিব্রতকর অবস্থা আঁচ করতে পেরে উপস্থিত জনতা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে এবং পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুলিশকে তাদের বাহিনীর পুনর্বিন্যাস করতে হয়। কিছু কনস্টেবলকে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সঙ্গে পাঠাতে হয়েছিল। অ্যাডিশনাল সিটি এসপিকে অ্যাসেম্বলি হাউসে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার নিরাপত্তা বিধান করার জন্য। কারণ, ছাত্ররা অ্যাসেম্বলি হাউসের সামনে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে প্রতিবেদন করা হয়। এবং বিশ্ববিদ্যালয় গেইটে একটি গ্যাস স্কোয়াড মোতায়েন করা হয়। ১ জন ইন্সপেক্টর, ১ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ১ জন হেড কনস্টেবল, ৬ জন এস.এ.এফ.-এর কনস্টেবল, ৪ জন লাঠিসজ্জিত কনস্টেবল এবং ১৬ জন কনস্টেবলের একটি সম্মিলিত গ্যাস স্কোয়াড ছিল। মেডিকেল কলেজ গেইটে শহরের ডিএসপি, ১ জন হেড কনস্টেবল এবং ১০ জন এস.এ.এফ.-এর কনস্টেবল ছিলেন। পরিষদ ভবনের কর্নারে ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি, ৩ জন সার্জেন্ট, একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২ জন হেড কনস্টেবল এবং ১৮ সশস্ত্র কনস্টেবল, ১ জন হেড কনস্টেবল এবং ৪ জন লাঠিসজ্জিত কনস্টেবল এবং ৬ জন কনস্টেবলের সম্মিলিত একটি গ্যাস স্কোয়াড।

১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী ৯১ জনকে গ্রেফতার করার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে পরিষদ ভবনের দিকে মিছিল নিয়ে এগোতে থাকে। এসপি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সতর্ক করে দেন যে, তারা একটি বেআইনি সমাবেশ করছে এবং তারা নিজেরা ছত্রভঙ্গ না হলে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। তারা ছত্রভঙ্গ হয়নি এবং ফলে পুলিশ গ্যাস শেল ও গ্যাস গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য। গ্যাস অ্যাটাকের ফলে ছাত্ররা কিছু সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরক্ষণেই মেডিকেল কলেজ এলাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে, সেক্রেটারিয়েট রোডের উল্টো দিকে জড়ো হয়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সহজেই মেডিকেল কলেজ এলাকায় চলে যেতে পারছিল।

কারণ সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেলের মাঝখানে যে দেয়াল ছিল সেটি ভাঙা ছিল এবং সেজন্য দুই এলাকায় যাতায়াতের জন্য সেক্রেটারিয়েট রোড হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। গ্যাস অ্যাটাক সাময়িকভাবে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, কিন্তু ততক্ষণে অতিরিক্ত সিটি এসপি জনাব মাসুদ মাহমুদ আহত হন, একটি জিপ গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অনবরত পুলিশ ফোর্সের ওপর ইট পাটকেল ছোঁড়া হচ্ছিল। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর বলে বিবেচনা করা হয় যে, সেখানে ঢাকা রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব এ.জেড. ওবায়দুল্লাহর উপস্থিতি কামনা করা হয়। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান বেলা ১টার দিকে। তিনি সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন এবং দেখতে পান যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, মেডিকেল কলেজ এলাকা থেকে শুরু করে প্রায় পরিষদ ভবন পর্যন্ত জায়গাটি জনাকীর্ণ হয়ে রয়েছে। উপস্থিত জনতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের সতর্কবার্তা অবজ্ঞা করে পুলিশের ওপর আক্রমণ জোরদার করে এবং ক্রমাগত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। গ্যাস অ্যাটাকের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়েও সাময়িকভাবে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দিকে–তাদের অভয়ারণ্যে–পিছু হটে এবং আরেকটি নতুন আক্রমণের জন্য সমবেত হয়। মনে হচ্ছিল গোলযোগের কেন্দ্রবিন্দু মেডিকেল কলেজ গেইট এবং সেই অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীকে মেডিকেল কলেজের সামনে

জড়ো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, তখন সেখানে এই ফোর্স নিয়োগ অতীব জরুরি হয়ে পড়েছিল। বেলা ২টা থেকে ২.৩০টার মধ্যে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হয়ে পড়ে এবং পুলিশ সদস্যরা সচিবালয় রোডের পশ্চিম দিকের দোকানগুলোর পিছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আইন পরিষদ সদস্য মৌলভি আওলাদ হোসেন পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং তার গাড়ি মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ডের ভেতরে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, এই মর্মে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে তাকে বাধ্য করা হয়। হুমকির মুখে তাকে এ রকম একটি বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল যে, তিনি লাঠিচার্জ করতে দেখেছেন এবং তার ফলে কয়েকজন ছেলেকে আহত হতে দেখেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ঘটতে দেখেননি। রাত ৯টা পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে বের হতে পারেননি। প্রায় সেই সময়ে সিটি ডিএসপি জনাব মুহাম্মদ সিদ্দিক দেওয়ান জনতার হাতে প্রহৃত হন। এবং ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে যে দুই দফায় মারাত্মকভাবে লাঠিচার্জ করা হয়েছিল তার একটি ছিল তাকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য। পুলিশ বার বার টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড ব্যবহার করছিল কিন্তু এতে কোনো দীর্ঘস্থায়ী ফল হচ্ছিল না। বরং জনতা খুব তাড়াতাড়ি পুলিশের এই পদক্ষেপ সামলে নিচ্ছিল। একজন সাক্ষী যেমন বলেছেন, তারা পুলিশের সাথে 'ইঁদুর-বেড়াল' খেলা খেলছিল, পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ারশেল ও গ্রেনেডগুলো পানি ঢেলে অকেজো করে দিচ্ছিল। তারা পুলিশ ও পথচারীদের উপরে বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে তাদের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

ওই সময় মাননীয় জনাব হাসান আলী এই পথ দিয়ে তার গাড়িতে করে পরিষদের দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকী (এম.এল.এ. এম.সি.এ.)ও তার সঙ্গে একই গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। জনতা গাড়িটি থামিয়ে দেয় এবং টায়ারের বাতাস বের করে দিয়ে তা অকেজো করে দেয়। বাম পাশ দিয়ে একজন, ডান পাশ দিয়ে আরেকজন, দুই যুবক গাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারা চাচ্ছিল মাননীয় মন্ত্রী এবং তার সঙ্গী যেন তাদের সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে যান। এবং এ নিয়ে তারা বেশ জোরাজুরি করছিল। তার সঙ্গী যুবকদের কথামতো গাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে মাননীয় মন্ত্রী এবং তার আর্দালি তাকে গাড়ির ভিতরে টেনে তুলে নেন। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে মনে হয়েছিল এটা তার [সঙ্গী] জন্য বিপজ্জনক হবে। কারণ, তখনও মুহুর্মুহু ইট-পাটকেল উড়ে আসছিল। পুলিশ সদস্যরা মাননীয় মন্ত্রী ও তার সঙ্গীকে একটি পুলিশ ভ্যানে তুলে নেন এবং তাদেরকে পরিষদ ভবনে পৌঁছে দেন। জিপটি যাওয়ার পথে মাথায় একটি ইটের আঘাতে মাননীয় মন্ত্রী আহত হন। ততক্ষণে পুলিশের অনেক সদস্য হতাহত হন। ডিআইজি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং এডিশনাল সিটি এসপি সবাই ইটের আঘাতে আহত হন। অন্য পুলিশ সদস্যরাও আহত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন।

প্রায় বেলা ৩.০০টার পর থেকে পুলিশ বুঝতে পারে, পরিস্থিতি তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। বেলা ৩.০০টার সময় রাস্তায় জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো মারাত্মকভাবে লাঠিচার্জ করে। কিন্তু এই সময়ে লাঠিচার্জের ফলে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, বরং পুলিশ দেখতে পায় বিক্ষোভকারীদের বদলে তাদেরকেই পিছু হটতে হচ্ছে। কারণ, তাদের দিকে বৃষ্টির মতো ছুঁড়ে আসা ইট-পাটকেলের মুখে তারা দাঁড়াতে পারছিলেন না। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তাদের হিসেব অনুযায়ী এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)। এই মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেল দুই দিক থেকে এত দ্রুত এবং বিপজ্জনকভাবে পুলিশের দিকে ধেয়ে আসছিল যে, পুলিশ সদস্যরা তাদের দ্বারা চারপাশ থেকে ঘেরাওকৃত এবং আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডি.আই.জি. এবং এস.পি. এ ব্যাপারে একমত হন যে, পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ যে গুলি করার আদেশ দেওয়া উচিত। শেষ অবলম্বন হিসেবে তারা একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনায় এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের সরাসরি নির্দেশে পুলিশ জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণকারী দলের মধ্যে ৩ জন

হেড কনস্টেবল এবং ৩০ জন কনস্টেবল ছিল, যারা মেডিকেল কলেজ গেইট ও মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের মাঝামাঝি বর্গাকারে অবস্থান নেয়। ৫ জনের প্রতিটি গ্রুপের পুলিশ সদস্যরা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ও বিশ্ববিদ্যালয় মাঠের মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে তাদের অবস্থান নেয়। বাকি সদস্যরা উত্তর-পূর্ব দিকে মুখোমুখি হয়ে অবস্থান নেয়। তাদের অবস্থান সম্বন্ধে ডিআইজি এবং এসপির বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু যেহেতু এসপি প্রকৃত কমান্ডে ছিলেন, তার বর্ণনা অধিকতর সঠিক হওয়ার কথা। অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা এবং এসপি নিজেও এই বর্গের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন। এসপি দুই গ্রুপের সদস্যদের এক রাউন্ড করে গুলি করার আদেশ দেন এবং তারা তাই করেন। বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকের বিক্ষোভকারীরা পিছু হটে যায়। কিন্তু মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকের বিক্ষোভকারীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেও পুনরায় ইট-পাটকেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসে। আর তখনই এসপি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে অবস্থিত পুলিশ সদস্যদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো গুলি করার নির্দেশ দেন। এই দিককার বিক্ষোভকারীরা যখন পিছু হটতে শুরু করে, তখনই পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট গুলি বন্ধ করার আদেশ দেন। গুলিবর্ষণ শেষে গোলাবারুদ চেক করা হয় এবং দেখা যায় সব মিলিয়ে ২৭ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল। ৫ রাউন্ড বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের দিকে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে এবং বাকি ২২ রাউন্ড মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল। গুলিবর্ষণের সময় বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের কোণার কাছে একটা লোক তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেহেতু বিক্ষোভকারীরা তখনো খুবই উত্তেজিত এবং সহিংস ছিল, তাই পুলিশের পক্ষে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় গুলি বর্ষণের ফলে ৯ জন হতাহত হয়েছিল, যার মধ্যে ৩ জন ছাত্র এবং বাকি ৬ জন বহিরাগত। রাত ৮টার দিকে হাসপাতালে ২ জন মারা যায়, যার মধ্যে ১ জন ছিল ছাত্র, এবং আহত আরেকজন তদন্তকালীন সময়ে মারা যান। এমনকি গুলিবর্ষণ শুরু করার পরেও বিক্ষোভকারীরা ইট-পাটকেল ছোঁড়া বন্ধ করেনি। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল কম্পাউন্ডে ১টি মাইক্রোফোন লাগানো হয় এবং তার মাধ্যমে সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে বিষোদগারপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের উত্তেজনা তুঙ্গে রাখার লক্ষ্যে রক্তমাখা জামাগুলো প্রদর্শন করা হয়। এবং বিকেল ৪.৩০টা বা ৫.০০টার সময় পরিষদ ভবন অভিমুখে বিক্ষোভকারীদের আরেকটি জমায়েত ঠেকাতে পুলিশকে আরেকবার লাঠিচার্জ করতে হয়।

গুবির্ষণের দায়ভার অবশ্যই তিন পদস্থ কর্মকর্তা—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের ওপর বর্তায়। এ ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে, যে সমস্ত কনস্টেবল গুলি করেছিল তদন্তে তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে জেরা করা হয়নি। যদি ঘটনা এমন হতো যে আত্মরক্ষার জন্য তারা কোনো আদেশ ছাড়াই বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি করেছে, তাহলে যেসব কনস্টেবল গুলি করেছে তাদের আত্মরক্ষার অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করা যৌক্তিক ছিল কি না, তা নির্ণয় করার জন্য তাদের সবাইকে জেরা করার প্রয়োজন হতো। যা-ই হোক, এই প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, এটা সুস্পষ্ট যে, কনস্টেবলরা আদেশ পেয়েই গুলি করেছিল। কিন্তু এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো যে কর্মকর্তা গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে তা ন্যায্য ছিল কি না?

২৮ নং সাক্ষী (জনাব মোহাম্মদ কামাল এম.এ.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষী। তিনি এই ঘটনার একমাত্র নিরপেক্ষ সাক্ষী, যিনি পুলিশের গুলিবর্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন। পুলিশ গুলি করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তিনি ঘটনাস্থলে পৌছান। এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে হাইকোর্টে ছিলেন। পরিষদ ভবনে জনৈক মৌলভি নজিবুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ২.৩০টায় হাইকোর্ট ত্যাগ করেন। তিনি ফুলার রোড দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তর-পশ্চিমে পাম্পিং স্টেশনের নিকটে এসে বিক্ষোভকারী দলের মধ্যে পড়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একদল বিক্ষোভকারী সংগঠিত হচ্ছিল। তার মতে, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজারের কাছাকাছি। তারা স্লোগান দিচ্ছিল

আর পুলিশের দিকে ইট পাটকেল ছুঁড়ছিল। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছিল। টিয়ার গ্যাস কিছুক্ষণের জন্য কার্যকর ছিল এবং বিক্ষোভকারীদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ শুরু করে। সাক্ষী আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি ফুলার রোডে তার পূর্বের অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, বিক্ষোভকারীদের ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হওয়া তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল। তিনি প্রকৃতপক্ষে পুলিশের গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন এবং পাম্পিং স্টেশনের কাছে এক ব্যক্তিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হতে দেখেন। এসব দেখে এই সাক্ষী দ্রুত দৌড়াতে শুরু করেন এবং নাজিমউদ্দীন রোড ধরে পালিয়ে বাঁচেন। তিনি হচ্ছেন দুইজন নন-অফিসিয়াল সাক্ষীদের একজন যারা সুনির্দিষ্টভাবে গুলিবর্ষণের ব্যাপারে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তিনি পাম্পিং স্টেশন থেকে ১০০ গজ দূরে বিক্ষোভকারীদেও পেছনে ছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অনুমান সঠিক নয়। তিনি সম্ভবত স্টেশন থেকে ১০০ ফুট দূরত্বের কথা বলতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তার গন্তব্য স্থান পরিষদ ভবনে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। যেমনটি তিনি ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেন। যে, তিনি রাস্তা পার হতে ভয় পাচ্ছিলেন। তার মনে হয়েছে, তাতে তার জীবন হুমকির মুখে পড়বে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি পুলিশ কিংবা বিক্ষোভকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। তার চোখের সামনেই পুলিশের গুলিতে পাম্পিং স্টেশনের পাশে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয় একজন। বেলা ৩.০০টার দিকে মেডিকেল কলেজ গেটের পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে পুলিশ সাক্ষীদের বর্ণনার সমর্থনে জনাব হামুদুর রহমান এই সাক্ষীর বিবৃতির ওপর নির্ভর করেন। পুলিশের প্রতি কোনো রকম বাধ্যবাধকতাহীন একজন নিরপেক্ষ ভদ্রলোক হিসেবে তখনকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য মূল্যবান।

যে সকল সাক্ষী পুলিশের গুলিবর্ষণের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন, তাদের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। এসব বিবৃতির অধিকাংশ তদন্তের উদ্দেশ্য সাধনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে না। এটা সুস্পষ্ট যে, সব ধরনের অস্বস্তিকর ঘটনা ও পরিস্থিতি অস্বীকার করার ব্যাপারেই তারা সচেষ্ট ছিলেন। জনাব হামুদুর রহমান উল্লেখ করেন, তদন্তে তারা যেসব বিবৃতি দিয়েছেন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের সড়ক, মেডিকেল কলেজের গেটে যেসব ঘটনা ঘটেছে সযত্নে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার অভ্যন্তরে–যেটাকে তারা পুলিশের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা মনে করেন–ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারেও তারা একই রকম বিবৃতি প্রদান করেন। পুলিশের গুলিবর্ষণ বন্ধ হওয়ার পর চত্বরের ভেতর মাইক্রোফোন স্থাপন এবং সেগুলো থেকে সেই এলাকায় উত্তেজনামূলক বক্তব্য প্রচার–এসব বিষয়ও তারা এড়িয়ে গেছেন। ড. গণি বলেছেন, ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিজেদের স্বার্থে কম্পাউন্ডের বাইরে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং গেটের অভ্যন্তরে কী ঘটেছে, তার মধ্যেই বিবৃতি সীমাবদ্ধ রাখাই মঙ্গলজনক হবে বলে মনে করেছে তারা। এই অবস্থানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনাব হামুদুর রহমান বলেন, এসব বিবৃতির ওপর নির্ভর করা যায় না। ছাত্ররা যদি রাস্তায় সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ করতে এড়িয়ে যায় এবং সেদিনের সমাবেশে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাদের উপস্থিতি অস্বীকার করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের বক্তব্য পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুত্ববহ সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না। একজন সাক্ষী যখন তার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সত্য গোপন করে, তখন তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

সাধারণ মানুষ যে সকল বিবৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে দেওয়ান হারুন মো. মুনীরউদ্দিনের (৬৪ নং সাক্ষী) বক্তব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একমাত্র সাক্ষী যিনি প্রকৃতপক্ষে গুলি করতে দেখেছেন বলে দাবি করেছেন। এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি জগন্নাথ কলেজের একজন ছাত্র। এবং তিনি স্বীকার করেন যে, সরকারি প্রজ্ঞাপনের জবাবে তিনি দুটি বিবৃতি দাখিল করেছেন। প্রথম বিবৃতিটি তিনি এই বলে শুরু করেন, তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সকাল ১০.৩০টায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসেন। সমবেত ছাত্রদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এম.এল.এ. এবং এম.সি.এ.দের তাদের দাবির কথা জানানো। তার মানে, তিনি একটি বিবৃতিতে স্বীকার করেন যে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয়

বিবৃতিতে তার অবস্থান ছিল এ রকম—"দেওয়ান হারুন মো. মুনীরদ্দিন ২৩-০৩-১৯৫২ ঢাকার জগন্নাথ কলেজের একজন ছাত্র, যিনি গুলিবর্ষণের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। যখন তদন্ত কমিটির সামনে আসেন তখন তিনি তার সুর পরিবর্তন করেন। এবং বলেন যে, তিনি সেদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি বরং চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহিঃবিভাগে যান। এবং ছাত্রদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ বিষয়ক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত তার লিখিত বিবৃতি অস্বীকার করেন। তার উল্লিখিত সাক্ষীদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি গোলাগুলি সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না, সে ব্যাপারে তাদের সাথে কোনোকিছু আলোচনা করেননি এবং তিনি এই মর্মে এদেরকে সাক্ষী হিসেবে পরিগণিত করেন যে তারা ভালো সাক্ষী হতে পারে।" এই ভিত্তিতে তিনি জনাব ফজলুল হক এবং জনাব শামসুদ্দিন এমনকি গোলাগুলির দিন চাঁদপুরে থাকা মতিউল ইসলাম (সাক্ষী নং ৫৬) এবং নোয়াখালীতে থাকা নূর মোহাম্মদকে (সাক্ষী নং ৫৭) যুক্ত করেন। এই সাক্ষীর দেওয়া সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি সত্যিই পুলিশকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ভিতর ঢুকতে, হোস্টেলের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার অবস্থান নিতে এবং সেখান থেকে হোস্টেল চত্বরে গুলিবর্ষণ করতে দেখেছেন। যার ফলশ্রুতিতে কোনো একটি হোস্টেলের বারান্দায় একজন লুটিয়ে পড়েন এবং ৭-৮ জন আহত হন।

গুলিবর্ষণের ব্যাপারে এটা আরও একবার দাবি করা হয় যে, যে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনায় মূল আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন একজন স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ঐ ঘটনার মাত্র এক দিন আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এটা সত্য যে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কিন্তু, তদন্তের মাধ্যমে আমাদের কাছে এটা কোনোভাবেই প্রতীয়মান হয় না যে, জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তার মতিভ্রম হয়েছিল। অথবা তিনি ডিআইজি এবং এসপি কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসপির ব্যাপারে এটা বলা হচ্ছে যে, বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল এবং উপর্যুপরি ইট-পাটকেলের মুখে উত্তেজিত হয়ে তিনি গুলিবর্ষণ করেছেন। কিন্তু তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন, তার সামনে উন্মুক্ত দুটি বিকল্প ব্যবস্থার কোনটিই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তার মুখোমুখি অবস্থানরত জনতার দিকে প্রচুর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছেন কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। তিনি সর্বশেষ যে চূড়ান্ত লাঠিচার্জ করেছেন, তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি হয় তার বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে মাঠটি বিক্ষোভকারীদের দখলে ছেড়ে দিতে পারতেন যাদের ঘোষিত লক্ষ্যই ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা, অথবা তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তার বাহিনীকে আক্রান্ত হতে দেখতেন। কিন্তু একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে দুটি বিকল্পের কোনোটিই তিনি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ ছিল তার প্রমাণ শুধু ডি.এম., ডি.আই.জি., এস.পি., ডি.এস.পি. ইট-পাটকেলে আহত হয়েছেন তা নয়, বরং বেলা ৩.২০ নাগাদ নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সর্বমোট ৬০ সদস্যের মধ্যে ২৪ জনই আহত হয়ে পড়েন। ওই পরিস্থিতিতে পুলিশ সুপার যদি বিক্ষুব্ধ জনতার কাছে তার বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য গুলি করার আদেশ দিয়ে থাকেন, তবে আমি মনে করি না যে, এটি দৃশ্যত একতরফা তদন্তে উঠে আসা প্রায় অপরীক্ষিত বিবৃতিগুলোর ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, গুলিবর্ষণ করার ব্যাপারে তার অবস্থান যৌক্তিক ছিল না।

আমাকে এখন দেখতে হবে গুলিবর্ষণ বাড়াবাড়ি ছিল কিনা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথমে পুলিশ দুই পাশে অবস্থান নিয়েছিল এবং প্রত্যেক স্কোয়াড এক রাউন্ড করে গুলি করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের পাশে একজন ব্যক্তি নিহত হয় এবং অবিলম্বে সেখানকার হৈহুল্লোড় থেমে যায়। অন্যদিকের উত্তেজনা, অর্থাৎ, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের পাশের বিক্ষোভটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয় কিন্তু, আবার তারা সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং পুলিশের দিকে তারা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। তাই জনতার সেই অংশের ওপর পুলিশ দ্বিতীয়বারের মতো গুলিবর্ষণ করে। রেজিস্টার খাতার তথ্য থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সব মিলিয়ে ২৭ রাউন্ড গুলি করা হয়েছিল এবং ঐ ২৭ রাউন্ড গুলির কারণে

৯ জন হতাহত হয়, যাদের মধ্যে ৪ জন নিহত হয়—এসব বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করেছে। হতাহতের সংখ্যার সাথে কয় রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে তা মিলিয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, বাড়াবাড়ি রকম শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। গুলিবর্ষণ ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং কার্যকর।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেজিস্টার দেখে আমি নিজে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছি যে, তদন্তে আমার সামনে যা উপস্থাপন করা হয়েছে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে হতাহতের সংখ্যা ঠিক তা-ই। এটা সত্য যে, রেজিস্টারে দেখা গিয়েছে যে, টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে, লাঠিচার্জ খেয়ে কিংবা মাটিতে পড়ে গিয়ে একটা বড় সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়েছেন। কিন্তু পুলিশ বেশি পরিমাণে গ্যাস গ্রেনেড ও শেল নিক্ষেপ করেছে এবং দুবার চূড়ান্ত লাঠিচার্জ করেছে—এসব মাথায় রাখলে তা অপ্রত্যাশিত মনে হবে না।

আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ না করে এই তদন্ত শেষ করতে পারছি না যে, আমি জানতে পেরেছি, পূর্ববঙ্গের পুলিশ বাহিনী স্টিলের হেলমেট দিয়ে সজ্জিত নয়। তাদের সম্বল অল্পকিছু প্রাচীন এআরপি হেলমেট। এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত একটি বাহিনীকে তাদের অভিযান পরিচালনা করতে হয় কাপড়ের টুপি পরে এবং ইট-পাথর বা অন্য কোনো কিছুর বৃষ্টির মুখে বিপর্যস্ত হতে হয়। অথচ ঢাকায় বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইন ভঙ্গকারীদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। যদি জনাব ইদ্রিসের অধীনস্থ পুলিশ বাহিনী যথার্থভাবে অস্ত্রসজ্জিত থাকতো, এটা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়, তাহলে এই তদন্তের উপলক্ষ কখনোই তৈরি হতো না।

পরিশেষে, তদন্তকালে গৃহীত বিবৃতিগুলো বিবেচনা করে আমাকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে,

(১) পুলিশের পক্ষে গুলি করা অত্যাবশ্যক ছিল;

(২) পরিস্থিতির বিবেচনায় পুলিশ কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ করা যৌক্তিক ছিল।

এটা দুঃখজনক যে, নির্দিষ্ট কিছু সংস্থা ও সংগঠন তদন্তকাজের সীমাবদ্ধতা উল্লেখপূর্বক উক্ত তদন্ত বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি তারা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতেন, তাহলে অফিসিয়াল সাক্ষীদের নিঃসন্দেহে আরও প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং কার্যকর জেরার মুখোমুখি হতে হতো। তাছাড়া পুলিশের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে আরো ওয়াকিবহাল হতে পারলে আরো কার্যকর সওয়াল-জবাব সম্ভব হতো। যা-ই হোক, আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব হামুদুর রহমানের কাছে, যিনি আমাকে যোগ্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং তার মক্কেলদের মামলা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অসাধারণ নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন। ঋণ স্বীকার করছি জনাব আব্দুল গণির কাছে, যিনি ভয়ানক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও শত বাধা-বিপত্তির মুখেও তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হবে হাইকোর্টের সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব এস আর ওসমানী বি.এল.কে, যিনি তদন্তকালে আমার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। স্মরণ করছি ইস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সিনিয়র প্রতিবেদক জনাব মোহব্বত আলীর অকুণ্ঠ কঠোর পরিশ্রম, যিনি তার সহকর্মীদের (মো. লতিফুর রহমান, সৈয়দ বজলুর রহমান, আব্দুস সামাদ, আব্দুল মোহাইমেন এবং ওসমান আলী) নিয়ে সাক্ষীদের বিবৃতিগুলোর প্রতিলিপি তৈরী করার শ্রম ও নিষ্ঠাসাধ্য কাজের পাশাপাশি এই প্রতিবেদন টাইপ করেছেন। স্মরণ করছি সচিবালয় কর্মী জনাব দীন মোহাম্মদ যিনি জনাব এ. আর. ওসমানীকে তদন্ত সংশ্লিষ্ট সাচিবিক কাজে সহযোগিতা করেছেন৷"[২৮]

(টি. এইচ. এলিস)

[২৮] এলিস কমিশন রিপোর্ট (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ : ছাত্রহত্যাকাণ্ড)/সম্পা: রাশেদ রাহম ॥ [বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর - ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। পৃ. ৩৯-৮৪]

দুই
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং শেখ মুজিবুর রহমান

০১.

"... দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আরব দেশের লোকেরা আরবি বলে। পারস্যের লোকেরা ফার্সি বলে, তুরস্কের লোকেরা তুর্কি ভাষা বলে, ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় কথা বলে, মালয়েশিয়ার লোকেরা মালয়া ভাষায় কথা বলে, চীনের মুসলমানরা চীনা ভাষায় কথা বলে। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা বলা চলে। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের কথা বলে ধোঁকা দেওয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পারে নাই। যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই।

এই সময় সরকারদলীয় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুর জন্য জান মাল কোরবানি করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা শেষ 'তাবিজ' নিক্ষেপ করলেন। জিন্নাহকে ভুল বোঝালেন। এরা মনে করলেন, জিন্নাহকে দিয়ে উর্দুর পক্ষে বলাতে পারলেই আর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাবেনা। জিন্নাহকে দলমত নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর যে কোন ন্যায়সঙ্গত কথা মানতে সকলেই বাধ্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কোন পথে, তাঁকে কেউই বলেন নাই বা বলতে সাহস পান নাই।

১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসলে হাজার হাজার লোক তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তেজগাঁ হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় হাজির হয়েছিল। আমার মনে আছে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিন আমরা সকলেই ভিজে গিয়েছিলাম, তবুও ভিজে কাপড় নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছিলাম। জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান এসে ঘোড় দৌড় মাঠে বিরাট সভায় ঘোষণা করলেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' আমরা প্রায় চার পাঁচ শত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সেই সভায়। অনেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল, 'মানি না'। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' - তখন ছাত্ররা তাঁর সামনেই চিৎকার করে বলল, 'না, না, না'। জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন। আমার মনে হয়, এই প্রথম তাঁর মুখের উপরে তাঁর কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে॥"[২৯]

০২.

"... শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়েও এ রকম হয়েছিল। তিনি ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল একথা বলেছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, তার তো সে রকম কোন ভূমিকা ছিল না। থাকলে তিনি অন্তত: রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য থাকতেন, যা তিনি ছিলেন না। তিনি বললেন, সে সময় তিনি তার প্রতিনিধি হিসেবে তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে দিয়েছিলেন। আমি বললাম সেটা কিভাবে সম্ভব। তারা তো তখন ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম কমিটির সদস্য ছিলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং তাজউদ্দীন সাহেব সদস্য ছিলেন তাদের এক সংগঠনের পক্ষ থেকে। তাছাড়া তিনি (মুজিব) তো ঢাকায় রাজনীতি করেননি। করেছেন কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে। ঢাকায় ঐ সময়ে তো তার কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল না। আমি আরও বললাম যে, জিন্নাহ সাহেবের সাথে ছাত্র লীগের নেতাদের যে সাক্ষাৎকার ছিল তাতেও তো তিনি ছিলেন না। এর জবাবেও তিনি একই কথা বলেছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কারণ জিন্নাহ সাহেব তখন পাকিস্তানের এক নম্বর নেতা,

---

[২৯] শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী ॥ [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ৯৮-৯৯]

কায়দে আজম ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তার সাথে সাক্ষাতের জন্য নিজে না গিয়ে অন্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দেওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া তিনি ১৯৬৯ সালে যেভাবে তাজউদ্দীন বা সৈয়দ নজরুল ইসলামকে কোন জায়গায় তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠাতে পারেন ১৯৪৮ সালে তো সেটা সম্ভব ছিল না। আমার কথা শুনে মুজিবর এ নিয়ে আর কথা বাড়াননি। এ বিষয়ে পরে আমি তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বলেছিলাম। তাতে তাদের দুজনেরই বিশেষ করে তাজউদ্দীনের প্রতিক্রিয়া খুব বিরূপ ছিল॥"[৩০]

০৩.

"... ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন। তার আগমনকে কেন্দ্র করে ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সে সময়ে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য একটি ভুখা মিছিল বের করবার উদ্দেশ্যেই এ সভাটি আহূত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সভায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব শামসুল হক, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। সভাশেষে একটি ভুখা মিছিল বের হয় এবং নাজিরা বাজারে রেলওয়ে ক্রসিং-এর কাছে এলে পুলিশ বাধা দেয়। মিছিলটি আবার ফিরে রেলওয়ে স্টেশনের পাশ দিয়ে যখন নবাবপুর রেলক্রসিং-এর দিকে যেতে থাকে সেখানে পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। জনাব শামসুল হকসহ এগারজনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৪ই অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে কারকুনবাড়ী লেনস্থ ইয়ার মোহাম্মদ সাহেবের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। তারপরদিনই জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আনোয়ারা খাতুনের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হওয়ার পরে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

... এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, স্বাধীনতা উত্তরকালে টেলিভিশনে দুটো সাক্ষাৎকারে এ কথাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই নাকি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়েছিল এবং এটিও বলা হয়েছিলো যে, ২০শে ফেব্রুয়ারীর রাতে বঙ্গবন্ধু নাকি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোন এক জানালা দিয়ে এ নির্দেশ দেন। কথাটি আদৌ সত্য নয়। কারণ ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই অনশনরত বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিকেল ৩টার দিকে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। তখন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলে। সুতরাং ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের কোন বাথরুমের গবাক্ষ পথে শেখ মুজিবুর রহমান ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নির্দেশ দিলেন–এটি একটি বানোয়াট গল্প। আমার মনে হয় এ ধরনের গল্প বাজারে ছেড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মান বৃদ্ধি করা যায় না! ১৪৪ ধারা যেদিন ভাঙ্গা হয় তার আগে থেকে তিনি জেলে ছিলেন॥"[৩১] (সাক্ষাৎকার : গাজীউল হক)

০৪.

"... ২১ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, ১৯৭৫। শুনলাম এবার একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য সরকার নির্দেশিত শ্লোগান হচ্ছে নাকি : 'এক নেতা, এক দেশ-বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ'।

শেখ সাহেব ছয় দফা থেকে শুরু করে যে আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে, অবশ্যই তার নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি তার ভূমিকা সম্পর্কে একই কথা বলা যায় না।

---

[৩০] বদরুদ্দীন উমর/আমার জীবন (তৃতীয় খন্ড) ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - জুন, ২০০৯। পৃ. ১২৩]

[৩১] একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ/সম্পা : গবেষণা ও সংকলন বিভাগ ॥ [বাংলা একাডেমী - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০। পৃ. ১৩২/১৮৩]

স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। তবু মনে পড়ছে পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন এলাকা থেকে কাঁদুনে গ্যাস আর পুলিশের লাঠি এড়াতে দেওয়াল টপকে মেডিকেল কলেজে ঢোকার কথা, শহীদদের রক্তাক্ত দেহের কথা। পরদিন মিছিলে পিঠে পুলিশের লাঠির কথা, মিলিটারির হল অবরোধের সময় লিফলেট নিয়ে প্রফেসর পিনল-এর বাসায় আশ্রয় নেওয়ার কথা। আরো কত ঘটনা!

এ সবকিছুই কি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে যা পেয়েছি তার জন্যই ছিল?

মনে-প্রাণে বড় বেশি বাঙালি ছিলাম–সরকারের চাকরিকালেও। সুখী স্বাধীন বাংলাদেশের একটা স্বপ্ন সবসময়ই ছিল। সেই স্বপ্ন ভঙ্গপ্রায়–তাই ব্যথাটাও বড় বেশি॥"[৩২]

০৫.

"... In his prison cell Mujib was able to keep himself abreast generally of developments in the language movement but it was difficult for him to communicate to his supporters outside. Mujib went on hunger strike not only as a gesture of support for the growing language movement but as part of his plan to get into the Medical College Hospital. When he was able to secure his admission there on the recommendation of the friendly prison doctor, it gave him the opportunity to smuggle out slips of paper to his party people with his views on the developing situation. The authorities became aware of this and two days later ordered his transfer to Faridpur Jail by steamer via Narayanganj.

The claim made by some of his adulators that it was Mujib's views communicated through the lavatory window of the hospital with slips of paper which tipped the scales in favour of the decision to disregard Section 144 does not make sense. He was either in transit to or already in Faridpur, when the critical debate on whether to violate Section 144 was taking place in Dhaka and it was not physically possible for him to get in touch with the other student leaders from where he was."[৩৩]

০৬.

"... যা হোক, আমরা আমাদের অনশন ধর্মঘট চালানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। ঐদিন (১১ বা ১২ ফেব্রুয়ারি। ঠিক তারিখটি মনে পড়ছে না) বিকেলেই আমাকে ও শেখ সাহেবকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের কেন জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, সম্ভবত কারাগারের নিচের ও মাঝারি স্তরের কর্মকর্তাগণ তা জানতেন না প্রথমে। সরকার তাড়াহুড়োর মধ্যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিল।

জেলগেটে অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম যে, আমাদের সঙ্গে হয়তো আরো আলোচনা করবেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। না, অন্য এক ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের জিনিসপত্র, স্যুটকেস ইত্যাদি সব এনে জমা করা হলো জেলগেটে। জানানো হলো আমাদের ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হচ্ছে। আমরা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমরণ অনশন ধর্মঘট করলে ঢাকাকেন্দ্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা যে পরিপূরক ভূমিকা রাখতে পারতাম, ফরিদপুর জেলে অনশন ধর্মঘট করে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর ফরিদপুর তখন একটি ছোট জেলা শহর। সেখানে কোনো শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার মতো পরিবেশও নেই, আর ঢাকাকেন্দ্রিক আন্দোলনের নেতারাও ফরিদপুর জেলে আমাদের অনশন ধর্মঘটকে তাদের সংগ্রামের সপক্ষে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন না।

---

[৩২] কাজী ফজলুর রহমান/আশা ও ভগ্নআশার দিনগুলি : দিনলিপি ১৯৭২-৭৫॥ [প্যাপিরাস - ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। পৃ. ১০৮]

[৩৩] S. A. Karim/Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy \ [UPL - 2009| p. 51]

... ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের অনশন ধর্মঘটের সাতদিন পার হয়ে যায়। পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি কোনো এক সময়ে ডেপুটি জেলার কাছে এসে নিচুস্বরে আমাকে ও শেখ সাহেবকে বললেন যে, ঢাকা শহরে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামীদের ওপর গুলি হয়েছে। বহু ছাত্র মারা গেছে এবং সেখানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হচ্ছে। ছাত্র হত্যা ঘটানোর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকায় মিছিল করেছে। আমরা আতঙ্কিত হলাম। আমাদের শঙ্কার কারণ- ঢাকায় ছাত্র মিছিলে গুলিতে অনেকে শহীদ হওয়ায় আন্দোলনের মূলস্রোত এখন সেখানে ভিন্নভাবে পরিচালিত হবে। সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে সেদিকে। আমরা দুজন যে আমরণ অনশন ধর্মঘট করে ভাষা সংগ্রামের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছি তা সবার নজরের বাইরে চলে যাবে, গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। কিছুটা ভগ্নহৃদয়, কিছুটা হতাশা আমাদের দুজনকেই সামান্য দুর্বল করে দিলো। তবে ভেঙে পড়লাম না।

এর পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি আমরা জানতে পারলাম যে, ঢাকা শহরে বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর বাড়িতে-আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। অনেকে আটক হওয়ার ভয়ে পলাতক। এই সংবাদে বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। রাজনৈতিক নেতাদের অনুপস্থিতিতে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে মূল সংগ্রাম যেমন মাঝপথে থেমে যাবার আশঙ্কা রয়েছে তেমনি কারাগারে অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবি আদায়ের জন্য জোরালো চাপ সৃষ্টি করে কিছু একটা অর্জন এবং একটা সুবিধাজনক সময়ে অনশন প্রত্যাহার করার সম্মানজনক পন্থা আমাদের হাতের মুঠোয় আর থাকবে না। কিছুটা দিশেহারা আমি, তবুও মনোবল অটুট রাখার চেষ্টা চালালাম।

... একটানা আট দিনের অনশনের ফলে আমার ও শেখ সাহেবের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। কারা কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত — আমাদের প্রাণ বাঁচে কি বাঁচে না। অন্যদিকে একুশে ফেব্রুয়ারির ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে জেলা শহরগুলোতে পর্যন্ত হরতাল পালিত হচ্ছে। কোথাও সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নেই। ২৩ কিংবা ২৪ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের সিভিল সার্জন প্রাদেশিক রাজধানীতে বড় কর্তাদের কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠালেন - 'শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।' সেই দিনই ঢাকা থেকে খবর এলো যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ শেখ সাহেবকে অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করানোর কোনো প্রচেষ্টাই নিলেন না, আমাকেও নয়। কেবল একটা হাসপাতাল স্ট্রেচার এনে তাতে শুইয়ে শেখ সাহেবকে জেল গেটে নিয়ে যাবার আয়োজন করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তখন বিছানা থেকে নড়তেও পারছিলেন না। অতিকষ্টে তিনি আমার বিছানা পর্যন্ত এলেন, এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মুখ রেখে কেঁদে ফেললেন: এতোদিনে আমি তার অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠেছিলাম॥"[৩৪]

০৭.

"... শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী কারামুক্তি পেলেন। কিন্তু ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে ঢাকায় এলেন না নেতৃত্ব দিতে। বিদ্রোহের অনলেও ঝাপ দিলেন না। এমন কি খুনি শাসক নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে ৫ই মার্চ দেশব্যাপী যে হরতালের ডাক দেওয়া হয় শেখ মুজিব তাতে অংশগ্রহণ করে মারমুখো জনতাকে নেতৃত্ব দিতে ঢাকায় আসেন নাই। তারপরও মুখপোড়া আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় দালাল চামচারা বলে ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবর নাকি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। ধিক তাদেরকে॥"[৩৫]

---

[৩৪] মহিউদ্দীন আহমেদ/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০২। পৃ. ১৭৩-১৭৪/১৮১-১৮২]

[৩৫] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে '৭৫ [বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি - অক্টোবর, ২০১২ (পঞ্চম সংস্করণ)। পৃ. ১৪৭]

০৮.

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতকরণ ও তার নায়কেরা

[১৯৯৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী কোলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় এই নিবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।]

"... ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ছিল এক অবিস্মরণীয় গণজাগরণ, গণআন্দোলন এবং অভ্যুত্থানের মাস। ১৯৫৩ সাল থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারী এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পালিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৭২ সাল থেকেই এখানে শুরু হয়েছে, অন্য এক প্রক্রিয়া, যার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পরিণত হয়েছে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবসায়ী এবং মতলববাজ বুদ্ধিজীবীদের বাণিজ্যিক উৎসবে। এ জন্যেই আমরা যারা পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের বিস্তারিত তথ্যের সাথে পরিচিত, যারা তথাকথিত ভাষা সৈনিক না হলেও ভাষা আন্দোলনকে নিজেদের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি, তাদের জন্য এই বাণিজ্য উৎসব, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিস্ময়কর না হলেও, যথেষ্ট পীড়াদায়ক।

এই পীড়ন গত কয়েক বছর ধরে বেশী মাত্রায় চলছে এবং নিয়মিতভাবে এর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় 'এ মাসে ভাষা সৈনিক ও রাজবন্দিদের সম্মেলন' শীর্ষক এক খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে যে, 'মহান ভাষা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য' সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পকলা একাডেমীতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসনী, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ ২১ জন ব্যক্তিত্বকে জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য' এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের আহ্বায়কদের মধ্যে দুই একজন আছেন একুশে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের সময় যাঁদের একটা প্রান্তিক ভূমিকা ছিল। কিন্তু সেই প্রান্তিক ভূমিকা তাঁদের নির্লজ্জ এবং অবাধ আত্মপ্রচারণা এবং প্রধান প্রচার মাধ্যমগুলি কর্তৃক তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে এই প্রচারকে এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত ব্যাপারে দাঁড় করানোর ফলে, এই সব মিথ্যার অবাধ পরিমাণগত বৃদ্ধি মিথ্যার গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে অপরিচিত লোকদের কাছে, বিশেষতঃ নতুন প্রজন্মের কাছে, উপস্থিত করছে এমন এক পরম সত্য হিসেবে, যা সাধারণভাবে মূল্যহীন তাই নয়, অনেক দিক থেকে রীতিমতো বিপজ্জনক।

এ তো গেল বর্তমান 'ভাষা-সৈনিক' নামে আত্মপ্রচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের কথা। এবার আসা যেতে পারে 'ভাষা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য' যাদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের কথা বলা হয়েছে তাঁদের প্রসঙ্গে। যে তিনজনের নাম এব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁদরে মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য অবশ্যই স্মরণযোগ্য। কিন্তু অন্য দুইজন অন্য কারণে স্মরণযোগ্য হলেও ভাষা আন্দোলনে 'অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য' স্মরণযোগ্য, একথা ঠিক নয়।

প্রথমত: মওলানা ভাসানীর কথা। ঢাকার বার লাইব্রেরীতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠনের জন্য ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫২ তারিখে যে সভা হয় তাতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু এই সভাপতিত্বের পর তাঁকে আর আন্দোলনে দেখা যায় নি। ২০শে ফেব্রুয়ারী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০-৪৭) আবুল হাসিম। এ কারণে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে গ্রেফতার করে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত সিলেট ও ঢাকা জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

১৩ই মার্চ মওলানা ভাসানীর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় এবং ১০ এপ্রিল তিনি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পন করেন। এই ভূমিকার কারণে ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর

'অবিস্মরণীয় অবদানের' কথা বলার অর্থ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে মূর্খতা অথবা নির্ভেজাল রাজনৈতিক মতলববাজী।

এখানে আবার বলা দরকার যে, ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর অবদান ৩১শে জানুয়ারীর সভায় সভাপতিত্ব করার বেশি কিছু না হলেও, এ দেশের রাজনীতিতে তাঁর অন্য অবদান ও ভূমিকার জন্য তিনি অবশ্যই স্মরণীয়। এ দুই বিষয়কে গুলিয়ে ফেলার মধ্যে কোন ইতিহাস জ্ঞান অথবা সত্যনিষ্ঠা নেই।

শেখ মুজিবর রহমানের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে কার্যতঃ তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে তৎকালীন খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। সেই সভায় ভাসানী ছাড়া শেখ মুজিবর রহমানসহ আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

জনসভায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তারপর মিছির বের হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ মওলানা ভাসানী, তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। এইভাবে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার হয়ে শেখ মুজিব ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী, যে সময়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকারীদেরকে বিপুল সংখ্যায় গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'র অনেক সদস্য আত্মগোপন করে আছেন। এই পরিস্থিতিতে জেল থেকে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি লাভ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে তাঁরও কোন ভূমিকা ছিল না এবং আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মুক্তি দেওয়াটা সরকার নিজেদের জন্য অসুবিধাজনক বা বিপজ্জনক কিছুই মনে করেনি।

কিন্তু শেখ মুজিবের কোন ভূমিকা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ দল এবং তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সেই আন্দোলনের নেতা, এমনকি মূল নেতা হিসেবে আখ্যায়িত ও প্রচার করে আসছে। এবং তাদের সেই প্রচার এখন এক ভয়ঙ্কর কুৎসিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ওপরে তাঁর 'অবিস্মরণীয় অবদানের' জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের কথা যেভাবে বলা হয়েছে তার মধ্যেই এই কুৎসিত মিথ্যার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

এই মিথ্যা যে শুধু অন্যেরাই প্রচার করেছে তাই নয়। ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক টেলিভিশন প্রোগ্রামে তিনি নিজেই একথা বলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা টেলিভিশনে শুনি এবং আমার লেখায় তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু মিথ্যার বাহবা ধ্বনি এই প্রতিবাদের দ্বারা স্তব্ধ হওয়ার কোন অবস্থা তখন ছিল না, এখনো নেই।

এ প্রসঙ্গে শেখের বক্তব্য ছিল এই যে, ভাষা আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। সেইভাবে হাসপাতালে থাকার সময় সেখানকার পায়খানার জানালা থেকে কাগজের চিরকুট ছুঁড়ে ছুঁড়ে তিনি ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান এবং সে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন নূরুল আমিন সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয় কীভাবে? যিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পায়খানার গবাক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাঁকে কীভাবে সেই সংকটজনক সময়ে সরকার মুক্তি প্রদান করলো? এ রাজনৈতিক মারফতী বা আধ্যাত্মবাদের মহিমা বোঝা আমাদের মতো ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের কর্ম নয়।

দ্বিতীয়তঃ সে সময় শেখ মুজিব নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগারদের মধ্যে একজন হলেও আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন ভাসানী, শামসুল হক, নারায়ণগঞ্জের ওসমান আলীসহ অন্য নেতারাও ছিলেন এবং শেখের

এমন অবস্থা ছিল না যাতে তিনি তৎকালে ওই রকম এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। বস্তুতঃপক্ষে সে সময়ে আওয়ামী লীগের নিজেরই তেমন কোনও রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ছিল না। সে কারণে আওয়ামী লীগের কোন মুখ্য তো নয়ই, এমনকি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও যে সে আন্দোলনে ছিল এমন বলা চলে না, যদিও তাদের মুসলিম ছাত্র লীগের বিভিন্ন স্তরের কিছু কর্মী ও নেতা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সব থেকে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলীর। এ কারণে তাঁর ও তাঁর সমগ্র পরিবারের ওপর যে নির্যাতন হয়েছিল সেটা অন্য কারও উপর হয়নি।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধা রাত্রের 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'র বৈঠকে তাদের প্রকাশ্য প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ২১শে তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধীতা করে। তাদের দিক থেকে সে সময় এই বিরোধীতার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। ১৯৪৮-৫০ সালে রণদিবে লাইনের হঠকারিতা এবং তার পরিণতিতে পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপুল ক্ষতির কথা মনে রেখে স্বভাবত কোনও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া ওই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তাদের কৃতিত্ব ছিল এই যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রেরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল সে পরিস্থিতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তারা সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আন্দোলনের সমর্থনে তখন কমিউনিস্ট পার্টী গোপনে সব থেকে অধিকসংখ্যক লিফলেট ছেপে প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্রকর্মী হিসেবে হাসান হাফিজুর রহমান যথেষ্ট কাজ করেন। সেই লিফলেটগুলি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত [আমার দ্বারা সম্পাদিত 'ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপা হয়েছে।]

কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 'যুবলীগই সে সময় সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যদিও একথা বলা যাবে না যে, তৎকালীন আন্দোলন কোনও একটি সংগঠন অথবা কোনও একজন নেতার পরিচালনাধীন বা নেতৃত্বাধীন ছিল। কিছু সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তখনকার ভাষা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার দিকটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য, তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী। একথা বলার অর্থ, সেই আন্দোলনে সব কিছু ছাড়িয়ে জনগণের ভূমিকা শহর থেকে গ্রামঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাঙলার জনগণই ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক। [এ কারণেই আমি নিজে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' তাঁদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেছি]

'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' সাংগঠনিকভাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার কারণেই সেই সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের সক্রিয়তা ছিল সব থেকে বেশী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যুবলীগের দুই সহ-সভাপতি মহম্মদ তোয়াহা ও নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা, সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, দুই যুগ্ম সম্পাদক ইমাদুল্লাহ ও মহম্মদ সুলতান প্রভৃতি। পাবনার আবদুল মতিনের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার যদি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে একজনের নাম করতে হয় তাহলে তিনি হলেন, অলি আহাদ। বর্তমানে তাঁর নাম এখন সব থেকে গুরুত্বূর্ণ 'ভাষা সৈনিক' হিসেবে কেউ করে না। কিন্তু একজনের বর্তমান অবস্থা দেখে তার অতীত ভূমিকার বিচার কোনও যোগ্য ঐতিহাসিক এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি করবেন না।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাকে যে চিঠি দেন সেই চিঠির লিখিত বক্তব্য থেকে আমি একটা অংশ উদ্বৃত করছি। চিঠিটি তিনি আমাকে লিখেছিলেন অলি আহাদ তাঁর এক রাজনৈতিক আত্মজীবনীমূলক বইয়ে তাঁর সম্পর্কে একটি ব্যাপারে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করার পর প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে। তিনি তাতে লেখেন, "জেল থেকে বেরিয়ে অলি আহাদ আমাকে বলেন যে, গোলাম মাহবুবের কথায় তাঁর আমার সম্পর্কে সন্দেহ হয়েছিল এবং এই মিথ্যে সন্দেহের জন্য তিনি আমার কাছে মাফও চান। এখন শুনছি,

তাঁর স্মৃতিকথায় আমার সম্পর্কে একটা বক্রোক্তি আছে। অলি আহাদদের পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্পর্কে আমার তীব্র বিরাগ থাকলেও ভাষা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বের জন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। প্রকাশ্যে তাঁর নাম বহু সভায় বলেছি - যখন তাঁর কথা ভুলে সবাই শেখ মুজিবের নাম বলছিলেন।"

আনিসুজ্জামান শেখ মুজিবের প্রতি 'শত্রুভাবাপন্ন' নন। শেখ মুজিব বরং তাঁর একজন শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আনিসুজ্জামানের এই বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়, অলি আহাদ ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রাহ্য ভূমিকা কার ছিল। কাজেই শেখ মুজিবর রহমান পরবর্তী সময়ে এদেশের রাজনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই তিনি মাতৃজঠর থেকেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'পূর্ব বাঙলা স্বাধীন করো' বলে কোন হুঙ্কার ছাড়েননি। কিন্তু এই হুঙ্কারই এখন তাঁর দলের লোকজন এবং তাঁদের সমর্থক এবং অনুগৃহীত বুদ্ধিজীবীর দল ছাড়ছেন। এই কাণ্ডকারখানার তুফানে এ ক্ষেত্রে যা কিছু সত্য সবই খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গল্পে পার্শ্ববর্তী দুই গ্রামের মাষ্টারদের বিদ্যার লড়াইয়ের কথা। মিথ্যা ঢাক-ঢোল, কাড়ানাকাড়া কীভাবে মিথ্যাকে সাধারণ অশিক্ষিত অথবা তথ্য সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেটাই হল, সেই গল্পের মর্মার্থ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় দুই গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের বৌদ্ধিক ও বিদ্যাগত দুরাবস্থার যে কাহিনী সেখানে বর্ণনা করেছেন তার থেকেও করুণ দুরাবস্থা আজ সারা বিশ্বের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে সব থেকে গৌরবোজ্জ্বল ভূখণ্ড এই বাঙলার জনগণের।"[৩৬] (লেখাটি লেখক সম্পাদিত মাসিক 'সংস্কৃতি' সপ্তম বর্ষ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৮ প্রকাশিত)

তিন

রাষ্ট্রভাষা এবং আন্দোলন প্রসঙ্গে

০১.

"... বস্তুতঃ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা ভারতীয় মুসলিম সমাজ উর্দু বনাম হিন্দির প্রশ্নে বরাবর উর্দুর পক্ষে ওকালতি করে এসেছিলেন। আমাদের দেশের মক্তব-মাদ্রাসায় ও ওয়াজ-মহফিলে উর্দুর বেশ প্রচলন ছিল। কোন কোন সময় বইয়ে লেখা হত, সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ভাষা উর্দু। ভারতীয় মুসলমান সমাজের যখন নিজস্ব 'ওতন' বা বাসভূমি হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল, তখন স্বাভাবিকভাবে নেতাদের মনে হয়েছিল 'কওমী জবান' উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে জিন্নাহ সাহেবের একরোখা মন্তব্যের একটা যৌক্তিকতা ছিল বই কি! জিন্নাহ সাহেব বা নাজিমুদ্দিন কেউই ভাল উর্দু বলতে পারতেন না। তাঁদের চেয়ে এদেশের অনেক মাওলানা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভাল উর্দু বলতে পারতেন। পূর্ব-বাংলায় সহস্রাধিক মক্তব-মাদ্রাসার বহু মৌলভী মওলানা ও তালবে এলেম উর্দু ভাষায় মোটামুটিভাবে পারদর্শিতা লাভ করেন। পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে বাংলা ভাষার কোন চলই ছিল না। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অনেক সময় তাদের পশ্চিমা সমকক্ষদের সঙ্গে ইংরেজির চেয়ে ভাঙ্গা উর্দুতে কথা বলতে স্বস্তি বোধ করতে দেখা যেত। এমন অবস্থায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা করা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক ব্যবধানের ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ হিসাবে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার ভূমিকায় উর্দুর একটা স্থান হয়ত ছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি।

বস্তুতঃ বঙ্গপ্রদেশের ভোটেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব নিলেন পশ্চিমা মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং দেশপ্রেমের একমাত্র দাবিদার সাজলেন অধিকারীর বেশে। রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনা

---

[৩৬] বদরুদ্দীন উমর/নির্বাচিত প্রবন্ধ ॥ [অন্যপ্রকাশ - ফেব্রুয়ারী, ২০০০। পৃ. ১৯৮ - ২০২]

ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার সৃষ্টিকর্তা যেন তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। বিত্তবান ও প্রভাবশালী পশ্চিমা নেতৃত্বকে কেমন যেন সহজে মেনে নিল পূর্বাঞ্চলের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। এমনিতেই, এদেশে সে পশ্চিমা ব্রাহ্মণই হোক বা মওলানাই হোক তার কদর বেশী। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের মুরুব্বিয়ানার সামনে পূর্ব-বাংলার নেতৃবৃন্দের হীনমন্যতায় তরুণ ছাত্রসমাজ হল অত্যন্ত মর্মাহত। পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ কথাবার্তায় ও আচরণে এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে, এদেশের মুসলমান সত্যিকারের মুসলমান নয়, এখনকার মানুষ কোনদিন স্বাধীন ছিল না, এরা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, হিন্দুদের কাছ থেকে সবক নেয় এবং তাদের কথায় উঠে বসে। পূর্ব-বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন চরিত্রহনন চলতে থাকল। কাজে কর্মে মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের কথা ফাঁকা ও অসার শোনাল। এক সময় এদেশের একজন গভর্ণর মালিক ফিরোজ খান নূন এক চরম অসৌজন্যমূলক উক্তি করে বসলেন, 'এদেশের মুসলমানদের নাম হিন্দুর মত, এদেশের মুসলমানরা মুসলমানী করে না।' তরুণ পূর্ববাংলার সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন দেখা গেল নেতৃস্থানীয় কোন নেতা পশ্চিমা মুরুব্বিয়ানার তেমন কোন প্রতিবাদ করলো না। আমাদের নেতৃবৃন্দ জানলেন না কখন তারা হারিয়ে ফেলেছেন দেশের যুব সমাজের আস্থা।

রাজনৈতিক উৎপীড়ন বা অর্থনৈতিক শোষণের তাৎপর্য মানুষকে বোঝাতে হয়। সময় লাগে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু মানুষের আত্মমর্যাদা যখন আহত, তখন সে বিক্ষুব্ধ হয় সহজেই। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত এদেশের যুব সমাজের অমর্যাদা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এক নিদারুণ আঘাত হিসাবে দেখা দেয়। ক্ষোভ, আবেগ, বুদ্ধি ও যুক্তির একত্র সমাবেশে দুর্বার হল সেই আন্দোলন। একটা ঔপনিবেশিক নিপীড়নের অবস্থার সৃষ্টি হল।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিলে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যাব এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অন্যদের কাছে হেরে যাব সে ধরনের ঠাণ্ডা মাথার যুক্তি তখন আমরা তুলতাম না। সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা, বেলজিয়াম ইত্যাদি বহু রাষ্ট্রভাষা-ভাষী রাষ্ট্রের কথা আমাদের আলোচনায় উল্লেখ পেত বটে, তবে বেশীর ভাগ সময় বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন যুক্তি প্রদর্শন তখন তরুণ মনে বাহুল্য মনে হত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার এক বিদেশী অধ্যাপক পাকিস্তানে উভয় অঞ্চলের জনংখ্যার হিসাব করে ভাষা আন্দোলনের উপর মন্তব্য করেছিলেন 'ইৎ ইজ সিম্পল ম্যাথমেটিক্স।' বাংলা ভাষার দাবির পেছনে এমন একটা সহজ ও বোধগম্য যুক্তি ছিল যে, কোন অপপ্রচার দ্বারাই তা খণ্ডন করা সম্ভব হল না। আবেগে, বিক্ষোভে এবং যুক্তিপ্রমাণে সেই আন্দোলন এমনই দুর্বার হয়ে দাঁড়াল যে আইনের কোন বাধা তার মানার কথা নয়। তাই চার বছর পরেই রাষ্ট্র ভাষার দাবি দেশের সংবিধানে স্বীকৃতি পেল। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েই শেষ হয়ে গেল না। জাতির প্রতিটি প্রশ্ন, আশা ও আকাঙক্ষা এর পরও আবর্তিত হতে থাকল একুশে ফেরুয়ারীকে কেন্দ্র করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি অনেক সময় বহুবাচনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবশ্য সে ধরনের কোন বিরোধের প্রশ্ন উঠার কথা নয়। তবু 'শিশু' রাষ্ট্রের সংহতির দোহাই যাঁরা পাড়তেন তাদের মধ্যে একটা আশঙ্কা দেখা দেয়। সেদিন ভিন্ন কণ্ঠে একটি ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যেত 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।' এই আশঙ্কায় আরবী হরফে বাংলা চালু করার এবং বাংলা ভাষাকে 'শুদ্ধ করার' একটা চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা দিত। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্যতা বা গুরুত্ব লাভ করতে পারল না। সবই হল পণ্ডশ্রম। অবশেষে, যে রাষ্ট্র নিয়ে হিতৈষীদের এত দুর্ভাবনা, ইতিহাসের ঘটনাক্রমে দু' দশকের মধ্যে কালস্রোতে ভেসে গেল সেই রাষ্ট্র॥"[৩৭]
(সাক্ষাৎকার : বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান)

---

[৩৭] একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ/সম্পা : গবেষণা ও সংকলন বিভাগ ॥ [বাংলা একাডেমী - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০। পৃ. ৬১-৬৪]

০২.

"... বাংলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আকাশে শুধু শরতের চন্দ্র উদিত হইত এবং সে চন্দ্রোদয়ে 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে যাইত দেশ ছেয়ে।' কিন্তু সে কাব্যাকাশে ঈদ-মোহরমের চাঁদ কখনও উঠিত না। ঈদের আনন্দে ও মোহরমের শোকে দেশ কখনও ছেয়ে'ও যাইত না। এই সাহিত্যের আলোকের প্রখরতায় মুসলিম বাংলার নিজস্ব সাহিত্য 'বটতলার পুঁথি সাহিত্য'র বদনাম লইয়া পল্লী-বাংলায় মুখ লুকাইল। ঈশ্বরগুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র 'নেড়ে যবন' গাল দিয়া মুসলিম বাংলাকে সেই যে সাহিত্যের মজলিস হইতে তাড়াইলেন, রবীন্দ্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিরাট আকর্ষণী শক্তিও আর তাদেরে সে মজলিসে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে মুসলিম ভারতের তমুদ্দনী বৈশিষ্ট্যের দাবিতে পাকিস্তান নামে যে একটা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হইয়া গেল, মুসলিম বাংলার ও হিন্দু বাংলার নিজ-নিজ স্বকীয়তার দাবিতে যে এক বাংলা দুই বাংলা হইয়া গেল, সে বিপ্লবের ঝড়-তুফানে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জান দিল এবং কোটি কোটি মানুষ ছিন্নমূল বাস্তহারা হইল, তাতেও আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের পাষাণ হৃদয়ে ও জমাট মস্তকে একটা আঁচড়ও লাগিল না। কলিকাতার উন্নত সাহিত্যিক ঐতিহ্যের কড়া নেশা আজো তাদের কাটে নাই। তারা আজও কলিকাতার আর্টের আবিরে দেহ-মুখ রাঙ্গাইয়া কলিকাতার ভাষায় হুলুধ্বনি দিয়া চলিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাকে, পূর্ব বাংলার স্বকীয়তাকে রূপান্তরিত ও সঞ্জীবিত করিবার, পূর্ব বাঙ্গালীর ভাষাকে সাহিত্যিক আভিজাত্য দিবার কোনও চেষ্টাই তারা করিতেছেন না। বরঞ্চ পূর্ব বাংলার ভাষিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টিক শ্রেষ্ঠত্বকে অভদ্রতা ও অশালীনতার তহমত দিয়া পশ্চিম বাংলার শালীন ভাষায় আমাদেরে শুদ্ধি করিবার অভিযান চালাইতেছেন।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক লেখকরা আমরা বাংগালদেরে বিশুদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাদের ভাষাজ্ঞানের উত্তাপে আমরা দগ্ধ হইতেছি বটে, কিন্তু সংগে সংগে বিদগ্ধও কিছুটা হইতেছি না কি? পশ্চিম বাংলার বিদগ্ধ সমাজে আমরা বাংগালদেরে গ্রহণযোগ্য করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে এরা আমাদের মুখের ভাষার চাষামিকে আর্যামিতে শুদ্ধি করিতেছেন। আমাদের গ্রাম-বাংলার জনগণের হর হামেশা এস্তেমাল করা মুসলিম ঐতিহ্যবাহী হাজার হাজার লফয্‌কে এরা ভাষা শৈলীর শলার ঝাঁটায় ঝাটাইয়া বই পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন। তাদের বদলে ভদ্রলোকের ব্যবহৃত বিশুদ্ধ আর্য শব্দাবলীর প্রবর্তন করিতেছেন।

এই সংস্কারকরা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মুখাগ্নি করিয়া তাদের মুখের খানা কে খাদ্য, গোশতকে মাংস, আন্ডাকে ডিম, সালুনকে ব্যঞ্জন, সুরুয়াকে ঝোল, বরতনকে থাল, নওলা- লুকমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। গোসলের বদলে এরা আমাদের স্নান করাইতেছেন। আমাদের বাড়ির বিলাইকে বিড়াল, কুত্তাকে কুকুর আর আমাদের চালের কাউয়াকে কাক করিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের সমাজের আদব-কায়দা ও তমিয- লেহাযকে শিষ্টাচার ও বিনয়-নম্রতায় উন্নত করিয়াছেন। আমাদের মেহমানদের দাওয়াত না করিয়া এরা অতিথিদের নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

এত করিবার পরেও যাতে আমাদেরে কেউ বাংগাল বলিয়া চিনিয়া না ফেলে, সেই উদ্দেশ্যে এই সাহিত্যিকেরা আমাদিগকে পশ্চিম বাংলার ভাষিক বিকৃতি ও স্ল্যাংগুলিতে পর্যন্ত ট্রেনিং দিতেছেন। এই জন্যই তারা লেখ্য স্ট্যান্ডার্ড এবং আমাদের কথ্য বাংলার তুলাকে তুলো, সুতাকে সুতো, গুলিকে গুলো, নাইকে নেই, দেওয়াকে দেয়া, নেওয়াকে নেয়া, এমনকি আরবী উল্লাকে উল্লো, দেওয়ানকে দেয়ান করিয়া ফেলিয়াছেন।

ঠাট্টা তামাশা নয়। আমাদের অবস্থা সত্যই এই। কিন্তু কেন এমন হইল? কেন আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন স্বকীয়তা-বিরোধী, আত্ম-মর্যাদা-বোধহীন বিদেশী প্রবণতা দেখা দিল?

যে পূর্ব বাংলার ভাষার সারা গায় মুসলিম তমদ্দুনের ছাপ, যে পূর্ব বাংলার প্রচলিত যবানী গণ-ভাষার শতকরা ষাইটটার মত লফয্ আরবী-ফারসীমূলক শব্দ, কলিকাতার হিন্দু সাহিত্যরথীরা যে জনগণের ভাষাকে মুসলমানী বাংলা বা দুভাষী বাংলা বলিয়া সাহিত্যে স্থান দিতে অস্বীকার করিলেন, যে অন্যায় অস্বীকৃতীই মুসলিম বাংলার ভাষিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-বোধের জন্মদাতা, মুসলিম বাংলার যে স্বাতন্ত্র্যবোধই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান হাসিলে রুপায়িৎ, সেই পূর্ব বাংলার ভাষার প্রতি পাকিস্তানের খাঁটি সন্তান তরুণ সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণা, এমন নফরৎ, এমন হেকারৎ পয়দা হইল কেমন করিয়া?

কেন তারা তাহযিব-তমদ্দুনের চেয়ে কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অধিক ভালবাসে? কেনই বা এরা দোয়া-খায়ের অপেক্ষা আশীষ-আশীর্বাদ বেশী চায়? কেন তারা তারিফ-তাযিমের চেয়ে প্রশংসা-সম্মানের বেশী আকাংখী? কেনই বা তাদের জিভে আন্ডার চেয়ে ডিম এবং গোশতের চেয়ে মাংসে এত বেশী স্বাদ লাগে?

আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আমরা উর্দুর দুই-দুইটা হামলার সামনে টিকিয়া আছি, তখন ভবিষ্যতেও থাকিব। সে হামলার ভয়ে আমরা ঐতিহ্য বিসর্জন দিব না। বিশেষত: আমাদের ছাত্র তরুণরা বাংলার জন্য জান কোরবানি করিয়াছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ইকবালকে পূর্ব পাকিস্তানের মাথার উপর হইতে সরাইয়া পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্রনাথকে মাথায় বসাইবার জন্য নয়। তারা এটা করিয়াছিল পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির জন্য। তা ছাড়া মুখের ভাষায় আরবী-ফারসীর প্রাচুর্য যদি ঐ কারণেই বর্জন করিতে হয়, তবে ঐ যুক্তিতেই আমাদের সব মুসলমানের এবং সব কয়টা বাংলা দৈনিকের আরবী-ফারসী নাম বদলাইয়া রাখিতে হয় সংস্কৃত নাম।

আমরা যেমন দেশের মাটি ত্যাগ করিতে পারি না তেমনি মুখের ভাষাও ত্যাগ করিতে পারি না। দেশের মাটি আমাদের যতই শিল্পহীন, অসুন্দর, অনুর্বর হউক, বুদ্ধি-কৌশল ও শ্রমের দ্বারা তাকেই আমরা শিল্পায়িত, সুন্দর ও উর্বর করিয়া তুলিব।

তেমনি আমাদের জাতীয় ভাষা যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক, সংস্কার করিয়া তাকেই আমরা সভ্য জাতির যুগোপযোগী ভাষা করিয়া তুলিব। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চালাইবার যোগ্যতা যদি আমাদের মধ্যে থাকিয়া থাকে, তবে স্বাধীন জাতি সৃষ্টি করিবার যোগ্যতাও আমাদের ভাষায় সুপ্ত রহিয়াছে। এই সুপ্ত অনুভূতির নি:শব্দ তন্ত্রীতে ঝংকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের ছাত্র-তরুণরা শহীদ হইয়াছিল। সে আত্মত্যাগকে ব্যর্থ হইতে দিতে আমরা পারি না॥"[৩৮]

০৩.

"... 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' গানটি শেষ হতেই জোরে শিস বেজে উঠলো সভাকক্ষে। আমরা ঠিক এই ধরণের ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম না। পরে শুনতে পেলাম মফস্বল শহরে ওইটিই নাকি বাহবা দেওয়ার ধরণ তখন। আরো মনে রাখতে হবে, তখন পাকিস্তানি শাসনের আঠারো বৎসর চলছে। এতগুলো বৎসরের সাধনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি অবহেলা হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক, এ গান সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে গেছে 'দূর্বোধ্য'। 'শাঙন গগনে' গানটিতে বাঁকা বাঁকা উচ্চারণ থাকাতে, তখনকার দিনের জনপ্রিয় উর্দু গানের সাথে মিল পেয়ে, এমন উচ্ছাস ঘটে যেতেই পারে।

সে আমলে উর্দু গানও যে সকলের কাছে সুবোধ্য ছিল এমনও নয়, তবে ওইটাই তখনকার ফ্যাশান বটে। মুক্তিযুদ্ধকালে একজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর পলাতক জীবনের এক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করলে তখনকার অবস্থাটা ভালো বোঝা যাবে। বেতারের শিল্পী জানতে পেরে গ্রামের লোক এলো গান শুনতে। পরিশীলিত কণ্ঠের বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে তারা মুগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বললো - 'হুঁ, উর্দু গান তো - তাই বোঝা যায় না'॥"[৩৯]

---

[৩৮] আবুল মনসুর আহ্মদ/পাক-বাংলার কালচার ॥ [আহ্মদ পাবলিশিং হাউস - অক্টোবর, ১৯৬৬। পৃ. ১২৯-১৫৪]

[৩৯] [illegible]

০৪.

"... It is not merely a matter of formality that we observe the 21st February as our Martyr's Day. In it is epitomized a sacred cause, an eternal message of life. So to us it does not matter what was the size and number of the persons sacrificed. We are concerned only with the greatness of the cause at issue.

The great cause it symbolizes is the language movement of East Bengal. This movement is an historical event much deeper in its significance and greater in its magnitude than many of us appear to have realised. The simple patent fact, no doubt, is the normal democratic right of the majority of the citizens of Pakistan to have their mother tongue statutorily recognised as their State language. But that is not the whole truth. It goes much beyond is the realization of our national identity which is the ultimate goal of all political independence and economic liberation. In our own case it is the very raison detre of Pakistan.

It is universally recognised that a nation can realize its identity only through its literature. It is equally recognised that a nation can create its own literature only through its own language. So what our February martyrs have done on this occasion is that they have put us on the right track towards our ultimate goal. This is the historic significance of the occasion. It is both a milestone and a polestar to guide us towards rediscovery of our 'weness' and attainment of our 'ourness'. That is where the fountainhead of our national identity lies. That is the direction in which our students and youths, the unfailing vanguards of all our national movements, have, by their February Revolution, signalled their superiors to advance. The glorious success of their revolution is imperishably enshrined in the country's Constitution in the shape of recognition of Bengali as one of the two State language of Pakistan. That was the point where apparently and logically the duty and responsibility of our students and youths ended and those of our poets and writers began.

But unfortunately the latter have signally failed to play their part in the intellectual regeneration of a new nation composed of an old civilized people. However shocking and painful it may sound the hard fact and the plain truth is that, in long eighteen years of political independence, thirteen years after February Revolution and nine years after the constitutional recognition of our language, we have not advanced to any appreciable degree of in laying the foundation of our national literature through which we are supposed to realize our national identity. To our great shame we have not moved one step towards rediscovery of East Pakistan. We still remain the literary dominion, linguistic colony and cultural hinterland of Calcutta as before.

Why is it so? The answer is very simple. With the exception of a few, the generality of our poets and writers whose duty it was to lead the people in and through an intellectual revolution not only did not do so but themselves could not keep pace with the emotional upsurge of the people who were pulsating with a new life. This pulsation, though extremely intense, was vague all the same. It was for the creative artists to give it a purpose, a direction and a shape. It was their duty, both national and moral, to give our people such a lead. They needed it badly. All peoples in all ages needed and got it as a post-revolution intellectual salvage service rendered to the nations. An intellectual vacuum interrupted only by thick mists of ideological and conceptual confusions is a phenomenon inevitably coming in the wake of all revolutions and Pakistan was a revolution in all senses of the term.

It dashed to pieces many prevailing notions, traditional beliefs, conventional ideas and time-honored definitions of things and matters not excluding history and geography. It was, in fact, a complete break with the past. This vacuum was to be filled up with the creative

arts contributed by the intellectual leadership of the people which poets and writers, in their own rights, constitute. This they did not do.

What did they do instead? They simply imitated our administrators. Nay, they did more. Our administrators could bring to Dacca only a portion of administrative Calcutta; but our poets and writers came to Dacca with the whole of intellectual Calcutta in their brain. It is, therefore, only natural that sitting at Dacca, the capital of a new nation, our poets and writers were continuing to gaze towards the same horizon, wield their pens in the same direction and sing the same tune in the same language as they had been doing sitting at Calcutta.

They overlooked the basic fact that from the mere poets and writers following in the footsteps of great masters like Bankim Chandra, Michael Datta, Rabindra Nath and Sarat Chandra, they have now become the torch-bearers of the renaissance of a new nation born of our basic conflict with the culture of which those great masters were propounders and exponents. As a result our writers failed to realize that it was no longer enough to say that Bengali is our mother tongue just as it no longer enough to say that Bengal is our motherland. Just as we can no longer claim the entire territory of Bengal as our own and all Bengalees as our compatriots, so cannot we claim any longer the whole of Bengali language and literature as our own. But this is exactly what our writers are doing.

They are doing so on the avowal that the Bengali language and literature is indivisible and so it has not been partitioned with the partition of the territory of Bengal. They appear to have wholly misconceived the salutary maxim that art and literature transcened political boundaries. They seem to be obsessed with a countryless literary supernationalism. To them any talk of cultural and literary autonomy of East Pakistan is illiberal parochialism just as in the political sphere to some politicians any talk of regional autonomy of East Pakistan is narrow secessionist provincialism. Such poets and writers are not expected to produce any creative art for, and to discover the national identity of, East Pakistan. The natural result has been the prevailing cultural barrenness and literary sycophancy of East Pakistan. There seems an all-eroding sense of frustration eating into the very vitals of our writers and poets.

... The Bengali Muslim, the pioneer of Bengali language and the father of Bengali literature who had been for centuries, equal and happy partner with his Hindu compatriot, was, now in the beginning of the twentieth century, relegated to the position of a total foreigner so much so that even his spoken words of mouth were discarded by the Education Department as non-Bengali words and were forbidden to be used in text books.

This trend generated a reaction in Muslim Bengal which, though natural, was very much unwise and suicidal. An influential section of the Muslims presumably in desperation, propounded a new theory that Urdu and not Bengali, was the mother tongue of the Muslims of Bengal. They urged upon the Muslim students not to learn Bengali in their classes. This attitude was not entirely unjustified in view of the fact that text books of this period were full of anti-Muslim writings. But fortunately the move did not succeed. The Ulama of Bengal who were expected to support this step did not do so. On the contrary, they, in collaboration with the majority of the Muslim intelligentsia, stoutly resisted it and thus saved Muslim Bengal from a cultural catastrophe. They, instead, devoted their energy to resuscitate the natural Muslim tone of Bengali language and thus mould its literature as a proper and powerful medium of Muslim culture.

... In this way the linguistic and literary divergence between the Hindu and Muslim Bengalees along with their political and cultural aloofness continued unabated without any

prospect of a solution. The situation came to such a bitter pass that the present writer who has been up to that time a staunch nationalist in his political views, in his address to a conference of the Progressive Writers' Association, Calcutta, in 1943, had regretfully to say : 'I do not know if there will be a political Pakistan. But I can assure you that if the Hindu writers persist in their adamant refusal to recognise the spoken words of the Bengali Muslims, a literary Pakistan in Bengal in inevitable.' This shows the extent of desperation prevailing amongst the Muslims at the time.

... It should have been the easiest thing for our intellectuals to understand that our youth did not sacrifice their lives in 1952 Revolution to replace Iqbal by Rabindranath. The great Rabindranath is no more the national poet of East Pakistan than Milton Shakespeare and Kipling are national poets of America. West Bengal Bengali is no more our mother tongue than British English is the mother-tongue of the Americans. And our students gave their lives in the February Revolution for the sake of their own mother tongue and not for that of the Indians of West Bengal. It should have been obvious to our poets and writers that just as East Bengal is now destined to become from a raw-material-supplying hinterland of Industrialized Calcutta to an industrialized independent modern country itself. So it must be a culturally autonomous country with literary and linguistic self-sufficiency of its own. Only that can make us a self-respecting, respectable and dignified nation. To become such a nation we must produce a Rabindranath of our own instead of borrowing one from others. A poet to be a national one must speak out the mind of the nation in her own language."[৪০] (The Concept/February, 1965)

০৫.

'... পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দরাবাদ শহর থেকে শহীদ সুহরাওয়ার্দী ঢাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি সংবাদপত্র বিবৃতি প্রদান করে গুলি বর্ষণে নিহতদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বিবৃতিটিতে তিনি আরও বলেন যে,

"... আমি একদিকে শুনছি ছাত্ররা শান্ত ছিল এবং অন্যদিকে শুনছি তারা পুলিশের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেছিলো। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, পুলিশ ঘটনাস্থলে কি করছিলো এবং আইনসঙ্গতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা কেন শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে দেয় নাই।

এখন নয়, অনেকদিন পূর্বে যখন পূর্ব বাঙলায় প্রথম বিতর্ক বিক্ষোভ শুরু হয়েছিলো তখনই একটি জনসভা ও সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে, যেভাবে এবং যে নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অনুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত। কিন্তু একই সঙ্গে আমি বলেছিলাম যে বাংলা পাকিস্তানের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের, বস্তুতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের, ভাষা হওয়ায় উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাকে একটি বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে কালে কালে জনগণ উর্দুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলে এবং সরকারি কর্মচারীরা তা স্বাভাবিকভাবে পড়তে ও লিখতে পারলে তখন উর্দু তার গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমস্যাটির প্রতি এই হলো একমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে এই মর্মে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ক্রমাগত ঘোষণার ফলে প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয় যার দঃখজনক পরিণতি আজ আমরা দেখছি। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু শিক্ষার জন্য যখন কিছুই করা হচ্ছে না তখন এ প্রশ্নটি উত্থাপনের অর্থ কি হতে পারে?"

[৪০] Abul Mansoor Ahmad/End of a Betrayal and Restoration of Lahore Resolution \ [Khoshroz Kitab Mahal - January, 1975| P. 337-354]

উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সম্পর্কে কিছুই না বলে সেই দাবির বিরোধিতা করায় পূর্ব বাঙলার সর্বত্র সুহরাওয়ার্দীর উপরোক্ত বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এমন কি আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এ প্রসঙ্গে সিলেট জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি নুরুর রহমানের নিম্নোক্ত বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। বিবৃতিতে তিনি বলেন,

'... উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতি করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব যে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। সাড়ে চার কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী যে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে সময় পশ্চিম পাকিস্তান হইতেও আমাদের দাবির পক্ষে জোরালো সমর্থন আসিতেছে তখন সোহরাওয়াদী সাহেবের এইরুপ উদ্দেশ্যমূলক দম্ভোক্তি শুধ অবাঞ্ছিতই নয়, উপরন্তু ঘৃণার্হ। কোন রাজনৈতিক মহলের অনুরাগ বিরাগের তোয়াক্কা না রাখিয়াই জাগ্রত জনতা তাহাদের ন্যায় সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের পথে পা বাড়াইয়াছে–আমরা সংকল্প নিয়াছি আমাদের এই আন্দোলনের পথে স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের কোন বিভ্রান্তিকর ভূমিকা আমরা কোনমতেই বরদাস্ত করিব না। সোহরাওয়াদী সাহেব এই সত্যটুকু বিলম্বে উপলব্ধি করিলে মারাত্মক ভুলই করিবেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছি এইরূপ জনস্বার্থ বিরোধী বিবৃতি ঝাড়িবার জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে জাগ্রত জনমতের নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করিতেই হইবে।'

পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যে কোন সম্পর্ক নেই এ কথা উল্লেখ করে বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়,

'... মতলববাজরা সোহরাওয়ার্দীর উক্তিকে আওয়ামী লীগের নীতির প্রতিধ্বনি হিসাবে অভিহিত করিয়া জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে; তাই আমি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতে চাই যে সোহরাওয়ার্দীর উক্তির সহিত আওয়ামী লীগের নীতিগত কোন প্রশ্ন জড়িত নহে, অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন সম্বন্ধ নাই–ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।'

২৬শে ফেব্রুয়ারী সুহরাওয়ার্দীর বিবৃতির উপর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'দৈনিক আজাদ' বলেন–

'... এই সময় মিঃ ছোরাওয়ার্দী একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন এবং বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কারণ পাকিস্তানের আদর্শের দিক দিয়া ইহাই ঠিক। কিন্তু একথা বলার পর তিনি আবার বলিয়াছেন যে, বাংলার বুকে জোর করিয়া উর্দু চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, আস্তে আস্তে পরিচিত করিয়া তুলিতে হইবে ইত্যাদি।

...মিঃ ছোরাওয়ার্দীর এই বিবৃতি বর্তমান সময়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পানি যখন ঘোলা হইয়া আসে, তখন অনেকেই মাছ শিকার করিতে আসে। আজ ভাষার ব্যাপার লইয়া বিক্ষুব্ধ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে মিঃ ছোরাওয়ার্দী বাছিয়া লইয়া নতুন জটিলতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। তাঁর মতলব এই যে, এতে করিয়া তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে। তিনি সমস্যার সামাধান চান না, তিনি সমস্যাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চান।'

সারাদেশে এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক অসুবিধা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন–

'সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছরই জুন মাসে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচী যাই এবং তাঁর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি। আমরা সেই সময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে স্বাক্ষর অভিযান করছিলাম। তাতে তিনি স্বাক্ষর করেন এবং তাঁর ইংরেজি স্বাক্ষর এর ব্লক সহ দাবিগুলো তৎকালীন সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে ছাপা হয়।'

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে উপরোক্ত স্বাক্ষরিত দাবি জ্ঞাপন সত্ত্বেও শহীদ সুহরাওয়ার্দী নিজের পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। এ ব্যাপারে আতাউর রহমান খানের নিম্নলিখিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–

'... ১৯৫৩ সালে আমি এবং মুজিব একসাথে লাহোর যাই শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেই সময় প্রেসের লোকদের কাছে আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলি। পরদিন কাগজে এটা ওঠে। শহীদ সাহেব সে সময় জাবেদ ইকবালের বাসায় থাকতেন। তিনি আমাদের সাথে এ ব্যাপার নিয়ে খুব রাগারাগি করেন। তিনি বলেন,

'It is wicked of you to raise the language controversy now. There are so many important questions which should be raised at this moment. এটা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত stupid হয়েছে', ইত্যাদি।

আমরা দুজনেই এর জবাবে বলি যে, প্রেসের লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করায় আমরা জবাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি তাই হওয়া উচিৎ। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের sentiment অন্যরকম। সেখানে সকলে রাষ্ট্রভাষা বাংলাই চায়।

এ কথা শুনে তিনি আমাদেরকে বলেন, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছ কেন? তোমরা সেখানেই থাকো, এদিক দিয়ে আর এসো না। তিনি মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর ভয়ানক অসন্তুষ্টই হন।"[৪১]

০৬.

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানকে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিঠি

ক.

"56, Clifton, Karachi

22/04/1952

My dear Mujibar,

Thank Heavens they have released you. I am sorry to learn you are still unwell. If you wish to come over to Karachi, do so by all means. It may do your health some good. It is so terrible to hear that they have arrested the leaders of the Awami Muslim League all over the place and yet we can do nothing. How long will our people have to endure these miseries - and surely God watches, and he will come to our rescue. I do not say things to please people. I consider this State Language controversy to be meaningless and will really disrupt Pakistan, if they do not drop the matter. At the worst, let us have Regional State Languages - Bengali for Bengal, and Urdu for West Pak., and for some time carry on with English as the Inter-Region Language and the International Language. However, it is no

---

[৪১] পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খন্ড)/বদরুদ্দীন উমর। [বইঘর - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫। পৃ. ৩৯১-৩৯৪]

use saying these things, as no one is prepared to listen. But I would advise, Muslims in Bengal to learn Urdu as a compulsory 2nd language, and if I am right, they will not object, if they are properly approached.

Yours,

Shaheed Suhrawardy"[৪২]

খ.

"13, Kutchery Road, Karachi.

11th September 1953.

I have received a type written letter from you after a long time. I was very sorry to hear of the mishap to Maulana Bhashani's wife. I hope that she has recovered by now, and the Maulana Sahib is again in circulation. Perhaps this was just as well, as the Maulana Sahib has a habit of over-straining himself, and he should give himself a rest from time to time.

I hope the organisation work is being done satisfactorily, and the regional organisers are touring and doing their duty. The main purpose should be to find strong sympathiser in every area, mohalla and lane of the town, and also in every village, and build the party on these strong workers.

I do not know when I shall be able to come to East Bengal. I hope it will be at the end of September or beginning of October, and may be even later, around the third week of October. There are many matters and cases over here, the most complicated being the Disturbances Enquiry Tribunal. I also must have time to have my teeth taken out, otherwise I shall not be able to work in East Bengal peacefully. I am wondering however whether you really do need my presence in Bengal, as it is impossible for me to go on supporting you in your extreme policy. Let me give you an example: Take the language question. We have all declared, and I have supported you on the problem, that one of the state languages should be Bengali. In order to get all-Pakistan confirmation for this policy, it is necessary not to antagonise the other parts of Pakistan, that is to say provided you wish to remain part and parcel of Pakistan. If you do not wish to do so, you can say whatever you like, and create bad blood between East and West, antagonise the people here, and destroy the integrity of the party. Now my policy clearly is that Pakistan must remain integral, and you must oppose all such influences whose tendency may be to separate the two wings.

Hence you can well realise that you are antagonising the whole of West Pakistan by demanding that Urdu should be boycotted, or that you will start Direct Action. I do not think that anybody has given you the authority to threaten such a serious course of conduct as direct action. Therefore, while you press your claims for Bengali, you must not attack Urdu. If you do not agree with me let me know. I will then possibly decide not to come to East Bengal, and I will even begin to think that you are not desirous of maintaining the integrity of Pakistan.

I see that the Maulana Sahib has called for the observance of an anti-Imperialist Day on the 11th of September. This appears to have reference to the attitude of the Western Powers in

---

[৪২] Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman : 1948-1971 (Vol. 02) / Edt.: Sheikh Hasina (Prime Minister of Bangladesh) \ [Hakkani Publishers - February, 2019 | p. 181-182]

relation to the Arab countries, and it takes no account of the imperialism of Soviet Russia over her satellite countries. So be it. But you must realise what repercussions this will have. It seems that you are all obsessed with supporting, at the present moment indirectly, the ideology, the politics and the political structure of the Communist Powers. You are receiving support from what are known as progressive groups and from the Communists. The reaction amongst our people is that our party is a camouflage communist body, and you may have within East Bengal itself anti-Communist members of our party who may break away from us. Do you think that by observing this Day we have increased our internal strength? You are merely giving an opportunity to the other groups to capture the field. Can you not possibly go slow. There is plenty of time for international politics. Let us strengthen the party position and see whether we can win the elections on the party ticket.

However, knowing as I do the manner in which you have all been injected with Communism, I do not think you will be able to appreciate what I am saying. There is one other danger, and that again is the disintegration of Pakistan. A separatist policy will not help you to maintain your entity. You will have to join up with India, not on the basis of a sovereign unit, but as part of the Indian Union, a contingency which no one can contemplate with equanimity. Now I do not want you to run away with the idea that I am preaching reactionarism, but our policy has to be subordinated to the paramount policy of the integrity of Pakistan, and hence we have to go slow, and only adopt such policy as may not antagonise this part of the country.

Yours Sincerely,

Sd/- H.S. Suhrawardy."[৪৩]

০৭.

"... যে ভাষা আন্দোলনের প্রতি আওয়ামী লীগের স্বাভাবিক দূর্বলতা প্রদর্শিত হয়েছিল বলে অনেকের মনে হয়, সেই ভাষা শহিদদের 'স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পরিচালিত সরকার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শণ করতে পারেনি (পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আওয়ামী লীগের পূর্ন আনুগত্য প্রদর্শনে ঘাটতির আশঙ্কায়)।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ইস্তেহারে যে ২১ দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল তাতে ১৭ নং দাবি হিসাবে ভাষা শহিদদের স্মৃতির জন্য 'শহিদ মিনার' নির্মাণের কথা ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ এই ইস্তেহার বাস্তবায়নের অন্যতম দায়বদ্ধ দল ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্টের আমলে কিংবা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের আমলে এই শহিদ মিনার নির্মিত হয়নি। আওয়ামী লীগের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের আমলে শহিদ মিনারের নকশা রচিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তার পরেও দু'বছর কাল এই সরকার ক্ষমতায় থেকেও শহিদ মিনার নির্মাণে চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, সামরিক শাসক আয়ুব খানের আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্ণর লে: জে: আযম খান বর্তমান শহিদ মিনারটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী শহিদ বরকতের মা এই মিনারটির উদ্বোধন করেন।

---

[৪৩] Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman : 1948-1971 (Vol. 03) / Edt.: Sheikh Hasina (Prime Minister of Bangladesh) \ [Hakkani Publishers - June, 2019 | p. 389-390]

আওয়ামী লীগ ভাষা আন্দোলনের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটের রাজনীতিতে উৎসাহী যতটা ছিল ততটা বিষয়টির প্রতি আন্তরিক ছিল না বলেই মনে হয়।"[৪৪]

০৮.

"... It was General Azam Khan who as East Pakistan's military governor in 1962 took the initiative of building a Shaheed Minar."[৪৫]

০৯.

"আজ 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' করছি জাতীয়তাবাদের ডাকে, কিন্তু তা যেন আমাদের অন্ধ করে না দেয়। উর্দু ভাষার প্রতি ঘৃণা, উর্দুভাষীর প্রতি ঘৃণা আমাদের অন্ধ না করে রাখে। তা হবে এক চরম আধ্যাত্মিক মৃত্যু।" (৩১/০৮/১৯৭১)[৪৬]

১০.

"... শোষক শ্রেণীর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তারা যে কোন ভাষাই ব্যবহার করুক না কেন তার ফলে জাতীয় ভাষার বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। কয়েক শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ডের রাজদরবারে রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে ফরাসী ভাষা প্রচলিত থাকার ফলে ইংরেজি ভাষার বিকাশ ও অগ্রগতি কি বন্ধ হয়েছিল? পাঠান ও মোগল আমলে শত শত বৎসর এই উপমহাদেশে রাজদরবারে রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে ফারসী-ভাষা চালু থাকবার কারণে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতীয় ভাষার (বাংলা-ভাষা সহ) ব্যবহার এবং সেগুলির বিকাশ ও অগ্রগতি কি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? সব শেষে ইংরাজ আমলে দু'শো বৎসর রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত ছিল। তাই বলে কি দেশীয় ভাষাসমূহের বিকাশ বন্ধ ছিলো? বরং ইংরাজ আমলেই আধুনিক বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশী বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

... রাষ্ট্র ভাষার দাবি জাতীয় ভাষার বিকাশ এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত নয়। রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্ন একটি বহুজাতিক দেশে কোন জাতীয় শোষক শ্রেণী রাষ্ট্র-ক্ষমতার ক্ষেত্রে বেশী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে সেই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যেমন পাকিস্তানে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শোষণের ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী না বাঙ্গালী শোষক শ্রেণী বেশী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে সেই প্রশ্নের সঙ্গে বাংলা-ভাষাও রাষ্ট্র-ভাষা হবে কি না প্রশ্নটি জড়িত ছিল। শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত জনগণের ভাষা ও শিক্ষা সম্পর্কিত গণতান্ত্রিক দাবিগুলোর সঙ্গে আদতে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নটির সেরকম কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নাই। ভাষা আন্দোলনে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্ব ও প্রভাব শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত জনগণের ভাষা ও শিক্ষা সম্পর্কিত গণতান্ত্রিক দাবিগুলো রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে নিয়ে গোটা আন্দোলনকেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল।"[৪৭]

১১.

কতিপয় সাক্ষাৎকার

[মোহাম্মদ তোয়াহা। সাম্যবাদী (মার্ক্সসিস্ট- লেনিনিস্ট) দলের চেয়ারম্যান। ভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। কথিত 'আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনীতির কারণে' তিনি সুদীর্ঘ ১৫ বছর ফেরারী জীবন যাপন করেন। জেল এবং ফেরারী অবস্থা মিলিয়ে ২২/২৩ বছর তিনি নির্বাসিত জীবন কাটান]

---

[৪৪] মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম/*আওয়ামী লীগ : পাকিস্তান সমর্থক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠকে রূপান্তর* (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অভিসন্দর্ভ) ॥ [উদার আকাশ (কোলকাতা) - ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ৬৫]

[৪৫] Syed Badrul Ahsan (Editor, Current Affairs) / The Daily Star - July 12, 2008

[৪৬] শওকত ওসমান/১৯৭১ : স্মৃতিখন্ড মুজিবনগর ॥ [বিউটি বুক হাউস - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২। পৃ. ৭০]

[৪৭] সইফ-উদ-দাহার/রাষ্ট্রভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তারপর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - নভেম্বর, ১৯৮৬। পৃ. ১০১-১০২]

প্রশ্নঃ রাষ্ট্রভাষার দাবি ঢাকার তৎকালীন স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

তোয়াহাঃ জনসাধারণকে এমন একটা ধারণা দেয়া হচ্ছিল যে, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি তুলে ছাত্ররা পাকিস্তান ও ইসলামিক আদর্শের খেলাপ কাজ করছে। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মহল হতে ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানাভাবে ঢাকার স্থানীয় জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হচ্ছিল। ফলে সিদ্দিক বাজার, নাজিরা বাজার প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় জনগণ একদিন মারমুখো হয়ে এসে তমদ্দুন মজলিস অফিসে হামলা চালায় এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। এ ঘটনার পর পরই আমি অন্যান্য তমদ্দুন মজলিস কর্মীদের সাথে অফিসের কাগজ-পত্র সরিয়ে আনি।

প্রশ্নঃ তমদ্দুন মজলিস অফিস আক্রান্ত হওয়া ছাড়া এসময় আর কোথাও এমনি ধরণের ঘটনা ঘটেছিল কি?

তোয়াহাঃ এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে ছাত্ররা একদিন চকবাজারে জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়। তখন পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল ছিল। ছাত্ররা উত্তেজিত জনতার সামনে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ সময় গোলাম আযম সাহস করে এগিয়ে যান। তিনি চিৎকার করে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন 'আরে ভাই আমরা কি বলতে চাই তা একবার শুনবেন তো।' এই বলেই তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কি উপকার হবে তার ওপর ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। পরিস্থিতি শান্ত হলো। সেদিন আর কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

প্রশ্নঃ আপনি কোন গোলাম আযমের কথা বলছেন?

তোয়াহাঃ অধ্যাপক গোলাম আযম। এখন তিনি জামায়াতে ইসলামী করেন।

প্রশ্নঃ তাহলে ভাষা আন্দোলনে আপনারা একসাথে কাজ করেছেন?

তোয়াহাঃ হ্যাঁ, ভাষা আন্দোলনে আমরা অনেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এক সাথে কাজ করেছি।

প্রশ্নঃ তিনি কি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন?

তোয়াহাঃ না, তিনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন না। দলগতভাবে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে ছাত্ররা তখন ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।

গোলাম আযম সাহেব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের জিএস ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অমায়িক এবং ভদ্র। ভালো সার্কেলের ছাত্ররা যেমন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তেমনি আমরা সহজাতভাবে একত্রিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের কাজ করেছি। আমাদের এ সার্কেলে আরো অনেক সহযোগী ছিলেন। এর পেছনে আর অন্য কোন কারণ ছিল না।

প্রশ্নঃ অরবিন্দ ঘোষ যে প্যানেলে ভিপি ছিলেন সেই প্যানেলেই কি গোলাম আযম সাহেব জিএস ছিলেন?

তোয়াহাঃ সেই সংসদেই তিনি জিএস ছিলেন। তখন দলীয় কোন প্যানেল ছিল না। কেন্দ্রীয় সংসদের পদগুলো চারটি হলে বন্টন হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচন তখন ছিল আমোদজনক খেলার মতো, যা আজ আর নেই।

প্রশ্নঃ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের অবদান কতটুকু ছিল?

তোয়াহাঃ ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের তেমন কোন অবদান ছিল না। এ সম্পর্কে অনেক ডাহা মিথ্যাচার প্রচলিত আছে, যা ভাষা আন্দোলনের মহান ইতিহাসকে বিকৃত করছে। আর তখন শেখ মুজিবের অবদান

থাকার কথাও নয়। কারণ ঢাকার ছাত্র সমাজে তার পরিচিতি ছিল নিতান্তই নগণ্য। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে যেসব ছাত্ররা ঃঃশুধু ঘোরাফেরা করতো শেখ মুজিব ছিলেন সে ছাত্র গ্রুপেরই একজন।

আপনাকে দুটো ঘটনা বলছি। বুঝতে পারবেন ক্ষুদ্র পরিসরে যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তাকেও শেখ মুজিব কিভাবে উপদলীয় কোটারী রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন।

একদিন আমি এবং তাজউদ্দীন আইন পরিষদের সদস্য মো: তোফাজ্জল আলীর বাসায় যাই। তিনি আমাদের দেখেই দূর থেকে চিৎকার করে বলে উঠলেন - 'আরে এসো, এসো, তোমাদের খবর আছে।' আমরা বুঝতে পারলাম না। এ 'খবর আছে' কথার অর্থ কি? আমরা গিয়েছিলাম প্রাদেশিক পরিষদ থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে সুপারিশ পাঠানোর কথা ছিল, সে বিষয়ে জানার জন্য। সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি যেন হেলা করেই বললেন, 'আরে, ওসব হয়ে যাবে। এখন কথা শুনো, Perhaps you are getting two ministers and one Ambassador. মুজিব তোমাদের কিছু বলেনি?' আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

তোফাজ্জল আলী সাহেবের সাথে আরো কিছুক্ষণ আলাপ হলো। আলাপের পর আমাদের বুঝতে আর বাকী রলো না যে, শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে MLA-দের পদ এবং ক্ষমতা লাভের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করছেন।

প্রশ্ন: কিভাবে শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে উপদলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন?

তোয়াহা: তখন আইন পরিষদের ভিতরে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থক MLA-দের একটা গ্রুপ ছিল। এদের মধ্যে ছিলেন মোফাজ্জল আলী (কুমিল্লা), মফিজ উদ্দীন (কুমিল্লা), আনোয়ারা বেগম, খান সাহেব ওসমান আলী (নারায়ণগঞ্জ), মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) প্রমুখ।

শেখ মুজিব ওদের কাছে আনাগোণা করতেন এবং প্রচার করে বেড়াতেন যে, ইউনিভার্সিটিতে যেসব আন্দোলন হচ্ছে তা তিনি এবং তার সমর্থকেরাই পরিচালনা করছেন। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে (সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ থেকে) যদি মন্ত্রীত্বে না নেয়া হয় তবে যে কোন মূল্যে আন্দোলন দ্বারা নাজিমুদ্দীন সরকারকে উৎখাত করা হবে। এইভাবে শেখ মুজিব-সোহরাওয়ার্দী বনাম নাজিমুদ্দীন-নুরুল আমিনের রাজনৈতিক দ্বন্ধে মহান ভাষা আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। ভাষা আন্দোলনকে উপদলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে চিত্রিত করার মাঝেই মুজিবের প্রকৃত ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন: শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে আরো কি একটা ঘটনা বাদ পড়ে গেছে যা আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলতে শুরু করেছিলেন?

তোয়াহা: হ্যাঁ, বলছি। ১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ। পূর্বেই নির্ধারিত ছিল এইদিন সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হবে। বিরতির সময় আমরা বেশ কয়েকজন সভাস্থলের দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরওয়ানী এবং জিন্নাহ টুপি পরিহিত অবস্থায় চেয়ারে সভাপতির আসনে বসে আছেন। আমি অবাক হয়ে যাই। কারণ ঐ সভায় আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। শেখ মুজিবের সভাপতির আসন অধিকার করে থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। আর তৎকালীন পরিস্থিতিতে সে মর্যাদাও তার ছিল না। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে আমি এবং আমার সহসাথীরা কিছু বললাম না।

এ সময়ের মধ্যে কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে শেখ মুজিব উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন যা নিছক শ্লোগানসর্বস্ব বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারপর হঠাৎ করে বক্তৃতা থামিয়ে 'চলো চলো এসেম্বলী চলো' - বলে শ্লোগান দিয়ে ছাত্রসভার সকলকে মিছিল সহকারে পরিষদ ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহবান জানায়। যদিও সেদিন মিছিল বা বিক্ষোভের কোন কর্মসূচী ছিল না, তবুও আকস্মিকভাবে পরিস্থিতি এমন হলো যে, মিছিল বন্ধ করারও তখন কোন উপায় ছিল না। পরিশেষে মিছিল হলো এবং পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে সেদিনের অসংগঠিত মিছিল স্বাভাবিক পরিণতিতে ছত্রভঙ্গ হলো।

সেদিন এই ঘটনার মাধ্যমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে মুজিব ভাষা আন্দোলনের দূর্বার গতিকে হীন স্বার্থে কাজে লাগাতে তৎপর রয়েছেন। তোফাজ্জল আলী সাহেবের বাসার ঘটনার সাথে সেদিনের অনির্ধারিত মিছিলের একটা যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া গেল।

প্রশ্ন: তাজউদ্দীন সাহেবের সাথে আপনার সম্পর্ক হয় কিভাবে? তোফাজ্জল আলী সাহেবের বাসায় যাওয়া আসার সময় থেকেই কি?

তোয়াহা: না, না, সেতো '৪৮ সালের কথা। সে এক সুদীর্ঘ কাহিনী। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম সাহেব যখন পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন আমি, তাজউদ্দীন, শামসুল হক (আওয়ামী লীগের এক কালের সেক্রেটারী) ও তার ভাই নুরুল হক (তিনি ঢাকা জেলার মুসলিম লীগের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। এখন পাকিস্তান ফরেন এফেয়ার্সের ডিজি) আমরা সবাই তখন মুসলিম লীগের হোল-টাইম কর্মী। তখন ১৫০, মোগলটুলীতে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম লীগের একটি শাখা অফিস খোলা হয়। সে সময় থেকেই তাজউদ্দীনের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। এছাড়া তাজউদ্দীন পূর্বাপর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যদিও তাজউদ্দীন বাহ্যত: আওয়ামী লীগ করতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাথেই জড়িত ছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্তেই তাকে আওয়ামী লীগে রাখা হয়।

একবার সম্ভবত: '৬২ সালের দিকে তিনি জেল থেকে বের হয়ে আমাদের বললেন 'আর ছদ্মনামে (অর্থাৎ আওয়ামী লীগে) কাজ করতে আমার ভালো লাগছে না। আমি নিজ পার্টিতেই কাজ করবো।' তখন কেউ কেউ মনে করলো, 'থাক না আমাদের একজন আওয়ামী লীগে আছে, সেখানেই কাজ করুক না।'

পরে অবশ্য পার্টিতে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু তাজউদ্দীনকে প্রত্যক্ষভাবে পার্টিতে নেয়া হয়নি। আমার মতে সেটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। তবে তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগে থেকেও আমাদের জন্য কাজ করেছেন। আওয়ামী লীগের সব তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন। ইন্ডিয়াতে গিয়ে অসম-চুক্তি করার পরই তার মাঝে একটা বিক্ষিপ্ত ভাব এসে যায়। এরপর তিনি কিছুটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তবে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যখন আমরা তাকে তাঁবেদার সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনে করতাম, তখনও তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। (বারান্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার এ বারান্দায় বসে আমার সাথে আলাপ করে গেছেন। ভুল-শুদ্ধ যখন যা করেছেন সবই এসে আমাদের কাছে অকপটে বলেছেন।

প্রশ্ন: বরকত সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

তোয়াহা: বরকতকে আমরা পূর্বাপর ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ হিসেবেই জানি। তবে অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব পুলিশ অফিসারের নিকট হতে যে কথা শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সে ধরণের কথা পূর্বে আমরাও শুনেছি।

প্রশ্ন: আপনি বরকত সম্পর্কে কথাটা কার কাছে শুনেছেন?

তোয়াহা: আমি মোজাফফর আহমদের কাছ থেকে (ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর) কথাটা শুনি। মোজাফফর তখন ওপরের কর্তৃপক্ষ মহলে আনাগোনা করতেন। সেখান থেকে শুনে এসে তিনিই প্রথম আমাকে কথাটা বলেন। কিন্তু আমরা তখন এতো টেনশানে ছিলাম যে, এ নিয়ে ভাববার ফুরসত ছিল না।

[কামরুদ্দীন আহমদ। '৪৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। '৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলনের পর ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে নাজিমুদ্দীন সরকারের সাত দফা দাবি সম্বলিত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তিনিই তার নেপথ্য রূপকার। বস্তুত সে চুক্তিই প্রথম শাসনতান্ত্রিক পন্থায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতি এনে দেয়। '৫২ সালের আন্দোলনও সরকার কর্তৃক সে চুক্তিভঙ্গের ফলশ্রুতি। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন ও ১৯৫৫ সালে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৫৭ সালে রাজনীতি ত্যাগ করে কূটনীতিকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।]

প্রশ্ন: এরপর (চুক্তি স্বাক্ষরের পর) কি ঘটলো?

কামরুদ্দীন: চুক্তি ও মুক্তির কাজ সমাধা করে আমি ১৬ই মার্চ সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ভাষণ দেওয়ার জন্য যাই। ১৭ই মার্চ আমি ঢাকায় ফিরে আসি। ১৮ই মার্চ শুনি চুক্তি কেউ মানছে না। না সরকার পক্ষ, না সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ। উভয় পক্ষই পরস্পরের ওপর দোষারোপ করছে। নাজিমুদ্দীন সাহেব জানালেন শেখ মুজিব সহ তাদের গ্রুপ চুক্তি লঙ্ঘন করে পরিষদ ঘেরাও করেছে। এমন কি তোফাজ্জল আলী MLA এবং ড: মালিক MLA কে মারধর করেছে।

আমি এ ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানালেন সরকারও চুক্তি মানছে না। তারা মানলে আমরা মানবো। পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের পরিবর্তে সরকার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

তোয়াহা ও তাজউদ্দীন পরিষদ ঘেরাও, MLA তোফাজ্জল আলী ও ড: মালিককে মারধর করার জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করেন। তারা জানালেন রাষ্ট্র ভাষার দাবি আদায়ের চেয়ে পার্লামেন্টারী রাজনীতির উপদলীয় কোন্দলের সুযোগ গ্রহণেই শেখ মুজিব বেশী আগ্রহী।

সত্যিকারে ব্যাপারটা ছিল তাই। রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে যারা আন্দোলন করতে চেয়েছিল তারাও দাবি আদায়ের জন্য একটা আইনগত চুক্তির ভিত্তি পেয়েছে। নাজিমুদ্দীন সরকারও জিন্নাহ সাহেবের আগমনের প্রাক্কালে চুক্তির মাধ্যমে পরিস্থিত শান্ত করার সুযোগ লাভ করেছেন।

কিন্তু শেখ মুজিব কিছুই পায়নি। তার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের সুযোগে নাজিমুদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করে উপদলীয় কোন্দলের সুযোগে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপকে ক্ষমতায় আনার ব্যবস্থা করা। সে ব্যবস্থা তখনও হয়নি বলে পরিষদ ঘেরাও করে চলছে। তোফাজ্জল আলী ও ড: মালিককে মারধর করার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ সাজানো যা নাজিমুদ্দীন আঁচ করতে পারেননি। তাই তিনিও মারধর খাওয়া তোফাজ্জল আলী ও ড: মালিকের পক্ষেই মুজিবকে দায়ী করে বক্তব্য রেখেছেন। তোফাজ্জল আলী ও ড: মালিক উভয়ের সাথে শেখ মুজিবের নেপথ্য দহরম মহরম ছিল। তারা সাজানো মারখেয়ে চেয়েছিলেন নাজিমুদ্দীনের সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে। অপর দিকে নাজিমুদ্দীনের পতন ঘটিয়ে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে। এই হলো '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহের এক অধ্যায়।

[কাজী গোলাম মাহবুব। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' তিনিই ছিলেন আহবায়ক। এই কর্মপরিষদের নেতৃত্বেই ১৯৫২ সালে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়।]

প্রশ্ন: পরিষদে কারা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন? তারা কি কোন গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

গোলাম মাহবুবঃ খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আলী আহমদ খান (বিচারপতি মোর্শেদের পিতা), খান সাহেব ওসমান আলী, মোঃ আলী, ডাঃ মালেক (পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নর) প্রমুখ রাষ্ট্রভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। পরিষদের ভেতরে এরা সোহরাওয়ার্দী সমর্থক বলে পরিচিত ছিলেন। তাই বলে এদের সবাই যে মনপ্রাণ দিয়ে পরিষদের অভ্যন্তরে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতেন তা নয়। এদের অনেকে ভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে নাজিমুদ্দীন সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গঠনে তৎপর হন। কেউ কেউ আবার পরবর্তী সময়ে নাজিমুদ্দীনের সাথে নেগোসিয়েশন করে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা চালান এবং ভাষা আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে পরিষদের অভ্যন্তরে ৬৪ জন এম.এল.এ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো। সোহরাওয়ার্দী সমর্থক বলে পরিচিত এই ফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে শেখ মুজিবও তৎপর ছিলেন। কারণ শেখ মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর ফ্যানাটিক সমর্থক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ফ্রন্ট রাষ্ট্রভাষাকে ইস্যু হিসেবে নিয়ে মুসলিম লীগ এম.এল.এ-দের তাদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা চালায়। এ ছাড়া পরিষদে নাজিমুদ্দীন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত পদ এবং ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যও এক শ্রেণীর এম.এল.এ- র মধ্যে কার্যকর ছিল। আরো নির্মম সত্য এই যে, এই গ্রুপের যারা ভাষা আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পদ লাভ করেছেন পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত ব্যক্তিত্বও তাদের সাথে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করেছেন। সেদিন মহান ভাষা আন্দোলনকে ব্যবহার করে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'টাউট ইজমের' অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাও পরবর্তীকালে তাদের সাথে কমপ্রোমাইজ করেছেন - এটা আজো আমার কাছে দুঃখজনক বলে মনে হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে 'টাউট ইজমের'-এ ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। জাতিকে অবশ্যই এই 'রাজনৈতিক টাউট ইজমের' কবল হতে মুক্তি লাভ করতে হবে।

প্রশ্নঃ আমাদের রাজনীতিতে আজো 'টাউট ইজমের' ধারা অব্যাহত রয়েছে - এর দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?

গোলাম মাহবুবঃ রাজনীতিতে 'টাউট ইজমের' ধারা অব্যাহত রয়েছে এই জন্য বলছি যে, যারা আদর্শ ও নীতিচ্যুত হতে পারছে, তারাই আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাদৃত হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলেই তা বুঝতে পারবেন।

যে মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) পদের লোভে নীতিচ্যুত হয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গ্রুপ ত্যাগ করলেন, তার ক্যাবিনেটেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত নেতা পরবর্তীকালে ল' মিনিস্টার হিসেবে যোগদান করেন। যে (খান বাহাদুর) আবদুল ওহাব খান পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছেন এবং পরে ভাষা আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছেন, তিনিই ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের টিকেট থেকে বঞ্চিত হয়ে যুক্তফ্রন্টে ভিড়লে সোহরাওয়ার্দী-হক সাহেবের আশীর্বাদে যুক্তফ্রন্টের মনোয়ন পান। তিনি ছিলেন হক সাহেবের ভাগ্নী জামাতা। হয়তো এই যোগ্যতার বলেই তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন। ঠিক এমনি ধরণের ব্যাপার ঘটে ১৯৭০ সালে। শেখ মুজিব তার ভগ্নিপতি সেরনিয়াবাতকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেন। অথচ সেরনিয়াবাত কোনদিন আওয়ামী লীগ করতেন না।

রাজনীতিতে, যখন ডেডিকেশন এবং সিনসিয়ারিটির মূল্য দেয়া হয় না, তখনই এতে টাউট ইজমের অনুপ্রবেশ ঘটে, আর টাউট ইজম থেকে সৃষ্টি হয় ন্যাশনাল ক্রাইসিস।

প্রশ্ন: তোয়াহা সাহেবের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে জানতে পারলাম, ভাষা আন্দোলনে গোলাম আযম সাহেবও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গোলাম আযম সাহেব তখন কি ছিলেন? তার কথা কিন্তু আর কেউ বলেন নি।

গোলাম মাহবুবঃ হ্যাঁ, গোলাম আযম, মৌলবী ফরিদ আহমদ এরা অনেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। কিন্তু কে কার কথা বলে বলুন। অন্যের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার মতো হৃদয়বৃত্তি আমাদের আছে কি? আমরা তো সবাই আত্মপ্রচারে ব্যস্ত। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি এবং গোলাম আযম ছিলেন জিএস। অত্যন্ত চরিত্রবান এবং আদর্শ প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন: আপনি এর পূর্বে বরকতকে দেখেছেন কি? ছাত্রদের কোন মিটিং-এ তাকে লক্ষ্য করেছেন কি?

গোলাম মাহবুবঃ আমি এর পূর্বে আর কখনও ছাত্রসভায় বরকতকে দেখেছি বলে মনে হয় না। বরকত আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

প্রশ্ন: বরকত পুলিশের ইনফর্মার ছিল বলে অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সে সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

গোলাম মাহবুবঃ অধ্যাপক রাজ্জাক সাহেব পুলিশ অফিসারের নিকট শুনেছেন। সুতরাং পুলিশের রক্ষিত রেকর্ডপত্র থেকেই এ তথ্যের সঠিক প্রমাণ আহরণ করা যেতে পারে। তবে বরকত যা-ই হউক না কেন, আমরা তাকে শহীদ মনে করি। কারণ ঘটনার অনিবার্য্য পরিণতি তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে।

প্রশ্ন: তখন ছাত্রদের মধ্যে পুলিশের ইনফর্মার থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন কি?

গোলাম মাহবুবঃ হ্যাঁ, থাকতে পারে। কারণ, পরিষদের এমএলএ-গণ যখন ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে নেপথ্যে পদ লাভের চেষ্টা চালাতে পারেন, তখন ছাত্রদের মধ্যেও সরকারি এজেন্ট বা পুলিশের ইনফর্মার থাকা বিচিত্র কিছু নয়। সকল মহান আন্দোলনের পেছনেই স্বার্থান্বেষী শক্তির স্যাবোটাইজ মূলক কারসাজি থাকতে পারে।

[মোহাম্মদ সুলতান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে একজন সংগ্রামী ছাত্রনেতা হিসেবে তৎপর ছিলেন। যে ক'জন ছাত্রনেতার অনমনীয় দৃঢ়তায় '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর ছাত্রসমাজের পক্ষ হতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হয়, তিনি তাদের অন্যতম।]

প্রশ্ন: ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা হয়েছে বলে আপনার জানা আছে কি?

সুলতানঃ হ্যাঁ, ১৯৭৪ সনে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেই তেমন একটি চেষ্টা হয়েছে। টিভির সাক্ষাৎকারে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করছিলেন শেখ মুজিব এবং কে.জি. মোস্তফা। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব কে.জি. মোস্তফাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার মনে নেই মোস্তফা, '৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছিলাম?' এমনি ধরণের অনেক কথা।

কে.জি. মোস্তফা মাথা নেড়ে, কখনো কথা বলে শেখ মুজিবের বক্তব্যের সমর্থন দিচ্ছিলেন। অথচ শেখ মুজিব তখন জেলে। আপনি নিজেই দেখুন, '৫৩ সালে প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারী নামক বইতে ভাষা

আন্দোলন সম্পর্কিত কে.জি. মোস্তফার একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এটা কে.জি. মোস্তফার নিজের লেখা প্রবন্ধ। এতে আছে 'শেখ মুজিব তখন জেলে। ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকেই তিনি জেল খাটছিলেন।' এ প্রবন্ধে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিব সম্পর্কের কোন কথার উল্লেখ নেই। আর পরবর্তীকালে তিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবকে '৫২-র ভাষা আন্দোলনের ১৪৪ ধার ভাঙ্গার নেতা বানিয়ে ফেলেন। যার ফলে তিনি লেবাননের রাষ্ট্রদূত পদটি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের কোন সম্পর্ক নেই।

[আবদুল মতিন (ভাষা মতিন)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক ছিলেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ২০শে ফেব্রুয়ারীর নবাবপুরের মিটিং-এ যে চারজন ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৫২ সালে মার্চের প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি কারাবরণ করেন।]

প্রশ্নঃ শেখ মুজিবই প্রথম কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। ঢাকা ডাইজেস্টের সাক্ষাৎকারে কেউ বলেছেন যে, নঈমুদ্দীন প্রথম 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ করেন, এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

মতিনঃ আপনি ইতিহাসের উপকরণ নিতে এসেছেন। ইতিহাসের অধ্যায়ে কোন বিকৃত বা কাল্পনিক তথ্যই টিকে থাকতে পারে না। শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট নন। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কনভোকেশনে তার উপস্থিত থাকার প্রশ্নই উঠে না। শেখ মুজিব কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন - এসব বক্তব্য মনগড়া কাহিনী মাত্র। নঈমুদ্দিন কনভোকেশন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ আমার প্রতিবাদের সাথে সেও কণ্ঠ মিলাতে পারে কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছিল তাই আপনাকে বলেছি। তাতে সত্যের সামান্যতম অপলাপ নেই।

[গাজীউল হক। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে যারা দু:সাহসিক ভূমিকা পালন করেন, তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় যে ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়, জনাব গাজীউল হকই সে সভায় সভাপতিত্ব করেন।]

প্রশ্নঃ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' কেন গঠিত হয়?

গাজীউল হকঃ ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে আসেন। তার আগমন উপলক্ষে ঢাকার ছাত্র সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারণ ঢাকা আসার কিছুদিন আগে করাচীতে গণ-পরিষদের বৈঠকে জনাব লিয়াকত আলী খান, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে জনাব লিয়াকত আলী খানকে কালো পতাকা দেখানোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে ডঃ মাহমুদ হোসেনের (তদানীন্তন ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট) পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জিমনেসিয়াম গ্রাউন্ডে' লিয়াকত আলী খানের যে ছাত্রসভা হবে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের জিএস জনাব গোলাম আযম (অধ্যাপক গোলাম আযম) ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটা মানপত্র পাঠ করবেন। সে মানপত্রে উর্দুর সাথে বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জোরালো দাবি সন্নিবেশিত থাকবে।

সিদ্ধান্ত অনুসারে জনাব গোলাম আযম সে জনসভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করেন। গোলাম আযম সাহেব যখন মানপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি পাঠ করছিলেন, তখন ছাত্ররা তুমুল করতালির মাধ্যমে এ দাবির প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। এতে বাহ্যতঃ লিয়াকত আলী খান ক্ষুব্ধ হন।

প্রশ্ন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি আহুত ১১ই মার্চের বিশ্ববিদ্যালয় হরতাল কি সফল হয়েছিল? ছাত্রদের মধ্যে সে সময় ধর্মঘটের প্রশ্নে কোন ভিন্নমত ছিল কি?

গাজীউল হক: '৫০ এবং '৫১ সালের ১১ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্থকভাবে হরতাল পালিত হয়। এসব হরতালে সাধারণ ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। ধর্মঘট সম্পর্কে ভিন্নমতের কথা বলছেন, না, ছাত্রদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ ছিল না। তবে দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়।

আমার মনে পড়ছে, '৫১ সালের ১১ই মার্চ সংগ্রাম কমিটি আহুত হরতালে সব ছাত্রই সাড়া দেয়। শুধুমাত্র একজন ছাত্র ভিন্নমত প্রকাশ করে। সে ছিল তদানীন্তন আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন ড: সাদানীর ভাতিজা। হরতাল উপেক্ষা করে সে ক্লাস করছিল। তাকে ছাত্ররা ক্লাস থেকে মধুর রেস্তোরায় ডেকে আনে। সেখানে মতিন সাহেব সহ আমরা সবাই তাকে ছাত্র ঐক্য প্রশ্নে বুঝাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই আমাদের আহবানে সাড়া দিচ্ছিল না। ঠিক এ সময় (কবি) হাসান হাফিজুর রহমান উত্তেজিত হয়ে চট করে তার পা থেকে স্যান্ডেল খুলে দু'ঘা লাগিয়ে দেন। তারপর নুর নবী (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট) সজোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকে চড়ে বসে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ি। মতিন সাহেব সহ আমরা সবাই মিলে তাকে ছাড়িয়ে নিই। অবশ্য এ ধরণের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

প্রশ্ন: ১৯৭৩ সালে জনাব আবদুস সামাদ আজাদ (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় জনাব শেখ মুজিবুর রহমান নাকি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের জানালা দিয়ে সামাদ সাহেবকে ১৪৪ ধারা ভাংগার নির্দেশ দিয়েছিলেন? পরবর্তীকালে কে.জি. মোস্তফাও অনুরুপ সাক্ষাৎকারে সামাদ সাহেবের কথা সমর্থন করেছিলেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

গাজীউল হক: (বিস্ময়ের সাথে) এটা কি করে সম্ভব? ২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেল ৩ টায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শেখ মুজিব এর পূর্বেই ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত হন। সামাদ সাহেব কি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জানালা দিয়ে শেখ মুজিবের মৌখিক নির্দেশ পেলেন? এটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এ সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা।

[আবুল হোসেন মিয়া। '৪৬-'৪৯ সালে ঢাকায় এবং '৫২ সালে রংপুরে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৪৯ থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের রংপুর জেলার সেক্রেটারী ছিলেন।]

প্রশ্ন: ঢাকায় কি উদ্দেশ্যে এলেন?

আবুল হোসেন: ঢাকার ৯৭, নবাবপুর দলীয় অফিসে আসি দলীয় সিদ্ধান্ত জানার জন্য। ইতিপূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের সব নেতাই গ্রেপ্তার হন। তখন অধ্যাপক কামরুজ্জামানকে অফিস-ইন-চার্জের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু পরে অধ্যাপক কামরুজ্জামানের সাথে আই.বি-র যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ সম্পর্কে সম্ভবত: ২৭/২৮শে মার্চের দিকে দলের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন: তখন কি আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন নেতাই বাইরে ছিলেন না?

আবুল হোসেন: কিছু নেতৃবৃন্দ বাইরে ছিলেন। যেমন - মরহুম সালাম খান, আতাউর রহমান খান, শামসুদ্দীন আহমদ (কোলকাতা সোহরাওয়ার্দী ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ছিলেন) এবং আলী আহমদ

(কুমিল্লা হতে নির্বাচিত এমএলএ) প্রমুখ। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ আমাকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর দায়িত্ব নেয়ার কথা বলা হয়। আমি একটু ভেবে শেখ মুজিবের নাম করি। কিন্তু শেখ মুজিবকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর দায়িত্ব দিতে কেউ রাজী হল না।

প্রশ্ন: শেখ মুজিব কি তখন জেলের বাইরে? তিনি তো দলের জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। তাকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারীর দায়িত্ব দিতে কি আপত্তি ছিল? আর আপনিই বা কেন ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিজে গ্রহণ না করে শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করলেন? শেখ মুজিবের সাথে আপনার সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

আবুল হোসেন: এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। হ্যাঁ, শেখ মুজিব তখন সবেমাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন। সম্ভবত: তিনি মার্চের ১৫/২০ তারিখের দিকে মুক্তি পান।

প্রশ্ন: আপনার কথার মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন করতে হচ্ছে - তিনি গ্রেপ্তার হন কবে?

আবুল হোসেন: তিনি বায়ান্নর আন্দোলনের অনেক আগে গ্রেপ্তার হন। বায়ান্নর আন্দোলনের সাথে তার গ্রেপ্তারের কোন সম্পর্ক নেই। যখন বায়ান্নর আন্দোলনের জন্য আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কাউকে বা হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে - তখন শেখ মুজিব জেল থেকে ছাড়া পান।

এবার অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেয়া যাক - যেহেতু শেখ মুজিব জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন সুতরাং তারই অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী হওয়ার কথা। কিন্তু কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন সাহেব বললেন, 'ও জেল থেকে বেরিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় ওর দ্বারা দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।'

সালাম খান বললেন, 'ও যে হামবাগ, ওর দ্বারা চলবে না। ও শুধু ভায়োলেন্স করবে।'

আতাউর রহমান সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমিই চার্জ নাও।' আলী আহমদ সাহেবও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

প্রশ্ন: আপনি এত সমালোচনা শুনে শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করলেন কেন? তার সাথে আপনার কোন বিশেষ সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি?

আবুল হোসেন: বিশেষ সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতা যাই কিছু বলুন, কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় থেকে মুজিবের সাথে পরিচয়। সে অনেক পুরনো কাহিনী। কুষ্টিয়াতে তখন নাজিমুদ্দীন সমর্থক ছাত্র সংগঠন শাহ আজিজ (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী) গ্রুপের নিকট অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ছাত্র সংগঠন পরাজিত হয়। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ ছাত্রনেতা ছিলেন নুরুদ্দীন (গ্রীন এন্ড হোয়াইট কোম্পানীর মালিক)।

কোলকাতায়ও এই গ্রুপের ছাত্রদের মধ্যে শত্রুতা চলতে থাকে। কোলকাতায় শাহ আজিজ গ্রুপের ছাত্ররা নুরুদ্দীন গ্রুপের ওপর প্রায়ই হামলা চালাতো। শাহ আজিজ গ্রুপে হামলাবাজ ছাত্র বেশি ছিল বলে নুরুদ্দীন গ্রুপ পেরে উঠত না। এদের দলে শুধু কিউ জি আজমিরী ছিল একটু সাহসী। তাই দুর্বল সোহরাওয়ার্দী সমর্থক নুরুদ্দীন ছাত্র গ্রুপকে শক্তিশালী করার জন্য আবুল হাশিম সাহেবের পরামর্শক্রমে গোপালগঞ্জ হতে শেখ মুজিবকে এনে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি করে দেয়া হয়। এতে সোহরাওয়ার্দী সমর্থক নুরুদ্দীন গ্রুপ বেশ শক্তিশালী হয়।

তখন থেকে শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয়। আমি ভেবেছিলাম বিভিন্ন কারণে মুজিব জেল খেটে তখন একটু নাম করেছে। তখন সরকারের জেল-জুলুম যার ওপর পতিত হতো জনগণ তার ওপর

সহানুভূতিশীল হয়ে পড়তেন। আমরাই দলীয়ভাবে শেখ মুজিবকে অন্যায়ভাবে জেলে আটকে রাখার জন্য প্রতিবাদ সভা করেছি, ফলে ছাত্রনেতা হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। তুলনামুলকভাবে আমরা আরো অপরিচিত ছিলাম। দলকে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ ধরণের পরিচিতির প্রয়োজন। এসব কথা ভেবেই আমি শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করি এবং আমাকে ভাববার সময় দেওয়ার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কয়েকদিনের জন্য মূলতবী রাখার অনুরোধ করি। আমার অনুরোধ রক্ষিত হয়।

এদিকে আমি গোপালগঞ্জে মুজিবের কাছে তাড়াতাড়ি ঢাকায় আসার জন্য চিঠি লিখে দিই। পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী হিসেবে শেখ মুজিবের নাম আমিই প্রস্তাব করি। আমার প্রস্তাবের পর সামনাসামনি আর কেউ বিরোধিতা না করায় শেখ মুজিবই আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

[আতাউর রহমান খান। সাবেক প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের অনেকের গ্রেফতার ও আত্মগোপনের পর, পরবর্তী পর্যায়ে পুনর্গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের তিনি আহবায়ক নির্বাচিত হন।]

প্রশ্নঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

আতাউর রহমানঃ শুধু ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসই নয়, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যেভাবে বিকৃতির চেষ্টা চলছে তাতে শঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে। জাতীয় ইতিহাস এবং ঘটনাক্রম বিকৃতির যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা জাতির জন্য কোনক্রমেই শুভ নয়। সত্য ঘটনা এবং ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে ঐ প্রবণতার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। অতি দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, রেডিও-টিভির মত জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি পর্যন্ত আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস এবং ঘটনাক্রম বিকৃতির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ জাতীয় ইতিহাস বিকৃতির এমনি ধরণের দু'একটি দৃষ্টান্ত পেশ করবেন কি?

আতাউর রহমানঃ এ ধরণের দৃষ্টান্তের তো শেষ নেই। ডাইজেস্টেই এ ধরণের দু'একটি দৃষ্টান্ত মুদ্রিত হয়েছে। এ ধরণের প্রচেষ্টা দেখলে খবই দু:খ হয়।

পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবের আগমনের কথা মনে পড়ছে। লন্ডন দিল্লী হয়ে শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফিরছেন। এদিকে টিভি ও বেতারে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ (ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রী) শেখ মুজিবের আগমন বার্তা ও গুণগান প্রচার করতে গিয়ে এমন সব তথ্য বিকৃত করে যাচ্ছিলেন যার সাথে সত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি একপর্যায়ে কিভাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে ভাষার দাবির সংগ্রামে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হচ্ছিল তার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন অথচ তিনি তখন কারাগারে।

এ ছাড়া কে. জি. মোস্তফার সাথে এক টিভি সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বলেছিলেন, কি ভাবে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন দেশ বিভাগের পরিকল্পনা পেশ হওয়ার পর কোলকাতা সিরাজউদ্দৌলা হলে জিন্নাহ সাহেবের ভাষণের চ্যালেঞ্জ করে পাকিস্তান টিকবে না বলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অথচ উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনীতিতে জিন্নাহ সাহেবের ভাষনের চ্যালেঞ্জ করা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। আর শেখ মুজিব ছিলেন তখন নেহায়েত ছেলে মানুষ।

ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকতকে নিয়ে ইদানিং বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালেও হুমকি ও পাল্টা হুমকির মাধ্যমে এমন সব কথা প্রকাশিত হয়েছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক অপ্রিয় ঘটনা আলোর মুখ দেখেছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহনকারী একদল আর একদলকে কোণঠাসা করার জন্য যেসব তথ্য প্রকাশ করছেন তাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অনেক অধ্যায় নতুন করে সাজাতে হবে।

স্বাধীনতার পর একদিন তাজউদ্দীন এলেন আমার বাসায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে ওসমানী সাহেব সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ তুললেন আমি রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলাম। তিনি জানালেন, 'যুদ্ধের ফ্রন্টের ধারেকাছেও তিনি (ওসমানী) যাননি। সারাদিন বাংলোতেই কাটাতেন। মাঝে মাঝে খড়ম পায়ে দিয়ে করিডোরে বেড়িয়ে আয়েশ করেই সময় কাটিয়ে দিতেন।' আমি বললাম, 'তাই যদি হয় তবে তাকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বানিয়ে রাখা হয়েছিল কেন?' তাজউদ্দীন বললেন, 'তখন কিছু করার ছিল না। নামমাত্র প্রধান সেনাপতিকে বদল করারও কোন অর্থ ছিল না।' তাজউদ্দীন বলে চললেন, 'আত্মসমর্পনের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তাকে খোঁজা হচ্ছে ঢাকা পাঠানোর উদ্দেশ্যে। কাউকে না জানিয়ে তিনি তখন গৌহাটি চলে গেছেন।' এসব কথা শুনতে শুনতে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

কি আশ্চর্য যে, স্বাধীনতার ঘোষনা এবং তার সঠিক সময় নিয়েও জাতির সাথে প্রতারণা চলছে॥"[৪৮]

১২.

"... ভাষার দাবীটি ছিল জাতীয় দাবী। ফলে, ভাষা আন্দোলন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। কোন একক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে এ আন্দোলনকে সীমিত না রেখে একে সর্বদলীয় রূপ দেয়ার ব্যাপারে তমদ্দুন মজলিশের কোন আপত্তি ছিল না। ফলে, সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বলতে গেলে তখন থেকেই ভাষা আন্দোলনে রাজনীতিবিদদের সরাসরি ও বলিষ্ঠ আগমন ঘটে। পরবর্তীতে কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দল ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় এবং আন্দোলন পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলনকে সংকীর্ণ ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের যে ঘৃণ্য প্রয়াস চালায় তা সত্যি লজ্জাকর। এদের অপপ্রয়াসের ফলে ভাষা আন্দোলনের সত্যিকার ইতিহাস আজ কলঙ্কিত। ভাষা আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেককেই আজ তাই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলতে শোনা যায়। এ সব অভিযোগ এতই মারাত্মক এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক যে, ইচ্ছে করলেই যে কেউ তা অস্বীকার করে এড়িয়ে যেতে পারেন না। কেননা, এ আন্দোলন সংগঠনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, ইতিহাস বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগও তারাই তুলেছেন।

ভাষা আন্দোলনের সংগঠক গাজীউল হক অভিযোগ করেছেন যেঃ 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে এবং তা দু'দিক থেকে। এক দিকে কিছু নতুন দাবীদারকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং অন্যদিকে কারো কারো নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারার কাঠামোতে ফেলার জন্য এ মহান আন্দোলনের ইতিহাসকে ভিন্নরূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন অনেকে।' (গাজীউল হকের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৮ - পৃঃ ৩৪)

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভংগের যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সাধারণ ছাত্র-জনতা কর্তৃক, সে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন মুহাম্মদ সুলতান। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগের সাথে সাথে সে বিকৃতির একটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেনঃ 'টিভির সাক্ষাৎকারে (১৯৭৪) ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ করছিলেন

---

[৪৮] ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন/মোস্তফা কামাল ॥ [বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭। পৃ. ৫৭-৬৮/৮৯-৯০/১৪১-১৪৩/১৪৬-১৫৬/১৬৮-১৭৪/২০৭/২১৪/২৫৯]

শেখ মুজিব এবং কে জি মোস্তফা। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব কে জি মোস্তফাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার মনে নেই মোস্তফা '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমি ১৪৪ ধারা ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলাম।-এমনি ধরনের অনেক কথা। কে জি মোস্তফা মাথা নেড়ে, কখনো কথা বলে শেখ মুজিবের বক্তব্যের সমর্থন দিচ্ছিলেন। অথচ শেখ মুজিব তখন জেলে। আপনি নিজেই দেখুন, '৫৩ সালে প্রকাশিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামক বইতে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কে জি মোস্তফার একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। এটা কে জি মোস্তফার নিজের লেখা প্রবন্ধ। এতে আছে, 'শেখ মুজিব তখন জেলে। ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকেই তিনি জেল খাটছিলেন।' উক্ত প্রবন্ধে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্কের কোন কথার উল্লেখ নেই। আর পরবর্তী কালে তিনি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবকে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভাঙার নেতা বানিয়ে ফেলেন। যার ফলে তিনি লেবাননের রাষ্ট্রদূত পদটি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের কোন সম্পর্ক নেই।' (মোহাম্মদ সুলতানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৯ - পৃ: ২৯)

এ জন্যই শেখ মুজিবের ভূমিকার মূল্যায়নে মোহাম্মদ তোয়াহা (ঢাকা ডাইজেষ্ট, মার্চ '৭৮) বলেনঃ 'ভাষা আন্দোলনকে উপদলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত করার মাঝেই শেখ মুজিবের প্রকৃত ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে।'

যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ছাত্রী ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, ১৪৪ ধারা ভংগ করে রাজপথে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ রেখেছিলেন ডঃ সুফিয়া আহমদ তাদের অন্যতম। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তাঁরও। তিনি বলেনঃ 'যারা এ আন্দোলনের ধারে কাছেও ছিলেন না, তারা আজকাল এ সম্পর্কে রেডিও, টিভির সাক্ষাৎকারে অংশ নিচ্ছেন। যাঁরা সত্যিকারে জড়িত ছিলেন তাঁদের অনেকের খোঁজও কেউ নিচ্ছে না।' (ড: সুফিয়া আহমদের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, এপ্রিল '৭৮ - পৃ: ২৫)

'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' নামে একটি সুবৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থ লিখেছেন বদরুদ্দীন ওমর। এ গ্রন্থে মূলতঃ ভাষা আন্দোলনের ইমেজকে ব্যবহার করে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তথা বামপন্থী রাজনীতিকে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যদিও বইটির অধিকাংশ জায়গা 'তৎকালীন রাজনীতির' বিশদ বিবরণে ভরপুর তবু শিরোনামের দাবী রক্ষায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কেও লেখককে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে হয়েছে। এ কিঞ্চিৎ আলোচনাটুকুও যদি অভিযোগ বহির্ভূত হতো তবে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান যে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন তা সত্যি উদ্বেগজনক। আতাউর রহমান খানের যে ইন্টারভিউর বিবরণ বদরুদ্দীন ওমর তার গ্রন্থে দিয়েছেন তার সম্পর্কে আতাউর রহমান খান বলেনঃ 'জনাব বদরুদ্দীন ওমরের সাথে আমার কোন ফরমাল ইন্টারভিউ হয়নি। তাঁর 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' বইটির প্রথম খন্ড পড়ে দেখতে পেলাম এতে কয়েকটি ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। একদিন বদরুদ্দীন ওমর আমার সাথে দেখা করতে আসলে বললাম, 'তোমার বইতে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি রয়েছে। অন্যের মুখে শুনেছ, হয়তো তারাই ভুল বলেছে।' তিনি আরো বলেনঃ 'বদরুদ্দীন ওমর আমার সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলো করেছেন তা পড়ে আমি অবাক হয়েছি। ... বদরুদ্দীন ওমর পিতৃসুবাদেও আমার স্নেহভাজন সুলেখক। তাই, ভেবে অবাক হই, কেমন করে এতগুলো কথার সমাবেশ সে করতে পারলো।' (আতাউর রহমান খানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুলাই '৭৮ - পৃ: ২৮)

ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠক ও উদ্যোক্তা প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম খুব ছোট্ট আকারে 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস' নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন অনেকদিন আগে। বইটির ব্যাপ্তি এতই ক্ষুদ্র যে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতা এতে ফুটে ওঠেনি। প্রসঙ্গতঃ তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত এমন

অনেকের নাম করেছেন যারা মফস্বল এলাকাতেও আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলোচনা এতই সংক্ষিপ্ত যে মনে হবে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কোন বইয়ের 'খুঁটি নাটি' ফর্দ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতি সম্পর্কে তার বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'সবচেয়ে দুঃখ আন্দোলনের প্রেরণার মূল উৎস আমাদের এই সংগ্রামের কাহিনী এখন মিথ্যা প্রচারণা ও সুযোগ সন্ধানীদের প্রচেষ্টায় বিকৃত ও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইতিহাসের অপব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।' (প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ '৭৮ - পৃঃ ২৮)

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম একজন সুসাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর লেখালেখি অনেক দৈনিক ও পত্রিকার পাতা ও সাময়িকীগুলোর মান বৃদ্ধি করে প্রতিবারই। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণসহ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যে কোন কারণেই হোক তিনি উপহার দিতে পারেননি এবং এজন্যই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির জালে আবদ্ধ আজো। উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইতিহাসের অপব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে বলে তিনি যে স্বীকৃতি সেখানে দিয়েছেন এ অপব্যাখ্যাকারীরা কারা জাতির সামনে সে পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা দরকার। তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ 'আমরা পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলাম, আজকের রাজনীতির পঙ্কিলতা আমাদের কাছে অকল্পনীয়।' (প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ '৭৮ - পৃঃ ২৮) হয়তো রাজনৈতিক অঙ্গনের ক্ষমতাধরদের মোকাবেলা করার অবস্থা তাদের ছিল না এবং সে কারণেই বিকৃতিকারীদের প্রশ্রয় দিতে হয়েছে তাদেরকে। এ সব বিকৃতিকারীরা ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানোর সাথে সাথে বিকৃতি ঘটিয়েছে ভাষা আন্দোলনের আদর্শিক চেতনারও। তাঁর ভাষায়ঃ 'মারাত্মক ব্যাপার হলো এই যে, একই সাথে আদর্শকেও কোনঠাসা করার সুযোগ নিয়েছে সুযোগ সন্ধানী সম্প্রদায়। এরা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত অনুপ্রবেশের মাধ্যমে প্রকৃত কর্মীদের কর্মধারা ও ইতিহাসকে মুছে দিতে চেয়েছে। আশ্চর্য, যারা জোর গলায় কোরাসে ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করছে - আন্দোলনের সেই সংকটময় মুহূর্তে তারা বিরোধিতা অথবা কমপক্ষে অসহযোগিতা করেছে।' (প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ '৭৮ - পৃঃ ২৮)

... ভাষা আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই মনস্তাত্ত্বিক পর্বটি গড়ে উঠতে শুরু করেছে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পূর্ব থেকেই। সর্বজনাব ডঃ শহিদুল্লাহ, ডঃ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, ফররুখ আহমদ, আব্দুল হক, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ পর্বটি সাতচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন একরূপ নিশ্চিত, তখনই এর রাষ্ট্রভাষা কি হতে পারে এ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়। সে সুবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীও উচ্চারিত হয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত দিলে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। এ সময় প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাকিস্তানে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শের বাস্তবায়নই ছিল তাদের লক্ষ্য। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাঙালী মুসলমানদের অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ অনুভূতি এ সংগঠনকে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা জোগায়। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায় 'মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং সাচ্চা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছাত্র ও যুবকদের একটা অংশ (তমদ্দুন মজলিশ) এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।' (যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ / বদরুদ্দীন উমর - পৃঃ ৬৭) অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন সংগঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ এ প্রতিষ্ঠানটিই গ্রহণ করে। এ পর্বে কমিউনিষ্ট পার্টি কোন ভূমিকাই রাখেনি। ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে এ সময় কমিউনিষ্টরা ছিল নির্লিপ্ত।

দ্বিতীয় পর্বটি আটচল্লিশের এগারই মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে তমদ্দুন মজলিশ তার প্রতিষ্ঠার পনের দিনের মধ্যে একটি পুস্তিকা বের করে। ভাষা আন্দোলনের সংগঠনে এ পুস্তিকাটি ছিল প্রধান হাতিয়ার। ভাষা আন্দোলনের এ সংগঠন পর্বেও মজলিশকেই যথার্থ অর্থে তৎপর দেখা যায়। এ সময়ও কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষার প্রশ্নে তেমন কোন তৎপরতা চালায়নি।

তৃতীয় পর্বটি বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্বের শেষের দিকে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিজয় এবং বিজয় পরবর্তী সময়েও তাদের বিশেষ ভূমিকা অব্যাহত থাকে।

... ভাষা আন্দোলনে ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল বিতর্কিত এবং প্রশ্নবোধক। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতিতে এরা যে জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে তাও নজীরবিহীন। লক্ষ্যণীয় যে, এ পার্টিটি তার ফ্যাসিষ্ট ও গণবিরোধী ভূমিকার জন্য কোনদিনই জনগণের কাছাকাছি আসতে পারেনি। কিন্তু যে কোন গণআন্দোলনের সফলতার পর তার কৃতিত্বের দাবীদার হয়েছে এ সংগঠনটি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত তাদের এ ভূমিকার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। ইতিহাসের পাতায় এ দলটি যে কাজে সবচাইতে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে তা হলো রাজনৈতিক ব্লাকমেইলিং। শূন্য লতার মত পরগাছা এ সংগঠনটি সর্বদা জনগণের সমর্থিত কোন সংগঠনের ঘাড়ে সওয়ার থেকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ব্যাকিং এ সংগঠনের টিকে থাকার মূল আশ্রয়। কমিউনিষ্ট পার্টির এ প্রাথমিক পরিচয়টি সামনে রেখেই ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা বিশ্লেষিত হতে পারে। কেননা, ভাষা আন্দোলনেও তার এ চিরাচরিত চরিত্রের কোন অন্যথা দেখা যায়নি।

... ভাষা আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা ছিল মূলতঃ আন্দোলন বিরোধী। কিন্তু পার্টির তরুণ কর্মীরা এটা বরদাশত করতে পারতো না। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণ ও প্রবীণদের সাংঘর্ষিক ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তাই পার্টির কোন কোন কর্মীকে আন্দোলনে সক্রিয় দেখা গেলেও দলীয়ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা ছিল প্রশ্নবোধক এবং দুঃখজনক। তিক্ত হলেও সত্য যে, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের চেষ্টার ফলে আজ কমিউনিষ্ট পার্টিই ভাষা আন্দোলনের কৃতিত্বের দাবীদার হয়ে বসেছে। পটভূমির বিকৃত বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃত উপস্থাপনের কারণে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আজও অন্তর্হিত।

... কমিউনিস্ট পার্টি যে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরোধিতা করেছিল তা সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে আরো অনেকেই কথা বলেছেন। তারাও এ মত পোষণ করেন। মোহাম্মদ সুলতান কমিউনিস্ট পার্টির এ সিদ্ধান্তকে ভুল সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন: 'পরবর্তী কালের আন্দোলনই তা প্রমাণ করে।' (মোহাম্মদ সুলতানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৯ - পৃ: ২৮) কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা সম্পর্কে আক্ষেপ করে তিনি আরো বলেন: 'সত্যি করে বলতে কি, কমিউনিস্ট পার্টিই এ দেশের গণআন্দোলনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে।' (মোহাম্মদ সুলতানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৯ - পৃ: ২৮) প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন: 'একুশে ফেব্রুয়ারী, যতদূর মনে পড়ে নয়টার দিকে পার্টির পক্ষ থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার এবং তোয়াহা সাহেবকে আমাদের কাছে পাঠানো হয় যাতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা থেকে আমরা বিরত থাকি।' (মোহাম্মদ সুলতানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৯ - পৃ: ২৮)

'যে বৈঠকে অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে সোচ্চার হলেন সে বৈঠকেই কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশের প্রতীক্ষায় তোয়াহা সাহেব ভোটদানে বিরত রইলেন। অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির যুবকেরা একদিকে, দাদারা অন্যদিকে ছিলেন। নইলে দু'রকম ভূমিকা হবে কেন?' (মোহাম্মদ সুলতানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৯ - পৃ: ৩৬) ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকার ব্যাপারে এ চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ, ভাষা আন্দোলনের নেতা জনাব কামরুদ্দীন আহমদ।

ভাষা আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টির সামগ্রিক ভূমিকা সম্পর্কে জনাব কামরুদ্দীন আহমদ আরো বলেনঃ 'কমিউনিষ্ট পার্টি দাবী আদায় বা মিমাংসার চেয়ে আন্দোলন জিইয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিল বেশী। উত্তেজনা আর বিক্ষোভের পরিবেশকে টিকিয়ে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ দেশের প্রতিটি আন্দোলনেই তাদের এ ভূমিকা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।' (মোহাম্মদ সুলতানের সাক্ষাৎকার / ঢাকা ডাইজেস্ট, জুন '৭৯ - পৃ: ৩৬) ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হলে আন্দোলন ব্যাপকাকার ধারণ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলে যদি সরকার দাবী মেনে নেয় তবে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে-এ আশংকাই সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়াতে প্ররোচিত করে।

ডাঃ ওবায়েদুর রহমান বায়ান্নর আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত প্রথম ১০ জনের অন্যতম ছিলেন। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারী তিনি এবং মরহুম জহির রায়হান এক সঙ্গে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সভায়। তিনি এবং জহির রায়হান পরস্পর ঘনিষ্ট সহপাঠী ছিলেন এবং থাকতেন আলীয়া মাদ্রাসার হোষ্টেলে একই রুমে। এক পর্যায়ে জনাব ওবায়দুর রহমান সহপাঠী জহির রায়হানের প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভাষা আন্দোলন এ দু'জনের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করে কিন্তু আবার এ আন্দোলনই তাদের সম্পর্কের ইতি ঘটায়। যদিও বিষয়টি ব্যক্তিগত তবু কমিউনিষ্টকর্মীরা বন্ধুর প্রতি সাধারণভাবে যে আচরণ করে ডাঃ ওবায়দুর রহমানের জবানবন্দীতে তা বেরিয়ে এসেছে। ভাষা আন্দোলনে এভাবেই তারা গা বাঁচিয়ে থেকেছে এবং পিছনে থেকে প্রয়োজনে সটকে পড়েছে। ডাঃ ওবায়দুর রহমান পুরোনো দিনের সেই সব স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেনঃ 'জহির রায়হানের বড় ভাই জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন বলে জহির রায়হানও সে আদর্শে দীক্ষা লাভের অনুকূল পরিবেশ পায়। তখন থেকেই সে মার্কসের বই পুস্তিকা এনে হোষ্টেলে পড়তো। আমাকেও এসব বই পড়তে দিত। এসব নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক আলোচনা হত। জহির রায়হান কমিউনিষ্টদের মাহাত্ম সম্পর্কে আমাকে বুঝাতো। তরুণ মনে তার এসব কথা কিছুটা রেখাপাত করতো। আমিও অল্প সময়ে মার্কস, লেনিন ও গোর্কির অনেক পুস্তিকা পড়ে ফেলি। এক সময় নিজের অজান্তে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট আদর্শে কিছুটা প্রভাবিত হই। জহির রায়হানের সাথে রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়েও বেশ আলোচনা হতো। রাষ্ট্রভাষার দাবীর প্রতি যদিও স্বভাবতঃই আমি পূর্ব থেকেই অনুরক্ত ছিলাম তবুও একথা সত্যি যে, জহির রায়হানই আমাকে প্রত্যক্ষ জড়িত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর শেষ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনই। জহির রায়হান থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে।'

অতঃপর তিনি কি করে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আসে সে কাহিনী বিবৃত করেন। তিনি বলেনঃ 'একুশে ফেব্রুয়ারী জহির রায়হান এবং আমি একই সঙ্গে বটতলার সভায় আসি। সভায় ১৪৪ ধারা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির পর শামসুল হক (আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সেক্রেটারী) সাহেবকে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে দেখি। এদিকে ছাত্র নেতা গজিউল হক সাহেব টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার আহবান জানান। তিনি ১০ জন করে রাস্তায় নামার প্রস্তাব রাখা মাত্র শুরু হয় এক অভাবনীয় প্রতিযোগিতা-কে কার আগে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান নিয়ে রাস্তায় নামবে। এমনি প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথমদিকেই আমরা এক গ্রুপ গ্রেফতার হলাম। ...কিন্তু বড়ই আশ্চর্য, তখন কোথাও জহির রায়হানের দেখা মিললো না। ...জেলখানার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের ৪০০ জনের মধ্যেও সে ছিল না। ...শুধু তাই নয়, আমি গ্রেফতার হওয়ার পর সে আমার খোঁজটি নেয়ারও প্রয়োজনবোধ করেনি। অথচ গ্রেফতারের পূর্বে সে এবং আমি ছিলাম নিত্য সহচর।' (ডাঃ ওবায়দুর রহমান / ঢাকা ডাইজেস্ট মার্চ-এপ্রিল '৭৯ - পৃ: ৩৫-৩৬)

ভাষা আন্দোলনে কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ কর্মীর এ গা বাঁচানোর ভূমিকা গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিস্মিত করেছে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক কাজী গোলাম মাহবুব-এর নিকট ভাষা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। জবাবে তিনি জানালেনঃ 'ভাষা আন্দোলনে বামপন্থীদের

ভূমিকা থাকবে কোথা থেকে? তখন কমিউনিষ্ট পার্টিতো 'ব্যান্ড' ছিল। তাঁদের কোন ভূমিকা পালনের প্রশ্ন ওঠে কি করে? তোয়াহা সাহেব তখন গণতান্ত্রিক শক্তির সাথেই কাজ করতেন। নেপথ্য থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি তাকে কি নির্দেশ দিত জানি না। তবে বাহ্যতঃ তিনি আমাদের কাছে সে পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না। আর অলি আহাদ সাহেব কিসের বামপন্থী ছিলেন? বামপন্থীরা নেপথ্য থেকে তাঁকে কাজে লাগাতো। তিনি ছিলেন 'হাইলি এ্যামবিশাস।' এ জন্য বামপন্থীরা প্রয়োজন মতো তাঁকে 'ইউটিলাইজ করতো। তিনি বামপন্থী ছিলেন না বরং বলা যায়, তিনি বামপন্থীদের টেপের মধ্যে ছিলেন। এ ছাড়া আর যারা বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন-যেমন মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, তাসাদ্দুক, গাজীউল হক তাঁদের সবার স্ব স্ব ভূমিকাতো দৃশ্যপটে আছেই। আপনি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন, আন্দোলনে থেকেও বামপন্থীরা পদ ও সুযোগ লাভের জন্য অধিকতর তৎপর ছিল আর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির সদস্যরা তো শুধু 'সাফার' করেছে।' (কাজী গোলাম মাহবুব / ঢাকা ডাইজেস্ট মে '৭৮ - পৃঃ৩৫) ভাষা আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়কের এ বক্তব্য গুরুত্বের সাথে প্রণিধানযোগ্য। নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বামপন্থীদের ভূমিকায় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির সদস্যরা শুধু 'সাফার'ই করেছে।

ভাষা আন্দোলনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর অলি আহাদ সম্পর্কে কাজী গোলাম মাহবুবের মন্তব্য হয়তো একটু রূঢ় তবে তিনি যে আসলেই কমিউনিষ্ট পার্টির ক্যাডার ছিলেন না একথা ঠিক। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিপ্লবী চরিত্রের মানুষ। আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টিগুলো প্রকাশ্যে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে যাদের দিয়ে প্রয়োজনের সময় তারা কিছু কাজ করিয়ে নিতে পারে। কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে তাঁর (অলি আহাদের) সম্পর্ক অনেকটা এ পর্যায়েরই ছিল বুঝা যায়। এ ব্যাপারে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ডঃ আহমদ রফিক তাঁর এক সাক্ষাৎকারে এ ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ 'পুলিশের গুলিবর্ষণ সম্পর্কিত কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক ছাপানো লিফলেট সে পরিস্থিতিতেও বিলি করার পূর্বে আমার রুমে এনে রাখা হয়। সম্ভবতঃ ২৩ কি ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুপুর বেলা রুমে গিয়ে দেখি আমার রুমের ভেতরে শহীদুল্লাহ সাহেব (শহীদুল্লাহ কায়সার) নিশ্চুপ হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে অলি আহাদ সাহেব লিফলেট ছাপানোর জন্য শহীদুল্লাহকে বলে চলছেন, আপনারা কমিউনিষ্টরাই আন্দোলনের বারোটা বাজাবেন। এসময় পার্টি থেকে এই লিফলেট (আমার রুমে গাদা করা লিফলেটগুলি দেখিয়ে) বের করার কি দরকার ছিল। জানেন, এ লিফলেট ছাড়া হলে কি পরিস্থিতি হবে?....(শেষ পর্যন্ত) এ লিফলেট আর ছাড়া যায়নি।' (ডাঃ আহমদ রফিক / ঢাকা ডাইজেস্ট মে '৭৯ - পৃঃ ২৭-২৮)

এখান থেকে দু'টা সত্য বেরিয়ে আসে। অলি আহাদের 'আপনারা কমিউনিষ্টরাই' এ উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি যে কমিউনিষ্ট নন তা পরিস্ফুট হয়। দ্বিতীয়তঃ 'আন্দোলনের বারোটা বাজাবেন' উক্তির মধ্য দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সে সময়ের ভূমিকাকে তিনি আন্দোলনের প্রতিকূল বলেই উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জাতীয় রাজনীতি '৪৫-'৭৫ এ আরো বিস্তৃতভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘটনার পর অনেকের সাথে জনাব অলি আহাদও কারারুদ্ধ হন। ১৫ই মার্চ কারাগার থেকে মুক্তির পর ফজলুল হক হলে তাদের এক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। স্মৃতিচারণের এক পর্যায়ে তিনি বলেনঃ 'মুক্তির পর ফজলুল হক হলে আমাদিগকে সম্বর্ধনা দানকালে কতিপয় ছাত্রের মধ্যে এক চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করলাম। তাহারা ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী আত্মগোপনকারী কমুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য কর্মী। তাহাদের পার্টির দায়িত্বই ছিল আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ভুল বুঝাবুঝি ও কলহের বীজ বপন করা। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে বা বিরুদ্ধে বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারিলেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনতাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়া ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে প্ররোচিত করা সহজ হয়। আন্দোলনে যাহাতে ফাটল বা অনৈক্য সৃষ্টি হইতে না পারে, সেই জন্য আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় বেল তলায় এক সাধারণ ছাত্র সভা আহবান করি। ...পূর্ববঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ও কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন কর্মীবৃন্দ এই সাধারণ ছাত্র সভাকে বানচাল করিতে নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু সাধারণ ছাত্রের সচেতন সংগ্রামী চেতনা উপরোক্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।' (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫ / অলি আহাদ, পৃঃ ৫৮-৫৯)

ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনাকে বানচাল করার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির এ ধরনের গণবিরোধী ভূমিকার এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। তিনি আরো উল্লেখ করেনঃ '১৬ই মার্চ পরিষদ ভবনে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে ১৭ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বেলতলায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের আহবায়ক নঈমদ্দিন আহমদের সভাপতিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রারম্ভেই পূর্ববঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য নেতা অধ্যাপক ফজলুল করিম কতিপয় সমর্থকের সহায়তায় গোলযোগ সৃষ্টির প্রাণপন চেষ্টা করেন। ইহা নাকি তাহাদের বিপ্লবের স্বার্থে বিশৃংখলা সৃষ্টির কর্মসূচী ভুক্ত। তাহারা সংগ্রাম পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের নেশার ঘোরে গণ বিপ্লব দ্বারা সরকারের উৎখাতের প্রয়োজনে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী দাবী করিতেছিলেন। ... সেদিনের সেই সভায় বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াসকে শক্ত ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলাম, যাহারা কলিকাতায় সদ্য অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করিয়া বিপ্লবের অলীক স্বপ্নের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলিয়া প্রকাশ্যে গগণবিদারী আওয়াজ তুলিতেছেন, তাহারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। সুতরাং কমিটি অব একশন বা কর্মপরিষদে তাহাদের কাহাকেও গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। আমরা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন করি, ছাত্র সমস্যা সমাধানের আন্দোলন করি, সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই, কিন্তু দেশের আজাদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি না। আমার বক্তৃতার সমর্থনে সাধারণ ছাত্রদের একাত্মতা লক্ষ্য করিয়া গোলযোগ প্রিয় কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থকগণ সভা হইতে বিষন্ন বদনে পিছুটান দিলেন।' (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫ / অলি আহাদ, পৃঃ ৬০-৬১)

ভাষা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিতে আন্দোলনের তরুণ নেতৃবৃন্দ কমিউনিষ্ট পার্টির স্বরূপ সম্পর্কে যে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং আন্দোলনের স্বার্থে কুচক্রীদের বিরুদ্ধে যে সাহসী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়।"[৪৯]

১৩.

"... The communist activities reached their climax in the language riots in February 1952, after which the government took serious action against the Party. In July 1954 it was banned in East Pakistan, but it continued to exert influence through front organizations among students and workers, and through infiltration of regular political parties like the Awami League and the Ganatantri Dal.

... The Calcutta Bengali daily "Swadhinata", mouthpiece of the Communist Party, published two articles on the background of the language movement in its issues of 10 and 11 March 1952, listing the activities of the Party in East Pakistan during the period 1950-1. The second article concluded with the claim that the Party 'rendered assistance in conducting the language movement towards the right direction; the Communist Party

---

[৪৯] আসাদ বিন হাফিজ / ভাষা আন্দোলন ও ডান-বাম রাজনীতি ॥ [প্রীতি প্রকাশন - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ । পৃঃ ৩১-৪৭]

endeavoured to form an All Party Language Committee and to make the Language Movement an extensive one in every district'.

The Chief Minister produced copies of these articles in the East Pakistan Assembly during the debate on the 1952 language riots firing. These activities of the communists used to be well covered by the intelligence reports to which I had access during my service in the government of East Pakistan."[৫০]

১৪.

"... ভাষা আন্দোলন নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু অনেকেই অনেককিছু লিখেছেন, যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছ বলে মনে হচ্ছে না। আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছি প্রধানত আমার ব্যক্তি-জ্ঞান থেকে। যখন ভাষা আন্দোলন হয় তখন আমি ছিলাম ছাত্র। এই আন্দোলনে অনেককিছুই ঘটেছিল আমার চোখের সমুখে। তাই এই প্রসঙ্গে করছি কিছু কথা আলোচনা। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্যে যা কিছুটা সহায়ক হতেও পারে। রাজশাহীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন খুব জোরালোভাবে হতে পেরেছিল। আন্দোলন জোরালোভাবে হতে পেরেছিল, রাজশাহী সরকারি কলেজকে নির্ভর করে। ১৯৪৮ সাল থেকেই রাজশাহীতে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে তিনজন অধ্যাপক ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিলেন। এঁরা হলেন- ড. এনামুল হক, ড. শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালী এবং মুহাম্মদ আবদুল হাই। ড. এনামুল হক বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন তাঁর আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিখ্যাত গবেষণার জন্যে। ড. শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালী বিদ্বৎসমাজে খ্যাত ছিলেন Perso-Arabic Elements in Bengali নামক গবেষণামূলক সন্দর্ভের জন্যে। মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেব ছিলেন একজন সফল শিক্ষক। তিনি রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় অনুবাদ করেন মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত The Historical Role of Islam নামক গ্রন্থ। যার একটা প্রভাব পড়ে অনেক ছাত্রের উপর। মুহাম্মদ আবদুল হাই পরবর্তী কালে বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের ওপর গবেষণামূলক বই লিখে পেতে পারেন বিশেষ খ্যাতি। আমি এ সময় ছিলাম রাজশাহী কলেজের ছাত্র। আজ যেমন বলা হচ্ছে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হলো স্বাধীন বাংলাদেশ গড়বার সূচনা। সেটা আমার কাছে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারছে না। কেননা, সে সময় এই তিনজন অধ্যাপকের কেউ-ই চাননি পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে। তারা কেবল চেয়েছিলেন সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি। একটি উর্দু ও অপরটি হতে হবে বাংলা। এর বেশি কিছু তাদের কাম্য ছিল না। এঁরা রাজনীতির লোক ছিলেন না। এদের চর্চার বিষয়ে ছিল ভাষা-সংস্কৃতি। এরা বাংলাভাষার পক্ষ নিয়েছিলেন বাংলাভাষী হিসাবে; রাজনীতিবিদ হিসাবে নয়। বাংলাভাষা আন্দোলনে তমুদ্দুন মজলিস পালন করেছিল খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তমুদ্দুন মজলিস স্থাপিত হয়েছিল ইসলামপন্থী তরুণদের দ্বারা। এরা চেয়েছিলেন বাংলাভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে: সাবেক পাকিস্তানকে ভেঙে দিতে নয়। এই সংগঠনের একজন বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন আবুল কাশেম। ইনি প্রথমে ছিলেন যতদূর মনে পড়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। কিন্তু পরে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙলা কলেজ এবং হন এর প্রেন্সিপাল। আমি রাজশাহী কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করবার পর ঢাকায় যাই তেজগাঁও কৃষি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে। লক্ষ্য ছিল একজন কৃষিবিদ হওয়া। এ সময় আবুল কাশেম সাহেবের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কিছু সুযোগ ঘটে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি এই ধারণাই পাই যে, তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে। তিনি কখনই বলেননি যে, তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার। আমি রাজনীতির লোক ছিলাম না। কিন্তু আমার সহোদরা রাজনীতি করতেন। তিনি মাঝে মাঝে লিখতেন তমুদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সৈনিকে'। আবুল কাশেম সাহেব এসেছিলেন আমার ভগ্নির বাড়িতে। সেখানে সুযোগ হয় তাঁর সঙ্গে কথা বলবার।

---

[৫০] Hasan Zaheer / The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism [Oxford University Press - March, 1994] p. 16/475]

বাংলাভাষা আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি যা বুঝেছিলাম, তা হল, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করলে উর্দু যাদের মাতৃভাষা কেবল তারাই পেতে পারবেন বড়বড় চাকরি। বাংলাভাষী তরুণরা কেরানীর চাকরি পেলেও উর্দুভাষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পেতে পারবেন না বড়বড় সরকারি পদে চাকরি। ভাষা আন্দোলনের একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল। তা ছিল চাকুরি সংক্রান্ত। আর এই চাকরি হল পাকিস্তানের সরকারি চাকরি। বাংলাভাষা আন্দোলন হয়েছিল সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীক কাঠামোর মধ্যে। উর্দুকে করার কথা হয়েছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র সরকারি ভাষা। এটা বাঞ্ছীত ছিল না বাংলাভাষী মুসলমান তরুণ সমাজের কাছে। তরুণ সমাজ তাই উদ্যোগ নেন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার। এ হল বাংলাভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভাষ্য। সংস্কৃতিক দিক থেকে এর একটা কারণ হল, যাকে নৃতত্ত্বের ভাষায় বলে সংস্কৃতির সংঘাত। উর্দুভাষীরা তাদের নিজেদের মনে করতেন বাংলাভাষীদের চাইতে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। তাদের এই অহংকার তাদের ওপর সাধারণভাবে বাংলাভাষী তরুণদের বিরূপ করে তুলেছিল। তারা চাননি উর্দুভাষীদের সাংস্কৃতিক উদ্ধত্যকে স্বীকার করে নিতে। বড় চাকুরি পাওয়া সম্ভব হবে না এবং উর্দুভাষীরা সংস্কৃতির দিক থেকে আমাদের করবেন নিয়ন্ত্রণ, এটা চাননি বলেই এ দেশের তখনকার শিক্ষিত তরুণ সমাজ ব্রতী হয়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। আমার মতে এই হল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিশেষ ভাষ্য। এই আন্দোলনের লক্ষ্য এখন যেমন বলা হচ্ছে, ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া। সে সময় সেটা আদৌ ছিল না বলেই আমার ধারণা।

বাংলাদেশের তরুণরা ইংরেজ আমলে লেখাপড়া করতেন প্রধানত সরকারি চাকুরির পাবার জন্যে। সরকার ছিল সবচেয়ে বড় চাকুরি দাতা। উচ্চ সরকারি চাকুরি পাবেন না বলে বাংলাভাষী শিক্ষিত তরুণরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে।

দিল্লি ও তার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে চলতো ব্রজভাষা। ব্রজভাষার সঙ্গে প্রচুর ফারসি ও ফারসির মাধ্যমে আসা শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে উর্দুভাষা। এই রকমই মনে করেন অনেক ভাষাবিদ। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। শব্দগত অর্থে উর্দু মানে হলো সেনা ছাউনি। অর্থাৎ সেনা ছাউনিতে সৈন্যদের মুখে ব্রজভাষা থেকে উদ্ভব হয়েছিল এই ভাষার। উর্দু শব্দটা হল তুর্কি ভাষার। তবে উর্দুতে তুর্কি শব্দ বিশেষ নেই। বাইরে থেকে আসা মুসলিম তুর্কিরা ঘরে তুর্কি ভাষা বললেও তাদের রাজকার্য চলেছে মূলত ফারসি ভাষার মাধ্যমে। তাই উর্দুতে আছে ফারসি শব্দের প্রাচুর্য, তুর্কি শব্দ নেই বললেই হয়। যদিও ভাষাটার নাম হচ্ছে তুর্কি। আর তুর্কি ভাষায় শব্দটার নাম হচ্ছে সেনা ছাউনি। উর্দুকে হিন্দুস্তনীও বলা হয়। হিন্দু শব্দটা ফারসি ভাষার। আদিতে বুঝিয়েছে সিন্ধু নদের তীরবর্তী মানুষকে। যাকে বলা হয় আধুনিক হিন্দিভাষা, তার উদ্ভব খুব বেশিদিন আগে হয়নি। এর উদ্ভব হয়েছে উর্দুর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং হিন্দুত্ব রক্ষার ইচ্ছায়। অনেক সময় উর্দুর সাধারণ কথিত রূপকেও হিন্দুস্থানী বলে উল্লেখ করা হয়। উর্দু লেখা হয় ফারসি আরবি অক্ষরে। কিন্তু হিন্দি লেখা হয় নাগরি অক্ষরে। হিন্দ-উর্দুর মধ্যে এটা আর একটি পার্থক্য। বৃটিশ ভারতে আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, সে সময়ে ভারতে সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলতো হিন্দুস্তানী ভাষায়। তারপরেই জনসংখ্যার দিক থেকে ছিল বাংলাভাষার স্থান। হিন্দি ভাষার তুলনায় বাংলা গদ্য ছিল অনেক উন্নত। ১৯৩০ সালে মীর মশাররফ হোসেনের লেখা 'বিষাদসিন্ধু' বই হিন্দিতে অনুদিত হয়। বইটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন কবিন্দ্র বেনীপ্রসাদ। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১১) যথেষ্ট উন্নতমানের গদ্য লিখেছেন। বাংলা সাহিত্য এসময় ছিল অগ্রসর। তাই বাংলা থেকে হিন্দিতে অথবা হিন্দুস্তানীতে অনূদিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠেছে ভাবি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা অথবা সাধারণ ভাষা কী হবে, তখন হিন্দুরা সমর্থন করেছেন হিন্দিকে। আর মুসলমানরা সমর্থন করেছেন উর্দুকে। এক্ষেত্রে হিন্দি বলতে বুঝিয়েছে আধুনিক সংস্কৃতবহুল হিন্দিভাষাকে। হিন্দি উর্দুর মধ্যে কোন ব্যকরণগত পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল শব্দসম্ভারে এবং লিপির ক্ষেত্রে। কেউই ব্রিটিশ শাসনামলে বলেননি

বাংলাভাষাকে করতে হবে ভাবি স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। কিন সাবেক পাকিস্তানে উঠেছিল এই দাবি। বৃটিশ আমলে ভারতে উর্দুকে সব মুসলমান সমর্থন করেছেন রাষ্ট্র বা সাধারণ ভাষা করবার জন্যে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ১৯৩৮ সালে এ কে ফজলুল হক All India Muslim Educational Conference-এর সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বাধীন ভারতের সাধারণ ভাষা (Lingua Franca) হতে হবে উর্দু। ফজলুল হক সাহেবের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু তিনি সমর্থন করেন উর্দুর দাবিকে। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে নাগপুরে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী বলেন, উর্দু ভাষার বিকাশ হয়েছে মুসলিম নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায়। ভাবি স্বাধীন ভারতে উর্দুর আরও বিকাশ করতে হলে তার দায়দায়িত্ব হল মুসলমানদের, অন্যদের নয়। মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভাষা হিন্দি ছিল না, ছিল গুজরাতী। তিনি তার বিখ্যাত সর্বদয় নামক বই লিখেছেন গুজরাতী ভাষায়। অর্থাৎ বৃটিশ আমলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দি-উর্দুর বিতর্ক। বাংলার দাবি সেখানে ছিল অনুপস্থিত। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ সাহেব যখন বলেন যে, উর্দুকেই করতে হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন তিনি তা বলেছিলেন পুরাতন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে। এ সময় হিন্দিকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি ছিল সাবেক ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে উদ্ভূত রাজনীতির জের। এটা নতুন কিছু ছিল না। জিন্নাহর মাতৃভাষা ছিল মহাত্মা গান্ধীর মতই গুজরাতী। তিনি তার প্রথম জীবনে রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করেন মাতৃভাষা গুজরাতীতে। তিনি গুজরাতী বলতে ও লিখতে পারতেন। তিনি উর্দুভাষায় মোটেও পারদর্শী ছিলেন না। উর্দু বলতেন ভাঙা ভাঙা ভাবে। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার সমর্থনে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তা তিনি দিয়েছিলেন বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায়; উর্দু ভাষায় নয়।

আমাদের একদল কথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী জিন্নাহ সাহেবের সমালোচনা করে চলেছেন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার দাবির জন্যে। কিন্তু তিনি যে কেবল উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি তোলেন, তা কিন্তু নয়। ১৯৫১ সালের ২৪ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত হয় পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী লীগ। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ শহরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেন, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আদর্শ অনুসারে একমাত্র উর্দুই হওয়া উচিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এটা তিনি বলেছিলেন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দুদিন পরে। অর্থাৎ ঢাকায় ছাত্র-মিছিলে গুলি চলার পরে। আমাদের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা জানেন না যে, পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহিরও বলেছিলেন যে, উর্দুই হওয়া উচিত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দৃষ্টিকোণ ভাষার প্রশ্নে হয়ে উঠেছিল একই। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন, শ্রমিক শ্রেণিরা করবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই উপমহাদেশে শ্রমিকরা হিন্দু-উর্দু যতটা বুঝতেন, বাংলা তা বুঝতেন না। বাংলার মানুষ মূলত ছিলেন কৃষিজীবী। মার্কস যে অর্থে শ্রমজীবী কথাটা তার বিখ্যাত কম্যুনিস্ট মেনুফেস্টুতে বলেছেন, বাংলার কৃষকরা সেই সংজ্ঞায় পড়েন না। তাই তাদের ভাষাকে নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব। সারা উপমহাদেশে কম্যুনিস্টরা হিন্দি ভাষায় আওয়াজ তুলেছিলেন,

ইয়ে আজাদী ঝুট্টা হ্যায়।
লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।

অর্থাৎ বিদেশী বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে, কিন্তু তা বলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। লক্ষ লক্ষ লোক এখনও অনাহারে ধুকছে। করতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বদলাতে হবে সমাজ জীবনের আর্থিক কাঠামো। এ ছিল তখন বামপন্থীদের বিরাট অংশের চিন্তা চেতনা। রাষ্ট্রভাষার দাবি তাই তাদের কাছে ছিল কেবল অবান্তরই নয়, সমাজতান্ত্রীক বিপ্লব থেকে মানুষের চেতনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়া। এটা একটা বুর্জুয়া চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উপমহাদেশে প্রকৃত শ্রমজীবীদের অধিকাংশের ভাষা হল উর্দু বা হিন্দুস্তানী। সেটাকেই মানতে হবে বিপ্লবের ভাষা হিসাবে। তার মাধ্যমেই প্রচার করতে হবে

বিপ্লবের বাণী। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বামপন্থী অবশ্য ছিলেন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে। কিন্তু সেইটাই বামরাজনীতির মূলধারা ছিল না। তারা ভাবছিলেন গায়ের জোরে দখল করতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতা। রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গঠন করতে হবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। তারা ভুগছিলেন এক রোমান্টিক বিপ্লববাদে। আমাদের অর্থনীতি বৈষয়িক ও কৃতকৌশলের দিক থেকে ছিল খুবই অনগ্রসর। কার্ল মার্কস বলেছেন, উৎপাদনী শক্তি বাড়াতে হবে। উৎপাদনী শক্তি বাড়ে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু তার এই শিক্ষাকে ভুলে যেয়ে এদেশের বামপন্থীরা চাচ্ছিলেন বিপ্লব করতে; যেটা সম্ভব ছিল না। কেননা, উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ওপর নির্ভর করে উৎপাদনী সম্পর্ক। উৎপাদনী শক্তির বিকাশ ছাড়া উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু ইলামিত্র ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি চাপাই নবাবগঞ্জের নাচোল থানায় ঘটান সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই সালেরই ২৪ এপ্রিল কম্যুনিস্টরা রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে কয়েদিদের সাথে হাত মিলিয়ে করতে চান উত্থান। তখন পাকিস্তান সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশে মুসলিম জনসমষ্টি তখন ভাবছিলেন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। তাদের কাছে এ ধরণের অভ্যুত্থান মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অনেকের কাছে মনে হয়েছিল একটা পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসাবে। তারা তাই এর করেছিলেন বিরোধিতা।

এবার আসা যাক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ের রাজনীতির প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে নিচের সন তারিখগুলো মনে রাখা ভালো। ১৯৪৭, ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত দুটি রাষ্ট্রের জন্ম। ১৯৪৭ সালের ২১ আগস্ট পূর্ববাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন (১৯৪৭৫০)। পূর্ববাংলার তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন (১৯৪৭-৫১)। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহর মৃত্যু। খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল (১৯৪৮-৫১)। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যখন ছাত্র মিছিলে গুলি চলে, তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন গোলাম মোহাম্মদ (১৯৫১-৫৫)। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন (১৯৫১-৫৩)। আর বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মূখ্যমন্ত্রী শব্দটা এসেছে ভারত থেকে, পূর্ববাংলায় তখন বলা হত প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন নুরুল আমিন (১৯৫১-৫৪)। ১৯৪৬ সালে তদানীন্তন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের যে নির্বাচন হয়, তারপরে পূর্ব বাংলায় আর কোনও নির্বাচন হয়েছিল না। নুরুল আমিন ছিলেন ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে একজন নির্বাচিত এমএলএ। সেই সুবাদে তিনি হন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী। দেশে তখন কোন সামরিক সরকার ছিল না। পূর্ব বাংলায়ও ছিল একটি নির্বাচিত সরকার। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি চলেছিল নুরুল আমিন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে; পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে নয়। কিন্তু এখন অনেকের লেখা পড়লে মনে হয়, গুলি চলেছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। সেটা আদৌ সত্য নয়। পূর্ব বাংলায় যদি নুরুল আমিন সরকার না থেকে অন্য কোন সরকার থাকতেন, তবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বন্ধ করবার জন্যে দিতেন গুলি চলবার নির্দেশ। নুরুল আমিনকে এখন যেভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে, তিনি সম্ভবত অতটা খারাপ ব্যক্তি ছিলেন না। কেননা, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি কোন কারচুপি করেননি। তাই জিততে পেরেছিল যুক্তফ্রন্ট। তিনি এসময় দিয়েছিলেন যথেষ্ট গণতন্ত্রী মনের পরিচয়। হতে দিয়েছিলেন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন। পুলিশ ছাত্র মিছিলে গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন গুলি চালিয়েছিল যথেষ্ট সাবধানে। না হলে আরও অনেক ছাত্র প্রাণ হারাতেন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই ছিলেন না ছাত্র মিছিলে। একজন দাঁড়িয়েছিলেন পথের ধারে। আর একজন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনিসিয়ামের স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে। আর একজন ছিলেন মেডিকেল হোস্টেলের ভেতরে। তখন পুলিশ প্রশাসন বিশেষভাবে মেনে চলতেন ব্রিটিশ শাসন আমলের বেঙ্গল পুলিশ কোড। তারা বেপরোয়া ছিলেন না। তারা বেপরোয়া হলে শহিদের সংখ্যা যে বাড়তো, সেটা সহজেই অনুমান করা চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেব শহিদ বরকত সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি নাকি ছিলেন আসলে পুলিশেরই লোক। আমি কোন বিতর্কের মধ্যে যেতে

চাই না। কিন্তু কথাটা খুব রটেছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে এখন এমনভাবে লেখা হয়, যেন সেদিন যুদ্ধ বেধেছিল কোন একটি বিদেশি সরকারের সঙ্গে এদেশের মানুষের। কিন্তু সে সময়ের পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সরকার ছিল একটি জননির্বাচিত সরকার। আর তার নির্দেশেই চলেছিল গুলি॥"[৫১]

১৫.

"... The protection of Bengali was never an issue in the separatist movement which culminated in Pakistan Anyone with a modicum of common sense would understand that there was no question of Bengali being under threat in a United India. As Mr Basant Chatterjee has shown in his book Inside Bangladesh Today, the language issue was seized upon on the morrow of Pakistan's establishment as a weapon with wish to destroy the new state. And the bungling of the new leaders of Pakistan brought ample grist to the mill. On this analogy, one might as well argue that the chief reason the American colonies separated from England in the 18th century was their anxiety to preserve the purity of the English Language.

I was amused to find Mr Zaheer referring casually to a proposal early in Pakistan's life that Bengali be written in Arabic script so as to strengthen the bonds of cultural unity between the two wings. In the first place this proposal never got off the ground as a serious suggestion. Secondly, the shallowness of Mr Zaheer's knowledge of the question at issue is underlined by his assertion that what was proposed was a change form Devanagri to Arabic. I am sure this would tickle even those who might accept his views on the political relationship between the two wings. The script used in Bengali has never been called Devanagri by anyone. It is a form of the alphabet used throughout the subcontinent in languages, which do not use Arabic script. Devanagari is associated in modern times with Hindi and Maratti particularly. A person who does not know the difference between Devanagri and Bengali scripts is hardly qualified to pass judgment on the language issue which was so cleverly and skilfully manipulated to subvert Pakistan's foundation.

Mr Zaheer's pretensions claim that much research has gone into mea culpa is also exposed by his failure or omission to take into account what Indian writers themselves have said about the methods used to fuel the rebellion in East Pakistan. If he had at all taken care to consult Basant Chatterjee and Jyoti Sen Gupta, he might have avoided some gaffes.

... The offensive against Pakistan took three forms: cultural, political and economic. On each front a subtle strategy was pursued. The enemy's first task, while appearing to be vitally concerned about the survival and prosperity of the new state, was to plant suspicions, to stir up misgivings, to create issues. If the attempt succeeded, the suspicion or misgiving would be carefully nurtured, allowed to grow, made to appear real. At this stage other issues would be brought in embracing a wider spectrum of the national life. It was also noticed that lest public interest in the issues should die down, a carefully planned succession of newer diversions was created, each contributing to the effect aimed at, namely, that the people of East Pakistan were being slowly bled white economically, enslaved politically, and subjugated culturally.

The enemy's greatest allies in this campaign were our complacency, good faith, naiveté, stupidity, insensitiveness and failure to act decisively at the right moment. Without such allies to assist them, they would never have scored the triumph they did. We need, therefore, to recognise that we owe our misfortunes as much to the enemy's scheming as to

---

[৫১] এবনে গোলাম সামাদ/বায়ান্ন থেকে একাত্তর ॥ [পরিলেখ - ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। পৃ. ১৩-১৪/১৭-১৮/২৯-৩০]

our own blindness in the face of danger. In the pages that follow, I shall try in my own way to analyse the enemy's campaign, the three aspects of it separately, I would deal first with the cultural aspect.

The main cultural weakness of the present generation (or rather the last two generations) of Muslims in Bengal consists in their neglect of the classical languages, Arabic and Persian. This has tended to cut them off from the rest of the Muslim community outside Bengal, to rupture those bonds, subtle and invisible which sustain a people's sense of spiritual cohesion. A Muslim lacking in Arabic and Persian, even at second hand, came gradually to forfeit the feeling that he was part of larger cultural entity. He forgot Islamic history, he ceased to take pride in the achievements of Muslim peoples elsewhere. Jawaharlal Nehru notes in his Autobiography published in 1935 that one of the greatest bonds among Muslims was a shared pride in the past achievements of Muslims. Since 1935 new trends in education, de-emphasising the importance of Arabic and Persian, had considerably eroded this pride. These trends were at work all over India, but outside Bengal they did not produce the same effects.

The reason is that whereas non-Bengal Muslims had in Urdu a substitute which at least offered partial compensation for the loss caused by the decline of classical Muslim scholarship, the Bengali Muslims had nothing like it in their armoury. For one thing Urdu itself represented a Muslim achievement. The main writers were Muslims; the ambience they created was steeped in Muslim traditions, many of the renowned Arabic and Persian classics were available in Urdu translation; much of the vocabulary, as a matter of fact most of the nouns and adjectives were drawn from Arabic and Persian; the imagery Urdu poets used was borrowed directly from those two languages. Secondly, owing to these reasons, an Urdu-speaking Muslim, even when cut off from Arabic and Persian was never deprived of that sense of pride in his own heritage without which social cohesion can not last. His Bengali counterpart, on the other hand, saw nothing around him except evidences of Hindu achievements. Though Muslims started cultivating the Bengali languages as early as the sixteenth century, and though it is also true historically that without the patronage of Muslim-rulers Bengali would never have made any progress, the fact remains that the number of outstanding Muslim writers in Bengali is comparatively small The Muslims contributed little to the literary renaissance in Bengal which took place in the 19 century.

To the generations that grew to maturity before the First Great World War the absence of Muslim achievements in Bengali did not matter much. The educated section among them were conversant with Arabic and Persian as well as Urdu. Many of them had adopted Urdu as their own. Consequently the fact that vis-à-vis the Bengali Hindus the Muslims could lay claim to no outstanding work in Bengali did not affect their amour propre. They believed honestly that it was in Urdu among the languages of the sub-continent that the expression of the Muslim genius was to be found. The 19 century renaissance in Bengal had its counterpart in the rise of the powerful school of Muslim writers in Urdu, among whom the best known for political reasons was Hali. Hali in Urdu brought the Muslims the same sort of message as Bankim Chatterjee did for the Hindus. Hali's Musaddas, a political poem whose purport was to urge the Muslims to shake off their torpor performed the same service for the Muslim community as Bankim's novel Ananda Math No Muslim who knew Ghalib, or Meer or Sauda or Shibli Nomani could feel small on account of a Michael Dutt or Bankim among the Hindus.

The new generation of Muslims who knew neither Arabic and Persian nor Urdu and who depended solely upon Bengali felt however completely cut off from the Muslim heritage

preserved in these languages. Had they succeeded as the Muslims of northern India had done in translating the chief Muslim classics into their own language, their sense of alienation would not have been so great. But what was available in Bengali „ apart from a bodz of verse narratives written in an idiom despised by the present generation „ consisted solely of the works of Hindu authors expressing a civilization different from theirs and exuding a flavour, subtle, indefinable, elusive where not pronounced, which derived from Hindu mythology, epic and scripture. To have to accept it as their own meant wrenching themselves from their background. But to the majority it did not mean a wrench at all. Not having known what their own heritage was like, they did not feel that they missed anything by not being acquainted with the classics in Arabic, Persian and Urdu.

I have mentioned earlier in this account how we in the forties founded the East Pakistan Literary Society in the University of Dacca with a view to popularising the kind of idiom that Muslims used among themselves. Ours was no revolutionary demand. We were repeating in our manifesto the claims put forward earlier by such writers as Qazi Nazrul Islam himself or Abul Mansur Ahmad. Now the fact is that these people had grown up in a Muslim atmosphere. They themselves did not know much Urdu, or Persian or Arabic, but they had as children breathed the essence of Muslim culture, imbibed the rhythms of Arabic Qasidas and Persian Gazals, and assimilated unconsciously the manifold influences summed up in the word Islam. Their standards of judgement, their modes of thought were cast in an Islamic mould. Had Muslim Bengal produced a succession of powerful writers like Nazrul Islam, the problem would have solved itself. But a single Nazrul Islam as against a galaxy of Hindu luminaries was not much help. Nor was Nazrul Islam a reliable guide. A great individualist, he could not be fitted into any theory; he wrote as he pleased, said what he liked. If some aspects of his practice could be adduced to strengthen the case for a Muslim idiom in Bengali, there were other writings which lent support to the other view.

The process I am trying to describe could be a fascinating studz in group psychology. Here was a society in transition, undergoing a slow change from one kind of culture to another through a process of education, being alienated from its cultural inheritance and involuntarily affiliated to an entirely different culture. The Pakistan movement on the political plane was an attempt to arrest the Muslim's conversion to Hinduism, but in Bengal language introduced additional complications. It is not that we were not aware of them. But I doubt whether man like Mr Fazlul Huq or Mr Shaheed Suhrawardz, both of whom were thoroughly steeped in classical Muslim scholarship, were alive to the problem. Most of the prominent Muslims of their generation, Khan Bahadur Abdul Momen and Mr Abul Qasem of Burdwan, Sir Abdur Rahim, Sir Abdul Halim Ghuznavi had had a pseudo classical education, with its emphasis on Urdu and Persian. Sir Abdur Rahim, though he belonged to a Midnapur family spoke Urdu at home. The other three, while fluent in Bengali, belonged also to an Urdu-centred world. They would never have thought of regarding the Hindu writers of the nineteenth century as representing their own cultural heritage.

The attitude of Mr Abul Qasem's son, Mr Abul Hashem, was very different. He was one of the main spokesmen of the new selfconsciousness among Muslims as Bengalis. To him Tagore rather than Ghalib, Bankim rather than Hali appeared to be the true voice of his people. The non-Bengali Muslims were viewed by people like him as strangers with very little in common with the Bengali Muslims.

It was this change of attitude towards their past and traditions which made the language movement of the fifties both possible and powerful. As the new generation nursed on

Bengali classics exclusively came to maturity and started occupying positions of authority, the entire cultural atmosphere underwent a perceptible change.

Immediately upon the establishment of Pakistan, the conspirators stimulated subtly a public debate on the state language issue. The adoption of Urdu, they claimed, would pave the way for the cultural and economic subjugation of the Bengali Muslims. The more important jobs would go to those whose mother tongue was Urdu and gradually the Bengali Muslims would be ousted from all positions of power. Young men in the University of Dacca fell a prey to this propaganda and started worrying.

Those of us who never suspected „ to our utter shame „ that the controversy could really have been inspired by ulterior motives felt shocked when a handful of students-- four, it is reported .. protested noisily when, addressing the Dacca University Convocation in March 1948 .. the Quaid-e-Azam declared that Urdu alone could be the lingua franc a of Pakistan. It was for us inconceivable that as early as March 1948 anyone in Pakistan could dare insult the Quaid-e-Azam publicly. Yet the incident did take place and its sequel practically sealed Pakistan's fate. Although everybodz felt horrified, no action at all was taken against the culprits. They were allowed to continue in the University, no reprimand was administered to them. On the contrary, the Government of East Bengal, then headed by Khwaja Nazimuddin, apparently took the view that such youthful exuberance deserved to be overlooked and pardoned. The Government should have known that misbehaviour with the Quaid-e-Azam had incensed the entire population of East Pakistan, and any punishment meted out to the miscreants would have received the approbation of an overwhelming majority. Many felt genuinely puzzled at the Government's failure to act, realising clearly that the tolerance shown would be misconstrued and used as a springboard for further mischief in the future.

This was the time when Pakistan was locked in a grim life and death struggle with India over Kashmir. Her administration was still shaky. The stupendous refugee problem in West Pakistan was straining her resources to the utmost. India had first withheld her share of the Imperial Bank of India assets; the military stores and equipment which had fallen to her share had been misappropriated. Nehru talked almost daily of settling the problems created by Partition by force of arms. If a country needed cohesion and solidarity at any period, this was when it was needed most in Pakistan. But without the slightest reference to these national issues, the conspirators proceeded stage by stage to work up the language agitation.

The most effective weapon in their armoury was not love of Bengali among Muslims but economic fear. I know personally that a considerable section favoured Urdu for cultural reasons. But they were silenced by the arguments that Urdu would spell economic deprivation, unemployment, industrial backwardness and second-class status in general for Bengali Muslims.

The way the issue was handled by the Government was unimaginative and showed a complete lack of understanding on its part about the implications of the problem. The government relied much too heavily on patriotism, believing that all they needed to do in order to counteract the enemy's designs was to draw attention to the dangers to Pakistan's existence. I have myself always felt, and said on many occasions that the official statements on language policy were wholly uncalled for. English continues even today to be the language of administration in both Bangladesh and Pakistan and yet the tragedz is that those of us who advocated a realistic approach to the problem and urged the retention of English were denounced as reactionaries. I remember that I became almost as unpopular in East Pakistan as in the West. Even persons like Dr I. H. Qureshi

and Dr Salimuzzaman Siddiqui ,, persons whom I respect ,, came to think of me as a fanatical Supporter of English who for obvious professional reasons wanted the status quo to be perpetuated. Yet how far is this from the truth, I always felt that the creation of an additional problem like the language problem--so sensitive, explosive and potentially dangerous ,, at a time when Pakistan's hands were full and before it had been consolidated betrayed an absence of statesmanship. Why could not the government have declared, specially after the Convocation incident, that there was no question of English being immediately replaced by Urdu, and that the issue would be resolved in the light of public opinion at some convenient date in the future if it was at all desired to do away with English. I have never understood why so much emotion was allowed to be generated over an issue which had little relation to the immediate facts. Even those who wanted Urdu or Bengali realised that no immediate change could he made, and that the country would have to retain English for pragmatic reasons for many years to come.

To me the whole controversy had an air of un-reality. To ruin the present for the sake of a future not even dimly discernible seemed to me neither practical wisdom nor sound idealism. The problem before us was how to consolidate the disparate national groups which constituted Pakistan into a psychologically united single national entity. Seeing that English, a foreign language, had fortuitously acquired a position which helped preserve the facade of national unity. Should we have disturbed it? Urdu or Bengali outside the context of Pakistan was meaningless. If Pakistan survived, then alone the question of Urdu or Bengali as the State language would have significance. All our efforts initially should have been directed towards the avoidance of centrifugal and divisive issues and the strengthening of all those elements ,, whatever their origin ,, which made for unity. Instead we went madly ahead, in both wings of Pakistan, to create, sometimes to resurrect, the deadliest impediments to national unity. Political leaders as well as educators alike began a self-defeating campaign against English each step they took, each declaration they made, weakened the forces of national cohesion and strengthened the enemy.

The thoughtlessness of non-Bengali officials in the East Pakistan Secretariat served to lend colour to the enemy's propaganda. The thoughtlessness was a compound of arrogance and naivete: arrogance bred by the conviction that Urdu alone was and could be a true vehicle of Muslim culture; naiveté arising from their eagerness to share what they considered valuable with the Muslims of Bengal. The backwardness of the local population came to be viewed as a sign of their ethnic inferiority. Hitches between Bengali and non-Bengali Muslims ,, often the result of business or professional rivalry ,, were seized upon by the enemy as proof of the sinister designs of the Urduspeaking classes, and fanned and magnified into serious clashes. Such hitches occurred everywhere in India: they are inevitable whenever people belonging to different linguistic groups mix in a city. But nowhere outside East Pakistan were they given the same importance. It was the attitude of the Urdu-speaking officials which rendered the enemy's mischievous interpretations of minor incidents plausible and credible. Mr Fazl-e-Karim Fazli, the provincial Education Secretary, alienated considerable bodz of public opinion by aggressively advocating the adoption of the Arabic script of Bengali. The fact is that apart from the enemies, many people, who, left to themselves, might have favoured such a change, resented the idea of having to be told how to write Bengali by one who did not know the language himself. Mr Fazli's intentions were patriotic; he wanted a single script for the country, believing that unity of script would make for greater cultural unity. But his suggestion came at a time when the conspirators were busy stirring up suspicions about the non-Bengalis, and it proved additional grist to their mill.

I am intentionally and deliberately using the term conspirators repeatedly, and, as I have said earlier, I have no doubt in my mind that there was conspiracy on foot. How else does one explain the proceedings of the Literary Conference held in 1949 at the Curzon Hall?

Dacca where the Chairman Dr Muhammad Shahidullah propounded his theory of Bengali nationalism? The Joint Secretaries were Mr Ajit Guha and Syed Ali Ashraf Mr Ali Ahsan's younger brother, then a lecturer in the Department of English. Dacca University, I was at the Conference myself having only a few months earlier in September 1948, resigned from the Sylhet M. C. College and joined the University. What I heard pained and disappointed me. I took a serious view of Dr Shahidullah's remarks and replied to him in a signed article published in the Azad. I said that Dr Muhammad Shahidullah's views clearly marked a departure from the two-nation theory, and were aimed at undermining the basis of Pakistan. If I argued, we were to regard ourselves as Bengalis first, how could we accept the basis of Pakistan? It seemed strange to me that so soon after the establishment of the new state through a process involving a great deal of sacrifice and bloodshed, a person like Dr Shahidullah should begin openly, publicly, questioning its basis. What, I asked, was the motive behind this revival of the controversies which had preceeded the creation of Pakistan?

Dr Shahidullah, politically always a simple-minded man, who had uttered those remarks without fully realising that they could be interpreted as a frontal attack on Pakistan's basic ideology got scared when my protest appeared in the Azad. He thought I had intentionally exposed him to the risk of arrest by drawing attention to the implications of his speech for nearly two years afterwards he refused to talk to me directly eyeing me with suspicion as a sworn personal enemy.

One of the delegates from Calcutta to the Curzon Hall Conference was Kazi Abdul Wadud. He had always been opposed to Pakistan and had chosen after 14 August 1947 to stay in Calcutta rather than move to Dacca like other Muslims. I had great respect for him. He was not a hypocrite: he made no secret of his views, and practised what he professed. When we met him, he said he was delighted that a conference of this kind was being held so soon after the establishment of Pakistan He felt that this showed that the Muslims were having second thoughts about it and were beginning to realise that they were culturally affiliated to the other part of Bengal.

I do not remember who else from Calcutta attended. But the significance of the Conference lay in the fact that its organisers had succeeded by a combination of hypocrisy and an appeal to the linguistic feelings of a section of the Bengali Muslims, in firing the first salvo in the campaign against Pakistan. Nothing was said openly against the ideology of Pakistan. References to politics were carefully avoided. The Conference was treated as a 'literary' affair, and those who spoke laid stress on language and literature. A great many, who would have denounced the organisers had they suspected the conference's real purpose, were taken in by the subterfuge. They saw nothing in a discussion on Bengali literature. But it was clear to me and to other members of the old Azad group that the offensive against Pakistan had been opened.

Unfortunately, in spite of my article and editorial comment in the Azad, which exposed the real motives of the organisers, the government chose to treat Curzon Hall affair as a minor incident which deserved to be ignored. And this, not withstanding the fact that the East Pakistan Secretariat at the highest level was manned about this time almost exclusively by non-Bengali officials. There could be two explanations. Either the Nurul Amin Cabinet did not realise what was happening and was opposed to action against those conspirators. Or the Secretaries, who knew no Bengali did not care who said what in Bengali as long as they continued to hold the reins of power.

Seen in retrospect this Conference had far-reaching effects. Had the organisers been properly snubbed: had they been made to understand that their real designs had been uncovered, they would, I believe, have retreated. But having found that an offensive against Pakistan,

carefully camouflaged, could be mounted and sustained with impunity, they grew bolder and planned a more open strategy. They however knew that they had to proceed cautiously, preparing the public mind first for any step they took, and they fully exploited the advantages that the problems of a new country struggling for survival afforded.

Nothing spectacular, however, happened in 1949 or 1950. I myself left for the United Kingdom for higher studies in September 1950 and have no personal knowledge of events during the next two years. In February 1952, I read in the Times a brief report on the riots which culminated in the incidents of February 21. I felt worried, but frankly did not realise the magnitude of the developments. Later on my return home in October of the same year I heard some details. To this day, however, I have not been able to understand the logic of the events that led to police firing on a student crowd on February 21. Why did Khwaja Nazimuddin, the Prime Minister, have to make a public declaration in favour of Urdu? There had been no clamour for a declaration either for or against Urdu; it was not an urgent issue. Yet the Prime Minister's adviser had thought that a plait, unequivocal pronouncement would resolve the doubts and end the disputes on the state language question. The result was exactly the opposite. There now flared up an agitation marked by the worst of feelings towards West Pakistan, and the Press in East Pakistan, not excepting the English language newspaper, The Pakistan Observer, (owned by Mr Hamidul Huq Chowdhury) in chorus denounced the champions of Urdu as exploiters and tyrants.

I am writing on the basis of what I heard and read on my return home in October 1952, by which time the excitement of February had considerably subsided. But the incidents of the 21 February in which several young men lost their lives left behind a legacy which for the conspirators against Pakistan proved a rich and inexhaustible mine. The slogan which spread from town to town and from village to village was: 'We demand Nurul Amin's; blood. Mr Nurul Amin, the provincial Chief Minister whose administration had been responsible for the firing became in the students' eyes a symbol of evil, tyranny and hatred. Students have been killed before in this subcontinent. Hundreds of them were arrested during the Civil Disobedience Movement of the thirties led by Mr Gandhi. Terrorism in the twenties claimed many victims. The Quit India movement of 1942 also led to violent deaths. But never before had any political deaths been exploited as the deaths of three of our students at Dacca in 1952 were exploited. The reason is of course not far to seek: the incident of 1952 had been a godsend to our enemies who now could embroider it, exaggerate it, magnifz its significance and hold it up as often as they liked as an instance of Pakistani bad faith towards the Bengali language and the Bengali people.

The Government for its part did not care to weigh the incident's importance, and took no steps to bring the real facts to light. What I learnt from unimpeachable sources indicates that the incident of 21" February was a plain case of defiance against law and order by an unruly mob, and had nothing directly to do with the Bengali Language. It is true that the mob had collected with a view to staging a demonstration in front of the provincial Assembly building in favour of Bengali but they were fired upon not because the Government was determined to suppress the Bengali language but because they were threatening to defy traffic rules and create a violent disturbance. Whatever the reasons, the firing assumed the semblance of the frontal and brutal assault on a cultural group, and provided endless ammunition for those who aimed at working up people's feelings against Pakistan."[৫২]

---

[৫২] Syed Sajjad Husain / The Wastes of Time : Refelctions on the Decline and Fall of East Pakistan \ [Notun Safar Prokashani - February, 1995 | p. 7 / 174-185]

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা : বৈরিতার বিস্তার

প্রথম পর্ব

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ : মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

এক

"... নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা পেশ করেছিল। এটাকে তারা বলত গণদাবি। তারা আরও বলতেন ক্ষমতার জন্য নয় গণদাবি আদায়ের জন্য তারা নির্বাচন করছেন।

নির্বাচনের পর অবশ্য গণদাবি আদায়ের নেতৃত্বদানকারীদের চেহারা ফুটতে শুরু করল। পরিষদের নেতা নির্বাচিত হলেন ফজলুল হক। কিন্তু গোল বাঁধল মন্ত্রীসভায় কারা যোগ দেবেন সেটা নিয়ে। ফজলুল হককে যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা বাধা দিতে উদ্যত হলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন গুলিস্তানের গভর্ণমেন্ট হাউস ঘেরাও করে মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণকে যে করেই হোক ভন্ডুল করবেন। ঘটনার দিন রাতে মোহন মিয়া আমার বাসায় হাজির। তিনি বললেন ইব্রাহিম তোমার লোকজন দিয়ে হেলপ করো। মুজিবকে বাধা দিতে হবে। আমি সেই রাতে কর্মীদের বাসায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে সংগঠিত করি এবং পরদিন সকালে গভর্ণমেন্ট হাউজের দিকে রওয়ানা দেই। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের হয়ে শেখ মুজিব তার লোকজন নিয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন আমাদের দল অনেক বেশী শক্তিশালী ও সংগঠিত তখন পিছিয়ে গেলেন এবং একটা মারামারির হাত থেকে আমরা সবাই রেহাই পেলাম। ফজলুল হক তখনকার মত নির্বিঘ্নে তাঁর মন্ত্রীদের শপথ করালেন।

আমার মনে আছে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছিল শাহবাগ হোটেলে। এতদিন তারাই ক্ষমতার বাইরে থাকা অবস্থায় এটিকে বলতেন শাদ্দাদের বেহেস্ত। তারা এটা নিয়ে অহেতুক নূরুল আমীনের কুৎসা রটিয়ে বেড়াতেন।

মোহন মিয়াকে সহযোগিতার জন্য তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) তাঁর ইত্তেফাক পত্রিকায় 'মুসাফির' নামে আমাকে আক্রমণ করেন এবং কয়েকদিন ধরে লেখালেখি করেন। তিনি খামোখাই আমার বিরুদ্ধে চটেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যুক্তফ্রন্টেও ছিল বহু দলত্যাগী নেতা কর্মীদের ভিড়। আপাত সুবিধা প্রাপ্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমি বলব এটা মানিক মিয়ার অপসাংবাদিকতা। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় শেখ মুজিব শেরে বাংলার মুখের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চটাং চটাং কথা বলেছিলেন। আর তার উত্তরে শেরে বাংলা দুঃখ করে বলেছিলেন, যে ছেলে আশি বছরের বুড়োকে বেইজ্জত করতে দ্বিধা করে না, সে এদেশের সম্ভ্রমকে লুটিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না–এটা তোমরা দেখে নিও।

এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার কথা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস হল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। ২১ দফার রফাদফা করে নেতারা রীতিমত মাঠে নেমে গেলেন। যুক্তফ্রন্টের শরীকদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। একজন ডাইনে গেলে আর একজন যেতেন বাঁয়ে।

সোহরাওয়ার্দীর লোকজন সোহরাওয়ার্দীর অনুগত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কিভাবে ফজলুল হককে সরিয়ে দেয়া যায়।

... এসময় আওয়ামী লীগ আরও একটা ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিল। আদমজী জুট মিল তখন নির্মাণাধীন। এখানে কিছু অবাঙ্গালী শ্রমিক কাজ করত। আওয়ামী লীগ প্রচার করতে লাগল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অবাঙ্গালীরা এদেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতি এখান থেকেই শুরু। তাদের রাজনৈতিক পুঁজিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী আর অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। অবাঙ্গালীরা এদেশের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী, তাদের রুখতে হবে। অথচ দেশ বিভাগের আগে এদেশে একটাও পাটকল ছিল না। এদেশের পাটকে নির্ভর করে যেসব জুট মিল গড়ে উঠেছিল তা ছিল কলকাতায়। তখন কিন্তু হিন্দুদের এই শোষণের বিরুদ্ধে এরকম প্রতিবাদ ওঠেনি বা পরবর্তীকালেও কেউ কিছু বলেনি। অবাঙ্গালীরা ছিল মুসলমান। পাকিস্তানের জন্য তারা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল। নিজেদের সহায় সম্পত্তি ফেলে এদেশে ছুটে এসেছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে তখনও কোন শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। অথচ অবাঙ্গালীরা যখন কেউ কেউ দেশের শিল্পায়নে এগিয়ে এল তখন তারাই হল আওয়ামী লীগের প্রথম টার্গেট।

নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা শামসুজ্জোহার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মী আদমজী জুট মিলে হামলা চালায় ও অবাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিহারী বাঙ্গালী দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়েছিল। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এটা ছিল আর একটা আওয়ামী চক্রান্ত। এ ঘটনার ফলেই সোহরাওয়ার্দীর অনুগত মোহাম্মদ আলীর পরামর্শে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন এবং প্রদেশে কেন্দ্রের শাসন জারী করেন।

... তখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র ও কুটিলতা এত ছায়া ফেলেছিল যে কোন মন্ত্রীসভাই দীর্ঘস্থায়ী হত না। আসলে হতে দেয়া হত না। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমেরিকা এত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল যে এখানে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ক্ষমতার মঞ্চে এবার এলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এই প্রথম আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বরাবরের মত সোহরাওয়ার্দী মার্কিন ঘেষা নীতি অনুসরণ করলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী অবশ্য সোহরাওয়ার্দীর এই মার্কিন যে নীতি পছন্দ করতেন না। এ কারণেই তার সাথে সোহরাওয়ার্দীর বিরোধ শুরু হয় এবং তিনি তার দলবল নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আসেন এবং নতুন দল ন্যাপ তৈরী করেন। সন্তোষের কাগমারীতে এক সম্মেলন ডেকে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের বিভাজন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেন। পরে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন হলে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ। পরের দিন পল্টন ময়দানে আহূত ন্যাপের জনসভায়ও হামলা করে আওয়ামী লীগ এবং সেখানে প্রচুর হতাহত হয়।

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে পাকিস্তানের জন্য এক বিরাট ক্ষতির কাজ করেছিলেন। ক্ষমতায় এসে তিনি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দেন। পরিষদ অধিবেশন ডেকে তিনি সংবিধানে রীতিমত সংশোধন এনেছিলেন। পাকিস্তান হয়েছিল পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে। এটা ছিল একসময় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ। এর জন্য ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান নেতাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এমনকি সোহরাওয়ার্দীও কলকাতার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এই পৃথক নির্বাচনকে ভিত্তি করে। তিনি কি বুঝে এটা করেছিলেন জানি না তবে নির্বাচনে হিন্দু ভোট পাওয়ার তাৎক্ষণিক সুবিধার কথা তিনি ভেবে থাকতে পারেন।

আওয়ামী লীগ যে পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য এক এক করে অতি সন্তর্পণে এগুচ্ছিল ভাষা আন্দোলনের পর পৃথক নির্বাচন তুলে দেওয়ার আয়োজন তারই প্রমাণ। তবে সোহরাওয়ার্দী কখনই পাকিস্তান ভাঙ্গায় জড়িত ছিলেন না। কিন্তু মোসাহেব ও পাকিস্তান বিরোধীদের কথায় তাঁর কান ভারী হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এতদিন আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শোষণের কল্পিত জিকির করত। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী যখন ক্ষমতায় গেলেন তখন তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করছে। সুতরাং নতুন করে পূর্ব পাকিস্তানের আর স্বায়ত্বশাসন দরকার নেই। আসলে ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ কখনও শোষণের কথা বলত না। ক্ষমতা হারালেই শোষণ তারা খুঁজে বেড়াত। এই ছিল আওয়ামী লীগের রাজনীতি।

অথচ এই রাজনীতি পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। দু'অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐক্যের বদলে বিভেদের বীজ পল্লবিত হচ্ছিল। পাকিস্তানের ক্ষমতার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী বেশি দিন টিকে থাকতে পারেননি। মাত্র ১৩ মাস প্রধানমন্ত্রীত্বের পর তাকে বিদায় নিতে হয়। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আওয়ামী কর্মীদের দাপটে সারাদেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। করাচীর সচিবালয় আওয়ামী কর্মীদের গুঞ্জনে মুখরিত থাকত। আমার মনে আছে মাত্র ১৩ মাসের মধ্যেই অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে সর্বপ্রকার লাইসেন্স, পারমিট, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে আমদানী-রফতানীর ব্যবসা, জাহাজের মাল চলাচলের স্থান ও রেলওয়ে ওয়াগন মঞ্জুরী সব কিছু হাতিয়ে নেয় তারা। করাচীর তাজ হোটেল ছিল বিখ্যাত হোটেল। এমন সব আওয়ামী লীগ কর্মী যাদের কোন সামাজিক অবস্থান ছিল না করাচীতে, সে সময় দেখেছি, তাজ হোটেল তাদের দখলে। একবার ব্যবসায়িক কারণে করাচীতে গিয়ে দেখি তাজ হোটেল আওয়ামী কর্মীতে গিজ গিজ করছে। সবাই তদবির প্রার্থী, লাইসেন্স-পারমিট আকাঙ্খী। এদের অনেককেই চিনতাম। তাদের ঘরে ঢুকে দেখি মদ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি।

এরপর প্রধানমন্ত্রী হন মুসলিম লীগের আই আই চুন্দ্রীগড়। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রাখতে সচেষ্ট হন। দুর্ভোগ্যবশত তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদ ৩ মাস স্থায়ী হয়েছিল। পৃথক নির্বাচনী বিল পুনরায় উত্থাপনে মুসলিম লীগ চেষ্টা করে। তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়॥"[৫৩]

দুই

"... ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় উপমহাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু জনসধারণ যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের উপর যে নজিরবিহীন আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, তারা সেই আস্থার মর্যাদা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। ইহার মূলেও কেন্দ্রীয় চক্রের অবদানই ছিল প্রধান।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর এবং জনাব ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় নেতা নির্বাচনের পরেই পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান জনাব ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আহবান জানাইলেন। কেন্দ্রীয় চক্রের অভিপ্রায় অনুসারে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তা করা হইয়াছিল। পার্লামেন্টারী দলের নেতা হিসেবে জনাব ফজলুল হকের নির্বাচন অবশ্য অবধারিত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব উড়াইয়া দেয়া যায় না। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের দলীয় ২২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৩০ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য। যাহোক, দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি রোধ করার জন্য গভর্ণরের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা গঠন কিছুটা বিলম্বিত হয়। ২ রা এপ্রিল (১৯৫৪) জনাব ফজলুল হককে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হইল।

ইতিমধ্যে অন্য একটি অভাবিত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশের একদিন কি দুইদিন পর ঢাকায় আসিয়া পৌছিলেন। ঐ দিন রাতেই তিনি সোজা জালালউদ্দিন ও আবদুল হামিদ সমভিব্যাহারে 'ইত্তেফাক' অফিসে আসিয়া আমাকে লইয়া প্যারামাউন্ট প্রেসে গেলেন।

---

[৫৩] ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৬৯-৭৩]

তিনি আমাকে বলিলেন যে, 'মোহন মিঞা ও আবদুস সালাম খান নাকি ফরিদপুরে বলিয়াছেন, শেখ মুজিব কেমন করিয়া মন্ত্রী হয় তা তারা দেখিয়া লইবেন'। শেখ মুজিব আরও বলিলেন যে, 'মন্ত্রী হইতে তিনি ইচ্ছুক নহেন, তবে তাদের এই কথার পর ব্যাপারটা তার মর্যাদার প্রশ্নে দাঁড়াইয়াছে'। শহীদ সাহেবকে এ ব্যাপারটা জানাইবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বিব্রতবোধ করিলাম। শেষে শহীদ সাহেবকে কথাটা বলিলে তিনি অবাক হইলেন। তার ইচ্ছা ছিল, ফজলুল হক সাহেবের অধীনে কাজ শিখাইবার জন্যে তিনি শেখ মুজিবকে ফজলুল হক সাহেবের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী করিবেন।

এদিকে ৩রা এপ্রিল রাত ১২ টার মধ্যে গভর্ণরের নিকট মন্ত্রিসভার নাম পেশ করিতে হইবে। অথচ কোন্দল শুরু হইয়া গেল। মন্ত্রিসভার সদস্যদের পূর্ণ তালিকা গঠন সম্ভব হইল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার এবং আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে লইয়া প্রথমে ছায়া মন্ত্রিসভা এবং পরে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন হইবে। কিন্তু কোন্দলের অবসান হইল না। অধিক রাত পর্যন্ত দেনদরবার করিয়া শহীদ সাহেব বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। রাত ১২ টার সময় হক সাহেব আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার এবং সৈয়দ আজিজুল হকের (নান্না মিঞা) নাম গভর্ণরের নিকট পেশ করিলেন। জনসাধারণ অবশ্য আভ্যন্তরীণ কোন্দলের খবর জানিল না, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের প্রধান অঙ্গদল আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব বর্জিত তিন সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার নাম দেখিয়া তাদের উৎসাহে ভাটা পড়িল। মহল্লায় মহল্লায় ব্যান্ড পার্টি লইয়া কর্মীদের বাহির হইবার যে প্রস্তুতি চলিতেছিল তা বাতিল হইয়া গেল। গভর্ণর হাউসের গেটে ছোট খাট বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইল। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে প্রদেশব্যাপী যে উৎসাহ-উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছিল তা স্তিমিত হইয়া গেল।

দীর্ঘ দেড় মাসকাল এইভাবে চলিল। পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল না; পর্দার অন্তরালে দলীয় নেতাদের মধ্যে দেন-দরবার ও দরকষাকষি চলিতে লাগিল। শহীদ সাহেব আশাহত হইলেন। নির্বাচনী অভিযানে দিন-রাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া তিনি এমনিই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি করাচী চলিয়া গেলেন। সেখানে তার অসুখ গুরুতর রূপ ধারণ করিল। চিকিৎসা ও অপারেশনের জন্য জুন মাসে তাকে জুরিখ যাইতে হইল। তৎপূর্বে ১৫ই মে একটি আপোষরফা হইল এবং সেই দিনই আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করিল। শেখ মুজিব এবং মোহন মিঞা উভয়ই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

বলাবাহুল্য, যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর হইতেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ চক্রের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগী পশ্চিমা বড় বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরাও পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন সৃষ্টি, অন্যথায় যে কোন উপায়ে যুক্তফ্রন্টকে ধিকৃত করিয়া ক্ষমতার আসন হইতে দূরে রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য-সহযোগিতা যোগাইতে তৎপর হইয়া ওঠে। প্রথম পর্বে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করিয়া যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরাইতে ব্যর্থ হইয়া হক মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা চলে। তাতে অকৃতকার্য হইয়া তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন।

সম্প্রসারিত হক মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিনেই আদমজী মিলে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা সংঘটিত করাইয়া মন্ত্রিসভাকে ধিকৃত করিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কঠোর মনোভাবের মোকাবেলায় আদমজী মিলের দাঙ্গার রহস্য যখন উদ্ঘাটিত হইবার উপক্রম হয়, তখন কেন্দ্রীয় লীগ সরকার প্রমাদ গনেন, আর নুতন উপায় আবিষ্কার করেন। শেরে বাংলা ফজলুল হকের কলিকাতায় ৩০শে এপ্রিল ও ৫ই মে'র মধ্যে প্রদত্ত বলিয়া কথিত কয়েকটি বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া ইতিমধ্যেই করাচীতে শোরগোল শুরু হইয়াছিল। তার ওপর আদমজী মিলের দাঙ্গা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সোনায় সোহাগা হইল। ঠিক এই সময়ই পূর্ব বাংলার প্রবল প্রতিবাদের মুখে ১৯শে মে করাচীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণের নামে পাক-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। আদমজী মিলে দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতি

পর্যালোচনার জন্য করাচীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করিয়া প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হক সাহেব এবং যুক্তফ্রন্টের কতিপয় মন্ত্রীকে করাচীতে তলব করিলেন। ১৯শে মে হক সাহেব তার মন্ত্রিসভার জনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ আজিজুল হক, ইউসুফ আলী চৌধুরী ও আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীসহ করাচী পৌছিলেন। ২২শে মে মন্ত্রীসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মালেক ও সরদার আমির আজম আদমজী মিলের দাঙ্গা সম্পর্কে তাদের পৃথক তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিলেন। কিন্তু দুই জনের রিপোর্ট দুই রকম হওয়ায় মন্ত্রিসভা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হইল না।

২৪শে মে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। পূর্বাহ্নেই পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ কূটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শতকরা ৮০টি আসন জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পুর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রদবদল হইবে না বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাবিত হইবে না। তার উপর প্রতিনিধিত্বহীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের গণমন আরও বিক্ষুব্ধ ছিল। ২৪শে মে মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের (যাকে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহের জন্য বগুড়ার মুহাম্মদ আলী আমদানী করিয়াছিলেন) বদৌলতে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত জনাব ফজলুল হকের একটি বিবৃতি বিকৃত আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। জনাব ফজলুল হক সরাসরি এই বিকৃত বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া কালাহানের রিপোর্টকে তার বক্তব্যের বিকৃত বিবরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া সঠিক বিবরণ সম্বলিত একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এতদসত্ত্বেও জনাব ফজলুল হককে বগুড়ার মুহাম্মদ আলী কালাহান ও রয়টার প্রতিনিধির সাথে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান। হক সাহেব কর্তৃক কালাহানের রিপোর্ট অস্বীকার করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন চক্র কালাহানের রিপোর্টকে মুলধন করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারির দুরভিসন্ধি আঁটিতে থাকে।

মিথ্যা অভিযোগে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় সরকারকে অপসারণের এই কারসাজির বিরুদ্ধে হক সাহেব তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি মানুষের আস্থাভাজন মন্ত্রীদের দেশপ্রেমে সন্দেহ করার প্রতিবাদে 'আলোচনা নিরর্থক' বলিয়া ২৮শে মে রাত্রে বি-ও-এ-সি বিমানযোগে ঢাকার পথে রওয়ানা হন। একই বিমানে জনাব আতাউর রহমান, সৈয়দ আজিজুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা ফিরিতেছিলেন। বিমানের অন্যান্য যার মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী জনাব হাফিজ ইছহাক এবং পুলিশের আইজি জনাব দোহা। আমিও সেই বিমানে ঢাকায় ফিরিতেছিলাম।

অতিপ্রত্যুষে বিমানটি দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমান হইতে অবতরণের পর চীফ সেক্রেটারী আমার পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইবে অনুমান করতে পারেন?' আমি অক্ষমতা প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হইবে। ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্ণর এবং এন, এম, খানকে চীফ সেক্রেটারী নিয়োগ করিয়া পাঠানো হইতেছে। তারা বিশেষ বিমানে রওয়ানা হইতেছেন। হয়তো আমাদের পূর্বেই ঢাকায় পৌছিবেন।'

করাচী অবস্থানকালে এন এম খানের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাকে চীফ সেক্রেটারী করিয়া ঢাকায় পাঠাইতে চান এই কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তবে মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা সম্পর্কে তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই। তখন তিনি এই কথা জানিতেন কি-না আমি জানি না, তবে চীফ সেক্রেটারী হইয়া ঢাকা আসার ব্যাপারে তার অনীহা ছিল - তিনি আমাকে এমনিই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক কোন্দলে তিনি জড়িত হইতে চান না।

দমদম বিমানবন্দরে পৌছার আগেই আমরা সাব্যস্ত করিয়াছিলাম যে, শেরে বাংলাকে বিমান হইতে নামিতে দেওয়া হইবে না। দোহা সাহেব তখন আমাদের বলিলেন যে, তিনি খবর পাইয়াছেন ঢাকায় সশস্ত্র বাহিনী টহল দিতেছে। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, ফজলুল হক সাহেবসহ মন্ত্রীদের কলিকাতায় নামিয়া থাকা উচিত। তিনি ঢাকায় পৌছিয়া প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে খবর পাঠাইবেন। আমরা সকলে একবাক্যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম। কিন্তু হক সাহেব বিমানবন্দরে না নামিয়া ছাড়িলেন না। আমরা প্রায় বেলা বারটার সময় ঢাকায় পৌছিলাম। হাজার হাজার জনতা বিমানবন্দরে উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষমাণ। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর কি ঘটিবে তা জানা ছিল বলিয়া আমরা নীরবে আপন আপন ঘরে চলিয়া গেলাম।

অপরাহ্ণ চারটার সময় মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং ৯২ক ধারা জারি করা হইল। সন্ধ্যায় হক সাহেবের বাসভবনে নিজেদের সভা বসিল। সেখানে পার্লামেন্টারী সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আমি 'ইত্তেফাক' অফিসে গিয়া দেখি গোয়েন্দা বিভাগের একজন ডি-এস-পি এবং একজন ইন্সপেকটর বসিয়া আছেন। তারা আমার হাতে প্রি-সেন্সরশিপ অর্ডার দিলেন। অর্থাৎ তাদের অনুমতি ব্যতীত কোন সংবাদ ছাপা যাইবে না। ফজলুল হক সাহেব স্বগৃহে অন্তরীণ হইলেন। সশস্ত্র পুলিশ তার বাসভবন ঘেরাও করিয়া রাখিল। ঢাকা এবং প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এলোপাতাড়ি গ্রেফতার চলিল এবং চব্বিশ ঘন্টায় ষোল শত নেতা ও কর্মী কারাবন্দী হইলেন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ত্রিশজন পরিষদ সদস্য ছিলেন। ১৪৪ ধারা জারি করা হইল। পূর্বপাকিস্তানে ৯২-ক ধারার শাসন দোর্দন্ড প্রতাপে চলিতে লাগিল॥"[৫৪]

তিন

"... ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনের জন্য ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করা হয়। আগের রাতে সিম্পসন রোডের যুক্তফ্রন্ট অফিসে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের একটি আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে তরুণ সদস্যদের বেশির ভাগই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বলেন–পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগেই হক সাহেবকে মন্ত্রীসভার তালিকা ও তাঁদের দপ্তর বন্টনের ঘোষণা করতে হবে। প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট চিঠির আকারে এই বিষয়গুলো লিখে তাতে হক সাহেবের স্বাক্ষর নিয়ে একটি কপি তার কাছে, একটি মওলানা ভাসানীর নিকট ও তৃতীয়টি গভর্নরের কাছে অর্পণের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে থাকবে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তাঁর বক্তব্য ছিল–জনগণ হক সাহেবকে আগেই লিডার নির্বাচিত করে রেখেছে, সদস্যরা সেই ওয়াদা করে ভোটারদের কাছ থেকে ভোট এনেছেন। এখন হক সাহেবকে লিডার নির্বাচনের জন্য নতুন কোনো শর্ত আরোপ করা হলে তা হবে বেঈমানি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর দলের সদস্যদের হক সাহেবের ওপর আস্থা রাখার পরামর্শ দিলেন।

এদিকে ২৩ মার্চ চন্দ্রঘোনায় কাগজের কলে বাঙালি ও বিহারি মোহাজেরদের মধ্যে মারাত্মক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। বিহারিরা বাঙালি শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের কচুকাটা করেছে। ঐ দাঙ্গার উল্লেখ করে প্রাদেশিক গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান যুক্তফ্রন্ট নেতা হক সাহেবকে তাড়াতাড়ি মন্ত্রীসভা গঠনের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

... হক সাহেবকে দিয়ে একটি দুর্বল প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন এবং যুক্তফ্রন্টের ভেতরে ভাঙন ধরানো ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের লক্ষ্য এবং বলাবাহুল্য, তারা সেই ষড়যন্ত্রে সফল হয়েছিল। কারণ,

[৫৪] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)/পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর ॥ [বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল - ফেব্রুয়ারী. ১৯৮৪। পৃ. ৫৬-৬১]

হক সাহেব ক্ষমতার লোভে এবং নিজের লোকদের ক্ষমতাবান করার জন্য অনেককিছু করতে রাজি ছিলেন। গভর্নর খালিকুজ্জামানকে সম্ভবত এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আওয়ামী লীগের বা গণতন্ত্রী দলের কাউকে মন্ত্রী করবেন না। তাতে কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের লাভই হয়েছিল। হক সাহেব তার ভাগ্নে সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়াকে মন্ত্রী করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা চালাতে থাকেন। এর বিপক্ষে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর প্রিয়পাত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রী করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে হক সাহেবের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি করার জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু হক সাহেব তার ভাগ্নে নান্না মিয়াকে মন্ত্রী বানানোর জন্য জেদ করলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রী বানানোর জন্য পাল্টা জেদ করেন।

গভর্নর ৩ এপ্রিল রাত ১২ টার মধ্যে হক সাহেবকে মন্ত্রীসভার সদস্যদের তালিকা পাঠানোর পরামর্শ দেন। হক-সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে আপোসরফা হলো না। কিন্তু হক সাহেব আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া–এই তিন জনের নাম প্রস্তাবিত মন্ত্রী পদের জন্য পেশ করেন। এতে সোহরাওয়ার্দী সাহেব দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হলেন এবং মওলানা ভাসানী মন্ত্রিত্ব নিয়ে হক সাহেবের সেই ভাগ্নে প্রীতি ও অন্যদের মন্ত্রী হওয়া ও বানানোর নোংরামিতে অতিষ্ঠ হয়ে সন্তোষ চলে গেলেন। যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রীসভায় একজনও স্থান না পাওয়ায় ঐ দলের লোকজন হক সাহেবের ওপর দারুণ ক্ষুব্ধ হন। এই অবস্থায় সোহরাওয়ার্দীও ক্ষুব্ধ চিত্তে করাচিতে চলে যান।

২ মে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে একটি দোকানে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল হয়। এতে ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়। তাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জনমনে নানা সংশয় সৃষ্টি হয়।

... এপ্রিলের শেষভাগে সৌদি আরবের বাদশাহ পাকিস্তান সফরে করাচিতে আসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হককে তার দলবলসহ তার সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। হক সাহেব তড়িঘড়ি করে একটা চার্টার্ড বিমানে তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ও এমএলএ-দের পঞ্চাশ/ষাটজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে করাচি গেলেন সৌদি বাদশার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য। মজার ব্যাপার হলো, যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক দল আওয়ামী লীগের কাউকে সৌদি বাদশাহ আমন্ত্রণ জানাননি। হক সাহেবের সাক্ষাতের পরে অবশ্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সৌদি বাদশার সঙ্গে বৈঠক করার নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এসবের মধ্যে চক্রান্তমূলক ঘটনা কিছু যে ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। হক সাহেবের সঙ্গী প্রত্যেককে সৌদি বাদশার পক্ষ থেকে তাঁর ছবিসহ সোনার ঘড়ি উপহার দেয়া হয়। সেই উপহারের ঘড়ি অনেকেই ঢাকায় এসে চড়া দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

হক সাহেব করাচি থেকে সোজা কলকাতায় চলে যান ১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল। সেখানে তার বিশাল বাড়ি ছিল, সেই সম্পত্তি ঢাকার কারো কোনো সম্পত্তির সঙ্গে বিনিময় করাই ছিল মূল লক্ষ্য। অবশ্য কলকাতায় তাঁর দীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিময় দিনগুলোর নস্টালজিয়া হয়তো তাঁকে টানতো। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য সফরে যাওয়ার যেসব কূটনৈতিক বিধিবিধান রয়েছে তার সবই লঙ্ঘন করে হক সাহেব কলকাতায় যান এবং সেখানে তিনি নির্বিচারে সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। কলকাতা সফরকালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক ভাবাবেগে এমন একটি বক্তব্য দিলেন যা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি মোক্ষম সুযোগ দিলো।

জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক কলকাতায় তাঁর সুদীর্ঘকালের বন্ধু পশ্চিম বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে আলোচনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলো ছিল (ক) দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রথার বিলোপ সাধন, (খ) উভয় বাংলার মধ্যে বাণিজ্য ও

যোগযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন, (গ) উভয় বাংলায় জনসাধারণের ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা ও যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে রিটার্ন-টিকিট পদ্ধতি চালুকরণ, (ঘ) সীমান্ত সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিলকরণ, (ঙ) বাস্তুহারাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি।

সফরকালে খিদিরপুরে হিন্দু-মুসলমানদের দেয়া এক সংবর্ধনা সভায় হক সাহেব যা বলেছিলেন তার মূলকথা: বাংলা রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে দুভাগ হয়েছে সত্যি; কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। রাজনীতিবিদরা দেশটাকে দু'ভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি, ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবেন না।

৬ মে জনাব ফজলুল হক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বৈঠক করেন প্রায় দেড়ঘন্টাব্যাপী। তারপর তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। হক সাহেবের কলকাতা ভ্রমণ ও সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাষণ দান এবং ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে বৈঠক ইত্যাদিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তানের কুচক্রী শাসকগোষ্ঠী নতুন চক্রান্ত শুরু করলো। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বেতার ভাষণে হক সাহেবকে 'পাকিস্তানের শত্রু', 'বিশ্বাসঘাতক' ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করলেন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভের সাফল্যকে বানচাল করার চক্রান্ত শুরু করলো পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলা ও শাসকগোষ্ঠী।

... এই মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলার দিনে অর্থাৎ ১৫ মে খবর এলো আদমজী জুট মিলস এলাকায় বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক সেই দাঙ্গায় নিহত হন বলে জানা যায়। আমি গভর্নর ভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাই একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। আমার হাতে ছিল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ও পাক-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি। সেটিতে, এমএলএ-দের স্বাক্ষর করানোর একসঙ্গে সবাইকে পাওয়া যাবে এই ভেবে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমি আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল ও কয়েকজন ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ থাকলেও তাদের কেউ কেউ অন্য দলের পরিচয়ে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ স্মারকলিপিতে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৭৪ জন এম, এল, এ-এর স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম এসব করে গেট দিয়ে বেরোনোর সময়েই শুনতে পেলাম আদমজীতে অবাঙালি শ্রমিকরা বাঙালি শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করে শত শত লোককে হত্যা করেছে।

পরিস্থিতি সরজমিন প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তখুনি আদমজীর দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় যাই। নব নিযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে সেখানে গিয়েছিলেন - আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও আবু হোসেন সরকার প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেব বা অন্য কোনো মন্ত্রী সেদিনই গিয়েছিলেন কিনা এতোদিন পর আজ আর তা সঠিক মনে নেই। তবে স্পষ্ট মনে পড়ে, আদমজী মিল এলাকায় সর্বত্র রক্ত আর রক্ত। দাঙ্গায় নিহত-আহত মানুষের রক্ত, আশপাশে ডোবা নালার কচুরিপানার ওপরে অসংখ্য মৃতদেহ, ধারালো অস্ত্রে মানুষকে খুন করে এইসব ডোবা নালায় নিক্ষেপ করা হয়েছে। বীভৎস সেই দৃশ্য, তাকানো দায়। শিশুদের খণ্ডিত দেহ ভাসছে; দাঙ্গাকারীরা এতো নির্মম হতে পারে, না দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না।

ঐসব নারকীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলো। পা চলছিল না একদম। নিজের শরীরটাকে কোনমতে জোর করে টেনে নিয়ে চলছিলাম। এরই মধ্যে শ্রমিক বস্তিতে একটা ঘরে ঢুকলাম। আমাদের কাছাকাছি একটা তক্তপোষের নিচে কিছু একটা নড়াচড়ার হালকা শব্দ পেলাম। অথচ ঘরশূন্য, খা খা করছে। তক্তপোষের নিচে একটা হোগলা জড়ানো। তারই ভেতর অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলো একজন মানুষকে। তিনি আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছিলেন।

হোগলাটা ধরে টান দিতেই মানুষটি বেরিয়ে এলেন। তিনি চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিলেন। তার ভয়–বিহারি দাঙ্গাবাজরা আবার তাকে খুন করতে এসেছে। ঐ অভিনব কৌশলে নিজেকে লুকিয়ে রেখে তিনি বিহারি দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

... এ সময় ক্যালহান নামে একজন বিদেশী সাংবাদিককে দেওয়া হক সাহেবের এক সাক্ষাৎকার একটি মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখছেন এই ধরনের একটি কথা ছিল। ফলে, এই নিয়ে বেশ হৈ চৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। পরে অবশ্য হক সাহেব বলেছিলেন যে, তার বক্তব্য ক্যালহান বিকৃত করে পরিবেশন করেছে। হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকদের যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, এটাও তার একটা অংশ কিনা কে জানে।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হককে কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচিতে ডেকে পাঠালেন। ২১ মে হক সাহেব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক - এই তিন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে করাচি পৌঁছলেন। হক সাহেব পাকিস্তানের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে, তিনি সাংবাদিক কালাহানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো কথা বলেননি; পশ্চিম পাকিস্তানে ৯/১০ দিন থেকে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি একটা আপোসরফার চেষ্টা করেন।

৩০ মে হক সাহেব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে করাচি ত্যাগ করেন। পরের দিনই অর্থাৎ ৩১ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থতার অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন। তিনি একইসঙ্গে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা জারি করে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন॥”[৫৫]

চার

“... ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একতরফা জয়ে হতভম্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল প্রমাদ গণিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানাইতে বেশ কিছু টালবাহানা করা হইল। পরিশেষে ২৫শে মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া নিলেন। তবে, অতীব পরিতাপের বিষয় যে, ইহার আগেই কায়েমী স্বার্থপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পূর্ববংগে অরাজকতা সৃষ্টি দ্বারা ফায়দা লুটিবার জন্য ২৩শে মার্চ চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী পেপার মিলে বাংগালী-অবাংগালী মেহনতি শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাংগা সংগঠিত করে। ইহার ফল পাকিস্তানের জন্য শুভ হয় নাই।

ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ২রা এপ্রিল (১৯৫৪) পূর্ব বংগ আইন পরিষদে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টারী সভায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচন করা হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শেরে বাংলার সহিত জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী ও শেরে বাংলার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া শপথ গ্রহণ করেন। স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও সরকার গঠনের প্রথম পদক্ষেপেই ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হককে মন্ত্রীসভার সদস্য করিয়া শেরে বাংলা ২১ দফা ওয়াদার প্রতি বৃদ্ধাংগুলী প্রদর্শন করেন।

---

[৫৫] মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ২০৬-২১৩]

দ্বিতীয়তঃ সর্ববৃহৎ অংগদল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হইতে কাহাকেও মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন নাই। ফলে অনৈক্য সৃষ্টি হইল। কেন্দ্রীয় শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল অতি সন্তর্পণে ইহারই অপেক্ষায় ওঁৎ পাতিয়াছিল। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলার উল্লিখিত কার্যক্রম দুইটি ছিল যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের প্রতি ভাগ্যাহত জনগণের উচ্চাশা ও অবিচল আস্থার উপর অপ্রত্যাশিত ও নির্মম কশাঘাত। নেতার অদূরদর্শিতাপূর্ণ কার্যাবলী এইভাবেই দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করে।

শেরে বাংলার আচরণে বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলার সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার সুযোগ অন্বেষণে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কলিকাতা সফরকালে ৩০শে এপ্রিল এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দানকালে আবেগপ্রসূত মুহর্তে বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাংগালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাংগালীকে কোন শক্তিই কোনদিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাংগালী চিরকাল বাংগালীই থাকিবে।'

শেরে বাংলার উক্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। আওয়ামী মুসলিম লীগ শেরে বাংলার উক্তির কদর্থ করিয়া রাজনৈতিক অংগনে তাহাকে ঘায়েল করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই দিকে ২রা মে (১৯৫৪) বা ১লা রমজান অপরাহ্নে এক অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকের সম্মুখে সশস্ত্র পুলিশের গুলীতে ৬/৭ বৎসরের এক কিশোর বালক প্রাণ হারায়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

চকবাজারের এক পানের দোকানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক কারারক্ষী (Jail Warder) মকবুল হোসেন বাকী খরিদ বাবদ বার আনা বা পঁচাত্তর পয়সা ঋণী ছিল। মকবুল হোসেন পুনরায় বাকী খরিদ করিতে চাহিলে দোকানী বাকী বিক্রি করিতে অস্বীকৃতি জানায় ও পূর্বেকার বাকী পঁচাত্তর পয়সা পরিশোধ করিতে বলে। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হয় ও ঘটনা ক্রমান্বয়ে হাতাহাতি ও মারামারির রূপ গ্রহণ করে। এই তুচ্ছ ঘটনাটিই অচিরে জনতা ও কারারক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার মতলবে খবর পাওয়ামাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ববংগ আইন পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাফেলাকে নেতৃত্ব দিয়া জেল গেট আক্রমণ করেন। উচ্ছৃঙ্খল জনতা জেল গেট সন্নিকটবর্তী সশস্ত্র পুলিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলে, আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার অপরিহার্য কারণেই জেল গেটে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশ গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আই জি পি শামসুদ্দোহা সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভংগ করিবার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনা অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ এবং অনুল্লেখযোগ্য অথচ ইহার ফলশ্রুতিতে একটি নির্দোষ নিষ্পাপ কিশোরকে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিতে হইল। অকারণেই খালি হইল মায়ের বুক। সস্তা জনপ্রিয়তাকামী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট ঘটনার যথার্থতা বা গুণাগুণ বিচার অবান্তর। উল্লেখ্য যে, আমাদের অনুরোধে নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণের জন্য শেরে বাংলাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেরে বাংলা শেখ সাহেবকে মন্ত্রীসভায় নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। ফলে গোটা আওয়ামী লীগের আর কাহাকেও মন্ত্রীসভায় নেওয়া হয় নাই। ইহাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ আর ইহারই পরিণাম ফল সদ্য গঠিত ফজলুল হক সরকারের বিরুদ্ধে তাহার এই অভিযান।

... ১০ই মে আওয়ামী লীগ আহূত পল্টনের বিরাট জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা অকস্মাৎ বিনা আমন্ত্রণে হাজির হইলেন। পল্টন সভামঞ্চে যুক্তফ্রন্টের দুই কর্ণধার মওলানা ভাসানী ও শেরে বাংলার একসংগে উপস্থিতি জনসমুদ্রে এক নব আশা ও আস্থার সঞ্চার করিল। সভায় শেরে বাংলা আবেগপ্রবণ ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, তিনি মাওলানা ভাসানীর নির্দেশেই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। এইভাবেই করাচী শাসকচক্রের প্ররোচনায় যুক্তফ্রন্টে যে অনৈক্যের বীজ বপনের চেষ্টা চলিতেছিল,

কুচক্রীদের সেই প্রচেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হইল। ১৫ই মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত হইল। আওয়ামী লীগের তরফ হইতে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান, হাশিমুদ্দিন আহমদ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন।

সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণকালেই আদমজী পাটকলে বাংগালী-অবাংগালী শ্রমিকে শ্রমিকে ভয়াবহ দাংগা সংগঠিত হয়। দাংগায় পনের শত আদম সন্তান বিনা কারণে প্রাণ হারায়। যুক্তফ্রন্টের বিজয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নেক নজরে দেখে নাই। তাই তাল সামলাইতে না পারিয়া বেসামাল মার্কিন রাষ্ট্রদত হিলড্রেথ খুবই অযাচিতভাবে ও সর্বপ্রকার কূটনৈতিক শালীনতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মন্তব্য করিলেন যে, 'পূর্ববংগের নির্বাচনের ফলাফলের দরুন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন হইবে না।' ইতিপূর্বে ২৩শে মার্চ কর্ণফুলী পেপার মিলে বাংগালী-অবাংগালী শ্রমিকের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী দাংগা হয় তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৫ই মে আদমজী পাটকলে।

নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা কালাহান মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাষ দান করেন। মিঃ কালাহানের এক প্রশ্নোত্তরে শেরে বাংলা নাকি বলিয়াছিলেন, 'পূর্ববংগ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।' কেন্দ্রীয় শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন বশংবদ গোষ্ঠীর মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের মহলে দাবি উঠিল, দেশদ্রোহী শেরে বাংলাকে পদচ্যুত করিয়া পূর্ববংগে কেন্দ্রীয় শাসন চালু কর। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সহিত বোঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা করাচী গেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অশুভ মতিগতিতে আতঙ্কিত হইয়া করাচীতে অবস্থানরত জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকা হইতে কতিপয় মন্ত্রীকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না।

৩০শে মে গভর্নর জেনারেলের ভাষায় 'কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে' ব্যর্থ শেরে বাংলার মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করা হয় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করিয়া জারি করা হয় কেন্দ্রীয় শাসন। গভর্ণর চৌধুরী খালেকুজ্জামানের স্থলে দেশরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্ণর পদে ও জনাব এম এ ইসহাকের স্থলে জনাব এন এম খানকে চীফ সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলা সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপ আদেশ জারি এবং যুক্তফ্রন্ট কর্মীদেরকে গ্রেফতারের হুকুম জারি করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ পঁয়ত্রিশজন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্যসহ প্রায় হাজারের উপর লোক গ্রেফতার হন। আমরা আত্মগোপন করিলাম।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আচরণে প্রথম হইতেই গভর্ণরী শাসন প্রবর্তন হওয়ার আশংকা আমাদের মনের কোণে নানাভাবে উকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। এইরূপ অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিবেশেই কমিউনিস্ট বন্ধুদের প্ররোচনায় মওলানা ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বার্লিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন। আমাদের কোন আপত্তি, কোন যুক্তি, কোন বাধা মওলানা ভাসানীর বিদেশ গমনের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আসন্ন নিশ্চিত হামলার সুস্পষ্ট ও অর্থবহ ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া মজলুম নেতার এই দেশ ত্যাগ পরোক্ষ ও তাহার অলক্ষ্যে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকেই শক্তিশালী করিয়াছিল। তাই ইস্কান্দার মীর্জা দম্ভোক্তি করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতে পারিয়াছিলেন, 'মাওলানা ভাসানীর মত রাষ্ট্রদ্রোহী প্রত্যাবর্তন করিলে, তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে।' প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ১৫ই জুন বেতার ভাষণে দাবি করেন, শেরে বাংলা নাকি নিজেই তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত 'রাষ্ট্রদ্রোহী' অভিযোগের 'স্বীকারোক্তি' দিয়াছেন।

... এইদিকে গভর্ণর ইস্কান্দার মীর্জার আধা সামরিক শাসনে যে নাভিশ্বাস দেখা দেয়, তন্মুহূর্তে যুক্তফ্রন্টের ত্রিপ্রধান নেতার অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরো শূন্যতার গর্ভে নিক্ষেপ করে। শেরে বাংলা অন্তরীণ অবস্থায় ২৩শে জুলাই (১৯৫৪) রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্য বিবৃতি দিলেন।

বিবৃতি দিলেন। মওলানা ভাসানী লন্ডনে দিন গুজরান করিতেছিলেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী পেটের ফোঁড়া অপারেশনকল্পে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। অথচ এই তিন প্রধান ঢাকার মাটিতে দাঁড়াইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারিকৃত গভর্ণরী শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ডাক দিলে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে পুনর্বহাল করা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোন উপায় থাকিত না। নেতৃত্বের দুর্বলতা জনতার প্রতিরোধ চেতনা ও শক্তিকে যে কিভাবে স্তিমিত করিয়া ফেলে, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শেরে বাংলা মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান নিজ গ্রেফতারের পূর্বে ৩০শে মে করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াই অপরাহ্নে তাহার সরকারি বাসভবনে আমাদের (অর্থাৎ আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন, হাতেম আলী তালুকদার ও আমি) সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়বার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি তদুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, প্রতিরোধ আন্দোলন করিবার প্রয়োজনেই শেখ সাহেবকে আত্মগোপন করিতে হইবে এবং তাহার গ্রেফতার বরণ করা সমীচীন হইবে না। কিন্তু আমাদের পরামর্শের প্রতি বৃদ্ধাংগুলী দেখাইয়া শেখ সাহেব সরকারি বাস ভবনেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং তথা হইতেই গ্রেফতার হইলেন ও নির্ঝঞ্ঝাটে কালযাপনের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আশ্রয় হইলেন৷"[৫৬]

পাঁচ

"... যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরীক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে কোন প্রকার পরামর্শ পর্যন্ত না করে শেরে বাংলা ১৯৫৪-এর ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠণ করলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেরে বাংলাকে অনুরোধ করলেন, মুজিবকে মন্ত্রিসভায় নেয়ার জন্য কিন্তু শেরে বাংলা তা প্রত্যাখান করায় যুক্তফ্রন্টের ঐক্যে ফাটল ধরে।

এ সময়ে বঙ্গবন্ধু আমাকে ও সাঈদ আলী খানকে ঢাকাতে ডেকে পাঠান। এক কর্মী সভায় বঙ্গবন্ধু তখনকার অবস্থা আমাদেরকে অবহিত করেন। শেষে আমার নেতৃত্বে একটা ডেপুটেশন শেরে বাংলার ঢাকার বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরের দিন সকালে আমি, সাঈদ আলী খান, অব্দুল হাই, ইউনুস মোল্লা, আবুল হোসেন প্রমুখ মূখ্যমন্ত্রীর (ব্যক্তিগত) ঢাকার বাসায় যাই।

শেরে বাংলা তখন সকালের নাস্তা খাচ্ছিলেন। আমাদেরকে বসার জন্য ইশারা করলেন। আমি অগ্রবর্তী থাকায় তার কাছাকাছি বসলাম। তিনি সৌজন্য বশত: আমাদেরকে নাস্তা খেতে বললেন না। খেয়েই যাচ্ছিলেন। তা প্রায় ৫-৬ গন্ডা পরোটা আর মুরগির মাংশ। কিছু সময় বাদে আমি একটা পরোটা তুলে নিয়ে মাংশের বাটি থেকে হাত বাড়িয়ে মাংশ নিলাম। তিনি আমার দিকে কিছুটা রাগান্বিতভাবে তাকালেন।

নাস্তা শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন 'আমরা কি চাই?' বললাম, 'আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এসেছি। শেখ মুজিবকে মন্ত্রিসভায় নেয়া হয়নি বলে।' তিনি বললেন, 'এটা তোমাদের ব্যাপার না।' আমাদের সাথে তর্কাতর্কি বেঁধে যায়।

শেষে চলে আসার সময় বললাম, 'দেখা যাবে। আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। মুজিবকে মন্ত্রিসভায় না নেয়া হলে আমরা নান্নার উপরে প্রতিশোধ নেব।'

---

[৫৬] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ১৮৮-১৯২]

বলাবাহুল্য শেরে বাংলা তার ভাগ্নে নান্নাকে বিশেষ স্নেহ করতেন বলে মুজিব ভাই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। যদি হুমকি দিতেই হয় তবে যেন নান্না প্রসঙ্গে দেই। পরে ১৫ মে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করে শেখ মুজিবকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন॥"[৫৭] (সাক্ষাৎকার : সরদার রহমত জাহান)

ছয়

"... অবশেষে শেরেবাংলা ফজলুল হক শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন। হক সাহেব যাদের প্রথম পর্যায়ে আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রী করেছিলেন তারা হলেন, খান আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমানকে হক সাহেব মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত না করায় তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে আদমজী জুট মিলে তার অনুগত শ্রমিকদের দিয়ে অবাঙালি শ্রমিকদের সাথে এক অপ্রীতিকর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিলেন। যার ফলে আদমজীতে বেশকিছু অবাঙালি শ্রমিক-কর্মচারীদের অকাল মৃত্যুবরণ করতে হয়। তা ছিল জাতির জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ ঘটনার পর শেরেবাংলা ফজলুল হক সাহেব তার উদার মন দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে মন্ত্রী নিযুক্ত করে শান্ত করেছিলেন। তখন দেশবাসীর মনে প্রশ্ন ছিল জেল হতে বের হয়ে আসার পর কি কারণে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব জাতির নির্বাচনী রায় যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে দিয়েছিল এবং কেনইবা তিনি সে রায় অস্বীকার করে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার দায়-দায়িত্ব আওয়ামী লীগের গায়ে চাপালেন? এ হৃদয়বিদারক অরাজনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে মূখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা ফজলুল হক তার মন্ত্রিসভার মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী হয়ে কয়েকদিন মাত্র মন্ত্রী পদে ছিলেন॥"[৫৮]

সাত

"...ঘটনাটি ছিল এমন–পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করলে হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি জীবনে শেষবারের মতো কলকাতা শহরে যান, যে শহরে তার কর্মজীবন কেটেছে–যে শহরে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এখন কোলকাতা আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের ভিড়। হক সাহেব কোলকাতায় গিয়ে বিপুল সংবর্ধনা পেলেন। সংবর্ধনার জবাবে হক সাহেব বললেন, বঙ্গদেশ খণ্ডনের দ্বারা বাঙালিকে, বাঙালি সত্তাকে, বাঙালি স্বকীয়তাকে, বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালি মনের কামনাকে দু'টুকরো করা যায় না। যাবেও না। মতলবাজরা দেশটাকে দু'টুকরো করলেও এপার বাংলা, ওপার বাংলার ভাষা ঐ বাংলা ভাষা। মিথ্যার প্রাচীর থাকলেও এপার বাংলা, ওপার বাংলার মানুষ একই ভাষায় কথা বলে। সংস্কৃতিগতভাবে একইভাবে চলাফেরা করে। ইতিহাসের প্রয়োজনে আবার তারা একে অপরের নিকটবর্তী হবে।

[৫৭] বঙ্গবন্ধুর অজানা অধ্যায়/সম্পাদনা : আলম তালুকদার ॥ [মুক্তপ্রকাশ - আগস্ট, ২০০৯। পৃ. ৫১]

[৫৮] শেখ আবদুল আজিজ (আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং মুজিব সরকারের তথ্য, কৃষি ও যোগাযোগ মন্ত্রী)/রাজনীতির সেকাল ও একাল ॥ [দি স্কাই পাবলিশার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯। পৃ. ২২৫]



যুক্তফ্রন্টের প্রধান পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমান

কোলকাতায় 'দি স্টেটসম্যান' এ ভাষণের শিরোনাম করল–'হক সাহেব আশা করছেন, দু'বাংলার কৃত্রিম প্রাচীর থাকবে না'। 'আনন্দবাজারের' শিরোনাম–'উভয়বঙ্গের মিথ্যার প্রাচীর ভেঙে ফেলার সংকল্প'।

কোলকাতার পত্রিকার এই খবরকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র শুরু হলো। পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হলো। হক সাহেব নজরবন্দি হলেন। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নিযুক্ত গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সংবাদ সম্মেলনে বললেন, 'কোথায় মওলানা ভাসানী। আমি তাকে প্রয়োজনে গুলি করব। আমার শাসনের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করলে সহ্য করা হবে না। দরকার হলে আমি পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করব। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে দশ বিশ হাজার মানুষ হত্যা করতেও পিছপা হব না।' ২৩ জুলাই অন্তরীণ অবস্থায় হক সাহেব রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি হওয়ায় মুসলিম লীগের নেতারা খুশি হলেন। কিন্তু তাদের এ আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী হলো না। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ২৩ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতা ১৯৪৬ সালে নির্বাচন হওয়ায় গণপরিষদের সদস্য ছিল। এবার সে সদস্যপদও গেল। গভর্নর জেনারেলের কাজটি ছিল একান্তই অগণতান্ত্রিক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আনন্দের ঢেউ দেখা গেল। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। আমার শত্রু মুসলিম লীগ। সেই মুসলিম লীগ অধ্যুষিত গণপরিষদ গোলাম মোহাম্মদ ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং গোলাম মোহাম্মদ আমার বন্ধু। তাই হঠাৎ যুক্তফ্রন্টের শরিক দল আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং নেজামে ইসলাম গভর্নর জেনারেল ওপর খুশি হলো।

২৩ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেশে ফিরবার জন্যে জরুরি বার্তা পাঠানো হলো। তিনি করাচি ফিরে এলে তাঁকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দেয়া হলো। ২৫ অক্টোবর মোহাম্মদ আলী দেশে ফিরে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এই মন্ত্রিসভাকে বলা হলো মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্ট। বিজ্ঞজনদের মন্ত্রিসভা। এ মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা হলো সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা, এককালের সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. খান সাহেব, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা আবু হোসেন সরকার, শিল্পপতি ইস্পাহানী, মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, মীর গোলাম আলী প্রমুখ। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী তখন জুরিখে চিকিৎসাধীন।

আমরা হতভম্ব হলাম। এ কোন্ রাজনীতি। দীর্ঘদিন পর জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হলো। ২ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। কিন্তু একটি যৌথ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলেন না। তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া এবং নেজামে ইসলামের আশরাফ উদ্দীন চৌধরীকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল (সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও)। হক সাহেব রাজি হলেন না। ইতোমধ্যে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি পেপার মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা। অনেক আলোচনার পর ১৫ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলো–মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবুর রহমান অন্তর্ভুক্ত হলেন। সে দিনই আদমজীতে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা হলো। হক সাহেবের কোলকাতার সংবর্ধনা সভায় একটি কথিত উক্তিকে ভিত্তি করে ৩০ মে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি হলো। বলা হলো, 'কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ শেরে বাংলার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হলো।' ২ জুলাই বিবৃতি দিয়ে হক সাহেব রাজ চাকরি ছেড়ে দিলেন।"[৫৯]

আট

"... বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা বর্ষিয়ান মৌলভী ফজলুল হক সাহেব দলপতি হিসাবে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রি নির্বাচিত হলেন এবং ১৩ই এপ্রিল (১৯৫৪) তার মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তখন তার

---

[৫৯] নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ১০৩-১০৫।

বয়স প্রায় বিরাশি বছর। ১৯৪৩ সালের অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রি ফজলুল হক সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং প্রায় এগার বছর পরে পুনরায় তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এসে বিভক্ত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গবাসীদের সাথে পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষও এ ঘটনাকে স্বাগত ও আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। কারণ হিন্দু-মুসলমান, পশ্চিম বা পূর্ববাসী নির্বিশেষে সকল বাঙালী মাত্রেরই অন্তরে হক সাহেবের জন্য একটি বিশেষ স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন পাতা ছিল।

৩০শে এপ্রিল, '৫৪ শুক্রবার কলকাতার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলো একটি 'সুখবর' পরিবেশন করল যে, সেদিন অপরাহ্নে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রি জনাব ফজলুল হক সাহেব ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে পৌছবেন। সংবাদে আরও জানা গেল যে, পায়ে গুরুতর এক ধরনের ব্যথায় হক সাহেব বেশ কিছুদিন যাবত অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হাঁটা-চলাফেরা করতে তার খুব কষ্ট হয়। এমন কি অনেক সময়ই তাকে ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে চলা ফেরা করতে হয়। তিনি তার পায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসছেন।

তাঁর আযৌবন বন্ধু ও সহযোগী পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রি ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে দিয়ে হক সাহেব তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেনই। এমন কি প্রয়োজন বোধে একজন সার্জেনের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করবেন।

তার পায়ের যন্ত্রণার বিষয়ে হক সাহেব পরে কলকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাজা নাজিমউদ্দিনের শাসন কালে বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেবার আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তখন শোভাযাত্রীদের ওপর বহুবার পুলিশ নির্দয়ভাবে লাঠি চালনা করে। এ ধরণের একটি শোভাযাত্রায় হক সাহেব নিজেও ছিলেন। তিনি পায়ে গুরুতর লাঠির আঘাত পান। হক সাহেব বলেন যে, তার পায়ের যন্ত্রণা এই আঘাতজনিতই।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৪ সাল শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের একটি বিমানে হক সাহেব সদলবলে দমদম বিমান বন্দরে উপনীত হলেন। সাথে তাঁর পত্নী ও দশ বছর বয়স্ক পুত্র আবুল কালাম ফায়েজুল হকও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলার প্রিয় নেতা ফজলুল হক সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কলকাতায় একটি 'হক সম্বর্ধনা সমিতি' গঠিত হয়েছিল। এ সমিতির কার্যালয় ছিল ৭নং ওল্ড গেষ্ট হাউস স্ট্রীটে।

বিমান বন্দরে হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এক বিপুল জনতা। তারা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে হক সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে যান। অনেকে তাঁর পদ স্পর্শ করে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় হক সাহেবকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। এবং তিনি সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর পূর্ব পরিচিত অনেককে চিনতে পারলেন। পূর্ব বাঙলায় দীর্ঘদিন কারা ভোগ করার পর সদ্য কারা মুক্ত শ্রীধীরেন ভৌমিক হক সাহেবকে মাল্য দান করতে গেলে তিনি তাকে চিনতে পারেন। হক সাহেবের পায়ের যন্ত্রণার দরুন পাক্ ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব নসরুল্লার গাড়ী বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হক সাহেব গাড়ী করে বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জ পর্যন্ত আসেন। সেখানে তাকে অনেকে মাল্যভূষিত করেন এবং সমবেত সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরেন। হক সাহেব একটি চেয়ারে বসে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তার কলকাতায় আগমনের উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের জবাবে হক সাহেব বললেন যে, 'তাঁর পায়ের চিকিৎসার কারণই তার কলকাতা ভ্রমনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমার পুরানো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি। এ কলকাতা শহরে ষাট বছরেরও বেশী সময় আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় দিনগুলো কাটিয়েছি। সেসব দিনগুলোর কথা আজ বড় মনে হচ্ছে। সেসব পুরানো স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্ভব হলে নতুন প্রেরনা সঞ্চার করতে আমি কলকাতায় এসেছি। ভবিষ্যতেও আসব।'

সমবেত সাংবাদিকদের কাছে একটি বিবৃতিও দিলেন হক সাহেব। বিবৃতিতে তিনি বললেনঃ 'আপনাদের সকলের সহৃদয় ব্যবহারে আমি এতদূর অবিভূত হয়ে পড়েছি যে কথা বলবার এবং মনের ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা এখন আমার নেই। আল্লাহর কৃপায় আমি সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। তবে আমি কথা

দিচ্ছি যে. আমি যাই লাভ করে থাকি না কেন; তা আপনাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে গ্রহণ করব। যথার্থ অংশ আপনাদের দিতে কখনই কার্পন্য করব না। দুই বাঙলার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ও উপযুক্ত সময়ে আমি সব বলব। সে এক বিরাট কাহিনী। আমি আমার বন্ধু, ডঃ রায়ের সঙ্গেও উভয় বঙ্গের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি।'

হক সাহেব আরও জানান যে, সম্ভবতঃ ৬ই মে বুধবার তিনি ঢাকায় ফিরবেন। এর পরে খাজা নসরুল্লা ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রি সৈয়দ আজিজুল হক সাহেবের সাথে ফজলুল হক সাহেব পার্ক সার্কাসে তার কড়েয়া রোডের বাস ভবনে চলে যান।

সেই দিনই রাতে হক সাহেব 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কথা প্রসংগে এ আশা প্রকাশ করলেন যে, সংশ্লিষ্ট সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিত লাভ করলে অদূর ভবিষ্যতে উভয় বঙ্গের মধ্যে ভ্রমণ ব্যবস্থা, বাণিজ্য সম্পর্ক ও অন্যান্য সমস্যাগুলো সমাধানের পথ বর্তমানের তুলনায় অনেক সুগম হবে।

পর দিন অর্থাৎ শনিবার সকালে হক সাহেব রাইটার্স বিলডিংস এ ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডঃ রায় এগিয়ে এসে দোতালায় সিঁড়ির মুখে হক সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন, এবং রাইটার্স বিলডিংস-এর বহু সরকারী কর্মচারী তাদের প্রাক্তন প্রভুকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

ডঃ রায় অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হক সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন এবং যথোপযুক্ত পরামর্শ দিলেন। ঠিক হল যে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হক সাহেবের রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করান হবে। হক সাহেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উভায় মুখ্য মন্ত্রির মধ্যে দুই বাংলার নানা সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয় অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে। মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয় গুলো নিয়ে তারা আলোচনা করলেন:

১. দুই বঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

২. উভয় বঙ্গের মধ্যে ভ্রমন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ও যাত্রীদের কষ্ট লাগবের জন্য ফিরতি টিকিট দেয়ার ব্যবস্থা।

৩. দুই বঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রথা বিলোপের প্রসঙ্গ।

৪. সীমান্ত ব্যবসা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ শিথিল করন।

৫. পূর্ব বঙ্গের যে সমস্ত বাস্তুহারা সে সময় ভারতে ছিলেন তাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে যাতে আস্থা সঞ্চারিত হতে পারে সেজন্য ঐ রাজ্যে যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবে আঘাত মূলক গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে আলোচনার সময় ডঃ রায় হক সাহেবের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষন করলেন। হক সাহেব ডঃ রায়কে জানালেন যে:

"তিনি কার্যভার গ্রহণ করার পর ইতিমধ্যেই এ ধরনের বই বাজেয়াপ্ত করেছেন। হক সাহেব ডঃ রায়কে জানান যে, ঢাকার বর্ধমান হাউজে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি বাঙলা একাডেমী গঠন করা হয়েছে। হক সাহেব আরও বললেন যে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জয় উভয় বঙ্গের বাঙালী পণ্ডিত অধ্যাপক ও সাহিত্য সেবীদের বিনিময় করতেও তারা প্রস্তুত আছেন।"

ডঃ রায়ের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষ হবার পর হক সাহেব রাইটার্স বিলডিংস-এ সমবেত সাংবাদিকদের বললেন:

"দুই বাঙলার মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা আমি বুঝিনা। দুই দেশের এ ব্যবধান কৃত্রিম। দুই বঙ্গের মধ্যে অবাধ যোগাযোগের সব বাধা নিষেধ অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এবং আমি আমার এ প্রচেষ্টায় বন্ধু বিধান বাবুর সহযোগিতা কামনা করি।"

পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে হক সাহেব বললেন যে:

"তিনি তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তিনি অবিলম্বে বর্ণ হিন্দু ও তপশিলি হিন্দুদের মধ্যে দু'জনকে তার মন্ত্রিসভায় আসন দান করবেন ও পরে আরও দু'জন হিন্দুকে মন্ত্রি পদে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা তার আছে।"

হক সাহেব আরও বললেন যে, 'তিনি সারাজীবন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙলা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ও কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাদের দু'মুঠো অন্ন ও বস্ত্র যোগানই হল তার জীবনের ব্রত।' হক সাহেব যখন রাইটার্স বিলডিংস থেকে বিদায় নিলেন, ডঃ রায় নীচে এসে গাড়ী পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁদের দুজনকেই অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। হক সাহেব গাড়ীতে উঠবার আগে ডঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন, 'ঢাকায় যাওনের আগে তোমার লগে আবার দেখা অইব?' ডঃ রায় সহাস্যে জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

অশীতিপর নেতা শনিবার দিনটি অত্যন্ত কম ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত করেন। বহু পুরানো বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিত ব্যক্তি কড়েয়া রোডে তার বাস ভবনে দেখা করতে আসেন। দুটি সম্বর্ধনা সভায়ও তিনি যোগ দেন, তার মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তাঁবুতে একটি। রবিবারেও কলকাতায় ফজলুল হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভাতেই তিনি উভয় বঙ্গের মধ্যে ভিসা প্রত্যাহার, সীমান্তের উভয় দিকের বাস্তুহারাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সুদৃঢ় করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক গোলোযোগের সময় গঠিত 'শান্তি সেনা' প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মিডলটোন রোডে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ রাধা বিনোদ পাল। এ সভায় সম্বর্ধনার উত্তরে এক আবেগময় ভাষণে হক সাহেব বললেন:

"জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তার আর কোন আশা বা অকাঙ্খা নেই। উভয় বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হয়েছে তা অপসারিত করার কাজ যদি তিনি আরম্ভ করে যেতে পারেন, তাহলেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতে পারবেন।"

বৃদ্ধ ফজলুল হক ভাবাকুল কণ্ঠে বলে চললেন,

"দুই বাঙলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুনাময় খোদাতায়ালার দরবারে আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, তিনি যেন এ ব্যবধান অচিরেই দূর করেন। আমার এ আকাঙ্খা যাতে পূর্ণ হয় সেজন্য আপনারা আমাকে দোয়া করুন।"

হক সাহেব আরও বলেন যে, "মহাত্মা গান্ধীর আদশে সংগঠিত শান্তি সেনার বাণী পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এও তার কামনা।"

সেদিনই অর্থাৎ রবিবার খিদিরপুরে হিন্দু মুসলমানদের একটি মিলিত সম্বর্ধনা সভায় হক সাহেব আবার বললেন,

"বাঙালীরা পূর্বে বা পশ্চিমে যে যেখানেই থাকুক না কেন তারা অখণ্ড এবং তাদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে।"

হক সাহেব আরও বললেন, "বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু'ভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গে কোন ফারাক নেই। রাজনীতিবিদরা দেশটাকে দু'ভাগ করে এ সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবে না।"

হক সাহেব বললেন যে, "জীবনের বাকী দিনগুলো তিনি যেন হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার ব্রতে অতিবাহিত করতে পারেন। এটা তার একমাত্র আকাঙ্খা।" তিনি উভয় বঙ্গের হিন্দু মুসলমানদের প্রতি এ আবেদন জানালেন যে, "তারা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে প্রকৃত ভাই-ভাইয়ের মত মিলে মিশে শান্তিতে বাস করেন।"

ট্রেড ইউনিয়নের নেতা মৃণাল কান্তি বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটি সভায় হক সাহেব জানালেন যে,

"সাবেক পুর্ব পাকিস্তানে যে সব পাঠ্যপুস্তকে অপ্রয়োজনীয় আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ দিয়ে সুমধুর বাঙলা ভাষাকে বিকৃত করা হয়েছে সেগুলো বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি ইতিমধ্যেই অবলম্বন করেছেন।"

পরদিন সোমবার ৩রা মে সকালে কলকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে হক সাহেবের ভাষণ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা শিরোনাম দিলেনঃ "Huq hopes to End Artificial Barrier", আনন্দ বাজার পত্রিকা শিরোনামায় দিলেন, "উভয় বঙ্গের মধ্যে মিথ্যার প্রাচীর ভেঙে ফেলার সংকল্প, সম্বর্ধনা সভায় জনাব হকের ভাষণ।"

যুগান্তর পত্রিকা 'হক যোগ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব ফজলুল হকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে লিখেছেন,

"রাজনৈতিক জীবনের বহু বিচিত্র, বহু বাধা বিপত্তি অতিবাহিত করে অবিভক্ত বঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রি মৌলবী ফজলুল হক সাহেব আবার দীর্ঘকাল পরে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিরূপে কলকাতা আগমন করেছেন। উভয় বঙ্গে হক সাহেবের অনুরাগী ও অনুগ্রাহীর অভাব নেই। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তার চরিত্রের স্বাভাবিক আকর্ষনই জনসাধারণকে চিরকাল তার প্রতি আকৃষ্ট করে আসছে। এখনও সে অবস্থার বিন্দুমাত্র অন্যথা হয়নি, পশ্চিম বঙ্গ আগমন উপলক্ষে তার বিরাট সম্বর্ধনাই তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। এ উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিকে আমরাও আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। ভারত বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, পূর্ববঙ্গের শাসন ভার তার ওপর অর্পিত তৎসম্পর্কে সকলের মনেই নতুন আশা জেগেছে।

হক সাহেব উভয় বঙ্গের জনসাধারনের আশা আকাঙ্খা সার্থক করে তুলুন, দুই বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে যে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিভূত হয়ে আছে তার অবসান করুন আমাদের শুধু এ টুকুই প্রার্থনা।"

৩রা মে, এলগিন রোডে নেতাজী ভবনের সভায় যোগ দিতে এসে হক সাহেবের মনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসুর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের স্মৃতি এবং অতীতের নানা ঘটনার কথা জেগে উঠল। তিনি স্মৃতিচারন করে বললেন যে, এ ভবনে অতীতে তিনি কত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাথে কত বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছে মাতৃভূমির সেবায় নিঃস্বার্থ কর্মের প্রেরণা লাভ করেছেন। সাম্প্রদায়িক দানবের উর্ধে উঠবার মত শক্তি তিনি তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অর্জন করেছেন। তিনি সুভাষ বসু ও শরৎ বাবু এ মহান ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে সত্যই শিক্ষা করেছিলেন যে, জাতি হিসাবে বাঙালী দল এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার উর্ধে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে হক সাহেব বলতে থাকেন,

"একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করিনা। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান' এ দুটি বিভেদার্থক শব্দের সাথে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ভারত বলতে আমি এখনও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমাদের এ সোনার দেশকে দু'ভাগ করেছে তারা

বাঙলার ও বাঙালীর দুশমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বুঝায়না। এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃচনা ও স্বার্থ সিদ্ধির একটা পন্থা মাত্র।"

হক সাহেব আরও বললেন যে,

"এ উপমহাদেশের মুসলমানদের চিন্তা করতে বাধ্য করানো হয়েছে যে, তারা যেন আসমান থেকে কিছু পেয়ে গেছে এবং প্রতিবেশীদের কিছুই করার নেই।"

হক সাহেব বলে চললেন,

"আমি এ দর্শনে বিশ্বাস করিনা। আমি আপনাদের এ আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি এ সঙ্কীর্ণ ভাবধারার উর্ধে উঠবার চেষ্টা করবো। আমি আশা করি যে, জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বছরে আমি দেখতে পারবো যে, আন্তরিকতার সাথে দেশের সেবায় ব্রতী হলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধে ওঠা সম্ভব। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ আমাকে ভারতের ইতিহাস গঠন করতে হচ্ছে। আশা করি ভারতের দ্বারা পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয় অংশকেই বুঝিয়েছি। অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগের প্রায় এগার বছর পর আমি আপনাদের আশীর্বাদে আবার শাসন ক্ষমতা লাভ করেছি। এ সময়ের মধ্যে পাক-ভারত রাজনীতির ঘটনা স্রোতে অথবা ভারতের প্রতি পাকিস্তানের নীতি পরিবর্তনের ক্ষমতা আমার ছিলনা। আবার আমি কাজ আরম্ভ করেছি। ভারত পাকিস্তান যুক্ত ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে আমার কর্তব্য বিষয়ে আমি সর্বদা সচেতন থাকবো। সারা পৃথিবী জুড়ে যে নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে ভারতকে যদি তাতে যোগ্য অংশগ্রহণ করতে হয়, তবে আল্লাহ, যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, আমি ভারতের এ অংশের নেতাদের সাথে একত্রে দাঁড়িয়ে ভারতকে অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এ মিলিত ভূ-খণ্ডকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবো।"

হক সাহেব পরিশেষে বলেন যে,

"পূর্ব বাঙলার মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নয়। তাদের অধিকাংশ দরিদ্র ও অজ্ঞ। কিন্তু তাদের জান ও দিল খোলা, তারা পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী ভাইদের সাথে সুখে শান্তিতে মৈত্রীতে বাস করতে চান। মুখ্যমন্ত্রি হিসাবে তার প্রধান কর্তব্য হবে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাম্প্রদায়িকতার নির্বাসন এবং দুই বাঙলার মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন।"

হক সাহেব আরও বলেন যে,

"বাঙালী অখন্ড জাতি, তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং তাদের আদর্শ এক, জীবনের উদ্দেশ্য এক এবং জীবন ধারনের পদ্ধতিও এক। দেশ বিভাগ সত্বেও দুই বাঙলা মিলিতভাবে অনেক বিষয়ে সারা দেশকে পথ দেখাতে পারে।"

হক সাহেব আরও বলেন যে,

"তার রক্তে সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নেই এবং তিনি সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসও করেন না। উভয় বঙ্গের হিন্দু মুসলমানের সেবক বলেই তিনি নিজেকে মনে করেন।"

পাক ভারত মৈত্রী সংসদের পক্ষ থেকে শ্রী ধীরেন ভৌমিক হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি মানপত্র অর্পণ করেন। এ মানপত্রে হক সাহেবকে 'ইতিহাস স্রষ্টা পুরুষ এবং গরীবের রাজা' বলে উল্লেখ করা হয়। কথা সাহিত্যিক শ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, 'মৌলবী ফজলুল হক বাঙলার কৃষকের বন্ধু।'

ঐদিনই অর্থাৎ ৩রা মে অপরাহ্নে হক সাহেব সস্ত্রীক চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ঘুটিয়ারী শরীফের দরগায় তাদের পারিবারিক মানত পালনের জন্য যান।

৪ঠা মে মঙ্গলবার, আনন্দবাজার পত্রিকা 'মিথ্যার প্রাচীর' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হক সাহেবকে অভিনন্দিত করেন। ৪ঠা মে, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় 'ফজলুল হক সম্বর্ধনা সমিতি'র উদ্যোগে গ্রাণ্ড হোটেলের প্রিন্সেস হলে হক সাহেবের সম্মানে একটি প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু শিল্পী, সাহিত্যিক প্রতিনিধিরা ও বহু বিশিষ্ট নাগরিক যোগদান করেন। শ্রীপঙ্কোজ কুমার মল্লিক 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' এ রবীন্দ্র সংগীতটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। সমিতির পক্ষ থেকে হক সাহেবকে মাল্যভূষিত করা হয়। হক সাহেবের বয়স অনুসারে ঐ মালাটি বিরাশিটি চাঁপা ফুলে গাঁথা হয়। একটি রম্য আধারে একটি সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্র এবং কৃষক প্রজা পার্টির আদর্শের প্রতীক স্বরূপ রৌপ্য-নির্মিত একটি ক্ষুদ্র আকারের লাঙ্গল হক সাহেবকে উপহার দেয়া হয়। হক সাহেব অভিনন্দনবাণীর উত্তরে বলেন যে, "সমবেত সুধী বৃন্দের কেউ কেউ তাকে ইংরেজীতে, আবার কেউ কেউ বাঙলায় তার ভাষণ দেবার জন্য তাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তার প্রাণের ভাষা বাঙলাতেই বলবেন।"

গ্রাণ্ড হোটেলের এ সভায় হক সাহেব বললেন যে, "কলকাতায় আসবার আগে তিনি কেবল একথাই ভেবেছেন যে, যারা চিরকাল তাকে স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন, দুঃসময়ে সাহায্য করেছেন, নিরাশার উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের মধ্যেই তিনি যাচ্ছেন এবং তাদের প্রীতি তিনি নিশ্চয়ই লাভ করবেন, তিনি যে এরূপ বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তার অতিপ্রিয় কলকাতা শহরে যেখানে কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন, সেখানে তিনি যে সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছেন, তাতে তিনি অবিভূত।" পরিশেষে সমবেত জনমণ্ডলীর অন্তর স্পর্শ করে হক সাহেব বললেন, "কলকাতা শহরের প্রতি, আপনাদের প্রতি আমার যে ঋণ তা আমি কোন দিন পরিশোধ করতে পারবোনা। আপনাদের সেবা, আপনাদের খেদমতই আমার লক্ষ্য। বাঙলার মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙালী জাতির উন্নতিই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, একমাত্র আকাঙ্খা। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আমি যাতে চলতে পারি, আপনারা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের একজন হয়েই পূর্ববঙ্গে আছি।"

হক সাহেবের মর্মস্পর্শী ভাষণে অনেকেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং অবিরাম করতালির দ্বারা তাকে অভিনন্দন জানান হয়। সভাশেষে অনেকে তাকে আলিঙ্গন করেন।

শ্রী পঙ্কেজ কুমার মল্লিকের 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি' এ গানটি দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

সেদিনই 'বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরি কমিটি' আয়োজিত একটি সম্বর্ধনা সভায় হক সাহেব বলেন যে,

"পূর্ববঙ্গে বাঙলা ভাষার জন্য উৎসাহ এবং দরদ পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও বেশী। এমন কি পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শিশুও বাঙলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।" তিনি সমবেত সংবাদপত্র সেবীদের আবেদন জানিয়ে বললেন, "আসুন আমরা রাজনীতির কুটিলতা ভুলে আমাদের মহান সংহতি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যের কথা মনে করি।"

কমিটির পক্ষ থেকে একটি মানপত্রে বলা হল, "আপনি অতীতে যে সব জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন এবং বর্তমানে যে নীতি ঘোষণা করেছেন তাতে আমাদের উভয় বঙ্গের সম্পর্কের উন্নতির আশা জেগেছে।" মঙ্গলবার সকালে ক্লাইভ রোডে 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্স' হক সাহেবকে একটি প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। রাতে তিনি রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নৈশ ভোজ করেন।

৫ইমে, বুধবার সকালে হক সাহেব প্রজা সমাজতন্ত্রীদলের নেতা পশ্চিম বঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রি ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাত করে উভয় বঙ্গের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। বিকালে ৫২ নং বিডন স্ট্রীটে সাধনা ঔষধালয় কলকাতা শাখা এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জনাব ফজলুল হককে সম্বর্ধনা জানালেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে হক সাহেব বললেন, "দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি আজ আর কিছু বলবো না। সাধনার ঔষধগুলো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী হয়। বিরাশি বছরেও আমার মাথায় যে কালোচুল দেখছেন তা সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ মাখার ফলেই মনে করি।"

বুধবার, ৫ই মে থেকেই হক সাহেব দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন কথা প্রকাশ্যে বলেননি। কারণ ইতিমধ্যেই ঢাকা ও করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল মহল তার কলকাতার ভাষণগুলোর মর্মার্থ অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করছিলো। তাকে 'বিশ্বাসঘাতক', 'পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের শত্রু' ইত্যাদি অবমাননাকর আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছিল। কলকাতায় হক সাহেবের কানেও সে সংবাদ পৌঁছেছিল।

৬ই মে, বৃহস্পতিবার সকালে হক সাহেব রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুখ্যমন্ত্রি ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুনরায় দেখা করলেন। কলকাতায় আসবার পর ডঃ রায়ের সঙ্গে এটাই তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। প্রায় দেড়ঘন্টা তারা নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন এবং সহৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশে বিরাশি বছরের হক সাহেব তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সের বন্ধু বিধান বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যদিও তারা দুজনেই নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার তাদের দেখা হবে এ আশা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ইহজগতে তাদের মধ্যে আর কোনদিন সাক্ষাত ঘটেনি॥"[৬০]

নয়

"...নির্বাচন জয় করার পরই হক সাহেবকে দলের নেতা নির্বাচন করা হয়েছিল। যখন সরকার গঠনের ডাক পড়ল, তিনি তাঁর দলীয় তিনজন নিয়ে আওয়ামীলীগ বাদ দিয়ে খণ্ডমন্ত্রিত্ব গঠন করলেন। আওয়ামী লীগের দল থেকে তিনি ইচ্ছামত বাছাই করে নেবেন, এই ছিল তাঁর মত; আমরা রাজি হইনি–তিনিই নেননি। বিশেষ করে দু'-একজনকে তিনি নিতে চাননি।

তাঁর করাচী-যাত্রা ও আলাপ-আলোচনা শুনে সবাই ঘাবড়ে গেল। তিনি বললেন, দেশ ভোট দিয়েছে আমাকে, আমার নৌকায়। অন্য কাউকে ভোট দেয়নি। কাজেই আমার মতে আমি কাজ করব। তাঁর কথাবার্তায় ও কাজ-কর্মে মুসলিম লীগ বেঁচে উঠার সুযোগ খুঁজতে লাগল। একটা সন্ধি যদি হয়ে যায় যুক্তফ্রন্টের সাথে–তাহলেই কাজ ফতেহ। তলে তলে কিন্তু মারণাস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। যারা পূর্ব-বাংলার লুণ্ঠনকারী তারা এই মিলনের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল। পূর্ব-বাংলা যদি এক হয়ে যায় তাহলে আর রক্ষা নেই।

ওছিলা জুটে গেল।

ফজলুল হক গেলেন কলকাতা। তারা নাকি দাওয়াত করেছিল। বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁর সম্বর্ধনা করল। ফজলুল হকের প্রশস্তি গাইল কীর্তনের সুরে। ভাবে বিহবল হয়ে তিনি নাকি অনেক কথা বললেন যা বলা উচিত নয়। তাতে দেশদ্রোহিতার গন্ধ পাওয়া গেল। নানা রকমের গল্প তৈয়ার হয়ে গেল এরি মধ্যে।

কয়দিন পর এল এক মার্কিন সাংবাদিক–নাম ক্যালাহন। হক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করল। কি কি বললেন হক সাহেব তা কোন দিনই ঠিক জানা যায়নি। তবে অভিযোগ করা হল তিনি যা বলেছেন সব পাকিস্তান বিরোধী। তিনি ভারতের সাথে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার সাথে পূর্ব-বাংলাকে যুক্ত করে দেবার ফন্দি এঁটে ছিলেন। দিন তারিখও নাকি ঠিক হয়েছিল, কোন্ দিন এই অপকর্ম করা হবে। ওয়াকেফহাল মহল বললেন, তিনি নাকি মাত্র বলেছিলেনঃ

---

[৬০] এস. এম. আজিজুল হক শাজাহান / শতাব্দীর কণ্ঠস্বর আবুল কাশেম ফজলুল হক ॥ [প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো - অক্টোবর, ১৯৮০ । পৃ: ৫০৫-৫১৮]

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়
হে. কে বাঁচিতে চায়;
দাসত্ব-শৃংখল বল কে পরিবে পায়।"

অবশ্য তর্জমা করে মার্কিন সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন!

মার্কিন সাহেব এরই ভেতর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অঙ্কুর খুঁজে বের করে করাচীর দরবারে রিপোর্ট পেশ করলেন। আর যায় কোথা। করাচী যা চেয়েছিল তাই হাতে পেল। দূর্জনের ছলের অভাব হয় না। মহা সুযোগ জুটে গেল, ফজলুল হককে কাবু করার–বাংলাকে জব্দ করার। করাচীর কাগজের পাতায় খই ফুটল। দেখাদেখি ঢাকার এঁরাও যারা করাচীর দালালী করে, খুব করে কলম চালাতে শুরু করল। গোলমাল পেকে উঠল ভাল করে। হক সাহেব একটু বেকায়দায় পড়ে গেলেন। এই সময় আওয়ামী লীগকে গেঁথে নিতে হবে মন্ত্রিত্বের বড়শীতে। কয়েকজনকে মন্ত্রী করে নেবার নিমন্ত্রণ জানালেন। আমার নামও ছিল তার ভেতর।

যে দিন লাটভবনে হলফ নিচ্ছি মন্ত্রিত্বের, ঠিক সেই সময় খবর এল আদমজী পাটকলে আগুন জ্বলে উঠেছে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামায়। লাটভবন থেকেই পাটকলে গেলাম। বীভৎস কাণ্ড দেখলাম। কত মরেছে, কত ঘর পুড়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। শিশু সন্তানের মৃত দেহ পুকুরের উপর ভাসছে। নারকীয় কান্ড। অথচ সামান্য কারণেই নাকি এত বড় ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু কারণটা বড় নয়–উদ্দেশ্য হচ্ছে আসল। কিছুদিন আগে থেকেই একটা ষড়যন্ত্র চলছিল। এমন একটা কিছু করা যাতে যুক্তফ্রন্ট কুপোকাৎ হয়। পূর্ব-বাংলার জনশক্তির উপর সবার মনে একটা তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়–এ দেশের মানুষ মানুষ নয়, এরা বর্বর, নরহন্তা, ডাকাত, অবাঙ্গালিকে অকাতরে হত্যা করে ইত্যাদি।

হক সাহেবের তলব হল করাচীতে। গেলেন। আমিও গেলাম; কেন, তা জানি না–বোধ হয় স্রেফ তামাশা দেখতে। করাচী রেগে আগুন। কথা বলার যো নেই। যে দেখে সেই ছি-ছি করে। আধা-বাঙালি এক জাঁদরেল সম্পাদক নিজের নাকের উপর তর্জনী রেখে কাল মুখ আরো কাল করে বলল, এটাকে একদম কেটে ফেলেছেন। রাস্তায় একা বের হতে সাহস হয় না। অথচ বুক ফেটে যাচ্ছিল কথা বলার জন্য। কারা করেছে, কেন করেছে, আর কয় শ' নিরীহ মুসলমান কাদের স্বার্থে আত্মাহুতি দিয়েছে, এর একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। যারা দাবার বড়ে তাদের গালা-গাল দিয়ে লাভ কি! কিন্তু বলতে পারিনি–মানুষ পাইনি। আঁচ করলাম, আয়ু শেষ। মন্ত্রী-লীলা সংবরণ করতে হবে।

বড়লাটের সাথে দেখা করলাম। চতুর লোক। দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, একটা ফয়সালা করে ফিরে যাও। আয়েন্দা যেন এমন না হয়।

বোগরা বললেন, ফজলুল হককে বাদ দিয়ে আর কাউকে দিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন কর। কোন রকমে তোমাদের মন্ত্রিত্ব রক্ষা করে দেই। কাকে দেয়া যায়? সুতরাং ফিরে আসতে হল।

হক সাহেবকে নিয়ে রওনা হলাম ঢাকার পথে কলকাতা হয়ে। সারা পথ তিনি নিরস্ত থাকতে দিলেন না। শেরে বাংলার মনে ত্রাসের সঞ্চার। বসে থাকতে পারেন না। উঠ বস্ করলেন সারাক্ষণ।

–ও মিয়া, যদি তেজগাঁও নামার সাথে সাথেই গ্রেফতার করে?

বললাম, অসম্ভব নয়, করতে পারে।

বল কি? করতে পারে? সত্যিই করবে নাকি?

বললাম, কেমন করে বলি–আমরা উভয়েই বিমান-বিহারী-উর্ধ্বলোকে। মর্ত্যলোকে কি হচ্ছে বলা কঠিন।

দমদম। মেলা ভিড় জমে গেছে হক সাহেবকে দেখতে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার কাতারের আগে। হক সাহেবকে কানে কানে বলে দিলাম, আপনি কিছুই বলবেন না। তিনিও তাই করলেন। দোহা সাহেব পরামর্শ দিলেন, কলকাতা নেমে থাকতে। তারপর পূর্ব দিকের আকাশের অবস্থা দেখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে রওনা দিতে। বললাম, পাগল হয়েছেন? কপালে যাই থাকুক ঢাকা ফিরতেই হবে।

তেজগাঁ বিমান ঘাঁটিতে লোকে লোকারণ্য। ঘরের ছেলে ঘরে এলাম এই সাধনা সবার মনে। বিকেলে শুভ-সংবাদ ঘোষণা করা হল, রেডিওর মারফত। বিরানব্বই ক-ধারা অর্থাৎ সাড়ে বিরানব্বই ধারা জারি করা হয়েছে। সরকার বাতিল। ইস্কান্দার মির্যা আসছেন গভর্ণর হয়ে।

তারপর চলল ফজলুল হকের নিন্দাবাদ। অষ্টপ্রহর। রেডিও, খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন–সবের মারফত জানিয়ে দেয়া হল, ফজলুল হক তথা যুক্তফ্রন্টের বিদায়। কায়েদে আজম কখন কি কি বলেছেন ফজলুল হকের বিরুদ্ধে–দেশদ্রোহী, মুসলিম জাতির অভিশাপ তিনি,–ইস্তক কলকাতা ও ক্যালাহনের ঘটনাবলির বিশদ-বিবরণ দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছোট ছোট কেতাব বের হয়ে গেল এই সব কীর্তিকলাপের কাহিনী নিয়ে। ঘরে ঘরে বিলি করা হল। এরোপ্লেন দিয়ে নিক্ষেপ করা হল নানা জায়গায়। এক পাঠশালায় গিয়ে দেখি এক ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকের বস্তার ভেতর ছোট্ট কেতাব–যার ভেতর এইসব কাহিনী লেখা। মুসলিম লীগের মুখ ছুটলঃ ও বলিনি আগেই, এরা এই সব কাণ্ড করবে?

পূর্ব বাংলা নীরব নিস্তব্ধ গোরস্তান। ধর-পাকড় শুরু হল বেদম। হাজার হাজার কর্মী গ্রেফতার হল। সবাই প্রায় আওয়ামী লীগের। ইস্কান্দার মির্যা ডাণ্ডা হাতে ঘুরতে লাগলেন। দুরস্ত করবেন সবাইকে। বেটারা ভোট দিয়েছে। ভোট দিলেই দেশ উদ্ধার হয় না। এটা বুঝিয়ে দিতে হবে মূর্খের দলকে। দেশময় ত্রাসের রাজত্ব শুরু হল। কয়দিন পর খবরের কাগজে বিবৃতি দিলাম–পুলিশ জুলুমের কাহিনীর বিবরণ দিয়ে। অমনি সরকারি দফতর থেকে চিঠি এলঃ কি তথ্য আমার হাতে আছে যার উপর নির্ভর করে আমি ও সব লিখেছি। সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে হবে। জবাব দিলামঃ দৃষ্টান্ত, উদাহরণ–নানা জায়গা থেকে যে-সব লিখিত অভিযোগ পেয়েছিলাম তার নকল পাঠিয়ে দিলাম। ব্যস্–খামোশ। আর উচ্চবাচ্য করেনি।

... আমার সরকার গঠনের কিছুদিন পরই কৃষক শ্রমিক দলের কয়েকজন নেতা আমাদের সাথে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সংখ্যানুপাতে তাদের কয়েকজনকে মন্ত্রী করতে হবে। আমরা কয়জন–আবুল মনসুর, মানিক মিয়া ও আমি এ ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রকাশ করি। তবে আমরা বলি যে, এরা যদি সরাসরি আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় তাহলে আমাদের দল ছেড়ে দিয়ে যে ক্ষতি কয়েকজন করেছেন তা পূরণ হতে পারে। আলাপ-আলোচনা করে দেখা গেল, নীতি ও আদর্শের সংঘাত তাদের সাথে হবে না এটা বড় কথা। তবুও প্রস্তাব দিলাম, দল ছেড়ে আমাদের দলে ঢোক। তাঁরা বললেন, একদম শুরুতেই দলে ঢোকা সম্ভব হবে না। তাঁদের মূল্য কমে যাবে রাজনীতির বাজারে। কিছুদিন গেলেই তারা ঢুকে পড়তে পারবেন।

সেক্রেটারীকে (শেখ মুজিব) বললাম। প্রথম আমতা আমতা করে পরে বললেন, আচ্ছা যদি আপনারা ভাল মনে করেন, করুন। এ আলোচনা চলল। কিন্তু সেক্রেটারীর ঔদাসীন্য লক্ষ্য করলাম। একদিন বললাম, আপনি যদি অমত হন, তাহলে এখানেই ইতি হবে। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললেন, না, না, অমত হব কেন? তবে ওদের কি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে আমার কি আপত্তি। কষ্ট দিলে আপনাকেই দেবে।

নেতা সোহরাওয়ার্দীকে সব বুঝিয়ে বললাম। তিনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তবে বললেন, ওদের সোজাসুজি আওয়ামী লীগে আসতে বল। তাদের আপত্তির কথা বললাম। শুনে বললেন, আচ্ছা তোমরা যা ভাল বোঝ কর। সেক্রেটারী খুব মনঃক্ষুন্ন। মোহন মিয়া আমাদের দলে এসে আসর জমাবেন, এটা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না। অথচ আমাদের মনের অবস্থাও তিনি জানেন।

ব্যাপার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না বললে কেউ এর সঠিক তাৎপর্য ও মর্ম বুঝতে পারবে না। কথা হচ্ছে, কি আকারে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস প্রস্তাবের একটি দিকই হয়ত সবার কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এক তরফা এর অশুভ ও মন্দ দিকটাই প্রকাশ করা হয়েছে। আমি সাথে থাকলে হয়ত এর সত্যিকার রূপ সবাইকে দেখিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে পারতাম। আমার বিশ্বাস নির্ঘাৎ এর সমর্থন আদায় করে নিতে পারতাম। 'হা' চাইলে 'হা', 'না' চাইলে 'না' পাওয়া যায়, এত আপনি জানেন। নেতা এর পর আর ঘাঁটাঘাটি করেননি। হয়তবা আমার যুক্তির যথার্থতা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু রাজনৈতিক মহলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কৃষক শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ আক্ষেপ করে বললেন আমরা গিয়েছিলাম এক বিরাট নেতার কাছে আশ্রয় লাভের আশায়। ভেবেছিলাম তিনি হিমালয়ের মত অনড় অটল। কিন্তু দেখলাম, সামান্য হাওয়ার ঝাপটায় সে পাহাড় টলমল করে উঠল। আমরা নিরাশ হয়েছি, কিন্তু দুঃখ পেয়েছি অনেক বেশি নেতার দুর্গতি দেখে। তবুও তারা আশা ছাড়েনি। আমরা যারা উদ্যোক্তা তারাও একেবারে হাল ছেড়ে দেইনি। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, আর নয়। এতে অপমান ছাড়া লাভ নেই। সুতরাং ইতি।

কিন্তু পরিস্থিতি বিশেষ করে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আমরা চেষ্টা ছাড়তে পারিনি। কৃষক শ্রমিক দল এই আলোচনাকে উপলক্ষ্য করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে নান্না মিঞাকে দলীয় নেতা নির্বাচন করে পরিষদে তাঁকে বিরোধী দলের নেতা বলে ঘোষণা করল। কিন্তু এত সব করেও আমাদের মন পেল না। আমাদের দলেরও যারা গোড়ায় ওদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করেছিল, তারাও স্বীকার করল, হাঁ, এতটা যারা করতে পারে, তাদের সন্দেহ করা উচিত হয় নি। তারা এ-কথাও বলল, ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না। যেরূপ ভাঙন লেগেছে দলে, তাতে খুব বেশি দিন যৌথ ব্যবসা করা চলবে কিনা বলা যায় না। কাজেই নতুন দলের লোক এসে জমলে আসন্ন বিপদ ও ভয়টা কেটে যেতে পারত॥"[৬১]

দশ

"... নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পরে আমি ঢাকা আসলাম। আমাকে রেলস্টেশনে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। শোভাযাত্রা করে আমাকে আওয়ামী লীগ অফিসে নিয়ে আসা হল। শহীদ সাহেব আমার জন্য চিন্তায় ছিলেন। যদিও আমার গ্রামের বাড়িতে বসে আমাকে বলে এসেছিলেন, 'তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই, আমি যা দেখলাম তাতে তোমার জয় সুনিশ্চিত।'

তাড়াতাড়ি যুক্তফ্রন্টের এমএলএদের সভা ডাকা হল, ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে। আওয়ামী লীগ দলীয় এমএলএদের সভা ডাকা হল আওয়ামী লীগ অফিসে ঐ একই দিন সকালবেলা। নির্বাচনে জয় লাভ করার সাথে সাথে আমাদের কানে আসতে লাগল জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছেন, পুরানা মুসলিম লীগারদের মারফতে–যারা কিছুদিন পূর্বে হক সাহেবের দলে যোগদান করে এমএলএ হয়েছেন কৃষক শ্রমিক দলের নামে। আদতে তারা মনে প্রাণে মুসলিম লীগ। সকালবেলা আওয়ামী লীগ সদস্যদের সভা আর বিকালে বার লাইব্রেরি হলে সমস্ত দল মিলে যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা। আওয়ামী লীগের সভায় শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সভায় রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতা খয়রাত হোসেন সাহেব প্রস্তাবের মারফতে বললেন, 'জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে নেতা নির্বাচন করার পূর্বে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তার সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীদের লিস্ট ফয়সালা করা উচিত। এবার তাকে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি দলের নেতা করলে তার

[৬১] আতাউর রহমান খান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী)/ওজারতির দুই বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ২০০০। পৃ. ৫৮-৬১/১৫৭-১৬০]

দলবলের মধ্যে এমন সমস্ত পাকা খেলোয়াড় আছে, যারা চক্রান্তের খেলা শুরু করতে পারে। আর একজন ডেপুটি লিডার আমাদের দল থেকে করা উচিত, কারণ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে।' শহীদ সাহেব বললেন, 'তিনি নিশ্চয়ই আমাদের দুইজনের সাথে পরামর্শ করবেন, মন্ত্রীদের নাম ঠিক করার পূর্বে। বৃদ্ধ মানুষ এখন তাকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না।' ভাসানী সাহেবও শহীদ সাহেবকে সমর্থন করলেন। আমি জনাব খয়রাত হোসেনের সাথে একমত ছিলাম। কিন্তু এই নিয়ে আর জোর করলাম না। আমি যখন গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়া থেকে নির্বাচনের পরে ফিরে আসি, শহীদ সাহেব আমাকে একাকী ডেকে বললেন, 'তুমি মন্ত্রিত্ব নেবা কি না'? আমি বললাম, 'আমি মন্ত্রিত্ব চাই না। পার্টির অনেক কাজ আছে, বহু প্রার্থী আছে, দেখে শুনে তাদের করে দেন।' শহীদ সাহেব কিছুই আমাকে বলেন নাই।

ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা হল। শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাতে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় এ, কে, ফজলুল হক সাহেবকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতা করা হল। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবে মুসলিম লীগ দলীয় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য, যারা পুরানা প্রাদেশিক আইনসভার মারফতে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তাদের পদত্যাগ দাবি করা হল। হক সাহেব নেতা নির্বাচিত হওয়ার কিছু সময় পরেই পূর্ব বাংলার গভর্নর তাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করলেন। তিনি রাজি হয়ে এসে, শীঘ্রই মন্ত্রিসভার নাম পেশ করবেন বলে বাড়িতে ফিরে গেলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তার সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। আমিও সাথে ছিলাম। তিন নেতা আলোচনায় বসলেন, একটা আলাদা ঘরে। বাইরে থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতাদের হাবভাব দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে বলে মনে হল। কিছু সময় পরে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবে বের হয়ে আসলেন এবং সোজা ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে পৌঁছালেন। আতাউর রহমান সাহেবও উপস্থিত হলেন। তারা আমাদের জানালেন, হক সাহেব এখন মাত্র চার পাঁচজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন; কিছুদিন পরে আরও কিছু সংখ্যক মন্ত্রী নিবেন। এখন আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, আতাউর রহমান খান ও আবদুস সালাম খানকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান। আমাদের নেতারা তাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, পুরা টিম নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা হল, যুক্তফ্রন্ট তাড়াতাড়ি দেশের জন্য কাজ শুরু করবেন। তারা আরও আপত্তি করলেন, এখন নান্না মিয়াকে না নিয়ে পরে নিলেই ভাল হয়। আর যদি পুরা টিম নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন তবে তাকে এখনই নিতে আপত্তি নাই। তারা বিশেষ করে জোর দিলেন পুরা টিম নিতে। হক সাহেব রাজি না হওয়াতে তারা তাকে বলে এসেছেন, আওয়ামী লীগের কেউই এভাবে মন্ত্রিত্বে যেতে পারে না। আপনি আপনার দল নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন। আওয়ামী লীগ আপনার মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দিবে এবং যখন পুরা মন্ত্রিত্ব গঠন করবেন তখন আওয়ামী লীগ তাতে যোগদান করবে। আওয়ামী লীগের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির এক ষড়যন্ত্র হচ্ছে এটা বুঝতে আর নেতাদের বাকি রইল না।

হক সাহেব শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বলেছেন, 'আমি শেখ মুজিবকে আমার মন্ত্রিত্বে নিব না।' তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের কাকে নেওয়া হবে না হবে সেটা তো আমি ও ভাসানী সাহেব ঠিক করব; আপনি যখন বলছেন নান্না মিয়াকে ছাড়া আপনার চলে না, তখন আমরাও তো বলতে পারি শেখ মুজিবকে ছাড়া আমাদের চলে না। সে আমাদের দলের সেক্রেটারি। মুজিব তো মন্ত্রিত্বের প্রার্থী না। এ সকল কথা বললে পার্টি থেকে বলতে পারে।'

আমি শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বললাম, 'আমাকে নিয়ে গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। আমি মন্ত্রী হতে চাই না। আমাকে বাদ দিলে যদি পুরা মন্ত্রিত্ব গঠন করতে রাজি হয়, আপনারা তাই করেন।' আমরা বসে আলাপ করছি, প্রায় এক ঘন্টা পরে হক সাহেব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি ছয়জনকে নিয়ে

মন্ত্রিত্ব গঠন করতে চান এবং মুজিবকেও নিতে রাজি আছেন। ভাসানী সাহেব বলে দিলেন, 'আওয়ামী লীগ যখন যোগদান করবে, আওয়ামী লীগের সব কয়জনই একসাথে যোগদান করবেন। এভাবে ভাঙা ভাঙাভাবে যোগদান করবে না।'

পরদিন হক সাহেব শপথ গ্রহণ করলেন। আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া (কেএসপি) এবং আশরাফউদ্দিন চৌধুরী (নেজামে ইসলামী) শপথ গ্রহণ করলেন। লাট ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল হল, 'স্বজনপ্রীতি চলবে না', 'কোটারি চলবে না', এমনি নানা রকমের স্লোগান। যদি একসাথে পুরা মিন্ত্রসভা শপথ গ্রহণ করত তা হলে লক্ষ লক্ষ লোক অভিনন্দন জানাত। মনে হল, একদিনের মধ্যে গণজাগরণ নষ্ট হয়ে গেছে। জনসাধারণ ঝিমিয়ে পড়েছে। হক সাহেবের দলবল বলতে শুরু করল, 'এ সমস্ত শেখ মুজিবের কাজ।' সত্য কথা বলতে কি, আমি কিছুই জানতাম না। সব খবরের কাগজ পড়ে দেখেছি। জনগণ ক্ষেপে যাচ্ছিল এবং যারা সংবর্ধনা দিতে গিয়েছিল তারাই উল্টা স্লোগান দিয়েছিল নান্না মিয়াকে মন্ত্রী করার জন্য। কারণ, তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন না। তার একমাত্র পরিচয় লোকে জানত, 'হক সাহেবের ভাগিনেয়'। লোক হিসাবে সৈয়দ আজিজুল হক অমায়িক ও ভদ্র। আমার সাথে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ খুবই মধুর ছিল। কলকাতা থেকে তাকে আমি জানতাম। কোনোদিন তাকে আমি রাগ হতে দেখি নাই। যাহোক, হক সাহেব এই সমস্ত কাজ নিজে কিছুই করেন নাই। বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যের কথা শুনতেন, বিশেষ করে লীগ থেকে বিতাড়িত দলের, যার নেতৃত্ব করতেন ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) সাহেব। তিনি নিজে মন্ত্রী হতে চান। তিনি জীবনভর মন্ত্রিত্ব ভাঙছেন আর গড়েছেন। তার একটা বিশেষ অসুবিধা হল তিনি লেখাপাড়া ভাল জানতেন না, তাই কেউই তার নাম বলেন না। কর্মী হিসাবে তার মত কর্মী এ দেশে খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। রাতদিন সমানভাবে পরিশ্রম করতে পারতেন। তাঁকে অনেকে Evil Genius বলে থাকেন। যদি ভাল কাজে তার বুদ্ধি ও কর্মশক্তি ব্যবহার করতেন তাহলে সত্যিকারের দেশের কাজ করতে পারতেন।

আমরা মন্ত্রিসভায় যোগদান না করে পার্টি গঠনের কাজে মন দিলাম। শহীদ সাহেব করাচিতে ফিরে গেলেন। তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছে অত্যধিক পরিশ্রমে। হক সাহেব করাচিতে বেড়াতে গেলে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তারা পদত্যাগ করবেন কি না', তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন নাই, আর তাদের করতে হবে কেন?' যদিও যুক্ত পার্লামেন্টারি পার্টির প্রথম সভায় দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাদের পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। করাচিতে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতারা তার সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে জানিয়ে দিল, তাঁদের রাগ আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে; হক সাহেবকে তারা সমর্থন করবে এবং যাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন তার চেষ্টা করবেন। শুধু আওয়ামী লীগকে যেন দূরে সরিয়ে রাখেন। গোপনে গোপনে আওয়ামী লীগ থেকে সদস্য ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। কেউই দলত্যাগ করতে রাজি না। যাদের মনের মধ্যে মন্ত্রিত্বের খায়েশ ছিল তারাও জনমতের ভয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। হক সাহেবকে তার দলবল ধোঁকা দিয়েই চলেছে। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বলতা পেলেই যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না, কারণ তারা জানত আওয়ামী লীগের সমর্থন ছাড়া সরকার চলতে পারে না। সংসদ সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগুরু। সকল দল মিলেও আওয়ামী লীগের সমান হতে পারবে না।

করাচি হতে ফিরবার পথে হক সাহেব কলকাতায় দু'একদিনের জন্য ছিলেন। সেখানে তার বক্তৃতা বলে কথিত কয়েকটা সংবাদ সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপানো হয়েছিল। সুযোগ বুঝে মোহাম্মদ আলী বগুড়া ও তার দলবলেরা হক সাহেবের বিরুদ্ধে তাই নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। হক সাহেব মহাবিপদে পড়লেন। এই বিপদের মুহূর্তে আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মীরা হক সাহেব ও তার দলবলের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। তারা জানিয়ে দিলেন যে, তারা হক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন। হক সাহেব এই অবস্থায় আওয়ামী লীগারদের সাথে আলোচনা করে পুরা মন্ত্রিসভা গঠন করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

এই সময় হক সাহেবের আর এক ভাগিনেয় জনাব মাহবুব মোর্শেদ বার এট ল (পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন) হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়াকে অনুরোধ করলেন যাতে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। তাকে সাহায্য করছিলেন ঢাকার কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব ও মির্জা আবদুল কাদের সর্দার। শহীদ সাহেব তখন করাচিতে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর পক্ষে ঢাকায় আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমি ও মওলানা সাহেব জনসভা করতে মফস্বলে বের হয়ে গেছি। আমাদের প্রোগ্রাম জানা ছিল অফিসের। হক সাহেব আতাউর রহমান খান ও মানিক ভাইকে বলেছেন যে, আমাকে মন্ত্রী করতে চান। মওলানা সাহেব ও আমি টাঙ্গাইলে এক কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলাম। এই সময় টাঙ্গাইলের এসডিও একটা রেডিওগ্রাম নিয়ে সভায় হাজির হলেন। আমাকে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে ঢাকায় যেতে অনুরোধ করে রেডিওগ্রাম পাঠিয়েছেন। আমি মওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শ করলাম। মওলানা সাহেব বললেন, 'দরকার হলে তোমাকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে হবে। তবে শহীদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নিও–এ সময় এইভাবে মন্ত্রিত্বে যাওয়া উচিত হবে কি না? বোধহয় হক সাহেবের দল কোনো মুশকিলে পড়েছে, তাই ডাক পড়েছে।'

আমি হক সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, 'তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে 'না' বলিস না। তোরা সকলে বসে ঠিক কর, কাকে কাকে নেওয়া যেতে পারে।' আমি তাকে বললাম, 'আমাদের তো আপত্তি নাই। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তার অনুমতি দরকার। আর মাওলানা সাহেব উপস্থিত নাই, তার সাথেও আলোচনা করতে হবে।' আমি ইত্তেফাক অফিসে মানিক ভাই ও আতাউর রহমান খান সাহেবকে নিয়ে বসলাম। একটু পরে মোর্শেদ সাহেব, কাদের সর্দার সাহেব, কফিলউদ্দিন চৌধুরী সাহেব আসলেন। আলোচনা করে শহীদ সাহেবের সাথে ফোনে আলাপ করতে চেষ্টা করলাম, তিনি কথা বলতে পারলেন না। তার জামাতা আহমেদ সোলায়মান কথা বললেন, তার মারফতে তিনি জানিয়ে দিলেন তার কোনো আপত্তি নাই।

আমি আপত্তি করলাম, মাওলানা সাহেবের মতামত প্রয়োজন, কারণ অনেক পানি এর মধ্যে ঘোলা করা হয়েছে। শহীদ সাহেব, ভাসানী সাহেব যদিও কয়েকজনের নাম পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তবু আবারও আলোচনা করে মতামত নেওয়া উচিত। এদিকে কৃষক শ্রমিক দল কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেবকে তাদের পার্টি থেকে মন্ত্রিত্ব দিতে রাজি নন। আমরা জানিয়ে দিলাম, দরকার হয় তিনি আমাদের দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রী হবেন। সত্য কথা বলার জন্য তাকে আমরা শাস্তি পেতে দিতে রাজি নই। রাত এগারটায় হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে দুইখানা জিপ গাড়ি নিয়ে আতাউর রহমান সাহেব, মোর্শেদ সাহেব, কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব, আবদুল কাদের সর্দার ও আমি টাঙ্গাইলের পথে রওয়ানা করলাম। রাস্তা খুবই খারাপ, তখনকার দিনে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল পৌঁছাতে দু ঘন্টা সময় লাগত। চারটা খেয়া পার হতে হত। আমরা খুব ভোরে টাঙ্গাইল পৌঁছালাম। মওলানা সাহেব আওয়ামী লীগ অফিসের দোতলায় আছেন। আমরা তার সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। পরে মোর্শেদ সাহেবের ওকালতিতে তিনি রাজি হলেন। আতাউর রহমান সাহেব তাকে নামগুলি দেখালেন। আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন আহমদ ও আমি। কফিলুদ্দিন চৌধুরী সাহেব সম্বন্ধে তারা যখন আপত্তি করছে তখন তিনিও আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে মন্ত্রী হবেন। হক সাহেব ছাড়া মোটমাট বারজন মন্ত্রী হবেন। পরে দেখা গেল, আরও কয়েকজন বেড়ে গেল রাতারাতি।

১৯৫৪ সালের মে মাস। আমরা সকলে শপথ নিতে সকাল নয়টায় লাটভবানে উপস্থিত হলাম। আমাদের যখন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়া শেষ হল, ঠিক সেই সময় খবর এল আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ভোররাত থেকে সৈয়দ আজিজুল হক সেখানে উপস্থিত আছেন। রাতেই ইপিআর ফোর্স ও পুলিশ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে।

ঢাকার দু'একজন বড় সরকারি কর্মকর্তা ও পুলিশের কর্মচারীরা উপস্থিত আছেন। আমরা যখন শপথ নিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে দাঙ্গা শুরু হওয়ার কারণ কি? বুঝতে বাকি রইল না, এ এক অশুভ লক্ষণ। হক সাহেব আমাদের নিয়ে সোজা রওয়ানা করলেন আদমজী জুট মিলে। তখন নারায়ণগঞ্জ হয়ে লঞ্চে যেতে হত। সোজা রাস্তা হয়েছে, তবে গাড়ি তখনও ভালভাবে চলতে পারে না। ট্রাক ও জিপ কষ্ট করে যেতে পারে। সকলেই রওনা হয়ে গেছেন। আমাকে লাটভবনের সামনে জনতা ঘিরে ফেলল এবং আমাকে নিয়ে শোভাযাত্রা তারা করবে বলে ঠিক করেছে। তাদের বুঝিয়ে বিদায় নিতে আধ ঘন্টার মত দেরি হয়ে গেল।

নারায়ণগঞ্জ যেয়ে শুনলাম, হক সাহেব আমার জন্য অপেক্ষা করে ঢাকা রওয়ানা হয়ে গেছেন। একটা লঞ্চ রেখে গেছেন। আমি পৌঁছালাম এবং সাথে সাথে যেখানে দাঙ্গা তখনও চলছিল সেখানে উপস্থিত হলাম। আমাকে একটা পুলিশের জিপে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দাঙ্গা তখন অল্প অল্প চলছিল। যেদিকে যাই দেখি রাস্তায় রাস্তায় বস্তিতে বস্তিতে মরা মানুষের লাশ পড়ে আছে। অনেকগুলি আহত লোক চিৎকার করছে, সাহায্য করার কেউই নাই। ইপিআর পাহারা দিতেছে, বাঙালি ও অবাঙালিদের আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। গ্রাম থেকে খবর পেয়ে হাজার হাজার বাঙালি এগিয়ে আসছে। অবাঙালিদের ট্রাকে করে মিলের বাইরে থেকে মিলের ভিতরে নিতেছে। আমার বড় অসহায় মনে হল। আমার সাথে মাত্র দুইজন আর্মড পুলিশ। এই সময় আরও কয়েকজন পুলিশের সাথে আমার দেখা হল। তাদের কাছে আসতে হুকুম দিলাম। এক গাছতলায় আমি আস্তানা পাতলাম। মিলের চারটা ট্রাক আছে, একটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু সংখ্যক লোক পাওয়া গেল, তাদের সাহায্যে যারা মরে গেছে তাদের রেখে আহত লোকগুলিকে এক জায়গায় করে পানি দিতে শুরু করলাম। আমার দেখাদেখি কয়েকজন কর্মচারীও কাজে হাত দিল। এই সময় মোহন মিয়া সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। আমার মনে বল এল। তিনটা ট্রাক হাজির করা হল। ড্রাইভাররা ভাগতে চেষ্টা করছিল। আমি হুকুম দিলাম, ভাগতে চেষ্টা করলেই গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দিব। আমার মেজাজ দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। ঢাকায় টেলিফোন করা হয়েছে, এ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য। মোহন মিয়া ও আমি সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিনশতের মত আহত লোককে হাসপাতালে পাঠাতে পেরেছিলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত বাঙালি জনসাধারণ জমা হচ্ছিল মিল আক্রমণ করার জন্য তাদের কাছে গিয়ে আমি বক্তৃতা করে তাদের শান্ত করলাম। তারা আমার কথা শুনল। যদি তারা সঠিক খবর পেত তাহা হলে আমার কথা শুনত কি না সন্দেহ ছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্বে আমি সমস্ত এলাকা ঘুরে মৃত লাশের হিসাব করলাম একটা একটা করে গণনা করে, তাতে পাঁচশতের উপর লাশ আমি স্বচক্ষে দেখলাম। আরও শখানেক পুকুরের মধ্যে আছে, তাতে সন্দেহ নাই।

সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে এই দাঙ্গা শুরু হয়। তিন দিন পূর্বে এক অবাঙালি দারোয়ানের সাথে এক বাঙালি শ্রমিকের কথা কাটাকাটি ও মারামারি হয়। তাতে বাঙালি শ্রমিকের এক আঘাতে হঠাৎ দারোয়ানটা মারা যায়। এই নিয়ে উত্তেজনা এবং ষড়যন্ত্র শুরু হয়। দারোয়ানরা সবাই অবাঙালি। আর কিছু সংখ্যক শ্রমিকও আছে অবাঙালি। এই ঘটনা নিয়ে বেশ মনকষাকষি শুরু হয়। মিল কর্তৃপক্ষ অবাঙালিদের উসকানি দিতে থাকে। মিল অফিসে কালো পতাকা ওড়াতে অনুমতি দেয়। মিলে কাজ বন্ধ করে দিয়ে বাঙালিদের বেতন নেবার দিন ঘোষণা করে বলা হয়, বেতন নিতে মিলের ভেতরে আসতে। যখন তারা বেতন নিতে ভিতরে আসে তখন চারদিক থেকে বন্দুকধারী দারোয়ান ও অবাঙালিরা তাদের আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যায়। পরে আবার বাঙালিরা যারা বাইরে ছিল, তারা অবাঙালিদের আক্রমণ করে এবং বহু লোককে হত্যা করে। নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা যে সময় শপথ নিচ্ছে সেই সময় বেতন দেবার সময় ঘোষণা করার অর্থ কি? ইপিআর উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একটা গুলিও করা হয় নাই। ফলে দাঙ্গা করে পাঁচশত লোকের উপরে মারা যায়। পুলিশ কর্মচারীরা পূর্বেই খবর পেয়েছিল, তবু কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই? মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক সাহেবকে মিষ্টি কথা বলে মিল অফিসে বসিয়ে রেখেছে। দাঙ্গা যে মিলের অন্যদিকে শুরু হয়েছে,

সে খবর তাকে দেওয়া হয় নাই। হক সাহেব ও অন্যান্য মন্ত্রীরা ঢাকায় চলে এসেছেন, আমি ও মোহন মিয়া উপস্থিত আছি রাত নয়টা পর্যন্ত। জনাব মাদানী তখন ঢাকার কমিশনার এবং হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক সিএসপি তখন চিফ সেক্রেটারি।

আমি যখন মাদানী সাহেবকে বললাম, পাঁচশত লোক মারা গেছে, তারা বিশ্বাস করতে চান নাই। মাদানী সাহেব বলেন, পঞ্চাশ জন হতে পারে। আমি তাকে বললাম, একটা একটা করে গণনা করেছি, নিজে গিয়ে দেখে আসুন। পরে মাদানী সাহেব স্বীকার করেছিলেন। রাত নয়টায় আমাকে ও মোহন মিয়াকে জানান হল, মিল এরিয়া মিলিটারিদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জনাব শামসুদ্দোহা তখন পুলিশের আইজি। আমাকে এসে বললেন, 'স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে, মিলিটারিরা সকলে বাঙালি।' আমি হেসে দিয়ে বললাম, 'সর্বনাশের কি আর কিছু বাকি আছে। আপনি যখন পুলিশ ও ইপিআর নিয়ে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারলেন না, তখন আর মিলিটারির হাতে না দিয়ে উপায় কি?' তখন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের অধীনে ছিল। ঢাকায় যেয়ে দেখি কি হয়েছে। চিফ মিনিস্টার নিশ্চয়ই মত দিয়েছেন।

... এই দাঙ্গা যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং দুনিয়াকে নতুন সরকারের অক্ষমতা দেখাবার জন্য বিরাট এক ষড়যন্ত্রের অংশ সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কয়েকদিন পূর্বে এই ষড়যন্ত্র করাচি থেকে করা হয়েছিল এবং এর সাথে একজন সরকারি কর্মচারী এবং মিলের কোন কোন কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। যুগ যুগ ধরে পুঁজিপতিরা তাদের শ্রেণী স্বার্থে এবং রাজনৈতিক কারণে গরিব শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি সৃষ্টি করে চলেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আদমজী মিলের মালিক গুল মোহাম্মদ আদমজী এসব জানতেন কি না সন্দেহ।

কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে যে সুযোগ খুঁজতে ছিল এই দাঙ্গায় তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ ও পশ্চিমা শিল্পপতিদের যোগসাজশে যে যুক্তফ্রন্টকে ভাঙতে চেষ্টা করছিল আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় তা সফল হল না। তাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের দালালদের সাহায্যে চেষ্টা করে হতাশ হয়ে পরে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে লাগল। এ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারত না, যদি প্রথম দিনই যুক্তফ্রন্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করে শাসনব্যবস্থাকে কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করত।

যুক্তফ্রন্ট ইলেকশনে জয়লাভ করার পরে বড় বড় সরকারি আমলাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। অনেকে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার করেছিল। আওয়ামী লীগ প্রথমে মন্ত্রিসভায় যোগদান না করায় তাদের প্রাণে পানি এসেছিল। যোগদান করার পারে তারা হতাশ হয়ে পড়ল এবং ষড়যন্ত্রে যোগদান করল। তবে হাফিজ মোহাম্মদ ইসহাক, চিফ সেক্রেটারি এই পরিবর্তনকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।

... দু'একদিন পরই হক সাহেব আমাকে বললেন, 'করাচি থেকে খবর এসেছে, আমাকে যেতে হবে। তুই ও আতাউর রহমান আমার সাথে চল। নান্না, মোহন মিয়া ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরীও যাবে, বেটাদের হাবভাব ভাল না।' আমি প্রস্তুত ছিলাম, কারণ আমাকে যেতেই হত। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে আছেন, তাকে দেখতে।

আমরা করাচি পৌঁছালাম। প্রথমেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাথে আমাদের পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের কি কি সাহায্যের প্রয়োজন তাও জানান হল। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারই নাকি এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে। একথা কেউ কোনোদিন শুনেছে কি না আমার জানা নাই যে, সরকার নিজেই দাঙ্গা করে নিজেকে হেয় করার জন্য। আইনশৃংখলা রক্ষার মালিক সরকার, সে কেন দাঙ্গা করে বদনাম নিবে?

দাঙ্গা বাঁধিয়েছে যারা পরাজিত হয়েছে তারা। করাচি থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দুনিয়ার কাছে হেয় করতে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করা হয়। তারা সুযোগ খুঁজছে কোনো রকমে প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করা যায় কি না

... আমরা পরের দিনই খবর পেলাম পূর্ব বাংলায় গভর্নর শাসন দিবে, মন্ত্রিসভা ভেঙে দিবে, এই নিয়ে আলোচনা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি জনাব ইসহাক সাহেবকে আদেশ দিয়েছে, যাতে আমরা পূর্ব বাংলায় আসতে না পারি, যাতে আমাদের প্লেনের টিকিট করতে না দেওয়া হয়। তিনি স্বীকার করলেন এই কথা বলে যে, এখনও তারা মন্ত্রী। আইনত তিনি আমাদের আদেশ মানতে বাধ্য। তাকে আরও বলা হয়েছিল, তার রিপোর্ট পরিবর্তন করতে। তিনি তাও করতে আপিত্ত করলেন। এটা করার ফল হিসাবে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক দিন পর্যন্ত ছুটি ভোগ করতে বাধ্য করেছিল। আমি ও আতাউর রহমান সাহেব এ খবর পেয়েছিলাম। তাই হক সাহেবকে যেয়ে বললাম, 'আমরা আজই ঢাকা রওয়ানা করব। কারণ, আজ না যেতে পারলে আরও কয়েকদিন থাকতে হবে। প্লেনের টিকিট পাওয়া যাবে না।' হক সাহেবকে অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনিও নান্না মিয়াকে ডেকে বললেন, তিনিও যাবেন। নান্না মিয়াও রাজি হলেন। মোহন মিয়া ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরী সাহেব করাচি থেকে তদ্বির করবেন, কোনো কিছু করা খায় কি না।

... বোধহয় ২৯শে মে হবে, আমরা রাতের প্লেনে রওয়ানা করলাম। দিল্লি কলকাতা হয়ে ঢাকা পৌঁছাবে বিওএসি প্লেন। আমাদের সাথে চিফ সেক্রেটারি হাফিজ ইসহাক ও আইজিপি শামসুদ্দোহা সাহেব ঢাকা রওয়ানা করলেন। দোহা সাহেব কেন এবং কার হুকুমে করাচি গিয়েছিলেন আমার জানা ছিল না। হক সাহেব পরে আমাকে বলেছেন, তিনিই হুকুম দিয়েছেন। কলকাতা পৌঁছাবার কিছু সময় পূর্বে জনাব দোহা হক সাহেবকে যেয়ে বললেন, 'স্যার আমার মনে হয় আপনার আজ কলকাতা থাকা উচিত। কি হয় বলা যায় না, এদের ভাব ভাল দেখলাম না। রাতেই ইস্কান্দার মির্জা এবং এন. এম. খান ঢাকায় মিলিটারি প্লেনে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ঢাকা এয়ারপোর্টে কোনো ঘটনা হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো কিছু না হয়, তবে আগামীকাল প্লেন পাঠিয়ে আপনাদের নেওয়ার বন্দোবস্ত করব।' হক সাহেব সবই বুঝতেন, তিনি নান্না মিয়া ও আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওদের সাথে আলাপ করুন।' আমার কাছে দোহা সাহেব এসে ঐ একই কথা বললেন। আমি তাকে পরিষ্কার বলে দিলাম, 'কেন কলকাতায় নামব? কলকাতা আজ আলাদা দেশ। যা হয় ঢাকায়ই হবে।' নান্না মিয়াও একই জবাব দিলেন। আমার বুঝতে বাকি থাকল না, কেন তিনি গায়ে পড়ে এই পরামর্শ দিতে এসেছেন। তিনি যে এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন তা করাচি থেকেই ঠিক করেই এসেছেন। পাকিস্তানী শাসকচক্র দুনিয়াকে দেখাতে চায়, হক সাহেব দুই বাংলাকে এক করতে চান, তিনি পাকিস্তানের দুশমন, তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী। আর আমরা তার এই রাষ্ট্রদ্রোহী কাজের সাথী।

ঢাকায় এসে দেখলাম, বিরাট জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা সকলের সাথে দেখা করে যার যার বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। আমরা হক সাহেবের পিএ সাজেদ আলীকে করাচি রেখে এসেছিলাম। যদি কোনো খবর থাকে তাহলে টেলিফোন করে যেন জানিয়ে দেয়।

... বেলা তিনটায় টেলিফোন এল, কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করেছে। মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা হয়েছে। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর, আর এন, এম, খানকে চিফ সেক্রেটারি করা হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আতাউর রহমানের বাড়িতে এসে তাকে নিয়ে হক সাহেবের বাড়িতে গেলাম এবং তাকে অনুরোধ করলাম ক্যাবিনেট মিটিং ডাকতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অন্যায় আদেশ আমাদের মানা উচিত হবে না এবং এটাকে অগ্রাহ্য করা উচিত। তিনি বললেন, কি হবে বুঝতে পারছি না, অন্যদের সাথে পরামর্শ কর। নান্না মিয়াকে বললাম, তিনি কিছুই বলতে পারছেন না, মনে হল সকলে ভয় পেয়ে গেছেন। আতাউর রহমান সাহেব রাজি ছিলেন, যদি সকলে একমত হতে পারতাম। মন্ত্রীদের পাওয়া গেল না, হক সাহেব দোতলায় বসে রইলেন। আতাউর রহমান সাহেবকে বললাম,

'আপনি দেখেন, সকলকে ডেকে আনতে পারেন কি না। আমি আওয়ামী লীগ অফিস থেকে কাগজপত্রগুলি সরিয়ে দিয়ে আসি। অফিস তালা বন্ধ করে দিতে পারে।'

আমি আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে দরকারি কাগজপত্র সরিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে অন্য পথ দিয়ে পুলিশ অফিসে এসে পাহারা দিতে আরম্ভ করল। আমি আবার নান্না মিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমাকে জানাল, বড় বড় পুলিশ কর্মচারীরা আমাকে খুঁজতে এসেছিল। বাড়িতে ফোন করে জানলাম সেখানেও গিয়েছিল। আমি রেণুকে বললাম, 'আবার আসলে বলে দিও শীঘ্র আমি বাড়িতে পৌছাব।' বিদায় নেওয়ার সময় অনেককে বললাম, 'আমি তো জেলে চললাম, তবে একটা কথা বলে যাই, আপনারা এই অন্যায় আদেশ নীরবে মাথা পেতে মেনে নেবেন না। প্রকাশ্যে এর বাধা দেওয়া উচিত। দেশবাসী প্রস্তুত আছে, শুধু নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের। জেলে অনেকের যেতে হবে, তবে প্রতিবাদ করে জেল খাটাই উচিত।' সেখান থেকে এসে পথে কয়েকজন কর্মীর সাথে দেখা করতে চেষ্টা করলাম, কাউকেও পাওয়া গেল না।

আমি সরকারি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা ভাড়া করে বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। দেখলাম, কিছু কিছু পুলিশ কর্মচারী আমার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। আমি রিকশায় পৌছালাম, তারা বুঝতে পারে নাই। রেণু আমাকে খেতে বলল, খাবার খেয়ে কাপড় বিছানা প্রস্তুত করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এহিয়া খান চৌধুরীকে ফোন করে বললাম, 'আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, বোধহয় আমাকে গ্রেফতার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি গাড়ি পাঠিয়ে দেন।' তিনি বললেন, 'আমরা তো হুকুমের চাকর। গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকুন। আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য বার বার টেলিফোন আসছে।' ... আধা ঘণ্টা পরে গাড়ি এসে হাজির।

... কি মামলায় আসামি করেছে আমার তা মনে নাই। আমি নাকি কাউকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছি বা লুটপাট করতে উসকানি দিয়েছি। খবর নিয়ে জানলাম, জেলগেটে একটা গোলমাল হয়েছিল, আমি মন্ত্রী হওয়ার সামান্য কিছুদিন পূর্বে, সেই ঘটনার সাথে আমাকে জড়িয়ে এই মামলা দিয়েছে।

একদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার করছিলাম। ঢাকায় রোজার সময় জেলের বাইরে থাকলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করে থাকতাম। হঠাৎ টেলিফোন পেলাম, চকবাজারে জেল সিপাহিদের সাথে জনসাধারণের সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় জেল সিপাহিরা গুলি করেছে। এজন লোক মারা গিয়েছে এবং অনেকে জখম হয়েছে। ঢাকা কারাগার চকবাজারের পাশেই। হক সাহে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন, আমি তখনও মন্ত্রী হই নাই। আমি আতাউর রহমান সাহেবকে টেলিফোন করলাম। তাঁর বাসা চকবাজারের কাছে। তিনিও খবর পেয়েছেন, আমাকে তার বাসায় যেতে বললেন। দরকার হলে একসাথে চকবাজার ও জেলখানায় যাওয়া যাবে।

আমি পৌছার সাথে সাথে দু'জনে দ্রুত চকবাজারে পৌছালাম। অনেক লোক জমা হয়ে আছে এবং তারা খুবই উত্তেজিত। আমরা উপস্থিত হলে তারা আমাদের ঘিরে ফেলল এবং সকলে একসাথে চিৎকার করতে শুরু করল। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চায়, কি ঘটনা ঘটেছে জানাতে। আমরা যখন তাদের অনুরোধ করলাম, এক একজন করে বলতে, তখন তারা একটু শান্ত হল এবং ঘটনাটা বলল। একজন ওয়ার্ডারের সাথে এক পানের দোকানদারের কথা কাটাকাটি এবং পরে মারামারি হয়। এই অবস্থায় দুচারজন ওয়ার্ডারও হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডারের পক্ষ নেয়, আর জনসাধারণ দোকানদারের পক্ষ নেয়। সিপাহিরা একটু বেশি মার খায়। তারা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে রাইফেল এনে গুলি করতে শুরু করে। এতে অনেক লোক জখম হয় এবং তিনজন আহত লোককে ধরে জেল এরিয়ার ভিতরে নিয়ে যায়। অনেক লোক তখন জমা হয়েছে। আমরা দুইজনই তাদের শান্ত হতে বলে, জেলগেটের দিকে রওয়ানা করেই দেখতে পেলাম, সৈয়দ আজিজুল হক ওরফে নান্না মিয়া (তখন মন্ত্রী) খবর পেয়ে এসেছেন।

তার সাথে একজন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আছেন। আমরা একসাথে জেলগেটের ভিতরে পৌছালাম। সেখানে জেল সুপারিনটেনডেন্ট ও জেলারের সাথে আলাপ হল। এ সময় আরও দু'একজন মন্ত্রী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশনাল কমিশনার এসে হাজির হয়েছেন। জনসাধারণ মন্ত্রীদের ও আমাদের দেখে একদম জেলগেটের সামনে এসে জড়ো হয়েছে। হাজার হাজার লোক চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে।

ঢাকা জেলে তখন একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট ছিল, তার নাম মিস্টার গজ। সত্যি কি না বলতে পারি না, তবে জনতা 'গজের বিচার চাই, গজ নিজে গুলি করেছে' ইত্যাদি বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে। গজের বাসা জেলগেটের সামনেই। কে যেন বলে দিয়েছে, এটা গজের বাড়ি। জনতা গজের বাড়ি আক্রমণ করে ফেলেছে। যারা উপস্থিত ছিলেন - মন্ত্রী, নেতা এবং সরকারি কর্মচারী তারা আমাকে অনুরোধ করল বাইরে যেতে। এত বড় ঘটনা ঘটে গেছে, একজন আর্মড পুলিশ এক ঘন্টা হয়ে গেছে, এসে পৌছায় নাই। আমি বাইরে যেয়ে জনতার মোকাবেলা করলাম। নিজের হাতে অনেককে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে নিবৃত্ত করলাম। কর্মীদের নিয়ে মি. গজের বাড়ির বারান্দা থেকে উন্মত্ত জনতাকে ফেরত আনলাম। একটা গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলাম গোলমাল না করতে, শান্তি বজায় রাখতে। বললাম, সরকার বিচার করবে অন্যায়কারীর। মাইক্রোফোন নাই। গলায় কুলায় নাই। আবার গজের বাড়ির দিকে জনতা ছুটেছে। আবার আমি কর্মীদের নিয়ে জনতা সামনে দাঁড়িয়ে তার বাড়ি রক্ষা করলাম। আওয়ামী লীগের অনেক কর্মীও তখন পৌছে গেছে। আমি যখন লোকদের শান্ত করে জেলগেটের দিকে ফেরাই, ঠিক সেই সময় আইজিপি দোহা সাহেব কয়েকজন পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন। তিনি আমার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'আপনি গ্রেফতার।' আমি বললাম, 'খুব ভাল।' জনতা চিৎকার করে উঠে এবং আমাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তাদের বোঝাতে লাগলাম। আবার দুই-তিন মিনিট পরে দোহা সাহেব ফিরে এসে বললেন, 'আপনাকে অন্ধকারে চিনতে পারি নাই। ভুল হয়ে গেছে। চলুন জেলগেটে যাই।' আমি তার সাথে জেলগেটের ভিতরে পৌছালাম এবং বললাম, 'প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে গোলমাল শুরু হয়েছে, আপনি এখন পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি রক্ষা আমাদেরই করতে হয়েছে। যা ভাল বোঝেন করেন। আমার কি প্রয়োজন। লালবাগ পুলিশ লাইন থেকে জেলগেট এক মাইলও হবে না, আর আপনার পুলিশ ফোর্স পৌছাতে এত সময় লাগল।' আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জনতা এক্কেবারে জেলগেটের সামনে এসে পড়েছে। আমরা দেখলাম, এখন পুলিশ লাঠিচার্জ বা গুলি করতে আরম্ভ করবে। কেউই জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে না। সরকারি পাবলিসিটি ভ্যানও আসতে বলা হয় নাই যে মাইক্রোফোন দিয়ে বক্তৃতা করে লোকদের বোঝানো যায়। খালি গলায় চিৎকার করে কাউকেও শোনানো যাবে না। যারা সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের রুমে বসেছিলেন তাদের বলে জনতাকে নিয়ে এ মিছিল করে রওয়ানা করলাম। আমাদের অনেক কর্মীও বাইরে ছিল। আমি বাইরে এসে জনতাকে বললাম, 'চলুন এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য মিছিল করা যাক।' আমি হাঁটা দিলাম। প্রায় শতকরা সত্তরজন লোক আমার সাথে রওয়ানা করল। আমি সদরঘাট পর্যন্ত দেড় মাইল পথ এদের নিয়ে এলাম।

আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে পরের দিন পল্টন ময়দানে এক সভা করব ঘোষণা করলাম। এটা খুবই অন্যায়, জেল ওয়ার্ডার কেন জেল এরিয়ার বাইরে যেয়ে গুলি করবে? আর কার অনুমতি নিয়েছে? কে ম্যাগজিন খুলে দিয়েছে? ওয়ার্ডারদের কাছে তো রাইফেল সব সময় থাকে না। আমি যখন আওয়ামী লীগ অফিসে বসে আলাপ করছিলাম তখন রাত প্রায় দশটা। আবার খবর এল, জেলগেটে গুলি হয়েছে। একজন লোক মারা গেছে। আমি আর জেলগেটে যাওয়া দরকার মনে করলাম না। আতাউর রহমান সাহেবকে টেলিফোনে বললাম, সভা ডেকে দিয়েছি, তিনি সম্মতি দিলেন।

পরের দিন পল্টন ময়দানে বিরাট সভা হল। আমি বক্তৃতা করলাম, যে দোষী তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, আর যারা গুলিতে মারা গিয়াছে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পুলিশ কেন সময় মত উপস্থিত হয় নাই,

তারও একটা তদন্ত হওয়া উচিত। এর কয়েকদিন পারে যখন মন্ত্রী হলাম এবং এ ঘটনা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, না হয়ে থাকলে কি করা উচিত এ বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছিলাম। মন্ত্রিসভা বরখাস্ত ও গভর্নর শাসন কায়েম হওয়ার পরে আমাকে ঐ জেলগেট দাঙ্গার কেসে আসামি করা হল এবং মামলা দায়ের করা হল। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই মামলা চলে। জনাব ফজলে রাব্বী, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচার হয়। অনেক মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করেছিল। এমন কি মিস্টার গজের মেয়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। পাবলিক সাক্ষী জোগাড় করতে পারে নাই। জেল ওয়ার্ডের মধ্যে থেকেও কয়েকজন সাক্ষী এনেছিল। তার মধ্যে দুইজন ওয়ার্ডার সত্য কথা বলে ফেলল যে, তারা আমাকে দেখেছে গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে এবং লোককে চলে যেতেও আমি বলেছিলাম, তা বলল। জেল সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার নাজিরউদ্দিন সরকার কিন্তু সত্য কথা বললেন না, পুলিশ যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই বললেন। এক একজন সাক্ষী এক এক কথা বলল এং কিছু কিছু সরকারি সাক্ষী একথা স্বীকার করল যে, আমি জনতাকে শান্তি রক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলাম। তাতে ম্যাজিস্ট্রেট আমার বিরুদ্ধে কোনো কিছু না থাকায় আমাকে বেকসুর খালাস দিলেন এবং রায়ে বলেছিলেন যে আমাকে শান্তিভঙ্গকারী না বলে শান্তিরক্ষকই বলা যেতে পারে। তবে এইবারে বোধহয় আমাকে দশ মাস জেলে থাকতে হল নিরাপত্তা আইনে।"[৬২]

এগারো

"... আতাউর রহমান সাহেবের সঙ্গে গভর্নর এ কে ফজলুল হক সাহেবের সম্পর্ক ভালোই হবে বলে আমার ধারণা ছিল। যদিও আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনো দিনই ভালো ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সেই ১৯৩৭ সনে কলকাতার এক আসন থেকে নাজিমউদ্দিনের নির্বাচিত হবার পর থেকেই দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। সেটা আরও তিক্ত রূপ নিয়েছিল ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে জিন্নাহর ঝগড়া হবার পরে। যখন ফজলুল হক সাহেবকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং ফজলুল হক হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। তারপর দুজনের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হয়েছিল বহুদিন ধরে। যুক্তফ্রন্টের সভায় যদিও তারা একই প্ল্যাটফর্ম থেকে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছিলেন, তবু কেউ কাউকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি।

শহীদ সাহেবের ধারণা ছিল যে তিনি যেহেতু প্রাদেশিক রাজনীতি করতে চান না এবং হক সাহেব যেহেতু কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে যেতে চান না, সুতরাং তাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হতে পারে। তিনি ফজলুল হক সাহেবকে সমর্থন করবেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য আর তার বদলে তিনি আশা করবেন হক সাহেবের পূর্ণ সমর্থন। হক সাহেব সে ব্যবস্থা মানতে রাজি ছিলেন না কোনো দিন, কারণ শহীদ সাহেবে প্রধানমন্ত্রী হলে হক সাহেব স্বাভাবিকভাবেই তার অধীন হয়ে যান। ওই কারণেই যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ধরে, ওই কারণেই শহীদ সাহেবের স্থলে পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় ১৯৫৬ সনে হক সাহেব হলেন গভর্নর আর শহীদ সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা। মাঝখানে 'স্যান্ডউইচড' ফজলুল হক স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি অনুভব করছিলেন।

আতাউর রহমান সাহেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্তি নিয়ে। ফজলুল হক সাহেব ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে জুবেরী সাহেবকে নিযুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে আমাদের সবার শিক্ষক জাস্টিস মোহাম্মদ ইবরাহিম সাহেবকে নিযুক্তিপত্র দেবার জন্য আতাউর রহমান সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গভর্নরকে লিখিতভাবে পরামর্শ পাঠালেন। হক সাহেবের দাবি যে গভর্নর ও আচার্য হিসেবে তাঁর মনোনয়ন মুখ্যমন্ত্রীর গ্রহণ করা উচিত। আর মুখ্যমন্ত্রীর পরিষ্কার কথা যে যেহেতু তিনি মুখ্যমন্ত্রী, তাই তারই পরামর্শ গ্রহণ করা শাসনতান্ত্রিক অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[৬২] শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী ॥ [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ২৫৯-২৭৭]

পাকিস্তান হবার প্রাক্কালে জুবেরী সাহেব আবুল হাশিম সাহেবের বিরুদ্ধে হক সাহেবের পেছনে কলকাতার ছাত্রদের সমর্থন জোগাড় করেছিলেন। তাই হক সাহেব তাঁর সে ঋণ শোধ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জাস্টিস মোহাম্মদ ইবরাহিম সাহেব উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। ইবরাহিম সাহেব ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। শহীদ সাহেবকে তিনি কোনো দিন বাঙালি বলে গ্রহণ করতে পারেননি। আমার ধারণা, জুবেরী সাহেব উপাচার্য হলে শহীদ সাহেব বেশি খুশি হতেন।

ঠিক ওই সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব এলেন ঢাকায়। ফজলুল হক হল ইউনিয়নের সহসভাপতি আবদুল মতিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন হলের ছাত্রদের সভায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির ওপর বক্তৃতা করার জন্য। ডক্টর মোজাহারুল হক তখন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট। সে কারণে সরকারি অনেক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুসলিম লীগ সরকারের আমলে। ডক্টর মোজাহারুল হক চিরদিনই আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে আসছিলেন। শহীদ সাহেব এসব না জেনে ছাত্রদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সভায় ছাত্রসম্প্রদায় ছাড়াও যথেষ্ট লোকসমাগম হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনার জন্য।

ইবরাহিম সাহেব ও মোজাহারুল হক সাহেব তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। মঞ্চে সিঁড়ির নিচে মোজাহারুল হক সাহেব প্রথমে বক্তৃতা করতে উঠলেন। তিনি বললেন যে পররাষ্ট্রনীতির ওপর আমরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা অনেক পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আজ তাঁর কাছ থেকে শুনতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তার মতামত; বিশেষ করে স্বাধীন দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কমিউনিস্ট দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথায় মিল এবং কোথায় পার্থক্য।

শহীদ সাহেব অপ্রস্তুত ও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লেন। হঠাৎ এমন একটা বিষয়ের ওপর কথা বলার জন্য তার মন প্রস্তুত ছিল না। তিনি বক্তৃতার প্রারম্ভেই বললেন যে তিনি ওই বিষয়ের ওপর বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তা ছাড়া তিনি কোনো সাম্যবাদী দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেখার বা সে সম্বন্ধে কিছু জানার সুযোগ পাননি। তবু তার যতটুকু জানা আছে বা খবরের কাগজে পড়েছেন, ততটুকুই তিনি বলতে পারেন। বক্তৃতা স্বাভাবিকভাবেই ভালো হলো না। ছাত্ররা তার ইংরেজি বলার ভঙ্গি অক্সফোর্ড উচ্চারণেই শুনল। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ল না। শহীদ সাহেবও বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে এসে গাড়িতে উঠে গভর্নমেন্ট হাউসে চলে গেলেন।

এর কিছুদিন পরেই নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো গভর্নর হক সাহেব ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান সাহেবের মধ্যে। ঢাকা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেলের নিযুক্তি নিয়ে। হক সাহেব আবদুল্লাহ সাহেবকে (পরে জাস্টিস) নিযুক্ত করার পক্ষপাতী আর মুখ্যমন্ত্রী বদরুদ্দীন সিদ্দিকীকে (পরে চিফ জাস্টিস) অ্যাডভোকেট জেনারেল করার পক্ষপাতী। হক সাহেব যেহেতু দীর্ঘকাল হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে তিনিই জানেন কে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু আতাউর রহমান সাহেবের দলের লোকের ধারণা হলো যে যেহেতু শ্যামা-হক মন্ত্রিত্ব গঠনের পর বদরুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব হক সাহেবের বিরোধিতা করেছিলেন, তাই তিনি তাঁকে নিযুক্ত করতে চান না। একই কারণে এবং যুক্তিতে আতাউর রহমান সাহেবের শাসনতান্ত্রিক পরামর্শ অনুসারে অনেক মনোমালিন্যের মধ্য দিয়ে বদরুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন।

... কৃষক প্রজা পার্টিতেও ভাঙন ধরেছে। জনাব আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্ব সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব গ্রহণ করতে পারছিলেন না। আতাউর রহমান সাহেবের দল ও সৈয়দ আজিজুল হকের (নান্না মিঞা) দলের মধ্যে একটা সমঝোতায় পৌঁছার জন্য জমিরউদ্দীন সাহেবের বাসায় একটা বৈঠক হয়। শহীদ সাহেব ও মানিক মিয়া সাহেব দুজনই ওই সমঝোতার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের ধারণা হলো, তাকে কোণঠাসা করার জন্যই ওই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সুতরাং তিনি সে সমঝোতার তীব্র বিরোধিতা করতে লাগলেন। আতাউর রহমান সাহেব, মানিক মিয়া ও জমিরউদ্দীন সাহেবের নিকট

থেকে অনেক কাহিনী শুনে মনে হচ্ছিল দলীয় রাজনীতি না হলে গণতন্ত্র চলে না। আবার দলীয় রাজনীতির মধ্যে অনবরত কোন্দল চলে, কাদাছোড়াছুড়ি আর একে অন্যকে নানা সত্য-মিথ্যা, নানা দোষে অভিযুক্ত করে লোকচোখে হেয় করার প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। এ জন্যই বোধ হয় সংসদীয় রাজনীতি আমাকে কোনো দিন আকৃষ্ট করেনি।"[৬৩]

বারো

ফজলুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমান

ক.

"... Sheikh Mujibur Rahman asked A. K. Fazlul Huq about violating the rules of United Front.

Huq An Impediment In Way of 'Restoration'.

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Provincial Muslim League. in a statement issued in Dacca yesterday (Monday) said after his discussions in Karachi he was confident that the question of restoration of parliamentary government could not be taken up as long as Mr. A.K. Fazlul Huq remained the leader of the Party. 'If there was any impediment in the way of the restoration of Parliamentary Government, it is Mr. Huq's insistence on being the leader', he said.

Mr. Rahman in his statement charged Mr. Fazlul Huq for violating the rules of the United Front Party and making utterances 'without consulting the Party or the Cabinet' when he was the Chief Minister of East Pakistan.

Mr. Rahman said that the no-confidence motion to be moved in the next United Front Parliamentary Party meeting would not be on behalf of any affiliated party 'but in accordance with the wishes of the majority of the Party.' 'This will be amply proved if one looks to the names of the signatories where in the members of all the four affiliated parties have put their signatures', Mr. Rahman added."

(*Morning News* / Dacca, 1 January 1955)

খ.

"... Abdul Latif Biswas, General Secretary, Pakistan Krishak Sramik Party (PKSP) protested statement of Sheikh Mujibur Rahman.

জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতি জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাসের প্রতিবাদ

পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দান করিয়াছেনঃ

জনাব আবু হোসেন সরকারের করাচীতে প্রদত্ত বিবৃতির নিন্দা করিয়া এবং যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টির জন্য কতিপয় রাজনীতিবিদ মোছলেম লীগের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে এছলাম পার্টির নিন্দা করিয়া তিনি করাচীতে এক বিবৃতি দিয়াছেন। জনাব মুজিবর রহমানের বিবৃতির পাল্টা বিবৃতি দেওয়ার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না; কিন্তু পার্টির প্রতি কর্তব্যবোধে আমি তাহার বিভ্রান্তিকর বিবৃতি সম্পর্কে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

[৬৩] কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী ॥ [প্রথমা প্রকাশন - অক্টোবর, ২০১৮। পৃ. ১১৭-১১৯/১৯০]

জনাব আবু হোসেন সরকারের বিবৃতি দৃষ্টে বুঝা যায় যে, তিনি কেবল নিজের মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি (সরকার) বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তফ্রন্ট পার্টি হয়ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে অল্পদিনের জন্য এবং পূর্ববঙ্গে পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা হিসাবেই গভর্ণরের উপদেষ্টা নিয়োগের প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে। যুক্তফ্রন্ট পার্টি কি সিদ্ধান্ত করিবে তাহা তিনি কিছুই বলেন নাই।

জনাব আতাউর রহমান ও জনাব মুজিবর রহমান অভিযোগ করিয়াছেন যে, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ঐ নেজামে এছলাম মোছলেম লীগের সহিত দহরম-মহরম করিতেছে এবং জনাব ফজলুল হক লীগে যোগদানের পথ পরিষ্কার করিতেছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষমুলক। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাহাদেরই প্রধান কর্ত্তা জনাব সোহরাওয়ার্দী মোছলেম লীগের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন অনিয়মতান্ত্রিকভাবে।

তাহারা আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, নেজামে এছলাম ও কৃষক শ্রমিক পার্টি যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে। জনাব সোহরাওয়ার্দীই যুক্তফ্রন্টকে পার্টি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মোছলেম লীগের ন্যায় তিনিও বলিয়াছেন যে, যুক্তফ্রন্ট কোন পার্টি নয় ইহা কতিপয় গ্রুপের সংমিশ্রন মাত্র। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ...(missing from the original document due to page damage) এবছর প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন না। যুক্তফ্রন্টের তিন নেতার একজন হইয়াও তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং করাচীতে তখন জনাব ফজলুল হক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাহার সহিত পরামর্শ করেন নাই। জনাব সোহরাওয়ার্দী একথা একবারও ভাবেন নাই যে, পূর্ববঙ্গের লোকেরা পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃ প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। বরঞ্চ পূর্ববঙ্গে পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃ প্রবর্তনের জন্য ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে প্রদেশবাসীর আশা ভরসা নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যুক্তফ্রন্ট পার্টীতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা কে করিতেছেন।

জানা গিয়াছে যে, কৃষক-শ্রমিক পার্টির জনাব আবু হোসেন সরকারের পরিবর্তে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমানকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঢুকাইবার জন্য আলোচনাও বিস্তর হইয়া গিয়াছে।

সেটা যখন ব্যর্থ হইল তখন দাবি করা হইল যে, পূর্ববঙ্গে গবর্ণরের কতিপয় উপদেষ্টা নিয়োগ করিয়া জনাব আতাউর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা করিতে হইবে। এসব কথা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও উহার প্রতিবাদ করা হয় নাই। বুঝা যায় যে, এই সব আলোচনার জন্যই করাচীতে জনাব আতাউর রহমানের এত দীর্ঘকাল উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হইয়াছিল। স্বার্থী মহলকে নিরাশ করিয়া দিয়া জনাব আবু হোসেন সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিলেন। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া জনাব আতাউর রহমান জনাব মুজিবর রহমানকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা ফিরিয়া সত্যঘটনা গোপন করার জন্য বিবৃতি দেওয়া শুরু করিলেন। সুতরাং যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার জন্য কৃষক-শ্রমিক বা নেজামে এছলাম পার্টির বিরুদ্ধে আদৌ অভিযোগ করা যায় না। অন্ততঃ আওয়ামী লীগের মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী লোকই যুক্তফ্রন্ট ও দেশবাসীর স্বার্থের ক্ষতি করিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়াস পাইতেছে। এই জন্যই এই সব লোক জনাব হকের বিরুদ্ধে গুজব করিতে দ্বিধা করে নাই।

মোছলেম লীগের সহিত জনাব ফজলুল হক বা কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোনও সম্পর্ক নাই॥"

(*Azad* / Dacca, 8 January 1955)

গ.

"... K. Bahauddin, Dilkusha Garden, Ramna, Dacca wrote a letter to former minister Sheikh Mujibur Rahman wherein he focused on political polarization among ML, AML as well as in the central and provincial government. He wrote sarcastically that he did not think Mawlana Bhasani would be able to visit East Pakistan soon, till Major General Iskandar Mirza, the interior Minister was fully satisfied about his good intention for East Pakistan as well as Sheikh Mujibur Rahman.

Dear Mr. Mujibur Rahman,

I have read your statement on Mr. Fazlul Haq in to-day's Observer dt. 1.2.55.

Let me tell you in plain words that the defect of the Qaid-e-Azam's formidable organisation in East Pakistan, in last general election was mere a coincidence and sheer bad luck for the organisation, it is a temporary setback in East Pakistan and not a permanent one.

You must also bear in mind that Mr. Muhammad Ali the Prime Minister of Pakistan is still the President of All Pakistan Muslim League, besides this Muslim League is still a very powerful organisation in West Pakistan.

You are only a lad of 30 years age and a Secy, of a much smaller organisation than the Formidable Muslim League. You forced your entry as a Minister in the depressed Fazlul Haq Cabinet through the backing of Mr. H. S. Shurawardy only, as he is very fond of you.

When you became a minister, I dropped a post card to you saying you looked more like a village babu than 'Arabian Shaikh'.

It seems as if 42 million people of East Pakistan irrespective of caste and creed are solely at your command, and you can form a parliamentary form of Govt. in East Bengal all by yourself as its Chief Minister, Ousting 80 years old, old layman Mr. A. K. Fazlul Haq, who would be more on the terms of Mr. Md. Ali, the Prime Minister of Pakistan and President of all Pakistan Muslim League, than yourself and Mr. Ataur Rahman Khan etc. etc.

As you know Mr. Syed Azizul Haq and I have worked together for three years from 1939-1942 and I have great regards for my friends Syed Azizul Haq and Mr. S.M. Murshid's old uncle, Mr. A. K. Fazlul Haq and he being a leader of K.S.P.

You and Ataur Rahman Khan cannot also form a Minister in East Bengal without Mr. A. K Fazlul Haq and K.S.P and Mr. Md. Ali is quite alive to these facts, besides Mr. A. K. Fazlul Haq has still a very high regard for the formidable Muslim League organisation in East Pakistan than yourself and Mr. Ataur Rahman Khan etc. etc.

Even your President Moulana Bhasani admitted that when Mr. Suhrawardy could be a Minister in the Centre, why not Mr. A. K. Fazlul Haq should again be a Chief Minister in East Pakistan.

I don't think Moulana Sahib would be able to visit East Pakistan soon, till Major General Iskandar Mirza Sahib the Interior Minister is fully satisfied about his good intention in East Pakistan, as well as yours.

You are welcome to face me for discussion whenever occasion suits you.

I don't think Mr. Gulam Muhammad the Governor General of Pakistan ever paid any attention or lend his ear to your talks or discussion in Karachi, A 'lad of 30' and 'Jail Bird'. It was Mr. Suhrawardy that you talked and it was he, who talked on your behalf to G.G., P.M. and the Interior Minister.

You are only hoping to become a minister through the patronage of Mr. Suhrawardy only. Mr. Fazlul Huq refused to take you in his cabinet as Mr. Ataur Rahman Khan Sahib was quite good enough to work with him, A man of 57."

Yours sincerely,

K. Bahauddin

ঘ.

"... Sheikh Mujibur Rahman in a statement severely criticized the government of Abu Hossain Sarker.

শেখ মুজিবর রহমান / বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারি নীতির তীব্র সমালোচনা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান এম.পি. গতকল্য (মঙ্গলবার) সংবাদপত্রে নিম্নরুপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের বাসভবনের সম্মুখে যে লজ্জাকর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে জনাব সরকার সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশের জনগণ জনাব সরকার কর্তৃক দিনের পর দিন প্রদত্ত বহু মিথ্যা বিবৃতির সহিত ইতি পূর্বেই পরিচিত লাভ করিয়াছেন।

ক্ষীয়মান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও চল্লিশজন সঙ্গী লইয়া জনাব সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আজও আহ্বান করেন নাই, শাসনতন্ত্রের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া সার্টিফিকেট দ্বারা অতিরিক্ত বাজেট পাশ করাইয়াছেন। সর্বোপরি বাৎসরিক বাজেট পাশ করাইবার জন্য মাত্র এক সপ্তাহ ধার্য্য করা হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তিন শতাধিক পরিষদ সদস্যের দ্বারা সরকারি বার্ষিক আয় ব্যয়ের খতিয়ান আলোচনা কল্পনাতীত এবং এভাবে সদস্যদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি শুধু দ্রুত অবনতির দিকেই যাইতেছে না, ইহা বর্তমানে এক সাংঘাতিক পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে, অথচ সরকারি দল এখনও আত্মসন্তুষ্টির মধ্যেই আছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য ঘাটতি নাই বলিয়া যে হাস্যাস্পদ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে এই আত্মসন্তুষ্টির প্রমাণ নতুন ভাবে পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ খাদ্য সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারের সহিত সহযোগিতার জন্য প্রথম হইতেই প্রসারণ করিয়াছিল। কিন্তু জনাব সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

আমাদের প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানী সরকারকে সরকার সৃষ্ট ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদলের মনে রেখাপাত করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি (জনাব মওলানা ভাসানী) সরকারের মোহ নিদ্রা ভঙ্গের জন্য শেষ চেষ্টা স্বরুপ অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। মওলানা ভাসানীর অবস্থা উদ্বেগজনক হওয়া সত্ত্বেও জনাব সরকার এবং তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা ইহাকে একটা খেলার জিনিস মনে করিতেছে। মওলানা সাহেব বর্তমানে মুমূর্ষ অবস্থায় আছেন। তাহার ওজন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। তিনি যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে পারেন। আর তখন মওলানা সাহেবের সহিত সরকার মন্ত্রিসভার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

গত রবিবার জনাব সরকারের বাস ভবনের সম্মুখে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা তাহার অবিমৃষ্যকারিতারই পরিচয়। আমরা জানি ঐ দিন পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে কতিপয় পরিষদ সদস্যসহ আমাদের বহু কর্মী আহত হইয়াছে।

জনাব সরকার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই যে, কিভাবে তাহার বাসভবনে তখন অধিক সংখ্যক পুলিশ আসিয়াছিল এবং কে পুলিশ সুপারকে ফোন করিয়া ঘটনাস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি কি জনাব সরকারকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তিনি নিজে কেন বাহিরে আসিয়া শোভাযাত্রাকারীদের সহিত সাক্ষাৎ দান করেন নাই? তিনি কেন পুলিশ সুপারকে আদেশ দিয়াছিলেন শোভাযাত্রীদের জোরপূর্বক বিদায় করিয়া দেওয়ার জন্য? জনাব সরকার যেন দেওয়ালের লিখন পড়িতে ভুলিয়া না যান।

আমরা যে কোন মূল্যে দেশের এই ভয়াবহ খাদ্য সংকটের মোকাবেলা হইতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিব। ৫০ এর মম্বন্তরের পুনরাবৃত্তি হইতে দিবনা। রোম যখন পুড়িয়া যায় নিরু তখন বাঁশি বাজাইতেছিল কিন্তু আমরা তাহাকে বাঁশি বাজাইতে অনুমতি দিতে পারি না। জাতির জন্য, দেশের জন্য, আমরা আমরণ সংগ্রাম চালাইয়া যাইব। কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নিকট নতি স্বীকার করিবনা।"[৬৪]

(*Ittehad* / Dacca, 9 May 1956)

তেরো

"... ১৯৫৪ সনে শেরে বাংলার মহাবিজয় বিশ্বের বিস্ময়; কিন্তু লীগের পক্ষে তা অসহ্য পরাজয়-গ্লানি। মুসলিম লীগ শেরে বাংলাকে রাজনৈতিক নির্বাসন দিয়েছে ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল। এলবা থেকে মহাবীর নেপোলিয়নের পলায়ন এবং ফ্রান্সে আবির্ভাব ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু সেন্ট হেলেনা থেকে নেপোলিয়ন পালিয়ে এলে তা হত ততোধিক বিস্ময়কর ঘটনা। মুসলিম লীগ ভেবেছিল শেরে বাংলার রাজনৈতিক সমাধি হয়ে গেছে এবং কেয়ামতের পূর্বে তাঁর আর পুনরুত্থান সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনৈতিক গগনে ১৯৫৩ সনে শেরে বাংলার ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব যেন নেপোলিয়নের সেন্ট হেলেনা থেকে আবার ফ্রান্সে আবির্ভাব।

ফ্রান্সের পতন এবং ডানকার্ক থেকে পলায়নের পরে মহাবীর হিটলারের প্রতি ব্রিটিশ জাতির শত্রুতা যেমন হিটলারের বিরুদ্ধে ঘনীভূত হতে লাগল–'রয়াল ওকের' ধ্বংসে যেমন ব্রিটিশ জাতি শঙ্কিত হল–পূর্ব পাকিস্তানে শেরে বাংলার হাতে মুসলিম লীগের পূর্ণ পরাজয়ে করাচি কেন্দ্রে গদিনশিন লীগপ্রধানেরা তেমনি সচকিত, স্তম্ভিত এবং শঙ্কিত হলেন। শেরে বাংলার হুংকারে করাচির দেবকুল প্রমাদ গুনে শত্রুবিনাশে ব্রহ্মাস্ত্রের খোঁজে বের হলেন।

করাচি কেন্দ্রে হল নবপর্যায়। শেরে বাংলা প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জনাব মোহাম্মদ আলী যেন হঠাৎ জাদুই চেরাগ হাতে উড়ন্ত গালিচায় চড়ে এসে স্যার নাজিমকে সরিয়ে দিয়ে পলকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে মসনদে বসে গেলেন। এ-ঘটনার মতো 'পলিটিক্যাল মিরাকল' পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায় না। ঐরাবত যদি রাজবাড়ির কাউকে শুণ্ডে তুলে সিংহাসনে বসায় তাতেও কিছুটা সময় লাগে, কিন্তু জনাব মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে আবির্ভূত হলেন একদম 'সুপারসনিক' অর্থাৎ বৈদ্যুতিক গতিতে। তখন মনে হল–সবই কপাল! মসনদে একবার বসতে পারলেই হল। কিন্তু আবার ভাবলাম, উল্কার উত্থান-পতন উভয়ই ত্বরিতগতি।

---

[৬৪] তথ্যসূত্র : Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman : 1948-1971 (Vol. 04)/Edt.: Sheikh Hasina (Prime Minister of Bangladesh) ।। [Hakkani Publishers - September, 2019| p. 207/208-210/223-226/414-415]

মাস্টারের চেয়ে ছাত্র বেশি বিদ্বান হলে, কিংবা বড়সাহেবের চাইতে ছোটসাহেব বেশি বিদ্বান-বুদ্ধিমান হলে যেমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়, ম্যাট্রিক পাশ দারোগার নিচে বিএ পাশ কনেস্টবল হলে যেমন অসামঞ্জস্য অবস্থা দেখা দেয়–১৯৫৪ সনে শেরে বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ আলীর অবস্থাও নিশ্চয়ই হয়েছিল তেমনি। তিনি পারেন তো তাঁর দাদা নবাব আলী চৌধুরীর সহকর্মী ফজলুল হককে জিজ্ঞেস করেন–'আই ডু নট নো' অর্থ কী?

আওয়ামী প্রধান জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীও বোধ হয় হকসাহেবের বিরাট জয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করে করাচি আনগোনা করছিলেন, সুযোগ এসে গেল। কলকাতায় শেরে বাংলার বক্তৃতা নিয়ে শুরু হল তোলপাড়, তরজমা এবং তফসির। কিন্তু মতলবি যত মন ভুলে গেল যে, কথিত বক্তৃতায় যে-কোনো মানুষেরই ভুল হতে পারে। বিলেতের ঝানু প্রধানমন্ত্রী মি. চার্চিল নিজের কেন্দ্রে কথিত বক্তৃতা দিতে গিয়ে এমনই বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন যাতে দুনিয়াময় তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। শেরে বাংলার তরজমা তফসিরে স্বার্থশিকারিদের এনে দিল সুবর্ণ সুযোগ। লীগ এবং লীগ-উদ্ভূত আওয়ামী লীগের ভেতরে যতদূর সম্ভব সমঝোতা হয়ে গেল।

১৯৫৪ সনের ৩১ মে হঠাৎ করাচির কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা প্রয়োগ করে শেরে বাংলাকে করল স্বগৃহে অন্তরিন। শত শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে জেল-হাজতে রাখা হল। যেন কর্তৃপক্ষ দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে যুক্তফ্রন্ট দলের পক্ষ থেকে শেরে বাংলা কলকাতার বাজারে বিক্রি করবার জন্য দর যাচাই করতে গিয়েছেন। বিরানব্বই বজ্রপাতে নেমে এল ঘোর অমানিশা। হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী মি. মোহাম্মদ আলী শেরে বাংলাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে করাচি রেডিও থেকে ঘোষণা করলেন। ইতিহাসে এ-ধৃষ্টতার নজির মেলে না। যেন বাচ্চাই সাক্কা আমানুল্লাকে বলছে দেশদ্রোহী।

... পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে রাহু-কেতুর উদয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী তদীয় ভক্তবৃন্দকে শান্ত থাকতে বলে উদরপীড়ার সুচিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডের ভূস্বর্গ জুরিক চলে গেলেন। তখন মনে পড়ল গল্পের কথা–'ভালুকটি তোমার কানে-কানে কী বলে গেল?' উত্তরে বলা হল–'যে বন্ধুকে বিপদে ফেলে পালায় তাকে নিয়ে বনে যেতে নেই।' বস্তুত তেমন বন্ধু নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতে নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে বজ্রপাতের পূর্বেই মওলানা ভাসানী শান্তির খোঁজে স্টকহলমের পথে ইউরোপ চলে গিয়েছেন। বিপদে বন্ধুর পরিচয় হল। কারকোনবাড়ি লেনের লোকেরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

১৯৫৪ সনের ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ সাহেব পাকিস্তানের নিত্য পরিবর্তনশীল মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে জনাব মোহাম্মদ আলীর 'রত্ন পরিষদ' বা 'ক্যাবিনেট অভ ট্যালেন্টস' রচনা করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী দল মুখোশ খুলেই যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির সভায় হাজির হল। আওয়ামী দল শেরে বাংলাকে সরিয়ে মি. আতাউর রহমানকে যুক্তফ্রন্ট পরিষদ দলের নেতা করে তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী করে শেরে বাংলার রাজনৈতিক সমাধির ব্যবস্থা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল; কিন্তু তাদের চেষ্টা ফলবতী হল না। আল্লার রহমতে শক্তিশালী সমর্থক ব্যারিস্টার আবদুল হামীদ, জনাব গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ, সৈয়দ আজিজুল হক, আমি, ফরীদ আহম্মদ, বেগম আনোয়ারা খাতুন এবং যাবতীয় কৃষক-শ্রমিক সদস্য এবং যথেষ্টসংখ্যক আওয়ামী সদস্যদের পরিশ্রমে শেরে বাংলার নেতৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। যে-আওয়ামী খণ্ডদলটি শেরে বাংলার পক্ষ সমর্থন করল তাদের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন জনাব আবদুস সালাম খান, হাশিমুদ্দিন আহম্মদ এবং জহুরুল হক (লাল মিঞা)।

যখন জনাব সোহরাওয়ার্দী লীগের কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের কোনো প্রতিবাদ না করে স্বীয় শিষ্য মি. মোহাম্মদ আলীর রত্ন পরিষদে আইনসচিবের পদ গ্রহণ করলেন, আওয়ামী দল শেরে বাংলার নেতৃত্ব খতমের ষড়যন্ত্র শুরু করল, তখন শেরে বাংলা অগত্যা বের হলেন জনমত যাচাইয়ের জন্য

উত্তরবঙ্গ মন্থন করতে। শেরে বাংলার সঙ্গী হলেন জনাব চৌধুরী আশরাফউদ্দিন, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, সৈয়দ আজিজুল হক, হাশিমউদ্দিন, আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী, আমি এবং আরও অনেকে।

১৯৫৫ সনের ২৬, ২৭, ২৮, ও ২৯ মে শেরে বাংলা যথাক্রমে পাবনা, রাজশাহী, রংপুর এবং বগুড়ার জনসভায় বক্তৃতা করেন। সারা উত্তরবঙ্গ আবার শেরের গর্জনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। হকের নামে জনগণ আবার পাগল হল। রংপুরের জনসভায় প্রশ্ন হল–'আপনার ভাইপো সৈয়দ আজিজুল হককে কেন মন্ত্রী করলেন?' শেরে বাংলা উত্তরে বললেন–'আমার ভাইপো বলে যোগ্য লোক অযোগ্য হতে পারে না। সুযোগ এলে আমি আবার তাকে মন্ত্রী করব।'

রাজশাহীর প্রায় দুলক্ষ লোকের জনসভায় শেরে বাংলার বক্তৃতার ভাব এবং জোশের জোয়ার এল। বগুড়ার জনসভায় আমি বোধহয় খুব ভালো বক্তৃতাই করেছিলাম। কিন্তু যখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক চৌকিদারি চাকরি নেবার দরখাস্ত পেশের গল্প বললাম, তখন সভায় বিরুদ্ধ দল মহাহট্টগোল সৃষ্টি করে; তখন শেরে বাংলা দাঁড়িয়ে হাত ইশারা করায় সব শান্ত হল। অতঃপর মি. হাশিমুদ্দিন আওয়ামী খেলোয়াড়িদের মুখোশ খুলে এক বিশেষ জোরালো বক্তৃতাদান করলে শেরে বাংলা সভাস্থলেই তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আল্লার অসীম রহমতে এবং শেরে বাংলার অশেষ পরিশ্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ সনের ৬ জুন পূর্ব পাকিস্তানের বুক থেকে ৯২ (ক) ধারার জগদ্দল পাথর সরিয়ে নিলেন। নিত্য নব নব অনিশ্চিত অবস্থার ভেতরে শেরে বাংলা শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। অতএব, তিনি জনাব আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য মনোনয়ন করেন এবং পরিষদের যুক্তফ্রন্ট দল তা মেনে নেওয়ায় ১৯৫৫ সনের ৬ জুন পূর্ব পাকিস্তানে আবু হোসেন মন্ত্রিসভা কায়েম হল। জনগণের মুখে আবার আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় তারা আশ্বস্ত হয়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করতে লাগল।

... আওয়ামী লীগের দল পূর্ব পাকিস্তানের লোক নিয়ে গঠিত। তারা যখন সংখ্যাসাম্যের ছুরি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের দাবি এবং অধিকারকে এক আনা পরিমাণ কেটে খর্ব করে দিল তখন যুক্তফ্রন্টের দাবি দুর্বল হয়ে গেল। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানবাসী এ-সংখ্যাসাম্য সানন্দেই গ্রহণ করলেন। এইভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য গণতান্ত্রিক দাবি চিরতরে খর্ব করেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব সংখ্যাসাম্য স্থাপন করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের খুশি করে নিজের ব্যক্তিগত এবং দলগত সুবিধা হাসিলের পথ সুগম করলেন। কারণ আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগ উভয়ই খুশি হল।

১৯৫৫ সনের ২৫ জুন সেই সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতেই নূতন গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র বারো জন আওয়ামী সদস্যসহ সোহরাওয়ার্দী সাহেব গণপরিষদে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের দল করে, জনগণের ভোটে তাদের প্রতিনিধি হয়ে, কোন্ নীতির বলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং তাঁর দল যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে গেলেন তা আজও জানা যায়নি। যুক্তফ্রন্ট ছাড়তে হলে তাঁদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে আওয়ামী লীগ হিসেবে নির্বাচন জয়ী হয়েই দল ত্যাগ করা উচিত ছিল। গণপরিষদের নির্বাচনকালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব আলাদাভাবে করাচি পরিষদে যাবার ফলে আমাদের দাবি আদায়ের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু শেরে বাংলার যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে মিলেমিশে গণপরিষদে গেলে সাধারণ নির্বাচনের মতো দশ আনা সুবিধাই পেত আওয়ামী লীগ। এসব ঘটনাপরম্পরা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের বুকে বিরানব্বইর বজ্রপাতের পেছনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং আওয়ামী দলের গোপন হস্ত ছিল কি না।

গণপরিষদে সোহরাওয়াদী সাহেবের দলের বিরুদ্ধে শেরে বাংলা তার কৃষক-শ্রমিক এবং নেজামে ইসলাম দল নিয়ে জয়ী হয়ে মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর মন্ত্রিসভায় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৫ সনের ১১ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে যত খুনি মামলার আসামি প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রাণভিক্ষা চেয়ে দরখাস্ত করেছিল, তাদের সকলের মুক্তির আদেশ দান করেন।

১৯৫৬ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। মুসলিম লীগ সুদীর্ঘ আট বৎসরেও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করতে সমর্থ হয়নি। শেরে বাংলার অদম্য উৎসাহে, অসীম আগ্রহে এবং অমানুষিক পরিশ্রমে মাত্র আট মাস কাল সময়মধ্যে তা রচিত, পঠিত ও আলোচিত হয়ে ১৯৫৬ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদে গৃহীত হল। শিশুরাষ্ট্র এবার হামাগুড়ি পরিত্যাগ করে মেরুদণ্ড সোজা করে দুনিয়ার বুকে সগর্বে দণ্ডায়মান হল। সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। যে-শেরে বাংলা লীগের জন্মকালে ছিলেন তার অন্যতম ধাত্রী এবং লাহোর লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন, তাঁরই হস্ত দ্বারা আল্লাহ পাক ষোলো বৎসর পরে জাতিকে শাসনতন্ত্র প্রদান করলেন। ইচ্ছা থাকলে আট মাসের মধ্যে যে শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব তাও প্রমাণ হয়ে গেল। অতঃপর শ্রান্ত-ক্লান্ত শেরে বাংলা শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের আশায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে ফিরে এলেন ঢাকায়।

... ঢাকার বুকে ভুখা-মিছিল করে কারা ভুখাদের পুলিশের গুলির সামনে ঠেলে দিয়ে কাপালিকের তান্ত্রিক মতে শবোপরি সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছে, আবার মানুষ মেরে তাদের শোকেই 'গভর্নর ফজলুল হকের মাথা চাই' বলে চিৎকার করেছে, তা বলে লাভ নেই। ১৯৫৬ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা শপথ নেবার পরে আওয়ামীদের মহা বিজয়োল্লাসে ঢাকার শহর তোলপাড় হল। ন্যাপ, আওয়ামী, কংগ্রেস কোয়ালিশন হল বটে; কিন্তু বহুরূপী ন্যাপের স্বরূপ ধরা ছিল কঠিন ব্যাপার।

শেরে বাংলা রাজনীতি থেকে ক্রমে বিদায় নেবার উদ্দেশ্যেই নিয়েছিলেন লাটের চাকরি। ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মারাত্মক করোনারি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কোনোরকমে বেঁচে রইলেন। অতঃপর তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন আওয়ামী দল এবং কৃষকশ্রমিক পুনরায় একত্র হয়ে দেশের সেবা না করলে মহা সর্বনাশ হবে।

গভীর জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবৃদ্ধ ফজলুল হক চাইলেন আওয়ামী এবং কৃষক প্রজাদলের পুনর্মিলন। তিনি আমাদের পরিষ্কার বলে দিলেন আওয়ামী-কৃষক-শ্রমিকের সমঝোতা না হলে হবে সংঘাত এবং সংঘাতের ভেতর দিয়েই হবে বজ্রপাত।

শেরে বাংলার আদেশ শিরোধার্য করে কৃষক-শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে জনাব রেজাই করিম, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মিঞা আবদুল হাফিজ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ফিরোজ আহম্মদ চৌধুরী এবং আমি ১৯৫৭ সনের ১৬ এপ্রিল রমজান মাসে করাচি রওনা হয়ে গেলাম। পূর্বকথিত মতে আওয়ামীপ্রধান জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশমতে তাঁকেই উভয়দলের নেতৃত্ব দিয়ে আওয়ামী-কৃষক-শ্রমিক দলের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হল। লিখিত চুক্তিপত্রে আমাদের কৃষক-শ্রমিক পক্ষের দস্তখত হয়ে গেল।

কিন্তু আওয়ামীপ্রধান সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দস্তখত আনতে গিয়ে সব পণ্ড হল। জনাব সোহরাওয়ার্দী 'তরলবুদ্ধি তরুণ ভক্তের' সবিশেষ আবদারে সে-কাগজে দস্তখত না দিয়ে তার সফরসূচি অনুযায়ী জাপান যাত্রা করলেন। আমাদের পরিশ্রম পণ্ড হল, তথাপি প্রস্তাবিত আওয়ামী-কৃষক-শ্রমিক সমঝোতা স্থাপনের জন্য ইত্তেফাক সম্পাদক মি. তোফাজ্জল হোসেনের ঐকান্তিক চেষ্টার কথা আজও মনে পড়ে। তবে এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলা চলে যে, শেরে বাংলার মহান উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব হলে অতঃপর আমাদের কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হত না।

মিলনপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে এল বিরোধ, বিরোধে এল সংকট, সংকটে হল সংঘাত এবং সংঘাতে হল সর্বনাশ। আওয়ামী ষড়যন্ত্রে ১৯৫৮ সনের ১লা এপ্রিল শেরে বাংলা গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হলেন। আওয়ামী দলকে বৈতরণী পার করে দিয়ে শেরে বাংলা তাদের যে উপকার করেছিলেন এবারে তিনি পেলেন তার পূর্ণ প্রতিদান। রাজনীতি থেকে হল তাঁর চিরবিদায়। যাদের নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে তিনি নিজের ছেলে বলে চিৎকার করেছিলেন, এবারে সেই আওয়ামী বীরবৃন্দ শেরে বাংলাকে রাজনীতি থেকে চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করতে যাবতীয় চক্রান্ত করে তাঁর প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এই আওয়ামী কৃতজ্ঞতার ভয়েই আমি বরাবর ছিলাম যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঘোর বিরোধী॥"[৬৫]

চৌদ্দ

"... On the morning of 15 May 1954, rioting broke out among workers at the Adamjee Jute Mills near Narayanganj, Dhaka (then East Pakistan). The violence subsided by midday, but left in its path almost 400 dead, including women and children, and scores injured. The clash was primarily between two groups of labourers, one Bengali and the other 'Biharis', a generic term used for migrants from India who had to a large extent come from the province of Bihar. The immediate cause of the violence was connected to the workplace politics within the mills. Yet the Bengali people's larger sense of deprivation of their cultural and civic rights and the presence of outsiders as competitors for scarce formal sector jobs may also have played a part in the onset of this violence.

The episode can be understood in light of how by the mid-1950s the promise of Muslim nationalism that led to the creation of Pakistan in 1947 had been severely put to the test by regional and nationalistic claims by Pakistan's diverse ethnic groups. The violence also came in the wake of the East Pakistan Legislative Assembly elections in March 1954 that led to the routing of the Muslim League, the founding party of Pakistan, by the United Front, a coalition radical, liberal, and conservative parties in East Bengal, and the populist Bengali leader, A. K. Fazlul Haq became Chief Minister.

The United Front's forming of the provincial government resulted in an upsurge of radical incidents in different parts of the province. By mid- to late-March, there had already been labour disturbances in a match factory in Khulna, in the Chandragona Paper Mills, and finally in the Adamjee Jute Mills in Dhaka. In all these events, there were elements of anti-management agitation (in all cases the owners were non-Bengali), yet they also manifested exuberance over the victory against the Muslim League government that had ruled East Bengal till then.

The Adamjee Jute Mills riots elicited widespread condemnation from across West and East Pakistan. Prominent members of the Muslim League and the business leaders from West Pakistan criticized the East Pakistan administration and demanded its removal, calling for the imposition of Governor's rule to safeguard the industrial growth of Pakistan. They argued that this was not merely labour trouble, but a deep-rooted conspiracy and a direct result of the venom spread by the words and action of the United Front's leaders who were being influenced by the Indian government and by the communists. (For example, among many statements by the business community in Karachi was one by Kassim Dada, president of the Pakistan Merchants' Association, who said that behind these disturbances was a well-organized effort to cripple the economy. Even the Karachi Bar Association asked for the dismissal of the United Front government in East Bengal for sheer incompetence and

---

[৬৫] বি. ডি. হাবীবুল্লাহ/শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক॥ [নালন্দা - ফেব্রুয়ারি, ২০১৪। পৃ. ১১৪-১১৮/১২১-১২৫]

treachery and it called for the promulgation of martial law. Morning News (a pro-Muslim League English daily) editorialized that this was a communist conspiracy which needed to be crushed. Yet it lamented that the communists and their fellow travellers were sitting inside the East Pakistan government. Of course, the views from East Bengal and the United Front were different. Chief Minister Fazle Haq did not blame the communists and complained that the centre was noncooperative in handling the situation. Similarly, Maulana Bhashani, President of the East Pakistan Awami League, said the rioting was a conspiracy by the defeated anti-Muslim Leaguers. Similar sentiments were echoed by Mirza Abdul Samad of the Communist Party of East Bengal and Mahmud Nurul Huda of Ganatantri Dal.)

The West Pakistan Communist Party had been much weakened since the government attacked it in 1951 due to the Rawalpindi Conspiracy Case; however, the Communist Party of East Bengal's partial resurgence due to its activism among political parties such as the Awami League, Ganatantri Dal (part of the United Front) maintained communism as a lingering threat for the ruling elite. (Ganatantri Dal, a coalition member of the United Front, had socialist and communist cadres and was primarily blamed for the violence.)

Under the pretext of the law and order situation, the state dismissed the elected government on 30 May 1954. Governor's direct rule was imposed and Iskandar Mirza the Defence Secretary (and later President), was sent as the Governor to control the situation. The CPP (Communist Party of Pakistan) on both sides of the country was finally banned in June 1954. It seems that even a tamed and subdued Communist Party that had been virtually crushed in West Pakistan and was participating in bourgeois elections in the East was still a threat to the authorities. Perhaps this was as much an indication of the state's own assessment of the 'rising' communist menace, or pressure from Pakistan's consolidating military and security ties with the US that forced it to clamp down on the CPP."[৬৬]

পনেরো

"... ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ময়দানের ইতিহাস বড়ই কলঙ্কজনক। দুই শক্তিশালী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ঐ বিশাল জয়লাভকে ধরে রাখতে পারলেন না। নির্বাচনের পরই শুরু হল কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টি প্রধান ও যুক্তফ্রন্ট-এর পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা শের-ই-বাংলা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সদস্যদের বাদ দিয়ে ১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্য দিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। শের-ই-বাংলা নিজের দলের ৩ জন সদস্যকে মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন কিন্তু তার মধ্যে একজন ছিলেন তার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া যা ছিল তার স্বজনপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ। তখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ অঙ্গদল আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কোন মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়নি। মাত্র ২৮ দিন পর আসল আরেক ধাক্কা যা বাস্তবিক পক্ষে যুক্তফ্রন্ট-এর নির্বাচনী বিজয়কে বানচাল করে দিল।

শের-ই-বাংলা পূর্ব পাকিস্তান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কোলকাতায় এক সম্বর্ধনা সভায় অত্যন্ত আবেগজড়িত ও বাস্তবতা বিবর্জিত বক্তব্য রাখলেন যা কেন্দ্রের মুসলিম লীগ সরকারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রের উন্মেষকে বানচাল করে দেওয়ার মওকা সৃষ্টি করে দেয়। তিনি মুসলিম জাতির ইতিহাস ও পাকিস্তান আন্দোলনের দিনগুলোর কথা বিস্মৃত হয়ে নিজের উপস্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বক্তব্যে বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ

---

[৬৬] Kamran Asdar Ali/Surkh Salam : Communist Politics & Class Activism in Pakistan (1947-1972) \ [Oxford University Press (UK) - 2015| p. 203-205]

বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙ্গালীত্বকে কোন শক্তিই কোনদিন ভাগ করতে পারবে না।'

যদিও আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে শের-ই-বাংলার মন্ত্রীসভা ১৯৫৪ সালের ১৫ই মে সম্প্রসারিত হলো কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শের-ই-বাংলার কোলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে গভর্নর জেনারেল শের-ই-বাংলা মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেন। এরপর যুক্তফ্রন্ট-এর নেতা শের-ই-বাংলার বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন, যুক্তফ্রন্ট-এর মধ্যে বিভেদ ও প্রকাশ্য শত্রুতা, কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর মধ্যে ৯২(ক) ধারার অবসানে মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য পৃথক পৃথক প্রচেষ্টা, গভর্নর জেনারেল-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উভয় দলের ব্যাপক প্রচেষ্টা ও অসম্মানজনক পন্থা অবলম্বন, ৯২(ক) ধারা অপসারণ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর বিপুল মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও শের-ই-বাংলা'র নমিনি আবু হোসেন সরকার-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতা, আবু হোসেন সরকারের পতন, ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খান-এর নেতৃত্বে তিনটি হিন্দু দল নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভা গঠন, শের-ই-বাংলা'র পূর্ব পাকিস্তান-এর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ, ফজলুল হক কর্তৃক আতাউর রহমান মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুতকরণ ও পুনরায় আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানানো, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গভর্নর শের-ই-বাংলা'র অপসারণ, অস্থায়ী গভর্নর কর্তৃক আবু হোসেন সরকার মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি, আতাউর রহমান-এর নেতৃত্বে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ৯ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন, আতাউর রহমান-এর সংখ্যাধিক্য হারানোর ফলে পুনরায় আবু হোসেন সরকার-এর ১৯/৬/৫৮ তারিখে মুখ্য মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ, ২২/৬/৫৮ তারিখে অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন সরকারের পরাজয়, ১৯৫৮ সালের ২৫শে জুন পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তন, ১৯৫৮ সালের ২২শে জুলাই আতাউর রহমান কর্তৃক নবম সরকার গঠন, ১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অভ্যন্তরে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে সদস্যগণ কর্তৃক আক্রমণ এবং মারাত্মক জখম, ১৯৫৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ–এত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ঘটনাবহুল পরিস্থিতি আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস।

ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এখানে এসেও থেমে থাকেনি। আওয়ামী লীগ ১৯৫৯ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন-এর কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন দানের কথা ঘোষণা করে। ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। আওয়ামী লীগ ২রা অক্টোবর ফিরোজ খান নুন-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। কিন্তু দফতর বন্টন প্রশ্নে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীবর্গ ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পদত্যাগ করেন।

বাঘ ওঁত পেতেই বসে ছিল, অপেক্ষা করছিল শুধু মহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষায়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দিবাগত রাত ৮টায় দেশে মার্শাল ল জারি হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেন, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মো: আইউব খান-কে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা শত কুচক্রের নায়ক রাজনীতিবীদদের মার্শাল ল পছন্দ না হলে তাদের দেশত্যাগ শ্রেয় বলে যে প্রেসক্রিপশন দিলেন সেই প্রেসক্রিপশনের বড়ি তিনিই সর্বপ্রথম গলাধঃকরণ করলেন। সমস্ত অঘটনের নেপথ্য নায়ককে মার্শাল ল জারির মাত্র ২০ দিন পর ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আউইব খান-এর কাছে সব দায়িত্ব অর্পন করেন দেশ ছাড়তে হয়॥"[৬৭]

[৬৭] সা'দ আহমদ/আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল (ব্রিটিশ ভাঁরত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) ॥ [রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ৫০-৫২]

ষোলো

"... প্রসঙ্গত একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক কলকাতায় যান। ৪ এপ্রিল ফজলুল হক কলকাতায় প্রদত্ত এক ভাবাবেগতাড়িত বিবৃতিতে বলেন,

'It is important that the people of two Bengals should realise the fundamental fact that in order to live happily they must render mutual assistance to each other. Politicians have partitioned territories, but the common mass should ensure that everybody lived peacefully. Language proved to be the most unifying factor in history and the people of two Bengals, bound together by common language, should forget political divisions and feel themselves to be one.'

মর্নিং নিউজ পত্রিকার ৫ মে তারিখের সংখ্যায় তার এ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ মহলে মার মার কাট কাট রব ওঠে। ফজলুল হক কোণঠাসা হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে তিনি আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেন। কিন্তু এতো করেও শেষরক্ষা করা সম্ভব হলো না।

১৯৫৪ সালের ১৯ মে পাক-ইউ-এস আর্মস প্যাক্ট (পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র) অস্ত্রচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। প্রদেশে জারি হয় ৯২ক ধারা। কুখ্যাত মীরজাফর আলী খাঁর বংশধর সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইসকান্দর মীর্জা বাংলাদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে পদার্পণ করেই তিনি নেতাদের গুলি করে হত্যা করার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, যেখানে পারো ভাগো যতোক্ষণ ভাগার সময় আছে–ইংরেজিটা বোধ করি ছিল, 'Go while going is good'। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির মাত্র ২০ দিন পরের এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্যই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়েছিল। বাতিল করার আগে যুক্তফ্রন্ট কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে, এ অভিযোগ আনা হয়। মওলানা ভাসানী এবং খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ৯২ ক ধারা জারি হওয়ার কয়েকদিন আগে লন্ডন চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং গুলি করার জন্য ওঁদের পাওয়া যায়নি। গ্রেফতার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য কর্মী ও নেতাকে। ইয়ার মোহাম্মদ খানকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। মন্ত্রিসভা পুরো দু'মাসও কাজ করতে পারেনি।

... বিরানব্বই ক ধারা প্রবর্তনের পর কিছুদিন বাংলার রাজনীতি স্তব্ধ হয়ে যায়। বাঙালিকে সন্তুষ্ট করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে জরুরি ভিত্তিতে বিমানে করে নিয়ে আসা হয়। বিমানে মাঝপথে আসার পর তাঁকে জানানো হয়, তোমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করার পর তিনি জাতির উদ্দেশে ইংরেজি ভাষায় এক নরম বক্তৃতা করেন। সবে বেলা ডুবেছে। আমি ফুলবাড়িয়া রোডে পশু হাসপাতালের কাছাকাছি একটা জায়গায় ছিলাম। হঠাৎ রেডিও বেজে উঠলো। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেবেন। থমকে দাঁড়ালাম। তিনি মাইক ফাটিয়ে বললেন, Fazlul Huq is a traitor. তার এই দম্ভপূর্ণ উক্তি শুনে যতোটা না বিস্মিত হয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি হয়েছিলাম ক্ষুব্ধ। তাকে আমি কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধান পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিরূপে দেখেছি, প্রায় রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কথা বলেছি। রাজনীতিতে তখনও তিনি সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হকের আশ্রিত শিক্ষানবিশ। ফজলুল হক বয়সে তাঁর পিতৃতুল্য। দু'জনের বিদ্যাবুদ্ধির কোনো তুলনা হয় না। সেই লোকের এই দম্ভ! খোটার জোরে মেড়া নাচে–বাংলা প্রবাদটি এধরনের মানুষ লক্ষ্য করেই রচিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বড় নোংরা জিনিস। কুকুরের মতো উদগীর্ণ খাদ্যও পুনরায় গিলতে হয়। বাংলায় আওয়ামী লীগকে একঘরে করা প্রয়োজন ছিল। তাই ট্রেটর ফজলুল হককে কিছুকাল পরেই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা প্রয়োজন হলো॥"[৬৮]

---

৬৮ আবু জাফর শামসুদ্দীন/আত্মস্মৃতি ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০০৫। পৃ. ২৩৪-২৩৬]

সতেরো

"... কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে, আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলিলে হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মধ্যে মনের অমিল আগে হইতেই ছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনোনয়নে সে বিরোধ ক্রিয়া করিয়াছিল আরও প্রসারিত রূপে। কারণ এই দুই মহান নেতার নিচে উভয় দলের আরও অনেক নেতা ছিলেন। নিজ-নিজ দলীয় স্বার্থ-বোধ তাঁদের ব্যবহারে ও কাজে-কর্মে নিশ্চয় প্রতিফলিত হইয়াছিল। এটা দানা বাঁধে লিডার নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া। যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছিলেন মোট ২২৮ জন। এঁরা সকলেই মুসলমান। যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলিম আসনই কনটেস্ট করিয়াছিল। ২৩৭টি মুসলিম সিটের মধ্যে ২২৮টিই দখল করিয়াছিল। এই ২২৮টির মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক ৪৮, নেযামে-ইসলাম ২২, গণতন্ত্রী ১৩ ও খিলাফতে রব্বানী ২ জন পাইয়াছিল। নিযামে-ইসলাম দল কার্যতঃ হক সাহেবের পৃষ্ঠপোষিত দল বলিয়া তাকেও কে, এস, পি, দল বলা যাইতে পারিত। কাজেই হক সাহেবের নিজস্ব মেম্বর ছিলেন ৭০ জন। গণতন্ত্রী ও রব্বানী পার্টির সদস্যরা প্রোগ্রামের ভিত্তিতে উভয় দলের মধ্যে ব্যালান্স রাখিবেন, এটা বুঝা যাইতেছিল।

১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল লিডার নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হইল। আগের রাত্রে আওয়ামী লীগ দলীয় মেম্বরদের একটি ইন্‌ফর্মাল বৈঠক হইল সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট অফিসে। ঐ সভায় তরুণ মেম্বরদের অনেকেই প্রায় একবাক্যে শহীদ সাহেবকে এইরূপ পরামর্শ দেন লিডার নির্বাচনের আগেই হক সাহেবকে মন্ত্রিসভার তালিকা প্রস্তুত ও পোর্টফলিও ভাগ করিতে হইবে। গবর্নরের নিকট একটি চিঠির আকারে ঐরূপ তালিকা করিয়া তাতে হক সাহেবের দস্তখত দিতে হইবে। তার তিনটি কপি হইবেঃ একটি হক সাহেবের ও অপরটি ভাসানী সাহেবের নিকট থাকিবে। তৃতীয়টি গবর্নরের নিকট দাখিল করিবার জন্য শহীদ সাহেবের হাতে থাকিতে হইবে। এই দলিলে দস্তখত না হওয়া পর্যন্ত হক সাহেবকে লিডার নির্বাচন করা হইবে না। কথাগুলি অবশ্য একসঙ্গে বলা হয় নাই, একজনও বলেন নাই। সকলে মিলিয়া বলিয়াছিলেন, কথায় কথায় উঠিয়াছিল।

কিন্তু শহীদ সাহেব এক কথায় ওদের সকলের সকল প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেনঃ জনগণ হক সাহেবকে আগেই লিডার নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছে। মেম্বররাও সেই ওয়াদা করিয়া ভোট আনিয়াছেন। এখন আর তাঁর উপর কোনও শর্ত আরোপ করা চলে না। করিলে এটা হইবে হদ্দ বেইমানি। প্রস্তাবকরা অবশ্যই বলিলেনঃ তাঁরা সত্যসত্যই হক সাহেবকে ছাড়া অন্য কাউকে লিডার নির্বাচন করিতে চান না। শুধু চাপ দিয়া একটা সর্বদলীয় উঁচুস্তরের মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চান। তাঁরা বলিলেনঃ বিনাশর্তে হক সাহেবকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিলে লিডার নির্বাচিত হওয়ার সংগে-সংগে তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হইবেন। শহীদ সাহেব ভাসানী সাহেব একত্রে চেষ্টা করিয়াও হক সাহেবকে আর ওদের খপ্পর হইতে বাঁচাইতে পারিবেন না। হক সাহেবের রাজনীতিক জীবনের ইতিহাস হইতে তাঁরা একাধিক নযির দিলেন। তাঁদের যুক্তি শহীদ সাহেবের মনঃপূত হইল না। তিনি এসব যুক্তিকে সন্দেহ-পরায়ণ ক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক বলিলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন, অতীতে যাই হইয়া থাকুক, জীবন সন্ধ্যায় হক সাহেব আর ভুল করিবেন না। যাঁরা শহীদ সাহেবের আশ্বাস মানিলেন, তাঁরা চুপ করিলেন। যাঁরা করিলেন না, শহীদ সাহেব ধমকাইয়া তাঁদের চুপ করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, কোনও ক্রমেই মন্ত্রিসভা গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। কারণ সাত-আট দিন আগে (২৩শে মার্চ) চন্দ্রঘোনা কাগযের কলে বাংগালী ও উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাংগা হইয়া যাওয়ায় গবর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান হক সাহেবকে তাড়াতাড়ি মন্ত্রিসভা গঠনের তাকিদ দিতেছেন। ভাসানী সাহেব এ ব্যাপারে কিছু বলিলেন না। তরুণদের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। তাঁদের প্রায় সার্বজনীন অসন্তোষের মধ্যে অনেক রাত্রে সভা ভংগ হইল।

পরদিন ২রা এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যুক্তফ্রন্ট পার্টির প্রথম অধিবেশন হইল। সর্বসম্মতিক্রমে হক সাহেব লিডার নির্বাচিত হইলেন। শহীদ সাহেব তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন। মওলানা সাহেব মোনাজাত করিলেন। ডিপুটি-লিডার, সেক্রেটারি, হুইপ প্রভৃতি আর কোনও কর্মকর্তা নির্বাচন না করিয়া শুধু গণ-পরিষদ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাস করিয়াই সভা ভঙ্গ হইল।

আওয়ামী লীগের তরুণ এম এল এ'রা যা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাই হইল। মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া হক সাহেবের সাথে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতান্তর হইল। এই মতান্তর শুধু দুর্ভাগ্যজনক ছিল না, লজ্জাজনকও ছিল। কারণ এ মতান্তর পলিসি লইয়া হয় নাই, হইয়াছিল মন্ত্রিত্ব লইয়া। সে মতভেদও মাত্র দুইদলের দুইজন তরুণের মন্ত্রিত্ব লইয়া। যে দশ-এগার জন সিনিয়র পলিটিশিয়ান লইয়া হক মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, হক সাহেবের নেতৃবৃন্দের ও এম. এল. এ.-দের, এমনকি জনসাধারণের, তা একরূপ জানাই ছিল। যে দুইজন তরুণের মন্ত্রিত্ব লইয়া মতভেদ শুরু হয়, তার একজন কৃষক-শ্রমিক পার্টির, অপর জন আওয়ামী লীগের। একজন হক সাহেবের প্রিয়পাত্র, অপরজন শহীদ সাহেবের। হক সাহেব পার্টি লিডার নির্বাচিত হওয়ার পরেই তাঁর বাড়িতে তিন-নেতার যে বৈঠক হয়, এতেই এই বিরোধ দেখা দেয়। হক সাহেব তার লোকটির নাম প্রস্তাব করায় শহীদ সাহেবও তার লোকটির নাম করেন। এটা ছিল নিছক যিদাযিদির ব্যাপার। নইলে শহীদ সাহেবের লোকটিকে মন্ত্রী করার ইচ্ছা শহীদ সাহেবের নিজেরই ছিল না।

বস্তুতঃ ঐ দিনই সকালের দিকে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ-কর্মী ঐ লোককে মন্ত্রী করার দাবি করাতে শহীদ সাহেব কর্মীদেরে ত ধমকাইয়া দেনই, উপরন্তু তাঁর প্রিয়পাত্রটিকেও ধমকাইয়া দেন। তাঁকে বলেন যে তিনিই ঐসব ছেলে-ছোকরা যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। তিনি অবশ্যই প্রতিবাদ করেন। কিন্তু শহীদ সাহেব সে প্রতিবাদে বিশ্বাস করেন নাই। যা হোক শহীদ সাহেব তাকে এই বলিয়া সান্তনা দিয়া বিদায় করেন যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি করা তিনি আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। শহীদ সাহেব উপস্থিত সকলের সামনেই তাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেন যে, ঐ কাজে এর দুইটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ হক সাহেবের মত অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান এডমিনিস্ট্রেটরের সাথে কাজ করিয়া তিনি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ হক সাহেবকে নিয়া আওয়ামী লীগ সংগঠনের এবং নির্বাচন-প্রতিশ্রুতি পালনের তাতে অধিকতর সুবিধা হইবে। শহীদ সাহেবের এই সারবান যুক্তিতে আমরা সকলেই খুশী হইয়াছিলাম। তিনিও শহীদ সাহেবের উপদেশ মানিয়া লইয়াছিলেন।

পরে হক সাহেবের বাড়িতে হক সাহেবের প্রিয়পাত্রের মোকাবিলা স্বরূপ শহীদ সাহেবই ঐ নাম করায় এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়াছিল, হক সাহেবকে দিয়া তাঁর প্রস্তাবিত নাম প্রত্যাহার করাইবার জন্যই শহীদ সাহেব এটা করিয়াছিলেন। ভাসানী সাহেবও এটাই বুঝিয়াছিলেন। হক সাহেব তার প্রস্তাবিত নামটি গ্রহণ করেন নাই। বরঞ্চ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই তার ঐ লোকটি দরকার বলিয়া নেতৃদ্বয়ের কাছে আপিল করেন। ভাসানী সাহেব কোনও-এক পক্ষে শক্ত হইলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইত। কিন্তু তিনি তা হন নাই। ফলে এই ছোট কথার উপর যে বিরোধ দেখা দিল তাকে কেন্দ্র করিয়াই অল্পদিন মধ্যেই যুক্তফ্রন্টে ভাংগন দেখা দিয়াছিল।

হক সাহেব আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়া তিনজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ফেলিলেন। এ বিরোধ মিটাইবার জন্য অনেক বন্ধু-বান্ধবসহ আমি দূতিয়ালি বৈঠক করিলাম। সব ব্যর্থ হইল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া শহীদ সাহেব করাচি গেলেন। এবং কিছুদিন পরেই চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেলেন। ঐ একই বিমানে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব তাঁর মন্ত্রী ও অনেক কৃষক-শ্রমিক মেম্বর লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে করাচি গেলেন। মওলানা ভাসানী ক্ষুন্ন মনে মফস্‌সলের বাড়িতে গিয়া বসিলেন।

যুক্তফ্রন্টে বড় রকমের ফাটল ধরিল। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে যাতে এই ফাটল বৃদ্ধির কোনও কাজ না হয় সে জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকিয়া আমরা সর্ব অবস্থায় এক মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। আওয়ামী লীগ হইতে মন্ত্রী নিবার সমস্ত দেন দরবারের একক ক্ষমতা মওলানা ভাসানীর উপর ন্যস্ত করিলাম।

মাসাধিককাল মন্ত্রিত্ব করিবার পর হক সাহেব আওয়ামী লীগ হইতে মন্ত্রী গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিলেন। মওলানা সাহেবকে এই সংবাদ দিলে তিনি স্বয়ং না আসিয়া আমাদের কয়েকজনকে ক্ষমতা দিলেন। আমরা আপোস করিলাম। অবশেষে ১৫ই মে তারিখে আরও দশজন মন্ত্রী লইয়া হক মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হইল। আমিও তার মধ্যে একজন ছিলাম।

কিন্তু শপথ গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই গবর্নমেন্ট হাউস হইতেই আমরা খবর পাইলাম আদমজী জুট মিলের শ্রমিকদের মধ্যে দাংগা হইয়াছে। হক সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সব মন্ত্রীরাই ঘটনাস্থলে গেলাম। স্তম্ভিত হইলাম। শত-শত মৃতদেহ ডিংগাইয়া আমাদের পথ চলিতে হইল। যারা মরিয়াছে, তাদের কথা ভাবিবার সময় নাই। আর যে মরিতেছে, তাদের মৃত্যু ঠেকাইবার জন্য ছুটিলাম। উভয় পক্ষ সশস্ত্র অবস্থায় তখনও নূতন করিয়া প্রতিশোধ নিবার জন্য পায়তারা করিতেছে। আমরা মন্ত্রীরা বিভিন্ন ফ্রন্টে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি নিজে যে ফ্রন্টে পড়িলাম সেখানেই বিনা মাইকে চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসার দরুনই হোক আর আমাদের চেষ্টায়ই হোক, শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত জনতা কতকটা শান্ত হইল। বিষন্ন মনে ফিরিয়া আসিলাম। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় বিভিন্ন দাংগায়ও দেখি নাই। পরবর্তী কয়েক রাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই।

নির্বাচনে অমন শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুসলিম লীগ নেতারা ওৎ পাতিয়াই ছিলেন। কালাহান নামক একজন মার্কিন সাংবাদিক হক সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আদমজী মিলের এই দাংগায় মুসলিম লীগ নেতারা নূতন অজুহাত পাইলেন। কোনও কোনও বিষয়ে পূর্ব-বাংলা সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশ জারি করিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশাবলী আলোচনার জন্য কেবিনেটের বিশেষ মিটিং দেওয়া হইল। চিফ সেক্রেটারি হাফিয মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব আমাদিগকে হুঁশিয়ার হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি আভাসে ইংগিতে জানাইলেন যে এই সব নির্দেশ অমান্য করিলে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা আছে। আমরা মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক নির্দেশ মানিতে রাযী হইলাম না। বিপদ যত বড়ই আসুক।

কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার হক সাহেবকে করাচিতে তলব করিলেন। মিঃ আবু হোসেন সরকার ও আমি ছাড়া আর সব মন্ত্রী করাচি যাত্রায় হক সাহেবের সংগী হইলেন। সেখানে হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল। মিঃ কালাহনের পর্যন্ত সাক্ষ্য লওয়া হইল। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্য যাচাই করা হইল একজন বিদেশী রিপোর্টারের উক্তি দ্বারা। এমন অপমান হক সাহেবকে সহ্য করিতে হইল। হক সাহেব ও তাঁর মিনিস্টাররা সকলে মাথা নত করিয়াই সব মানিয়া নিলেন। তাঁরা অনুগত পাকিস্তানী, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা তাঁরা চান না, এই মর্মে সকলে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন। কিন্তু এতেও কিছু হইল না। হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীরা করাচি হইতে ঢাকায় ফিরিবার আগেই ৯২-ক ধারা-বলে গবর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হইল। গবর্নর চৌধুরী খালিকুযযমান ও চিফ সেক্রেটারি হাফিয ইসহাকের বদলে শক্তিশালী গবর্নর রূপে ইসকান্দর মির্যাকে ও শক্তিশালী চিফ সেক্রেটারি রূপে মিঃ এন এম খাঁকে পাঠান হইল।

এটা যে হইবে তা আমি আগের দিনই জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ এদিন গবর্নর খালিকুযযমান সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। করাচির ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার মত কি জানিতে চাহিলেন। হক সাহেব ও তাঁর সংগী মন্ত্রীদের যুক্ত বিবৃতিতে ব্যাপারটা মিটিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার ধারণার কথা

গবর্নরকে বলিলাম। গবর্নর তখন আমাকে খোলাখুলি বলিলেনঃ 'আমার বিশ্বাস তোমাদের মন্ত্রিত্বও শেষ, আমার গবর্নরিও শেষ।' এ বিশ্বাসের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে জানাইলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা প্রয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁর জবাবে গবর্নর ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁর ধারণা কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের মতে অটল থাকিবেন। আমি গবর্নর হাউস হইতে বাসায় ফিরিয়া বন্ধুবর আবু হোসেন সরকারকে ব্যাপার জানাইলাম। তিনি জবাব দিলেন যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত। রাত্রিবেলাই ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের কথা আমরা জানতে পারিলাম। কিন্তু তার আগেই হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রীরা যে অবস্থায় ঢাকা আসিলেন তাতেই আমরা বুঝিয়াছিলাম ব্যাপার ভাল নয়।

খুব বিশ্রী ও অভদ্রভাবে ৯২-ক ধারা জারি হইয়াছিল। একথা না বলিয়া উপায় নাই। ৯২-ক ধারা জারি করিবার সংগে সংগে অন্যতম মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকারি মন্ত্রীভবন হইতে গেরেফতার করা হইল। আমাদের বাড়ি হইতে সরকারি গাড়ি টেলিফোন পিয়ন চাপরাশী গার্ড সবই তুলিয়া নেওয়া হইল। সুপ্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ এই যে মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পরও পনর দিন মন্ত্রীরা সরকারি বাড়িতে থাকিতে এবং সমস্ত সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের বেলা তা করা হইল না। পরদিন সকালে উঠিয়া আমরা একেবারে মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হইলাম। আগের দিন যারা সরকারি উর্দি-পরা সরকারি প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় সরকারি গাড়িতে চলাফেরা করিতেছিলাম, তারাই পরদিন ঈদের মাঠে গেলাম কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটিয়া। কারণ মন্ত্রী-ভবনের মত বড়লোকের এলাকায় রিকশা পাওয়ার উপায় নাই। এজন্য আমি কোনও দুঃখ করিলাম না। কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ ভীতচকিত অবস্থায় এই ৯২-ক ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাতে তাঁরা যে রাতের বেলাই আমাদিগকে সরকারি ভবন হইতে ধাক্কাইয়া বাহির করিয়া দেন নাই, অথবা আমাদের পিঠের নিচে হইতে সরকারি খাট-পালং এবং আমাদের পাছার নিচে হইতে চেয়ার-সোফা টানিয়া নেন নাই, এজন্য আমি মনে মনে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ দিলাম।

চৌধুরী খালিকুযযামানকে গবর্নরি হইতে এবং হাফিয ইসহাককে চিফ সেক্রেটারিগিরি হইতে যেভাবে জরুরী তারের আগায় বরতরফ করিলেন এবং গবর্নর রূপে মেজর জেনারেল ইসকান্দর মির্যা এবং চিফ সেক্রেটারি রূপে মিঃ এন এম খাঁ যেরূপ তলোয়ার ঘুরাইতে-ঘুরাইতে ভারতের আকাশবাতাস কম্পিত করিয়া 'ধর-ধর-মার-মার' বলিতে বলিতে পূর্ব বাংলার দিকে বাতাসের আগে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, তাতে সকলেরই বোধ হয় মনে হইয়াছিল তাঁরা পূর্ববাংলার বিদ্রোহ দমন করিতেই আসিতেছেন। নবনিযুক্ত গবর্নর ইসকান্দর মির্যা ভারতের বুকে দৌড়াইতে দৌড়াইতেই ঘোষণা করিলেনঃ 'ভাসানীকে আমি গুলি করিয়া হত্যা করিব।' বলা আবশ্যক মওলানা ভাসানী তখন পূর্ব-বাংলায় ছিলেন না। তিনি বর্ধিত হক মন্ত্রিসভার শপথের পরেই বিশ্ব-শান্তি সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য সুইডেনের রাজধানী স্টকহমে চলিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন বেলা দুইটায় সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট অফিসে যুক্তফ্রন্ট পার্টির এক সভা ডাকা হইল। উক্ত সভায় যাইবার জন্য আমরা জনাব আবু হোসেন সরকারের সরকারি বাড়িতে সমবেত হইলাম। পদচ্যুত মন্ত্রীদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর সকলে এবং প্রায় শ-দেড়েক এম এল এ ঐ সভায় সমবেত হইলাম। সমবেত মেম্বরদের মধ্যে কেউ-কেউ জানাইলেন যে যুক্তফ্রন্ট আফিস পুলিশে ঘেরাও করিয়াছে। পার্টির লিডার হক সাহেবকে সভায় আসিতে দেওয়া হইতেছে না। ব্যাপার জানিবার জন্য মিঃ আবদুস সালাম খাঁ ও আমি একটি বেসরকারি জিপে চড়িয়া সিমসন রোডে গেলাম। গেটে পুলিশ আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। একজন অফিসার আসিয়া আমাদিগকে জানাইলেন যুক্তফ্রন্ট আফিস তালাবদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে কোনও সভা করিতে দেওয়া হইবে না। যতদূর মনে পড়ে, ঐ অফিসারটি হোম ডিপার্টমেন্টের একটি আদেশনামাও আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া অবস্থা রিপোর্ট করিলাম। তখন সর্বসম্মতিক্রমে ঐ ইনফরম্যাল মিটিংকেই যুক্তফ্রন্টের ফরম্যাল মিটিং ঘোষণা করা হইল। লিডার উপস্থিত না থাকায় এবং পার্টির কোনও ডিপুটি লিডার না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে চৌধুরী আশরাফুদ্দিন আহমদ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনিয়মতান্ত্রিক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের নিন্দা করিয়া, পার্টি লিডারকে নযরবন্দী ও অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গেরেফতার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর কর্মপন্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ অমান্য করিয়া ভূতপূর্ব মন্ত্রিগণের এবং এম এল এ গণের সমবেতভাবে কারাবরণ করার প্রশ্ন আলোচিত হইল। এই কর্মপন্থায় অধিকাংশের সমর্থন দেখা গেল। এই সংগ্রামে পার্টি-লিডারের নেতৃত্বের আশায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা স্থির হইল। প্রস্তাবিত সংগ্রামে পার্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মৌঃ আতাউর রহমান খাঁ, মৌঃ কফিলুদ্দিন চৌধুরী ও মোঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে লইয়া একটি কনভেনর বোর্ড গঠন করা হইল। সভা চলিতে থাকা অবস্থায় এখানেও পুলিশের হামলা হইল। পুলিশ অফিসাররা আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন।

সভা ভাংগিয়া গেল। আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের সংগে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলাম এবং আইন অমান্যে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। আমরা তাঁকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে তাঁর নেতৃত্বে যদি আমরা মন্ত্রীরা এবং সমবেত শ দেড়েক এম এল এ জেলে যাই, তবে কেন্দ্রীয় সরকার এক সপ্তাহ কালও ৯২-ক ধারা চালু রাখিতে পারিবেন না। সপ্তাহ পার না হইতেই কেন্দ্রীয় সরকার হক মন্ত্রিসভাকে পুনর্বহাল করিবেন আর জনগণ আমাদিগকে জেলগেটে মাল্য-ভূষিত করিয়া মিছিল করিয়া সেক্রেটারিয়েটে লইয়া আসিবে।

হক সাহেব আমাদের এই গোলাবি চিত্রে টলিলেন না। বরঞ্চ আমাদিগকে মফসসলে যাঁর-তাঁর এলাকায় গিয়া জনগণকে বিপ্লবী বেআইনী ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করিবার অবাস্তব ইমপ্র্যাকটিক্যাল ও অনিষ্টকর উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। আমরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বুঝিয়া আসিলাম শেরে-বাংলা হক সাহেব বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে একটা আপোস করিবার চেষ্টা তলে-তলে করিতেছেন।

কাজেই আমরা কেউ কিছু করিলাম না। কিন্তু হক সাহেব ও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ১৬ই জুন তারিখে এক বেতার বক্তৃতায় হক সাহেবকে 'স্বীকারোক্তিকারী দেশদ্রোহী' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হক সাহেব নিজ ঘরে নযর-বন্দী হইলেন। অতঃপর তাঁর সাথে দেখা শোনায় খুব কড়াকড়ি করা হইল। গেটে পুলিশের কাছে নাম দস্তখত দিয়া আমি কয়েকবার হক সাহেবের সাথে দেখা করিলাম। শেরে-বাংলাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখিলাম। অনেক জেরা করিয়াও তাঁর কথিত স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে হাঁ-না স্পষ্ট কিছু আদায় করিতে পারিলাম না। তিনি ঘুরাইয়া-প্যাঁচাইয়া এমন ধরনের সব শিশুসুলভ কথা বলিলেন, যাতে আমি বুঝিলাম তিনি ঐ গোছের কিছু একটা করিয়া ফেলিয়াছেন।

হক সাহেব নযর-বন্দী, মওলানা ভাসানী দেশে নাই, শহীদ সাহেবও গুরুতর অসুখ অবস্থায় বিদেশে। চারিদিকেই অন্ধকার। সুধু সাহসী নেতৃত্বের অভাবে ছাত্রতরুণরা বিভ্রান্ত। শেখ মুজিবুর রহমান সহ প্রায় দুই হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী ইউনিভার্সিটির ছাত্র সহ প্রায় দুইশ ছাত্র গেরেফতার হইল। তার মধ্যে আমার দ্বিতীয় পুত্র সলিমুল্লা হলের জেনারেল সেক্রেটারি মহবুব আনামও ছিল। এমনি করিয়া দেশের আকাশে-বাতাসে নৈরাশ্যের ও অস্ফুট ক্রোধের গুমরানো ক্রন্দন শ্রুত হইতে থাকিল।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে পূর্ব বাংগালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হইয়াছিল, প্রভাতেই এমনি করিয়া তাতে গ্রহণ লাগিল। পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে, সে গ্রহণ আজও ছাড়ে নাই। পিছনের দিকে তাকাইয়া এত দিনপরেও আজ মনে হয়, যদি তিন প্রধানের বিরোধ না হইত, যদি যুক্তফ্রন্টের

সর্বসম্মত মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত, যদি হক সাহেব ও শহীদ সাহেব স্ব স্ব প্রিয়পাত্রের জন্য যিদ না করিতেন, যদি মওলানা ভাসানী নিরপেক্ষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, যদি হক সাহেব লিডার নিযুক্ত হইয়াই গণ-পরিষদের মেম্বরগিরি নিজে ছাড়িতেন এবং অন্যান্যদেরে ছাড়িবার নির্দেশ দিতেন, যদি তিনি ২১ দফা কর্মসূচি রূপায়ণে ধীরে ও দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেন, যদি হক সাহেব কলিকাতা সফরে গিয়া রাজনৈতিক দুশমনদেরে অজুহাত না দিতেন, তবে পূর্ব বাংলার ভাগ্যে কি কি কল্যাণ হইতে পারিত, সারা পাকিস্তানের ভাগ্যে কি কি শুভ পরিণাম হইত, তা আজ সহজেই অনুমেয়। পূর্ব-বাংলার সরকারের জনপ্রিয়তার সংগে তাঁর ঐক্য ও স্থায়িত্বের মুখে নির্বাচনে পরাজিত সরকারি দল আমাদের দাবি মানিয়া লইতেন। গণ-পরিষদে নয়া নির্বাচন হইত। নয়া নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ব-বাংলার গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচিত হইত; পাকিস্তানে গণতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে রূপায়িত হত; পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান চরম দূর্ভাগ্যসমূহের একটাও ঘটিতে পারিত না॥"[৬৯]

আঠারো

তোষামোদের রাজনীতি : গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এবং বাংলার নেতারা

ক.

"... ৪ই নভেম্বর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক পুনরায় কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রীত্বের টোপের যাদুকরী প্রভাবেই শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খান ঢাকা বিমান বন্দরে স্বৈরাচারী গভর্ণর জেনারেলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। বিমান বন্দরে কে তাঁহাকে প্রথমে মাল্যভূষিত করিবেন এই সমস্যায় জর্জরিত দুই নেতাকে উদ্ধার করিলেন গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং। অর্থাৎ তিনি শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খানের দুই হাত একত্রিত করিয়া যুগপৎ মাল্যদানের সুযোগ করিয়া দিয়া উভয়েরই ধন্যবাদার্হ হইলেন, জনপ্রতিনিধিদের এই কর্মকান্ডে অবাক গোলাম মোহাম্মদ নিশ্চয়ই তাঁহাদের অলক্ষ্যে ক্রুর হাসি হাসিলেন এবং মনে মনে বোধ হয় আওড়াইয়াছিলেন, 'আসিলাম, দেখিলাম এবং জয় করিলাম।' ৯২-ক ধারার গভর্ণরী শাসনের যাঁতাকলে পূর্ব বঙ্গবাসীর যখন নাভিশ্বাস উঠিতেছিল, তখনই তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই ন্যাক্কারজনক কুৎসিৎ চেহারা ও ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা দেশবাসীকে স্তম্ভিত না করিয়া পারে নাই॥"[৭০]

খ.

"... ১৯৫৪ সালের ১৪ নভেম্বর গভর্নর জেনারেল এলেন পূর্ব পাকিস্তান সফরে। তাকে বিমানবন্দরে মাল্যভূষিত করার জন্য হক সাহেব ও আতাউর রহমান খান সাহেব যেন প্রতিযোগিতা চালালেন। কার্জন হলে তাকে সংবর্ধনা জানানো হলো। গভর্নর জেনারেলকে খুশি করার জন্য দুই নেতার প্রতিযোগিতায় সবাই হাসাহাসি করলেন। আসলে গোলাম মোহাম্মদকে তুষ্ট করে ক্ষমতায় যাওয়ার আশায় দুই নেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। এবং তাদের ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনার পেছনে কাজ করেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তোষণ। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদাসমূহের বাস্তবায়ন তথা বাঙালির বাঁচামরার দাবি আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া যাবে না তারা হয়তো এরকম ভেবেছিলেন। পূর্ব বাংলাকে সম্ভাব্য কমিউনিস্ট আধিপত্য থেকে রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মুরব্বিরা পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসকচক্রকে তাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেসক্রিপশন গিলতে বাধ্য করেছিল॥"[৭১]

---

[৬৯] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ২৫৯-২৬৬]

[৭০] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ১৯৪-১৯৫]

[৭১] মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ২১৯-২২০]

গ.

"... প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে, সবাই আশা করেছে, এবার হয়ত ৯২-ক ধারা উঠিয়ে নেওয়া হবে। এই ধারণা আরো প্রবল হল যখন ঘোষণা করা হল যে, গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানে আসছেন। বড়লাটের আগমন সংবাদে আমাদের সাংবাদিকরা নানা রকম জল্পনা চালাতে থাকি। এবার আওয়ামী লীগকে হয়ত পূর্ব-পাকিস্তানের গদীতে বসানো হবে। কৃষক-প্রজা দলের আশা, এবার তাদের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়বে। আরো হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হল, যখন আমরা বিমান বন্দরে দেখলাম শেরে বাংলা কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে এবং আতাউর রহমান খাঁ আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে গোলাম মোহাম্মদকে মালা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। সাংবাদিক বন্ধুরা হাসাহাসি শুরু করলো। গদী পাওয়ার জন্য নেতাদের এমন হ্যাংলামি আর কখনো দেখিনি। শুধু তাই নয়, কার্জন হলে শেরে বাংলার পক্ষ থেকে একবার এবং আতাউর রহমান সাহেবের পক্ষ থেকে আর একবার অভ্যর্থনা জানানো হল॥"[৭২]

ঘ.

"... এসময় রাষ্ট্রীয় কাজে একবার গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় আসেন। তখন রাজনৈতিক মহলে শলা-পরামর্শ চলছিল কেন্দ্রের শাসন তুলে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার। বিমানবন্দরে গোলাম মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানাতে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। গোলাম মোহাম্মদ এসেছিলেন দেরী করে। সেদিন মালা নিয়ে ফজলুল হক ও আতাউর রহমান খান ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলেন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের নেক নজর কাড়ার জন্য। দু'দলেরই উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের সুদৃষ্টি অর্জন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা। আমার কাছে সেদিন বিশেষ করে খারাপ লেগেছিল ফজলুল হকের মত একজন মানুষ কি করে একজন আমলার পিছনে ছুটতে পারেন। ক্ষমতার লোভ মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যায়॥"[৭৩]

ঙ.

"... ইতিমধ্যে পূর্ব-বাংলার ৯২-ক ধারা তুলিয়া পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রিত্ব লইয়া কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। হক সাহেবকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশদ্রোহী ঘোষণা করায় এবং তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই আশা হইয়াছিল যে প্রধান মন্ত্রিত্ব তাঁদের হাতেই আসিবে। মন্ত্রিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গবর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদই সর্বময় কর্তা, এটা ছিল জানা কথা। অতএব যুক্তফ্রন্টের পক্ষ হইতে যিনি গবর্নর জেনারেলের গলায় মালা দিবেন, কার্যতঃ যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে তিনিই মন্ত্রিসভা গঠনে আহুত হইবেন। এ ধারণায় নেতাদেরে পাইয়া বসিল।

কিন্তু আওয়ামী-নেতাদের এই আশা পূর্ণ হইল না। গবর্নর-জেনারেল ঢাকা আসিবার আগেই কাগযে বিবৃতি দিলেন যে হক সাহেবকে তিনি রাষ্ট্রের দুশমন মনে করেন না, বরঞ্চ একজন বন্ধু মনে করেন। এটা ছিল ধূর্ত গোলাম মোহাম্মদের একটা চাল। এই চালে স্বয়ং হক সাহেবও পড়িলেন। ঐ ঘোষণার পরে গবর্নর-জেনারেলের গলায় মালা দিতে হক সাহেবও প্রস্তুত হইলেন। অবশেষে ১৪ই নবেম্বর বড়লাট ঢাকা আসিলে হক সাহেব ও আতাউর রহমান সাহেব উভয়েই তাঁর গলায় মালা দিলেন। কার্যন হলে অভিনন্দন হইল। আমার মনটা এইসব ব্যাপারে এতটা তিক্ত হইয়াছিল যে আমি ঢাকা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিমান বন্দরে গেলাম না। এই সব ফাংশনেও যোগ দিলাম না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল যে গবর্নর-জেনারেলকে লইয়া এইরূপ লাফালাফি করা ঠিক হইতেছে না।

---

[৭২] মোহাম্মদ মোদাব্বের/সাংবাদিকের রোজনামচা ॥ [বর্ণমিছিল - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। পৃ. ২৯১-২৯২]

[৭৩] ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৭১]

কিন্তু এই মাল্যদানের আশু কোনও ফল হইল না। পূর্ব-বাংলায় পার্লামেন্টারি সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না॥"[৭৪]

চ.

"... গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করিলেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, গণপরিষদ বিলুপ্তিকালে তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, যথাশীগগির পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা পুন:প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের আশায় যুক্তফ্রন্ট পার্টিও তাই গভর্ণর জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাইবার মনস্থ করিল যদিও ইহা অনেকের কাছে বিসদৃশ্য ঠেকিয়াছিল। এই ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট অফিসে সভা আহুত হইল। কিন্তু সামান্য একটা ব্যাপারে কথা কাটাকাটির পর সভায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি হইয়া গেল। যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে আর অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইল না। আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি তখন পৃথক অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। বিমানবন্দরে এক কলঙ্কময় দৃশ্যের অবতারনা হইল॥"[৭৫]

ছ.

"... তখন দেশে এক চরম হতাশা। সেই মুহূর্তে নজরবন্দি হক সাহেবের সহকর্মী আবু হোসেন সরকার আর কারাগারে আটক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে। এই মোহাম্মদ আলী অবিভক্ত বাংলার শেষ মন্ত্রিসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বিদেশে ছিলেন। অনেকে আশা করলেন হয়তোবা তিনি দেশে ফিরে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ৯২(ক) ধারার শাসনকালেই পাকিস্তান কমিউনিস্ট বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রক্ষা চুক্তি (সিটো)-এর সদস্য হয়।

এ মন্ত্রিসভা গঠনের পর ১৫ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় আসবেন বলে ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের ধারণা হলো শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় যাবেন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পক্ষে। সুতরাং গোলাম মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানালে তাদেরই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে ডাকা হবে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহারের পর।

অপরদিকে ঢাকা আসার পূর্বে গোলাম মোহাম্মদ ঘোষণা দিলেন, শেরে বাংলা ফজলুল হক তার একান্ত বন্ধু। তিনি দেশের আদৌ শত্রু নন। ফলে কৃষক শ্রমিক পার্টি ভাবল গোলাম মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানালে মন্ত্রিত্ব তারাই পাবে।

সুতরাং ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় কার্জন হলের সংবর্ধনা সভায় আতাউর রহমান এবং আবু হোসেন সরকার উভয়েই গোলাম মোহাম্মদকে মালা দিলেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের জেলে বন্দি হাজার হাজার নেতা ও কর্মী।

আমরা আত্মগোপন করে আছি। আর আমাদের নির্বাচিত নেতারা মালা নিয়ে ছুটছেন–কে আগে স্বৈরশাসককে মালা দেবে॥"[৭৬]

[৭৪] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ২৬৮]

[৭৫] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)/পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর ॥ [বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল - ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪। পৃ. ৬৩]

[৭৬] নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ [ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ১০৫-১০৬]

জ.

"... করাচিতে আতাউর রহমান সাহেব গোলাম মোহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক ছিলেন তখন করাচির মাহমুদুল হক ওসমানী। তিনিও গোলাম মোহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব বাংলায় এসে আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বুঝতে পারলাম, কিছু একটা চলছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। আমি তো বন্দি, কেইবা আমার কথা শুনবে?

আতাউর রহমান সাহেব, গোলাম মোহাম্মদের কাছ থেকে একটা বার্তা নিয়ে নাকি জুরিখ শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করবেন। কি বার্তা হতে পারে অনেক গবেষণা হল। আতাউর রহমান সাহেবের উচিত ছিল প্রথমে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করা। যদি গোলাম মোহাম্মদ বা মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে কোনো আলোচনা করতে হয়, তবে প্রথমেই মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং আমাদের মুক্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা!

আতাউর রহমান সাহেব জুরিখ থেকে ফিরে আসলেন। গোলাম মোহাম্মদ সাহেব কিছুদিনের মধ্যে প্রোগ্রাম করলেন, ঢাকায় আসবেন। পাকিস্তানের বড়লাট ঢাকায় আসবেন ভাল কথা। পূর্ব বাংলায় তখন গভর্নর শাসন চলছে। পূর্বের সরকার ভেঙে দিয়েছিল! এখন পর্যন্ত সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় নাই। এমএলএ'রা ও কর্মীরা জেলে। আওয়ামী লীগের সভাপতি বিলাতে, জেনারেল সেক্রেটারি কারাগারে বন্দি। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। এই অবস্থায় কি করে গোলাম মোহাম্মদকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেবার বন্দোবস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বুঝতে কষ্ট হতে লাগল। আরও দেখলাম, একটা ফুলের মালা নিয়ে আতাউর রহমান সাহেব, আর একটা মালা হক সাহেব নিয়ে তেজগাঁ এয়ারপোর্টে গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের গলায় দুইজনই মালা দিলেন।

কিছুদিন পূর্বের থেকেই আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলের মধ্যে মনকষাকষি চলছিল এই অভ্যর্থনার ব্যাপার নিয়ে। এটা পরিষ্কার হয়ে পড়ল কৃষক শ্রমিক দল আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, একমাত্র হক সাহেবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী লোক একজোট হয়েছে ক্ষমতার ভাগ বসানোর জন্য। এদের কোনো সংগঠন নাই, আদর্শ নাই, নীতি নাই। একমাত্র হক সাহেবই এদের সম্বল। তারা গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে কেন মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)কেও অভ্যর্থনা করতে পারেন; কিন্তু আওয়ামী লীগ একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান–সেই প্রতিষ্ঠানের নেতারা কি করে এই অগণতান্ত্রিক ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার বুঝতে কষ্ট হল। আমি ও আমার সহবন্দিরা খুবই মর্মপীড়ায় ভুগছিলাম। আমাদের দুঃখ হল এজন্য যে, আমাদের নেতারাও ক্ষমতার লোভে পাগল হয়ে পড়েছেন। এতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেতাদের হল না যে, যুক্তফ্রন্টের দুই গ্রুপকে নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলকে আলাদা আলাদাভাবে তারা যোগাযোগ করছে, যাতে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব পূর্ব বাংলায় এসে বিরাট অভ্যর্থনা পেতে পারেন। হলও তাই। কিন্তু তিনি যা করবেন, তা ঠিক করেই রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে যে তিনি যুক্তফ্রন্টকে দ্বিধাবিভক্ত করাবেন সে ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরে শুনেছিলাম, গোলাম মোহাম্মদ ওয়াদা করেছিলেন শহীদ সাহেব জুরিখ থেকে ফিরে আসলেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। বড় বড় শিল্পপতিরা ও কিছু সংখ্যক আমলা কিছুতেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সেটা চাইছিলেন না।

মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এসে গোপনে হক সাহেবের দলের সাথে বোঝাপড়া করে ফেলেছেন যে, আওয়ামী লীগকে না নিলে তার দলকে পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করতে দিবে এবং শহীদ সাহেব যে কেউই নয় যুক্তফ্রন্টের, একথা ঘোষণা করতে হবে। তা হলেই শহীদ সাহেবকেও দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

মোহাম্মদ আলী জানতেন শহীদ সাহেবই একমাত্র লোক যে তার প্রধানমন্ত্রীর পদের দাবিদার হতে পারেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শহীদ সাহেব এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে জনগণ তাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চায়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা জানতেন, হক সাহেবের দলের সাথে আপোস করলে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন না দিয়েও পারা যাবে। তবে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া আপোস করবে না॥"[৭৭]

ঝ.

"... গোলাম মোহাম্মদ ২৩ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙে দেন। গণপরিষদ ভেঙে দেওয়ায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য বাঙালি যুব সম্প্রদায় মনে মনে খুশি হলো। কারণ, গণপরিষদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেই মুসলিম লীগ বাংলার জনগণের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অপমানিত ও লজ্জিত করেছিল।

এর সপ্তাহ তিনেক পরেই গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব বাংলা পরিদর্শন করতে আসেন। তাকে মাল্যভূষিত করার জন্য হক সাহেব ও আতাউর রহমান খান সাহেব দুই নেতাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এটা শুধু নেতৃবৃন্দের পক্ষেই অবমাননাকর ছিল না, সারা বাংলার আত্মসম্মানে আঘাত করেছিলেন নেতারা, শুধু মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য। নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েও পাঞ্জাবের অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মুখে নতজানু হয়ে নেতারা এটাই প্রমাণ করলেন যে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ পাঞ্জাবের অভিজাত সমাজের সমকক্ষতা দাবি করতে অপারগ। আমি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও আমার অন্তরে বাংলার এই পরাজয়কে যেন নিজের পরাজয় বলে অনুভব করলাম॥"[৭৮]

ঞ.

"... I had not met Ghulam Mohammad since 1952. The transformation in him was shocking. He was almost half invalid and his speech was affected by paralysis of the tongue. He advanced to receive me with difficulty and embraced me. He apologized for the conspiracy against me and swore in the name of Allah and the Quran that he had never supported the actions against me. All these things were done, he said, by the coterie of ministers he had dismissed and by Liaquat Ali Khan. He asked me what I thought of the actions taken by him. He knew my views about the misuse of power by the previous governments and the betrayal of the constituent assembly in its primary task of framing a constitution. Ghulam Mohammad appeared anxious to know the likely reaction in East Bengal to the dissolution of the assembly.

I told Ghulam Mohammad that the members of the constituent assembly had abused their trust for seven years and deserved to be dismissed. However, the legality of the action taken was to be considered seriously as, under the Indian Independence Act there was no provision for the dissolution of the assembly. The assembly had the function of framing the constitution and there was no provision in the Act to deny it the right to perform its functions. Although there was a sense of relief among the people at the dissolution of the assembly that betrayed their trust, much would depend on what was done to repair the damage done to the country since 1947. It was therefore necessary to bring into existence another body as soon as possible so that there was no gap in the process of constitution making which would be fatal to the country's existence; I had not yet seen the proclamation of 24th October 1954.

---

[৭৭] শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী ॥ [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ২৮১-২৮৩]

[৭৮] কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী ॥ [প্রথমা প্রকাশন - অক্টোবর, ২০১৮। পৃ. ৫০]

Ghulam Mohammad said he was mindful of the situation. He was anxious to visit Dacca to assess the opinion in East Pakistan and wondered it he would receive a welcoming reception. I told him that the feeling in the country was so bitter against the previous governments that he could take advantage of it as he had hit hard against men who were very unpopular and disliked by the people. I said that he was likely to get a favourable reception in Dacca if he went there as Governor General, provided he promised to announce there the formation of a new constituent assembly to complete the unfinished work within a limited time. Ghulam Mohammad asked for my support and cooperation to which I agreed on condition that he would make the announcement for the constitution of the new assembly. He suggested that as the period of the ban against holding public office under PRODA had been reduced in several cases, I should apply to the government to remove the ban imposed on me. I declined his suggestion with thanks as the ban in my view was totally unjust and the result of conspiratorial politics. I advised Ghulam Mohammad to meet some other politicians front East Pakistan who were in Karachi, including those from the Awami League.

Ataur Rahman Khan, with some others, later met Ghulam Muhammad. He entrusted Ataur Rahman with the task of bringing Suhrawardy from Beirut. Suhrawardy came and joined the cabinet as law minister after having agreed to have a new Constituent Assembly on the basis of parity between East and West Pakistan and the grouping together of all the provinces in West Pakistan into one unit. Both measures were directed at nullifying the majority position East Pakistan had so long enjoyed in the central legislature. Both steps were wrong and bound to adversely affect Pakistan. I made my criticism openly.

Ghulam Mohammad came to Dacca after some time and received a grand welcome. It was a depressing sight to see the leaders, who had recently won a resounding election under the United Front, falling over each other to greet him. Fazlul Huq, Maulana Bhashani, Ataur Rahman Khan, Abul Hussain and Sheik Mujib were among many lined up to receive Ghulam Mohammad and garland him. I had advised that support to Ghulam Mohammad should he qualified and there should be some restraint in his reception. I went to the airport to receive him as I had promised but I could not bring myself to stand in line to shake his hand and kept away from the dais set up for the occasion. He did keep his part of the bargain and gave some indication that the legislature would soon be restored."[৭৯]

ট.

"... কপালের লিখন। মাত্র কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হককে আখ্যায়িত করেছিলেন পাকিস্তানের দুশমন ও রাষ্ট্রদ্রোহী এবং রুশ-ভারতের দালালরূপে। আজ তার উপরেই ভরসা। আর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় দালাল ও কম্যুনিস্ট প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করা সত্ত্বেও গোলাম মোহাম্মদ গোষ্ঠী শেষ রক্ষার জন্যে নির্ভর করতে লাগলেন আওয়ামী লীগের সেই সব তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী নেতৃবৃন্দের উপর।

পূর্ব বাংলার ঐক্য হল দ্বিখন্ডিত। ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে যুক্তফ্রন্টের ফজলুল হকের দাবি জনসাধারণের প্রতি প্রদত্ত একুশ দফার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ভিড়ে গেলেন মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে। এদিকে যুক্তফ্রন্টের অপর দল আওয়ামী লীগ ভিড়লেন গোলাম মোহাম্মদের তরীতে। পূর্ব বাংলার এই অনৈক্যের মধ্যখানে পড়ে রইলেন শত শত দেশপ্রেমিক কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। নেতৃত্ববিহীন জনতা পড়ে থাকলেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে যে অনিশ্চয়তায় তারা ইতিমধ্যেই কাটিয়েছেন গত সাতটি বছর।

[৭৯] Hamidul Huq Chowdhury/Memoirs \ [Associated Printers Ltd. - 1989] p. 159-160]

অবস্থা চরমে উঠল গোলাম মোহাম্মদের পূর্ব বাংলা সফর নিয়ে।

যুক্তফ্রন্টের দুই দলে তীব্র প্রতিযোগিতা গোলাম মোহাম্মদের গলায় কে আগে মালা পরাবেন। গলা গোলাম মোহাম্মদের একটি কিন্তু মালা দুটি। গোলাপ-রজনীগন্ধার একটি মালা শোভা পাচ্ছে শেরে বাংলা ফজলুল হকের হাতে, আর আতাউর রহমানের হাতে রয়েছে বেল-করবী-বকুলের মালা।
দুই রাধা এক কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ পড়লেন মুশকিলে, কারে থুই কারে রাখি।

অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তিনি বললেন: দুই রাধা এক হও। দুই মালা এক কর। চার হাতের দুই মালা এক করে পরাও এক গলায়। পরিস্থিতিটি ন্যাক্কারজনক। পূর্ব বাংলার মাথা হেঁট হল বিশ্বের চোখে। বুদ্ধিবৃত্তিতে দেউলিয়াগ্রস্থ পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ আরেকবার প্রমাণ করলেন যে, মন্ত্রিত্বের হালুয়ার জন্যে তারা করতে পারেন না এমন কিছুই যেন নেই। দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাতেও আপত্তি নেই তাদের।

এমনি করে করাচির চক্রান্তজালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক মৎস্যরা ধরা দিল। চার ছড়ান হয়েছিল মন্ত্রিত্বের। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বললেন ফজলুল হকের দলকে: যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগকে ভাগিয়ে দাও, তোমাদের হাতে পূর্ব বাংলার মসনদ তুলে দিচ্ছি। তোমরা খাঁটি মুসলমান, তোমাদের সঙ্গে আমাদের মুসলিম লীগের মুসলমানদের কোন ঝগড়া নেই। কিন্তু যতসব গোলমালের মূলে কম্যুনিস্ট ও হিন্দুস্তানের দালাল ঐ আওয়ামী লীগের মুসলমানেরা।

এদিকে গোলাম মোহাম্মদ আওয়ামী লীগের নেতা আতাউর রহমানকে ডেকে চুপি চুপি বললেন: মিয়ারা, তোমরা-আমরা তো এক এবং অভিন্ন। পাকিস্তানে আমরাই তো নির্ভেজাল মুসলমান। যতসব গন্ডগোল ঐ ফজলুল হককে নিয়ে। তিনিতো হিন্দুস্তানের পাকা দালাল এবং একজন ঘোর কম্যুনিস্ট। তাকে বাদ দিয়ে এস পূর্ব বাংলার মসনদ তুলে দিচ্ছি তোমাদের হাতে। আমাদের আমেরিকার বন্ধুদেরও মনে হয় তাই ইচ্ছে।

করাচির রাজনীতির ডাক্তারগণ পূর্ব বাংলার তথাকথিত নেতাদের রোগটি ঠিকই ধরে ফেললেন। এখানকার যারা সাচ্চা দেশপ্রেমিক, তাদের তারা ভাল করেই চেনেন এবং তাদের পক্ষে পূর্ব বাংলার ক্ষমতাসীন হবার সম্ভাবনা আপাততঃ নেই। তাদের বাদ দিয়ে আর যারা দেশপ্রেমিকের দাবিদার তাদের অধিকাংশই মেকী। পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে তারা নাবালক। চাকরি বা মন্ত্রিত্বের মোয়া দিয়েই ভুলান যায়। কাজেই অষুধ তাদের লেগে গেল। ক্ষমতার গন্ধে দিশেহারা নেতৃবৃন্দের একদল ছুটলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পিছু পিছু। অপরদল গোলাম মোহাম্মদের।"[৮০]

---

৮০ খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস/ভাসানী যখন ইউরোপে (রচনাসংগ্রহ) ॥ [বাংলা একাডেমী - জুন, ২০১৩। পৃ. ১৭৯-১৮০]

দ্বিতীয় পর্ব

আন্তঃদলীয় কোন্দল : শহীদ সোহরাওয়ার্দী বনাম ফজলুল হক এবং যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন

এক

"... ১৮ই ডিসেম্বর কারামুক্তির অব্যহিত পরই শেখ মুজিবুর রহমান বিভেদের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং যুক্তফ্রন্ট নেতা শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করেন। ওয়ার্কিং কমিটি শেরে বাংলার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আওয়ামী লীগভুক্ত পরিষদ সদস্যদের উপর নির্দেশ জারি করে। আমার উপরে তখনও গ্রেফতারী পরওয়ানা ছিল বিধায় আমি আওয়ামী লীগ সদর দফতর ৫৬ নং সিম্পসন রোডের উক্ত সভায় যোগ দিতে পারি নাই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইলেই আমি সাইকেলযোগে আওয়ামী লীগ অফিসের গাড়ী বারান্দায় পৌছানো মাত্রই শেখ সাহেব ও অন্যদের সহিত দেখা হয়। শেখ সাহেব আমাকে সভার কার্যবিবরণী জানান এবং কার্যবিবরণী খাতায় আমার সহি গ্রহণ করিয়া সভার কোরাম আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণ করেন। 'দৈনিক ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ও আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি সুসাহিত্যিক ও প্রখ্যাত লেখক আবুল মনসুর আহমদের ঘোর বিরোধিতা ও আপত্তি এবং মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর লন্ডন হইতে যুক্তফ্রন্ট ভঙ্গের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ সত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আতাউর রহমান খান ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৫) শেরে বাংলাকে নেতৃত্ব হইতে অপসারণকল্পে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন ও নূতন নেতা নির্বাচনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। অনাস্থা প্রস্তাব সভায় শেরে বাংলা ১১৯ ও আতাউর রহমান ১০৫ সদস্যের সমর্থন পান। শেরে বাংলা ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন উক্তি এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক যুক্তফ্রন্টকে কতকগুলি দলের জগাখিচুড়ি (Conglomeration of parties) আখ্যাদানের মধ্যেই নিহিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যদের অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের মূল মানসিক শক্তি। যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন সৃষ্টির এই প্রয়াসে ইন্ধন জোগাইয়াছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর করাচী প্রাসাদ চক্রের অন্যতম অনুগত সহচর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী নিয়াজ মোহাম্মদ খান। অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই একমাত্র শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন, যাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গদল ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে যুক্তফ্রন্টের বিজয় সুনিশ্চিত করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুচরদের প্ররোচনায়, বুদ্ধিনাশা অবস্থায় তিনিই স্বয়ং জনগণের ঐক্যের এই হাতিয়ার যুক্তফ্রন্টের মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনারাজির ধারায় জনগণের অলক্ষ্যে ও নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যক্তিসর্বস্ব, ব্যক্তি প্রাধান্য ও ব্যক্তিপূজা আশ্রয়ী রাজনীতির ক্রমবিকাশ ঘটে এবং নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচীভিত্তিক রাজনীতির অভিশাপ দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়া বসে। যাহা হউক, এইভাবেই যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া গেল এবং এইদিকে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে রহিল কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রী দল, জনাব আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একাংশ (২০জন) যুক্তফ্রন্টভুক্ত রহিল এবং জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বৃহত্তর অংশ সংগঠিত হইল। লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগের ১৯জন পরিষদ সদস্য এই অবস্থায় শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন॥"[৮১]

দুই

"... আমার বরাবর ধারণা ছিল যে গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নিজে এবং তাঁর পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মধ্যে বিরোধ বাঁধাইয়া যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। মওলানা ভাসানী দেশে থাকিলে এই চেষ্টায় তাঁরা সফল হইতে পারিবেন না এই আশঙ্কাতেই তাঁরা মওলানা সাহেবকে দেশে ফিরিতে দিতেছিলেন না। এই ব্যাপারে কি শহীদ সাহেব, কি হক সাহেব, দুই জনের একজনও দেশকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারিতেছেন না বলিয়া আমার মনটা খুবই খারাপ হইয়াছিল। দুই নেতাই শাসন-নিয়ন্ত্রণের উর্ধে। একজনের কথায় নির্ভর করা যায় না; আরেকজন কারও পরামর্শ মানেন না। এ অবস্থায় একটি মাত্র লোক যিনি উভয়কে শাসন করিতে পারিতেন, তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানী। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ঠিক এই সময়েই দেশে নাই। আজ আমার মনে হইতেছে, মওলানা সাহেবের ঐ সময়ে বিদেশে যাওয়াটা ঠিক হয় নাই। তিনি থাকিলে বোধ হয় হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের ঐ ব্যক্তিগত বিরোধ এবং পরিণামে যুক্তফ্রন্টের ভাংগন রোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমার মনে হইলে কি হইবে? পার্টির বা দেশের সবচেয়ে যে সংকট মুহূর্তে মওলানা সাহেবের প্রয়োজন হইয়াছে সবচেয়ে বেশি, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছেন।

যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধ আরও বাড়িল। আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান সাহেব হক সাহেবের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব আনিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে দস্তখত অভিযান শুরু হইল। অভিযানের গোড়ায় মুজিবুর রহমান সাহেব বলিলেনঃ 'এ অনাস্থা-প্রস্তাব আওয়ামী লীগের তরফ হইতে নয় যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে।' এতে কিছু সংখ্যক আওয়ামী মেম্বর ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার স্বাধীনতা দাবি করিলেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ডাকিয়া আওয়ামী মেম্বারদের উপর ম্যানডেট দেওয়া হইল।

এই ধরনের সভায় কোনদিনই শান্তিপূর্ণ সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হয় না। গণ্ডগোলেই সভা শেষ হয়। এই অভিজ্ঞতা আমার অনেক দিনের ছিল। কাজেই 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়া সাহেব ও আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলাম। কিন্তু আমাদিগকে এই বলিয়া চুপ করা হইল যে এটা শহীদ সাহেবের নির্দেশ এবং মওলানা সাহেবেরও এতে মত লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনঃপুত হইল না।

[৮১] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ১৯৬-১৯৭]



পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য আমি শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবের ও মওলানা সাহেবের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিবার চেষ্টা করিলাম। শহীদ সাহেবকে পাওয়া গেল না। মওলানা সাহেবকে পাইলাম। অনাস্থা-প্রস্তাবে তাঁর অনুমোদনের কথা তিনি অস্বীকার করিলেন। বলিলেন এ কাজে বিরত থাকিবার জন্য, তিনি আমাদের কয়েকজনের নামে পত্র দিয়াছেন। আমার চিঠি ময়মনসিংহের ঠিকানায় দিয়াছেন বলিয়া তখনও আমার হাতে পৌঁছে নাই। যাহোক তিনি অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার সভা স্থগিত রাখিবার জোর পরামর্শ দিলেন।

আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষার কোনও উপায় দেখিলাম না। কাজেই সে চেষ্টা করিলাম না। বরঞ্চ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ম্যানডেটের জোরে জিতিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু শহীদ সাহেব ঢাকা না আসায় ও মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধতার কথা জানাজানি হইয়া যাওয়ায় জয়ের সম্ভাবনা কমিয়া গেল। আমি আপোসের চেষ্টা করিলাম। বন্ধুবর আবদুস সালাম খাঁ সাহেবই এ আপোস করাইয়া দিতে পারিতেন। কারণ তিনি পঁচিশজনের মত আওয়ামী মেম্বর লইয়া হক সাহেবের সমর্থন করিতে ছিলেন। আমি তাঁকে এই আপোস-ফরমূলা দিলাম পার্টির সভায় একই প্রস্তাবে প্রাদেশিক নেতা হিসাবে হক সাহেবের উপর ও কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে শহীদ সাহেবের উপর আস্থা জ্ঞাপন করা হইবে। সালাম সাহেব আমার ফরমূলা খুবই পছন্দ করিলেন। কিন্তু বলিলেনঃ বড়ই দেরি হইয়া গিয়াছে। ইট ইয টু লেইট। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলামঃ কিছু দেরি হয় নাই। সালাম সাহেবের আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি সোজা হক সাহেবের কাছে গিয়া বলিবেন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের পর তাঁর আর স্বাধীনতা নাই। তিনি ইতিপূর্বে হক সাহেবকে সমর্থনের যে ওয়াদা করিয়াছিলেন তা হইতে তিনি মুক্তি চান। সত্য-সত্যই সালাম সাহেবের ঐ ওয়াদা খেলাফ করিতে হইবে না। কারণ এ কথা শোনা মাত্র হক সাহেব সালাম সাহেবকে আপোসের জন্য ধরিবেন। সালাম সাহেব তখন আমার ফরমূলায় আপোস করাইবার সুযোগ পাইবেন।

সালাম সাহেব আমার অনুরোধ রাখিতে পারেন নাই। ফলে নির্ধারিত দিনে ১৯৫৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি এসেমব্লি হলের রিফ্রেশমেন্ট রুমে যুক্তফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক বৈঠক বসিল। সভার প্রাক্কালেও উভয় পক্ষের আপোস-কামী কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় আপোসের একটা চেষ্টা করিলাম। কিন্তু উভয় পক্ষের চরমপন্থীদেরই জয় হইল। সভার কাজ শুরু হইল। এ ধরনের সভায় বরাবর যা হইয়া থাকে তাই হইল। উভয় পক্ষের প্রস্তাব পাস হইল। উভয় পক্ষই জিতিল। উভয় পক্ষের খবরের কাগযে যার-তার প্রস্তাবের সমর্থকদের যে সংখ্যা বাহির হইল তার যোগফল মোট মেম্বরের চেয়ে বেশি। উভয় পক্ষই জয় দাবি করিলেন। আওয়ামী লীগ ওয়ালারা বলিলেনঃ আওয়ামী লীগের জয়। কৃষক-শ্রমিক ওয়ালারা বলিলেনঃ কৃষক-শ্রমিক পার্টির জয়। দুই দলের কেউ তখন বুঝিলেন না যে জয় তাঁদের কারও হয় নাই। আসল জয় হইয়াছে গণ-দুশমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির।

... ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়কে নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। কতকগুলি নীতিগত বিরোধও দায়ী ছিল। কিন্তু সবার চেয়ে বেশি ও আশু দায়ী ছিল মুজিবুর রহমানের একগুঁয়েমি। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া দেওয়ার মূলেও ছিল মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপ। মুজিবুর রহমানের নিজের কথা ছিল এই যে ঐ পাঁচমিশালী আদর্শহীন ম্যারেজ-অব-কনভিনিয়েন্স যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া আওয়ামী লীগকে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাঁচাইয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনেকের মত, আমার নিজেরও, যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া তিনি পূর্ব-বাংলার বিপুল ক্ষতি করিয়াছেন। এপক্ষে-ওপক্ষে বলিবার কথাও অনেক আছে। বলিবার অনেক লোকও আছেন। কিন্তু শেষ কথা এই যে যুক্তফ্রন্ট ভাংগা যদি দোষের হইয়া থাকে তবে সে দোষের জন্য মুজিবুর রহমানই প্রধান দায়ী। প্রায় সব দোষই তার। আর ওটা যদি প্রশংসার কাজ হইয়া থাকে তবে সমস্ত প্রশংসা মুজিবুর রহমানের। তবে যুক্তফ্রন্টের বিরোধের সুযোগ লইয়া পরাজিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যে পূর্ব-বাংলার উপর গবর্নরী শাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যুক্তফ্রন্ট ভাংগার ফলে যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব-বাংলার

দাবি-দাওয়া গৃহীত হইতে পারে নাই, এবং সেই হইতে ১৯৫৮ সালে দেশের চরম দুর্দৈব আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে যে যুক্তফ্রন্ট ভাংগার বিষময় পরিণাম বলা যায়, এটা দল-মত-নির্বিশেষে প্রায় সবাই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবু এর বিচারের জন্য ইতিহাসের রায়ের অপেক্ষা করিতে হইবে॥"[৮২]

তিন

"... এদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খানের প্ররোচনায় যুক্তফ্রন্টের কর্তৃত্বের বাইরে আওয়ামী মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলার সর্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ মুরব্বিজন জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও রাজনীতিক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ সেই সময় যে কোনো মূল্যে যুক্তফ্রন্টের ভেতরকার ঐক্য ধরে রাখার স্বার্থে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঐ ধরনের তৎপরতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তারা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নেতা হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের বিরোধিতা করেন। এই অনাস্থা প্রস্তাব আনা থেকে বিরত থাকার জন্য কলকাতা থেকে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে পরামর্শ দেন। কিন্তু সেসব কোনো কাজে আসলো না। অবশেষে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার হক সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ভোটে দিতে বাধ্য হলেন। জয়টা হক সাহেবেরই হল; তিনি পেলেন ১১৯ ভোট আর তাঁর বিপক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান পেলেন ১০৫ ভোট। অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ হল।

কিন্তু যুক্তফ্রন্ট অবধারিতভাবে ভেঙে গেল। শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ ও কতিপয় রাজনীতিবিদের ক্ষমতার প্রতি উদগ্র লালসা যুক্তফ্রন্টের সেই অনাহুত ভাঙনের জন্য দায়ী। যুক্তফ্রন্টের সেই অনৈক্যের রাজনীতির উত্তরাধিকার আজও আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। ভাঙনের পর যুক্তফ্রন্টের অবস্থা দাঁড়ালো এ রকম : হক সাহেবের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রী দল। আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের একাংশ (কুড়িজন এমএলএ-এর গ্রুপ) যুক্তফ্রন্টভুক্ত রইলো। জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের বৃহত্তর অংশ একক ক্ষমতাধর দল হিসেবে সংগঠিত হলো। উনিশ জন এমএলএ আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করলেন॥"[৮৩]

চার

"... যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছিলেন গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ইঙ্গিতে জনাব মোহাম্মদ আলী, সে ভাঙন সহজ করে আনিলেন শেখ মুজীব যুক্তফ্রন্টের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে। এই অনাস্থা প্রস্তাব যুক্তফ্রন্ট অথবা আওয়ামী লীগ থেকে দলগত পর্যায়ে আনা হয়নি। শেখ সাহেব নিজের উদ্যোগে কয়েকজন সদস্যকে নিজের দলে টেনে নিয়ে এই কাজটি করেছিলেন। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়া (তোফাজ্জল হোসেন) ও আবুল মনসুর আহমদ শেখ মুজীবের এই কাজের তীব্র বিরোধিতা করতে লাগলেন। দেশী বিদেশী সাংবাদিকরা উদগ্রীব হয়ে আছে ঘটনার শেষ দেখার জন্য। মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী জানিয়ে দিলেন যে, শেখ মুজীবের এই কাণ্ডকারখানা নীতি-বিরুদ্ধ, এতে তাদের সমর্থন নেই। এতদসত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী

---

[৮২] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ২৭৩-২৭৫/৪২৬]

[৮৩] মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ২২৮-২২৯]

পার্টীর বৈঠক বসলো। ১৯৫৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, পরিষদের হোটেল-কক্ষ সরগরম। শেখ মুজীবের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলই যুদ্ধংদেহী অবস্থায়। শেষ পর্যন্ত হাঙ্গামা হুজ্জুতের মধ্যে সভা শেষ হল। উভয় পক্ষই সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের জানালেন, তাঁদের জয় হয়েছে। আসলে কাণ্ডটা হল বানরের পিঠা ভাগের মত। করাচীর পাঞ্জাবী শাসকচক্র দেখলেন যে, যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ব্যাপারে তাদের আর তকলিফ স্বীকার করতে হল না। ওরা নিজেরাই নিজেদের গলায় ছুরি চালিয়েছে॥"[৮৪]

পাঁচ

"... এই সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ দৃশ্যপট থেকে অনুপস্থিত থাকেন। সোহরাওয়ার্দী তার চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ড চলে যান এবং ভাসানী বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য সুইডেনে যান। পূর্ব পাকিস্তানের অপর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ফজলুল হক বাহ্যত মৌনতা অবলম্বন করেন। ফলে নবনিযুক্ত গভর্নর ইস্কান্দার মীর্যার অধীনে দমনমূলক গভর্নর শাসন রূপ লাভ করতে থাকে এবং অন্যদিকে শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। এই অচলাবস্থার পরিণামে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে একটি বিল পাস করার পর জরুরি অবস্থা আরোপ করা হয়। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে আমলা, জমিদার ও খ্যাতিমান শিল্পপতিরা তাকে সমর্থন দেবে। কিন্তু স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনও তার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থেকে যান। সোহরাওয়ার্দীর সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালানো হয়। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক উসমানী যখন আতাউর রহমানকে এই মর্মে অবহিত করেন যে 'গোলাম মোহাম্মদের বিরোধিতা করার অর্থই হবে সামরিক শাসনকে ডেকে আনা' তখন তিনি নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য ইউরোপ গমন করেন।

অনুমান করা যায় যে আতাউর রহমানের প্রত্যাবর্তনের পর গভর্নর জেনারেলের প্রতি তাঁর বাহ্যত কোমল মনোভাবের পেছনে সোহরাওয়ার্দীর সমর্থন ছিল, কেননা ফিরে আসার পর সোহরাওয়ার্দী নিজেই গোলাম মোহাম্মদের 'বিজ্ঞ মন্ত্রিসভায়' (Cabinet of Talents) আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। দলীয় লোকজনের প্রাথমিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এমনকি তিনি যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেননি। যুক্তফ্রন্টকে উপেক্ষা করার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সম্ভবত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এরই সম্ভাব্য প্রতিশোধ হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে যখন ফজলুল হক করাচি গমনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং একজন সদস্যকে মনোনয়নদান করতে সম্মত হয়ে আবু হোসেন সরকারের নাম প্রস্তাব করেন তখন তিনিও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কোনো পরামর্শ বা তাকে কিছু অবহিত করেননি।

এইভাবে দেখা যায় যে গভর্নর জেনারেল যুক্তফ্রন্টের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে তার প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে অনুরক্ত থাকার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করায় ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ দলাদলি প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং যুক্তফ্রন্টের প্রধান অংশীদার হিসেবে তার ন্যায্য ও যথাযথ পাওনা লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই কারণে আওয়ামী লীগ উক্ত বৈঠকে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করে। ওদিকে কৃষক পার্টিও পাল্টা অনাস্থা প্রস্তাব আনে। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে যদিও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি

---

[৮৪] মোহাম্মদ মোদাব্বের/সাংবাদিকের রোজনামচা ॥ [বর্ণমিছিল - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। পৃ. ২৮৫-২৮৬]

তথাপি উভয় দল স্বীয় বিজয় অর্জিত হয়েছে বলে দাবি করে। বাস্তবিকপক্ষে অবশ্য আওয়ামী লীগ আবদুস সালাম খান, হাশিমুদ্দিন আহমদ ও আনোয়ারা খাতুনসহ কতিপয় সদস্যকে সাময়িকভাবে হারায়। এরা ফজলুল হক নেতৃত্বাধীন দলের সঙ্গে এই অজুহাতে যোগ দিয়েছিলেন যে প্রাথমিকভাবে এঁদের আনুগত্য ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রতি॥"[৮৫]

ছয়

"... আওয়ামী লীগের তরফ থেকে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। মওলানা তখন বিদেশে–কলকাতায়। সোহরাওয়ার্দীও বিদেশে। খুব প্রচার করা হলঃ উভয় নেতাই সম্মতি দিয়েছেন এই প্রস্তাবের পক্ষে। মওলানা ভাসানী টেলিফোন করেছেন এর সাক্ষীও পাওয়া গেল। সভাস্থলে গিয়েই আমাদের পক্ষ থেকে মওলানা তর্কবাগীশকে সভাপতি প্রস্তাব করা হল। ফজলুল হক সাহেব ওপাশে বসে রইলেন। তাঁর দলের লোকেরা বলল, তিনি ছাড়া কেউ সভাপতি হতে পারে না। এরই মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হল। ভীষণ হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে এক সভাপতি ঘোষণা করলেনঃ প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সভাপতি ঘোষণা করলেনঃ হয়নি।

তার পরদিন খবরের কাগজে সদস্য-সংখ্যার তালিকা বের হল। শুভঙ্করীর কারিগরি শুরু হল। ওরা বলে ওদের দলে বেশি, আমরা বলি আমাদের সংখ্যা বেশি। দস্তখত করা কাগজও বের হতে লাগল। দুই দিকেই দস্তখত দিয়েছেন এমন নামও অনেক পাওয়া গেল। মোদ্দা কথাঃ ফজলুল হক আর যুক্তফ্রন্টের নেতা রইলেন না। শুধু কৃষক-শ্রমিক পার্টির। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাকে নেতা সাব্যস্ত করা হল। হলাম নেতা। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল।

যে বিরাট আশা-আকাঙ্খা নিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছিল যুক্তফ্রন্ট–বিজয়ের উচ্চ শিখরে গৌরবমণ্ডিত করেছিল–তাকে আমরা ভেঙে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এমনি ভেঙে গেছে যুগে যুগে। যারা মানুষের মুরব্বি সেজেছে, তারাই নিজেদের খুশী-খেয়াল মাফিক এমন সব কাজ করেছে যা মানুষকে হতাশার নিম্নস্তরে নিয়ে ফেলেছে। জন-কল্যাণের ধারক ও বাহকরাই পারে শুধু এমন কাজ করতে। সাধারণ মানুষ রাজনীতির কেরামতি বুঝতে পারে না। এ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শিশুর মত অবাক হয়ে শুধু কারণ খুঁজে। জিজ্ঞাসারও উত্তর পায় না।

ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার কথা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচিত হয়েছিল। বহু বাদানুবাদের পর যখন ভোট দেয়া হয় তখন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র একজন ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু যেদিন সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, সেদিন বত্রিশ জন আওয়ামী লীগ সদস্য দল ভেঙে প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ লংঘন করে অন্য দলে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভায় এদের কয়েকজন মন্ত্রী হয়েছিলেন। এরা চলে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় কিন্তু আমরা দুঃখিত হইনি। বারবার নড়াচড়া করে বড় দুঃখ দিয়েছে এরা। পদ্মা নদীর মত–এ কূল ভেঙে ও কূলে উঠে॥"[৮৬]

সাত

"... আমরা তখন সকল ঘটনার নীরব সাক্ষী। দেশে ৯২(ক) ধারা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট শাসন। সভা মিছিল সমাবেশ করা মুশকিল। অপরদিকে নেতৃত্বের কোন্দল। প্রগতিশীল শক্তি বিভ্রান্ত। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাক তা কেউ চায়নি। অথচ মনে হচ্ছে

---

৮৫ শ্যামলী ঘোষ/আওয়ামী লীগ (১৯৪৯-১৯৭১) ॥ [ইউপিএল - ২০০৭। পৃ. ১৬-১৮]

৮৬ আতাউর রহমান খান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী)/ওজারতির দুই বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ২০০০। পৃ. ৬৮-৬৯]

ষড়যন্ত্রকারীরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চাচ্ছে। সেই ষড়যন্ত্রে জেনে হোক না জেনে হোক শরিক হয়েছেন সকল দলের নেতৃবৃন্দ। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়।

কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব এনে আওয়ামী লীগ লাভবান হলো না। কারণ পরিষদের সকলেই ছিল যুক্তফ্রন্টের মনোনীত সদস্য। কেউ আওয়ামী লীগ বা কেএসপির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়নি। তাই আওয়ামী লীগের এক শ্রেণির সদস্য যুক্তি দেখাল–আমরা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মানতে রাজি নই। নির্দেশ হতে হবে যুক্তফ্রন্টের। ফলে হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আওয়ামী লীগ জিততে পারল না। আমরা শুধু দেখলাম। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের নতুন নেতা নির্বাচিত হলো। ভোট নিয়ে অনেক হইচই হলো। বিকেলে টেলিগ্রাম বের হলো। উভয় পক্ষই দাবি করলেন তাঁরাই জিতেছেন। আওয়ামী লীগ গ্রুপের নেতা হলেন আতাউর রহমান খান। কৃষক শ্রমিকের পার্টি কেএসপি দাবি করল অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়নি। তাই তারা জিতেছেন।

আমাদের মনে হলো, জিতেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদে পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক আমলার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের রাজনীতি। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর তারা আতঙ্কিত হয়েছিল। এবার তাদের শঙ্কা দূর হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হলো পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট॥"[৮৭]

আট

"... হক সাহেব লাহোরে এক খবরের কাগজের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের কেউই নন, আমিই নেতা। অথচ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তফ্রন্টে। হক সাহেব কেএসপি'র দলের নেতা। কেএসপি, নেজামে ইসলাম মিলেও আওয়ামী লীগের সমান হবে না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব আওয়ামী লীগের নেতা–হক সাহেব একথা কি করে বলতে পারেন! হক সাহেবের দল গোলাম মোহাম্মদকে বলে দিয়েছে যে, তাঁরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী চান না, মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে চান, এই জন্যই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় নাই। আার মোহাম্মদ আলী সাহেব বলে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ দলকে বাদ দিয়েই পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন করতে হবে। আমি বুঝতে পারলাম, মোহম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের মাথায় ভর করেছেন। আর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী শহীদ সাহেবের মাথায় ভর করেছেন।

কেএসপির নেতারা তখন অনেকেই করাচিতে। কেউই শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। আমার সাথে কেএসপির নেতাদের দু'একজনের দেখা হলে আমি তাদের জানালাম, আপনারা অনেক কিছুই করেছেন। কথা ছিল, শহীদ সাহেবকে আপনারা পাকিস্তানের নেতা মানবেন, আর আমরা হক সাহেবকে পূর্ব বাংলার নেতা মানব, এখন আপনারা করাচি এসে মুসলিম লীগ নেতা বগুড়ার মোহম্মদ আলীকে নেতা মানছেন এবং তাকেই সমর্থন করছেন। শহীদ সাহেব যাতে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারেন তার চেষ্টা করছেন। আমরাও বাধ্য হব হক সাহেবকে নেতা না মানতে, দরকার হলে যুক্তফ্রন্টের সভায় অনাস্থা প্রস্তাব দেব তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আমরা হক সাহেবকে ক্ষমতা দেই নাই যে, তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী সাহেবকে সমর্থন দেবেন এক মুসলিম লীগ নেতাকে নেতা মানবেন। কৃষক-শ্রমিক দলের নেতারা কথা পেয়েছেন পূর্ব বাংলায় সরকার তাদেরই দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ দল থেকে কিছু লোক তারা পাবেন, এ আশ্বাসও তারা পেয়েছেন। যদিও শহীদ সাহেবের সাথে তার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে একমত হতে পারি নাই, তবু অন্য কেউ তাকে অপমান করুক এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। আমি শহীদ সাহেবকে বললাম, 'যখন হক সাহেব প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন

---

[৮৭] নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ [ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ১১১-১১২]

আপনি যুক্তফ্রন্টের কেউই নন, তখন বাধ্য হয়ে প্রমাণ করতে হবে আপনিও যুক্তফ্রন্টের কেউ। কেএসপি ও নেজামে ইসলামী যুক্তফ্রন্টে থাকে থাকুক। আমরা অনাস্থা দিব হক সাহেবের বিরুদ্ধে। তাতে অন্ততপক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে তো কথা বলতে পারবেন এবং আওয়ামী লীগ পার্টি পূর্ব বাংলার আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগ ছাড়া কারও পূর্ব বাংলায় সরকার চালাবার ক্ষমতা নাই।' শহীদ সাহেব বললেন, 'যতদিন আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে আছে ততদিন তো সত্যই আমি কেউই নই। হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের নেতা, তিনি আওয়ামী লীগ, কেএসপি ও নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন!'

আমি ঢাকায় ফিরে এসে আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক ভাইকে নিয়ে বৈঠকে বসলাম এবং সকল কথা তাদের বললাম। শহীদ সাহেবের মতামতও জানালাম। ভাসানী সাহেব কলকাতা এসে পৌঁছেছেন খবর পেয়েছি, কিন্তু কোথায় আছেন জানি না। শহীদ সাহেব এন, এম, খান চিফ সেক্রেটারি সাহেবকে টেলিফোন করেছেন রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে। অনেক কর্মীই আস্তে আস্তে মুক্তি পেতে লাগল। কেএসপি দলের নেতারা রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য একটা কথাও বলেন নাই। কারণ, তাদের দলের কেউই জেলে নাই। আওয়ামী লীগ এমএলএ ও কর্মীরা তখনও অনেকে জেলে এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ, মানিক ভাই ও আমি অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলাম। হক সাহেবের নেতৃত্বে অনাস্থা দেওয়া হবে কি হবে না, এ বিষয়ে হক সাহেবের চেয়েও তাঁর কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গই বেশি তৎপর মুসলিম লীগের সাথে কোনো নীতি, আদর্শ ছাড়াই মিটমাট করার। কোথায় গেল একুশ দফা, আর কোথায় গেল জনতার রায়। তিনজনই প্রথমে একটু একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। অনাস্থা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নাই, তবে পারা যাবে কি যাবে না এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি বললাম, না পারায় কোনো কারণ নাই। নীতি বলেও তো একটা কথা আছে। শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হলে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করলাম। ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সকল সদস্যই একমত, কেবল সালাম সাহেব ও হাশিমউদ্দিন সাহেব একমত হতে পারলেন না। তবে একথা জানালেন যে, তারা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানতে বাধ্য।

আমি ও আতাউর রহমান সাহেব বের হয়ে পড়লাম এমএলএদের দস্তখত নিতে। সতের দফা চার্জ গঠন করলাম। হক সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কে অনাস্থা প্রস্তাব প্রথমে পেশ করবে, সে প্রশ্ন হল। অনেকেই আপত্তি করতে লাগলেন, আমার নিজেরও লজ্জা করতে লাগল। তাঁকে তো আমিও সম্মান ও ভক্তি করি। কিন্তু এখন কয়েকজন তথাকথিত নেতা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তাঁকে তাদের কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারলাম না। এদের অনেকেই নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে এসেই ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজিত হয়। ঠিক হল, আমিই প্রস্তাব আনব আর জনাব আবদুল গণি বার এট ল সমর্থন করবেন। আমরা তাঁর কাছে সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনিও সভা ডাকতে রাজি হলেন। আমরা আওয়ামী লীগের প্রায় একশত তেরজন সদস্যের দস্তখত নিলাম। তাতেই আমাদের হয়ে গেল॥"[৮৮]

নয়

"... The judgment of the Federal Court, indirectly upholding the dissolution of the Constituent Assembly, has been criticized ever since for setting a bad precedent. What is usually not mentioned is the enthusiasm with which the Governor-General's act was hailed by the politicians both in East and West Pakistan. Ironically, the dissolution of the Assembly, which opened up the prospects of offices for its constituent parties, both in the

---

৮৮ শেখ মুজিবুর রহমান/অসমাপ্ত আত্মজীবনী ॥ [ইউপিএল - ২০১২। পৃ. ২৮৬-২৮৮]

Centre and East Pakistan, also led to splits in the United Front; the leaders of the two major parties tried to gain the favour of the Governor General.

Suhrawardy, who had supported the dissolution of the Assembly, was promised prime ministership of a future coalition ministry by the Governor-General, Ghulam Muhammad. In December he was given a seat in the 'cabinet of talents' of Muhammad Ali, which was sworn in on 24 October. But the Prime Minister, who had the support of the United Front, inducted a nominee of Fazlul Huq in the cabinet in January 1955, to counterbalance Suhrawardy. Neither of the two leaders of the United Front consulted each other about participation in what was the Governor-General's cabinet.

The factional tussles reached breaking point after the release of Mujibur Rahman, General Secretary of the Awami League, from jail in January 1955, when an attempt was made to oust Fazlul Huq from the parliamentary leadership of the United Front in April. The split was not on any principles - they all agreed on the 21-point programme - but was actuated by greed for power and personality clashes between Fazlul Huq and Suhrawardy."[৮৯]

দশ

"... শহীদ সাহেবের মন্ত্রিসভায় যোগদানের দিনকয়েক আগে তারই প্রচেষ্টায় ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) শেখ মুজিবুর রহমান জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। করাচীতে আলোচনাকালে শহীদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী এন, এম, খানকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের জন্যে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জেল হইতে মুক্তির পর পঞ্চম দিবসে শেখ মুজিব করাচী গমন করেন আর সেই দিনই আমি করাচী হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসি। ফলে, মুক্তির পর তার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হইল না। দশ দিন করাচীতে অবস্থানের পর আতাউর রহমানসহ শেখ মুজিব ৫ই জানুয়ারী (১৯৫৫) ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিমান বন্দরে তিনি আমাকে জানালেন যে, ফজলুল হক সাহেব শহীদ সাহেবের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, সুতরাং যুক্তফ্রন্টে হক সাহেবের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিতে হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, হঠাৎ কিছু না করিয়া যা করতে হয় চিন্তা-ভাবনা করিয়া করা উচিত।

কয়েকদিন পর শুনিলাম, ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উথাপনের বিষয় স্থির হইয়া গিয়াছে। জনাব আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবর রহমান অনাস্থা প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে একদিন 'ইত্তেফাক' অফিসে আসিলেন। আমি ও আবুল মনসুর সাহেব অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলাম। আমার যুক্তি ছিল, বগুড়ার মুহাম্মদ আলী হক সাহেবের সঙ্গে হাত মিলাইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শহীদ সাহেবকে দুর্বল করতে চাহিতেছেন এই কথা আমরা জনকয়েক মাত্র জানি, জনসাধারণ এই খবর রাখে না। বহু আশা-ভরসা করিয়া তারা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়াছে। যুক্তফ্রন্টকে ভাঙনের জন্য তারাই দায়ী হইবেন। জনগণ তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিবে। তাই তলেতলে বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর সঙ্গে হক সাহেব ও তার দলীয় লোকদের যে গোপন আলাপ-আলোচনা চলিতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে, জনগণের নিকট তা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হইলে জনগণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইবে। মনসুর সাহেবও একই মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতি যদি শহীদ সাহেবের সম্মতি থাকে, তবে তাকে ঢাকায় আসিতে হইবে। অন্যথায় শহীদ সাহেব ও মাওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন সঙ্গত হইবে না, সফলও হইবে না।

---

৮৯ Hasan Zaheer / The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism \ [Oxford University Press - March, 1994| p. 37-38]

মাওলানা ভাসানী তখন কলিকাতায় টাওয়ার হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। দেশে ফিরিলে তাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে বলিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা যে হুমকি দিয়াছিলেন তারপর মাওলানা ভাসানী আর দেশে ফিরেন নাই। স্মর্তব্য যে, শহীদ সাহেব আইনমন্ত্রী হইবার কিছুকাল পর স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া তাকে দেশে ফিরাইয়া আনেন।

যা হোক, বহুক্ষণ ধরিয়া শেখ মুজিবের সহিত মনসুর সাহেব ও আমার যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন চলিল। শেষ পর্যন্ত মনসুর সাহেব কলিকাতায় মাওলানা সাহেবের সাথে আলোচনা করিয়া এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রণের প্রস্তাব দিলেন। জওয়াবে শেখ মুজিব জানাইলেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই মাওলানা সাহেবের মত লইয়াছেন। তিনি সম্মত আছেন। তবু আমরা যখন এই মুহূর্তে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন অযৌক্তিক বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে থাকিলাম তখন শেখ সাহেব বলিয়া বসিলেন যে, ১৪৪ জন সদস্য প্রস্তাবিত অনাস্থা প্রস্তাবে সই দিয়াছেন। হয়ত উৎসাহের অতিশয্যেই তিনি এই সংখ্যা প্রকাশ করলেন। কয়েকদিন পর জানা গেল, তখন পর্যন্ত ৮০ জন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়াছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ২রা ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবই আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের প্রশ্নে ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিলেন।

কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনকালে শেখ মুজিবুর রহমান যে বিবৃতি দেন তাতে একটি মারাত্মক ত্রুটি থাকিয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, দলীয় ভিত্তিতে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হয় নাই। অনাস্থা প্রস্তাবে কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলামের বহু সদস্যও সই করিয়াছেন, অপরপক্ষে আওয়ামী লীগের সকল সদস্যও তাহাতে সই করেন নাই।

অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির দিন নিকটবর্তী হইতেই সঙ্কট দেখা দিল। ভোটাভুটির দুই-তিনদিন পূর্বে শেখ মুজিব আমাকে জানাইলেন যে, আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের উপর ম্যান্ডেট প্রদানের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা আহবান করা হইতেছে। ইতিমধ্যে কেএসপি'র সেক্রেটারী জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস বলিয়াছেন যে, কেএসপি বা নেজামে ইসলামের কোন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবে সই দেন নাই। নির্ধারিত দিনে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসিতেই জনাব আবদুস সালাম খান ও হাসিমুদ্দিন বললেন যে, অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নকালে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই। তার চেয়েও বড় কথা, অনাস্থা প্রস্তাব পেশকালে আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাতে সদস্যদের অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেওয়া-না-দেওয়ার স্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং সেই অধিকারের বলে তারা হক সাহেবকে ওয়াদা করিয়াছেন যে, অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে তারা ভোট দিবেন না। আমি তখন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একজন নিষ্ক্রিয় সদস্য। শেষ পর্যন্ত যা হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ম্যান্ডেট পাস হইল বটে, কিন্তু আবদুস সালাম খানের অনুসারীদের প্রস্তাবের পক্ষে সই দিবার জন্য সম্মত করা গেল না।

এইভাবে আওয়ামী লীগের ৩৫ জন সদস্যের প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অনাস্থা প্রস্তাবের ভাগ্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। এসেম্বলী হলে অনুষ্ঠিত দুই দলের পাল্টা সভায় কোন দলই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিল না। কিন্তু উভয় দলই বিজয়ের দাবি করিল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিজয়ের সংবাদ লইয়া 'ইত্তেফাক' অফিসে আসিলেন। আমার মনে কিন্তু এই বিজয় সম্বন্ধে সংশয় ছিল। তাই ইত্তেফাকে এই সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইল তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে 'আওয়ামী লীগ অফিস হইতে প্রাপ্ত খবর' বলিয়া ছাপা হইল। বলা বাহুল্য, এতদিন আওয়ামী লীগ সংক্রান্ত যাবতীয় খবরের দায়িত্ব ইত্তেফাকের নিজস্ব প্রতিনিধিরাই পরিবেশন করিয়াছেন। এই প্রথমবারের মতন ব্যতিক্রম করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

তারপর এই বিজয়কে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইল বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, সদস্যদের সইয়ের ফ্যাকসিমিলি আর পাল্টা ফ্যাকসিমিলি ছাপাইবার পালা। ইহাতে আমি বিবেকের দংশন জ্বালায় ভুগিলাম।

এইসব ঘটনার পরেও অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমান দাবি করিতেন যে, আওয়ামী লীগকে এমনভাবে আলাদা করিয়া না নিলে এই প্রদেশে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা এবং কেন্দ্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হইত না। তার মতের সহিত আমি কখনও একমত হইতে পারি নাই। এখনও হইতে পারিতেছি না। কারণ আওয়ামী লীগকে পৃথকীকরণে দেশের বা জাতির কোন লাভ হয় নাই।

শেখ মুজিবুর রহমান নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আছেন। তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অধিক। কিন্তু আমি আমার সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারি নাই যে, যে যুক্তফ্রন্ট তিন নেতার সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল, সেই যুক্তফ্রন্টকে ভাঙ্গিবার দায়িত্ব কেমন করিয়া তার উপর বর্তাইল। আমাদের বক্তব্য ছিল, জনাব ফজলুল হকের আচরণ অবাঞ্ছিত ও যুক্তফ্রন্টের স্বার্থের পরিপন্থী হইলে শহীদ সাহেব আর মাওলানা ভাসানীর উপস্থিতিতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে হক সাহেব যদি প্রকাশ্যে গোলাম মুহাম্মদের সহিত হাত মিলাইতেন তাহা হইলে আওয়ামী লীগ তাকে বর্জন করলে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হইত না।

যা হোক, অনাস্থা প্রস্তাবের পরিণতি এই দাঁড়াইল যে, আবদুস সালাম খানসহ ৩৫ জন আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য হকপন্থীদের দলে যোগদান করিলেন। যুক্তফ্রন্ট এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত ও অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন॥"[৯০]

এগারো

ভুখা মিছিল : আওয়ামী লীগের লাশের রাজনীতি

ক.

"... এ সময় (১৯৫৬) চালের মণ (যতটা মনে পড়ে) ৩০ টাকা থেকে ৩৫ টাকায় ওঠে। আওয়ামী লীগের মওকা হয়ে গেল। তারা ভুখা মিছিল বের করল। অবশ্য মিছিলে ভুখা মানুষ ছিল না। এদের একাংশকে আওয়ামী লীগ পেট ভরে খাইয়ে পকেট ভরে টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনেছিল। চালের দাম আরো যেন বাড়ে, আবু হোসেন সরকারের সরকার আরো সংকটগ্রস্ত হয়ে যেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় তার জন্য আওয়ামী লীগ কোন কৌশলই বাদ দিল না। শহীদ-মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগাররা বুড়িগঙ্গার পারে পিকেটিং করে চাল বেপারীদের নৌকা থেকে চাল তোলা বন্ধ করে দিল। খাদ্য সংকট তীব্রতর হয়ে উঠল। ক্রমশ অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে লাগল। একদিন ভুখা মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করল। গুলিবর্ষণের পর লাশ নিয়ে একটা মিছিলও হয়েছিল। ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে লাশ খুব ভাল হাতিয়ার। পরিষদ ভবনের চারদিকে মিছিল এবং ঘেরাও হয়েছিল॥"[৯১]

খ.

"... বিরোধীদলের অনাস্থা প্রস্তাব ভয়ে ভীত ও শংকিত মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ৩০শে আগস্ট (১৯৫৬) গভর্ণর সমীপে তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় প্রতিরোজই ভুখা মিছিল চলিতেছিল। জনতা দিন দিন হইয়া উঠিতেছিল মারমুখি।

---

৯০ তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)/পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর ॥ [বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল - মে, ১৯৮১। পৃ. ৬৬-৭০]

৯১ অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ/রচনা সমগ্র - ১ ॥ [মীরা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০০৪। পৃ. ২৪৩]

বিস্ফোরণোন্মুখ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৪ঠা আগষ্ট জিনজিরা এলাকা হইতে আগত এক বিরাট ভুখা মিছিল নদী অতিক্রম করিয়া ঢাকার চকবাজারে প্রবেশ করিলে, পুলিশ ভুখা জনতার উপর গুলী চালনা করে এবং পুলিশের গুলীতে অকুস্থলেই তিনজন নিহত হয়। বাজেট পেশ করিবার জন্য আহুত ১৩ই আগস্টের পরিষদের অধিবেশন গভর্ণর শেরে বাংলা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেন। শেরে বাংলা তদীয় দল কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভাকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে অবধারিত পরাজয় হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যে এই অন্যায় পদক্ষেপটি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা না বলিলেও চলে।

... ৪ঠা সেপ্টেম্বর গভর্ণর শেরে বাংলার সরকার ভুখা মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করে এবং পুলিশের গুলীতে চারজনকে প্রাণ দিতে হয়। বিচলিত গভর্ণর শেরে বাংলা বাধ্য হইয়া প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে সরকার গঠনে আহবান করেন। নিহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য ও গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৫ই সেপ্টেম্বর এক বিরাট জঙ্গী মিছিল সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকে গভর্ণর কর্তৃক সরকার গঠনের আমন্ত্রণ আলোচিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মাওলানা ভাসানীকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণে অনুরোধ জানানো হইলে, তিনি সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা আতাউর রহমান খানকে দায়িত্ব দেন। ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রীদল, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কফিল উদ্দিন চৌধুরী উপদল) সমবায়ে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ করান। পরবর্তীকালে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও (ধীরেন দত্ত গ্রুপ) আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেয়॥"[৯২]

গ.

"... তখন পাকিস্তানে, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানে, খাদ্যাভাব চরমে উঠেছিল। বাজারে খাদ্যশস্যের দামও ছিল অত্যধিক বেশি। ফলে তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যের দাবিতে মিছিল সংগঠিত করলাম। হাজার হাজার লোকের 'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাচতে চাই', 'ভুট্টা-ফুট্টা মানি না' শ্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ। তখন চাল-গমের বদলে ভুট্টার ছাতু খাওয়ানোর চেষ্টা চলেছিল। সাধারণ মানুষ ভুট্টা খেতে অনভ্যস্ত ছিল।

[৯২] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ২১২-২১৩]



নবাবপুর রোডে ভুকা মিছিলের সম্মুখভাগে এম. এ. জলিলসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের দেখা যাচ্ছে

একদিন এই ধরনের খাদ্য-দাবির একটা মিছিল সচিবালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দেখি হাজার দশেক লোকের বিশাল মিছিল, আমি সেই মিছিলের সামনে গিয়ে নেতৃত্ব নিলাম, মিছিলটিকে নিয়ে গেলাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের সামনে। সেখানে আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান এলেন এবং আমরা তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে গেলাম। সেখানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজুর রহমান মালিক প্রায় পাঁচশ মণ গম ও শতমণ চাল বরাদ্দ করলেন খাদ্যাভাব-পীড়িত মানুষের জন্য। সেই খাদ্য-মিছিলে কেরানি-সুভাড্যা ও ঢাকা শহরের আশপাশের খাদ্যাভাব-পীড়িত এলাকা থেকে অভাবী কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষেরা এসেছিলেন।

এক পর্যায়ে আমরা মিছিলকারীদের নিয়ে চকবাজারের দিকে যাই। সেখানে পুলিশ আমাদের মিছিলের ওপরে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং শেষ পর্যন্ত গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ২ জন মিছিলকারী নিহত হন। পুলিশ তাদের লাশ জেলখানার ভেতরে নিয়ে গিয়ে লুকোনোর চেষ্টা চালায়। বহুলোক পুলিশের হামলায় আহত হন। আমরা গুলিতে নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের লাশের জন্য জেলখানার গরাদ পর্যন্ত ছুটে যাই এবং প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকি। আমরা জেলখানার লোহার গরাদের শিক ধরে চীৎকার করলাম, পুলিশকে গালাগালি করলাম লাশ ফেরত দেয়ার জন্য। কিন্তু পুলিশ লাশ দিতে রাজি হলো না। পুলিশ আবার আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করলো। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে শেষে স্থানত্যাগে বাধ্য হলাম। সেই মিছিলে ও বিক্ষোভস্থলে শেখ মুজিবুর রহমানও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এবং আরো কয়েকজন নেতা যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দুই জন নিহতের মধ্যে একজনের লাশ আমরা পেয়েছিলাম। সেই লাশটি নিয়ে পরে আবার বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল। প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি এন এম খান সেই মিছিলে লাঠিচার্জের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তৎকালীন আইজি (পুলিশ) তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেই আইজি ছিলেন মিঃ দোহা। কুখ্যাত সেই দোহা স্বৈরশাসকদের পদলেহনকারী বলে পরিচিত।

... ৪ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান গভর্নর হাউজে গভর্নর হক সাহেবের সঙ্গে প্রদেশের রাজনৈতিক ও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন। এমন সময় নবাবপুর রোডে এক বিশাল ভুখা মিছিলে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে চারজন নিহত হলেন। ঐ মিছিলটি গভর্নর হাউজ ঘেরাও করতে যাচ্ছিল। মওলানা ভাসানী আরমানিটোলা মাঠে নিহতদের গায়েবানা জানাজা পড়লেন। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আরেকটি মিছিল নিয়ে মওলানা ভাসানীর সমাবেশে হাজির হলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই রকম অবনতিশীল পরিস্থিতিতে গভর্নর হক সাহেব জানালেন যে, যত শিগগির সম্ভব আওয়ামী লীগকে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানাবেন। শেষ পর্যন্ত ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী করে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়॥"[৯৩]

ঘ.

"... একবার ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের শরীক আওয়ামী লীগ একটা ষড়যন্ত্র করে। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে কিছু গরীব লোককে খাদ্য দেবার প্রলোভন দিয়ে ঢাকায় এনে ভুখা মিছিল বের করে। আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণমেন্ট হাউস ঘেরাও করে ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলা। মিছিল যখন ঢাকা কোর্টের সামনে আসে তখন পুলিশ বাধা দেয়, পরে লাঠিচার্জ করে এবং গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে দুজন গরীব মানুষ মারা যায়। এদের ভাগ্যে অবশ্য রাতারাতি শহীদ হওয়ার গৌরব প্রাপ্তি ঘটেনি। আওয়ামী লীগের এই মিছিল সংগঠিত করেছিলেন জিঞ্জিরার হামিদুর রহমান। তিনি আওয়ামী লীগ থেকে '৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন॥"[৯৪]

---

[৯৩] মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ২৪২/২৪৯]

[৯৪] ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৭০]

ঙ.

"... দেশে চাউল নেই। সরকারি গুদামও নাকি খালি পড়ে আছে। বিদেশ থেকে চাউল আমদানি না করলে আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তার কি ব্যবস্থা হয়েছে? গোড়ার দিকে সরকার বুঝতে পারেনি কিংবা বুঝতে পারলেও সরকারি যন্ত্র এত মন্থরগতিতে চলে যে, বিপদ শেষ না হয়ে যাওয়ার আগে কার্যকরী কোন প্রতিকার ব্যবস্থা করা হয় না। তাই হয়ে ছিল। বিপদ যখন একদম ঘাড়ে চেপে বসল তখন যন্ত্রের গতিবেগও একটু বাড়ল। এখান থেকে ফরমাশ পাঠাতে হবে। ব্যবস্থা করবে করাচী। টাকা যোগায় করাচী, অবশ্য এই দেশেরই টাকা। ফরমাশ পাঠাতেই অনেকদিন কেটে গেল। তারপর পরিমাণ যা চাওয়া হল, প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়। কম চাওয়াই নাকি রীতি। বিদেশ থেকে বেশি দামে কিনে এনে কম দামে বেচলে লোকসান হয়, সেটা শোধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। অবশ্য এ ঋণটাও প্রদেশের ঋণের খাতায় জমা থাকে। কাজেই, কম চাইলে টাকার অঙ্কও কম হয়, ক্ষতির পরিমাণও কম হয়। দেনার ভার হালকা হয়।

একদম না চাইলে আরও ভাল। গোড়ার দিকে নাকি তাই বলা হয়েছিল। আমাদের কিছু লাগবে না। চালিয়ে নিতে পারব। করাচী কিন্তু খোঁজ-খবর রাখে। বলে, ও সব কথা চলবে না। কিছু এনে রেখে দিলে ভাল হয়। বিপদের সময় সাত-তাড়াতাড়ি হয়ত যোগাড় করা যাবে না। তারপর অবস্থার যখন অবনতি হতে লাগল, তখন করাচীর দরবারে আরজি পেশ করা হল, কয়েক লাখ টন চাউল গম আটা সংগ্রহ করতে হবে বিদেশ থেকে। আবার গড়িমশি করে কিছুদিন কেটে যায়। তারপর মুমূর্ষ অবস্থা–জাঁকান্দানী।

চাউল আসছে না বিদেশ থেকে। বিদেশের চাউল সংগ্রহ করা ত সোজা কথাও নয়। এদিকে চারদিকে ভূখ-মিছিলের অবিরাম অভিযান চলতে লাগল। গ্রাম থেকে বুভুক্ষ নরনারী দল বেঁধে শহরের দিকে ধাওয়া করতে লাগল। পুলিশ তাদের ঠেঙ্গিয়ে শহর-ছাড়া করে দিল। আবার চলল তারা গাঁয়ের দিকে, খালি পেটে খালি হাতে। একদা বড় একটা মিছিল এসে ঢুকল শহরের ভেতর চকবাজারের কাছাকাছি। সরকারের সৈন্য-সামন্ত লাগল তার পিছনে–পিছনে নয় সামনে। বাধা দিতে গেল। ফিরে যেতে বলল, যেখান থেকে এসেছে সেখানে। ভূখা মানুষ হুমকি মানে না। সামনের দিকে চলে। ভয় ভীতি হুমকি সবই দেখান হল, কিন্তু ওরা ভ্রুক্ষেপ করে না। অটল। চুয়াল্লিশ ধারার হুকুম অমান্য করলে গ্রেফতার করে জেলে ভরে দেয়া হবে, তাও বলা হল। ভূখা মানুষ বলে তাও ভাল, দুটি ভাত পেটে যাবে। জোর করে তারা সামনের দিকে চলল। বেগতিক দেখে গুলি করার হুকুম দেয়া হল। আর অমনি রাইফেল উঠল সিপাহীর কাঁধে। দুড়ুম দুড়ুম কয়েকবার গুলি ছোঁড়া হল মিছিলের উপর। নিরস্ত্র ভূখা মানুষের উপর। গুলি চলল ভূখা মানুষের পাঁজর-বের হওয়া বুকের উপর–মাথার খুলির উপর। দপদপ পড়ে গেল কয়েকটি নিরীহ প্রাণী। ভাত খেতে এসে গুলি খেয়ে মরল। আর খেতে আসবে না। কোনদিনও না!

শহর গরম। চারদিক থেকে তীব্র প্রতিবাদ আসতে লাগল। সরকার টলমল করে উঠল। অবস্থা সঙ্গীন–পরিস্থিতি গুরুতর। সামাল দেয়া যাবে না। সরকার এটা বুঝতে পারলেন। গভর্ণর তখন হক সাহেব, চেষ্টা করলেন প্রাণপণ, কোন রকমে রক্ষা করা যায় কি না। কিন্তু যাদের দিয়ে কাজ হবে তারাই যদি পালিয়ে যায়, তা হলে কি করে রক্ষা করবেন! খবর পেয়ে করাচীর সব গরম হয়ে উঠল। প্রেসিডেন্ট মীর্যা গর্জে উঠলেন। শেরে বাংলা চমকে উঠলেন। কোন উপায়েই তাঁর দলকে রক্ষা করা চলে না।

বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গুলি-খাওয়া মানুষের লাশগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করছি, এমন সময় খবর এল, লাট সাব আমাকে ডেকেছেন। সারাদিন প্রায় না-খাওয়া অবস্থায়। ঐ অবস্থায়ই গেলাম লাটভবনে। দেখা হতেই বললেন, নাও, এবার সামাল দাও। তোমাকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। হঠাৎ এ প্রস্তাব শুনে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। সহসা মুখে কথা ফুটল না। অনেকক্ষণ পর বললাম, আচ্ছা দেখি চিন্তা করে। আর, সবার সাথে পরামর্শ করাও দরকার। বললেন, তা কর, কিন্তু দায়িত্ব নিতেই হবে।

পরদিন কমিশন করলেন আমাকে, মন্ত্রিত্ব গঠন করার জন্য। রাজি হয়ে গেলাম, কিন্তু চোখ বুজে অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করতেই দেখলাম চার দিক শূন্য। কোথাও যেন প্রাণ নেই, শক্তি নেই। মরুভূমির ধূসর নিস্পন্দ ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। বুকটা কেঁপে উঠল আতঙ্কে। অথচ ফেরবার পথ নেই॥"[৯৫]

চ.

"... পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রধানমন্ত্রী কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার। প্রদেশের গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ ও কেএসপি। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই। আবু হোসেন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিদিনই সভা মিছিল হরতাল হতে শুরু করল। অপরদিকে কোন্দল দেখা দিল কেএসপির কোয়ালিশন সরকারে। আওয়ামী লীগেও বিরোধ দেখা দিল বৈদেশিক নীতি নিয়ে। পাকিস্তানের সংবিধানে অর্থবছর পরিবর্তন করা হলো। নতুন অর্থবছর হলো জুলাই থেকে জুন। অথচ আবু হোসেন সরকার ভয় পাচ্ছিল প্রাদেশিক পরিষদ ডাকতে। বাজেট পাস করতে। কারণ ভয় ছিল পরাজয়ের। অপরদিকে আওয়ামী লীগ দাবি জানাচ্ছিল প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকতে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার আবু হোসেন সরকারকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার নির্দেশ দেয়। পরিবর্তে আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন ৩০ আগস্ট।

আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করায় দেশে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন চালের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিছিল হচ্ছে চালের দাবিতে। ৪ সেপ্টেম্বর এমন একটি মিছিল জিঞ্জিরা থেকে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে চকবাজার হয়ে নতুন ঢাকার দিকে আসছিল। পুলিশ এই মিছিলে গুলি করে। চার জন নিহত হয়। আওয়ামী লীগসহ সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান সারাদেশে এই হত্যার প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করে ৫ সেপ্টেম্বর।

৫ সেপ্টেম্বর আমার হরতালের দায়িত্ব পড়ে হাইকোর্ট এলাকায়। আমার সঙ্গে ছিলেন ফজলুল হক হলের ছাত্র আবদুর রহিম। যিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

আমাদের এলাকা ছিল হাইকোর্ট মোড় থেকে মেডিক্যাল কলেজের মোড় পর্যন্ত। সেদিন এই এলাকায় কতগুলো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ওইদিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ছিল। আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করলেও গভর্নর ফজলুল হক তখনো কাউকে নতুন সরকার গঠন করতে বলেননি। তাই সেদিন পরিষদ অধিবেশন থাকায় অসংখ্য সদস্যকে তৎকালীন পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল) মিলনায়তনে যেতে হচ্ছিল আমাদের এলাকা হয়ে এবং প্রতিটি গাড়ি নিয়েই বিবাদ হচ্ছিল।

এক সময় দেখা গেল, সামরিক বাহিনীর পাহারায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস আসছেন। স্বাভাবিকভাবেই জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। লতিফ বিশ্বাস কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী। আর ঢাকায় গুলি হয়েছে, ভুখা মিছিলের ওপর। তাই জনতার বিক্ষুব্ধ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এ পরিস্থিতিতে আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের গাড়িবহর হাইকোর্টের কাছে এলে আমরা তাঁকে গাড়ি ছেড়ে দিতে বললাম। বললাম, আপনাকে পৌঁছে দেব পরিষদ ভবনে। তিনি আমাদের কথায় রাজি হলেন। হেঁটে চললেন আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু আমরা রমনা গেটের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মিছিল হিংস্র হয়ে উঠল। মিছিল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। ভাবলাম পরিষদ ভবন নয়, লতিফ বিশ্বাসকে বাঁচাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীনিবাসে পৌঁছে দেব। কারণ তাঁকে নিরাপদে পরিষদ ভবন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছিলো না। ইতোমধ্যে কে যেন তার মুখে গোবর মাখিয়ে দিল।

---

[৯৫] আতাউর রহমান খান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী)/ওজারতির দুই বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ২০০০। পৃ. ০৮-১০]

রমনা গেটের উত্তরে মিছিলে গোলযোগ শুরু হলো। বাংলা একাডেমীতে মিছিল পৌছাতে পারল না। সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোনো ভবনে তাঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাংলা একাডেমীর দক্ষিণ পাশে আজকের পুষ্টি ভবনে তাঁকে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু জনতা তখন মারমুখি। আর সঙ্গী তখনকার ছাত্রলীগের সদস্য আজকের জাতীয় পার্টি নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। তাকে বললাম, মোয়াজ্জেম একটা বক্তৃতা দিয়ে মিছিল ফিরিয়ে নাও। সেদিন মোয়াজ্জেমের বক্তৃতা আজো আমার মনে আছে। মোয়াজ্জেম হোসেন বলল, ভাইসব মানুষ দেখে কারা পালায়? - কুকুর। আপনারা কি কুকুরের পিছু ছুটবেন? না, মিছিলে যাবেন আমাদের সঙ্গে?

মিছিল চলে এল আমাদের সঙ্গে। তখনো জানতাম না যে, এর চেয়েও বড়ো সমস্যা অপেক্ষা করছে রমনা গেটে। আবদুস সালাম খান এবং হাশেমুদ্দীন সাহেব তখন গাড়িতে যাচ্ছিলেন পরিষদ ভবনের দিকে। এ দু'জন এক সময় আওয়ামী লীগ করতেন। এরা আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভায় গিয়েছিলেন দল ছেড়ে। তাই এদের বিরুদ্ধে জনতার স্বাভাবিক আক্রোশ ছিল। রমনা গেটের মোড়ে এদের গাড়ি এলে আমি গাড়ি থামালাম। বললাম, নামুন। পৌছে দিচ্ছি পরিষদ ভবনে। গাড়িতে যেতে পারবেন না। তাঁরা গাড়ি থেকে নামতেই মিছিল থেকে এক লোক গিয়ে তাদের মুখে গোবর মাখিয়ে দিল। কোনো মতে তাঁদের নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে এগোলাম। কিছুটা পশ্চিমে গিয়ে তুলে দিলাম ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট ড. মযহারুল হকের বাসায়। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম ভিড় বাড়ছে। জনতা ক্ষিপ্ত হচ্ছে। ফজলুল হক হলের প্রভোস্টের বাসা বাঁচানো দায়। আমি একটি রিকশা নিয়ে পরিষদ ভবনের দিকে গেলাম। ভাবলাম মাওলানা সাহেব বা শেখ সাহেবকে ছাড়া এ জনতা ঠেকানো যাবে না। তাদের একজন প্রয়োজন। নইলে অঘটন ঘটে যেতে পারে।

পরিষদ ভবনে পৌছে তোপের মুখে পড়লাম যেন। সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। পাশে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, পরিষদে আপনার বিরুদ্ধে মোসন আনব। আপনি আমাদের সদস্যদের পরিষদ ভবনে আসতে বাধা দিচ্ছেন। আমি শুধু লতিফ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রকৃত চিত্র হচ্ছে আমি না থাকলে আজ লোকটি রাজপথে নির্ঘাত মারা পড়ত।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে পাস কাটিয়ে গেলাম। পরিষদ ভবনে মওলানা ভাসানীকে পেলাম না। শেখ সাহেবকে বললাম। তিনি মিছিল নিয়ে আমার সঙ্গে এলেন। সেদিন দেখেছিলাম মিছিল নিয়ন্ত্রণের অটুট ক্ষমতা। তিনি আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তরের রাজপথে এসে জনতাকে ধমক দিলেন। বললেন, তোমাদের পরিষদ সদস্যদের আক্রমণ করতে কে বলেছে? কে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়িতে ঢিল মারতে? জনতা টু শব্দটি না করে আস্তে আস্তে সরে গেল। আর ইতোমধ্যে ড. মযহারুল হকের বাসা থেকে আমার কাছে একটি স্লিপ এলো। স্লিপ লিখেছেন হাশেম উদ্দীন আহমদ। তিনি লিখেছেন, তার কাপড়ের অবস্থা বেহাল। বাড়ি থেকে নতুন কাপড় না এলে পরিষদে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি স্লিপটি শেখ সাহেবের হাতে দিলাম। তিনি হেসে স্লিপটি হাতে নিলেন। আমি জানতাম, এ মানুষটিই এ কাজটি করতে পারবেন এবং করবেন।

হরতালের পরে রাতে শুনলাম গভর্নর এ কে ফজলুল হক আবু হোসেন সরকারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন এবং আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেছেন। মনে হলো আমার ছাত্রলীগ ছাড়বার পালা এল। কারণ প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা। ছাত্রলীগের পক্ষে এই মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করা সহজ হবে না। আর আমার পক্ষে আওয়ামী লীগকে অন্ধ সমর্থন দেওয়া সম্ভব হবে না॥"[৯৬]

---

৯৬ নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ [ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ১৩১-১৩৪]

ছ.

"... বাংলাদেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিদ্যমান। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিত্ব রক্ষা করার জন্য হক সাহেব কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে বাংলার গভর্নর হয়ে এসেছেন। প্রায় চল্লিশজনকে মন্ত্রিত্ব ও চাকরি দিয়েও তিনি অধিবেশন ডাকতে সাহস পাচ্ছেন না। খাদ্যাভাব দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ল। সরকারি গুদামে যে সংগৃহীত চাল ছিল, তা-ই তার পার্টির সদস্যদের নিকট দশ টাকা দরে বিক্রি করে দিলেন। আর তাঁরা প্রত্যেকেই সে চাল চার-পাঁচ গুণ বেশি দরে বিক্রি করে অজস্র টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ লোকই ছিলেন। সে জন্য তিনি বুঝতে পারেননি যে তিনি যা করেছেন তার ফলাফল কী হতে পারে।

শেখ মুজিব তার এ অবস্থার পূর্ণ রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করলেন। গ্রামে, শহরে ও শহরতলিতে তাঁর কর্মীদের নিয়ে সরকারের এবং গভর্নর ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য লোকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত থাকলেন। তারপর সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ থেকে খাদ্যের দাবিতে মিছিল বের করার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৫৬ সনের ৪ সেপ্টেম্বর তিনি চকবাজারের দিক থেকে এক বিরাট মিছিল নিয়ে চললেন গভর্নমেন্ট হাউসের দিকে। তার লক্ষ্যস্থল আবু হোসেন সরকারের বাসভবন না হয়ে হক সাহেবের বাসভবন কেন হলো, তা-ই নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল। যারা অন্তর থেকে হক সাহেবের ওপর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তাঁরা এর বিরোধিতা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গের কর্মীরা একমত হলেন না। বিশেষ করে শেখ মুজিব। মুজিবের পরিকল্পনায় আবু হোসেন সরকার খালের 'পুঁটি মাছ'। আর কৃষক পার্টির সত্যিকার রাঘববোয়াল হচ্ছেন হক সাহেব। সুতরাং সেখানেই বিক্ষোভকে কেন্দ্রীভূত করা একমাত্র 'স্ট্র্যাটেজি'।

দরিদ্রের দরদি হক সাহেব হয় খাবার দেবেন, নয় গুলি চালাবেন। দুটোর কোনোটাই তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই হয় তাকে পদত্যাগ করতে হবে, নইলে কৃষক প্রজা সরকার নিজের আদেশেই ভেঙে দিয়ে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিত্ব গঠন করতে বলতে হবে।

চকবাজার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বাধা দিল। কিন্তু বিক্ষোভ তখন চরমে উঠেছে। তাই লাঠি চালনা, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার বিফল হলো। বাধ্য হয়ে পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। বেশ কিছুসংখ্যক লোক আহত হয়। শহরে ছড়িয়ে পড়ে যে বহু লোক নিহত হয়েছে। খাদ্যের অভাবে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভরত মিছিলের ওপর গুলি চালনার জন্য শহরের লোকদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করলেন ৪ তারিখ বিকেলে। ৫ সেপ্টেম্বর সকালে হক সাহেব আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা আতাউর রহমান খান সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কমিশন প্রদান করেন। ৫ তারিখ পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন মওলানা ভাসানী। সভার আরম্ভেই আতাউর রহমান সাহেব কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের নিকট হক সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং কমিশনের কথা জানালেন। তারপর কমিটির সিদ্ধান্ত চাইলেন।

মওলানা সাহেব কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সরকার গঠন করার অনুমতি দেবার কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর প্রথম শর্ত, দুই শ মণ করে চাল প্রতি মহকুমায় সাত দিনের মধ্যেই পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়, সমস্ত মেডিকেল স্কুল তিন মাসের মধ্যে এমবিবিএস কলেজে উন্নীত করতে হবে। আরও এমন সব শর্ত। আতাউর রহমান সাহেব বললেন, এমন শর্তসাপেক্ষ-মন্ত্রিসভা গঠন করা যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু সহজভাবে তাকে বলে দেওয়া ভালো যে তিনি যেন কমিশন পরের দিন ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। যাঁরা মন্ত্রী হবার জন্য প্রার্থী তারা মওলানা সাহেবের সঙ্গে তর্ক করতে রাজি নন। অন্যরা বলছেন যে মওলানা সাহেবের শর্তগুলো ছাড়া মন্ত্রিসভা গঠন করলে তা সাত দিনও টিকবে না। তা ছাড়া ভবিষ্যতেও আর নির্বাচনে জিততে হবে না। অথচ দেখলাম কেউ মওলানা সাহেবকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছেন না তাঁর দাবিগুলো যুক্তিযুক্ত কি না।

আমি নতুন সদস্য, তবু ধীরে ধীরে বললাম যে, দুই শ মণ চাল প্রত্যেক মহকুমায় সাত দিনের মধ্যে পাঠাতে আতাউর রহমান সাহেবের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আসল কথা সরকারি গুদামে দুই শ মণ চাল আছে কি না, সে তো সরকার গঠন না করলে জানার উপায় নেই। তা যদি থাকে তবে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমার মনে হয় সরকারি গুদামে যদি অতটা চাল থাকত তাহলে খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভরত মিছিলের ওপর আবু হোসেন সরকার গুলি চালাত না। সুতরাং এটা তেমন একটা সমস্যা নয়। কারণ, সরকারি গুদামে যদি চাল না থাকে তবে বার্মা থেকে আনতে হবে বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনতে হবে। সে অবস্থায় কোনোক্রমেই সাত দিনের মধ্যে প্রতি মহকুমায় দুই শ মণ চাল পাঠানো সম্ভব হবে না। বার্মা থেকে চাল আনতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই তার ব্যবস্থা করতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চাল আনতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেখানে গিয়ে চাল কিনে জাহাজে স্থানের ব্যবস্থা করে দেড় হাজার মাইল দূরে নিয়ে আসতে এক মাসের বেশি সময়ের প্রয়োজন। আরও মনে রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের আমাদের খুব সুনজরে না দেখাই স্বাভাবিক।

তারপর মেডিকেল স্কুলগুলোকে কলেজে উন্নীত করার ব্যাপারেও কোনো আপত্তি থাকার কারণ নেই। বরং সেটা করাই ভালো। প্রশ্ন হচ্ছে একটা কলেজের জন্য চাই উপযুক্ত অধ্যাপক, অর্থাৎ এমআরসিপি বা এফআরসিএস না হলে এমবিবিএসদের পড়াবে কে আর পরীক্ষাই বা নেবে কে। তা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য চাই মূলধন, তার বেশ কিছুটা আসবে বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে। সেসব তিন মাস এমনকি ছয় মাসের মধ্যে ব্যবস্থা করতে পারলেও নিশ্চয়ই স্কুলগুলোকে কলেজে উন্নীত করার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

এ-রকমই কিছু আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থির হলো যে আতাউর রহমান সাহেব ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভা গঠন করবে। আমার ধারণা হচ্ছে আমাদের দেশে যুক্তির চেয়ে নিজের বা নিজেদের জেদ বজায় রাখার প্রতি ঝোঁক বেশি॥”[৯৭]

জ.

“... এ সময়ে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির আবর্তের মধ্যে পথ হারালেন পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল রাজনীতিক নেতা। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল। প্রাদেশিক আইন পরিষদে কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা আবু হোসেন সরকার নেজামে ইসলামীদের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এ মন্ত্রিসভা টিকেনি। পূর্ব বাংলায় খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। খাদ্যের দাবিতে প্রথম বিক্ষোভ মিছিল হয় ১৯৫৬ সালের ৩ নভেম্বর। বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরা, এপারে মাতুয়াইল, ডেমরা প্রভৃতি অঞ্চল হতে হাজার হাজার লোক কাছারির সম্মুখে সমবেত হয়। শ্লোগান মুখরিত হয় কাছারি প্রাঙ্গণ, পুলিশ লাঠিচার্জ করে। কয়েক ব্যক্তি আহত হন।

আমার দিনপঞ্জিতে লেখা আছে–‘আজ ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬। ভুখা মিছিল এলো নদীর ওপারের এবং মাতুয়াইল অঞ্চলের অনেকগুলো ইউনিয়ন থেকে। কাছারিতে হাজার হাজার লোক জমায়েত হলো। পুলিশ কাছারি বারান্দায় মিছিলকারীদের ওপর লাঠি চালালো। হলো কয়েকজন আহত। সংবাদ পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন এমএলএ, ইয়ার মোহম্মদ খান, মোহাম্মদ খান এমএলএ, আতাউর রহমান খান এমএলএ, আবুল মনসুর আহমদ এবং আমিও ঘটনাস্থলে গেলাম। মিছিলকারীরা ধ্বনি তুলছে; চাল চাই, রেশনিং ব্যবস্থা চাই! গগন পতন মুখরিত।’

অনেকক্ষণ দেন-দরবারের পর ম্যাজিস্ট্রেট ৫০০ মণ চাল ইউনিয়নগুলোকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সন্ধ্যায় মিছিলকারীদের অনেককে সরকারি বাসে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হলো।

---

[৯৭] কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী ॥ [প্রথমা প্রকাশন - অক্টোবর, ২০১৮। পৃ. ৬০-৬২]

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬–'গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করেছেন ভুখা মিছিলের ভয়ে। ইত্তেহাদ অফিসে বসে আছি। বেলা সাড়ে এগারোটা হবে। খবর এলো পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর গুলি ছুঁড়েছে। কাজী ইদরিসকে নিয়ে ঘটনাস্থল চকবাজারে গেলাম। তিনজনকে খুন করেছে পুলিশ। একজনের লাশ পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে স্থানীয় জনসাধারণ। তাঁর কণ্ঠনালি ভেদ করে গুলি চলে গেছে। নিহত ব্যক্তিকে দেখলাম গলির ভেতরে একটা টিনের চালের ঘরে চৌকির নিচে। গরিব গ্রামবাসী যুবক। হালকা-পাতলা চেহারা। তখন রক্ত জমে গেছে। বাড়ি হতে বেরোবার সময় সে কি জানতো আর কখনও সে মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাছে ফিরে যাবে না? তারা হয়তো ভাতের চালের জন্য অপেক্ষা করছিল। চাল পেল না। শবদেহটিও ফিরে পেয়েছিল কি না সন্দেহ।"

'চৌকির ওপরে শুয়ে আছে এক ব্যক্তি। অদ্ভুত ঠাণ্ডা মেজাজ ঢাকার লোকের। মুজিবর রহমান, আতাউর রহমান আসতেই লাশ দিলো ওরা। জনতা সেই লাশ নিয়ে মিছিল করলো। ১৫ হাজারের মিছিল। পথে মিটফোর্ড হাসপাতালে ঢুকে জানলাম, গুলির আঘাতে জখমি কয়েকজন ভর্তি হয়েছে। শেখ মুজিব, ইয়ার মোহাম্মদ খান লাশসহ মিছিলের পুরোভাগে। মিছিল সদরঘাটে পৌঁছতেই আবার গুলি চললো– নিহত হলো আরো একজন এবং কয়েকজন আহত। মানুষ তবু দমে না, মিছিল তবু চলে।'

কিছুদূর এগোতেই ডান দিকে আমার বইয়ের দোকান 'কিতাবিস্তান', ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি দোকানে চলে গেলাম। আমার সঙ্গে এলো ইয়ার মোহাম্মদ খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান। উত্তেজিত জনতা তখন আপন গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। দোকানে বসে আমরা কথা বলছি। বোধ করি পাঁচ মিনিটও যায়নি। এমন সময় গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম। ভিক্টোরিয়া পার্কের প্রান্তসীমায় (বাহাদুর শাহ পার্ক) কাছারি মোড়ে পুলিশ মিছিলের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। বেশ কিছু লোক আহত হলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গ্রেফতার হন অনেকে। সম্ভবত গ্রেফতার এড়ানোর জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দোকানের পাশের একটি সরু গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইয়ার মোহাম্মদও চলে গেলেন। আমি একা বসে রইলাম।

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ আমার দিনপঞ্জিতে লেখা আছে–"গতকাল জনতার মধ্যে অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার ভাব দেখেছি, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ভাব। সোয়ারিঘাটে একটি সাধারণ লোক নদীর ওপার থেকে আগত লোকদের উৎসাহিত করে পাঠাচ্ছিল পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে ঘেরাও ভুখা লোকদের দিকে গুলি চলার পর। সে বলছিল, ভাত চান তবে যাননা এগিয়ে। গুলি চলেছে তো কি হয়েছে। এমনিতে মরতে হবে, তার চেয়ে গুলি খেয়ে মরো। সে নিজেও যাচ্ছিলো। কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না এতে। ভাবছিলাম, যদি কোনো ভালো নেতৃত্ব থাকতো তবে এ জনতা দ্বারা কি না করা যেতো?

গতকাল গভর্নর ফজলুল হক আতাউর রহমান খানকে ডেকেছেন মন্ত্রিসভা গঠন করতে। তার পরামর্শে ১৪৪ ধারা উঠিয়ে নেয়া হলো আজ সকালে। সারাদিন তুমুল বিক্ষোভ মিছিল চললো। আবদুল লতিফ বিশ্বাস, আবদুস সালাম খান হলো অপমানিত। বিকেলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা হলো। শেখ মুজিবও বক্তৃতা করলেন।

আজ জাতীয় পরিষদের উপনির্বাচনে জিতলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আকবর হোসেন।'

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬–'আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেছেন। আজ বিকেল পাঁচটায় আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং শেখ মুজিব, আবুল মনসুর আহমদ, মাহমুদ আলী এবং কফিলউদ্দিন চৌধুরী মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন৷"[৯৮]

---

[৯৮] আবু জাফর শামসুদ্দীন/আত্মস্মৃতি ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০০৫। পৃ. ২৩৬-২৩৭]

ঝ.

"... সাবেক পাকিস্তান আমলে (১৯৫৬ ইং সন) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন এ, কে, ফজলুল হক, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আবু হোসেন সরকার। তখন সারা পূর্ব পাকিস্তানে আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে। মিছিল আর মিছিল, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি। এ গণ আন্দোলনের মুখে আবু হোসেন সরকার টিকতে না পেরে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন। তখন ৯২ ক ধারা জারী হয়। গভর্ণরের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৮/৯/৫৬ ইং ঢাকা ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ১৪৪ ধারা যাতে ভংগ না হয় তার জন্য ঢাকা শহরে কড়াকড়ি ডিউটির ব্যবস্থা করা হয়। এদিক দিয়ে নদীর ঐ পাড়ে (জিঞ্জিরা) বিরোধী দল এলাকার সমস্ত লোককে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে গরু জবাই করে খাইয়ে মিথ্যা কথা বলে হাজার হাজার লোক একত্রিত করে বলেছিল ডি, সি, অফিসে ১০ টাকা ও ১০ সের চাউল দিবে। এই কথা শুনে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে পার করে হাজার হাজার লোক সোয়ারী ঘাটে জমা করে। এর পর সেখান থেকে এক মিছিল বের করে চকবাজারে পৌছে। সেখানে পুলিশ ফোর্স তাদেরকে বাধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা পুলিশের উপর আক্রমন করে, তখন পুলিশ ফোর্স আত্মরক্ষার জন্য কোন উপায়ান্তর না দেখে মিছিলকারীদের উপর গুলী চালায়। এতে চার ব্যক্তি প্রাণ হারায়, কিছু কিছু লোক আহত হয়, পুলিশ সেখান থেকে তিনটি লাশ উদ্ধার করেছিল। আর একটি লাশ ছাদের উপর থাকায় পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। ঐ লাশ নিয়ে অগনিত জনতা সেখান থেকে জোরপূর্বক মিছিল বের করে এবং সদরঘাট অভিমুখে রওয়ানা হয়। তখন একথা শুনে এস, পি, ঢাকা মহসীন সাহেব আমাকে নির্দেশ দিলেন অতিসত্বর দুই গাড়ী ফোর্স নিয়ে সদরঘাট মোড়ে অবস্থান করতে এবং আরও বললেন মিছিলকারীরা যাতে সদরঘাট মোড় পার হতে না পারে এবং ডি, সি, অফিসে পৌছতে না পারে তার জন্য যে কোন উপায়ে তাদের রুখতে হবে।

একথা শুনে আমি সাথে সাথে দুই গাড়ী ফোর্স নিয়ে সদরঘাট মোড়ে পৌছি তখন আমার সাথে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমরা পৌছার পর সংগে সংগে দেখি পশ্চিম দিক হতে, পাটুয়াটুলী হতে অগণিত লোক বাঁশের চাটাইতে মোড়ানো একটি লাশ কাঁধে নিয়ে লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যখনই আমাদের দেখল তখনই আমাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তখন আমি তাদেরকে সাবধানবাণী উচ্চারন করে বলি আমাদের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। তথাপিও তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারপর আমি লাঠি পার্টি দিয়ে লাঠি চার্জ করাই। কিন্তু এতেও কোন ফল না হওয়ায় দেখতে পাই আমার নিষেধ উপেক্ষা করে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে আমাদের দিকে আসছে। এমতাবস্থায় আমি আর কোন উপায়ন্তর না দেখে বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালাবার নির্দেশ দেই। তখন গুলীর আওয়াজে এমন এক বিকট শব্দ হয়েছিল যে, ঢাকার বুকে এই ধরনের আর কোন দিন গুলী ছোঁড়া হয়নি। এই গুলীর আওয়াজে চারদিক একেবারে কম্পিত হয়েছিল। তিন চার হাজার লোক বুড়িগঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং চারদিকের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

আমার এই গুলীর একদিন পরেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের কেবিনেট গঠন করা হয়। আতাউর রহমান মুখ্যমন্ত্রী হলেন এবং বাণিজ্যমন্ত্রী হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে তারা সদরঘাটের গুলির তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। এ কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন জাস্টিস মিঃ সি লাহিড়ী এবং তার সাথে ছিলেন একজন জজ জনাব গোলাম মাওলা। আর কারো নাম আমার মনে নেই। প্রায় তিন মাস তদন্ত চলে, বহু লোক আমাদের এই মামলায় সাক্ষী দেয়।

কে কি বলেছে তা আমি জানিনা। এই কমিশন তদন্ত করেছিলেন সাবেক সংসদ ভবন (মেডিক্যাল কলেজের পাশে বর্তমান শহীদ মিনারের নিকট)। তদন্ত শেষ করে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমার বিরুদ্ধে ৪০

পৃষ্ঠাব্যাপী ৩০২ ধারা সরকারের নিকট দাখিল করে। এতে বিশ বছরের জেল না হয় ফাঁসি দু'টার একটা হবেই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় আমি বেঁচে যাই। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা দখল করার পর কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ক্ষমতার লড়াই। এক পর্যায়ে এ সংসদ ভবনেই হাতাহাতি কিল-ঘুসি শুরু হয়ে যায়। ডিপুটি স্পীকার তার হাতুড়ী দিয়ে বার বার ঘন্টা পিটিয়েও শান্ত করতে পারেনি। একজন সদস্য চেয়ার উঠিয়ে স্পীকারের মাথায় আঘাত করে। সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তখন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে মার্শাল ল জারী করেন। যে রাজপথ একদিন রঙিন হয়েছিল গরীব মানুষের খুনে, তারই পরিণাম ফল এই মার্শাল ল। তারপর মার্শাল ল সরকার সদরঘাট গুলীর নিরপেক্ষ তদন্তের আদেশ দিয়ে তদন্ত শুরু করেন। এই তদন্তে আমাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। তাই আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে এবং আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভাগ্যের জোরে আমি ২০ বছর জেল ও ফাঁসি হতে বেঁচে গেলাম॥"[৯৯]

বারো

"... দুইদিন পর তাঁর লাশ ঢাকায় আসার কথা। করাচী ও লাহোরের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পীড়াপীড়ি করলেন, ওই অঞ্চলে তাকে দাফন করবে, কিন্তু বাংলার মাটি তাকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে আকর্ষণ করল, যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তান হার মেনে যায়।

আসার দিন ভোর থেকেই বিমানঘাটি জনসমুদ্রে পরিণত হল। লক্ষ লক্ষ শোকার্ত হৃদয় অশ্রুর ধারা চোখে নিয়ে দাঁড়ায়ে রইল, তাদের প্রাণের অধিক প্রিয় নেতার শেষ সম্বর্ধনার জন্য। শববাহী বিমান দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে দিগন্ত ফেটে পড়ল।

মিছিল করে শবাধার নেওয়া হল ঘোড়-দৌড়ের ময়দানে। আউটার স্টেডিয়াম, যেখানে শেরে বাংলার জানাযা হয়েছিল, সে স্থান অপ্রশস্ত বলে এই স্থান ঠিক করা হল। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ। লক্ষ প্রাণের হাহাকার ধ্বনি মিশে গেল মোনাজাতের সাথে।

কবরের জায়গা নিয়ে ছোটখাট কোন্দল সৃষ্টি হল। শেরে বাংলার কবরের পাশেই নেতার অন্তিম শয্যা রচনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু অতি উগ্রপন্থী বন্ধুরা এতে আপত্তি করেন। শেরে বাংলার পাশে তিনি কেমন করে থাকবেন? তিনি অশান্ত হয়ে উঠবেন। দূরে - অতিদূরে, নাগালের বাইরে রাখতে হবে তাকে। ফিতা দিয়ে দূরত্ব মেপে প্রায় একশ' হাত দূরে স্থান করা হল। সরকার আপত্তি করেছিল - ভূমির মালিক সরকার। তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

দুইজন নেতা পাশাপাশি থাকবেন, জনগণ এটাই চেয়েছিল। কিন্তু আমরা অনেক বেশী বুঝি। নানা কারণে নানা অবস্থায় জীবনে তাদের বিরোধ হয়েছে - মরণে যদি সে সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে! তা হলে কেলেঙ্কারী হবে না? একজন সজল চোখে আমার হাত ধরে বলল, ভাইজান, কেমন করে নেতা এত কাছে থাকবেন? তার আত্মা কিছুতেই শান্তি পাবে না। নেতার বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য ভক্তবৃন্দের কি আকুল উৎকণ্ঠা।

মানুষের মৃত্যুর পরও রাজনৈতিক জীবনের কোন্দল-কোলাহলের প্রতিধ্বনি পবিত্র আত্মার অসম্মান করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে নেতাকে কবরে রাখা হল। বাংলার জনগণের শেষ সহায়-সম্বল দুইজন গণনেতাকে এমনি করে আমরা মাটি চাপা দিয়ে দিলাম॥"[১০০]

---

[৯৯] এস. ইউ. খান চৌধুরী (অব: পুলিশ সুপার)/অতীত কথা কয় ॥ [লেখক - এপ্রিল, ১৯৯০। পৃ. ১২৫-১২৮]

[১০০] আতাউর রহমান খান (প্রাক্তন চীফ মিনিস্টার) / স্বৈরাচারের দশ বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - নভেম্বর, ১৯৭০ । পৃ: ২৬৮-২৬৯]

তৃতীয় পর্ব

অন্তর্দলীয় কোন্দল : শহীদ সোহরাওয়ার্দী বনাম মওলানা ভাসানী এবং ন্যাপের জন্ম

এক

"... ১৯৫৭ সালের ১৭ তারিখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। জানা গেল, এই সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী এবং সোহরাওয়ার্দী-বিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বামপন্থী প্রগতিবাদী নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বেশকিছু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার যোগদানের সিদ্ধান্ত জানা গেল। আমরা দারুণভাবে উত্তেজিত, উদ্বেলিত সেই সম্মেলনকে ঘিরে। আমি তো আনন্দে দিশাহারা প্রায়। কারণ, এতোদিনে আওয়ামী লীগের হীনমনা ও সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা সুবিধাবাদী রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে একটি যথার্থ সংগ্রামী রাজনৈতিক দল গঠন এবং তার নেতৃত্ব দিতে পারবো আমরা। আমার মতো রাজনৈতিক কর্মীর এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি থাকতে পারে!

কাগমারী সম্মেলনের পর পরই মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারী প্রগতিপন্থী আওয়ামী লীগ কর্মী-সংগঠকদের বিরুদ্ধে সোহরাওয়ার্দী-অনুসারী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা কর্মীদের অসৌজন্যমূলক তৎপরতা বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা অসহনীয় হয়ে দাঁড়ালে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু তার পদত্যাগপত্র পড়ে থাকে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের দপ্তরে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায়। মওলানা ভাসানীর সেই পদত্যাগপত্রটির একটি অংশ ছিল এ রকম : 'কেন্দ্র ও পূর্ব বঙ্গে ক্ষমতার আসনে বসে আওয়ামী লীগের নায়কগণ, বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দী দলের আদর্শ ও একুশ দফা ক্রমাগতভাবে লঙ্ঘন করে চলেছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী দলের মূলনীতির প্রতি ও বহু প্রস্তাবের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেশকে ধীরে ধীরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছেন। কাজেই আমি আর এ দলের সভাপতি পদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চাই না। আগামী ২৫ শে জুলাই থেকে আমি এ দলের সদস্যও থাকতে চাই না।'

১৯৫৭ সালের ৩১ মার্চ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় যুগ্ম সম্পাদক অলি আহাদের বিরুদ্ধে সংগঠন বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ এনে তাকে বহিষ্কার করা হয়। ঐ ঘটনার প্রতিবাদে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খানসহ ৯ জন সদস্য ও কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন। অন্য পদত্যাগকারীরা হচ্ছে : পীর হাবিবুর রহমান, হাতেম আলী খান, অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ

ও আকবর হোসেন আকন্দ। তাঁদের সবাই এমএলএ ছিলেন। ৩১ মে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পদত্যাগ করেন। এর পক্ষকালের মধ্যেই ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকার শাবিস্তান ও গুলিস্তান সিনেমা হলে দলের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী ভাষণ দেন। কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রী অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির ওপর কাউন্সিলরদের ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী তখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কাউন্সিলরদের ভোটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে পড়ে ৫০০ ভোট এবং মওলানা ভাসানী পান মাত্র ৩৫ ভোট। উল্লেখ্য যে, ঐ কাউন্সিলে সোহরাওয়ার্দী অনুসারী লোকেরা ইচ্ছেমতো কাউন্সিলর বানিয়ে তাদের যোগদানের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন।

যে সব দল মওলানা ভাসানীর নতুন দল গঠনের সমর্থনে এগিয়ে আসে সেগুলোর মধ্যে ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক 'পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি', সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জি. এম. সৈয়দের 'আওয়ামী মাহাজ', সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের 'খোদা-ই-খিদমতগার' ও মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন 'আজাদ পাকিস্তান পার্টি'। এই সব আঞ্চলিক দলগুলোর নীতি ও কর্মসূচি ছিল জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল। পাশাপশি ভাসানী আহূত গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন সফল করতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দল হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বাধীন 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' এবং মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব পাকিস্তান-যুব লীগ' এগিয়ে আসে। ১ জুলাই ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে এক কর্মী সভায় ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সভাপতি ও আমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। আমরা ঐ সম্মেলন উপলক্ষে ব্যাপকভাবে তৎপর হই। আগেই বলেছি ঐ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসামান্য উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী-সমর্থক কর্মী-নেতাগণ এবং তাদের পত্রপত্রিকা ঐ গণতান্ত্রিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যাচ্ছিল।

একদিকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা আওয়ামী লীগ কর্মী ও তাদের ভাড়াটে বাহিনীর হামলার আশঙ্কায় সৃষ্ট ভয়-ভীতির পরিবেশে শেষ পর্যন্ত ২৫ জুলাই ঢাকা শহরের রূপমহল সিনেমা হলে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন শুরু হয়। আমরা যারা ঐ সম্মেলনটিকে সফল করার জন্য তৎপর ছিলাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, চৌধুরী হারুন-উর-রশীদ, পীর হাবিবুর রহমান, অলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, আতাউর রহমান, বেগম সেলিনা বানু, মণিকৃষ্ণ সেন, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, আবু জাফর শামসুদ্দীন, হাতেম আলী খান, মোহাম্মদ সুলতান, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ইয়ার মোহাম্মদ খান, ডাঃ আবদুল করিম, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, মাহমুদ আলী, মোখলেসুর রহমান (সিধু ভাই), মীর্জা গোলাম হাফিজ, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সাইদুল হাসান, আবদুস সামাদ আজাদ ও আমি নিজে। অভ্যর্থনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার ওপর যথেষ্ট দায়িত্ব বর্তেছিল। আমি তা সম্পাদনের যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছি।

সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব নেতা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ খান আবদুল গাফফার খান, জি এম সৈয়দ, মিয়া ইফতেখারউদ্দিন, মাহমুদুল হক ওসমানী, আবদুল মজিদ সিন্ধী, আবদুস সামাদ খান আচকজাই, আবরার আবদুল গফুর, গোলাম মোহাম্মদ ঘোরী, হাশিম খান গিলবাই, মাহমুদ আলী কাসুরী, এয়ার কমোডর ঝাঞ্জুয়া প্রমুখ। সম্মেলনে সহস্রাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ইয়ার মোহাম্মদ খান তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা এবং প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা

পররাষ্ট্র নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। পরে সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিভাগপূর্ব কাল থেকে শুরু করে পাকিস্তান অর্জনের পটভূমি, মুসলিম লীগের স্বৈরতন্ত্রী ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শাসন-কার্যক্রম, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক তৎপরতা ও পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয় লাভ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন, প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ ও তার পরিণতিতে পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার সংকট এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়সমূহ পর্যালোচনা করে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এইসঙ্গে তাঁর বক্তৃতা উর্দুতে অনুবাদ করে শোনানো হয়। এরপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত নেতাগণ বক্তৃতা করেন।

তারপর ইয়ার মোহাম্মদ খান নয়া গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তাতে বলা হয়, 'পাকিস্তানের উভয় অংশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল এবং গণতান্ত্রিক নাগরিকদের প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলনে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার পর (১) পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিতকরণ, (২) জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, (৩) নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশের স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সম্মেলন পাকিস্তানবাসীর সেবায় উৎসর্গীকৃত নতুন একটি জাতীয় দল গঠনের প্রস্তাব করছে। এই নতুন দলটির নাম হবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও পাকিস্তানের উভয় অংশে দলটির সাংগঠনিক তৎপরতা শুরুর লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নবগঠিত দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী হলেন নতুন দলের সাধারণ সম্পাদক। দলের পূর্ব পাকিস্তান কমিটিরও সভাপতি হন মওলানা ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক করা হয় পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলীকে ন্যাপ-এর পশ্চিম পাকিস্তান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে খান আবদুল গাফফার খান ও মাহমুদ আলী কাসুরী। ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক কমিটিতে বামপন্থী ও প্রগতিশীল নেতাগণ ছিলেন এবং তাঁদের কেউ কেউ কমিউনিস্ট পার্টির কার্ডধারী ছিলেন। নয়া দলটি জন্ম লাভের পর পর এটিকে 'রুশ-ভারতের দালাল' বলে আখ্যায়িত করেছিল সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা রাজনীতিবিদরা। মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে একই অপবাদ দিতো তারা। তবে তাতে দলের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক বিস্তার-বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি।

... ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে রূপমহল সিনেমা হলে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই আমাদের ওপর রাজনৈতিক শিবির থেকে হামলা চালানো হয়। সেই হামলায় খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া ইফতেখারউদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা ও নবীন সংগঠক আহত হয়েছিলেন। পরে এক সাংগঠনিক সফরে গিয়ে আমি নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় আমাকে একদিন নরসিংদীতে একটি সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছিল। খোদ ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর ওপর হামলা চলেছে বারবার। ট্রেনে, স্টেশনে এবং রাস্তায় তাঁর ওপর ইটের টুকরো নিক্ষেপ করে তাকে অপদস্থ করেছে বিরোধীপক্ষের রাজনীতিবিদগণ। এইসব নোংরা আচরণে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ওপর মওলানা ভাসানী খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। এইসব উস্কানিমূলক ও অরাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার পেছনে খোদ শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ইন্ধন জুগিয়েছিলেন বলে মওলানা ভাসানীর কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য এসেছিল।

পরবর্তীকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাংগঠনিক কাজে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে যাই। সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ন্যাপ-এর অনেকগুলো জনসভায় আমি বক্তৃতা করেছিলাম। সীমান্ত প্রদেশে (তখন সেটি অবশ্য 'প্রদেশ' ছিল না) এবং বেলুচিস্তানের জনসভাগুলোতে শত্রুপক্ষ আমাদের কিছু করতে পারেনি। কিন্তু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিভিন্ন সভাস্থলে তারা ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। সে সব যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপন নির্দেশে করা হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। তবে বিরোধী পক্ষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, আমাদের সভাগুলো ভেঙে পণ্ড করে দিতে পারেনি। স্তব্ধ করতে পারেনি আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম। কারণ আমাদের সঙ্গে প্রচুর সংগ্রামী নেতা, কর্মী ও সংগঠক ছিলেন যারা ঐ ধরনের হামলা মোকাবিলা করে জনসভা অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঐসব অপকর্মে তার ঘনিষ্ঠ অনুসারীদেরও সমর্থন ছিল বলে প্রমাণ পেয়েছি আমরা॥"[১০১]

দুই

"... ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাগমারী সম্মেলন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ সম্পর্কে শাহ আহমদ রেজা লিখিত 'ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম' শীর্ষক বই থেকে আমি কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। শাহ রেজা লিখেছেন, 'সংগঠনের সভাপতি কর্তৃক নিজের দলেরই ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপের বিরোধিতা এবং সমালোচনার উদ্দেশ্যে এ ছিল এক বিরল আয়োজন। এই সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন পাকিস্তানি রাজনীতির দুই বিতর্কিত পুরুষ। একজন দেশ, জনগণ এবং দলের স্বার্থে সংগঠনের নীতি ও কর্মসূচি সমুন্নত রাখতে উচ্চকিত অনমনীয় প্রতিবাদী মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, অন্যজন ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনে দলের ঘোষিত নীতিবিরোধী কার্যক্রমের পক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।'

... সম্মেলনে মওলানা ভাসানী এক ঐতিহাসিক বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তিনি যে কতবড় দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন তা তার কাগমারী সম্মেলনের বক্তব্যের মধ্যদিয়েই ফুটে উঠেছিল। তিনি কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর যেভাবে অর্থনৈতিক শোষণ ও বিজাতীয় শাসন চলছে তাতে এমন একটা দিন আসবে যেদিন পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম বলতে বাধ্য হবে।' এছাড়াও মওলানা ভাসানী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো, বাগদাদ চুক্তি - এগুলোর বিরুদ্ধে তার এবং দলের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এবং বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বা কোনো রকম সামরিক চুক্তির পক্ষে আওয়ামী লীগ অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই তার এ বক্তব্য সম্পর্কে শহীদ সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং এটিকে খুব Exception হিসেবে নিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতার একপর্যায়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়েও গিয়েছিলেন।

... কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। মওলানা ভাসানীর কুশপুত্তলিকা দাহ, ফাঁসির দাবিতে স্মারকলিপি, ভাসানীর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদেশে মাতম সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমি এখন তার বর্ণনা দেব।

---

[১০১] মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ২৬৪-২৬৭/২৭০-২৭১]

এই আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃত্ব। তারা তাদের সমালোচনার সুতীব্র বর্শাফলক মওলানা ভাসানীর দিকে নিক্ষেপ করে বলতে শুরু করে যে, মওলানা ভাসানী কেন্দ্র এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এ ধরনের উক্তি করেছেন। তাদের বক্তব্যে এ কথা প্রকাশ পায় যে, মওলানা ভাসানীর এ সমস্ত বক্তব্য পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার শামিল এবং এর ফলে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভারতীয় নেতাদের নামে তোরণ নির্মাণের জন্য মওলানা ভাসানীকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃত্ব। আমার মনে পড়ে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তৎকালীন সহসভাপতি এটিএম শামসুল হক। সে সভায় মওলানা ভাসানীর ফাঁসির দাবি করে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছিল। এ ছাড়া সেই প্রস্তাবে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

যদিও আওয়ামী লীগের একাংশ এবং ছাত্রলীগ এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ এদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। বিশেষ করে তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন, সেলিনা বানু, ইয়ার মোহাম্মদ খান, অধ্যক্ষ আব্দুল হাই প্রমুখ মওলানা ভাসানীর পক্ষে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীরা মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের সমর্থনে অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের এক শ্রেণির দুষ্কৃতকারী ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। এ নির্যাতনের হাত থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আব্দুস সাত্তারও রেহাই পাননি। ছাত্র ইউনিয়নের অবিসংবাদিত নেতা মরহুম এস এ বারী এ টি'র ওপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার জনপ্রিয়তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন কলেজ থেকে আসা ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে তাকে কোনো নির্যাতন করার সাহস পায়নি দুষ্কৃতকারীরা। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই নয়, বিভিন্ন হলে, বিভিন্ন কলেজে এবং বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের এক শ্রেণির গেস্টাপো বাহিনী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও কয়েকবার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হই।

এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে, বিভিন্ন সামরিক চুক্তির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী-মুজিব গ্রুপ এবং তাদের প্রভাবাধীন ছাত্রলীগ একটি ফ্যাসিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ শত নির্যাতন সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এভাবে রাজনৈতিক আকাশে দেখা দেয় বিভেদ ও অনৈক্যের ঘনঘটা।

এরই একপর্যায়ে ১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদকে পদত্যাগপত্রটি দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। জহুর হোসেন চৌধুরী 'দৈনিক সংবাদে' পদত্যাগপত্রটি ছাপিয়ে দেন। পদত্যাগপত্র সাধারণ সম্পাদকের নিকট না দিয়ে সরাসরি সংবাদপত্রে দেয়ার জন্য সোহরাওয়ার্দী-মুজিব গ্রুপ অলি আহাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা অলি আহাদকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ৯ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদত্যাগ করেন। পদত্যাগী সদস্যরা হলেন - ইয়ার মোহাম্মদ খান,

আব্দুল হাই, আব্দুস সামাদ, সেলিনা বানু, দবির উদ্দিন আহমদ, পীর হাবিবুর রহমান, হাতেম আলী খান, অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন আহমদ ও আকবর হোসেন আখন্দ।

এমনি পরিস্থিতিতে কাগমারী সম্মেলনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আওয়ামী লীগের আর একটি কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল শাবিস্তান সিনেমা হলে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে রাজশাহীতে আমরা কয়েকজন এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলাম। কারণ রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অস্তিত্ব তেমন ছিল না। সুতরাং শাবিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি, কিন্তু আমাদের এই কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। এমনকি অলি আহাদ, গাজিউল হকসহ প্রগতিশীল নেতাদের সেই কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। এ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী যোগদান করেছিলেন। তিনি স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। তাঁর এ বক্তব্যের বিপক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীও বক্তব্য রাখেন। মওলানা ভাসানী তার বক্তব্য শেষ করেই কাউন্সিল অধিবেশন থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেখানেই ছিলেন। ফলে কাউন্সিলে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে যে ভোটাভুটি হয় সে ভোটাভুটিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যের পক্ষে প্রস্তাব পাস হয়; অর্থাৎ মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে প্রস্তাব পাস হয়। সম্মেলন কক্ষে এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে মাত্র ৩০-৩২ জন কাউন্সিলর মওলানা ভাসানীর পক্ষে সমর্থন জানাতে পেরেছিলেন। মওলানা ভাসানী চলে যাওয়ার পর কাউন্সিলে অত্যন্ত উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে এবং একপর্যায়ে দুই দফা সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়।

আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল সভার দ্বিতীয় অধিবেশন পরদিন ১৪ জুন শাবিস্তান সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত প্রায় ২ হাজার ব্যক্তি সোহরাওয়ার্দীর নীতির পক্ষে ভোট দেন। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এই তথ্য পরিবেশন করেন যে, বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা ছিল ২৫ থেকে ৪৫ জনের মতো। আওয়ামী লীগের এই তথাকথিত কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে মওলানা ভাসানীকে পতদ্যাগপত্র প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। অলি আহাদকে বহিষ্কার ও যুবলীগ সদস্যদের আওয়ামী লীগ করার অধিকার নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে শেখ মুজিব ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার আহ্বান জানান এবং এ সম্পর্কে কাউন্সিল কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে রহস্যজনকভাবে বিরত থাকে। কিন্তু রহস্যের এই জট খুলে গেল ১৪ জুন। এ দিন পল্টনের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেয়া হয়েছে।' কী আশ্চর্য! শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার কোনো প্রতিবাদই করেননি। এটাই ইতিহাস! এই ইতিহাসকে আর কতদিন অস্বীকার করা যাবে?

... শাবিস্তানে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন থেকে বেরিয়ে গিয়েই মওলানা ভাসানী সোজা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে ১৩ নম্বর কেবিনে ছিলেন সেখানে চলে যান। কিছুক্ষণ পর আমিও মওলানা ভাসানীর সেই রুমে চলে আসি। মওলানা সাহেব তখনও আমাকে চিনতেন না। কিন্তু আমি ভাসানীর কেবিনে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আমার মনে আছে, মওলানা ভাসানী কয়েকটি টেলিগ্রাম করলেন পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতার কাছে। এদের মধ্যে ছিলেন - খান আব্দুল গাফফার খান, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, আব্দুস সামাদ খান আচকজাই, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, মাহমুদুল হক ওসমানী, আব্দুল মজিদ সিন্ধি, জিএম সৈয়দ প্রমুখ। টেলিগ্রামের ভাষা কী ছিল এখন আমার তা পুরোপুরি মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, মওলানা ভাসানী তাদের পূর্ব পাকিস্তানে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমার মনে হয়, মওলানা ভাসানী তখন স্পষ্টভবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থান

থেকে সম্পূর্ণ সরে গেছে এবং আওয়ামী লীগের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল তাও হারিয়ে গেছে। তাই অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তিনি একটি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের পূর্ব পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা পাকিস্তানে এসেছিলেন। তখন মওলানা ভাসানী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ত্যাগ করে ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাসায় উঠেছিলেন। সেখানেই পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের সাথে তার দেখা হয়। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় গণতান্ত্রিক কনভেনশন আহবান করেন।

... ২৬ জুলাই কনভেনশনের প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে খান আব্দুল গাফফার খান, জিএম সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, আব্দুল মজিদ সিন্ধী, মাহমুদুল হক ওসমানী, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, অলি আহাদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ এবং মাহমুদ আলীসহ নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দ রূপমহল সিনেমা হল থেকে পল্টন ময়দান অভিমুখে মিছিল সহকারে যাত্রা শুরু করলে পথিমধ্যে এক দফা আক্রমণ হয়। আমি এই মিছিলের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু এ হামলা মোকাবিলা করে মিছিল পল্টন ময়দানে গিয়ে সমবেত হয়। পল্টন ময়দানে পূর্ব থেকেই গুণ্ডা বাহিনী প্রস্তুত ও সুসজ্জিত অবস্থায় ছিল। নেতৃবৃন্দ পৌঁছার সাথে সাথেই শুরু হয় ইট পাটকেল বর্ষণ। এরপর পল্টনের এক কোণে যে মসজিদ ছিল সে মসজিদের পাশে কয়েকটি বাঁশ ও বেতের দোকান ছিল। সেখান থেকে বাঁশ নিয়ে আওয়ামী লীগের গেস্টাপো বাহিনী জনসভার মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের আক্রমণের শিকার হন আব্দুল গাফফার খানসহ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। এমনকি মওলানা ভাসানীও অপমানিত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাননি।

আমি মঞ্চের খুব কাছাকাছি ছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, এত কিছু হামলার পরেও অকুতোভয় অলি আহাদ মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বারবার মাইক ঠিক করে বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর পিঠের ওপর বেশ কয়েকবার বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। গোলযোগের একপর্যায়ে পুলিশ শান্তি স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করে। এভাবে পল্টনের ঐতিহাসিক জনসভাকে পণ্ড করে দেয়া হয়। আর এভাবেই মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সরকার তারই দলের সদ্য পদত্যাগী সভাপতি ও তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

... পল্টনের জনসভাকে পণ্ড করে দেয়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের 'গণতান্ত্রিক' আচরণের যে সূচনা হয় তা ছড়িয়ে দেয়া হয় সারাদেশে। এরপর একটি জনসভাও মওলানা ভাসানী ও তার পার্টি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত করতে পারেনি। সর্বত্রই ছিল আওয়ামী ফ্যাসিবাদের উলঙ্গ আক্রমণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক কনভেনশনকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তাকে তারা প্রতিহত করতে পারেনি; বরং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

... সে সময় 'দৈনিক ইত্তেফাক' পল্টনের জনসভা পণ্ড হওয়ার পর দিন ৮ কলাম ব্যানার হেডিং দিয়ে লিখলো 'জনতার রুদ্ররোষে ভাসানীর জনসভা পণ্ড'। এভাবে ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ফ্যাসিবাদী হামলার পাশাপাশি কলমযুদ্ধ শুরু করে দিলেন। তিনি ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানীকে 'লুঙ্গিসর্বস্ব মওলানা' বলে অভিহিত করে তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব সমালোচনা করেন

যাকে শালীন বলা যায় না। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির তিন আদ্যক্ষর NAP কে বিকৃতভাবে আখ্যায়িত করলেন 'নেহেরু এইডেড পার্টি' হিসেবে এবং এভাবে মওলানা ভাসানীকে অপদস্থ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়।

আমি তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমি সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র ছিলাম। সে সময়কার লব্ধ অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। সলিমুল্লাহ হল ছিল তখন ছাত্রলীগ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কেন্দ্র। সে সময় হলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে যদি আমরা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতাম তাহলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আপত্তি উত্থাপন করা হতো এবং বলা হতো রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের বন্ধু নন। সে সময় আমাদের অনেকে খদ্দর পরিধান করতেন। এ কারণেও আমাদের ওপর হামলা করা হতো। সলিমুল্লাহ হলে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সভায় আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল না বলে শুধু সলিমুল্লাহ হল বলাতে আমার ওপর ছাত্রলীগের কর্মীরা হামলা চালায়। আমি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলাম সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনে। আমি নিয়মিত 'দৈনিক সংবাদ' ও 'পাকিস্তান অবজারভার' রাখতাম। 'সংবাদ' কেন পড়ি সে জন্যও রুমে এসে ছাত্রলীগ কর্মীরা আমাকে শাসিয়ে যায়। ছাত্রলীগের সাথে হাত মিলিয়েছিল ছাত্র শক্তিসহ সব প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন। বলা প্রয়োজন যে, তখনও এনএসএফ-এর জন্ম হয়নি। আমরা ডাইনিং হলে খেতে গেলেও তারা আমাদের উদ্দেশে নানা ধরনের বিদ্রুপ এবং অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করত। ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসতে যাব এ সময় তারা চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করত। রাজনৈতিকভাবে তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। তারা বলতে থাকে যে, তারা সবাই পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা যেভাবেই হোক টিকিয়ে রাখতে হবে। এরা সবাই ছিল সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের সমর্থক।

... ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সৃষ্টি হওয়ার পর প্রায় ৩০ জন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এই দলে যোগদান করেছিলেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একটা Balancing factor হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যে দিকে ঝুঁকতো সেদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টির একটা অবস্থান সৃষ্টি হলো। ফলে ক্ষমতার রাজনীতিতে একটা বিরাট পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করল।

... মুজিব ভাসানী থেকে আলাদা হওয়ার পর সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর এই আকাক্ষা বাস্তবায়িত করার জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের কোনো সমঝোতা তিনি হতে দেননি। শহীদ সোহরাওয়ার্দী যাতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে কোনো সমঝোতায় না আসতে পারেন তার জন্য কৌশলে তাকে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। সমঝোতা না করেই তিনি ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করার জন্য বেরিয়ে গেলেন॥"[১০২]

তিন

"... যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন আমি বাবার সঙ্গে টাঙ্গাইলে গিয়েছিলাম ভাসানীর সেই ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন দেখতে। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির নামে গেট হয়েছিল, তার মধ্যে গান্ধী, সুভাষ বসুর নামেও গেট হয়েছিল। এই কারণে সে সময় ভাসানীকে 'ভারতের দালাল'-এই বদনাম নিতে হয়েছিল। কাগমারী সম্মেলনে ভারত থেকে বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক এসেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার স্যান্যাল, রাধারানী দেবী - তাদের বক্তৃতা শুনেছি। তারাশঙ্করের বেশ কিছু উপন্যাস

[১০২] কাজী জাফর আহমদ/আমার রাজনীতির ৬০ বছর : জোয়ার ভাটার কথন ॥ [তরফদার প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। পৃ. ৫২-৫৩/৫৪-৫৭/৬১-৬৩/৬৭-৬৮/৬৯]

এবং প্রবোধ কুমার সান্যালের 'মহা প্রস্থানের পথে' বইটি আগেই পড়া ছিল। তাই তাদের বক্তৃতা শোনার জন্য কৌতূহল ছিল। তারাশঙ্কর খুব আবেগময় ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। তার মধ্যে মওলানা ভাসানীর প্রশংসা ছিল প্রচুর। বক্তৃতা শেষে তার কিছু বই ভাসানীকে উপহার দিলেন। এরপর প্রবোধকুমার স্যান্যাল উঠেছিলেন বক্তৃতা করতে। বক্তৃতার শেষের দিকে তিনি বললেন, 'তারাশঙ্কর মহাশয় তার বই দিয়ে গেছেন। কিন্তু আমি কী দেব? সাত কোটি বাঙ্গালির মতো আমিও নিঃস্ব, রিক্ত। বই এর ইংরেজি বুক। সেই বুকই আমি দিয়ে গেলাম।' রাধারানী দেবী বলেছিলেন, 'ভাষা মা। সেই মায়ের জন্য যে ছেলেরা প্রাণ দেয়, সেই ছেলেদের দেখার জন্য মা ছুটে এসেছে।' কাগমারী সম্মেলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য তখন বুঝিনি। মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন দেশের এক রাজনৈতিক কালপর্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই কাগমারী সম্মেলন থেকেই মওলানা ভাসানী পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ইতিহাসখ্যাত 'আসসালামু ওয়ালাইকুম' এখান থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও পাকিস্তানের বিদেশনীতি নিয়ে যে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছিল, তার প্রকাশ ঘটেছিল এই কাগমারী সম্মেলনে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে সোহরাওয়ার্দী তখন স্বল্প সংখ্যক দলীয় সাংসদ নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের সংবিধানে নাকি শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হয়ে সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের এতদিনকার কর্মসূচির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো ও বাগদাদ প্যাক্ট (পরে নাম হয় সেনটো)-এর প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। এমনকি সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধের সময় তিনি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে তিনি সেই সময় বহুল আলোচিত জিরো থিওরিটি রেখেছিলেন। জিরো প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো। শূন্যের সঙ্গে যত শূন্যই যোগ দেয়া হোক, যোগফল শূন্যই হবে। পাকিস্তান ও এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলো হচ্ছে ক্ষমতা বা অর্থসম্পদের দিক থেকে শূন্য। তাই শক্তি সঞ্চয় করতে হলে পাকিস্তানের মতো শূন্য ক্ষমতার দেশকে বড় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। শূন্যের সঙ্গে বড় অঙ্ক যুক্ত হলে যোগফল বড় অঙ্ক হয়। অতএব, সোহরাওয়ার্দীর থিউরি অনুসারে পাকিস্তানকে হয় আমেরিকার সঙ্গে না হয় রাশিয়া তথা কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে যেতে হবে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর মতে, কমিউনিস্ট শিবিরের সঙ্গে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে থাকতে হবে। এইভাবে তিনি সামরিক চুক্তি ও সামরিক জোটের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। জনসাধারণকে বোকা বানানোর কী অসাধারণ চাতুরী! সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কী নির্লজ্জ দালালি!

সেদিন এইসব বিষয় নিয়ে ছাত্র ও লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ তর্কবিতর্ক হত। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা তৈরি হয়েছিল। কমিউনিস্ট এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক অংশ ভাসানীর পেছনে সমবেত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী বরাবরই পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা রেখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল আপসহীন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জমায়েত হয়েছিল সোহরাওয়ার্দীর পেছনে। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীকে নিজের তৈরি দল ছেড়ে গঠন করতে হল নতুন দল - ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- ন্যাপ। এই ন্যাপে যোগ দিয়েছিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ। গণতান্ত্রিক কনভেনশন থেকে যেদিন ন্যাপ গঠিত হয়েছিল, সেদিন সরকারের ছত্রছায়ায় আওয়ামী লীগ দারুণ গুণ্ডামি করেছিল, উদ্দেশ্য যাতে ভাসানীর নেতৃত্বে দল গঠিত না হতে পারে। গুণ্ডামির কারণে অনেক প্রতিনিধি সম্মেলন স্থলে যেতে পারেননি, অনেকে আহত হয়েছেন। বিকেলে নবগঠিত দলের জনসভা হবার কথা। জনসভাতেও হামলা চালানো হল।

স্রেফ গুণ্ডামি। তারপরও ১৪৪ ধারা জারি করে সভা পণ্ড করে দেয়া হল। স্কুল বয়েসেই সেই সভা, গুণ্ডামি ও সভাপণ্ড সবকিছুই দেখেছি॥"[১০৩]

চার

"... ইতোমধ্যে একদিন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলেন। তিনি সলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে ভাষণ দিলেন তার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে। এ ভাষণে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর বিখ্যাত জিরো শূন্য তত্ত্ব। তিনি বললেন, পাকিস্তানের মতো ছোট রাষ্ট্রগুলো কতগুলো গণিতের শূন্য-এর মতো। এর বাঁ দিকে যে কোনো অংক বসালেই তার অর্থ হয়। যেমন একটি শূন্যের বাঁয়ে এক বসলে ১০ হয়। অন্যথায় শূন্য হয়ে যায়। এই এক অংকটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আমরা শূন্য থেকে যাব এবং এই অংকেই তিনি বাগদাদ চুক্তি, পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং সিটো চুক্তির সমর্থক। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এ ভাষণে পাণ্ডিত্য থাকলেও গ্রহণযোগ্য হলো না সাধারণ ছাত্র সমাজের কাছে। ওই সভায় আমি যাইনি। শুধুমাত্র আমাকে ঢাকা হলে বসে অনেক কথা শুনতে হলো। সকলেই জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল–আর কতদিন ছাত্রলীগে থাকবেন?

তবে এর পরেও ঘটনার বাকি ছিল। একদিন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এম এ বারী এ টি আমার রুমে এলেন। আমাকে বললেন, আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সমাবেশ ডেকেছে ফজলুল হক হল, এসএম হল, ইকবাল হলের ছাত্র সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্টরা। আলোচনার বিষয়বস্তু মওলানা ভাসানীর কথিত বক্তব্য। এই ছাত্র নেতারা নাকি কাগমারীতে মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ইউরোপ সফর শেষে মাওলানা সাহেব মাত্র দেশে ফিরেছেন, তাই নাকি ছাত্র নেতাদের তার কাছে যাওয়া। আলোচনাকালে মওলানা সাহেব নাকি ছাত্রনেতাদের কাছে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের বামপন্থী নেতা বেভানের একটি বক্তব্যের উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনটি নিম্নরূপ -

মওলানা সাহেব আলোচনাকালে বেভানের কাছে কাশ্মীর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মতামত জানতে চান। বেভান নাকি বলেছিলেন, 'মওলানা, কাশ্মীর দিয়ে কী হবে, তোমরা পাকিস্তান চেয়ে ভুল করেছ।' মওলানা সাহেবের কাছে এই কথা শুনে ছাত্রনেতারা মওলানা ভাসানীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বেভান এ কথা বলার পর আপনি কী বললেন?' মওলানা সাহেব নাকি জবাবে বলেছিলেন, 'আমার কী বলার আছে। বেভান ঠিকই তো বলেছে।'

মওলানা সাহেবের কথায় ছাত্রনেতারা ক্ষুব্ধ হয়। তারা ঢাকায় এসে প্রচার শুরু করে যে, মওলানা ভাসানী পাকিস্তান বিদ্বেষী, ভারতীয় এজেন্ট। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে সভা সমাবেশের সিদ্ধান্ত হয়। মওলানা সাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি।

বারী সাহেব বললেন, কাল আমতলার সমাবেশে মারামারি হবে। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর অবস্থান দুই মেরুতে। তাই মওলানা ভাসানীকে হেনস্তা করা প্রয়োজন। নইলে এই তুচ্ছ ঘটনার জন্যে মওলানা সাহেবের কথিত উক্তির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ ডাকার কোনো কারণ ছিল না। আমার কাছে ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে এল। বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ছাত্রলীগের শহীদ সোহরাওয়ার্দী পন্থীরাই এ কাজটি করেছে। সংঘর্ষ অনিবার্য।

... ঘণ্টাখানেক পর সমাবেশ শুরু হলো। লক্ষ করলাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের অনেকে ছাত্র সমাবেশে এসেছে। মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ বরাবর দুর্বল। সভার শুরুতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন সামসুল হক। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি কারো নাম উল্লেখ না করে বললেন, পাকিস্তানে কোনো

---

[১০৩] হায়দার আকবর খান রনো/শতাব্দী পেরিয়ে ॥ [তরফদার প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। পৃ. ২৭-২৯]

মীর জাফরকে সহ্য করা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র কালিদাস বৈদ্য শ্লোগান দিলেন–মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ। প্রতিপক্ষ শ্লোগান দিলো–শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ–হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। সেকালে মারামারিতে বোমা-রাইফেল, পিস্তল ছিল না। তাই সংঘর্ষ হাতাহাতিতে সীমাবদ্ধ থাকল। দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ চলার পর দোতলা থেকে অর্থনীতি বিভাগের ড. নূরুল হুদা ও ইংরেজির টার্নার নিচে নেমে এলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে সবাই শান্ত হয়ে গেল।

সে সময়ের একটি ঘটনা আজও মনে পড়ছে। ছাত্রলীগের সদস্যরা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের ভারতীয় দালাল মনে করত। তাই ওই দিন ছাত্রলীগের এক সদস্য ছাত্র ইউনিয়নের এক সদস্যকে কান ধরে বলতে বাধ্য করছিল–কাশ্মীর পাকিস্তানে চাই। দৃশ্যত সংঘর্ষে ছাত্রলীগ জিতেছিল। বিকেলের দিকে আমতলায় দাঁড়িয়ে ছিল বাংলার ছাত্র সুনীল মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। আমি তখন ক্লান্ত। আলোয়ান ছিঁড়ে গেছে সংঘর্ষ ঠেকাতে। সুনীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম–এরপর কী হবে বলুন? তিনি হেসে বললেন, আমতলায় কোনোদিন সিরাজদ্দৌলা জিততে পারে না। এরপর ছাত্রলীগে ফেরার কথা আর ভাবতে পারছিলাম না।

... মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলেন। কাউন্সিল পূর্ববর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল ৬ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা গেল, এই কমিটির বৈঠকে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি অভিনব প্রস্তাব গৃহীত হলো। প্রস্তাবে বলা হলো কাউন্সিলে সামরিক চুক্তি সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৫ ভোট এবং বিপক্ষে ১ ভোট পড়লো। এই ভোটটি দিয়েছিলেন অলি আহাদ, যিনি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

তবুও গণ্ডগোল দেখা দিল পরবর্তী সময়ে কাগমারীতে আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিয়ে। আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন মওলানা ভাসানী।

এই সম্মেলনে তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। আর তখনই কাগমারী সম্মেলনে এসেছিলেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, সুফিয়া ওয়াদিয়া, প্রবোধ স্যানাল, রাধা রাণী দেবী প্রমুখ। কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম, আব্রাহাম লিংকন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, তিতুমীর, হাকিম আজমল খান, লেনিন, শেক্সপিয়রসহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই তোরণ নির্মাণের ফলে মওলানা ভাসানীকে ভারতীয় এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়। মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে দৈনিক ইত্তেফাক বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ছিল যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করলেও ওয়ার্কিং কমিটিতে সে প্রস্তাব কোনোদিনও গৃহীত হতো না। মওলানা ভাসানী সামরিক চুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন। কিন্তু বৈঠকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হতো না। অধিকাংশ সভায় তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে নিজের ভাষণের পর বৈঠক ত্যাগ করতেন। ফলে তার সমর্থকরা কোনোদিনই বৈঠকে এ ধরনের প্রস্তাব আনতেই সাহস পেতেন না। শেষ পর্যন্ত শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান যে ধরনের প্রস্তাব চাইতেন সে ধরনের প্রস্তাবই গৃহীত হতো। এবারও কাগমারী সম্মেলনে তাই ঘটল। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলো না। কোন্দল চূড়ান্ত রূপ নিলো আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিয়ে। কাগমারী সম্মেলনের পর মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৬ মার্চ লিখিতভাবে পদত্যাগ করলেন।

আওয়ামী লীগ থেকে মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র দেবার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ একশ্রেণির আওয়ামী লীগ নেতার ধারণা হলো যে এর পেছনে আওয়ামী লীগের একশ্রেণির অনুপ্রবেশকারী বামপন্থী নেতারা দায়ী। এঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আছে এবং এদের নেতৃত্ব করছেন সংগঠনের সম্পাদক অলি আহাদ। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ৩০ মার্চ। অলি আহাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হলো। প্রথম বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান। এ অধিবেশনে অলি আহাদ পাল্টা অভিযোগ আনেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করার জন্যে। পরে বৈঠক মুলতুবি হয়ে যায়। বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মনসুর আহমেদ। তিনি নিজে প্রস্তাব উত্থাপন করে অলি আহাদকে বরখাস্ত করেন। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদসহ ৯ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। উপস্থিত ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

মওলানা ভাসানী তখন ফতুল্লা ঘাটে নৌকায় অবস্থান করছিলেন। অলি আহাদসহ বিক্ষুব্ধ সদস্যগণ মওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডেকে সমস্যা মোকাবেলার আহ্বান জানান। মওলানা সাহেব তাতে রাজি হলেন না। তিনি ৩১ মার্চ রোববার নারায়ণগঞ্জে জনসভা করার নির্দেশ দেন। ১৮ ও ১৯ মে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির জন্যে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। মওলানা ভাসানী ১ জুন অনশন শুরু করলে ৩ জুন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। এবার তিন বছরের জন্যে অলি আহাদকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। পদত্যাগী ৯ জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নতুন ৯ জন কো-অপট করা হয়।

মওলানা সাহেব জানান, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা হলেই তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠতে পারে–এই পটভূমিতে ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকার পিকচার প্যালেসে (পাকিস্তান সিনেমা হল) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আহ্বান করা হয়। কাউন্সিলের আলোচ্য বিষয় অলি আহাদকে বহিষ্কার, সামরিক চুক্তি, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, খাদ্যশস্য মূল্যবৃদ্ধি তথা মওলানা ভাসানীর অনশন।

এবারও সেই এক ঘটনা ঘটল। মওলানা সাহেব অধিবেশনের প্রথমে নিজস্ব বক্তব্য দিয়ে হল ত্যাগ করেন। সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতিসহ সবকিছু গৃহীত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের সদস্যরা মওলানা ভাসানীর সমর্থকদের ওপরে হামলা চালায়। মারামারির পর বরিশাল ছাত্রলীগের কতিপয় সদস্য ঢাকা হলে আমার কক্ষে আসে এবং বীরবিক্রমে তাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে থাকে। আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এবার আওয়ামী লীগ দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ১৪ জুন বিকালে পল্টন ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে।

... এরপরে মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগে থাকা আর সম্ভব ছিল না। তিনি ১৩ ও ১৬ জুন দু'দিনব্যাপী ঢাকায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ মওলানা ভাসানী এবার পাকিস্তানভিত্তিক নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেবেন। মওলানা ভাসানীর সিদ্ধান্ত সেদিন আমাকে কৌতূহলী করেছিল, বিস্মিত করেনি। আমি লক্ষ্য করছিলাম, দেশে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হতে যাচ্ছে। এ দলের প্রধান বক্তব্য হবে–সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভাগ হচ্ছে। এমন ঘটনা পৃথিবীতে কমই ঘটেছে। এ কথা সত্য, সেকালের আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ ভাঙনের বিরুদ্ধে ছিল–কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাদের অনুসৃত নীতি এই ভাঙনের অন্যতম কারণ ছিল।

... আমার ধারণা, সেকালে আওয়ামী লীগে ভাঙন এবং ন্যাপ গঠনের জন্যে দায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির অন্ধ অনুসরণ এবং এ কাজটি করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা।

তবে ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাইয়ের একটি ভিন্ন কাহিনীও আছে। সেদিন ন্যাপের সম্মেলন এবং জনসভায় আওয়ামী লীগের গুণ্ডামি ছিল অবিস্মরণীয়। সেদিন পল্টন ময়দানে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্মানিত নেতাদের ওপর গুণ্ডারা হামলা করেছিল। পণ্ড করতে চেয়েছিল রূপমহল হলে তাদের সম্মেলন। আওয়ামী লীগের সে আচরণ ছিল অশোভন, বর্বর এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ আর দৈনিক ইত্তেফাক সেদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে Nehru Aided Party বলে অভিহিত করেছিল।

... তবে ন্যাপ গঠনের পর বিপদ এল অন্যদিকে থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার। বিরোধী দলে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম। এ পরস্থিতিতে ন্যাপ যে দিকে ভোট দেবে সে সরকারই একমাত্র টিকে থাকবে। কারণ আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত অনেক পরিষদ সদস্যই তখন ন্যাপে যোগদান করেছে।

... ১৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। পরিষদে ন্যাপের সদস্য সংখ্যা ৩৩। ন্যাপ ভোটাভুটিতে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার ফলে আতাউর রহমান সরকারের পতন ঘটে ১৯ জুন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন আবু হোসেন সরকার। ২২ জুন আবু হোসেন সরকার অনাস্থা ভোটে পরাজিত হন। ২৫ জুন পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। এই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের জন্যে মূলত দায়ী ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। তারা কখনো আওয়ামী লীগ আবার কখনো কৃষক শ্রমিক পার্টিতে ভোট দিয়ে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্যেই শেষ পর্যন্ত একটির পর একটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে৷"[১০৪]

পাঁচ

"... ১৯৫৬ সালের ১৯ ও ২০শে মে ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে পুনর্বার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়, 'কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের লেজুড় হিসাবে না থাকিয়া আমাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হইতে হইবে এবং আমরা বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র এই নীতি পাকিস্তানকে পৃথিবীর বুকে সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারে।' উক্ত ঘোষণায় আরো বলা হয়, 'বিভিন্ন সামরিক চুক্তি বিশেষত: বাগদাদ চুক্তিতে অংশগ্রহণ করিয়া পাকিস্তান মুসলিম জাহানের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সহানুভূতি হারাইয়াছে। অতএব কাউন্সিল এই প্রকারের সকল সামরিক চুক্তির নিন্দা ও বিরোধীতা করিতেছে।'

১৯৫৪ সালের নির্বাচনোত্তরকালের সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী, হাজী মো: দানেশ, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রমুখ ১৬৭ জন সদস্য নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ সদস্য ২১ এপ্রিল (১৯৫৪) এক যুক্ত বিবৃতিতে কঠোর ভাষায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে নিন্দা করেন ও উহা বাতিলের দাবি জানান।

অথচ ১৯৫৬ সালে ক্ষমতাসীন হইবার পর গদির মোহে পড়িয়া জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি সদস্য প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী নির্দেশিত পথে সংগঠনের বৈদেশিক নীতির বরখেলাফে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি ও সিয়াটো চুক্তির গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হন। ইহার প্রমাণ ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে (টাঙ্গাইল জেলা) অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী কাউন্সিল অধিবেশন। এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও তাহার মন্ত্রীবর্গ, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও তাহার মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যরা সংগঠনের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। সামরিক চুক্তি ও সামরিক জোট বিরোধী নীতির প্রতি তাহাদের এই বিরোধীতা ও অশ্রদ্ধা

[১০৪] নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ [ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ১৪০-১৪২/১৫৩-১৬১]

আমাদের চরমভাবে মর্মাহত করে। ১৯৫৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম ছাত্র সভায় পাক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যভাবে সামরিক চুক্তি ও জোটের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী আগাগোড়াই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রধান সমর্থক এই শেখ মুজিবুর রহমানই আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। একচ্ছত্র নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ রাজধানী ঢাকায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত শান্তি ও মৈত্রীর নামে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি নামক পঁচিশ বৎসর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শুধু তাহাই নয়, তিনিই অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দের ভারত অবস্থানকালে অপ্রকাশ্যে গোপন চুক্তির অনুমোদন দান করিয়া বাংলাদেশকে ভারতের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ইহা ছিল শেখ সাহেবের ১৯৫৬-৫৭-৫৮ সালের ন্যাক্কারজনক ভূমিকারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাঁটি অনুচর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একই পদার্থের তৈরি। ক্ষমতার লোভে দেশ ও জাতিকে বিকাইয়া দিতে তাহারা উভয়ই বিবেকের সামান্যতম দংশনও বোধ করেন নাই।

... কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনের পর বিভেদের মেঘ আকাশে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে। আওয়ামী লীগ দ্রুত দ্বিধাবিভক্তির পথে অগ্রসর হইতে শুরু করে, একাংশ পশ্চিমা শক্তির অন্যতম দোসর প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন জানায় ও অপরাংশ সামরিক চুক্তি বিরোধী ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির প্রবক্তা বৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানীকে সমর্থন দেয়। সংগঠনের নির্ধারিত বক্তব্যের প্রতি দেশবাসী ও কর্মীবাহিনীর সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় জনসভা ও কর্মীসভায় যোগ দিতে শুরু করি। উক্ত কর্মসূচী মোতাবেক ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বারহাট্টা, বৈখরহাটী, নেত্রকোনো ও আটপাড়ায় যথাক্রমে ৬, ৮, ১০ ও ১৭ই মার্চ আওয়ামী লীগ কর্মীসভা ও জনসভায় বক্তৃতা দেই। ১৮ই মার্চ আমি কাগমারীতে (সন্তোষ) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করি। মওলানা ভাসানী সংগঠনের সভাপতি পদ হইতে ইস্তফা দানের সিদ্ধান্ত আমাকে জানান। তিনি আমার কোন যুক্তিই শ্রবণ করিতে রাজী হন নাই। বরং তাঁহার পদত্যাগপত্রটি দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেন। পদত্যাগ পত্রটি নিম্নরূপঃ

জনাব পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী সাহেব,

ঢাকা

আরজ এই যে, আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইবার খুলিতে হইবে, তদুপরি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার লীডার সদস্যদের নিকট আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারামী কাজ বন্ধ করিতে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের উপর ট্যাক্স ধার্য করা জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। ভয়াবহ খাদ্য সংকটেরও কোন প্রতিকার দেখিতেছি না। ২১ দফা দাবির অন্যান্য দফা যাহাতে অর্থব্যয় খুব কমই হইবে তাহাও কার্যকরী করিবার নমুনা না দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিলাম। আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

স্বা-মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

কাগমারী ১৮/৩/৫৭

যদিও আদেশ অনুযায়ী পদত্যাগপত্রটি দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। তবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকেও বিষয়টি জানাই। শেখ সাহেব আমাকে ভুল বুঝিলেন ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় কর্মী ও জনসভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে সংগঠনে গৃহীত সাম্রাজ্যবাদী সামরিক চুক্তি বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহবান জানাইতেছিলাম। তাই মার্কিন অনুচর মন্ত্রীমহল আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সম্পাদক ফজলুর রহমান এবং সফরউদ্দিন শেখ মুজিবুর রহমানেরই প্ররোচনায় আমার বিরুদ্ধে এক দরখাস্ত তাঁহার নিকট দাখিল করেন।

দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগ শেখ সাহেব ৩০শে মার্চ (১৯৫৭) পূর্বপাক আওয়ামী লীগ সদর দফতরে (৫৬ সিম্পসন রোড) আহূত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন। অভিযোগের জবাবে আমি শেখ সাহেবকে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীমন্ডলীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ জনসমক্ষে খন্ডাইতে আহবান জানাই ও আওয়ামী লীগ মন্ত্রীমন্ডলী কর্তৃক সংগঠনের গৃহীত পররাষ্ট্র বিষয়ক ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবির বরখেলাফ নীতি অনুসরণ পরিহার করিতে বলি। সকাল দশ ঘটিকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই সভা মুলতবী রাখা হয়। সন্ধ্যা আট ঘটিকায় পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী সভা আরম্ভ হয়। মজার ব্যাপার এই যে, এই সময়ে অসুস্থতা বিধায় আবুল মনসুর আহমদ দফতরে সরকারি কাজ করিতে যাইতে পারিতেন না এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে সংগঠন হইতে বহিস্কার করিবার জন্য কার্যকরী সংসদের সভায় যোগ দিতে বা সভাপতিত্ব করিতে কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই। গরজ বড় বালাই! চতুর মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ পূর্বাহ্নে সমস্ত রিপোর্ট অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সকাল বেলার অধিবেশনে আনীত অভিযোগ বলে আমাকে বহিষ্কার করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি ভিন্নপথ অবলম্বন করিলেন। দেখা গেল, ক্ষমতাসীনদের নিকট ন্যায়-অন্যায়, প্রাসঙ্গিক-অপ্রসংগিক ও বৈধ-অবৈধ কোন কিছুই বিবেচ্য নয়। পথের কাঁটা দূর করিতেই হইবে সুতরাং 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। বলাই বাহুল্য যে, এইভাবে একপ্রকার গায়ের জোরেই আমাকে সংগঠন হইতে বরখাস্ত করা হইল।

সভায় সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ আমাকে প্রশ্ন করেন, 'মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট দিলেন কেন? কাগমারীতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কি?' প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, উভয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর কাগমারীতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার সভাপতি মওলানা ভাসানীই দিতে পারেন। তজ্জন্য সভা মুলতবী রাখিতে হয় এবং পরবর্তী সভায় মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হয়। প্রশ্নোত্তরে বেকায়দায় পতিত হইলেও নব্য মার্কিনী দোসর মন্ত্রীশ্রেণীর প্রতিনিধি আবুল মনসুর আহমদ হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। হাল ছাড়িলে মার্কিন অনুচর মহলে মর্যাদা ক্ষুন্ন হইবে যে! তাই জওয়াব শুনিবার পর কালবিলম্ব না করিয়া সভাপতির আসন হইতে স্বয়ং আবুল মনসুর আহমদ প্রস্তাব করিলেন যে, So 'Mr Oli Ahad be suspended from the post of the Organising Secretary.' অর্থাৎ অতএব 'মিঃ অলি আহাদকে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হউক।' সর্বমোট ৩৭ জন সদস্যের মধ্যে আমিসহ ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলাম। ৩০ জনের মধ্যে ১৪ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন এবং নিম্নলিখিত ৯ জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন ও প্রতিবাদে পদত্যাগ করেনঃ

১। ইয়ার মোহাম্মদ খান, এম.পি.এ, কোষাধ্যক্ষ, ২। আবদুল হাই, প্রচার সম্পাদক, ৩। জনাব আবদুস সামাদ, এম.পি.এ. শ্রম সম্পাদক, ৪। সেলিনা বানু, এম,পি,এ, মহিলা সম্পাদিকা, ৫। দবিরউদ্দিন আহমদ, এম.পি.এ. সভাপতি, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ, ৬। হাবিবুর রহমান, এম,পি,এ, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ, ৭। হাতেম আলী খান, এম,পি,এ, ৮। অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমদ, এম.পি.এ. ৯। আকবর হোসেন আখন্দ, এম,পি, সভাপতি, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ।

রাত ১-৩০ মিনিটে সভা ভঙ্গ হওয়ার সময় নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুজ্জোহা সভাস্থলে আসিয়া ফতুল্লা ঘাটে মওলানা ভাসানীর নৌকায় অবস্থানের খবর আমাদিগকে জানান। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া মওলানা ভাসানীর সহিত দেখা করিতে ঘাটমুখে রওয়ানা হই। মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা দেন। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্থানের পর মওলানা ভাসানী নারায়ণগঞ্জ নগর আওয়ামী লীগ সভাপতিকে ৩১শে মার্চ রোজ রবিবার জনসভা আহবান করিবার আদেশ দান করেন। আমি অবাক দৃষ্টিতে মওলানা ভাসানীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম। আমি তাঁহাকে ওয়ার্কিং কমিটির সভা পুনঃ আহবান করিতে পরামর্শ দান করি এবং ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে মন্ত্রীমহলের কারাসাজিকে মোকাবেলা করিবার অনুরোধ জানাই। কিন্তু গঠনতান্ত্রিক পথে সমস্যার সমাধান না করিয়া তিনি নারায়ণগঞ্জ জনসভার মাধ্যমে সাংগঠনিক অন্যায় ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ করিবার মত অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় দিলেন। ইহার সারমর্ম হইল, সংগঠনের ঐক্যের পথ পরিহার করিয়া বিভেদের দ্বার উন্মুক্ত করা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইহাই চাহিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহারাই জয়ী হইল। মওলানা ভাসানী সংগঠনের সভাপতি। তিনি স্বয়ং ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করিয়া সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে পারিতেন। কি চমৎকার! বিচারক নিজেই বিচারপ্রার্থী। মওলানা ভাসানী সুস্থ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হইলেন। চরম সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী সবসময় পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। ফলে দেশ, জাতি ও জনতা বঞ্চিত হইয়াছে তাহার সঠিক নেতৃত্বের সুফল হইতে।

... মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ২৫শে জুলাইর সম্মেলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত আরম্ভ হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পাক-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকথার নায়ক সীমান্ত প্রদেশের লালকোর্তা নেতা, সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান, পাঞ্জাবের জননেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন আহমদ, সিন্ধুর জননেতা ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান জি.এম. সৈয়দ, বেলুচিস্তানের ইংরেজ শাসকদের ত্রাস খান আবদুস সামাদ আচাকজাঁই, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী ও অন্যান্য জনবরেণ্য নেতা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাহারা সকলেই ন্যাশনাল পার্টির সদস্য। পশ্চিম পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে এই ন্যাশনাল পার্টির পঁচিশজন সদস্য ছিলেন এবং জি.এম সৈয়দ ছিলেন উক্ত পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা। সম্মেলনকে বানচাল করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে সরকারি শাসনতন্ত্রের প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে চিরাচরিত হীন পন্থায় আওয়ামী লীগ ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী ব্যবহার করে। আওয়ামী লীগের গুন্ডামীতে হতোদ্যম ও নিরুৎসাহিত না হইয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশপ্রেমিক বন্ধুগন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আরও সচেতন এবং আরও সজাগ হন। তাই শত বাঁধা-বিপত্তি ঝড় ও ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনেই গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। এই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থাশীল আওয়ামী লীগ অংশ ও পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল সমবায়ে গঠিত পাকিস্তানব্যাপী জাতীয় রাজনৈতিক দল।

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর তুষ্টি বিধানের তাগিদে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও আতাউর রহমান সরকার পাকিস্তানের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে আহুত জনসভার উদ্যোক্তাদের উপর হিটলারী ঝটিকা বাহিনীকে লেলাইয়া দিয়া পাকিস্তান ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার মহৎ

কর্মটি সমাধা করেন। দেশপ্রেমের এতবড় অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্তে কোন দেশপ্রেমিক পিছু পা হয়? আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান আদর্শ দেশপ্রেমিক বটে। উভয়ের যুগল প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সেইদিন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়! বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার ব্যাপারে তাহাদের উভয়েরই এই জেহাদীপ্রেম নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের কাগমারী (সন্তোষ) অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আত্মগোপনকারী ও নিষিদ্ধ কমউনিস্ট পার্টির গোপন (আন্ডার গ্রাউন্ড) নেতৃত্ব কমরেড মনিসিংহ, কমরেড খোকা রায়, কমরেড আবদুস সালাম ও অন্যান্যকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। দীর্ঘকালের সংগ্রামী রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রজ্ঞা ও ব্যাপক থিওরিটিকাল জ্ঞান বলে তাঁহারা সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহারা তখনকার ত্বরিত গতিতে প্রবাহিত ঘটনাস্রোতের উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। বোধহয় দিব্যচক্ষে অবলোকন করিতেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সংগ্রামী, সমাজ সচেতন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অংশকে সংগঠন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে এবং সেইমতে সামন্তবাদ, উঠতি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুচর শ্রেণীর সুপরিকল্পিত সংকল্প ও চক্রান্ত বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে সুচারুভাবে সমাধা হইতে যাইতেছে। অর্থাৎ গণমুখী আওয়ামী লীগ গণবিরোধী ক্যাম্পে পরিণত হইতেছে। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ড নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তি রোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির (ওভার গ্রাউন্ড) সহযোগী নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত কোন্দল ও প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা, ঘৃণ্য ও পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নানা সন্দেহজনক উচ্চমহল হইতে আনুকূল্য লাভের লোভ, আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট পার্টির সৎ ও অমূল্য পরামর্শদানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। পররাষ্ট্র নীতিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মতভেদ চরম আকার ধারণ করে এবং সর্বশেষে মতভেদ পথভেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই মতভেদ ও পথভেদেরই ফসল।

উল্লেখ্য যে, এই সময়ে মওলানা ভাসানী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ উভয়েই ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসারত ছিলেন। সেইখানেই আপোষ-আলোচনার কিছুটা সূত্রপাত হয়। আবুল মনসুর আহমদ আমার বিরুদ্ধে গৃহীত সাংগঠনিক শাস্তিমূলক বহিষ্কারাদেশের প্রত্যাহার ও পদত্যাগী ৯জন নেতাকে পুনর্বহাল করিবার ব্যাপারে একটি আপোষ-রফা প্রস্তাব দিয়াছিলেন। সাংগঠনিক দিক হইতে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হউক, ইহা কখনও আমার কাম্য ছিল না। মওলানা ভাসানী ইহা জানিতেন। তাই আপোষ-রক্ষা প্রস্তাবাবলী আমার নিকট হইতে সযত্নে লুকাইয়া রাখেন। সেই সময়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রতি এত ক্রোধান্বিত ছিলেন যে, হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া জালেম ইস্কান্দার মীর্জার প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন এবং ইহার ফলে যে কোন সর্বনাশা পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহারই ফলশ্রুতি হইল আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন॥"[১০৫]

ছয়

"... পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তর্বিরোধ জমাট বাঁধিয়া উঠিল। প্রেসিডেন্ট মওলানা ভাসানীর সাথে বাহ্যতঃ ও প্রধানতঃ বৈদেশিক নীতি লইয়া ভিতরে-ভিতরে বিরোধ ছিলই। কাগমারি আওয়ামী লীগ সম্মেলনে এই বিরোধ উপরে ভাসিয়া উঠে। আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার প্রতিও মওলানা সাহেব বিরূপ হইয়া উঠেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলেন যে আতাউর রহমান

---

[১০৫] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ১৭৮-১৭৯/২২৬-২২৯/২৩৩-২৩৪]

মন্ত্রিসভা ২১ দফার খেলাফ কাজ করিতেছেন। কথাটা সত্য ছিল না। কারণ আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা সাধ্যমত ২১ দফার কার্যক্রম কার্যে পরিণত করিয়া চলিতেছিলেন। শাসন-সৌকর্যের ব্যাপারে ও অফিসারদের ট্রেন্সফারাদি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী স্বভাবতঃই এবং ন্যায়তঃই সকল আওয়ামী লীগ কর্মীদের খুশী করিতে পারিতেন না। তাঁরাই মওলানা সাহেবের কানভারি করিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। মওলানা সাহেব স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী মনোভাবের লোক বলিয়া মাত্রাছাড়া ভাবে তিনি নিজের দলের সরকারের নিন্দা করিতেন। তাতে আতাউর রহমান সাহেব ত অসন্তুষ্ট হইতেনই শহীদ সাহেবও হইতেন। একদিকে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও অপর দিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি নেতৃদ্বয়ের মধ্যে এই বিরূপ মনোভাব আমার কাছে অশুভ ও বিপজ্জনক মনে হইত। আমি জোড়াতালি যুক্তি দিয়া এই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিতাম। মওলানা সাহেবকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের এবং জনপ্রিয় নেতৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অনুরোধ করিতাম। অপরপক্ষে দুই প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম যে সরকারের সমালোচনা করিয়া মওলানা সাহেব নিজেকে তথা প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় রাখিয়া ভালই করিতেছেন। বরঞ্চ তলে-তলে সহযোগিতার ভাব রাখিয়া বাইরে-বাইরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান যদি সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করেন, তবে তাতে পরিণামে লাভ আমাদেরই। কারণ আমাদের সরকার কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা। আমাদের ইচ্ছা ও জনগণের দাবি মত সব কাজ সত্যই ত আমরা করিতে পারিতেছি না। এই ব্যাপারে আমি ভারতের কংগ্রেসের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ সঞ্জীব রেড্ডি ও প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুর মধ্যে গোপন সহযোগিতা ও প্রকাশ্য সমালোচনার দৃষ্টান্ত দিতাম।

পক্ষান্তরে এই বিরোধে ইন্ধন যোগাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। পূর্বপাকিস্তানে এই বিরোধে বাতাস করিয়া এক শ একজন এক শ এক উপলক্ষে উহা বাড়াইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কেন্দ্রে যিনি এটা করিতেন, তিনি একাই এক শ। ইনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্যা। এটা আমি বুঝিলাম যেদিন প্রধানমন্ত্রী আমাকে গোপনে বলিলেনঃ প্রেসিডেন্ট মির্যা মওলানা ভাসানীকে অবিলম্বে গেরেফতার করিবার জন্য তাঁর উপর খুবই চাপ দিতেছেন। আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমরা মন্ত্রিত্ব করিব, আর আমাদের সভাপতিকে গেরেফতার করিব আমরাই? লিডার আমার ভাব দেখিয়া বলিলেনঃ 'বিস্ময়ের কিছু নাই। সিক্রেট ফাইল দেখিলে তুমিও প্রেসিডেন্টের সাথে একমত হইবে।' অনেক কথা কাটাকাটি হইল। অবশেষে তিনি আমাকে একটা বিশাল ফাইল গছাইলেন। বলিলেনঃ 'পড়িয়া দেখ'।

পড়িয়া দেখিলাম। খুব মনোযোগ দিয়া। কয়েকদিন লাগিল। সিক্রেট ফাইল ত! নিজ হাতে আয়রন সেফে রাখিতাম। রাত্রে-রাত্রে পড়িতাম। অন্য কেউ দেখিয়া না ফেলে। প্রধানমন্ত্রী টুওরে বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই জিগ্‌গাসা করিবেন। পড়িলামও উকিল যেমন করিয়া নথি-পত্র পড়ে প্রতি লাইনে-লাইনে। সবগুলি ফটোস্টেট কপি। হুবহু অরিজিনাল। পাকিস্তানস্থ ভারতীয় দূতাবাস হইতে যে সব চিঠিপত্র দিল্লিতে ভারত সরকারের বৈদেশিক দফতরে লেখা হইয়াছে, তাতে মওলানা ভাসানীর নাম আছে। লেখকের সাথে ভাসানী সাহেবের কোনও এক লোকের মারফত কোনও একটি কথা হইয়াছে। এই বিশাল ফাইলের তিন-চারটি পত্রে তিনচার বারের বেশি মওলানা সাহেবের নাম নাই। তবু ঐ বিরাট ফাইলকেই মওলানার বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল কেন বলা হইল, আমি তা বুঝিতে পরিলাম না। এই না বুঝার দরুন আরও বেশি করিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম নিশ্চয়ই কিছু আছে, আমিই বোধ হয় বুঝিতে পারিনাই।

লিডার আসিয়াই জিগ্‌গাস করিলেনঃ। 'পড়িয়াছ ত?' আমি 'জি হাঁ' বলিতেই আগ্রহভরে বলিলেনঃ 'কি পাইলে?' বলিলামঃ 'কেন মওলানাকে গেরেফতার করিতে হইবে, তার কোনও কারণ পাইলাম না।' প্রধানমন্ত্রী আশ্চর্য হইলেন। 'বল কি? তবে কি ঐ বিশাল ফাইলটায় কিছু নাই?' যা যা আছে, খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সব বলিলাম। তাঁর পর মন্তব্য করিলাম, 'আমারে দিবার আগে আপনে নিজে কি তবে ওটা পড়েন নাই? আপনি পাইলেন, আমি পাইলাম না। তবে কি সার আমারে ভুল ফাইল দিয়া গেলেন?' প্রধানমন্ত্রী হাসিলেন। ভুল ফাইল দেওয়া হয় নাই। তবে যে প্রেসিডেন্ট বলিলেন, ওটা পড়িলেই সাংঘাতিক সব

কথা পাওয়া যাইবে! মওলানাকে আর এক মুহূর্ত জেলের বাইরে রাখা যায় না। প্রধানমন্ত্রী ও আমি একমত হইলামঃ ওতে কিছু নাই। শুধু ফাইলের সাইজ দিয়াই আমাদেরে কাবু করিবার উদ্দেশ্য ছিল।

লিডার যাই বুঝিয়া থাকুন আমি বুঝিয়াছিলাম, মওলানা ও শহীদ সাহেবের মধ্যে বিরোধ বাঁধাইবার এটা একটা সেকান্দরী কৌশল। আওয়ামী লীগে ভাংগন আনাই তাঁর উদ্দেশ্য। মির্যা শহীদ সাহেবকে দিয়া মওলানাকে আক্রমণ করাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি মওলানাকে দিয়া শহীদ সাহেবকে আক্রমণ করাইবার আয়োজন করিলেন। কোথা দিয়া কি হইল বোঝা গেল না। হঠাৎ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। মওলানা সাহেবের ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত দুই জন আওয়ামী নেতা একজন পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পপতি সহ ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। এইটুকুমাত্র শুনিয়াছিলাম। তার সাথে মওলানার পদত্যাগে কোনও সম্পর্ক থাকে কেমন করিয়া? মওলানার পদত্যাগ যে আওয়ামী লীগের জন্য একটা ক্রাইসিস, আগামী নির্বাচনে যে এর ফল আমাদের জন্য বিষময় হইবে, একা আমি যেমন বুঝিলাম প্রধানমন্ত্রীকেও তেমনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। প্রধানমন্ত্রী যেমন বুঝিলেন, মওলানা সাহেবও তেমনি বুঝিলেন। অবশ্য বিভিন্ন অর্থে। অন্ততঃ তাঁকে তেমনি বুঝান হইল। তাই তিনি আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রাক্কালে পদত্যাগ করিলেন। মওলানা সাহেব নিশ্চয়ই আশা করিয়াছিলেন, কাউন্সিল মিটিং-এ তিনি জিতিবেন। কারণ এই সময়ে ছাত্র-তরুণদের বিপুল মেজরিটি মার্কিন-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আওয়ামী লীগের কাউন্সিলারদেরও অনেকেই সেই মত পোষণ করেন। কাগমারি সম্মিলনীতে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতের মধ্যে আমরা যে আপোস ফর্মুলা বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, সেটার আর দরকার নাই, মওলানার মনে নিশ্চয় এই ধারণা হইয়াছিল।

যে কোনও কারণেই হোক মওলানা সাহেব মনে-মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ফেলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি সুহরাওয়ার্দী-হীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করিবেন, নয় ত তিনি আলাদা পার্টি করিবেন। এটা আমি বুঝিতে পারি হাসপাতালে তাঁর সাথে আলাপ করিয়া। প্রথমতঃ তিনি পদত্যাগের ঘোষণাটি করিয়াছিলেন অস্বাভাবিক নযিরবিহীন গোপনীয়তার সাথে। সহ-কর্মীদের সাথে রাগ করিয়া পদত্যাগ করিলে মানুষ স্বভাবতঃ তাঁদেরে জানাইয়া পদত্যাগ করেন। এ ক্ষেত্রে মওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমানের সাথে এবং কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সাহেবের সাথে বিরোধের জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র সেক্রেটারি মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠাইয়া দিতেন। মুজিবুর রহমান আতাউর রহমানকে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ সাহেবকে জানাইতেন। আওয়ামী লীগ মহলে হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁকে পদত্যাগে বিরত করিতাম। এইটাই মওলানা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বিশ্বস্ত অনুগত মিঃ অলি আহাদকে নির্বাচন করেন। পদত্যাগপত্রটি আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান কাউকে না দেখাইয়া বামপন্থী খবরের কাগযে পৌছাইয়া দিবার ওয়াদা করাইয়া তিনি উহা মিঃ অলি আহাদের হাতে দেন। মিঃ অলি আহাদ সরল বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষরে-অক্ষরে তা পালন করেন। এ কাজে তিনি মওলানা সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য দেখাইয়া থাকিলেও প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ভংগ করিয়াছেন, এই অপরাধে মিঃ অলি আহাদকে সাসপেন্ড করা হয়। প্রতিবাদে ৯ জন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার পদত্যাগ করেন।

এমনি ক্রাইসিস মুখে লইয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক হয় প্রধানতঃ মওলানা সাহেবের ইচ্ছামত। তার আগে-আগে প্রসারিত ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি পার্টির যুক্ত বৈঠক দেওয়া হয়। মওলানা সাহেব তখন হাসপাতালে। আমিও। উভয়ে প্রায় সামনা-সামনি কেবিনে থাকি। প্রধানতঃ আমারই প্রস্তাবে মওলানা সাহেবকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কখনো আমি ও মুজিবুর রহমান একত্রে কখনও আমি একা মওলানা সহেবকে ইস্তফা প্রত্যাহারের অনুরোধ-উপরোধ করি। পদত্যাগী ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বরদের এবং মিঃ অলি আহাদ সম্পর্কে মওলানার

ইচ্ছামতো কাজ হইবে, এ আশ্বাসও আমরা দেই। কিন্তু মওলানা অটল। যা হয় কাউন্সিল মিটিং-এ হইবে, এই তাঁর শেষ কথা। কাউন্সিল মিটিং-এ তিনি জয়লাভ করিবেন, এটা তিনি আশা করিলেও নিশ্চিত ছিলেন না। সেই জন্য আগেই তিনি মিয়া ইফতিখারুদ্দিন ও জি. এম. সৈয়দ প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানী বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ও শহিদ সাহেব কর্তৃক বিতাড়িত সাবেক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি মিঃ মাহমুদুল হক ওসমানীর সাথে গোপন পরামর্শ করিতে থাকেন। এটা আমি জানিতে পারি হাসপাতালের লোকজনের কাছে। ডাক্তারের পরামর্শে আমি রোজ বিকালে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে ঘন্টাখানেক খোলা ময়দানে হাওয়া খাইতাম। একদিন হাসপাতালে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বদ্ধ দরজায় মওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। এটা চলে পর-পর কয়দিন। কাউন্সিল মিটিং-এ ভাসানী সাহেব হারিয়া যান। তবু কাউন্সিল মওলানাকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। মওলানা তদুত্তরে ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপ গঠনে প্রেসিডেন্ট মির্যার হাত ছিল এতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় করাচির শিল্পপতিরা এ কাজে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। অথচ এই সময়েই প্রেসিডেন্ট মির্যা 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন: 'প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দী ও আমি এক সংগে থাকিব। তাঁরমত যোগ্য লোক পাকিস্তানে আর হয় নাই।' মির্যার ঐ উক্তির মধ্যে সবটুকু ভন্ডামি ছিল না। কিছুটা আন্তরিকতা ছিল। তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিশেষতঃ ভাসানীর প্রভাবমুক্ত সুহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী রাখিতে সত্য-সত্যই উদগ্রীব ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ওটা সম্ভব না হওয়ায় তিনি সুহরাওয়ার্দী-বিরোধী হইয়া পড়েন॥"[১০৬]

সাত

"... ১৯৫৭ সনের মার্চ-এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ কাউন্সিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ নীতি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল। তাই ঐ কাউন্সিল বৈঠক বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। সে কাউন্সিল বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিদেশ নীতি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল। তাদের ভাড়াটে লোকজন আওয়ামী লীগ কাউন্সিলরদের ভিতর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশ নীতির পক্ষে নানাভাবে প্রচার চালিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানকে যুক্তিসঙ্গত বলে জাহির করার জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন ইনফরমেশন সার্ভিস (ইউসিস) সোভিয়েত বিরোধী কুৎসাপূর্ণ কয়েকটি চলচ্চিত্র কাগমারীতে প্রকাশ্যে প্রদর্শনের আয়োজনও করেছিল।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের ঐ সব প্রচারের জবাবে কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের বিরুদ্ধে একটি ইস্তাহার ঐ কাউন্সিল বৈঠকের সময় কাগমারীতে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল বৈঠককে কেন্দ্র করে পার্টির সামনে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলিও দেখা গিয়েছিল :

যদি আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল বৈঠক সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে, যদি ঐ কাউন্সিল বৈঠক প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশ নীতি অনুমোদন করে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হবে।

কিন্তু দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে উপরোক্ত দুটি অবস্থার কোনটাই কমিউনিস্ট পার্টি কাম্য বলে মনে করে নাই। অতএব, কর্তব্য কি এটাই ছিল সমস্যা।

সেই অবস্থায় পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কাউন্সিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিদেশ নীতির সরাসরি বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করে '৫৩ সনের শেষে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠকে

---

১০৬ আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ৩৮৩-৩৮৭]

সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার প্রতি পুনরায় সমর্থন জানিয়ে কাগমারী কাউন্সিল বৈঠকে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা রাজনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত হবে।

তখন শোনা গিয়েছিল যে, মওলানা ভাসানী একটি প্রস্তাব আকারে বা বক্তৃতা দান কালে বিদেশ নীতি প্রসঙ্গে এরূপ বক্তব্য ঐ কাউন্সিল বৈঠকে রাখবেন। মওলানা ভাসানী এরূপ প্রস্তাব বা বক্তব্য কাউন্সিল বৈঠকে পেশ করলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার, পার্টির সভ্য ও সমর্থকগণকে সে প্রস্তাব বা বক্তব্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল বৈঠকে বিদেশ নীতি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব বা বক্তব্য পেশ করেন নাই। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিজের স্বার্থেই তাঁর সরকারের বিদেশ নীতির প্রতি তাঁর নিজের দল আওয়ামী লীগের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ নীতির প্রতি আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য সমর্থনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের উপর অনবরত চাপও দিচ্ছিল। তাই কাগমারীর কিছুদিন পরে ১৯৫৭ সনের জুন মাসে ঢাকা নগরীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের আর একটা বৈঠক আহুত হয়েছিল। ঐ কাউন্সিল বৈঠকে মওলানা ভাসানী ও কাউন্সিলের কমিউনিস্ট সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশ নীতি অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশ নীতির প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন দানের পর কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থক-গণের পক্ষে সে দলে থাকা সম্ভবপর ছিল না।

এদিকে, আওয়ামী লীগের ঢাকা কাউন্সিল বৈঠকের পরেই মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে একটি নতুন প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পার্টি এই উদ্যোগ সমর্থন করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁরা নূতন দল গঠনে উৎসাহের সাথে রাজী হয়েছিলেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯৫৭ সনের জুলাই মাসে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে একটি প্রগতিপন্থী কর্মসূচি নিয়ে সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়েছিল। ন্যাপই ছিল প্রথম সারা পাকিস্তান ভিত্তিক প্রগতিপন্থী রাজনৈতিক দল। খান আবদুল গফফার খান, জি, এস, সৈয়দ, মিয়া ইফতিখারউদ্দিন প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত গণতান্ত্রিক নেতৃবর্গ, পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা এবং সেখানকার গণতান্ত্রিক কর্মীমহলের একটি বড় অংশ ন্যাপে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রী দল ন্যাপ মিশে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক প্রকাশ্য কর্মী, বিশেষ করে পার্টির যে সব সভ্য ও সমর্থক আওয়ামী লীগে ছিলেন তারা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাপের মাধ্যমে কাজ করতে শুরু করেছিলেন। বলা বাহুল্য, কমিউনিস্ট পার্টি তখনও বেআইনীই ছিল।

ন্যাপের জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ ন্যাপের বিরুদ্ধে খড়গ হস্ত হয়ে উঠেছিল। ন্যাপ গঠনের জন্য ঢাকাতে যে সম্মেলন হয়েছিল সে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় আওয়ামী লীগের এক শ্রেণীর লোকজন ন্যাপ কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল। তারপরও বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা ন্যাপের সভা শোভাযাত্রার উপর হামলা চালিয়েছিল। তাতে বেশ কিছু ন্যাপ কর্মী আহত হয়েছিলেন।

তখন আওয়ামী লীগের একটি অংশ কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার ঝড় তুলেছিল। সে সময় (১৯৫৬-৫৭ সনে) মার্কিন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরীতে একটি প্রতি-বিপ্লবী অভ্যুত্থান হয়েছিল। সে অভ্যুত্থান দমন করার জন্য হাঙ্গেরীর জানোস কাদার সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য চেয়েছিল। সোভিয়েতের সাহায্যে ঐ প্রতি-বিপ্লবী অভ্যুত্থান দমিত হয়েছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তখন দৈনিক ইত্তেফাকের মতো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে দিনের পর দিন কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসা চালান হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ঐ কুৎসার বিরুদ্ধে

রুখে দাঁড়িয়েছিল। পার্টির পক্ষ থেকে ঐ কুৎসার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন পার্টির বিশিষ্ট কর্মী আলী আকসাদ। বহু প্রামাণ্য দিয়ে হাঙ্গেরীতে মার্কিন ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলে দিয়ে আলী আকসাদ একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে হাঙ্গেরীর প্রকৃত ঘটনাবলী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সে প্রবন্ধ প্রথমে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে পার্টি সে প্রবন্ধটি 'হাঙ্গেরীর রক্তাক্ত ঘটনাবলী' শিরোনামায় একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিল। সে পুস্তিকা পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মহলে সমাদৃত হয়েছিল।

যা হোক, আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে ন্যাপের বিরুদ্ধে ঐ সব গুণ্ডামি ও কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল॥"[১০৭]

আট

"... ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে 'বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের' এক অধিবেশন হয়। তাতে আমাকে মনন সাহিত্যশাখার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যারা এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন, খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারা গেল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন 'বাঙলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য নীতির' পরিপোষক এবং 'পাক-বাঙলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের' স্বীকৃতি দানের বিরোধী। তাছাড়া একথাও শোনা গেল, 'বাঙলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য' এই নীতির জয়ঘোষণার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা নাকি পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ করেছেন। যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের মতামত আগে থেকেই আমার জানা ছিল। তাঁরা শুধু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিভাজ্যতা সম্পর্কে নয়, বাংলাদেশের অবিভাজ্যতা সম্পর্কেও দৃঢ়মত পোষণ করতেন।

যাহোক, এ সম্মেলনে যোগ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে আমার অভিভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, আমার অভিভাষণটি মননশাখায় পঠিত হয়েছিল। সে অভিভাষণের উপসংহারে আমি বলেছিলাম : 'পাকিস্তানী যুগের প্রথম দিকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বৈপ্লবিক সংঘটনের ফলে সাহিত্যের গতিধারা হয়ে পড়ল যেন কিছুটা স্তম্ভিত। ক্রমে শাসন-ব্যবস্থাগত বিশৃঙ্খলা, মোহাজের-সমস্যা, দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসব নানা কারণে এদেশের মানুষের জীবনধারায় নেমে এলো একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। এ অবস্থা সাহিত্যিক মননের অনুকূল নয়। তারপর সুদীর্ঘ সময়েও এই কারণেই এখানে কোনো সাহিতিক্য প্রচেষ্টা দানা বেঁধে উঠতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলে এখানকার সাহিত্যিক সমাজ যে মোটেই হাল ছেড়ে দেন নাই, হালে তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দলের সাহিত্য-সম্মেলন, সাহিত্যিক বৈঠক, তামদ্দুনিক অনুষ্ঠানাদির ভিতর দিয়ে। এতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় আমাদের সাহিত্যিক দুর্যোগ সম্ভবত কেটে যাচ্ছে।'

কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক দুর্যোগ যে কেটে যায় নাই, বরং অধিকতর বেড়ে গিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল পরবর্তী আরেকটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে। সম্ভবত দু' বৎসর পর সে-সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় টাংগাইল জেলার কাগমারীতে। মাওলানা ভাসানী ছিলেন এ-সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা।

বাঙলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য এ-বাণী প্রচারকল্পে এবারও পশ্চিম বাঙলা থেকে পাকা-প্রবীণ সাহিত্যিক আমদানীর চেষ্টা অব্যাহত ছিল। ফলে আমন্ত্রিত হয়ে এ সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ও ছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ উদগীরণে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার কথা এখান থেকেও আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। তাছাড়া, তাঁর সম্পাদিত 'পদাতিক' মাঝে মাঝে এখানেও ছিটকে এসে পড়ত। তাতেও চোখে পড়ত 'নরহন্তা' 'নারী ধর্ষক' 'পশুপ্রকৃতি' পাকিস্তানীদের লোমহর্ষক বর্ণনা।

---

[১০৭] খোকা রায়/সংগ্রামের তিন দশক ॥ [বর্তমান সময় - ২০১০। পৃ. ১১৭-১১৯]

তাছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বাংলা দেশের অবিভাজ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য কিংবা অন্য কোনো কারণে জানি না, সম্মেলন-স্থানের বহির্দেশে অসংখ্যা গেট করেছিলেন, এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলোর নামকরণ হয়েছিল ভারতীয় নেতাদের নামেঃ যেমন গান্ধী-গেট, জওহর-গেট, সুভাস-গেট ইত্যাদি। সম্মেলনের কার্যবিবরণী সম্পর্কে যে-খবর পাওয়া গেছিল, তার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের ভাষণগুলোই ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাতে নাকি দেশভাগের জন্য যথেষ্ট অশ্রুপাত করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, দেশভাগ হলেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য কখনো ভাগ হতে পারে না, হয় নাই - এক সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালী জাতিত্ব কখনো বিভক্ত হতে পারে না ইত্যাদি॥"[১০৮]

নয়

"... During 1954 pre-election hectic days of constant meeting throughout the length and breadth of the country, there were numerous incidents between him and Surwardy centering the possession of the microphone for example. One cardinal principle that both of them were bestowed with was that if Surwardy was the last speaker, Moulana would see, since, in those days, a public meeting had to be finished before Magrib prayer (late evening), that as little time as possible should be spared for Surwardy, and if Moulana was the last speaker, Surwardy would make sure that the sun was securely sheltered in the western horizon, into the vista of invisibility and then leave the microphone, which would allow only a few minutes for the Moulana to speak.

Once, in one such public meeting in Kushtia, the Moulana and Surwardy were the chief speakers. The local leaders' arrangements and sense of priority put the Moulana to address the meeting before Surwardy. The Moulana began to speak in his usual revolutionary manner and cavorting fashion, using his sharp, vituperative tongue. He was filling the ears of his doddering audience with all kinds of garbles, with no indications as to when his speech would end; if at all.

Surwardy, having been quite abreast with such self-same policy, and in no way unsuspecting of the Moulana, began to fume. One could clearly conjure Surwardy's white face turned scarlet with rage, which also indicated that, had he got the opportunity, he would have delved a permanent berth at the worst kind of hell for the Moulana. However, before he had the opportunity to execute such novel intentions, with only five minutes remaining for the Magrib, Surwardy was encouraged to hear the hopeful words from Moulana's glistening lips, 'Aas-salai-malai-kum'; an indication, that he was about a stop his spouting. But alas, the intention of Allah, the merciful, was little different.

Just when the Moulana made the fateful decision to sit down and hand over the charge of the microphone to Surwardy's benefit, an unbeknownst factor interrupted his decision. While in crouch half way to sitting, his ever surveying eyes caught the glimpses of green and still water-hycinth in a nearby swamp! Within a split second he stood up from his bending posture, and without appearing least concerned, resumed his oratorial steam, using his rancorous voice in full blast.

'This 'Kochuripana' you see in the pond, is being criminally wasted by the be-deviled government of Chief Minister Nurul Amin. Had it been used for fertilizer, then it could fetch high fortune to the farmers of East Pakistan. The proper use of the neglected green of East Pakistan could have brought a sum of taka five crores, seventy six lakhs, seventy-three

---

[১০৮] আবুল কালাম শামসুদ্দীন/অতীত দিনের স্মৃতি ॥ [খোশরোজ পাবলিকেশনস - জুন, ২০০১। পৃ. ২৫৯-২৬০]

thousand, nine hundred and forty seven taka, five gonda, three kranti and one teel of net revenue income to the exchequer!'

And some more on this.

As the darkness descended on the earth, devouring the day-light, I found myself useless with Surwardy's movie camera in my hand and, deciding to give up the idea of snapping Surwardy's posture of prerorations, I quietly went up-stage and sat near Surwardy. A puckered expression appeared on Surwardy's face, and as I was pondering about it, Surwardy himself came to my aid.

'Henry, do you know from which source the Moulana had gotten these statistics and data?'

'I know it, sir, but.........'

'For God's sake............' sneered Surwardy.

'Moulana's source usually emanate from himself Sir.' I hazarded rather rashly, to which he laughed: shortly, both anger and amusement on his face.

Although the Moulana's graciousness tangently kept full 180 seconds, before the Magrib prayer for Surwardy to speak in that meeting, still; Surwardy couldn't address the meeting at all!

It so happened that the old wall-clock of the nearby mosque was running exactly three minutes faster, and because of that, the prompt and punctual 'Moazzin' of the Mosque, blasted the loud speaker with his serreted voice, conjuring the faithfuls to join in the prayer. That, without question, certainly signalled the drop of the curtain on Surwardy's face and end of the meeting. Surwardy, extremely baffled, red with rage, had no alternative but to remain content with the hurling of his crisp, under-breath curse reserved for the Moulana only.

'The pig-headed Moulana'. Surwardy salvoed. But, such explicable vituperation must not be taken as the monopoly of Surwardy. He had a partner.

Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani was equally equipped with similar invectives and had the same capacity to jettison them justly or otherwise, to anybody at any time, according to his predilections. If Surwardy had the audacity to constantly call the Moulana pig-headed, the Moulana was not going to give his other cheek to Surwardy; instead, he proved himself a proud Muslim and catapulted his arsenal of invectives right on his face. In one informal meeting at 16, Khaja Dewan Road, when Surwardy used same words for the Moulana, he ended up having his own share of it.

'Tumi Shahid Ekta Shoar, Matal abong Choritroheen.' (You are a pig, a drunkard and characterless).

A lot of the Moulana's other ornations about Surwardy or anybody else or about any bemoaning incident, calling for his episcopacy are, I am afraid, not printable.

Great people not only think alike, they also act alike. The similarity between the Moulana and Surwardy had yet another domain. A little psychic — may be. In most of the public meetings. where the two leaders arrived, together or separately, there were invariably some playful projectiles.

In public meetings, or processions, party workers and the throng of people chanted all kinds of slogans eulogizing, mostly, the leaders personally. In that case, if the eulogy was directed first towards the Moulana, he would sit back and spew a satisfactory smile; occasionally pampering his white-gray beard, enjoying every bit of it. Then, when the time came for the workers and people to chant for Surwardy, it was a disaster.

'Khamosh', be absolutely silent. No one seems to be concerned with the party cause and objectives. No one seems to be remembering Allah and his Rasool. We mustn't indulge in personality-cult politics and give Zindabad to politicians. This way you will ruin the balance and equilibrium of politics. Zindabad should only be chanted for the party — objectives and not for any person."[১০৯]

দশ

"... ১২ সেপ্টেম্বর শহীদ সাহেব শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। মন্ত্রিসভার সদস্য হলো অর্ধেক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর বাকি অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পোর্টফোলিও ভাগ হলো সেভাবে। ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ত এমন সব পোর্টফোলিও যেগুলো সত্যি বলতে প্রাদেশিক সরকারের আওতায় পড়ে। তাই তাদের বিশেষ কিছু করতে হতো না। শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থ প্রভৃতি পোর্টফোলিওর ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের ছিল পূর্ণ অধিকার।

পাঁচ দিন পরে শহীদ সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ব বাংলায় প্রথম আগমন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য কয়েক হাজার লোকের সমাগম হলো ঢাকা বিমানবন্দরে। পরের দিন পল্টন ময়দানে লক্ষাধিক লোকের এক বিরাট সভায় তিনি বক্তৃতা করবেন। মওলানা ভাসানী করবেন সভাপতিত্ব। শহীদ সাহেব তার বক্তৃতায় পাকিস্তানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। জাতীয় সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার বিশেষ সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবেন বলে উল্লেখ করলেন। অবশ্য এ-ও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি যে কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব করছেন, তাতে তাঁর দল আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং বাংলার সব দাবিই তিনি মেটাতে পারবেন, তা মনে করেন না।

তাঁর বক্তৃতার পর মওলানা সাহেব লম্বা বক্তৃতা আরম্ভ করলেন এবং বক্তৃতার মাঝখানে একখানা চামড়ার বেত জনসাধারণের দিকে তুলে ধরে বললেন যে শহীদ সাহেব যদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমাদের একুশ দফানুপাতে কাজ না করেন তাহলে সর্বজন সমক্ষে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কিছু ছোকরার দল খুব হাততালি দিল। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট এটা অত্যন্ত অপমানজনক ও অভদ্রজনোচিত বলে মনে হলো।

সেদিন থেকেই ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া 'রাজনৈতিক মঞ্চে' মওলানা সাহেবকে কঠিন ভাষায় আক্রমণ করতে থাকলেন। আর শেখ মুজিব তার ওপর প্রতিশোধ নিতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানিক মিয়ার সঙ্গে মওলানা সাহেবের আর কোনো দিন মিটমাট হয়নি। শেখ মুজিব রাজনৈতিক কর্মী। সুতরাং মওলানা সাহেবের সঙ্গে মুখে ভাব রাখলেও অন্তরে ছিল তার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা। তারই শেষ পরিণতি ১৯৫৭ সনে আওয়ামী লীগ থেকে মওলানার পদত্যাগ। মওলানা সাহেবের বক্তৃতার সময় শহীদ সাহেবের মুখ লজ্জায়-অপমানে এত রাঙা হয়ে গিয়েছিল যে সেটা কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি দুহাত দিয়ে বারবার মুখ ঢাকছিলেন। মনে হচ্ছিল তা যেন জনসমুদ্রের দৃষ্টি থেকে মুখ লুকাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

---

[১০৯] Iqbal Ansari Khan/The Third Eye : Glimpses of the Politicos \ [UPL - 1991| p. 104-107]

... পরিষদ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সাহেবের ঘরে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভা ডাকা হয়েছে–তার নোটিশও পেলাম।

পরদিন গেলাম আতাউর রহমান সাহেবের বাসায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে। জমিরুদ্দীন সাহেব তখন মুখ্যমন্ত্রীর 'পলিটিক্যাল সেক্রেটারি'। তাঁকে আগেই টেলিফোনে বলে রাখা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর বাসায় গিয়ে দেখি, তাঁর বাড়িতেই আর যা-ই হোক প্রটোকলের বালাই নেই। অনেক লোকই তার ঘরে বসে আছে। যার কাজ আছে সে-ও আছে, আর যার নেই, সে-ও বসে আছে। কেউ আসন ছাড়তে রাজি নয়। ওখানে বসে থাকলে লোকচক্ষে তার গুরুত্ব ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। আর মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, সুতরাং বাইরে তাঁর দলের লোকের কাছে বলার মতো যথেষ্ট উপাদান পায়। জমিরুদ্দীন সাহেবকে বললাম, ব্যাপার কী? এভাবে সরকার চলে নাকি। জমির সাহেব বললেন, এমনি করেই চলছে আজ সাত-আট মাস, যে একবার ঢোকে সে আর বেরোয় না। তাই কাজের থেকে কথা হয় বেশি। আপনি বরং ওপরে গিয়ে ভাবির ওখানে বসুন, খাবার টেবিলেই কথা হবে। রাজনৈতিক সচিবের পরামর্শই গ্রহণ করলাম।

মধ্যাহ্নভোজনের সময়ও হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ ওপরের বারান্দায় বসে ভাবির সঙ্গে কথা বলছি, এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এলেন। খানা লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা হলো। কাগমারীর কাহিনী, মওলানা সাহেবের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক, শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, কিছুই বাদ রাখলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির নোটিশ আমি পেয়েছি কি না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মওলানা সাহেব উপস্থিত থাকবেন কি না। তিনি জানেন না বললেন। আরও বললেন যে মওলানা সাহেব এখন কমিউনিস্ট পার্টির মুঠোয় আছেন। সভায় আসবেন কি না সেটা কতকটা কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্র্যাটেজির ওপর নির্ভর করবে। তাই সঠিক কিছু বলা যায় না। মুজিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিঃসন্দেহে খারাপ। কিন্তু মওলানা সাহেব অনেক সময় সদরি ইস্পাহানি ও ইয়ার মোহাম্মদ খান দ্বারাও প্রভাবান্বিত হন। মনে হলো মওলানা সাহেব ও মুজিবের ঝগড়ার মধ্যে তিনি অনেকটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চান।

... যাক যা বলছিলাম। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত হলাম। মওলানা ভাসানী সাহেব আসেননি। আবুল মনসুর সাহেব অলি আহাদ সাহেবকে প্রশ্ন করলেন যে, অলি আহাদ সাহেব কেন ময়মনসিংহের গাঁয়ে গিয়ে প্রতিটি সভায় শেখ মুজিব এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। অলি আহাদ সাহেব সে কথা অস্বীকার করলেন না। বরং তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু সমর্থন করার চেষ্টা করলেন। আতাউর রহমান সাহেব বললেন যে, অলি আহাদ সাহেব জনগণের সম্মুখে গিয়ে ওই সব অভিযোগ করার পূর্বে দলের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। তর্ক-বিতর্ক চলল কিছুক্ষণ। শেখ মুজিবের দল অলি আহাদ সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করে দল থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করল। ওই প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই অলি আহাদ সাহেব, আবদুস সামাদ (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মন্ত্রী) এবং আরও পাঁচজন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, তাঁদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে সভা ত্যাগ করলেন।

পরের দিন সকালে সংবাদ কাগজে মওলানা ভাসানী সাহেবেরও ইস্তফা এবং বিবৃতি প্রকাশিত হলো। বোঝা গেল এবং পরে জানতেও পারলাম যে অলি আহাদ সাহেব যখন সভায় ছিলেন তখন তাঁর নিকট মওলানা সাহেবের বিবৃতিটি প্রস্তুত ছিল। কার্যনির্বাহী কমিটির বিতর্ক ছিল লোকদেখানো ব্যাপার। আর অলি আহাদ সাহেবের অভিযোগসমূহও আবুল মনসুর সাহেব এবং শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করার পেছনে ছিল কাগমারী সম্মেলনে মওলানা সাহেবের পরাজয়ের প্রতিশোধ তোলার রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি॥"[১১০]

---

১১০ কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী ॥ [প্রথমা প্রকাশন - অক্টোবর, ২০১৮। পৃ. ৬৩-৬৪/১১৪-১১৬]

এগারো

"... বামপন্থী ছাত্র সংগঠন Students Union ভাসানীকে সমর্থন করলে সোরাবর্দী গোষ্ঠী আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন Students League, জামায়েত-ই-ইসলামী এবং মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন পেয়েছিল এবং ভাসানীপন্থীদের নির্মমভাবে আক্রমন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দখলের এই লড়াইয়ে সোরাবর্দীর হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুজিবর রহমান। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবর সেদিন পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির জিম্মাদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর ভাসানীপন্থীদের চিহ্নিত করেছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারতের এজেন্ট বা দালালরূপে।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ভাসানী আওয়ামী লীগসহ এদেশের সকল সংগঠনের প্রগতিশীল অংশকে ঢাকার রূপমহল প্রেক্ষাগৃহে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। মূলতঃ বামপন্থীদের প্রচেষ্টায় এখানে ন্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রশাসনের পরোক্ষ মদদে আওয়ামী লীগের যুবনেতা মুজিবর রহমান সদ্যোজাত ন্যাপের কঠোর বিরোধিতা করেন। এই সময় একদিকে ন্যাপ এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগ, জামায়েত-ই-ইসলামী ও আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। যে মুসলিম লীগ ছিল আওয়ামী লীগের জাতশত্রু তার সঙ্গেও আওয়ামী লীগের সহাবস্থান এই পর্বে লক্ষ্য করা যায় শুধুমাত্র ন্যাপকে ধ্বংস করার প্রয়োজনে। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে আওয়ামী লীগ ঢাকার পল্টন ময়দানে ন্যাপের প্রথম জনসভায় যে আক্রমন চালায় তাতে প্রমাণিত হয় যে, আওয়ামী লীগ প্রশাসনের কাছে অনেক বেশি নিরাপদ দলরুপে বিবেচিত হয় এবং আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে ন্যাপ ভারতের দালাল ও পাকিস্তান ধ্বংসকারী দলে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগ এবং প্রশাসন ন্যাপকে Nehru Aided Party রূপে প্রচার করতে থাকে। বলাবাহুল্য এই পর্বে (১৯৫৪-১৯৫৮) আওয়ামী লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, উপরন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জাতীয়স্বার্থ এবং সংহতি বজায় রাখার জিম্মাদারের ভূমিকা পালন করেছিল৷"[১১১]

বারো

"... ১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কাগমারীতে এক ঐতিহাসিক বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে আলোচিত মূল বিষয়গুলো ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন আর আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ ও যে কোনো সামরিক মৈত্রীবিরোধী পররাষ্ট্রনীতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। তাতে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় পার্টির নেতা ও আওয়ামী লীগের টিকেট থেকে নির্বাচিত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

মওলানা যখন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষাবলম্বন এবং পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ চালানোর অভিযোগ তুলছিলেন তখন সোহরাওয়ার্দী দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন যে, '৯৮ শতাংশ স্বায়ত্ত্বশাসন ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে'। তিনি পাকিস্তান স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি ও কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিমালার পক্ষেও রায় দেন। এই সম্মেলনেই মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণ চালানোর সমালোচনা করে তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'তোমরা যদি পূর্ব পাকিস্তানে তোমাদের শোষণ অব্যাহত রাখতে চাও, যদি তোমরা পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি মেনে না নাও, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কাছে আমার একটাই বক্তব্য আছে - তা হলো - আসসালামুআলাইকুম - তোমরা তোমাদের পথে যাও, আমাদের পথ আমরা বেছে নেব।'

---

[১১১] মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম/আওয়ামী লীগ : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠকে রূপান্তর (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অভিসন্দর্ভ) ॥ [উদার আকাশ, চব্বিশ পরগণা - জানুয়ারি, ২০১৩। পৃ. ৭৪]

তাৎক্ষণিকভাবে মওলানাকে একজন কমিউনিস্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ও সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকাগুলোতে মওলানার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে জাতীয় রাজনীতি থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রে অবস্থানরত তার সরকার এই কাজে সক্রিয় অবদান রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সভায় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সমর্থকরা মওলানার প্রতি সমর্থন প্রদানকারী বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে। এই ক্যাম্পাস যুদ্ধে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীসহ অন্যান্য বামপন্থী দলের সদস্যরা ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগ দেয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করে বামপন্থী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ নেয়। তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, পাকিস্তানবিরোধী ও ভারতের দালাল হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এতে করে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনবাদীরা মওলানা এবং সোহরাওয়ার্দীর পক্ষাবলম্বন করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর ডান হাত হিসেবে তার সকল কাজ ও ধারণার প্রতি সমর্থন জানিয়ে শেষোক্ত পক্ষে অবস্থান নেন। এভাবে সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগের মূল অংশ পাকিস্তানের 'জাতীয় সংহতির রক্ষক' হিসেবে চিহ্নিত হন।

এর ফলে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানী নির্বাহী কমিটির অপর আট জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের প্রগতিশীল মনোভাবাপন্নদের এক প্লাটফর্মে সমবেত করার মানসে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন। সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব মওলানা এবং বাম শক্তির ক্ষমতা ভুলুণ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তারা সব রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যাতে করে নতুন রাজনৈতিক দলটি ভালোভাবে কাজ শুরু করতে না পারে।

এ অবস্থায় মওলানা ভাসানী ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই সকল প্রগতিশীল শক্তির সমন্বয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলে সেই সম্মেলন হলের বাইরে থেকে আওয়ামী লীগের সংগঠিত হামলার সম্মুখীন হয়। শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ আদেশে তার সহযোগিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো থেকে বাসভর্তি ইট, পঁচা ডিম ও হকিস্টিকধারী ছাত্র জোগাড় করে সম্মেলনে আক্রমণ চালান।

তখন কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় স্থানেই ছিল আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী লীগ পুলিশ ও আওয়ামী লীগের বিক্ষোভকারীরা সমবেতভাবে মওলানা ভাসানীর 'রাষ্ট্রবিরোধী সম্মেলনে' হামলা চালায়। তাদের মতে, মওলানা 'পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার' লক্ষ্যে সেই পার্টি গঠন করতে যাচ্ছিলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর ইষ্টক বর্ষণ ও পঁচা ডিম নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করে বিক্ষোভকারীদের হামলা চালানোর সুযোগ দেয়। পরের দিন নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পুলিশ তাতে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেনি॥"[১১২]

তেরো

" ... নবগঠিত ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)-এর পল্টনে প্রকাশ্য জনসভায় (আওয়ামী লীগের) জনৈক ছাত্র মোশাররফের নেতৃত্বে ঢাকার রাজনীতিতে প্রথম বোমাবর্ষণের ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুর মধ্য দিয়ে তখন আমরা পার হচ্ছি। এই মোশাররফই পরবর্তীকালে ব্যবসায় অবতীর্ণ হন এবং বর্তমানে সম্ভবত: কোটিপতি হয়েছেন। পুরোন বন্ধু, বর্তমানে নব ধনপতি মোশাররফের মতে সে আমলে রাজনৈতিক দলেও গুন্ডা আমদানী করে মারপিট করা হত। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ না করলে স্তব্ধ করা যেত না॥" [১১৩]

---

[১১২] মওদুদ আহমদ/বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ॥ [ইউপিএল - ২০০৩। পৃ. ৪৮-৪৯]
[১১৩] ফয়েজ আহমদ/মধ্যরাতের অশ্বারোহী ॥ [ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ - ডিসেম্বর, ১৯৮২। পৃ. ১৬]

চৌদ্দ

"... কোয়ালিশন সরকার। আমাদের সংখ্যাগুরুত্ব নির্ভর কয়েকটি দলের সমর্থনের উপর। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কর্মপন্থা ও নীতি ছিল। তা নিয়ে সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক। তবে সেগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও কোন্দল বিভিন্ন দলের সদস্যের মনে বিষম আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমাদের কোন্দল যে বেশির ভাগই ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি-ভিত্তিক তা তারা বুঝতে পারে। ভাবে, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় দেখা যাক। আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ে। ভাবে বেশিদিন এ জোট টিকবে না।

আওয়ামী লীগে ভাঙন শুরু হয়ে গেল। এ ভাঙন নীতির সংঘর্ষে নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে যারা বের হয়ে যায়, তারা নীতির গৎ আওড়ায়, কিন্তু আসলে নীতি বলতে তাদের কিছু ছিল না। তারপর আদর্শের সংঘাতও একেবারে ছিল না তা বলা যায় না। সেটা অবশ্য গোড়া থেকেই ছিল। কাজেই ভাঙন যে একদিন লাগবেই তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুমান করেছিলেন, কারণ বিভেদের বীজ গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠানের মাটিতে বোনা হয়েছিল। আদর্শের সংঘাতও লেগেই ছিল। ব্যক্তিগত মতামতের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠানের আদর্শের উপর স্থান দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞব্যক্তিরা শুরুতেই বললেন, এ অবস্থায় এক সঙ্গে বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

মওলানা ভাসানী গোড়া থেকেই অনেক নেতার কার্যকলাপ গভীর সন্দেহের চোখে দেখেছেন। আওয়ামী লীগ লক্ষ্যভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হয়ে যাচ্ছে এ অভিযোগ তিনি বরাবর করেছেন। সমস্ত অভিযোগ ছাড়িয়ে গেল বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ। মওলানার নিজস্ব মতবাদ ছিল–তা তিনি কোন অবস্থায়ই পরিবর্তন করতে রাজি নন। মরে গেলেও আমার মত বদলাতে পারব না–ঘোষণা করতেন প্রায়ই।

প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রস্তাব ছিলঃ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি; কারও সাথে আমাদের বিবাদ নেই–সবার সাথে বন্ধুত্ব। কোন সামরিক জোটে আমরা শরীক হব না। সামরিক জোটের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ এতে পাকিস্তানের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব হবে। এমন শর্ত আছে যার ফলে পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। অবশ্য তখন পর্যন্ত শর্ত কেউ দেখেনি। পাকিস্তানের পার্লামেন্ট কায়েম হবার পর আমাদের প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। সব চুক্তির নকল পার্লামেন্টে পেশ করা হবে। গণ-প্রতিনিধিরা যদি মনে করেন, চুক্তির শর্তসমূহ আমাদের পক্ষে ক্ষতিজনক তাহলে চুক্তি বাতিল করা হবে। কাগমারী সম্মেলনের সময় কার্যকরী সংসদের এক সভা হয়। এই প্রশ্ন সেখানে উঠে। মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত ছিলেন। সারা রাত আলোচনার পর পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার পার্লামেন্টের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এর পর পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক চুক্তি বিশদভাবে আলোচিত হয়ে গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী (সোহরাওয়ার্দী) এর আগে থেকেই পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক-চুক্তি, বিশেষ করে বাগদাদ চুক্তির সমর্থনে দেশ-বিদেশে সর্বত্রই বক্তৃতা করে এসেছেন। পাকিস্তানের নাম বিশ্বদরবারে একদম নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। তিনি উল্কার মতো প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দিকে ছুটে চললেন। তার ফলে দুনিয়ার সমস্ত দেশ পাকিস্তানকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করল। পাকিস্তান স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশ, প্রচুর সম্ভাবনায়, এ কথা প্রথম বারের মত তারা বুঝতে শুরু করল।

এদিকে মওলানা ভাসানী বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনের মতামত গ্রহণ করার দাবি জানালেন। দুই দিন অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হল। দুই দিনই পররাষ্ট্র নীতির সমর্থনে বিপুল সংখ্যক সদস্য ভোট দিল। মওলানার পক্ষে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ আর অন্য দিকে প্রায় আটশ। ধারণা করেছিলাম, মওলানা সাহেব এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করবেন না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তিনি এই পরিষ্কার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর প্রচারণা করবেন না। তাঁর নিজস্ব মত যতই বলিষ্ঠ বা নির্ভুল হোক না কেন। কিন্তু তা করেননি! তিনি মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়েন এবং তার পরই নতুন দল গঠন করেন।

... দিন যায়। এরি মধ্যে কার্যকরী-সংসদের এক বৈঠকে কোন এক সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায়, নয়জন সদস্য ইস্তফাপত্র দাখিল করে। নয়জন সদস্য ছেড়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগে ভাঙন লাগল। এই সব সদস্য মওলানাকে ঘিরে নতুন ঘর বাঁধবার চেষ্টায় বাঁশখুঁটি যোগাড় শুরু করলেন। মওলানা ত আগেই বিক্ষুব্ধ। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে। এই নয় ব্যক্তির দলত্যাগ তাকে আরও জোরদার করে তুলল। তিনি নতুন দল সৃষ্টির চিন্তা করতে লাগলেন। অবশ্য আগে হরদম বলতেন–আওয়ামী লীগ আমার শেষ রাজনৈতিক দল। ঝগড়া করি আর যাই করি, দল আমি ছাড়তে পারব না। আর যেদিন আওয়ামী লীগ ছাড়ব সেদিন থেকে রাজনীতিই ছেড়ে দেব। শহীদকে আমি কোন অবস্থায়ই ছাড়তে পারি না। একদিন সে নিশ্চয়ই আমার পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদকে ছাড়লেন, আওয়ামী লীগ ছাড়লেন, কিন্তু রাজনীতি ছাড়েননি।

পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন প্রগতিবাদী হোমরাচোমরা নেতৃবৃন্দকে দাওয়াৎ করলেন ঢাকায় আসার জন্য। এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। দুই দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করল। মওলানা তাঁর সভাপতি হলেন। দলত্যাগী আওয়ামী লীগ সদস্য, গণতন্ত্রী দলের দু'তিনজন ছাড়া আরও দলছাড়া দু'চারজন সদস্য নিয়ে এই দল গঠন করা হয়। পরিষদের জন তিরিশ সদস্য এই নতুন দলভুক্ত হলেন। এই সম্মেলন ও তাদের আহুত জনসভায় তাদের সাথে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। ছোট খাট মারামারি, গুণ্ডামী ইত্যাদি। পশ্চিম পাকিস্তানের দু'-একজন নেতার গায়ের উপর দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র উঠা-নামা করে। ঢাকার শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

... আটান্ন সনের জুন মাসে আবার পরিষদ অধিবেশন। তিন মাসের বাজেটের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে জুনের শেষে। কাজেই বাকি বছরের বাজেট পাস করিয়ে নিতে হবে। বিরোধী দলের তোরজোড় খুব বেড়ে গেল।

এর আগে করাচী গিয়েছিলাম। নেতাকে অনুরোধ করে এসেছিলাম পরিষদ অধিবেশনের কয়েক দিন আগে ঢাকা আসতে। ঐ সময় তার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। কোয়ালিশনের বিভিন্ন দলের আচরণ, নিজেদের দলের সদস্যদের দল ত্যাগের হিড়িক দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সর্বোপরি, ন্যাপের ব্যবহার অত্যন্ত অনির্দিষ্ট।

নেতা এলেন অধিবেশনের কয়েকদিন আগে। ন্যাপ-নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করেন। হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই, শুনলাম নেতা চলে গেছেন ময়মনসিংহ–জনসভা করতে। এটা জনসভার সময় নয় আর কোন কারণও ছিল না ঠিক এই সময়ই জনসভা করার। তারপর মুন্সিগঞ্জ, রায়পুরা ইত্যাদি। অর্থাৎ ঢাকা তিনি অবস্থান করতে পারছেন না। বোঝা গেল তাকে দূরে রাখা হচ্ছে।

এদিকে ন্যাপের নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। রোজই আসে, ফিরে যায়। তারা নেতার সাথে কথা বলতে চায়, আমার সাথে নয়। তিনিই তাদের দাবি দাওয়া সম্বন্ধে আশ্বাস দিলে তারা আমাদের সাথে থাকবে। তাদের দাবি, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বৈদেশিক নীতি, এক ইউনিট বাতিল, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন, একুশ দফার অন্তত চৌদ্দ দফা দাবি পূরণ, অতি সত্বর যুক্ত-নির্বাচনের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন-ব্যবস্থা।

এ সব দাবি আমাদেরও। তাই বললাম, কিন্তু তারা সান্ত্বনা পায়নি। সোহরাওয়ার্দীকে এসব স্বীকার করতে হবে। এই জন্যই নেতাকে দূরে রেখে, ন্যাপকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নেতা উপস্থিত থাকলে ন্যাপের সাথে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গেলে, তারা আমাদের সমর্থন করলে, ফলে আমার সরকার টিকে যায়।

লাহোরের এক ইংরেজি কাগজও এই খেলা ধরে ফেললো। এ অধিবেশন কয়দিন চলার পর আঠার তারিখে কাট সেশনে ভোট হয়। যা হবার তাই হল। ন্যাপ নিরপেক্ষ রইল, ঐ কারণে। ভোটে হেরে গেলাম–ইস্তফা দিয়ে দিলাম। বাঁচা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এর আগে সদস্য-ভবন এলাকায় খুব তোড়জোড় চলেছিল। সব খবর পেলাম। আমার বিরুদ্ধে বিরোধীদল অনাস্থা প্রস্তাব আনার আগেই আমার দলের বন্ধুরাই আয়োজন করছিলেন অনাস্থা প্রস্তাব দেবার। অর্থাৎ আমাকে বাদ দিয়ে অন্য একজনকে নেতা নির্বাচিত করলেই আমি সরে পড়ি। সদস্য-ভবনে ঘুরে ঘুরে সব খবর নিলাম। অনেকের আমলনামা দেখলাম। একটুও আশ্চর্য হইনি। অবশ্য এদিক দিয়ে সুবিধা না হওয়ায় অন্য পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং সেটা সফল হয়ে গেল।

আবার রাত্র-শেষ ন্যাপ দলের ছোট-খাটো একজন নেতা টেলিফোন করলেন, স্যার, আমরা সাব্যস্ত করেছি আপনাকে সমর্থন করব। আগামীকাল এটা ফায়সালা হয়ে যাবে। গভর্ণরকে জানাতে হবে, ইত্যাদি। বললাম, আর হয় না। উঠে বসুন, আমরা আসছি। এল। এসে সব কাহিনী বলল। আমাকে গভর্ণরের বাড়িতে যেতে বলল। মাফ চাইল, ভুল স্বীকার করল। ইত্যাদি। বললাম, এসব করে কিছু হবে না। ছেড়ে দাও।

আবু হোসেন সরকারকে প্রধানমন্ত্রী করে আবার দু'দিন পরে পরিষদ অধিবেশন শুরু হল। প্রথম দিনই শেখ মুজিবুর রহমান অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন সরকার-মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে। সেদিন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। আবার উঠল তেইশ তারিখে। পালটা এক চাল চাললেন সরকারি দলঃ কোয়ালিশন দলে কয়েকজন সদস্য আছেন যারা সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারীর শামিল, কাজেই আইনত তারা সদস্যপদে কায়েম থাকতে পারেন না। ডেপুটি স্পীকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এ সম্বন্ধে মতামতের জন্য ইলেকশন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর নানা রকমের বক্তৃতার পর শেখ মুজিবুর রহমানের অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবের উপর ভোট হয় এবং আবু হোসেন সরকার হেরে যান। ন্যাপ দল এবার আমাদের সাথে ভোট দেয়। পরদিন সরকার ইস্তফা দেন ও গভর্ণরের নির্দেশ অনুযায়ী পরিষদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। যথারীতি একশ তিরানব্বই ধারার বিধান জারি হয়ে গেল। মন্ত্রিত্ব, পরিষদ সব শিকায় উঠল॥"[১১৪]

পনেরো

"...আমার এক বন্ধু এমপিএ ছিলেন ১৯৫৭ সালে। মওলানা সাহেব যখন ন্যাপ করলেন ইস্কান্দার মির্জার সাহায্যে প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতির ধুয়া তুলে, তখন ন্যাপ পার্লামেন্টারি পার্টি গঠন করে আওয়ামী লীগ থেকে সমর্থন উঠাইয়া নিলেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলো। তখন তিনি ন্যাপের এক পার্টি মিটিংয়ে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা চলবে না। কে এস পি, নিজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ কোয়ালিশনকে সমর্থন করা উচিত। তখন কিছু কিছু সদস্য তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই সমস্ত দল কি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করতে পারে? এরা ইস্কান্দার মির্জার দালালি করছে। ইস্কান্দার মির্জা আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারকে ধ্বংস করতে চায়। আওয়ামী লীগ তো বন্দিদের মুক্তি দিয়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। যুক্ত নির্বাচনের জন্য যুদ্ধ করছে। কেমন করে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নীতি বিবর্জিত দলদের সমর্থন করতে পারা যায়! মওলানা ভাসানী সাহেব তার উত্তর দিয়েছেন এই কথা বলে, মিশরের নাসের যদি সমাজতন্ত্র করতে পারে, তবে ইস্কান্দার মির্জাকেও একবার পরীক্ষা করে দেখলে অন্যায় কি? এরপরেই জানা গেল মওলানা সাহেব ইস্কান্দার মির্জার সাথে গোপন সন্ধিতে যোগ দিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দী নিধন যজ্ঞে। তাঁর নীতি আমার জানা আছে। জেলে বসে আইয়ুব সাহেবের কাছে কি কি চিঠি দিয়েছেন তাও আমার জানা আছে।

... ন্যাপের সভাপতি নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে সব দলকে এক করতে চান, আজ তাদের সভায় বলেছেন। নিম্নতম কর্মসূচি দিয়ে চুপচাপ তাঁহার নতুন বাড়ি বিন্নাচর গ্রামে যেয়ে বসে থাকলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে! সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন আওয়ামী লীগ শুরু করেন সেই সময় হতে এই ভদ্রলোক

---

[১১৪] আতাউর রহমান খান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী)/ওজারতির দুই বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ২০০০। পৃ. ১৫৩-১৫৭/২০১-২০৩]

বহু খেলা দেখাইয়াছেন। মিস জিন্নাহর ইলেকশন ও অন্যান্য আন্দোলনকে তিনি আইয়ুব সরকারকে সমর্থন করার জন্য বানচাল করতে চেষ্টা করেছেন পিছন থেকে। তাঁকে বিশ্বাস করা পূর্ব বাংলার জনগণের আর উচিত হবে না। এখন আর তিনি দেশের কথা ভাবেন না। আন্তর্জাতিক হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার কাছে টেলিগ্রাম পাঠান আর কাগজে বিবৃতি দেন। বিরাট নেতা কিনা? আফ্রো-এশীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মজলুম জননেতা। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাঁচুক আর মরুক তাতে তার কি আসে যায়! আইয়ুব সাহেব আর একটা ডেলিগেশনের নেতা করে পাঠালে খুশি হবেন। বোধহয় সেই চেষ্টায় আছেন।

... মওলানা ভাসানী সাহেব হঠাৎ সুস্থ হয়ে ঢাকায় এসেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ৬ দফা সমর্থন করেন না। তবে স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন। কারণ, তাঁর পার্টির জন্ম হয় স্বায়ত্তশাসনের দাবির মাধ্যমে। কাগমারি সম্মেলনের কথাও তিনি তুলেছেন। তিনি নাকি দেখে সুখী হয়েছেন যে, একসময়ে যারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করবার জন্য তাঁর বিরোধিতা করেছেন তারাই আজকাল স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছে। মওলানা সাহেব বোধহয় ভুলে গিয়াছেন, ভুলবার যদিও কোনো কারণ নাই, সামান্য কিছুদিন হলো ঘটনাটা ঘটেছে। খবরের কাগজগুলি আজও আছে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের কর্মীরা আজও বেঁচে আছে। তারা জানে, বিরোধ ও গোলমাল হয় বৈদেশিক নীতি নিয়ে। সে গোলমালও মিটমাট হয়ে গিয়েছিল সম্মেলনের পূর্বের রাতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ। মওলানা সাহেবই সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সমর্থন করে ওয়ার্কিং কমিটিতে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আছে, শহীদ সাহেবকে নিয়ে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে। ১২ জনের নেতা প্রধানমন্ত্রী, কেমন করে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করা সম্ভবপর হবে। শহীদ সাহেব যখন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন করে দিয়েছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা জনগণকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন তাড়াতাড়ি সাধারণ নির্বাচন দিতে তখন আমরা বৈদেশিক নীতি নিয়ে আর হৈচৈ করবো না - যে পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন না হয়।'

ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, 'পার্লামেন্টারী পার্টির হাতে ক্ষমতা দিতে। বৈদেশিক নীতি বিষয়ে পার্লামেন্টারী পার্টি যাহা ভাল মনে করে, করবেন।' সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যাওয়ার পরে মওলানা সাহেব খবরের কাগজে অসত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, বৈদেশিক নীতির প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং ভাসানীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বৈদেশিক নীতির উপরে কোনো প্রস্তাবই নেওয়া হয় নাই, আর হবে না বলেও ঠিক করা হয়েছিল। মওলানা সাহেব জানতেন, কাউন্সিল সভায় তাঁর কোনো প্রস্তাবই পাশ হবে না। কারণ, সদস্যগণ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সমর্থন করতেন। কয়েক মাস পরে ঢাকার নিউ পিকচার্স হাউস ও গুলিস্তান সিনেমা হলের সম্মেলনে ভাসানী সাহেব মাত্র ৪৩ ভোট পেয়েছিলেন ৮৩৪ ভোটের মধ্যে। সেখানে স্বায়ত্তশাসনের কোনো কথাই ওঠে নাই। কারণ, আওয়ামী লীগের যেদিন জন্ম হয় সেইদিন থেকেই স্বায়ত্তশাসনের বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করছে। মওলানা সাহেব বোধহয় ভুলে গেছেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে পার্লামেন্টে যখন শাসনতন্ত্র তৈয়ার হয়, তখন স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করে আওয়ামী লীগ প্রত্যেক দফায় সংগ্রাম করেছিল। এখনও কেন্দ্রীয় আইন সভার রেকর্ড থেকে তা পাওয়া যাবে। আর আমার কাছেও সেগুলি আছে। এমনকি জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব বলেছিলেন, 'আমরা দুইটা দেশ; কিন্তু একটা জাতি তৈয়ার করতে হবে' (বাকি কথাগুলি আমার ঠিক মনে নাই)। সেইজন্যই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এই রকম শত শত এমেন্ডমেন্ট আবুল মনসুর আহমদ সাহেব, জহিরুদ্দিন, দেলদার সাহেব, খালেক সাহেব, আমি ও আরও অনেকে দিয়েছিলাম। স্বায়ত্তশাসন না দেওয়ায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবসহ আমরা সকলে ওয়াক আউট করেছিলাম।

আওয়ামী লীগ ভেঙে যখন ন্যাপ করা হলো, তখন বৈদেশিক নীতির উপরই হয়েছিল বলে এতদিন মওলানা সাহেব বলতেন, এবার নতুন কথা শুনলাম। কিছুদিন বেঁচে থাকলে অনেক নতুন কথাই তিনি শোনাবেন। যেমন, তিনি কোনোদিনই মওলানা পাশ করেন নাই তবুও মওলানা সাহেব না বললে বেজার হন।

ন্যাপ কেন হয়েছিল? আদর্শের জন্য নয়। মওলানা সাহেবের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা খুব বেশি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেন নাই এবং তার মধ্যে এতো ঈর্ষা দেখা দেয় যে, গোপনে ইস্কান্দার মির্জার সাথে হাত মিলাতেও তার বিবেকে বাধে নাই। তিনি মির্জা সাহেবকে মিশরের নাসের করতে চেয়েছিলেন॥"[১১৫]

ষোলো

"... একটা কথা স্মরণে রাখা উচিত, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে প্রথমে আইনমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করেন এবং এ বছরই পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান পাস করা হয় এবং এতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ০ + ০ = ০ এই থিওরির প্রবক্তা শহীদ সাহেবই আমাদের পূর্ববাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুগারকোটেড পিল গিলিয়েছিলেন সে সময়।

পূর্ববঙ্গ দোহন শোষণ করার কুমতলবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের পরীক্ষিত খাস দোস্তকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে পুরুস্কৃত করেছিল। সেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী কি করে মার্কিনিদের সাথে বেঈমানী করতে পারেন? তাই তিনি মওলানাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। দল লন্ডভন্ড হয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান তার মার্কিনপ্রীতির বন্ধুদের নিয়ে সংগঠিত হতে থাকেন। হয়েও গেল। কারণ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই মুসলিম লীগ শাসনবিরোধী হওয়ায় আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল সমর্থন পেয়ে গিয়েছিল।

৯ বছর ঐ সংগঠনটিকে তিলতিল করে গড়ে তোলার পর মওলানা ভাসানী জনগণের স্বার্থ এবং পূর্ববাংলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিজ হাতে গড়ে তোলা সংগঠন ছেড়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারার রাজনীতি ব্যাপকভাবে পত্তন করেছিলেন ন্যাপ-এর মাধ্যমে। কিন্তু মার্কিন প্রভুরা খুব একটা খুশি হতে পারেনি কারণ তারা ভাবছিল তবে কি পাকিস্তান তাদের কব্জার বাইরে চলে যাবে? সুতরাং মার্কিনিরা এবার সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে আরো চাপ সৃষ্টি করল। মওলানা ভাসানী পাকিস্তান ভিত্তিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলে মার্কিনিদের টনক নড়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে, আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রগতিশীল যারা ছিলেন তারা সংগঠন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এছাড়া আরেকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য, সে হলো পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্টরা তখন অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করেন ন্যাপে, কারণ পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলন আর প্রগতিবাদী যে কোনো কার্যক্রমে কমিউনিস্টরা আত্মগোপন থেকেও সবচেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছেন। এসব খবর মার্কিন মুল্লুকের শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল। সুতরাং এমত পরিস্থিতিকে নিজেদের কব্জায় রাখতে এবং প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বিস্তার ও যাতে ঐক্য সম্ভব না হয়, সেদিকে নজর দিয়ে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রথমে মেজর জেনারেল মীর্জা ইসকান্দর, ৭ দিন পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খানকে সামরিক প্রধান বানান জেনারেল আজম খান, লেঃ জেনারেল কে এম শেখ এদের বদৌলতে।

সামরিক শাসন জারি হলো, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হলো, সংবিধান স্থগিত হলো। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ও সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল। দেশব্যাপী বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী গ্রেফতার হলেন। পূর্ববাংলার জেলখানা ভর্তি হয়ে গেল। খবরের কাগজের উপর সেন্সরশিপ জারি হয়ে গেল।

---

[১১৫] শেখ মুজিবুর রহমান/কারাগারের রোজনামচা ॥ [বাংলা একাডেমি - মার্চ, ২০১৭। পৃ. ১০৪/১৬৭-১৭১]

দুদিন কনভেনশন শেষে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও মাহমুদুল হক ওসমানীকে সেক্রেটারি জেনারেল করে পাকিস্তান কমিটি গঠিত হয়েছিল।

... এখানে একটি কথা বলে রাখি - তা হলো এই গণতান্ত্রিক কনভেনশন ভন্ডুল করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি কর্মসূচী নিয়েছিলেন। তাকে বাস্তবায়নের জন্য রূপমহল সিনেমা হলের গণতান্ত্রিক কনভেনশনকে ভন্ডুল করার জন্য এক ঘৃণ্য পরিকল্পনা হচ্ছিল ১৭ কোর্ট হাউস স্ট্রিটের 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকা অফিসের দোতালায় জেনারেল ম্যানেজারের রুমে। ব্যক্তিটি ছিলেন প্রাক্তন দুর্ধর্ষ ছাত্রলীগ নেতা ও পরবর্তীকালে দৈনিক ইত্তেফাক-এ বিজ্ঞাপন ম্যানেজার এম এ ওয়াদুদ। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমাণ করলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন মিল্লাত পত্রিকার দূরবস্থা দেখে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করলেন, তখন এম এ ওয়াদুদকে জেনারেল ম্যানেজার করে পাঠালেন। আর গণতান্ত্রিক কনভেনশন এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, বাইরে বিরুদ্ধ প্রচারণা, জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির নানা কর্মসুচি তৈরি করেছিলেন বেশ কজন সহযোগী নিয়ে।

এত বড় কনভেনশন হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব প্রগতিশীল স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ যে এতে উপস্থিত হবেন, এটা আওয়ামী লীগ বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী-মুজিব নেতৃত্ব বুঝতেই পারেননি। তাই ওয়াদুদ ভাই শিশু সাহিত্যিক মোশাররফকে ধরে রিকশায় মাইক লাগিয়ে মওলানা ভাসানী ও কনভেনশনের বিরুদ্ধে গীবত গাইতে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেচারা সারাদিন পাটুয়াটুলী, সদরঘাট এলাকায় প্রচার চালিয়ে কিছুই করতে পারেননি। পরে মোশাররফ মওলানা ভাসানীর পরম ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর গোপনসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয় দিন কনভেনশন শেষে রূপমহল সিনেমা হল থেকে সকল নেতাকে নিয়ে মিছিল যাবে পল্টন ময়দানে জনসভার জন্য। আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ছিল যেন এ জনসভাই না হতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষোভ ছিল প্রচন্ড। কারণ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তির উৎস জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ইয়ার মোহাম্মদ খান ন্যাপের সাথে চলে গেছেন এবং তার শক্তিতে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পল্টনে। সেই ক্ষোভ থেকে মিছিল এবং জনসভা যাতে না হতে পারে, তার সব প্রস্তুতি গ্রহন করেছিল আওয়ামী লীগ। মিছিল যখন আন্টাগোরার ময়দান (বাহাদুর শাহ পার্ক) এর সামনে তখন একবার ব্যর্থ চেষ্টা চালান হয়েছিল বটে কিন্তু ঐ ভীতি সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে নেতৃবৃন্দ এগিয়ে চলেছিলেন পল্টন ময়দানের দিকে। আজ এ কথা লিখতে গিয়ে বার বার একটি দৃশ্য ভেসে উঠছে, সে হলো সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খানের গায়ে যেন সামান্য আঘাত না লাগে সেজন্য তার মতো দীর্ঘাঙ্গ নেতাকে আড়াল করে কে দাড়াবে? দাঁড়ালেন ভাসানী-কর্মী সাহসী রাজনীতিক মন্টু খান। আমাদের মন্টু ভাই, তিনিও লম্বায় কম নন, তাই তিনি ছাতা হাতে সীমান্ত গান্ধীর পাশে পাশে রইলেন। মিছিলে কোনো বাঁধা সৃষ্টি করতে না পেরে অবশেষে পল্টনের বিশাল জনসভায় হামলা চালাতেও দ্বিধা করল না আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা। শুনলে অবাক হবেন, আওয়ামী লীগের সে সময়ের প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহ আজিজুর রহমানও হামলাকারীদের একজন। সভাস্থলে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল এবং আওয়ামী লীগ ভেবেছিল জনসভা ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু তা হলোনা।

শুধু পল্টন ময়দানেই নয় জেলায় জেলায় ন্যাপের মিটিং হলেই আওয়ামী লীগের হামলা অবধারিত ছিল কারণ আওয়ামী লীগে যেসব মেধা সম্পন্ন নেতা ছিলেন সংগঠক হিসেবে তাদের অনেকেই যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে চলে এসেছিলেন। কনভেনশন শেষ হওয়ার পরপরই ন্যাপের কমিটি জেলা, মহকুমা ও থানায় গড়ে উঠতে থাকে। এটা আওয়ামী লীগের সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও গড়ে উঠেছিল কারণ অসাম্প্রদায়িক ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতির এটিই একমাত্র দল। তাই সচেতন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিককর্মীরা সংঘবদ্ধ হতে থাকেন এই নতুন অসাম্প্রদায়িক দলের ব্যানারে॥"[১১৬]

---

১১৬ কামাল লোহানী/রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার ॥ [ভূমিকা - ফেব্রুয়ারি , ২০১২। পৃ. ২৮-৩১]

সতেরো

"... Three days after becoming the new Prime Minister, Suhrawardy came back to Dhaka, accompanied by Amjad Ali, the Finance Minister, and a number of high officials to take stock of the food situation and later allocated three crores of rupees to procure food for the province. But if Suhrawardy had thought that his efforts for easing the sufferings of the people of East Pakistan would be greeted with universal approval, he was mistaken.

Bhashani had been a thorn in the side of every government. Now it was the turn of the Awami League government. Never mind that he was the President of the Awami League, and that his party was holding power, both in the Centre and in East Pakistan. At a mass meeting held in Dhaka to welcome Suhrawardy, with Bhashani presiding, he made the astonishing remark that 'the people had expected the Prime Minister to bring a planeload of foodgrain — he has brought instead a planeload of women' and added that 'if he didn't perform his job properly, he would be dragged down by the ear from his seat of power'."[১১৭]

আঠারো

"... পাকিস্তান তখনও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী শাসিত হচ্ছিল। লোক দেখানোর জন্য হলেও একটি সংবিধান রচনার প্রয়োজন ছিল। তজ্জন্য গণপরিষদে সংখ্যাধিক্য চাই। পূর্ববঙ্গীয় সদস্যদের সমর্থন ব্যতীত তা হয় না। তজ্জন্য আওয়ামী লীগকে ভিড়ানো আবশ্যক। প্রেসিডেন্ট গোলাম মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে ডিসমিস করে ওয়াশিংটন থেকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে উড়িয়ে এনে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানোর দিনেই কাজটি শুরু হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। বিভাগপূর্ব বাংলায় সাংবাদিকতার কাজ করেছি। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে তখন প্রায় রোজ মোলাকাত হয়েছে। কথাবার্তাও বলেছি। তাকে একজন ভাঁড় মনে হয়েছে; কিন্তু ফলস্টাফের যোগ্যতা তার ছিল না। রাজনীতিতে সবই সম্ভব। কিন্তু বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যার সমতার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে আইনমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় এলেন। পল্টন মাঠে জনসভা হলো। উপস্থিত ছিলাম। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন, আপোস ফয়সলায় না এলে সামরিক আইন জারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুই অংশের মধ্যে সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব লোপ করা হলো। ষড়যন্ত্র অব্যাহত রইলো। আওয়ামী লীগকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হতে দেয়া হয়। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে পদ দেয়া হলো। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্বও গেল।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্যোগে বাগদাদ প্যাক্ট নামক সামরিক জোট আগেই গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান ঐ জোটের সদস্য হয়। উক্ত সামরিক জোট সমর্থন করার শর্তে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে সকল প্রকার সামরিক জোটের বিরোধী ছিল। ১৯৫৩, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সভায় সামরিক জোটভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। দৃশ্যত এই ইস্যুতে মওলানা ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রথম ঢাকায় আসেন, যতোদূর মনে পড়ছে, ১৯৫৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁকে সংবর্ধনা দান এবং তাঁর নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা শোনার জন্যই পল্টন মাঠে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়।

---

[১১৭] S. A. Karim/Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy \ [UPL - 2009| p. 74-75]

সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভাপতি মওলানা ভাসানী। প্রধান বক্তা শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সভাপতির বক্তৃতায় মওলানা ভাসানী অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট পূরণ না করলে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে লাথি মেরে বিতাড়িত করা হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন একই মঞ্চে পাশাপাশি বসা। এই অবমাননাকর অশালীন উক্তি আমার ভালো লাগেনি। কঠিন কঠোর কথাও নরম ভাষায় বলা যায়। দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কাবোধ করেছিলাম।

... ইয়ার মোহাম্মদের কাছে শুনেছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কাগমারি সম্মেলনের জন্য নাকি ৫০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। আতাউর রহমান তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। টাকাটা নাকি তার কাছে এসেছিল। প্রস্তুতি কমিটির কাছে সে টাকা আসেনি। যুগ্ম ট্রেজারার সদরি ইস্পাহানি এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান সে টাকা পেয়েছিলেন কি না অথবা সে টাকা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা নিজেরাই সম্মেলনের জন্য ব্যয় করেছিলেন নাকি মওলানা সাহেবকে কাগমারি খরচের জন্য দেয়া হয়েছিল সে বিষয়ে প্রস্তুতি কমিটি অথবা আহ্বায়ক আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। সদরি ইস্পাহানি ৫০০০ টাকা ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়েছিলেন এবং সে টাকা দিয়ে সম্মেলনের নামে ব্যাঙ্কে একাউন্ট খোলা হয়েছিল মনে পড়ে। ব্যাঙ্ক হতে টাকা তোলার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন ট্রেজারারদ্বয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ওরা টাকা দিতেন। কিন্তু সম্মেলন শেষে যখন অস্থায়ী টেলিফোনের জন্য ৮০০ টাকার বিল এলো তখন সে টাকাটা দেয়ার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না। ইয়ার মোহাম্মদ খান বললেন, তহবিলে টাকা নেই। আমার বাসার ব্যক্তিগত টেলিফোনটি কেটে দেয়ার নোটিশ এলে আমাকে বাধ্য হয়ে ঐ বিলের টাকা শোধ করতে হয়েছিল।

প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য খায়রুল কবির পরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মীর্জা নাকি সম্মেলনের জন্য মওলানা সাহেবের কাছে আলাদাভাবে ২৫,০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমার ধারণা, টাকাটা সদরি ইস্পাহানির মারফত এসে থাকবে। আমার কাছে যে দশ হাজার টাকা মওলানা সাহেব জমা রেখেছিলেন সেটাও নাকি সদরি ইস্পানি তার নৌকোয় দিয়ে এসেছিলেন, পরে শুনেছিলাম।

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও একই সময়ে কাগমারিতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব, মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান (প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রীও) প্রমুখসহ প্রতিষ্ঠানের সকল নেতা কাগমারিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে মতৈক্য হয়নি। মনে পড়ে, সন্তোষের মহারাজাদের চকমিলানো দোতলা বাড়ির নিচের তলার একটি কক্ষে ফরাশের ওপর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হচ্ছিল। আমি রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাইরে দাড়িয়ে কি হয় কি হয় ভাবছিলাম। একবার ইয়ার মোহাম্মদ খান সম্ভবত বাথরুমে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন। দেখলাম পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত সোহরাওয়ার্দী সাহেব ফরাশে বসে গম্ভীর মুখে কি যেন বলছিলেন। তাঁর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। ইয়ার মোহাম্মদ কিছু বললেন না, বাথরুম সেরে এসে পুনরায় প্রবেশ করলেন।

ফয়সালা হলো না। মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী ভক্তগণ প্রধানত পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রশ্নে কাগমারিতেই দুই বিবদমান গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেলেন এবং সেই যে বিভক্ত হয়ে গেলেন আর কখনও দুই গ্রুপ ঐকমত্যে এলো না।

... সম্মেলন শেষ হওয়ার পর বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি। নানাসূত্র থেকে অনেক তথ্য কানে এসেছে। সম্মেলন পরবর্তী ঘটনাবলিও দেখেছি। আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী উভয় গ্রুপের মধ্যে শত্রুপক্ষের এজেন্ট ছিল। ওরা এজেন্ট প্রভকিয়টর অর্থাৎ উস্কানিদাতা এবং ডবল এজেন্টের কাজ করেছিল। অবশ্য কিছু কিছু সৎ অতি-উৎসাহী কর্মীও ছিলেন যারা কোন সময় কতোটা অগ্রসর হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সজাগ ছিলেন না। এতোকাল পরে নামোল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু আলাপ-আলোচনার মধ্যে জানতে পেরেছিলাম যে, প্রস্তুতি কমিটিতেও এমন লোক ছিলেন যারা মওলানা ভাসানীকে যা শোনাতেন

তার বিপরীত কথা শোনাতেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং তাঁর ভক্ত শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং তার বন্ধুদের বলা হচ্ছিল, কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন মওলানা ভাসানী ও তার অনুগতদের দল হতে বহিষ্কৃত করা হলে শাসক শ্রেণী সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব মেনে নেবে, তার প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন পাকা হবে। মওলানা ভাসানীকে খবর দেয়া হতো সোহরাওয়ার্দীকে বিতাড়িত করা হলে তারা মওলানা ভাসানীকে মাথায় তুলে নেবে, তার কাগমারির জনহিতৈষীমূলক প্রকল্পগুলোর জন্য দেদার অর্থ সাহায্য করবে। প্রস্তুতি কমিটির একজন সদস্যকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার সাথে ইসকান্দার মীর্জার যোগাযোগ আছে কি? তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, 'হ্যাঁ আছে। দেখাসাক্ষাৎ হয়।'

লক্ষ্যাদর্শের সংঘাত ছিল। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যাদর্শে বিশ্বাসী কিছুসংখ্যক যুবক কর্মী। অবশ্য ভণ্ড সমাজতন্ত্রীদেরও অনেকে স্থান করে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ টাইপ পুঁজিবাদী পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। লিয়াকত আলীকে রাওয়ালপিণ্ডির জনসভায় হত্যা করার দিন পাকিস্তানে পশ্চিমি পার্লামেন্টারি রাজনীতিও হত্যা করা হয়। সোহরাওয়ার্দী বিষয়টা বুঝেছিলেন কিনা জানি না। অপরদিকে নেতা এবং তাদের প্রধান প্রধান লেফটেন্যান্টগণ ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ হতে মুক্ত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রিত্বের ছত্রছায়াতলে আখের গুছিয়ে নিয়েছিলেন অনেকে। আবুল মনসুর আহমদ তার দৃষ্টান্ত। বস্তুতপক্ষে আওয়ামী লীগের ভাঙন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উদ্ভবের মধ্যে ছদ্মবেশী মোনাফেকদেরও বড় রকমের ভূমিকা ছিল। তৎকালীন ঘোরতর বিপ্লবী অলি আহাদ, মাহমুদ আলী প্রমুখের পরবর্তীকালীন ভূমিকা তার প্রমাণ বহন করছে।

অবশ্য ইতিহাসের বিধান এড়ানো যেতো না। মত ও পথের মেরুকরণ ১৯৪৮ সালেই শুরু হয়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। সাম্রাজ্যের মধ্যে এ-ধরনের অবস্থান থাকতে পারে, জনগণের রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন শেষ যোগসূত্র, দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্ররক্ষাকারী সেলাইর মেশিন। তার মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমান যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানী এবং তাঁর সমর্থকগণ সেই ভূমিকাই পালন করেছিলেন।

... কাগমারি হতে ঢাকা ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরো তীব্র হলো। প্রচার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী হলেন বিদ্রূপ ও উপহাসের বস্তু। সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) দৈনিক ইত্তেফাকের রাজনৈতিক মঞ্চে আক্রমণের প্রধান টার্গেট ছিলেন মওলানা ভাসানী। অথচ কিছুকাল পূর্বেও মানিক মিয়া ছিলেন মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের সম্পাদক, ইয়ার মোহাম্মদ খান ছিলেন ডিক্লারেন্ট। মানিক মিয়ার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের তিনি ছিলেন বেতনভুক্ত কর্মী। মানিক মিয়াকে বাজারের ডুলা হাতে দু'এক টাকার জন্য ইয়ার মোহাম্মদের বাড়িতে যেতে আমি নিজেই দেখেছি।

দৈনিক ইত্তেফাকের জবাব দিচ্ছিল নবপর্যায়ের দৈনিক ইত্তেহাদ। তার ভাষাও শালীন ছিল না। এই কাদা ছোড়াছুঁড়ির মধ্যে গুলিস্তান সিনেমা হলে বিশেষ কাউন্সিল মিটিং ডাকা হয়। মওলানা ভাসানীর সমর্থকদের যে-কোনো উপায়ে মাইনরিটি প্রমাণ করাই ছিল এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার উদ্দেশ্য। এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম। মওলানা ভাসানী কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত থেকে অবস্থা বুঝে সভাস্থল ত্যাগ করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পক্ষীয়রা জয়লাভ করে। মওলানা ভাসানী পক্ষীয়রা পুনরায় কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করে আর্মানিটোলাস্থ পিকচার হাউস সিনেমা হলে। সেখানেও উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিতি ছিল কম। কোনো ফয়সালা হলো না। কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এবং প্রদেশে আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা যে-কোনো উপায়ে বহাল রাখার লক্ষ্যটাই তখন ভাসানী বিরোধীদের নীতিতে পরিণত হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তার বহু পূর্বেই পল্টন ময়দানের জনসভায় বাংলাদেশবাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তারা শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে।

রাজনীতিতে কার্যকরভাবে সক্রিয় থাকতে হলে ভিন্ন দল গঠন করা ছাড়া মওলানা ভাসানী এবং ভাসানীপন্থীদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। তখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ছিল প্রধানত পূর্ববঙ্গীয় রাজনৈতিক দল। নতুন দলকে নিখিল পাকিস্তানি রাজনৈতিক দলরূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী এক কনভেনশন আহ্বান করেন। ইংরেজি ভাষায় 'Why Convention' শিরোনামে একটি প্রচার পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাটির নাম-পৃষ্ঠার নিচে 'Bhasani' শব্দটি মুদ্রিত ছিল। Reception Committee of the Pakistan Democratic Workers Convention-এর পক্ষে প্রচার পুস্তিকাটির প্রকাশক ছিলেন খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। এটি মুদ্রিত হয়েছিল আল হেলাল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং লিমিটেড ঢাকা হতে। ১৯৫৭ সালের ২৫ এবং ২৬ জুলাই সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু সম্মেলন ২৭ জুলাই পর্যন্ত চলেছিল। পনের পৃষ্ঠার এই প্রচার পুস্তিকাটিতে পাকিস্তানি বৈদেশিক নীতি এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ শেষে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ তার মূলনীতি এবং তার একুশ দফা বর্জন করেছে। এই করে মুসলিম লীগ, কে এস পি (কৃষক প্রজা পার্টি) প্রভৃতি গণবিরোধী দলের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়া হচ্ছে। 'এখনও পথে ফিরে আসার সময় আছে' এই সাবধান বাণী উচ্চারণ শেষে Democratic Convention শিরোনামের নিচে বলা হয়,

'Whatever may be the activities of a handful of leaders who are interested only in keeping themselves in power, the glorious struggle which we had started, with independence and democracy as our ideals, must be advanced; these ideals must be realised to make Pakistan an independent sovereign and welfare state by freeing her from the clutches of the imperialist war blocs, and to solve the economic problems of the oppressed people.

With this end in view and to devise ways and means to advance the struggle and to unite all the democratic forces in East and West Pakistan to make the struggle successful, I have called, with the cooperation of the leaders of West Pakistan a Convention on July 25 and 26 at Dacca, appeal to all democratic minded people, irrespective of caste, creed or colour to join in the Convention and request all people young and old men or women to help in the work of the Convention.'

এই পুস্তিকাটির খসড়া নাকি করেছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট (দেবেন দাস?)। এই পুস্তিকাটি সম্মেলনে বিতরণ করা হয়েছিল। মুদ্রিত পুস্তিকাটি নিয়ে জনসন রোডে অবস্থিত তৎকালীন আল হেলাল প্রেস হতে ডেলিভারি নিয়ে বেরিয়ে আসার পথে প্রকাশক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস কনভেনশনবিরোধী কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি দমেননি। মারপিটের মধ্যে ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হন। ঘটনাটা আমার বইয়ের দোকানের সামনেই ঘটেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান হতে একটি বেশ বড় প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করেন। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন মিয়া ইফতেখারউদ্দীন, খান আবদুল গাফফার খান, মেজর ইসহাক, আবদুল সামাদ খান আচকজাই, ব্যারিস্টার মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরি, মাহমুদুল হক ওসমানী, আফজল খান, প্রিন্স আবদুল করিম, গৌস বখত বেজেঞ্জো, আতাউল্লাহ খান মেঙ্গল, আরবাব সেকান্দার খান, জি এম সৈয়দ, শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে প্রথম বিদ্রোহীদের অন্যতম বিমান বাহিনীর কমান্ডার জানজুয়া প্রমুখ। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সদরঘাটে রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত এই তিন দিনব্যাপী সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল। সম্মেলন গৃহে প্রবেশ করার সময় সদরঘাটের মোড়ে মিয়া ইফতেখারউদ্দীন, খান আবদুল গাফফার খান প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা লাঠি ও ইটপাটকেলধারী বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হন। যতোদূর মনে পড়ছে মিয়া ইফতেখারউদ্দীন জখমি হয়েছিলেন।

আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। তার সুদৃঢ় অবস্থান ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।

সম্মেলনের কিছুদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে। মওলানা ভাসানী খুব সম্ভব পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে আসছিলেন। তাকে আনার জন্য ইয়ার মোহাম্মদ খানসহ আমরা কিছু লোক তেজগা বিমানবন্দরে যাই। আমি তখন আগামসী লেন বিধান পল্লীতে বসবাস করি। সেদিন আমার কি খেয়াল হলো, টারমাকে অপেক্ষমাণ মওলানা সাহেবকে আমার বাসায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি রাজি হলেন। আমি তাকে নিয়ে বাসায় এলাম। আসলাম তো, কিন্তু আমি ঢাকা শহরের স্থায়ী অধিবাসী নই। রাজনীতিতে নতুন নেতাও নই। মওলানা ভাসানী আক্রান্ত হলে আমি তাকে কেমন করে রক্ষা করবো? আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ পেলাম আমার বাড়ির মাত্র কয়েক গজ দূরে গলির বিপরীত দিকে খন্দকার মোশতাক আহমদের বাড়ি। আবদুস সালাম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে তিনি সেটা ছেড়ে পুনরায় আওয়ামী লীগে চলে এসেছিলেন। রাত তখন ১০টা হবে। পাঁচিল ঘেরা বাড়ির গেট বন্ধ ছিল। একদল লোক 'মওলানা ভাসানী মুরদাবাদ' এবং আরো কি সব ধ্বনি করতে করতে কয়েকবার গলিতে ঘোরাফেরা করলো। বহু আগেই পাখি শিকারের জন্য একটি একনলা বন্দুক কিনেছিলাম। সেটিতে গুলি ভরে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হলাম। সৌভাগ্যের বিষয় বিক্ষোভকারীরা গেট ভেঙে বা দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেনি।

মওলানা সাহেব আমার বাড়িতে খুব সম্ভব তিনদিন ছিলেন। এই তিনদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। এ-সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকে এসেছিলেন। একজনের নাম শুধু মনে পড়ছে। তিনি আবুল হাসান মোহাম্মদ ইসমাইল, পুলিশ বিভাগের আই, জি, । তখন তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন কি না মনে করতে পারছি না। তিনি মওলানা সাহেবকে পার্টি না ভাঙার অনুরোধ করেছিলেন। ঐ তিন দিনেরই আর একটি ঘটনা। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ তখন সফর উপলক্ষে ঢাকায়। রাত প্রায় এগারটায় আমার টেলিফোন বেজে উঠলো, রিসিভার কানে লাগাতেই শুনতে পেলাম, আবুল মনসুর আহমদ বলছি। তার সঙ্গে কলকাতার জীবন হতেই পরিচয় ছিল। গল্প-লেখক এবং সাংবাদিক হিসেবে তার খ্যাতি। তিনি টেলিফোনে কমপক্ষে তিরিশ চল্লিশ মিনিট কথা বললেন। আওয়ামী লীগ অটুট রাখা কেন আবশ্যক, বৈদেশিক নীতি কেন ঠিক প্রভৃতি বহু বিষয়ে আমাকে বোঝালেন। মওলানা ভাসানী আমার বাড়িতে আছেন। অতএব মনসুর সাহেবের বোধকরি ধারণা হয়েছিল, আমি মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা। বলাবাহুল্য, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা দূরের কথা তার খাঁটি চেলা বা মুরিদও আমি কখনও ছিলাম না। আমি তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম, তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, এই ছিল সম্পর্ক। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হয়েছে। কিন্তু এখনও আমি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশে গণজাগরণে মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিনই রাত বারোটার দিকে আবার টেলিফোন বাজলো। এবার টেলিফোনকারী তার নাম বললেন না। বজ্রকণ্ঠে জানালেন 'তোমাকে খুন করবো'। আমি বললাম, মৃত্যু তো একদিন আছেই। অপরপক্ষে সজোরে রিসিভার রেখে দিলেন। কণ্ঠস্বর চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু অনুমানের ওপর নির্ভর করে সন্দেহযুক্ত বক্তব্য রাখা যায় না।

তিনদিনের দিন মওলানা সাহেবকে নিয়ে গেলেন খুব সম্ভবত ব্যারিস্টার শওকত আলী খান অথবা ইয়ার মোহাম্মদ। নিজের চেয়ে বেশি ভয় ছিল মওলানা সাহেবকে নিয়ে। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

... ২৭ জুলাই বিকেলে নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উদ্যোগে পুরানা পল্টন মাঠে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মাঠের মসজিদের পশ্চাতে মঞ্চ তৈরি হয়। যতোদূর মনে পড়ছে, মঞ্চে সভাপতির সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া ইফতেখারউদ্দীন, জি এম সৈয়দ, মাহমুদুল হক ওসমানী, মাহমুদ আলী কাসুরী, আবদুল মজিদ সিন্ধী, আবদুস সামাদ খান আচকজাই, গউস বখশ বেজেঞ্জো প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা। খান আবদুল গাফফার খান, মিয়া ইফতিখারউদ্দীন বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

এই জনসভাও একটি সুসংগঠিত বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধের ফলে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। যতোদুর মনে পড়ছে, আমাদের কেউ গুরুতর জখম হয়নি। আমার মনে পড়ছিল ৯ বছর পূর্বের অনুরূপ একটি ঘটনা। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার পর প্রথম জনসভা করা হয় আরমানিটোলা ময়দানে। সে সভায়ও সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। উপস্থিত ছিলাম। খুব একটা বিপুল জনসমাগম হয়নি। মুসলিম লীগ নিয়োজিত বাহিনী সে সভার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু সভা হয়েছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ঐ আক্রমণের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মওলানা ভাসানী তখনও সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতিও ছিলেন মওলানা ভাসানী। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে যে, ফলাফল এক হয়নি। কেন হয় নি তদ্বিষয়ে কোনো সুচিন্তিত আলোচনা এখনও হয়নি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৭১-এর যুদ্ধের আগে পাকিস্তানে এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে কেন বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করলো না, তার কার্যকারণ নির্দেশিত হওয়া আবশ্যক মনে করি। তা হলে সম্ভবত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের ব্যর্থতার কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে॥"[১১৮]

---

১১৮ আবু জাফর শামসুদ্দীন/আত্মস্মৃতি ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০০৫। পৃ. ২৪০-২৪১/২৫০-২৫৮]

চতুর্থ পর্ব

উপদলীয় কোন্দল : শেখ মুজিবুর রহমান বনাম আতাউর রহমান খান

এক

"... ১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিলাভ করেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর পদে যোগদান। তবে সব আলোচনা-সমালোচনা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যুক্তির কাছে হার মেনে যায়।

জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে সাক্ষাতের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে খুঁজছিলেন। আমি পলাতক, তিনি আমার কাছে সরাসরি খবর পাঠাতে পারলেন না। তবে খবর আমার কাছে পৌঁছলো যথারীতি। আমি আমার স্ত্রী বেগম রেবেকাকে নিয়ে সন্ধ্যার পর গেলাম শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। আমাদের পুরোনো বন্ধু-রাজনৈতিক সহচর জনাব নূরউদ্দিন আহমদের বাসায় তখন তিনি থাকতেন। সেটা ছিল পুরোনো ঢাকার মদনমোহন বসাক রোডের শেষ দিকের একটা বাড়ি। তখন সম্ভবত ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাস। সেই রাতটা ঐ বাড়িতেই কাটলো।

আমার চুল বড় হয়ে মাথাভর্তি ঝাকড়া ধরনের ও কিছুটা বিসদৃশ হয়ে পড়েছিল। শেখ সাহেব এক নরসুন্দরকে খবর পাঠিয়ে আনালেন এবং আমার কেশরাজিকে সুবেশ করানোর দায়িত্ব দিলেন; ফিস দুই টাকা, তিনি নিজেই দিলেন। তখন যে কোনো চুল কাটার সেলুনে এই চার্জ সম্ভবত দুই আনার বেশি ছিল না। এমনকি এই দুই আনা দিয়ে যে কোন সাধারণ রেস্তরাঁয় নিম্নমধ্যবিত্তদের এক বেলা মাছ বা মাংস দিয়ে পেট পুরে আহার করা সম্ভব ছিল।

দুপুরে খাবার সময় শেখ সাহেব আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা দুজনে বাড়ির পেছনের একটি কামরায় একান্তে দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় বসলাম। আমি শেখ সাহেবকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও এই ব্যাপারে পূর্ব বাংলার জনগণের সমর্থন আদায় করা এবং পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় কুচক্রী শাসকমহলের তোষামুদে একটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন ও পূর্ববাংলার মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনকে সুকৌশলে দমন করার চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের যুক্তফ্রন্ট-এর করণীয় বিষয়ে আমার মত জানালাম।

কিন্তু এসব ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণে আমি ব্যর্থ হলাম। দেখলাম, তিনি আমাদের বক্তব্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে সঠিকভাবে পেশ করার আশ্বাস দিয়ে একটি বিষয়ে আমার অভিমত স্পষ্টভাবে জানতে চাচ্ছেন। সেই বিষয়টি হচ্ছে, আমরা (অর্থাৎ গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং আমার অন্য বন্ধু এমএলএ-গণ) পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনের সময় আতাউর রহমান খানের পরিবর্তে তাঁকে (শেখ মুজিবুর রহমানকে) মুখ্যমন্ত্রী করতে মানসিকভাবে তৈরি এবং

একমত কিনা। শেখ সাহেব আমাকে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পক্ষে সমর্থন জোগানোর জন্য যারপরনাই অনুরোধ জানালেন।

তাঁর সেই প্রস্তাব-পরামর্শ ইত্যাদির মাঝে আমি যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম এবং পরামর্শ দিলাম যাতে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এবং বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের মধ্যে এই মুহূর্তে কোনো ভাঙন দেখা না দেয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়।"[১১৯]

দুই

"... দলীয় ফর্মুলা, দলের লোকায়তকরণের মতো সংঘাতসঙ্কুল ইস্যুগুলির নিষ্পত্তি হওয়ার আলোকে মনে হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তবে বাহ্যত সাধারণ ঐকমত্যের গভীরে সংগঠনের নানা স্তরে মতানৈক্য ও অবিশ্বাসের অন্তঃস্রোতধারা প্রবাহিত ছিল। ১৯৫৬ সালে এ দল পূর্ব পাকিস্তানে ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার পর প্রধানত দুটি ধারার সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে।

প্রদেশ পর্যায়ে সংগঠন ও সংসদীয় শাখার নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খান। তাঁদের দুজনের মধ্যে আমলাতন্ত্র/প্রশাসনের মোকাবেলায় দলীয় সংগঠনের সঙ্গত ভূমিকার প্রশ্নে গুরুতর বিরোধ ছিল। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও সে কারণে প্রশাসন বা সরকারপ্রধান হিসেবে আতাউর রহমান এক অরাজনৈতিক আমলা ব্যবস্থার সনাতন ধারণায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে এ আমলা ব্যবস্থা কাজ করবে রাজনৈতিক চাপমুক্ত অবস্থায় সরকারের ঘোষিত নীতিমালা বাস্তবায়নে। আর সে জন্য শাসক দলের কর্মকর্তাদের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান জোরালো এক ক্যাডারভিত্তিক দলীয় সংগঠন নির্মাণের অভিলাষী ছিলেন। তিনি জানতেন, তার দলীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রতি আমলাদের বৈরীপ্রায় মনোভাবের কথা। আর সে জন্যই তিনি বিভিন্ন স্তরের প্রশাসক ও প্রশাসনের বিভিন্ন এখতিয়ারের ওপর দলীয় কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ন নজরদারির পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যবস্থায় এমনও হতে পারে যে, দলীয় কর্মীদের পুরস্কার দিয়ে সংগঠনের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করা গেলো। এটা, ব্রিটিশ যে সনাতন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল সেটিকে ছাপিয়ে বা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টাও হতে পারে। একে সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবেও দেখা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে দলের সংসদীয় শাখার ওপর দলীয় সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি একটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বিতর্কিত প্রশ্ন এবং এই দ্বন্দ্বে জড়িত ব্যক্তিত্বদের ভিত্তিতেই পরিস্থিতি তার নিজ খাতে এগিয়ে যায়। তবে সে যাই হোক দলীয় সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর বিশ্বাস ও সরকারের নীতি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা মনে করে আমলাদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস ছিল অনেকটা তার বদ্ধ ধারণার মতো।

... দলীয় সংগঠনের ভূমিকার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের মতবিরোধ নিয়ে একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সোহরাওয়ার্দী এ বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিলেন আবুল মনসুর আহমদকে। তিনি দেখলেন দলের সংসদীয় ও সাংগঠনিক শাখা দুটির মধ্যে বিশেষ ধরনের মতবিরোধের এই সংঘাতটি তুঙ্গে উঠেছে দলের সম্পাদকের এ বিষয়ে নিজস্ব কিছু দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে। আবুল মনসুরের মতে সমস্যাটি এরকম: দলের

---

[১১৯] মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ২২৩-২২৪]

সম্পাদকের ধারণা জেলা আওয়ামী লীগের স্থান অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বে, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্থান অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বে।

অবশ্য আতাউর রহমানের নিজস্ব ধারণা ছিল এই যে, শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই মুখ্যমন্ত্রী হতে চান আর ঐ মতভেদ ছিল তাকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে উৎখাত করার একটা অজুহাত মাত্র। তিনি এমন বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেসব ক্ষেত্রে দলের কর্মীরা এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত প্রণয়নের এখতিয়ারেও হস্তক্ষেপ করেছে, আর জেলা কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ তো করেছেই। আতাউর রহমান নিশ্চিত ছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান দলের অভ্যন্তরে একটি চক্র গড়ে তুলেছেন তাঁর ওপর কলঙ্কারোপের উদ্দেশ্যে, আর এতে মুজিব অন্তত এই অবধি সফল হয়েছেন যে, এমনকি, সোহরাওয়ার্দীও আতাউর রহমানের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দিহান হয়ে ওঠেন ও তাঁকে সরাতে চান। আবুল মনসুর আহমদ এই সাক্ষ্যও দিচ্ছেন যে, সোহরাওয়ার্দী আতাউর রহমানকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকেই সেখানে বসানোর চিন্তা করছিলেন, কিন্তু আসন্ন নির্বাচনের মুখে তেমন কাজ কৌশলগত দিক থেকে ঠিক হবে না বুঝতে পেরে সে উদ্যোগে ক্ষান্ত দেন।

খুব সম্ভবত আতাউর রহমান দলের কাছে সম্পদ গণ্য হওয়ার চেয়ে দায় হয়ে উঠেছিলেন 'অপারেশন ক্লোজড ডোর' (OCD)-এর নানা প্রতিক্রিয়ার কারণে। এ অভিযান চলে হিন্দুদের ওপর। আওয়ামী লীগের একাংশের কাছে এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় ছিল না। ওসিডি অভিযান শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর। এ সময় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আতাউর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর এলাকায় চোরাচালান বন্ধ করার কাজে সশস্ত্র বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানান। এর আগে আওয়ামী লীগ পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছিল যে, বেসামরিক প্রশাসনে সশস্ত্র বাহিনীর কোনো হস্তক্ষেপ হতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উল্লিখিত কার্যব্যবস্থা ছিল দলের অবস্থানের একান্ত পরিপন্থী। ইতঃপূর্বে যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার খাদ্যপণ্যের চলাচল ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী তলব করার জন্য তীব্রভাবে সমালোচিত হন। যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে, চোরাচালানের নেপথ্যে নানারকমের সুগভীর অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। সে কারণগুলি দু'ভাবে দূর করা যায়। একটি ব্যবস্থা হলো আইনসম্মত সীমান্ত বাণিজ্য; অন্যটি পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু শেষোক্ত দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে কাজ না করে মুখ্যমন্ত্রী এক অনিশ্চিত নিরাময় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। দৃষ্টত মনে হয়, জনাব আবু হোসেন সরকারের সেনাবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রের প্রভাবমুক্ত ছিল না। যদিও তিনি এ কথা অস্বীকার করে সিদ্ধান্তের সকল দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেন তবু তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ দেওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্যার প্রস্তাবের সত্যতা তিনি স্বীকার করায় এ আভাসই মেলে যে ওসিডি-এর বেলায় সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে আতাউর রহমান খানের ভালো মনের পরিচয় পেয়ে প্রেসিডেন্ট সম্ভবত নিজের প্রয়োজনে তার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে একটি যোগসূত্র গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর প্রস্তাবিত ওসিডি ছিল এ ক্ষেত্রে এক যাচাই নিরীক্ষামূলক ব্যবস্থা।

তবে নেপথ্যে যেসব কারণই ক্রিয়াশীল থাক না কেন, অন্তর্দলীয় কোন্দল ছিল এক বহুল আলোচিত বিষয়। এতে আওয়ামী লীগের গঠন কাঠামোর দুরবস্থাই প্রতিফলিত। অনেকের দল ছেড়ে ন্যাপে যোগ দেওয়া এবং ওসিডি চলাকালে হিন্দুদের ওপর নিগ্রহ নির্যাতনের খবরে আওয়ামী লীগ থেকে হিন্দুদের সমর্থন তুলে নেওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদেও আওয়ামী লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে।"[১২০]

[১২০] শ্যামলী ঘোষ/আওয়ামী লীগ (১৯৪৯-১৯৭১) ॥ [ইউপিএল - ২০০৭। পৃ. ২৫-২৬/৪০-৪১]

তিন

"... পূর্ব পাকিস্তানে তখন আওয়ামী লীগের মধ্যেই চরম কোন্দল। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। অবশেষে শেখ সাহেবকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। তাঁকে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় এবং বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে সফর করতে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে রওনা হন। কিন্তু ইতোমধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। শেখ সাহেবকেও ফিরে আসতে হয়।

এসময় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারে তুমুল কোন্দল দেখা দেয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে কৃষক শ্রমিক পার্টি। বিভক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টি আবু হোসেনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান বুঝতে পারেন, যে কোনো সময় তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে। তিনি গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি করার আহ্বান জানান। তাঁর কথা না শুনে ৩০ মার্চ গভর্নর তাঁকে পদচ্যুত করেন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন আবু হোসেন সরকার। আবু হোসেন সরকারের অনুরোধে ঐদিনই পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি হয়। কেন্দ্রে তখন প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন। তাঁর সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে ফিরোজ খান নুন গভর্নর ফজলুল হককে ৩১ মার্চ অপসারণ করেন। ১ এপ্রিল আতাউর রহমান আবারও মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়॥"[১২১]

চার

"... মন্ত্রিত্ব গঠন করার কিছু দিন পরই মওলানা ভাসানী ঢাকা এসে চুপি চুপি আমাকে বলেন–'সাবধান, গভীর ষড়যন্ত্র চলছে আপনার বিরুদ্ধে। দল পাকাচ্ছে। কিছু সদস্য ঘন ঘন আমার ওখানে যাওয়া-আসা করছে। আর ইশারা ইঙ্গিতে আপনার বিরুদ্ধে নানা কথা বলছে। আপনাকে হুশিয়ার থাকতে হবে।'

বললাম–'কি হুঁশিয়ার থাকব? ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি যন্ত্রও নেই আমার হাতে তাদের মোকাবিলা করার। দল পাকাতে ও ভাঙ্গতে আমি অপারগ। প্রবৃত্তিও নেই ওসব কাজে। দেশের জন্য কিছু করতে এসেছি। কাজ করে যাব। যেদিন দেখব, দল গড়ে উঠছে, আমাকে কাজ করতে দিচ্ছেনা, সেই দিনই সরে পড়ব। আমাকে বাধা দিবেন না।' 'এটা বলেন কি আপনি?'–মওলানা বললেন। 'এতো অক্ষমতার নিদর্শন–পরাজিতের মনোভাব। একটু শক্ত হতে হবে, তাহলেই সব দমে যাবে।' বললাম, 'শক্ত আমি হতে পারি, কিন্তু বাইরের শক্তি কে যোগাবে আমাকে? আপনি পালিয়ে বেড়াবেন বিপদের সময় নাগাল পাব না আপনার।' বললেন, 'না না ঘাবড়াবার কারণ নেই–আমাকে পাবেন সব সময়ই।' বললাম, 'পাব বটে, কিন্তু হয়ত সময় ফুরিয়ে গেলে। যারা দল পাকায় তারা যেসব পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে তা আমি পারব না। তারা যে স্তরে নেমে যেতে পারে, আমি তা কোনদিন পারব না। আমি প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। অশান্ত পরিবেশে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। ঝগড়া-ঝাটি কোন্দল এ সব করতে আমি বিলকুল অভ্যস্ত নই।' উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'না তা করবেন কেন? কাজ করে যান নিরুদ্বেগে! শুধু একটু খেয়াল রাখবেন, যেন অযথা বিপদগ্রস্ত না হয়ে পড়েন।'–'আমার মত মানুষকে বিপদে ফেলা খুবই সোজা। আচ্ছা, সতর্ক দৃষ্টি রাখব।'

দল সত্যিই গড়ে উঠেছিল। সেক্রেটারীকে (শেখ মুজিব) বললাম। তিনি বললেন, 'ওসব বাজে কথা। আপনি এ সব কথায় কান দেন কেন? এই আপনার দোষ!'

---

১২১ নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ [ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ১৬০-১৬১]

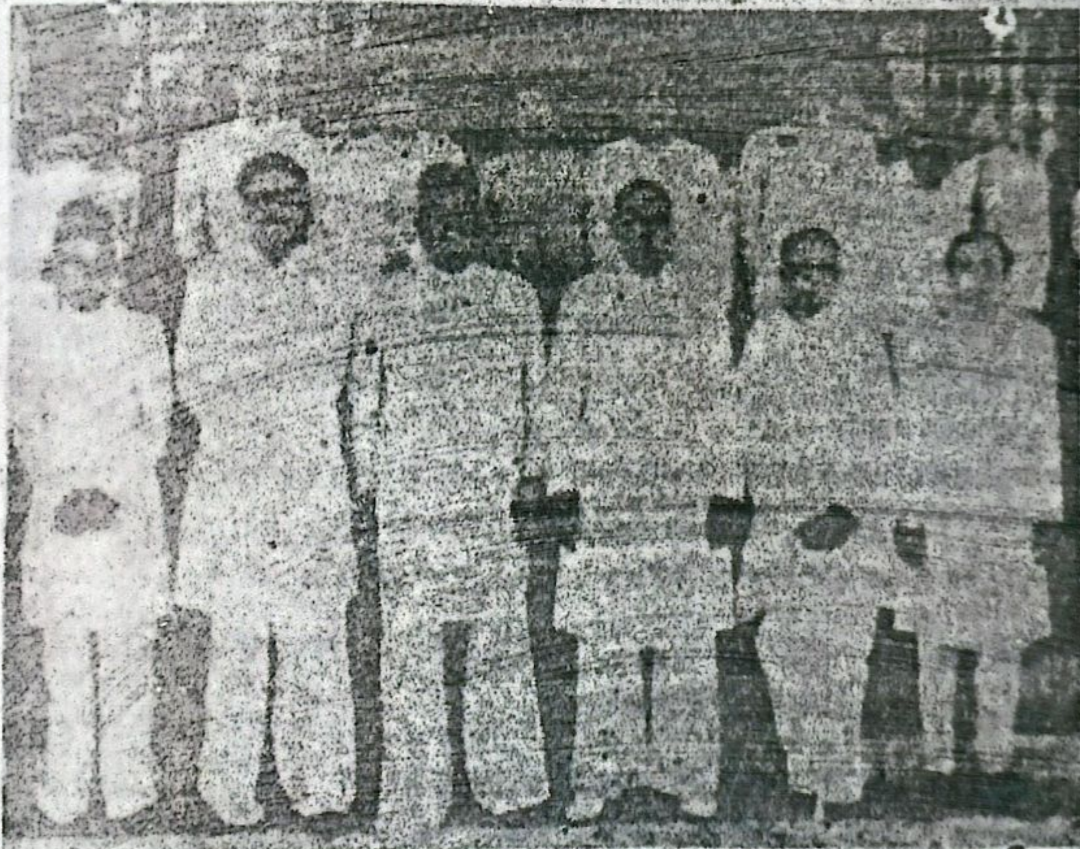
প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলিতে লেখা আছেঃ কোন কর্মকর্তা সরকারি পদ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি করেন, তাহলে তাকে প্রতিষ্ঠানের পদ ত্যাগ করতে হবে। দু'টা এক সাথে চলবে না। আমরা এই নিয়ম লংঘন করেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলাম। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের অনুমতি দিয়েছিলেন সমায়িকভাবে। কিন্তু কয়েক মাস যাওয়ার পর মানুষ কানাঘুষা করেঃ এ কেমন কথা? আমাদের মনও খুঁতখুঁত করছে প্রথম থেকেই। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই স্থির করলাম, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পদ ইস্তফা দিব এবং দিয়েও দিলাম। মন্ত্রীদের মধ্যে যারা প্রতিষ্ঠানের কোন পদ-ধারী ছিলেন, তাঁরাও ছেড়ে দিলেন।

সেক্রেটারী ঘোষণা করলেন, তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ দেবেন। কর্মীরা আনন্দে নেচে উঠল। এই ত চাই। এমন আদর্শ ক'টা রাজনীতিক স্থাপন করেছেন তাদের জীবনে! সুতরাং চারদিক থেকে অভিনন্দন-বাণী আসতে লাগল। সেক্রেটারীও একখানা ইস্তফা-নামা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কথা রইল, তিনি কিছুদিন পর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিবেন।

আমি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বললাম, আমি তাকে আটকে রেখেছি বিশেষ দরকারী কাজে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই তার ইস্তফা-নামা মঞ্জুর করে তাঁকে খালাশ করে দেব। খবরের কাগজের বিবৃতিতে আরও বলা হয় অনেক কথাঃ তাঁর কৃতিত্ব, আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ এবং তিনি চলে যাওয়ায় আমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে; কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মন্ত্রিত্ব-পদে ইস্তফা দিলেন তার তুলনা নেই এবং এ কাজে বাধা দেয়া অন্যায়।

এর কিছুদিন পর ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় এই ব্যাপার উল্লেখ করে একটা দিন ধার্য করা হল, যেদিন তিনি সত্যি ছেড়ে দিবেন। কর্মী ও সদস্যরা বলছিল আর বেশিদিন আটকিয়ে রাখা উচিত হবে না। তার কিছুদিন পর বিদেশ ভ্রমণ করে ফিরে এসে তিনি মন্ত্রিপদ ছেড়ে দিলেন। নানা রকমের ছোট-খাট ব্যাপারে হয়ত ঠিক তার মনমত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করতেন এবং তার অভিব্যক্তি ছোট-খাট গণ্ডির ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকত না। বাইরেও তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

এ সব কথা আলোচনা করেছি তার সাথে। তিনি প্রায়ই বলতেন, আপনি মানুষের কথায় কান দেবার বদ অভ্যাসটা ছেড়ে দিন। ওসব শুনে অনর্থক মন খারাপ করে লাভ নেই। মন খারাপ করি নি; কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যাপারটাই খারাপ হয়ে গেল; গুরুতর আকারও ধারণ করতে লাগল। মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর সেক্রেটারী প্রতিষ্ঠানের কাজে একান্তভাবে আত্ম-নিয়োগ করবেন, এই ধারণা সবাই করেছিল। তিনিও এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রিত্ব ছেড়েছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের দিকে তিনি আর তেমন নজর দেন নি। ক্ষমতা লাভের পর সদস্য ও কর্মীদের ভেতর প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ব্যাপারে বিরাট নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছিল, তা তিনি রোধ করতে পারেননি। ক্ষমতা লাভের আগে যে কর্মতৎপরতা উন্মাদনা প্রতিষ্ঠানকে মহিমান্বিত করেছিল, সে গৌরব চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে গেল। জেলা ও মহকুমায় ভিন্ন ভিন্ন দল হয়ে গেল। একই জায়গায় দু'টি করে একটি কমিটি হয়ে গেল। সব জায়গায় উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিল।



আজাদ

পূর্ব্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা-----

সম্মুখ সারিতে (বাম হইতে) জনাব খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবর রহমান, গভর্ণর জনাব এ, কে, ফজলুল হক, উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান, মিঃ শরৎ চন্দ্র মজুমদার ও জনাব মাহমুদ আলী। পেছনের সারিতে (বাম হইতে) জনাব আবদুর রহমান খান, মিঃ মনোরঞ্জন ধর, জনাব মশিউর রহমান, মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও জনাব মোহাম্মদ মনসুর আলী। —আলোক চিত্র : আজাদ

২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ দৈনিক আজাদে প্রকাশিত আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার সদস্যগণ।

ওদিকে আমাদের উপর সদস্য ও কর্মীদের উপদ্রব অব্যাহত গতিতে চলল। সম্ভব অসম্ভব দাবির পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলল। ইত্যবসরে কিছুসংখ্যক নতুন সদস্য ঢুকে পড়ল প্রতিষ্ঠানের ভেতর। তারা প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী কিংবা হবু-ব্যবসায়ী। ক্ষমতার সাথে তাদের থাকতেই হয়—ক্ষমতার সাথে তাদের চলে যেতেও হয়। ছোট বড় মাঝারি রাতারাতি আওয়ামী লীগের সভ্য হয়ে গেল। পুরাণ কর্মী যারা, ত্যাগ ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যারা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তাদের অনেককেই ঠেলে দেয়া হল পেছনের কাতারে। নতুনের দাপটে পুরাতন সভ্য প্রায়ই অসভ্য হয়ে গেল। আমাদের ভেতর দালালি শুরু হলে পরিণাম যে আত্মঘাতী, এ কথা বোঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না - থাকতেও পারে না। প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের দরদ থাকার কথা নয়। প্রতিদিনের দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করে তিলে তিলে যে প্রতিষ্ঠান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, গত কয় বছরের সাধ্য-সাধনার ভেতর দিয়ে তার কোন অধ্যায়ের সাথে এদের পরিচয় নেই। অনেকেই ঐসব নির্যাতনের হোতা ও উদ্যোক্তা ছিল। দুর্দিনে অনেকেরই সাক্ষাৎ মিলেনি। আজ সুদিনে তারা এসে ভিড় করেছে তীর্থের কাকের মত।

আমাদের উপরের মহলে কোন্দলটা যাতে বেশি করে পেকে উঠে তার চেষ্টায় তারা ইন্ধন জোগাতে লাগল। এর খবর ওর কাছে, ওর খবর এর কাছে দিনরাত এরা সরবরাহ করে দু'দিকেই মজলিস গরম রেখেছে। এই তাদের একমাত্র মূলধন। এ ছাড়া কোন মহলেই তারা খাতির পেতে পারে না। একদল আমার কাছে এসে সেক্রেটারী কি করছে আর বলছে সালঙ্কারে তার বিবরণ দিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে। উঠে গিয়েই সেক্রেটারীর কাছে এক দল ফর্দ দাখিল করেছে। সে ফর্দে আমার মন্তব্য বা বক্তব্য বলে এমন সব কথা চালিয়ে দিয়েছে, যা আমি বলিওনি, ভাবিওনি। সত্যের সাথে অবশ্য এ সব রিপোর্টের কোন সম্পর্ক কোন কালেই ছিল না।

একদিন শুয়ে আছি, অসুস্থ। দেখা করতে এলেন কয়েকজন। দেহটা ভাল ছিল না বলে কথা কইবার প্রবৃত্তিও ছিল না। তারাই শুরু করলঃ–'স্যার, সেক্রেটারীর আচরণ অসহ্য, যা তা বলেন আপনার বিরুদ্ধে। এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। আমরা মরে গিয়েছি নাকি?' বললাম, 'এত উত্তেজনা দেখিয়ে লাভ কি? খবর নিয়ে দেখি তিনি কিছু অন্যায় বলেছেন কি না।'–'খবর নিয়ে? আমরা কি তবে মিথ্যা বলছি না কি?'–'না, না, তা হবে কেন? ভুলও ত বুঝে থাকতে পার।' হেসে বলল,–'স্যার, আপনি আজব মানুষ। নিজ কানে শুনে এলাম, ভুল বুঝব?' তারপর থেমে বলল–'স্যার, আপনি হযরত ঈসার মত এক গালে চড় খেয়ে আর এক গাল পেতে দিতে পারেন। আমরা পারব না।'–'না পার, চুপ থাক।'

আমার ওখান থেকে উঠে সটান সেক্রেটারীর বাড়ি গিয়ে হাজির। সেখানেও ঐ পালা। চীফ মিনিস্টার দল পাকাচ্ছে, আপনাকে শায়েস্তা করবে। একজন পুরান কর্মী উপস্থিত ছিল। আমার এখানেও সে উপস্থিত ছিল। সে বাধা দিতে গেলে সবাই তাকে ধমকিয়ে চুপ করে দেয়। কয়দিন পর আমাকে সে এসে বলল,–'স্যার, আর রাজনীতি করব না। মিথ্যা কথা বলে কারও মন যুগিয়ে চলা যদি রাজনীতি হয়, তাহলে আমি সে রাজনীতি করতে পারব না। এ কয়দিন আমি ঘুমোতে পারিনি। আপনার কাছে ওরা কি বলল, আর সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে ওরা কেমন করে মিথ্যা কথা সব বানিয়ে বলল। অবাক হয়ে গেলাম। কি মোনাফেক এরা।' বললাম–'রাজনৈতিক আদর্শ না থাকলে তার ধরন এমনি হতে বাধ্য। ওদের কোন লক্ষ্য বা আদর্শ নেই। যা আছে, তাই পুঁজি করে ওরা বেঁচে আছে। দুঃখ কর না।'

একদিন সেক্রেটারীকে বললাম, 'কালক্রমে একটা ভীষণ অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে উভয়ের। যদি এসব অঙ্কুরেই বিনাশ করে না দেই, তাহলে বিষবৃক্ষে পরিণত হবে।' বললেন,–'কিচ্ছু ভাববেন না। লোকে যা বলে তাই বিশ্বাস করবেন না।' বললাম–'বিশ্বাস ত আমি করিই না। ওকালতি করে একটা বদ অভ্যাস হয়েছে যাচাই না করে, জেরা না করে, কোন কথা সহজে গ্রহণ করি না, তা যতই মুখরোচক ও আপাতমধুর হোক না কেন। কতগুলি লোক আপনাকে ঘিরে বাঁচবার চেষ্টা করে। তাদের মূলধন ও

সম্বল হচ্ছে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করা।'–'না, না, কি যে বলেন, আশ্চর্য। কিছু লোক আপনাকে নানা কথা বলে বিগড়ে দিয়েছে।'–'জী না, বিগড়াবার লোক আমি নই। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। কারা চাপলুপী করে, আর কারা সত্য কথা বলছে তা বুঝতে পারি। কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। আমাকে কেউ ফুলিয়ে কলাগাছ করতে পারবে না। আমি যা তাই।' বললাম–'আমার জ্ঞান-বুদ্ধি যোগ্যতা সীমাবদ্ধ। আমার মত লোকের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মত। এখান থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাবার চেষ্টা করছি। একটা দিব্যজ্ঞান লাভ করেছি - আমার যা যোগ্যতা তার পরিমাণে পদ-মর্যাদা আমি পাবই, কেউ রুখতে পারবে না। যার যোগ্য নই, তা কেউ দিতে পারবে না, স্বয়ং আল্লাহ্ও তা দিবেন না, দিতে পারেন না। তাহলে বিচার বিভ্রাট হবে। এটা বিশ্বাসের অঙ্গ - যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারব না।' তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে বললাম, 'যদি মনে করেন, আমার গদিতে থাকা উচিত নয়, পরিষ্কার বলে দেবেন, কোন সাজ-সজ্জা করতে হবে না। সরে পড়ব।' উত্তেজিত হয়ে বললেনঃ 'না, না, এ সব কিছু করতে হবে না। আপনি চুপ থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বললামঃ ইনশাল্লাহ্।

মাঝে একবার করাচী গেলাম। নেতার সাথে আলাপ হল। তিরানব্বই কি করে উঠান যায়। ফিরোজ খাঁ নুন, ইসকান্দার মীর্যা–এদের সাথে আলাপ করতে হয়। দেখলাম, নেতাও খানিকটা বদলে গেছেন। আমরা কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। নেতা এক এক করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, কাকে দিয়ে গভর্ণমেন্ট গঠন করা হবে। তোমাকে? তোমাকে? তোমাকে?

চমকে উঠলাম। অন্য কাউকে দিয়ে সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত তা হলে নেতা গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং কাদের প্ররোচনায় তাও বুঝতে কষ্ট হল না। বললাম, কেন, কাকে দিয়ে করবেন, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?–নিশ্চয়ই আছে। তোমার উপর কারুর আস্থা নেই। আমার নিজের দলেরও অধিকাংশ তোমাকে চায় না। বললাম, স্যার, একেবারে নতুন তথ্য আপনার কাছে শুনছি। যদি আমার দলের লোক না চায় তাহলে তো আমার থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। অধিকাংশ দূরের কথা, যদি কুড়ি জন লোকেরও আমার উপর আস্থা না থাকে তাহলে আমি আর যেতে চাই নে। কিন্তু জানতে চাই এটা কি আপনি নিজের জ্ঞানে বলছেন, না, অন্য কারও কথায় বলছেন?–কেন, নিজেই জানি। বহু লোক আমার কাছে এসে তোমার বিরুদ্ধে বলেছে, বহু অভিযোগ, অনুযোগ করেছে। বললাম, তাতে কি হয়েছে? অভিযোগ অনুযোগ এক কথা আর অনাস্থা অন্য কথা। অভিযোগ করে বলে আমার উপর আস্থা নেই, এ কথাও কি বলেছে? তারা আমাকে বদলিয়ে অন্য নেতা নির্বাচন করবে, এ কথাও কি বলেছে? বললেন, ওর মানে তাই। বললাম, তা ত হতে পারে না। অভিযোগ-অনুযোগ আমাদেরও আছে আপনার বিরুদ্ধে, নিজেরা আলোচনা করি হরদম, দুঃখ প্রকাশ করি। কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য নেতা নির্বাচন করব, এ কথা কল্পনা করতে পারিনি। নেতা চুপ করে রইলেন। বললাম, স্যার, ঢাকা আসুন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, তারা আমাকে চায়, না অন্য কাউকে নেতা করতে চায়। এর উত্তরই প্রশ্নের সমাধান করবে। এর পর আমার আর কিছুই বক্তব্য থাকবে না।

নেশার ঘোরও কেটে যাচ্ছিল আমার। স্থির করে ফেললাম, আর না। নেতার আস্থাও হারিয়ে ফেলেছি–এর পর রাজনীতির নাম মুখে আনাও বেহায়াপনা। কিন্তু কম্বল ত ছাড়ে না। মাকড়সার জালের মত চারদিক বেড়ায়ে ধরে। ছুটতে চাইলে বের হওয়া যায় না।

নেতা এলেন ঢাকায়। বললেন, দু'মাসের আগে কিছু করা যাবে না। তবে আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি, মাথা গুণতি করার, তা ওরা গ্রহণ করেছে। গভর্ণর এটা করবেন এবং তাঁকে সহায়তা করবার জন্য কেন্দ্র থেকে একজন কর্মচারী আসবেন। বললাম, স্যার, আমি এতে নেই। অন্য কাউকে খুঁজে বের করুন। যার শখ অদম্য তাকেই নিন।–এ সব বাজে ব'ক না। ঝগড়া করার সময় এখন নয়। তাল সামলাতে হবে। পরে দেখা যাবে কি হয়।

কেন্দ্র থেকে পীর আহসান উদ্দিন এলেন গভর্ণর সুলতান উদ্দীনকে সাহায্য করার জন্য। দুই দলের শক্তির মহড়া চলল বেশ কয়েকদিন। যাদের সার্টিফিকেটে অনিন্দনীয় তাদের সম্বন্ধে কারোর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দিগ্ধ যারা তাদেরে হাজির করে তাদের মতামত প্রকাশ করতে হল তদন্তকারীদের সামনে। তাতেও সন্দেহ ফুরায় না। দু'-একজন এমন আছেন, যাঁরা মুখে বলে এলেন অমুক দলে আছেন, ফিরে আসার পরই চিঠি দিয়ে গভর্ণরকে জানালেন, ওটা খাঁটি মত নয়, তিনি সত্যি সত্যিই অন্য দলে আছেন ও থাকবেন।

দুই মাসের মেয়াদ ফুরিয়ে আসার আগেই গভর্ণর জানিয়ে দিলেন, আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন দল সংখ্যায় ভারী। যদিও খুব বেশি সংখ্যায় নয় তবুও সংখ্যাগুরু। আগস্টের শেষ দিকে হুকুম এল আবার মন্ত্রিসভা গঠন করার। গভর্ণর আমাকে কমিশন করলেন। আমার সাথে কে কে মন্ত্রী হবেন তার লিস্টও নেতাই ঠিক করে দিলেন। আমাকে ডাকেনওনি, জিজ্ঞেসও করেননি। তবে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন কে কে মন্ত্রী হবেন, আর কি কি বিভাগের ভার তারা নেবেন।

বেশ রদ-বদলের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভাগও বদলে দেয়া হয়েছে। এ সব না করলে ভালই ছিল। নেতাকে খুব হাত করে নেয়া হয়েছিল, নইলে এতটা করতে তিনি রাজি হতেন কি না সন্দেহ। অসুস্থ ছিলাম–বিছানায় পড়া। স্থির করলাম, যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? এরপর কপালে কি আছে বলা যায় না। যে পাল্লায় পড়েছি, তাতে সহজে নিস্তার নেই। মরার পরও আক্রোশ থাকবে, এমন কি বাড়বেও হয়ত। দু'-একজনের কাছে প্রকাশ করলাম। কথাটা নেতার কানে গেল। তিনি একদিন হঠাৎ বাসায় এসে হাজির। আমার সিদ্ধান্ত বললাম, বার বার কেন ওই এক কথা বলে আমাকে আটকে রাখছেন। আল্লাহর ওয়াস্তে অব্যাহতি দেন। আমি কমিশন ফেরত দেই। যার গরজ বেশি, শখ বেশি, তিনি ভার নিন। তাঁকেই ডাকা হোক। বললেন, তা ত হতেই পারে না। ছেলেমি করো না। এই বলেই সব তর্ক বন্ধ করে দিয়ে উঠে পড়লেন।

আবার একদা অশুভক্ষণে মন্ত্রিত্বের শপথ নিলাম॥"[১২২]

পাঁচ

"... পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবর রহমানকে বাড়ী-গাড়ীসহ মোটা ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া পাকিস্তান টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এমনকি তিনি শেখ সাহেবকে দামী লিমুজিন গাড়ীও উপহার দেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসাবেও প্রেরণ করেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া শেখ সাহেবকে উক্ত মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে শেখ সাহেব জাতীয় পরিষদ সদস্যরূপে রাশিয়া মুখে রওয়ানা হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্ব হইতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পদত্যাগের পরপরই পাকিস্তান সরকার শেখ সাহেবকে জেনেভা হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করেন।

নানা কারণ ও অজুহাতে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির একাংশ আওয়ামী লীগ দলীয় মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিরুদ্ধে উপদল গঠন করিবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মিঃ রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বে 'সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ভুক্ত' কতিপয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, দ্বিতীয়তঃ উত্তরবঙ্গ প্রদেশের দাবিতে আওয়ামী লীগ দলীয় কতিপয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, তৃতীয়তঃ 'ক্লোজ ডোর অপারেশন' (Close Door Operation)-এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কংগ্রেস দলীয় কতিপয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আতাউর রহমান খান সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

---

[১২২] আতাউর রহমান খান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী)/ওজারতির দুই বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ২০০০। পৃ. ১৪৯-১৫৩/২০৩-২০৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা ভাসানী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশও আতাউর রহমান খান মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দ্বিধাবিভক্ত কৃষক-শ্রমিক পার্টি আভ্যন্তরীণ কোন্দল ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সৈয়দ আজিজুল হক স্বীয় নেতৃত্বের দাবি ত্যাগ করিয়া পার্লামেন্টারী নেতা সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেন।

বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ চাপ ও আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান নিকট ভবিষ্যতে ভরাডুবির আশংকায় ৩০শে মার্চ গভর্নর শেরে বাংলাকে প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মূলতবী রাখিবার আহবান জানান। বৈরী গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান সরকারের প্রতি অধিকাংশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু সদস্যের আস্থা নাই অজুহাতে তাহাকে পদচ্যুত করেন ও আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহবান জানান। নূতন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরই তাঁহার পরামর্শে গভর্নর প্রাদেশিক পরিষদ মূলতবী ঘোষণা করেন। এই দিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূন ৩১শে মার্চ শেরে বাংলাকে গভর্নর পদ হইতে অপসারণ করেন এবং ১লা এপ্রিল প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার এক ঘন্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে পদচ্যুত করেন। পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জনাব আতাউর রহমান খান ৯ সদস্যবিশিষ্ট সরকার গঠন করেন।

নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ও ক্ষমতার লালসাসর্বস্ব এই রাজনীতির খেলা দেশবাসীকে হতবাক ও বিক্ষুব্ধ করে। ফলশ্রুতিতে সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। দর্শকদের জন্য খেলা এইখানেই শেষ হয় বটে, কিন্তু পর্দার অন্তরালে খেলা অব্যাহত থাকে। আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রচেষ্টায় পুনঃ দেশব্যাপী অবাঙ্গালী বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ৪ঠা জুন (১৯৫৮) করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ, কেন্দ্রীয় সামরিক-বেসামরিক চাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চনার ঘোরতর ও গভীর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনয়ন করেন। এইভাবেই ১৯৫৯ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কড়ি অগ্রভাগেই আদায় করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান। সত্যই ক্ষমতার রাজনীতির গতি কি বিচিত্র।

১৮ই জুন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে তেত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট ন্যাপ নিরপেক্ষ থাকিবার দরুন আতাউর রহমান খান সরকার সংখ্যাধিক্য হারাইয়া ফেলেন এবং ১৯শে জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু ২২শে জুন অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। কেননা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ভুক্ত পরিষদ সদস্যবর্গ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। ২৫শে জুন (১৯৫৮) পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তিত হয়।"[১২৩]

ছয়

"... আমি দেশে ফিরে এসে দুটো জিনিস লক্ষ করলাম। প্রথমত আতাউর রহমান সাহেব ও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে এত ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে যে দুজনের একজনকে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল। শেখ সাহেব শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফা দিয়ে 'টি বোর্ডের' চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নতুন নিয়মে স্থির হলো যারা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা হবেন, তাঁরা মন্ত্রী থাকতে পারবেন না। সুতরাং মন্ত্রিত্ব থাকল আতাউর রহমান সাহেবের হাতে। সংগঠন গেল মুজিবুর রহমান সাহেবের অধীনে। মওলানা ভাসানী সাহেব ও অন্য কয়েকজন কর্মকর্তা সংগঠন

---

১২৩ অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ২৩৭-২৩৯]

ছেড়ে যাওয়ায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মুজিবই সংগঠনের একমাত্র নেতা বলে পরিগণিত হলেন। নতুন সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ নামেমাত্র সভাপতি রইলেন। সংগঠন যার হাতে পরবর্তী নির্বাচনে তার লোকই সাধারণত বেশিসংখ্যক সদস্য হয়। তাই সাময়িকভাবে আতাউর রহমান সাহেব, আবুল মনসুর আহমদ সাহেব আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমাসীন থাকলেও তাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। পরবর্তীকালে তাদের আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করার কারণে এবং মুজিবের একমাত্র নেতৃত্ব লাভের কারণ এখান থেকেই আরম্ভ।

... এবার ঢাকা গিয়ে মনটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো, আওয়ামী লীগ ভাঙার পথে। শেখ মুজিব ও আতাউর রহমানের মধ্যে সম্পর্ক এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে তাদের কারোর পক্ষে ফেরার পথ নেই।

... হঠাৎ শেখ মুজিবের একটি টেলিগ্রাম পেলাম যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখানে গিয়েছিলেন তিনি লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ গ্রান্টে। টেলিগ্রামের সারমর্ম হচ্ছে তিনি ঢাকার পথে রেঙ্গুন হয়ে কলকাতা আসবেন এবং দুদিন থেকে পুরাতন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে ঢাকায় ফিরবেন। আমার বাসাতেই থাকবেন। ঠিকানা দেওয়া নেই। সুতরাং আমাকে আর উত্তর দেবার প্রয়োজন হলো না। ভাবলাম, ভালোই হলো। মুজিবের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। এ সুযোগে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা যাবে, আতাউর রহমান সাহেবের সঙ্গে তাঁর একটা মিটমাট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যুক্তফ্রন্টে নির্বাচনে জেতার পর আর তেমন কোনো স্থায়ী সরকার পূর্ব বাংলায় হয়নি। অন্যদিকে যখন আতাউর রহমানকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল তখন তাঁকে সাধারণ নির্বাচন না হওয়া অবধি সমর্থন দেওয়া হবে এইরূপ ধারণা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৮ সনে সাধারণ নির্বাচন, সুতরাং তাঁকে আর জ্বালাতন করে লাভ কী? নতুন নির্বাচন হলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে গেলে, আবার সবাই তার নেতৃত্বে কাজ করবেন।

এদিকে শীতকালীন অধিবেশন ঢাকায় আরম্ভ হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই রেঙ্গুন থেকে 'লংডিস্ট্যানস কল' এল–অপর প্রান্তে শেখ মুজিব। বললেন, 'আগামীকাল বার্মা এয়ারওয়েজ কলকাতা পৌঁছবে–দুপুর বারোটা থেকে একটার মধ্যে। গাড়ি পাঠাবেন।' পরদিন বাবুর্চিকে বললাম লাঞ্চ তৈরি রাখতে। বেয়ারাকে বললাম গেস্টরুমটা ঠিক রাখার জন্য। পরের দিন যথাযথ গাড়ি পাঠানো হলো। আমি ও আমার স্ত্রী খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বেলা একটার দিকে গাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢোকার শব্দ পেয়ে আমরা দুজনে দোতলার সিঁড়ির নিকট আসতেই শুনি, মুজিব কী নিয়ে খুব চেঁচামেচি করে ওপরে উঠে আসছেন–সঙ্গে নূরুদ্দীন সাহেব ও মোয়াজ্জেম সাহেব।

ওপরে এসেই বললেন, 'না ভাই সাহেব, আপনার এখানে বেড়ানো গেল না। আতাউর রহমান ভেবেছে কী? হাতির পাঁচ পা দেখেছে বুঝি? আমি আজই ঢাকায় যাব। সাত দিনের মধ্যে তার মন্ত্রিত্ব ঘুচিয়ে যদি না দিই, তবে আমার নাম শেখ মুজিব নয়।' আমি বা আমার স্ত্রী কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না। আমরা একেবারে, যাকে বলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী তাঁকে বললেন কাপড়-জামা ছেড়ে কিছু খেয়ে নিতে। আরও বললেন, অন্য কোনো কারণে না হোক, আমরা দুজনই রোগাক্রান্ত এবং তখনো অভুক্ত। মুজিবের বোধ করি সংবিৎ ফিরে এল। আমি সবাইকে হাত-মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে আসতে বললাম। নূরুদ্দীন সাহেব ও মোয়াজ্জেম সাহেব খেলেন না।

খাবার টেবিলে বসে মুজিবকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? উত্তর হলো যে আমার জেলার পুলিশ সুপারকে তো আগেই বদলি করে দিয়েছে মোহন মিঞার কথামতো। আজ এসে শুনলাম, ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আহমদ ফজলুর রহমানকেও সাত দিন আগেই বদলি করে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে বলেছে। তাও মোহন মিঞার কথামতো। আমি বললাম, একটু স্থির হোন। আমি দেখি

আতাউর রহমান সাহেব কী করেছেন। এমনি তাড়াহুড়া করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলি করে দিল। মুজিব বললেন, কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি কেবল আজ আমাকে ঢাকায় যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

আমি খানিকটা হতাশ হয়ে পিআইএ এজেন্টকে টেলিফোন করে দিলাম এবং শেখ সাহেবের জন্য একটা আসন রিজার্ভ করে রাখতে বললাম। মুজিব আসছেন বলে যে কারণে খুশি হয়েছিলাম, সে আলোচনাটাই আর করা গেল না। আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, আতাউর রহমান সাহেবের মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান ঘটছে। সত্যি, হলোও তাই। সাত দিনের মধ্যেই খবর পেলাম যে মাহমুদ আলী সাহেব ও তাঁর নয়জন ন্যাপ সদস্য আতাউর রহমান সরকারের ওপর তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে আতাউর রহমান সাহেবের মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। শহীদ সাহেব করাচি থেকে ছুটে এসেছেন পূর্ব পাকিস্তানে, তারপর নিপুণতা ও দক্ষতার সঙ্গে ন্যাপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আবার ন্যাপের সমর্থন জোগাড় করতে সমর্থ হলেন। দু-তিন দিনের মধ্যেই আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পতন হলো এবং আতাউর রহমান সাহেব পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। মাঝখান থেকে জমিরুদ্দীনের পলিটিক্যাল সেক্রেটারির চাকরিটাই কেবল গেল এবং তার ছেলে শামসুল হক (পরিষদ সদস্য) পলিটিক্যাল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হলেন॥"[১২৪]

সাত

"... In retrospect, it raised to memory many past politics. Like his tongue, Mujib had a razor-sharp memory, particularly in the domain of relationship of himself and the rest of the world. With him, it was never any ideology or principle or people's wellbeing that determined the course of his actions; someone was loveable and good if he was docile and subservient to him, if not, he was an enemy. One might attribute such mental state to a depressive man underneath his ever-accusing and constantly contemptuous conuvlsions; inside him, worked a phobia which usually came from lack of education, lack of confidence, undesevering high ambition and complicated complexes. His ambiguous mental-machine made him as good at everything as none else could. But, whatever be the situation, and whosoever confronted, him couldn't help his overbearing presence. When he decided to be amiable, he was magnetic.

His undaunted peering at persons kept everyone at limbo. His high-strung confabulations rendered everyone around him a near captive. He never wore himself out, or felt an ebbing in his enormous physical energy. From the very beginning of Awami League politics, the relationship between Mr Ataur Rahman Khan and Sheikh Sahab had been one of psychic strain.

Mr Khan was a renowned lawyer with a reputation of sobriety and moderation. Then, again, by virtue of his age and social status he used to be placed in higher order than the Sheikh. But the first Awami League Joint-Secretary (the other one was Khondoker Moshtaque Ahmed) was a dynamic worker, and the rank and file, particularly the young forces, were his chums. Also, the party cadre more or less belonged to him. While Mr Khan decorated the chair and felt happy to preside over the working committee and public meetings, the Sheikh invariably used to have the day turned to his advantage by his oratorial ferocity. Auvncular Ataur Rahman Khan used to speak, too, but, that was when the public felt a little sleepy.

When the anti-Muslim League joint-front consisting of Awami Muslim League, Fazlul Haque's Krishak Sramik Party (KSP) and Nezam-e-Islam fought and won 95 percent seats in East Pakistan Assembly in 1954 provincial election, Chief Minister Fazlul Haque formed

[১২৪] কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী ॥ [প্রথমা প্রকাশন - অক্টোবর, ২০১৮। পৃ. ১১৯/১৮৯/১৯১-১৯২]

the ministry with Ataur Rahman Khan and other Awami members. Sheikh Mujib, despite his eager volunteering, was not taken in the cabinet by Fazlul Haque. Sheikh Mujib then got a resolution passed in the Awami League working committee that until and unless he was made a minister, no Awami League members would join the Joint-Front cabinet! Ataur Rahman Khan and Abul Mansur Ahmed, despite their intentions to join the cabinet, were kept at bay by the resolution. The 1954 Joint-Front was a victory for the crores of people of East Pakistan, who had just made a gigantic constitutional revolution by killing the invincible Pakistan Muslim League, the architect of Pakistan. It was a personal, innate ambition of one man versus the whole gamut of people's confidence and hopes that got enmeshed in hazy hopelessness.

The tussle between Ataur Rahman and Sheikh Mujib on the issue of ministership assumed a never-ending dimension, which could be called the single most important factor that shaped and influenced the subsequent decades of politics and history. It cannot be said though that Sheikh did not know how to adjust and accommodate the nuances. On the intervention of Karachi-based absentee-leader, Surwardy, after about a month since the formation of the cabinet with KSP and Nezam-e-Islam members only, Sheikh Mujib sacrificed the snag-resolution that impeded the formation of fullfledged joint-front ministry with Awami League, but not before he was designated a minister of the government of East Pakistan in charge of the ministry of cooperative. Although, most of the time, the two Rahmans didn't see things from the same angle, nonetheless, their identical sense of gumption for largesse was never laconic. Ataur Rahman Khan as the civil supply minister, Mujibur Rahman as cooperative minister, forgot their short-term psychological strains and remained for some time at peace, albeit, not for long.

Subsequently, the Joint-Front government was toppled by Sheikh and split into factions by applying the same strategy, as was with NDF, by withdrawing from the people's hope, otherwise known as the Joint-Front. It was then Awami League vs Fazlul Haque's KSP and Nezam-e-Islam. There were instances of physical manhandlings between the Awami League and KSP members, not outside, but right inside the Assembly, particularly between Sheikh Mujib and the king maker Mohan Mia. In the last riot that saw throwing of chairs and other missiles like paperweights, even iron-rods, the presiding Deputy Speaker, Shahed Ali, an aged man with hazardous health condition, was struck and fatally wounded. Such episodes on the part of the Honorable Assembly members and many other factors led to the downfall of KSP government.

I was present that day inside the Assembly, sitting in the visitors gallery, saw the skirmish first-hand which brought in the Awami League ministry with Ataur Rahman Khan as the Chief Minister of East Pakistan in 1956.

In view of his influence on the party-apparatus, Sheikh Mujib was the likely and practical choice to be the Chief Minister; he would love to be so, but his age and habit didn't earn the choice from the high command: Surwardy. To quote Surwardy, 'I didn't believe my ears when I first heard that Mujib wants to be a Minister in Fazlul Haque's cabinet! How could it be possible? It is downright ridiculous and nonsense"!

Surwardy's choice of Ataur Rahman Khan as the Chief Minister of East Pakistan was never free from a thunderous backlash, which afflicted not only the relationship between the two Rahmans, but also had many sore spots bared between Mujibur Rahman and Surwardy himself."[১২৫]

---

[১২৫] Iqbal Ansari Khan/The Third Eye : Glimpses of the Politicos \ [UPL - 1991| p. 34-37]

আট

"... ইতিমধ্যে গৃহ-বিবাদের অশান্তি আমাদের পাইয়া বসিয়াছিল। আতাউর রহমান সাহেব ও মুজিবুর রহমান সাহেবের মধ্যে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনই আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক। দুই-এর দক্ষ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ-মন্ত্রিসভা এক বছরে অনেক ভাল কাজ করিয়াছে। ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ওয়াপদা, আই-ডবলিউ-টি-এ, ফিল্ম কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ইত্যাদি নয়া-নয়া শিল্প ও সংস্থা স্থাপন এবং খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড, কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ এই ধরনের আরদ্ধ স্কিমগুলি ত্বরান্বিত করণ, বর্ধমান হাউসে আইনমাফিক বাংলা একাডেমি স্থাপন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ তাঁরা করিয়াছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ইহাদের পার্লামেন্টারি সদাচার। নির্বিচারে সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তিদান, নিরাপত্তা আইনসমূহ বাতিলকরণ, নিয়মিতভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে অফিসারদিগকে কঠোরভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখা, নির্ধারিত সময়ে আইন-পরিষদের বৈঠক ডাকা, বিনা-বাজেট-মনযুরিতে খরচ না করা, ইত্যাদি সকল ব্যাপারে আদর্শ গণতান্ত্রিক সরকারের উপযোগী কাজ করিয়াছেন।

এই সর্বাংগীন সদাচারের মধ্যে চাঁদের কলংকের মতই ছিল আতাউর রহমান–মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ। এই বিরোধের সবটুকুই ব্যক্তিগত ছিল না, অনেকখানিই ছিল নীতিগত। কিন্তু কতটা নীতিগত আর কতটা ব্যক্তিগত, তা নিশ্চয় করিয়া বলা এখন সম্ভব নয়, তখনও ছিল না।

... ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিডার যখন আমাকে আতাউর রহমান–মুজিবুর রহমান বিরোধের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার নির্দেশ করিতে আদেশ করেন, তখন এক মাস পরে চরম বিপদের কথা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তথাপি মুজিবুর রহমানের কাজ-কর্ম আমার ভাল লাগিতেছিল না। তাঁর প্রতিষ্ঠান-প্রীতি আসলে নিজের প্রাধান্য-প্রীতি বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল। আমার নিজেরও এ ব্যাপারে অভিযোগ ছিল।

... একদিন কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের বৈঠকের সময় করাচিতে সমারসেট হাউস নামক মেম্বরমেসে কতিপয় প্রথম কাতারের আওয়ামী নেতার সামনে আতাউর রহমান প্রস্তাব দিলেন যে আমার পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিত্ব গ্রহণ করা উচিৎ। মওলানা ভাসানীর পদত্যাগের পর কয়েকমাস ধরিয়া ঐ পদ খালি ছিল। ভাইস-প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ স্থলবর্তী হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন। সবাই উৎসাহের সাথে আতাউর রহমানের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠানের অফিসবিয়ারাররা মন্ত্রিত্ব বা অন্য কোনও সরকারি পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। পার্লামেন্টারি রাজনীতি হইতে সরিয়া যাইবার উপায় হিসাবে এই একটা বড় সুযোগ। লিডারের দেওয়া পার্টি-সংগঠনের দায়িত্বও এতে পালন করিতে পারিব। আমি আতাউর রহমানের প্রস্তাবে তাই মোটামুটি সম্মতি দিলাম।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই আমরা করাচি থাকিতেই জানিতে পারিলাম মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যে ঢাকা ফিরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় মওলানা তর্কবাগীশকে স্থায়ী সভাপতিত্বে বহাল করিয়াছেন। আতাউর রহমান কাগযে প্রকাশিত খবরটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেনঃ 'দেখলেন ভাইসাব, আপনেরে সভাপতি করায় সেক্রেটারির অসুবিধা আছে।'

ঘটনাটা ছোট কিন্তু তুচ্ছ নয়। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য খুবই এমবেরেসিং। সমালোচনা করা কঠিন; প্রতিবাদ করা আরও কঠিন। অথচ আতাউর রহমানের অভিযোগ সত্য। সত্যই মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল যে তিনি যেটাকে পার্টি-প্রীতি মনে করিতেন সেটা ছিল আসলে তাঁর ইগইযম আত্ম-প্রীতি। আত্ম-প্রীতিটা এমনি 'আত্মভালো' বিভ্রান্তিকর মনোভাব যে ভাল-ভাল মানুষও এর মোহে পড়িয়া নিজের পার্টির, এমন কি নিজেরও, অনিষ্ট করিয়া বসেন। আমি যখন কংগ্রেসের সামান্য একজন কর্মী ছিলাম, তখনও উঁচুস্তরের অনেক কংগ্রেস নেতার মনোভাব দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতাম।

তাঁদের ভাবটা ছিল এই : স্বরাজ দেশের জন্য খুবই দরকার। কিন্তু সেটা যদি আমার হাত দিয়া না আসে, তবে না আসাই ভাল। আমার বিবেচনায় মুজিবুর রহমানের মধ্যে এই আত্ম-প্রীতি ছিল খুব প্রবল। এটাকেই তিনি তাঁর পার্টি-প্রী।তি বলিয়া চালাইতেন। এই জন্যই আতাউর রহমানের সহিত তাঁর ঘন-ঘন বিরোধ বাধিত। এই বিরোধে উভয়েই আমার বিচার চাহিতেন, অর্থাৎ সমর্থন দাবি করিতেন। সে বিচারে আমি অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছি। নিরপেক্ষ সুবিচারের ভড়ং দেখাইতে গিয়া আমি অপরাধ করিয়াছি বলিয়া এতদিনে আমার মনে হইতেছে।

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকেই এই বিরোধ পাবলিকের আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। জুন মাসের প্রাদেশিক পরিষদ বৈঠকে আমরা সরকার পক্ষ ভোটে হারিয়া যাই। কে. এস. পি.র সাথে প্রায়-সমাপ্ত ব্যবস্থাটা শেষ মুহূর্তে ভাংগিয়া দেওয়ার এটাই ছিল প্রথম শাস্তি। ন্যাপের ভোটের উপর আমাদের গবর্নমেন্ট নির্ভরশীল ছিল। তারা ছিল পিছুটান। এন্টি- স্মাগ্লিং ক্লোযডোর অপারেশনে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান রাযী হওয়ায় হিন্দু সমর্থকদের অনেকেই বিরুদ্ধে গেলেন। আমাদের সংগীন অবস্থা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

লিডার (সোহরাওয়ার্দী) আমাকে গোপনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিতে বলেনঃ কার দোষ? কি কারণে এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে? লিডারের তখন পুরা সন্দেহ হইয়া গিয়াছে যে মুজিবুর রহমান নিজে প্রধানমন্ত্রী হইবার জন্য আতাউর রহমানের অযোগ্যতা ও অজনপ্রিয়তা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন। এর মধ্যে তদন্ত করিবার কি আছে? লিডার নিজেই দুইজনকে পৃথক-পৃথকভাবে জেরা-যবানবন্দি করিলেই ত হয়। আমি তাই বলিলাম। লিডার জবাব দিলেন, তিনিও ও-ধরনের সবই করিয়াছেন। এখন আমি কি করিতে পারি তাই দেখিতে চান।

আমি সাধ্যমত চেষ্টা ও 'তদন্ত' করিলাম। তদন্তের বিষয় ছিল উভয় বন্ধুর সাথে প্রাণ খুলিয়া দেশের মানে পূর্ব-বাংলার ভবিষ্যৎ নির্মাণে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এবং সেই পটভূমিকায় তাঁদের উভয়ের কর্তব্য। উভয়েই খুব জোরের সংগে যে সব কথা বলিলেন তার সারমর্ম গিয়া দানা বাঁধিল দুইটি পৃথক শাসননীতিতে। আতাউর রহমান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দায়িত্ব শৃংখলাবদ্ধ দক্ষ এডমিনিস্ট্রেশন। জিলা-মহকুমা শাসকবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত সকল অফিসার রাজনীতিক পার্টিবাযি, মেম্বরদের প্রভাব ও কর্মীদের চাপমুক্ত অবস্থায় নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি মত কাজ করুন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা এই। দলীয় কর্মী ও মেম্বরদের হস্তক্ষেপ তিনি পসন্দ করিতেন না। পার্মানেন্ট অফিশিয়ালরা সর্বদাই রাজনীতিক প্রভাবমুক্ত থাকিবেন, অন্যথায় পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা চলিতে পারে না, এই মত তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন।

পক্ষান্তরে মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। এ বিষয়ে তাঁর মত সুস্পষ্ট। প্রতিষ্ঠানকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করা তাঁর দায়িত্ব। নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করা এবং দলীয় সরকারকে দিয়া সেসব ওয়াদা পূরণ করান প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়াছে, মুষ্টিমেয় অফিসার ছাড়া সকলেই মুসলিম লীগ মনোভাবাপন্ন। আওয়ামী লীগ সংগঠনের উপর আগে তাঁরা শুধু যুলুমই করেন নাই, আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় আসাটাও তাঁরা পসন্দ করেন নাই। তাই নানাভাবে আওয়ামী মন্ত্রিসভাকে ডিসক্রেডিট করাই এঁদের সংঘবদ্ধ ইচ্ছা। এঁদের দিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা সফল করাইতে হইলে ইহাদের উপর আওয়ামী লীগ কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। এই উদ্দেশ্যে জিলা ও মহকুমা অফিসারদের উপর আঞ্চলিক আওয়ামী লীগের যথেষ্ট প্রভাব থাকা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এইরূপ শক্তিশালী করিতে চাহিতেছেন; পার্টির প্রধানমন্ত্রী তাতে বাধা দিতেছেন। সেক্রেটারির নযরে জিলা আওয়ামী লীগ বড়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বড়।

এটা আসলে শাসনযান্ত্রিক প্রশ্ন নয়, শাসনতান্ত্রিকও বটে। পার্টি বড়, না মন্ত্রিসভা বড়? প্রশ্নটা কিন্তু আকারে ও এলাকায় আরও বড়। পার্টি বড়, না আইনসভা বড়? আইনতঃ নিশ্চয়ই আইন-সভা বড়। কারণ আইনসভার সার্বভৌমত্বের, সভারেইন্টি-অব-দি লেজিসলেচারের উপরই গণতন্ত্রের বুনিয়াদ। কিন্তু ন্যায়তঃ পার্টি বড়। পার্টিতে আগে সিদ্ধান্ত হইবে; আইন-সভা সেই সিদ্ধান্তে অনুমোদনের রবার স্ট্যাম্প

মারিবে মাত্র। কারণ অপযিশন দলের মেম্বররাই শুধু সরকারি বিলের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন, পযিশন দলের মেম্বররা পারেন না। পার্টি গবর্নমেন্ট চালাইতে পার্টি ডিসিপ্লিন দরকার পার্টি পযিশনে আসে নির্বাচনে মেজরিটি করিতে পারিলে। নির্বাচনে জয়ী হইতে গেলে নির্বাচনী ওয়াদা বা মেনিফেস্টো দেওয়া দরকার। সে মেনিফেস্টো কার্যকরী করা পার্টির নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব। কাজেই সে দায়িত্ব পালনের উপায় নির্ধারণ ও আইন-রচনার কাজটা পার্টিতে স্থির হওয়া দরকার। পার্টির মেম্বররা কাজেই আইনপরিষদে দাঁড়াইয়া পার্টি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। এই ভাবেই পার্টি গবর্নমেন্ট কার্যতঃ আইন-পরিষদের সভারেইনটিকে পার্টি-প্রতিষ্ঠানের সভারেইনটিতে পরিণত করেন। এটা গণতন্ত্র ও পার্টি গবর্নমেন্টের চিরন্তন অন্তর্বিরোধ, ইটার্নেল কন্ট্রাডিকশন। ইহার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাদের সমাধানের আশায় আমরা বসিয়া থাকিতে পারিনা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পার্টি-সেক্রেটারির বিরোধ এমন আসন্ন হইয়াছে যে এটা এখনি মিটানো দরকার। আমি লিডারকে তদনুসারে আমার মত জানাইলাম। আমার অভিমত অনুসারে 'দোষ কার' প্রশ্নের মীমাংসার কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। আমার মতে উভয়ের দোষ ফিফটি-ফিফটি।

... লিডার আমার নিরপেক্ষতায় খুশি হইলেন। কিন্তু হাসিয়া বলিলেনঃ 'বিবদমান দুই পক্ষেরই দুশমন হওয়ার এমন সোজা রাস্তা আর নাই। কিন্তু আমি এদেরে লইয়া করি কি?' আমি সহজ উত্তর দিলামঃ নির্বাচন পর্যন্ত স্টেটাস কোও, যেমন আছে তেমনি বজায় থাকা॥"[১২৬]

[১২৬] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ৪২৫-৪৩০]

পঞ্চম পর্ব

গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক : ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যাকাণ্ড

এক

"... ১৯৫৮ সালের ঘটনা। সোহরাওয়ার্দী তখন আর প্রধানমন্ত্রী নন। সম্ভবত, ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রী; পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার চালাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা। তখন প্রাদেশিক আইন সভার বাজেট অধিবেশন চলছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল প্রাদেশিক আইনসভার স্পিকার আবদুল হাকিম বাজেটের ওপর রুলিং দিয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবেন। স্পিকারকে প্রাদেশিক আইনসভা অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখাই ছিল ঐ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ। হাকিম সাহেব আইন সভা (অ্যাসেম্বলি ভবন, এখন যেটা জগন্নাথ হল) ভবনে স্পিকারের চেম্বারে এসে হাজির হলেন। তাকে চেম্বারবন্দী করে রাখার জন্য ঘেরাও করে রাখলেন আমাদের সদস্যগণ। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন ঢাকায়। প্রাদেশিক আইনসভা ভবনের পরিস্থিতি তখন খুবই গোলমেলে। আমরা সঠিক কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা পাচ্ছিলাম না। আইনসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানসহ সবাই উপস্থিত।

আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো - শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে খুঁজে বের করে সেখানে নিয়ে আসার জন্য। আমি সারা ঢাকা শহর খুঁজে অনেক কষ্টে তার অবস্থান বের করতে সক্ষম হলাম। তিনি তখন একজন সুদর্শনা ভদ্রমহিলাকে সঙ্গী করে গুলিস্তান সিনেমা হলে বকস-এ বসে চলচ্চিত্র উপভোগ করছেন। এইভাবে তার সামনে হাজির হওয়াটা আমার পক্ষে প্রথমে খুব একটা শোভন মনে হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই, পরিস্থিতি খুবই নাজুক। অগত্যা আমি সিনেমা হলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বিনীতভাবে জানালাম যে, আমরা দারুণ সমস্যায় পড়েছি, আপনাকে এক্ষুণি প্রাদেশিক আইন সভা ভবনে যেতে হবে, আপনার জন্য সবাই সেখানে অপেক্ষা করছে। আমার কথাগুলো শুনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে একটা নিস্পৃহতার ভান করলেন। আসলে কিন্তু তিনি এতটা সরল ছিলেন না। তার মধ্যে যথেষ্ট চাতুর্য ও রাজনৈতিক ধূর্ততা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা তার রাজনৈতিক সঙ্গী-সাথী ছিলেন এবং তার কর্মকান্ড নির্মোহ বিশ্লেষণ করতে পারেন, তারা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের রাজনৈতিক শঠতা-ধূর্ততা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল। শেষ পর্যন্ত শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রাদেশিক আইন সভা ভবনে পৌছলাম। তখনো সেখানকার পরিস্থিতি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের কামরায় ঢুকে বসে পড়লেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। ততক্ষণে আতাউর রহমান খানসহ সবাই দারুণভাবে উত্তেজিত। কেউ কেউ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ওপর অসহিষ্ণু ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ফেললেন :

'আপনাকে সময়মতো পাওয়া যায় না, আপনি কোথায় বসে থাকেন, আর কোথায় যান, মানুষের কাছে মুখ দেখানো যায় না।' হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই ধরণের অভিযোগেও রেগে গেলেন না, বরং ধীরস্থির শান্তকণ্ঠে বললেন, 'না, আমি সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখেছি, তাতে মানুষ আর কি বলবে আমাকে।' তারপর রাজনৈতিক করণীয় নিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেন, 'আপনারা যে এখানে বসেছেন, কলম কই, কাগজ কই, আপনারা তো কিছু সিদ্ধান্ত নিবেন। কাগজ কলম কিছু নেই, সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবেন।' দেখলাম সোহরাওয়ার্দী সাহেব পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন। তিনি এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করলেন, এক নম্বর চিহ্ন দিয়ে লিখলেন যে, স্পিকারের বাড়ির সব টেলিফোন সংযোগের তার কেটে দিতে হবে, তার বাসভবনের সব সুযোগসুবিধা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে, বাসভবনের বিদ্যুৎ সংযোগও কেটে ফেলতে হবে, পানি সরবরাহ লাইনও বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে; এসব কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে নির্দেশ দিলেন।

আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও উত্তেজনার মধ্যে খানিকটা আনন্দ-উদ্বেল চিত্তে ভাবলাম–যাক আমাদের সংগ্রাম কিছুটা সফল হতে চলেছে। এর আগে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়েছিলেন এই স্পিকার হাকিম সাহেব। একইভাবে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর মন্ত্রীসভারও পতন ঘটাতে যাচ্ছেন। এই চক্রান্তের প্রতিরোধে একটা কিছু হচ্ছে বুঝতে পেরে আমরা তখন বেজায় খুশি। স্পিকার হাকিম সাহেব রাশভারী প্রবীণ ব্যক্তি। মাথার সব চুল ধবধবে সাদা। কিন্তু ভদ্রলোকের সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জন্য যে সাধারণ শ্রদ্ধাবোধ জাগার কথা তার বদলে তখন তাকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার ভাবনা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রাদেশিক আইন সভা অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী সভাপতিত্ব করবেন।

এতে বিপক্ষের সদস্যগণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। কারণ, তাতে তাদের চক্রান্ত সফল হবে না। তখন আমার সহধর্মিণী বেগম রেবেকা গুরুতর অসুস্থ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমি তাঁর শয্যাপাশে বেশ খানিকটা টেনশনের মধ্যে আছি। ওদিকে আইন সভার অধিবেশন কক্ষে কি হচ্ছে কিছুই জানি না। শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একটি জিপসহ একজনকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেই জরুরি পরিস্থিতিতে নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় জিপে চড়ে আইন সভা ভবনে গেলাম। গিয়ে দেখি অধিবেশন কক্ষের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি আর ঢুকতে পারলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খোলার পরে দেখলাম অধিবেশন কক্ষের ভেতরে তছনছ অবস্থা। জানতে পারলাম যে, ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আমি সেই পরিস্থিতিতে অধিবেশনকক্ষে ঢুকলাম, তখন অধিবেশনের বিরতি হয়ে গিয়েছিল। তবে দুই পক্ষের সদস্যদের মধ্যে অসৌজন্যমূলক পর্যায়ের ধমক-পাল্টা ধমক, হুমকি-পাল্টা হুমকি প্রভৃতি চলছিল। আমি আদৌ অধিবেশনকক্ষে না থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ শাহেদ আলীর ওপর আক্রমণে আমার অংশগ্রহণের অভিযোগও তুলেছে। অথচ সেই দুর্ঘটনার সময় আমি ছিলাম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, গুরুতর অসুস্থ স্ত্রীর শয্যাপাশে। পরবর্তীকালেও এমন অনেক বাজে ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে আমার কোনো অংশগ্রহণ ছিল না অথচ অভিযোগ করা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। অনেকেই সে সব অভিযোগ বিশ্বাস করেননি, তবে কেউ কেউ বিশ্বাস করায় সাময়িকভাবে হলেও আমি বিড়ম্বনায় পড়েছি, বেদনাহত হয়েছি৷"[১২৭]

---

১২৭ মহিউদ্দীন আহমদ (সাবেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা)/আমার জীবন আমার রাজনীতি ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারী ২০

দুই

"... আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনে কেএসপি (শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি) গ্রুপের (একটি অংশ) যোগদানের ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কেএসপি ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা করাচী গমন করিলেন। সেখানে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইল যে, জাতীয় স্বার্থে কেএসপি প্রধানমন্ত্রীর (সোহরাওয়ার্দী) হস্ত শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিয়া বিবৃতি প্রচার করিবেন। কেএসপি-কে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সবকিছু মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আমি রাত্রির প্লেনে ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু একদিন পরই জানিতে পারিলাম যে সবকিছু ভন্ডুল হইয়া গিয়াছে। 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল, জনাব আবুল মনসুর ও শেখ মুজিবুর রহমান তা অনুমোদন করেন নাই। শেখ মুজিব সেই খসড়াটি প্রধানমন্ত্রীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন আর প্রধানমন্ত্রী সেই দিনই রাত্রিবেলায় জাপান রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। কি অবস্থায় এই সব ঘটিয়া গেল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলাম না।

কেএসপি কোয়ালিশনে যোগদানের বিষয়টা এমনিভাবে পন্ড হইয়া যাওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইলাম। সৈয়দ আজিজুল হক অবশ্য ঢাকায় ফিরিয়া বিবৃতি দিলেন যে, আলোচনা অব্যাহত থাকিবে। বেচারা কেএসপি নেতাদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইল। সোহরাওয়ার্দীর কোয়ালিশনে যোগদানের আশায় তারা দল ভাঙিলেন অথচ সেই আশা পূর্ণ হইল না। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরিয়া আসার পর তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, শহীদ সাহেবের বিবৃতিতে এমন কতকগুলো কথা ছিল যা বাদ না দিলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি হইত। আমি 'মর্নিং নিউজে' প্রকাশিত শহীদ সাহেবের বিবৃতিটি ছিঁড়িয়া ফেলার খবরটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তা অস্বীকার করিয়া সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন আমি তাকে এই খবরের প্রতিবাদ করার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি জানাইলেন যে, করাচীতে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি যখন তাহাকে বলিলাম যে, এমন কোন প্রতিবাদ কোন পত্রিকায় আমি দেখি নাই, ঢাকার কোন পত্রিকায় এমন কোন বিবৃতি পাই নাই, তখন তিনি করাচীর কি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার বরাত দিয়া বলিলেন যে, সেই পত্রিকায় তার বিবৃতি বাহির হইয়াছে। বিষয়টির এখানেই তিনি ইতি করিলেন, প্রতিবাদমূলক কোন বিবৃতি তিনি আর দিলেন না।

... মূখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারী জমিরুদ্দিনের বাসভবনে আবার কেএসপি'র কোয়ালিশনে যোগদানের ব্যাপারে কেএসপি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত হইলেন। মূখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শহীদ সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল তিনি যেন কোন বিশেষ ব্যাপারে কিংকর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছেন না। পরে অবশ্য জানা গেল যে, কেএসপি'র আওয়ামী লীগে যোগদানের ব্যাপারটাই তাকে এমনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে, কারণ তার মফস্বল সফরকালে আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মীরা নাকি কেএসপি'র আওয়ামী লীগে যোগদানের ব্যাপারে বিরোধিতা প্রকাশ করিয়াছে। জমিরুদ্দিনের বাসভবনে আহুত এই সভা সম্বন্ধে শেখ মুজিব অবহিত ছিলেন কিনা আমি জানি না। তিনি আচমকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সিঁড়ি-কোঠায় দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র?' তার এই আচরণে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, আওয়ামী কোয়ালিশনে কেএসপি'র যোগদান তার কাম্য নয়।

শেখ মুজিবের আচরণে সভায় নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। দুঃখে, ক্ষোভে, বিস্ময়ে সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পর শহীদ সাহেব স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'দলের লোকেরা কেএসপি'র কোয়ালিশনে যোগদানের বিরোধিতা করিতেছে। কি যে করিব স্থির করিতে পারিতেছি না'। এই বলিয়া তিনি গাড়িতে উঠিলেন।

করাচী যাইবেন। আমিও তার সহিত গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্যার কি হইল'? তিনি জওয়াব দিলেন, 'কিছুই হয় নাই। দলীয় বিরোধ আমার আর ভাল লাগে না। যা হয় হোক, প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য আমার আর মোহ নাই'।

কেএসপি'র সহিত আলাপ-আলোচনার আপাততঃ এইখানেই যবনিকাপাত হইল।

... কেএসপি'র নান্না মিঞা গ্রুপের কোয়ালিশনে যোগদানের প্রশ্নে আবার আলোচনা শুরু হইল। তাদের বলা হইল যে, পরিষদ অধিবেশনের পূর্বে শহীদ সাহেব ঢাকায় আসিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এইবার তারা মন্ত্রিত্বের জন্য দর কষাকষি করিতে লাগিলেন।

শহীদ সাহেব ঢাকায় আসিলে সেই রাত্রেই বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য মোহন মিঞাকে অনুরোধ করা হইল। জনাব জহিরুদ্দিনের বাসভবনে শহীদ সাহেবের নৈশভোজের ব্যবস্থা হইল। সেখানে জনাব আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম।

কেএসপি'র কোয়ালিশনে যোগদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে শেখ মুজিবুর রহমান জানাইলেন যে, মাওলানা ভাসানী তাহাকে জানাইয়াছেন যে, তার দলের সমস্ত পরিষদ সদস্য আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছেন। এই কথায় শহীদ সাহেব মন্তব্য করিলেন যে, ন্যাপের সমস্ত সদস্য যদি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন দেয়, তবে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে কেএসপি নিয়া কোয়ালিশন ভারি করার প্রয়োজন নাই।

খানাপিনা শুরু হইল, এদিকে বার বার মোহন মিঞা টেলিফোন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তাহাকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। খানাপিনার শেষে সেই রাত্রেই ভাসানী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া এই ব্যাপারে চূড়ান্ত করার জন্য আমি শেখ মুজিবকে তাগাদা দিলাম। তিনিও রাজী হইলেন। গভীর রাতে খবর নিয়া জানিলাম, শেখ মুজিবের সাথে মাওলানা সাহেবের সাক্ষাতই হয় নাই, পরদিন হইবে। শেখ মুজিবই আমাকে এই কথা জানাইলেন।

কেএসপি'র সাথে আলোচনার পথ এইভাবে পুনরায় রুদ্ধ হইল। এই নিয়ে তিন-তিন বার একমাত্র শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত খেয়ালে কেএসপি'র আওয়ামী কোয়ালিশনে যোগদান বাধাপ্রাপ্ত হইল। কি কারণে এবং কোন ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেন তা আজ পর্যন্ত সুস্পষ্ট নয়, তবে তার এই প্রতিবন্ধকতা যে আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের কি সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল, তিনি এখনও তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি-না জানি না।

তবে ইতিহাস কোন ঘটনাই ভোলে না। কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে না। তিনি এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিলে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নাজেহাল হইতে হইত না। আওয়ামী কোয়ালিশন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইত। পরিষদে হানাহানি ঘটিত না। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদ কক্ষে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন না। এবং কেন্দ্রীয় চক্র শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের সুযোগ ও অজুহাত পাইত না। পাকিস্তানের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইত। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কোন্দলকে মূলধন করিয়াই ইস্কান্দার মীর্জা ও জেনারেল (বর্তমানে ফিল্ড মার্শাল) মুহাম্মদ আইয়ুব খান দেশকে বর্তমান পর্যায়ে ঠেলিয়া দিয়াছে॥"[১২৮]

তিন

"... ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮)। এদেশের ইতিহাসের এক চরম কলঙ্কজনক দিন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত কিন্তু জনগণের স্বার্থ বিরোধী এই নেতারা সেদিন দেশের ইতিহাসকে কল্পনাতীতভাবে মসীলিপ্ত করে।

---

[১২৮] তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)/পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর ॥ [বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ- মে, ১৯৮১। পৃ. ৮৪-৯১]

বাইরের ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদদের কথা বাদ দিলাম। আমরা ৩০৯ জন পরিষদ সদস্য ছিলাম। তাদের মধ্যে কিছু কলমবাজ লোক তো ছিলেন। বামপন্থীদের মধ্যেও কেউ আজ পর্যন্ত এই দিনের ঘটনাবলীর একটি পূর্ণ বিবরণ লিখেননি। ঐদিনের কার্যবিবরণী, টেপ রেকর্ডার সব কিছু পরবর্তী সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তা কোথায় আছে জানি না। জানলেও তা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে আমাকে স্মৃতি নির্ভর হতে হচ্ছে। আর সেদিনকার সেই বিয়োগান্ত নাটকীয় ব্যাপারটির নাটকীয় বর্ণনা আমার অদক্ষ হাতে সম্ভব নয়। তবু চাই যে এর একটা রেকর্ড থাকুক। ভবিষ্যৎ বংশধররা উপলব্ধি করবে তাদের পিতৃপুরুষরা শ্রেণী চেতনার অভাবে কাদের নামে 'জিন্দাবাদ' দিয়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করত। আর শ্রেণীগত কারণে, শ্রেণীশোষণের স্বার্থে এই নেতারা কী নির্মম, নির্লজ্জ, পাশবিক বিশ্বাসঘাতকতা করত। জনতা কত মহান। আর এই 'জননেতা' নামধারীরা কত নিচ, কত হীন। জনতা কত নি:স্বার্থপর। আর এরা কত স্বার্থান্ধ, কত লোভাতুর, কত নির্লজ্জ।

২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) সম্পূরক (Supplementary) বাজেট পেশের সাথে সাথে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। মোহন মিয়া, নান্না মিয়া, নবী চৌধুরী প্রমুখ আবু হোসেন দলের নেতারা মাইক স্ট্যান্ড, চেয়ারের হাতল ইত্যাদি যা পেলেন তা ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। এ ব্যাপারে ফরিদপুরের মোহন মিয়া (ইউসুফ আলী চৌধুরী) ওস্তাদ ছিলেন। চরের জমি জবর দখলের সময় তিনি তার লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে থাকতেন এবং নিজেই দাঙ্গা পরিচালনা করতেন। ওদিকে আওয়ামী লীগের যারা মাসলম্যান, মারামারিতে ওস্তাদ তারা মোহন মিয়াদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করল। আই.জি. ইসমাইল সাহেব স্বয়ং পরিষদ কক্ষের ভেতরে। এসেম্বলী মার্শালরাও ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে (যা আসির কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে) তারা পরিস্থিতির মোকাবেলা করে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন।

শেখ মুজিব আমার পাশে বসা ছিলেন। অপর পক্ষ স্পিকারের ওপর আক্রমণ করার সাথে সাথে সে তার ব্যাগ থেকে শঙ্কর মাছের হাত দেড়েকের একটা লেজ বের করে। শুনেছি শঙ্কর মাছের লেজের আঘাতে নাকি ঘা হয় এবং সে ঘা পঁচতে থাকে। স্পীকারের চারদিকে আবু হোসেনের দল হল্লা করছিল। সেদিকে লাফ দেবার আগে আমি শেখ মুজিবের হাত ধরে ফেললাম এবং বললাম—'গভর্ণমেন্ট তোমাদের, এসেম্বলি মার্শালরা এমন কি পুলিশের আই.জি উপস্থিত আছেন।' কিন্তু মুজিব ঝাড়া মেরে আমার হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেল। মারামারি চলছে। সূর্য পূর্ব দিকে না উঠে পশ্চিম দিকে উঠতে পারে কিন্তু যখন মারামারি চলছে তখন শেখ মুজিব আতাউরের মত চুপচাপ বসে থাকবে তা তো হতে পারে না। তাহলে শেখ মুজিব আর শেখ মুজিব থাকে না।

মারামারি শুরু হলে মহিলা সদস্যরা বিকট কান্নার রোল তুললেন। তাদের পরিষদ কক্ষের পশ্চাদভাগে চলে যেতে বলা হয়। সেদিন প্রেস গ্যালারি খালি ছিল। সাংবাদিকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। আমরা ন্যাপ দলীয়রা দাঙ্গাতে জড়িত নই একথার প্রমাণ রাখার জন্য পরিষদ কক্ষের পেছন ভাগে লাইন ধরে দাঁড়াই। দাঙ্গা হচ্ছিল সামনের দিকে, স্পীকারের চারদিকে। শান্তিবাহিনীর ভূমিকা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কার বাপের সাধ্য এমন পারস্পরিক বেপরোয়া হিংস্র আক্রমণকে প্রতিরোধ করে। আবু হোসেন দলের একজনের নিক্ষিপ্ত জিনিসের আঘাতে শাহেদ আলীর নাক দিয়ে দরদর রক্ত ঝরতে শুরু করল। ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা ১-২০মিনিটের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন গিলোটিন করে বাজেট পাশ করার পর অধিবেশন মূলতবী হয়।

আবু হোসেন দলের মুরব্বি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার কাছে স্পিকার হাকিমের তারবার্তা:

Dacca
20.09.58
STE 160

Mujibur Rahman over Telephone several times threatened me with violence of the worst sort saying I will not be allowed to enter the Assembly. Will be bodily removed adding that

no local police will be of help to me. Relation of mine was assaulted last evening. I seek your advice. (Justice Asir Commission Report. 9th April 1959)

২৬শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট মির্জার নিকট আবু হোসেন সরকারের ফনোগ্রাম:

Mujibur Rahman and other leaders attacked Speaker with spears, rods and microphone stands stop imported armed goondas by Awami Leaguers rushed inside Assembly from outside attacked Speaker and opposition members encircling Speaker to save his life were molested and beaten stop despite frantic appeal police refused help stop some opposition members wrongfully confined in Awami Minister's house stop others threatened with attack anywhere any time stop. (Justice Asir Commission Report)\"[১২৯]

(পথ চলিতে / ১৯.০৪.১৯৬৯)

চার

PAKISTAN: Death in the Chair

"... Though the eleven-year-old republic of Pakistan has yet to hold its first general election, its politicians stage some of the fiercest parliamentary battles of the British Commonwealth. Last week in Dacca, the evenly matched government and opposition forces of East Pakistan waged the biggest brawl in the young country's brief history.

It began when Abdul Hakim, speaker of the East Pakistan Provincial Assembly, managed to destroy the government's slim parliamentary majority by disqualifying half a dozen government deputies for unlawfully holding state jobs on the side. Outraged government deputies laid down a barrage of paperweights, desk panels and curtain rods, chased him out the door, voted him 'insane.' Thereupon one of their men, Deputy Speaker Shahid Ali, took over his place.

When parliament met again, the new speaker readmitted the six deputies. Opposition members exploded with fury. They tore their desks from the floor ripped their microphones out of their stands, and charged. Steel microphone stands whipped at Ali's face, a desk panel struck him full on the head, and he went down in a pool of blood. After steel-helmeted cops arrived to break up the melee, sergeants-at-arms bore Mr. Speaker off to a hospital on a stretcher. He died two days later, the first presiding officer of any parliament in the history of the British Commonwealth to perish of injuries received while occupying the chair."[১৩০]

পাঁচ

"... ক্ষমতাপাগল রাজনীতিকরা পরিষদ কক্ষকে পাগলা গারদে পরিণত করল। ১৯৫৮ সালের ২২ জুলাই স্পীকার আবদুল হাকিমকে পাগল সাব্যস্ত করে প্রস্তাব গৃহীত হল। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তাতেও স্বার্থান্ধ ক্ষমতা পাগলদের উন্মত্ততা থামল না। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে শাহেদ আলীকে হত্যা করা হল ২৩শে সেপ্টেম্বরে।

ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ছিলেন শান্ত স্বভাবের লোক। অপর দিকে স্পীকার আবদুল হাকিম ছিলেন শক্ত লোক। কারো ইচ্ছা অনিচ্ছায় সংসদ চালাতেন না। আবদুল হাকিমকে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের সদস্যরাই সরিয়ে দেয়। শাহেদ আলী কে.এস.পি (কৃষক শ্রমিক পার্টি)'র লোক হলেও শান্ত স্বভাবের কারণে ক্ষমতাসীনরা তাকেই পছন্দ করে স্পীকারের আসনে বসায়। এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এসেম্বলিতে। শাহেদ আলী এসেম্বলিতে ঢোকার সময় শেখ মুজিব ও মোহন মিয়া ধস্তাধস্তি করছিল।

---

[১২৯] অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ/অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ রচনাবলী—১। সম্পাদনা : আনু মুহাম্মদ ॥ [মীরা প্রকাশন—ফেব্রুয়ারী, ২০০৪। পৃ. ২৫৩-২৫৫]

[১৩০] Time (USA)/Monday, Oct. 06, 1958

শাহেদ আলীকে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করলাম - 'কেন এসেছেন?' জবাবে শাহেদ আলী বললেন — 'আপনাদের দেখতে এসেছি।' বিরোধী দলের সদস্যদের বিরোধিতায় শাহেদ আলী ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব ভীতির কারণে তিনি আওয়ামী লীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন ও কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে এস পি) সদস্যদের কিছু বলার চেষ্টা করেন। বাজেট নাকি অন্য কোন বিষয়ে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ সদস্যরা ভীষণ ক্ষেপে যান শাহেদ আলীর উপর। একটা পেপার ওয়েট নিক্ষিপ্ত হয় শাহেদ আলীর কপালে। কে মেরেছিল আন্দাজ করতে পারলাম না, উনি কপালে হাত চেপে ধরেছিলেন।

তবে সেদিন শেখ মুজিব হাউসকে শান্ত করার পরিবর্তে গরম করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। প্রথমেই দেখলাম চেয়ার নিয়ে স্পীকারের দিকে তেড়ে যেতে। মুজিবের অন্য সাঙ্গ পাঙ্গরা সাথে ছিল, পুরো অধিবেশনে ভীষণ হট্টগোল লেগে গেল। লাউড স্পীকার বন্ধ। পরে দেখলাম শাহেদ আলীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার কয়েকদিন পরে (২৬শে সেপ্টেম্বর) শাহেদ আলী পাটোয়ারী মারা গেলেন॥"[১৩১]

(সাক্ষাৎকার : তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব হাশিম উদ্দিন)

ছয়

"... প্রেস গ্যালারী থেকে আমি তখন পরিষদ কক্ষের শ্বাস-রুদ্ধকর পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিলাম। যতদুর মনে পড়ে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা তখন করিডরে হাতাহাতি এবং বাইরের রাস্তায় বিক্ষোভের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন।

আমার সামনে প্রেস গ্যালারীর অনুচ্চ দেওয়ালের তিন চার সারি দুরের একটি আসনে কৃষক প্রজা পার্টির প্রভাবশালী সদস্য ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) বসেছিলেন। তার চোখে মুখে উত্তেজনার চিহ্ন স্পষ্ট। টেবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সদস্যদের আসনের উভয় হাতলের উপর রাখা একটুকরো পালিশ করা চ্যাপ্টা কাঠের এক মাথায় স্ক্রু দিয়ে লাগানো ছিলো। মোহন মিয়া তার আসনের সঙ্গে লাগানো কাঠের টুকরোটি হঠাৎ শাহেদ আলীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কাঠের টুকরোটি তার মুখে ও বুকে গিয়ে লাগলো। তিনি গুরুতর আহত হয়ে তার আসনের উপর লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নিকটস্থ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।

২৩ সেপ্টেম্বর সংঘঠিত রক্তক্ষয়ী ঘটনার অব্যবহিত পর, পরিষদ ভবন ত্যাগ করার আগে, জনৈক পুলিশ অফিসার চাক্ষুষ বিবরণ দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তখনো পর্যন্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেও এর ফলাফল কি দাঁড়াবে তা অনুমান করতে পারিনি। ডেপুটি স্পিকার কে আহত করার জন্য কৃষক-প্রজা পার্টি দায়ী, এ কথা মনে রেখে আমি চাক্ষুষ বিবরণ দিতে রাজী হলাম। পুলিশ অফিসার আমার বক্তব্য লিখে নিলেন। মোহন মিয়াকে আক্রমণকারী বলে আমি সরাসরি উল্লেখ করলাম।

... ৭ই অক্টোবর মধ্যরাত্রে কৃষক-প্রজা পার্টি ও আওয়ামীলীগ বিরোধী মহলের আশা পূর্ণ হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার আসন বন্টন নিয়ে ফিরোজ খান নুনের সাথে আওয়ামীলীগ নেতাদের বিরোধের ফলে আওয়ামীলীগ মন্ত্রীরা ২রা অক্টোবর 'কোয়লিশন' মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সংকট এবং শাহেদ আলী হত্যাকান্ডের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা জেনারেল আয়ুব খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তন করে॥"[১৩২]

---

১৩১ দৈনিক ইনকিলাব/২২ এপ্রিল, ১৯৯২

১৩২ ড. আবদুল মতিন/স্মৃতিচারণ পাঁচ অধ্যায় ॥ [র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিশার্স - ১৯৯৪। পৃ. ১৭-১৯]

সাত

"... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে আটক থাকার বছরগুলো বাদ দিলে একজন সাংবাদিক হিসাবে ১৯৭১-এর প্রারম্ভিক সময় পর্যন্ত এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত একজন সরকারি আমলা হিসাবে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে অবস্থান করায় বহু রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের আমি হচ্ছি নীরব সাক্ষী।

মনে হয় মাত্র সেদিনের কথা। অথচ মহাকালের গর্ভে এক এক করে প্রায় ৩০টি বছর গত হয়ে গেছে। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখটা ছিল ১৯৫৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। ২০শে জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে কেএসপি-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর আতাউর রহমানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা তখন ক্ষমতায়। এক নাজুক অবস্থায় সেদিন শুরু হলো প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন। এ সময় স্পিকার আব্দুল হাকিম প্রকাশ্যেই আওয়ামী লীগের বিরোধীতার কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে পরিষদের বাজেট অধিবেশনের ব্যবস্থা হলো। এখানে উল্লেখ্য. সম্প্রতি ঢাকার জগন্নাথ হলের যে ভবনটি ধ্বসে ৩৭জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিহত হয়েছেন, ১৯৫৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সেই ভবনটিতেই অনুষ্ঠিত হলো প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বিরোধীদলীয় সদস্যরা তখন প্রচণ্ড মারমুখী। এঁদের বক্তব্য, কিছুতেই পরিষদের অধিবেশন করতে দেয়া হবে না। এ সময় পরিষদের করিডোর-এ উভয় পক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর আনাগোনা।

এটা এমন এক সময়, যখন কংগ্রেস ও তপশিল ফেডারেশন দ্বিধা-বিভক্ত এবং নব্য গঠিত ন্যাপ দলীয় এমএলএ-দের মধ্যে দোদুল্যমান মনোভাব। এ ধরনের এক প্রেক্ষিতে সেদিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে রক্ষা করার পুরো দায়িত্বটাই ছিল দলীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের উপর অর্পিত। তিনি দলীয় সদস্যদের এ মর্মে ব্রিফিং দিলেন, 'যে কোনো অবস্থার মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ এমএলএ-দের শান্ত থাকতে হবে। কারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ এবং প্রস্তাবিত বাজেট পাস করানোটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের অধিবেশন। মনে রাখবেন, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সরকার সমর্থক এমএলএ'রা পরিষদে সামান্যতম হট্টগোল করলে বিরোধী দলই লাভবান হবে। এজন্য পরিষদের অভ্যন্তরে আমাদের স্ট্রাটেজি হচ্ছে–নিজ নিজ সিটে শান্তভাবে বসে থাকা। এর অন্যথা যেন হয় না।'

চারদিকে তুমুল উত্তেজনা। ঢাকার প্রেস ক্লাবে বসে দেশী-বিদেশী সমস্ত সাংবাদিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 'নিরাপত্তার অভাবে পরিষদ অধিবেশন বর্জন।' দৈনিক ইত্তেফাক-এর চিফ রিপোর্টার হিসাবে আমি বহু যুক্তিতর্ক দিয়ে সবাইকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। আমার বক্তব্য ছিল, যেখানে জীবন বিপন্ন করে পেশাগত কারণে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা কোরিয়া আর ভিয়েতনাম-এর যুদ্ধের রিপোর্ট সংগ্রহ করছে, সেখানে এ ধরনের বয়কট-এর সিদ্ধান্ত অর্থহীন। কিন্তু আমার কথায় কোনো কাজ হলো না। কেননা পরোক্ষভাবে সাংবাদিকরাও তখন বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েছে বলা যায়। সাংবাদিকদের এ ধরনের বয়কটের সিদ্ধান্তে একথাটাই প্রমাণ করবে যে, 'আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শান্তি ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে।'

শেষ অবধি ইত্তেফাক বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেন আর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে আলোচনার পর আমি আলোচ্য বয়কট-এর সিদ্ধান্ত করে একাই পরিষদের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গেলাম। একমাত্র 'ইউপিপি' সংবাদ সংস্থার আব্দুল মতিন ('জেনেভায় বঙ্গবন্ধু' লেখক) ছাড়া আর কোনো রিপোর্টার আমার সঙ্গে ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান পরিষদের অভ্যন্তরে যেয়ে নিজের কক্ষে বসে রইলেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মুখ্য মন্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, 'ভাই সাহেব দোয়া কইরেন। সেশন ঠিকভাবে যেন চালাইতে পারি। আমি কিন্তু চেয়ার ছাইড়া উঠুম না।'

ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী তার কথা রেখেছিলেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি। পরিষদ কক্ষের একদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শান্তভাবে বসে সরকার সমর্থক সদস্যবৃন্দ আর অন্যদিকে পুলিশের আইজিসহ উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অসংখ্য কাষ্ঠখণ্ড এবং ভাঙা চেয়ার দিয়ে ডেপুটি স্পিকারের উপর উপর্যুপরি হামলা।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য! ব্যাপক হৈ-হল্লার মাঝে নিক্ষিপ্ত কাঠখণ্ডে জনাব শাহেদ আলী পাটোয়ারী তখন মারাত্মকভাবে আহত আর তার নাক দিয়ে রক্তের ধারা। তিনি স্পিকারের চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়লেন। মারাত্মকভাবে আহত শাহেদ আলীকে রাস্তার ওধারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘন্টা কয়েক পর তার ইন্তেকাল।

বিশ্বের ইতিহাসে এভাবে পিটিয়ে স্পিকার হত্যার ঘটনা বিরল। এরপরও ঢাকার অন্য সব সংবাদ পত্রগুলো শাহেদ হত্যার ব্যাপারেও আওয়ামী এবং বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের উপর দোষারোপ করার কতই না প্রচেষ্টা করলো, আর সাংবাদিক হিসাবে আমি এসবের নীরব সাক্ষী হয়ে রইলাম॥[১৩৩]

আট

"... After the imposition of Governor's rule, the political parties started a campaign for restoration of Parliamentary Government in East Pakistan. There was also the power struggle between the two main parties - the Awami League and the Krishak Sramik Party, each party claiming majority and demanding formation of a ministry headed by its own leadership.

However, the Governor's report to the Central Government put the Awami League strength at 152 and that of the Krishak Sramik Party at 146. Thus, an Awami coalition Government led by Ataur Rahman Khan was sworn in on 25 August 1958, when Governor's rule was lifted by the Centre. (The National Awami Party again supported the Awami League leadership because it wanted to keep the Krishak Sramik Party-led coalition comprising communal elements like the Muslim League and Nizam-i-Islam out of power in the interests of joint electorate, civil liberty and early general elections).

On 20 September 1958, when the Assembly met, the Government moved a motion of no-confidence against the Speaker Mr Abdul Hakim, mainly because the Government suspected that the Speaker was supporting the Opposition. (Earlier the Government, by a notification deprived the Speaker of all his discretionary powers including that concerning no-confidence motion against him or the Deputy Speaker). The Speaker, while giving his ruling on the above motion, named several members of the Awami League for disorderly conduct. Thereupon the Legislative Assembly witnessed disgraceful scene of riot in which the Speaker was assaulted and government and opposition members attacked one another with chairs, microphone stands and other missiles.

The Awami League retaliated by declaring the Speaker 'insane' and demanding the appointment of a Committee of Inquiry to determine his sanity. (The Deputy Speaker, Shahid Ali, who was a member of the Awami League, ruled that the Government motion, saying that Abdul Hakim (the Speaker) was of unsound mind, had been carried).

On 23 September, the Assembly again became the scene of physical violence in which the Deputy Speaker was so severely beaten by the members of the Opposition that he died a

---

১৩৩ এম আর আখতার মুকুল/মুজিবের রক্ত লাল ॥ [অনন্যা - ২০১৪। পৃ. ২৮১-২৮২]

few days later. Several MLAs were injured. On the orders of the Government the members of the Opposition were removed from the House. The Government was thus able to have all its budget demands passed.

The Awami League and the Opposition parties showed utter disregard for democratic principles and processes. They adopted all unscrupulous means to remain in power. In their lust for power, they reduced parliamentary democracy to a farce."[১০৪]

নয়

"... যা হোক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াই আইন পরিষদের বৈঠক ডাকিতে হইল। স্পিকার আবদুল হাকিম সাহেবের প্রতি আমাদের পার্টি নেতাদের আস্থা ছিল না। তাঁর উপর একটা অনাস্থা-প্রস্তাবও দেওয়া হইয়াছিল। সে প্রস্তাব বিবেচনার সুবিধার জন্য নিজে হইতে ডিপুটি স্পিকারের উপর ভার দিয়া সরিয়া বসা তাঁর উচিৎ ছিল। তিনি তা না করিয়া নিজেই সে প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। এই ভাবে স্পিকারের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত লাগায় মুজিবুর রহমান আমাকে বলিলেন: ডিপুটি-স্পিকারকে শক্ত করিয়া আমাদের পক্ষ করিতে হইবে। ডিপুটি স্পিকার শাহেদ আলী আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ও হোস্টেল-মেট। আমরা উভয়ে অনার্স দর্শনের ছাত্র বলিয়া আমাদের হৃদ্যতাও ছিল আর সকলের চেয়ে গভীর। তিনি ইতিপূর্বেও হাউসে প্রিযাইড করিয়াছেন এবং আমাদের পক্ষেই রুলিং দিয়াছেন। কিন্তু স্পিকার ছিলেন তখন বিদেশে। এখন স্পিকার দেশে হাযির। তাঁর সাথে আমাদের পার্টির সংঘাত। এই অবস্থায়ই তাঁকে বুঝাইয়া একটু মযবুত করিয়া দিতে মুজিবুর রহমান আমাকে ধরিলেন। আমি ডিপুটি স্পিকারের বাড়ি গেলাম। অনেক কথা হইল। তিনি মযবুত হইলেন।

ডিপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হইল। হাউস শুরু হইল মানে অপযিশন দলের হট্টগোল শুরু হইল। শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। শুধু খালি হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক। পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডান্ডা, চেয়ারের পায়া-হাতল ডিপুটি-স্পিকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিভংগের আশংকা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁরা হাতে-চেয়ারে ডিপুটি-স্পিকারকে অস্ত্র-বৃষ্টির ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপযিশনের কেউ-কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাঁদের বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা ভাংগা ছিল। তাই না যোগ দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম সাবধানীদের মত হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে। নিজ জায়গায় অটল-অচল বসিয়া বসিয়া - সিনেমায় ফ্রি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল দেখার মত এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শকরা খেলা অনেক ভাল দেখে ও বুঝে। আমি তাই দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলাম।

যা দেখিলাম, তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন ব্যথিত হইলাম; বুদ্ধিমানের মূর্খতায় তেমনি চিন্তিত হইলাম। গণপ্রতিনিধিরা বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব লইয়াই আইনসভায় আসিয়াছেন। গুন্ডামি করিয়া কাজ হাসিল করিতে আসেন নাই, ভাল কাজ হইলেও না। শিক্ষিত ভদ্র ও সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক লোকেরাও কেমন করিয়া ইতরের মত গুন্ডামি করিতে পারেন, চেনা-জানা সুপরিচিত, সমান শিক্ষিত ভদ্র সহকর্মী ডিপুটি স্পিকারের উপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলাবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন, তা দেখিয়া আমার সারা দেহমন ও মস্তিষ্ক বরফের মত জমিয়া গিয়াছিল। সে বরফেরও যেন উত্তাপ ছিল। আমারও রাগ হইয়াছিল। সে অবস্থায় আমার হাতে রিভলভার থাকিলে আমি নিজের আসনে বসিয়া আক্রমণকারীদের গুলি করিয়া মারিতে পারিতাম। এঁরা সবাই আমার সহকর্মী।

[১০৪] M. B. Nair/Politics in Bangladesh (A Study of Awami League : 1949-58) \ [Northern Book Centre (New Delhi) - 1990| p. 246-247]

শিক্ষিত ভদ্রলোক। অনেকেই অন্তরংগ বন্ধু। তবু তাঁদের গুলি করিয়া মারিতে আমার হাত কাঁপিত না। নিছক অক্ষমতার দরুন অর্থাৎ রিভলভারের অভাবে তা করিতে পারি নাই। করিতে পারিলে আমিও ওঁদেরেই মত গুন্ডা আখ্যা লাভের যোগ্য হইতাম। বেশকম শুধু হইত ওঁদের হাতে মাইকের মাথা, পেপার ওয়েট আমার হাতে রিভলভার।

বুঝিলাম ওদেরও মনে আমারই মত রাগ ছিল। সে রাগের কারণ ডিপুটি-স্পিকার অন্যায়ভাবে সরকার পক্ষকে সমর্থন করিতেছিলেন। ডিপুটি-স্পিকারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা অপযিশন মেম্বরদের কারও ছিল না নিশ্চয়ই। এমনকি, অমন অসংখ্য গুন্ডামিতে যারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের সকলে জানিয়া-বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া ঐ আক্রমণ করেন নাই। আমি নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছি, হামলাকারীদের অনেকেই স্পন্টেনিয়াসলি, নিজের অজ্ঞাতসারেই, যেমন শুধু দেখাদেখি পাটকেল নিক্ষেপ করিতেছেন। এটা যেন হাটের মার। সবাই মারিতেছে, আমিও একটা মারি, ভাবটা যেন এই। কিন্তু ফল কি হইতেছিল? দেহরক্ষীরা চেয়ারের উপর চেয়ার খাড়া করিয়া ডিপুটি স্পিকারের সামনে প্রাচীর তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে প্রাচীরটা ভেদ করিয়া হামলাকারীদের পাটকেল ডিপুটি স্পিকারের মাথায় নাকে মুখে লাগিতেছিল। শাহেদ আলী কোনও বীর বা ডন কুস্তিগির পাহলওয়ান ছিলেন না। সাদাসিধা শান্ত-নিরীহ ছোট কদের একটি অহিংস ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। দর্শনের ছাত্র না শুধু। চলনে-আচরণেও ছিলেন দার্শনিক। ওকালতি বা রাজনীতির চেয়ে স্কুল-কলেজের মাস্টারি করাই তাঁকে বেশি মানাইত। এমন লোকের উপর অমন হামলা! দেহরক্ষীরা চেয়ারের পাহাড় না তুলিলে তিনি ঐ মঞ্চের উপরই মরিয়া একদম চ্যাপ্টা হইয়া যাইতেন। পরের দিন হাসপাতালে তিনি সত্য-সত্যই মারা যান।

এই হত্যাকান্ডের আদালতী বিচার হয় নাই। ভালই হইয়াছে। বিচার হইলে অনেক মিয়ারই শাস্তি হইত। দেশের মুখ কালা হইত। কিন্তু আদালতী বিচার না হইয়া গায়েবী বিচার হইয়াছে। তাতে দেশের মুখ কালা হইল কিনা পরে বুঝা যাইবে। কিন্তু দেশের অন্তর যে কালা হইয়াছে সেটা সংগে সংগেই বোঝা গিয়াছে। ঐ ঘটনার পনর দিনের মধ্যেই মার্শাল ল। শাহেদ আলীর অপমৃত্যুকে মার্শাল ল প্রবর্তনের অন্যতম কারণ বলা হইল। অর্থাৎ পরের ঘটনার জন্যই আগেরটা ঘটিয়াছিল বা ঘটান হইয়াছিল। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিতে গিয়া শাহেদ আলী নিহত হইলেন অপযিশনের ঢিল-পাটকেলে। অথচ পূর্ব বাংলার দুশমনরা তখনও বলিলেন এবং আজও বলেন আওয়ামী লীগই শাহেদ আলীকে হত্যা করিয়াছে। কোন্ পাপে এ মিথ্যা তহমত॥"[১৩৫]

দশ

"... জনাব আবদুল হাকিম। মিস্টার স্পীকার, স্যার। স্বনামধন্য কবি,–সাহিত্য ও বক্তৃতায় সমান দক্ষ। স্পীকার হওয়ার পরই তার রাজত্বে বিপ্লব শুরু করে দিলেন। তিনি একাই। তিনি একচ্ছত্র ও সার্বভৌম। পরিষদের কর্মচারীদের সংখ্যা হুহু করে বাড়িয়ে দিলেন। শুধু সংখ্যা নয়, মাইনার হারও। আর মাসে মাসে দিতে লাগলেন প্রমোশন। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীকে কয়েক মাসের মধ্যেই জয়েন্ট সেক্রেটারী করে দিলেন। অন্যান্য বেলায়ও তাই। পরিষদের বাজেট বেড়ে গেল তিনগুণ। এর জন্য টাকা চাই। টাকা দেবে গৌরীসেন–অর্থ বিভাগ। ঘোর আপত্তি করল। কেটেকুটে অনেক কমিয়ে দিল। মিস্টার স্পীকার রাগ করলেন। কিন্তু কাজ আদায় করার ফন্দি-স্বরূপ চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন। আমার কাছে ও অর্থমন্ত্রীর কাছে ঘন ঘন লিখতে লাগলেন। কিন্তু আমরা রাজি হতে পারিনি। এ ছাড়া পরিষদ সম্বন্ধে দুয়েকটা বিল পাস করার চেষ্টা করলেন। সদস্যদেরকে ধরে তাদের দিয়ে বিল পেশ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সর্বেসর্বা, কারো অধীন নন–এই সমস্ত আইনে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সমস্ত কারণে তিনি চটে রইলেন এবং বলতে লাগলেন, কায়দা পেলেই সরকার কাত করে দেবেন। আমরাও খুব সতর্ক রইলাম। তবুও–

---

[১৩৫] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ৪৩৫-৪৩৭]

জুনের অধিবেশনের সময় স্পীকার সাহেব বিদেশ ছিলেন। সরকারি ও বেসরকারি সদস্য অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করার মনস্থ করলেন এবং খুব তোড়জোড় শুরু করলেন। সরকার ও বিরোধী দলের প্রায় সবাই রাজি। প্রস্তাব পেশ করলেই পাস হয়ে যাবে। নেতাকে (সোহরাওয়ার্দী) জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি রাগ করে উঠলেন। বললেন, তিনি উপস্থিত নেই, এ সময়ে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। এ সব আন্দোলন বন্ধ করে দাও। বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হল। অনেকেই নাখোশ হলেন।

কিছুদিন পর স্পীকার ফিরে এলেন দেশ ভ্রমণ করে। ফেরার পথে ইসকান্দার মীর্যার সাথে দেখা করে এলেন। দুষ্ট লোকেরা বলতে লাগল, মীর্যা স্পীকারকে কু-পরামর্শ দিয়েছেন। অসম্ভব নয়। মীর্যা ইদানীং মাঠে নেমে গেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারকে শেষ করার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ তাকেই ঘিরে উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফিরোজ খাঁকে হাত করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই তারা অন্য লাইন ধরে। ইসকান্দার মীর্যা সহজেই তাদের সাথে যোগ দিলেন। সেপ্টেম্বর অধিবেশনের আগে রাজনৈতিক মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়। স্পীকারকে অনাস্থা দেবার প্রস্তাব যে মুলতবী রাখা ছিল, আবার উঠানো হল। অবশ্য এবারে বিরোধীদল মনে মনে স্পীকারকে ঘৃণা করলেও তার বিরুদ্ধে অনাস্থা দিতে রাজি নয়। কারণও ছিল। স্পীকারের মনোভাব তারা জানত। ইসকান্দার মীর্যার সাথে তার গোপন পরামর্শের হোতাও তারা। সেই তাকে বাগিয়ে যদি সরকারের পতন ঘটান যায় তাহলে অতি সহজেই কাজ হাসিল হয়।

এ সুযোগ কেন ছাড়বে? ওছিলা জুটে গেল। কোয়ালিশন দলের কয়েকজন সদস্যের ব্যাপারে যে আপত্তি উঠেছিল, তাকে আবার চাঙ্গা করে তোলা হল। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করেও ছিল, কিন্তু স্পীকার মত দিলেন, এরা কিছুতেই সদস্য পদে বহাল থাকতে পারে না। এই অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে আইনের পরিষ্কার বিধান অগ্রাহ্য করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থার নোটিশ দেয়া হল। তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনাকালে তার সভাপতিত্ব করা উচিত নয়, এ কথাটা তিনি মানতে রাজি হন নি।

এই নিয়ে খুব ঝাকাঝাকি। স্পীকার জাতীয় পরিষদের অধিকারও স্বীকার করতে রাজি নন—প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স করে আইনের আওতা বাড়াতে কমাতে পারেন—তাও তিনি স্বীকার করেন নি। এমন কি, এইসব সদস্য সম্বন্ধে আগে যে মত তিনি দিয়েছিলেন তাও তিনি পাল্টিয়ে দিলেন। সমস্ত অনাস্থা প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করে দিলেন। সদস্যদের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পরে তার মতামত দিবেন বলে ঘোষণা করলেন। এর পর হট্টগোল শুরু হল। দু'দিক থেকে সদস্যরা স্পীকারের আসনের দিকে রওনা হল। মিঃ স্পীকার কিছু না বলে পিছন দুয়ার দিয়ে সটকে পড়লেন। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আসন দখল করলেন। দেওয়ান মাহবুব আলী তাঁর প্রস্তাব পুনরায় পেশ করলেন। প্রস্তাব ভোটে হয়। সংখ্যা গোণা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে একশ' সত্তর জন ভোট দিলেন অর্থাৎ স্পীকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল।

এর পর দুই দিন অধিবেশন বসে কিন্তু কোন কাজ না থাকায় অধিবেশন মুলতবী করা হয়। তেইশ তারিখে খুব তোড়জোড়ে অধিবেশন বসার কথা। স্পীকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হয়ে গেলেও তিনি এটা মানতে রাজি হন নি। তিনি জোর করে চেয়ারে গিয়ে বসবেন। এদিকে সরকারপক্ষ তাকে মানতে রাজি নন। ডেপুটি স্পীকার সভাপতিত্ব করবেন এই স্থির করা হয়। খুব হট্টগোল হবে এটা বুঝতে পেরে ডেপুটি স্পীকার তাঁর রক্ষীর দল বাড়ান। সরকারের কাছেও পুলিশ মোতায়েনর জন্য তিনি লেখেন।

ডেপুটি স্পীকার বসার সাথে সাথে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ মালকোচা মেরে আসরে নেমে পড়লেন। যে কোন ভাষায় তাঁকে গাল দিতে থাকলেন। তারপর হাতের কাছে যা পান তাই নিক্ষেপ করতে লাগলেন বেচারী ডেপুটি স্পীকারের দিকে। কাগজ-চাপা পাথর, দোয়াত, কলম, শেষ পর্যন্ত লাউড-স্পীকার ভেঙ্গে

তার মাথাগুলি ছুঁড়তে লাগলেন তার দিকে। এর মাঝে হঠাৎ ২/১টা লেগে গেল নাকে। দর দর করে রক্ত বইতে লাগল নাক থেকে। সরকার পক্ষের সদস্যরা দাড়িয়ে রইল হতবাক হয়ে। পাশে দাড়িয়ে ছিলাম কিন্তু যে রকম গোলাগুলি চারদিক থেকে বর্ষণ হতে লাগল, ভয়ে বের হয়ে গলোম ঘর থেকে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস, পি, ও অন্যান্য উপরস্থ কর্মচারীও হতবাক হয়ে দেখতে লাগল। গণপ্রতিনিধিদের নতুন খেলা। কামরায় গিয়ে বসে রইলাম। কমিশনার আই, জি, পি, এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? সব বললাম। বললেন, এখন কি করতে হবে? বললাম, কি আর করতে পারেন আপনারা। আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে যা করা দরকার করবেন। কমিশনার বলেন, সে সব আমরা বুঝি না। আপনি কি চান, তাই বলুন। বললাম, আমার ব্যক্তিগত চাওয়ার উপর কিছুই নির্ভর করে না। আইনত যা করা দরকার তাই তোমরা করবে।

কয়েকজন নেতাকে ঘর থেকে বের করে আনা হল। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হল। পরে শুনতে পেলাম।

বেচারা শাহেদ আলী পর দিন হাসপাতালে মারা যান। আসির কমিশনে সাক্ষ্যদানের সময় কমিশনার যে সব উক্তি করলেন, তার ইঙ্গিত আগেই দেয়া হয়েছে; যা ঘটেছে তা চেপে রেখে যা ঘটেনি তাই বললেন, আর কমিশনও সেটা বিশ্বাস করে দোষ আমার ঘাড়ে চাপালেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, সব আমার হুকুমে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কোন হুকুম দেন নি; যা কিছু সবই আমার হুকুমে–দায়িত্ব আমার। তার উক্তি মাঠে মারা গেল৷"[১৩৬]

এগারো

"... ইতিমধ্যে ২২শে জুলাই আতাউর রহমান খান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের নবম সরকার গঠন করিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহুত হয়। সরকার দলীয় স্পীকার আবদুল হাকিমের সহিত মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে পরিষদের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার মানসে স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী (ন্যাপ সদস্য) অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং সরকার অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন। মজার ব্যাপার, পরক্ষণেই সরকারি দলভুক্ত পিটার পল গোমেজ (কংগ্রেস) স্পীকার আবদুল হাকিমকে 'পাগল' ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উক্ত প্রস্তাব গৃহীতও হয়। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন পাগলামীর প্রতিযোগিতায় সবাই অবতীর্ণ; দেশ ও জাতি গৌণ। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল পরিষদ অভ্যন্তরে দাঙ্গা।

২৩শে সেপ্টেম্বর দেশবাসী অধিবেশন নাটকের উপসংহার অবলোকন করেন। ভারপ্রাপ্ত স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদ অভ্যন্তরেই মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয় এবং ইহার যবনিকাপাত ঘটে ৭ই অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে৷"[১৩৭]

বারো

"... এসময় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে পরিষদের একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রীতিমত মারামারি বেঁধে যায়। সেটা হাতাহাতি

---

১৩৬ আতাউর রহমান খান (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী)/ওজারতির দুই বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - জানুয়ারি, ২০০০। পৃ. ২০৬-২০৯]

১৩৭ অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ২৩৯-২৪০]

ও ঘুষোঘুষি পর্যন্ত পৌঁছায়। সে সময় পরিষদে সভাপতিত্ব করছিলেন ডেপুটি স্পীকার চাঁদপুরের শাহেদ আলী। তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মারামারির এক পর্যায়ে শেখ মুজিব শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মারেন। শাহেদ আলী ছিলেন ডায়াবেটিসের রোগী। তিনি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যান। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি আঘাতজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। আমি পুরো কাহিনী পরে মোহন মিয়ার মুখ থেকে শুনেছি।

পরিষদের মধ্যে আওয়ামী লীগের গুন্ডামী ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। এভাবে একজন নির্বাচিত স্পীকারকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ তার ফ্যাসিস্ট চরিত্রের ষোলকলা পূর্ণ করে। পরিষদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনেও ঘটে ভূমিকম্প। জেনারেল আইয়ুব রাজনীতিবিদদের এই নীতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের ধুয়া তুলে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। এভাবে রাজনীতিবিদদের হাত থেকে পাকিস্তানের ক্ষমতা চলে গেল সামরিক বাহিনীর হাতে॥"[১৩৮]

তেরো

"... এই অবস্থায় আবার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলো। পরিষদের স্পিকার ছিলেন খুলনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী এবং সাহিত্যিক আব্দুল হাকিম। তিনি সাহিত্য এবং বক্তৃতায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশনের পক্ষে। সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, স্পিকার হচ্ছে তাদের বিরোধী পক্ষ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সমর্থক। এ অবস্থায় স্পিকারকে অনাস্থা দেয়ার একটা প্রয়াস আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হলো। যেদিন স্পিকারের বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব দেয়া হয় সেদিন আমি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম।

যখন স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো তখন প্রশ্ন উঠল অনাস্থা প্রস্তাব যখন আলোচনা হবে তখন পরিষদে কে সভাপতিত্ব করবে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হলো, যেহেতু স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে সে জন্য এ অধিবেশনে তাঁর সভাপতিত্ব করা উচিত নয়। কিন্তু স্পিকার সেটা কিছুতেই মানতে রাজি হননি। একপর্যায়ে তিনি এ অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। সদস্যদের অযোগ্যতা সম্পর্কেও যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলোও তিনি অগ্রাহ্য করলেন। ফলে শুরু হলো তুমুল হট্টগোল।

তখন সরকারি দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পরিষদ যে আইন প্রণয়ন করেছিল সেটা স্পিকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু স্পিকার মত দিলেন এরা কিছুতেই সদস্য পদে বহাল থাকতে পারে না। অবস্থা চরমে উঠল। সরকারি দলের পক্ষ থেকে কিছুটা প্রকাশ্যে আধা প্রকাশ্যে বলা শুরু হলো যে, স্পিকার সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। ফেরার আগে তিনি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সাথে কথা বলে এসেছেন এবং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা তার কানে কানে কিছু মন্ত্র দিয়েছেন। ফলে স্পিকার সরকারি দলের ওপর খাপ্পা হয়ে রয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে সরকারি দলের সদস্যরা স্পিকারের আসনের দিকে রওনা হলেন। অন্যদিকে তাদের প্রতিহত করার জন্য বিরোধী দলের সদস্যরাও স্পিকারের আসনের দিকে ধাবিত হলেন। এমন অবস্থায় দেখলাম স্পিকার কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে সরে পড়লেন। এ অবস্থায় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী আসন দখল করলেন। তখন সরকারি কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে দেওয়ান মাহবুব আলী স্পিকারের বিরুদ্ধে তার অনাস্থা প্রস্তাব পুনরায় পেশ করলেন। প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলো এবং সবার মাথা গণনা করা হলো। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ল ১৭০টি। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা পাস হলো। এরপর অধিবেশন মুলতবি হয়ে গেল।

দু'দিন পর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালর ২৩ সেপ্টেম্বর আবার পরিষদের অধিবেশন বসল। স্পিকার তার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা পাস হয়েছে তা মানলেন না। তিনি জোর করে স্পিকারের আসনে বসলেন। এদিকে সরকার পক্ষ

---

[১৩৮] ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৭৫-৭৬]

তাকে মানতে রাজি নয়। তারা স্থির করলেন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। শেষ পর্যন্ত সরকারি দল স্পিকারকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে দেয়নি। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী আবার সভাপতির আসনে বসলেন। শাহেদ আলী ছিলেন আওয়ামী লীগের সমর্থক। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আবুল মনসুর আহমদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহপাঠী ছিলেন।

পরিষদ কক্ষের চারদিকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আগের দিন আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ শাহেদ আলীর বাসভবনে গিয়ে তার সাথে কথা বলে এসেছেন। শাহেদ আলী স্পিকারের অনাস্থা কার্যকর করা এবং সরকারের অবস্থান সুসংহত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালনে রাজি হয়েছেন সুতরাং শাহেদ আলী স্পিকারের আসনে বসার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সংসদে রক্ষীর সংখ্যা বাড়ালেন। কিন্তু যেসব রক্ষী নতুন নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের অনেকে ছিল আওয়ামী লীগের কর্মী। এছাড়া শাহেদ আলী উক্ত অধিবেশনের জন্য কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ করলেন। একজনের কথা মনে আছে। তিনি হলেন ফরিদপুরের মোশাররফ হোসেন। যখনই আওয়ামী লীগের সাথে কোনো দলের সংঘাত হতো সেখানেই মোশাররফ হোসেনকে দেখা যেত। তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের রাজনীতিকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মোশাররফ হোসেনের মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। তিনি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সাফল্য অর্জন করেন। কারাগারে তার সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি ততদিনে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ভূমিকার কট্টর সমালোচকে পরিণত হন।

সেদিনের ঘটনার কথায় আবার ফিরে আসছি। ডেপুটি স্পিকার তাঁর আসনে বসার সাথে সাথে বিরোধী দলের সদস্যরা মালকোচা মেরে আসরে নেমে পড়লেন। তারা ডেপুটি স্পিকারকে উদ্দেশ করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করলেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, বিরোধী দলের এ অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টির অন্যতম নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ দু'জনই ফরিদপুর জেলাবাসী। দুজনই ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী। বিরোধী দল হাতের কাছে যা পাচ্ছিল তা ডেপুটি স্পিকারের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। শাহেদ আলী একজন সহজ-সরল মানুষ ছিলেন এবং শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। পেপারওয়েট, দোয়াত-কলম, এমনকি লাউড স্পিকার ভেঙে মাথা ও ডাণ্ডা বিরোধীদল তার দিকে ছুঁড়তে লাগল। সরকারি দলও চুপ করে বসে রইল না। বিরোধী দল যাতে স্পিকারের দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করতে না পারে সে জন্য সরকারি দল প্রতিরোধ গড়ে তুলল। অন্যদিকে তারাও বিরোধী দলকে উদ্দেশ্য করে একইভাবে দোয়াত-কলম, পেপারওয়েট ইত্যাদি ছুঁড়তে শুরু করল। এমনি অবস্থায় শাহেদ আলীর দিকে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর কিংবা লাউড স্পিকারের মাথা তার নাকে গিয়ে লাগল। দেহের অন্যান্য স্থানেও তিনি আঘাত পেলেন। কিন্তু নাকে আঘাত পাওয়ার জন্য তার নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করল। পরিস্থিতি যা দেখলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। দেশের আইন পরিষদের মাননীয় সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহীভাবে যেভাবে বিভিন্ন ধরনের বস্তু নিক্ষেপ করছিল তাতে লজ্জায় মাথা নুইয়ে পড়ল। যারা জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিয়োজিত, যারা সমাজে শিক্ষিত ও ভদ্র বলে পরিচিত তারা কেমন করে এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারেন তা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য।

এ ঘটনাটা অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে গিয়েছিল। কারণ দু'পক্ষই ছিল উত্তেজিত। সরকারি দলের লক্ষ্য ছিল মসনদ রক্ষা করা, আর বিরোধী দলের লক্ষ্য ছিল সরকারের পতন ঘটানো। এমনি অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করল। তারা কৃষক-শ্রমিক পার্টির কয়েকজন নেতাকে জোর করে কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে গেল। আমার যতদূর মনে পড়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলো। আহত শাহেদ আলীকে হাতপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। পরদিন তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহেদ আলীর হত্যার জন্য কারা দায়ী এ সম্পর্কে মন্তব্য করা খুব কঠিন। এটা ঠিক যে এর জন্য দু'পক্ষই দায়ী। তবে সেদিনের ঘটনার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী আওয়ামী লীগ–এটা আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ রক্ষী ও কর্মকর্তার ছদ্মাবরণে তারা আওয়ামী লীগের কর্মীদের আইনসভার অধিবেশন কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলেই বিরোধী দলের মধ্যে উত্তেজনা ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল॥"[১৩৯]

চৌদ্দ

"... In East Pakistan a shameful incident had happened within the precincts of the legislature. The Deputy Speaker was so severely assaulted with chairs and other missiles by certain members that he was led away bleeding and with internal injuries from which he subsequently succumbed.

When General Iskander Mirza appointed Fazlul Huq as his Interior Minister in 1955, he adopted Huq's KSP as his own, pampered and flattered it, met its members secretly, and utilized it to suit his own ends. Before I took office as Prime Minister this party was in power in East Pakistan with Abu Hossain Sarkar, Huq's nominee, as Chief Minister. Sarkar resigned as he found himself unable to face the House and to get his budget passed. Ataur Rahman Khan of the Awami League was made Chief Minister a few days before I was appointed Prime Minister. Such a tangled maze of politics had President Iskander Mirza created that while his party in the West, the Republican Party, supported me, his party in the East, namely, the KSP, opposed me in the centre and formed the opposition to the Awami League ministry in East Pakistan.

Some time before the incident took place, it appeared that President Iskander Mirza was already contemplating getting rid of Malik Firoz Khan Noon and creating a contretemps in East Pakistan. The day previous to the assault the Speaker of the Provincial Assembly, who was a supporter of the KSP, was charged by the Government of Ataur Rahman Khan with partiality and with irresponsible behaviour. There was an uproarious scene between the opposing factions and the Speaker withdrew from the Assembly. The supporters of the government insisted that he should not be allowed to occupy the chair again. Actually he came the next day to his room in the assembly but made no attempt to proceed to the chamber. In his stead the Deputy Speaker presided.

The provincial government had information the previous evening that the KSP members of the legislature had vowed that they would commit violence on the person of the Deputy Speaker if he came to occupy the chair and would not on any account permit him to do so. In the face of this threat the government had either to resign or accept the challenge. There was one other alternative, namely, that the Governor be directed by the President to take action under Article 193 and take charge of the provincial government as agent of the President.

I happened to be in Dhaka at the time and tried but failed to get in touch with the President, who was in Karachi, although the leaders of the KSP were able to get him on the telephone easily. I got in touch with the Prime Minister, also in Karachi, who said that Article 193 could not even be considered and that the challenge to violence had to be faced; otherwise there would be an end to all civilized democratic government. The provincial minister ordered the police, under the personal command of the Inspector General of Police, to be ready to rush into the assembly chamber at the first sign of violence but at the same time he cautioned its supporters to be absolutely quiet and not meet violence with violence lest they be held responsible for any abusive acts within the House.

---

[১৩৯] কাজী জাফর আহমদ/আমার রাজনীতির ৬০ বছর : জোয়ার ভাটার কথন ॥ [তরফদার প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। পৃ. ৭১-৭৪]

No sooner, however, had the Deputy Speaker entered the assembly than some opposition members started to throw chairs and whatever other missiles they could lay their hands upon at him. To his misfortune, instead of surrounding him, the guards gave way and left him open to the hail of missiles. The police also did not rush in as had been planned. They came a little later after the Deputy Speaker had been severely wounded. The supporters of the government, who would under other circumstances have rushed forward and prevented the opposition from committing the assault, sat silent expecting every moment that the police would rush in to the rescue of the Deputy Speaker. This was a most unfortunate event as the Deputy Speaker succumbed to his injuries.

I am regretfully constrained to state that whether President Iskander Mirza did or did not visualize the occurrence in its entirety, the opposition party would never have dared to act so brutally and savagely, so fearlessly and without restraint, if it had not felt that it had the backing of the President. It is believed that he desired deliberately to create some situation in East Pakistan which might supply him with arguments for the ultimate abrogation of the constitution, which he had already decided on some time ago and for which he had made all arrangements."[১৪০]

পনেরো

"... In East Pakistan a serious crisis occurred on 31 March 1958, when Fazlul Haq, the Governor, dismissed Ataur Rahman Khan's Cabinet. Later that night Fazlul Haq was himself dismissed by Iskander Mirza. Ataur Rahman was succeeded by Abu Hussain Sarkar who was in turn dismissed within twelve hours of assuming office and the Ataur Rahman Cabinet was back again in power. As in West Pakistan, the N.A.P. played its disruptive role of supporting and then opposing one ministry after another in East Pakistan. Its withdrawal of support led to the fall of the Awami League Ministry on 19 June and the United Front Ministry succeeded it. The same day the NA.P. switched support to the Awami League and brought down the United Front Ministry. The situation became so confused that the President declared Section 193 (President's rule) in the province on 24 June 1958. After two months Ataur Rahman Khan was reinstated as Chief Minister. The provincial assembly declared the Speaker 'of unsound mind' and a brawl in the House on 21 September resulted in the death of its Deputy Speaker, Shahed Ali."[১৪১]

ষোলো

"... মুখ্যমন্ত্রী, শেখ মুজিব প্রভৃতি সবাই জুন মাসে বাজেট অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও মানিক মিয়াকেও দেখলাম নানা পরামর্শ করছেন। শহীদ সাহেব চান সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে যেন কোনোক্রমেই আতাউর রহমান সাহেবের মন্ত্রিসভার পতন না ঘটে। আর ইস্কান্দার মির্জা চাইছেন যেভাবেই হোক সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পূর্ব বাংলার ঘাঁটি ভেঙে দিতেই হবে। কৃষক প্রজা পার্টি একদিকে তাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালাচ্ছে আর আওয়ামী লীগ দৃষ্টি রেখে যাচ্ছে তাদের দলের কাউকে যেন ভাগিয়ে নিতে না পারে।

পরিষদে তারা সংখ্যাগুরু। কিন্তু তাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে আবদুল হাকিম বাজেট সেশন হতে দেবেন না। মোহন মিঞার দল গোলমাল করবে। আর যেহেতু পরিষদের কাজ নিয়মিত চলা অসম্ভব হয়ে পড়তে বাধ্য, ওই অজুহাতে বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ বাজেট পাস হতে দেওয়া হবে না–বাধ্য হয়ে যাতে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

---

[১৪০] Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy with a Brief Account of His Life and Work/Edt.: Mohammad H R Talukdar \ [UPL - 1987| p. 126-127]

[১৪১] Mohammad Ayub Khan (President of Pakistan)/Friends Not Masters : A Political Autobiography \ [Oxford University Press - September, 1967| p. 56]

আমি ওই সব অবস্থা দেখে কলকাতা ফিরে এলাম। ভাবলাম, আমাদের দেশ কি সংসদীয় রাজনীতির জন্য উপযোগী? বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিক্ষোভের স্বাধীনতা, একটা সুস্থ মানবমনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে বাকস্বাধীনতা অশ্রাব্য ব্যক্তিগত গালাগালিতে পরিণত, সে বাকস্বাধীনতা দেশে না থাকাই ভালো। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের পক্ষে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে চিন্তার স্বাধীনতার প্রকাশ যদি মানুষের চরিত্রের অবক্ষয়ের পথে যায়, তবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তেমনি বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে যদি দুপক্ষের লড়াই এবং খুনোখুনি হয়ে যায়, তবে ওই বিক্ষোভের অধিকার না থাকাটাই মঙ্গল।

পূর্ব বাংলা পরিষদে যে ঘটনা ঘটল বাজেট অধিবেশনে তা যেমন লজ্জাজনক, তেমনি দেশ ও দশের অমঙ্গলই ডেকে আনা স্বাভাবিক। ঘটনাটি আমি নিজে দেখিনি, কিন্তু যারা উপস্থিত ছিল তাদের মুখে যা শুনেছি তাতে লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে গেছে বিদেশিদের কাছে। কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষ থেকে মোহন মিঞা অধিবেশন হতে দেবেন না, আর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব অধিবেশন চালাবেন। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী সাহেব স্পিকারের আসনে বসে আছেন, আর তার চারপাশে ঘিরে আছেন আওয়ামী লীগের পুরোনো ছাত্রলীগ নেতারা, যারা সংসদ সদস্য হয়ে এসেছেন। মোহন মিঞা আর তার দলের লোকের হাতের কাছের দোয়াত, পেপার ওয়েট, কাঁচের বল, ছাইদানি এমনকি পকেট থেকে ইটপাটকেল বের করে অনবরত ছুঁড়ে মারছিল শাহেদ আলী সাহেবের দিকে। শেষ পর্যন্ত মোহন মিঞা তার সম্মুখের মাইক্রোফোনের স্পিকার ছুঁড়ে মারলেন।

এবার সেটা লাগল শাহেদ আলী সাহেবের নাকে। নাকের হাড় ভেঙে গেল। ভীষণভাবে রক্ত ঝরতে লাগল। কোনোরকমে অধিবেশন এক দিনের জন্য মুলতবি রেখে তিনি বেরিয়ে আসার জন্য দাঁড়ালেন। আওয়ামী যুব-সদস্যরা তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। শাহেদ আলী বৃদ্ধ লোক, তার ওপর ডায়াবেটিকের রোগী। হাসপাতালে গিয়ে বোধ হয় কয়েক দিন বেঁচে ছিলেন। তারপর চিরনিদ্রা। এরই নাম উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি॥"[১৪২]

সতেরো

"... Failure of Administrative Machinery

Mr. Justice Mohammed Asir constituting the one-man Commission of Inquiry into the incidents of September 20 and 23 last in East Pakistan Assembly, which resulted in the death of the Deputy Speaker, Mr. Shahed Ali, has held that the parliamentary system of Government in the province had collapsed under the unremitting stresses of political feuds and scramble for power. The report of the Commission, which the Government has accepted, along with the Government resolution, was published in Dacca in a Gazette Extraordinary in May.

The terms of reference of the Commission, which was appointed by the new regime, included enquiry into the circumstances leading upto failure, if any, of the administrative machinery entrusted with the responsibility of maintaining law and order in the premises of the Assembly and also outside. It was also asked to report whether officers and those in authority displayed in the course of the incidents a conduct incompatible with their responsibilities.

Demoralisation of Services

According to the Commission, there was failure of administrative machinery and inside the chamber of the Assembly the situation went beyond the control of the Deputy Speaker, who was conducting the proceedings, and the Secretary of the Assembly. The District

[১৪২] কামরুদ্দীন আহমদ/বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী ॥ [প্রথমা প্রকাশন - অক্টোবর, ২০১৮। পৃ. ২১৮-২১৯]

Magistrate, the Inspector-General of Police and other officers who had been requisitioned to deal with the situation, due to the indecision of higher authorities and other compelling reasons 'failed to discharge their functions within the Assembly premises strictly according to law.' The report says that the services charged with the responsibility of maintaining peace and order, and thus ensuring a sense of security among law-abiding citizens, were demoralised and prevented from discharging their statutory obligations.

The report also says that the Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, could not keep himself above party interest and failed to take a detached view where law was to take its own course, as he was persuaded in his capacity as Home Minister to interfere with the statutory functions of the Magistrate and other officers. It goes on to say:

'The policemen and officers who were utilised to serve the cause of the ruling party, though initially respectful to the representatives of the country, dealt with the members of the opposition vigorously and severely, quite unmindful of their status, when stirred at the instance of the Chief Minister.'

Party Politics

The then Central Government had interested itself in the lurid drama of party politics that was leading the whole country along the paths of disaster. Not only the rule of law was ignored and well established conventions associated with democracy and parliamentary life openly flouted and ordinances flung in quick succession at opponents with a view to legalising fraudulent means to serve one's individual or party interest, but the very lawmaking body, that is, the East Pakistan Legislative Assembly was reduced to a 'riotous unlawful body'.

The report quotes a telegram sent by the then Speaker to Mr. Iskandar Mirza which stated: 'Mr. Mujibar Rahman over the telephone several times threatened me with violence of the worst sort saying that I will not be allowed to enter the Assembly House, will be bodily removed, adding that no Police will be able to help me."

The Commission also says that in the naked or ill-clad struggle for power both the ruling Awami League coalition and the Krishak Sramik Party-led Opposition adopted methods other than constitutional or democratic. Dissension and distrust, suspicion and personal considerations ruled the minds of individual members. The conduct of the Chief Minister was not compatible with the responsibility and duty of that high office.

The conduct of the Speaker, Mr. Abdul Hakim could not be said to have been above board and suspicion. Although none of the political parties had any regard for him yet they utilised him for their own purpose just as he also tried to exploit the differences existing between the rival groups.

Summing up his findings, Mt. Justice Asir said that each party seemed to have vied with each other in breaking all democratic principles and that good faith of the Speaker and Deputy Speaker could hardly be assumed."[১৪০]

আঠারো

"... ১৯৫৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার অধিবেশন বসার কথা। এমনই সময় ঢাকা গেজেটের এক বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করে স্পীকারের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়। সেই সাথে আওয়ামী লীগ আইন সভার সেক্রেটারিয়েটের সকল দায়-দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে স্পীকারের ক্ষমতাকে খর্ব করার প্রয়াস চালায়। এখানে আওয়ামী লীগের সুবিধা ছিল যে, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ছিলেন দলটির প্রতি বন্ধুত্বসুলভ, এর অন্যতম কারণ ছিল নুন নিজে কেন্দ্রীয় আমলাদের দ্বারা শাসিত পাকিস্তানে তার মর্যাদা বৃদ্ধি

[১৪০] Monthly Civic Affairs (Vol. 06, Issue: 11)/Edt. : S. P. Mehra \ [P. C. Kapoor (Kanpur, India) - June, 1959| p. 50-51]

করতে চেয়েছিলেন। এমনই প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের স্পীকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মির্জার কাছে বিশেষ একটি আর্জি পেশ করেন। স্পীকার দাবি করেন যে, নতুন প্রজ্ঞাপন দিয়ে পার্লামেন্ট ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে এবং মুজিব নিজে স্পীকারকে শারিরীকভাবে হামলা করবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। মুজিব স্পীকারকে সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে বারণ করেছেন বলেও প্রকাশ। স্পিকারের ভাষ্যমতে, তার পরিবারের সদস্যদেরকে ইতোমধ্যেই নাস্তানাবুদ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের স্পীকার তার আবেদন শেষ করেছেন এই বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানে তখন চলছিল 'সন্ত্রাসের রাজত্ব'।

প্রেসিডেন্ট মির্জার তরফ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্পীকারের এই লিখিত আবেদনের কোন উত্তর মেলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্পীকার আব্দুল হাকিম সংসদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের দৌরাত্মের গতি-প্রকৃতি আরো প্রত্যক্ষভাবে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। উভয় পক্ষই সংসদীয় কায়দায় বেশ কিছু যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাতে ভাষার হুমকিধামকি কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেহেতু স্পিকার সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন না, তাই আইন প্রণেতাদের মাঝে সার্বিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ছিল অবশ্যম্ভাবি। আইন প্রণেতাগণ একে অপরের গলা টিপে ধরেছিলেন। স্পীকারের মাইক্রোফোনকে আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। জাতীয় পতাকা উড্ডয়নকারী স্তম্ভকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল যথেচ্ছভাবে। স্পীকার বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার জীবন সংকটাপন্ন। তাই তিনি সংসদ অধিবেশন থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলেন এই বলে যে, অধিবেশন স্থগিত করা হলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের আইন প্রণেতাগণ স্পীকারের লোষণা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ সময় আওয়ামী লীগের আইন প্রণেতারা স্পীকারকে একজন 'অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি' বলে ঘোষণা করে। নিজেরাই সংসদের আলোচনা চালিয়ে ঘোষণা করে যে, তারা একটি বোর্ড গঠন করে স্পীকারের সার্বিক অবস্থা তদন্ত করবে এবং নির্ধারণ করবে স্পীকার তার পদে আসীন থাকতে পারেন কি না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে সংসদে কোন আলোচনা চালানো সম্ভব ছিল না। তখন ডেপুটি স্পীকার ছিলেন শাহিদ আলী। তিনি কিছুক্ষণ আলোচনা চলতে দেন। ঐদিনের সংসদের কর্মকাণ্ডকে বর্ণনা করা হয়েছে 'পাক-ভারত উপমহাদেশের আইন সভার ইতিহাসে সবচাইতে জঘন্যতম ঘটনা প্রবাহ, যা কখনো কেউই প্রত্যক্ষ করেনি'।

এত কিছু সত্ত্বেও পরের দু'দিন সংসদে আলাপ-আলোচনা চলেছে। কিন্তু স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার অধিবেশন চলাকালে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখেন। আওয়ামী লীগ সরকার তখন দাবি তোলে যে, ডেপুটি স্পীকারকে অবশ্যই সংসদের অধিবেশনে হাজির থাকতে হবে। কিন্তু ডেপুটি স্পীকার শাহিদ আলী উপস্থিত থাকতে নারাজ ছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন যে, ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে তার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল আইনপ্রণেতাদের অধিবেশনে থাকা সম্ভব নয়। তখন আওয়ামী লীগ সরকার ডেপুটি স্পীকার শাহিদ আলীকে বোঝালেন যে, সংসদ অধিবেশনে যোগ দিলে তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮ সাল) আইন প্রণেতাগণ অধিবেশনে মিলিত হন। দর্শক হিসেবে ঐ অধিবেশনে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। স্পীকারের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। ডেপুটি স্পীকারের অধিবেশনে ঢোকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিরোধী দলীয় আইন প্রণেতাগণ বিস্ময় ও আশংকা প্রকাশ করেন। কারণ বিরোধী দলীয় আইন প্রণেতাদের এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কোন নোটিশ দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের কিছু দেহরক্ষী নিয়ে শাহিদ আলী সংসদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আসন গ্রহণ করেন। এর তিনদিন পূর্বেই আইন প্রণেতারা সংসদ অধিবেশনে ধস্তাধস্তি করেছিলেন এবং বেশ কিছু আসবাবপত্র ভাংচুর করেছিলেন। ডেপুটি স্পীকার শাহিদ আলী স্পীকারের আসনে বসার সাথে সাথে তাকে লক্ষ্য করে ভাংগা চেয়ারের হাতল ছুঁড়ে মারা হয়। ভাংগা চেয়ারের হাতলটি স্পীকারের নাক ও চোখে আঘাত হানে। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের অধিকারী শাহিদ আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ অবস্থা দেখে কোন কোন আইনপ্রণেতা শাহিদ আলীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। দৌড়ে যান জেলা মেজিস্ট্রেট, পুলিশ প্রধান এবং হেলমেটধারী কিছু পুলিশ। অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন। বিরোধী দলীয় সদস্যদের সাথে ইউনিফর্ম পরা পুলিশের ধস্তাধস্তি চলে বেশ কিছুক্ষণ। পুলিশ প্রধান অধিবেশন কক্ষ থেকে বিরোধী দলীয় আইন-প্রণেতাদের সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেন। বিরোধা দলীয় আইনপ্রণেতারা যখন অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের

আইনপ্রণেতারা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং বেশ কিছু সাংসদকে আহত করে। বেশ কয়েকজন আইন প্রণেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি স্পীকার শাহিদ আলী নিজে, যিনি এই ঘটনার দুই দিন পর মারা যান। সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায় যে, আইন সভার অধিবেশন চলাকালে আক্রমণের শিকার ডেপুটি স্পীকার তার জখম থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর আবুল হোসেন সরকারসহ তার দলের আরো ৭ জন সদস্যকে বন্দী করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে হত্যার পরিকল্পনা এবং দাঙ্গার অভিযোগ আনা হয়। সকল সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, পুরো বিষয়টি ছিল আওয়ামী লীগের পূর্ব পরিকল্পিত এবং দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এমনটি করা হয়। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে এ ঘটনার পেছনে বামপন্থিদেরও হাত ছিল। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র রক্ষণশীল দলের লোকদেরকেই শাস্তি দেয়ার জন্য বন্দী করা হয়েছে। পরে এই বন্দীদের জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছিল এমনভাবে, যাতে তারা আর রাজনীতি করতে না পারে এবং সরকারি কোন পদে আসীন হতে না পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য পুরো বিষয়টির ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। সংসদ অধিবেশনে এ ধরণের ন্যাক্কারজনক মারামারি এবং এর পরবর্তী প্রভাব প্রদেশের ওপর কেমন হবে, সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ছিলেন দিধাদ্বন্দ্বে আক্রান্ত।

জেনারেল ওমরাও খান তখন পূর্ব পাকিস্তান সামরিক চৌকির প্রধান। তিনি পুরো ব্যাপারটির ওপর একটি অতীব জরুরী রিপোর্ট প্রেরণ করেন রাওয়ালপিন্ডিতে। ওই রিপোর্টের উপসংহারে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। জেনারেল আইউব খান রিপোর্টটি নিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সাথে বৈঠক করেন। তারা দুজন আলোচনা করেন কীভাবে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও স্বস্তি ফেরানো যায়। ঠিক একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও নানাবিধ সমস্যা চলছিল। ফিরোজ খান নুনের প্রশাসন কেবলই দুর্বল হচ্ছিল। আইউব ও মির্জা উভয়ই দাবি করলেন যে, দেশটি সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নয়। তারা শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের পূর্বে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে দেয়াকে বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করলেন। তদুপরি এই দুই ব্যক্তি মিলে সামরিক শাসন জারি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান রহিত ঘোষণা করলেন। বন্ধ করে দিলেন আইন সভার সকল অধিবেশন। নিষিদ্ধ করলেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর থেকে সামরিক বাহিনী দেশের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিলেন। প্রেসিডেন্ট মির্জা আইউব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। ক্ষমতা ছেড়ে মির্জা গোপন আস্তানায় গেলেন এবং তিন সপ্তাহ পরে পাকিস্তানে ছেড়ে দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। আইউব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়ে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে আবির্ভূত হলেন। পরবর্তী ৪৪ মাস দেশ সামরিক বাহিনীর অধীনেই থাকলো। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর চড়াও হতে থাকলো। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সফলতা সকল ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান ছিল। অচিরেই বুঝা গেল যে, পাকিস্তান ঔপনিবেশিক ধারায় সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ঐতিহ্যকেই ধরে রাখছে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নিজের জনপ্রিয়তা রক্ষার স্বার্থে মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। সে সময়টাতে আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব চরিত্রে আবির্ভুত হতে থাকে। ভুলে যায় যে, এর পূর্বে দলটি দুই বছর ধরে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই সময়টাতে আওয়ামী লীগ নেতারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজে ব্যস্ত ছিল। এই দুই বছরের আওয়ামী লীগের শাসন আমলে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার বা জনগণের প্রয়োজন পূরণে মোটেও দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়নি। কেবল ক্ষমতার ভাগাভাগির লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা। নেতিবাচক রাজনীতি সবসময় নেতিবাচক আচর-আচরণের উদ্ভব ঘটায়। স্বায়ত্ব শাসনের উদ্দেশ্যসমুহ হয়ে পড়ে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্খা। আর ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়াই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পথ বিধ্বস্ত করে। যারা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারতো, তাদের ভাগ্যলিপিতে কেবলই আওয়ামী বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারা উঠে আসে॥"[১৪৪]

---

[১৪৪] লরেঞ্জ জিরিং/বাংলাদেশ - মুজিব থেকে এরশাদ : একটি বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস (মূল. Bangladesh: From Mujib to Ershad : An Interpretive Study/অনু. ড. মো: মাইমুল আহসান খান) ॥ [সিসিবি ফাউন্ডেশন - জুলাই, ২০১৪ । পৃ. ৬৫-৬৮]

তৃতীয় অধ্যায়

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাল : বিচ্ছিন্নতার শেষাঙ্ক

প্রথম পর্ব

আইয়ুব খান ও তার দশক : বিপ্লবী প্রয়াস ও পরিণতি

এক

"... সময় এসে পড়লো। এতদিন যে সময়ের অপেক্ষায় থাকা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা এসে পড়লো। দায়িত্বকে আর দূরে সরিয়ে রাখা গেল না।

দিনটি ছিল ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল। আমি আমার রেলগাড়ীর সেলুনের মধ্যে যখন অবস্থান করছিলাম, তখন জানতাম যে, একটা যুগ শেষ হয়ে আসছে। আমি করাচী যাচ্ছিলাম, সেখানে একটি মর্মন্তুদ সুদীর্ঘ রাজনৈতিক প্রহসন ধীরে ধীরে শেষ হচ্ছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তিনি কর্মপন্থা গ্রহণ করা স্থির করেছেন। বহু বৎসর ধরে আমরা সবাই আশা করেছিলাম যে, দেশের রাজনৈতিক নেতারা তাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেমিক লোক ছিলেন, গুণবান এবং দক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন এবং কায়েদে আজমের সেই সব নিকট-সহচররাও ছিলেন যারা দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অনড় সংকল্প নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁরা দেখেছিলেন কি করে লিয়াকত আলী খান স্থিরতার সংগে, সাহসিকতার সংগে এবং অনমনীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় অর্ণবপোতকে অশান্ত স্রোতের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিলেন। সার্কাসের দড়াবাজদের মত এক এক সময় এক একজন লাফ দিয়ে মধ্যের দোলনার আড়াটিকে ধরে ফেলে একটু ঝুলে উজ্জ্বল বাতির আলোকের মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন, আবার পর মুহূর্তে ষড়যন্ত্র ও সামর্থহীনতার জালের মধ্যে উৎপক্ষিপ্ত হয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমি ৫ই অক্টোবরে করাচীতে পৌছালাম। ইয়াহিয়া, হামিদ এবং আরও অন্য দু'একজন অফিসার আমার পূর্বেই সেখানে পৌছেছিল। আমি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার সংগে দেখা করতে গেলাম। তিনি লন-এ বসেছিলেন। তিনি চিন্তিত এবং তিক্ত-বিরক্ত ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম -

'আপনি কি মন স্থির করেছেন?'

'হ্যাঁ', তিনি উত্তরে বললেন।

'আপনি কি মনে করেন এটা একান্তই দরকার?'

'এটা একান্ত দরকার', দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন।

আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগলো তা হলো, এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে, এ রকম একটা মর্মান্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে এই কঠোর কর্মপন্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এতে জড়িয়ে পড়াটা আনন্দদায়ক নয়। কিন্তু এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ারও কোনও উপায় ছিল না। দেশকে রক্ষা করার এটাই হলো শেষ প্রচেষ্টা।

এর কিছুদিন পূর্বে তিনজন মন্ত্রী এবং চারজন স্টেট মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সভ্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। মালিক ফিরোজ খান নূনের টলটলায়মান আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারকে রক্ষা করার জন্য মন্ত্রীর সংখ্যা সর্বমোট ছাব্বিশে এসে পৌঁছাল। এর উপর দপ্তর বণ্টন নিয়ে অশালীন বিবাদ বিতণ্ডা চললো। ৭ই অক্টোবর একটার সময় দপ্তরগুলো পুনর্বণ্টন করা হলো। আওয়ামী লীগ ত্বরিতবেগে সরকার থেকে পদত্যাগ করলো। আবার রাত ৭টার সময় নতুন করে দপ্তরগুলো বিলি-বণ্টন করা হলো। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটলো। রাত ৮ টার সময় এই দৃশ্যের উপর যবনিকা পড়লো যখন ইস্কান্দার মির্জা নাটকীয়ভাবে শাসনতন্ত্র বাতিল করলেন। সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন ঘোষণা করলেন। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারদের পদচ্যুত করলেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাকে বাতিল করলেন এবং আমাকে প্রধান সামরিক আইনের পরিচালক নিযুক্ত করলেন।

সে সময় থেকে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতির মধ্যে আর ভাব-প্রবণতার কোনও অবকাশ থাকলো না। যখন এ কাজ করতেই হবে তখন সঠিকভাবেই করতে হবে। একটি সবল পরিকল্পনা বিধিবদ্ধ করা হলো এবং তা কাজে লাগানো হলো।

আমি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে উপদেশ দিলাম, আপনি বরং এই পরিস্থিতি সম্পর্কে উজিরে আজমকে জানান। তিনি সেটা প্রয়োজনীয় মনে করলেন না, কারণ তাঁর কাজ যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিলো না। আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছ থেকে দুটো জিনিস লিখিতভাবে চাই। প্রথমটি, আমি যে সামরিক আইন পরিচালনা করবো সেটা এবং অন্যটি, আপনি উজিরে আজমকে একখানি চিঠি দেবেন এই বলে যে, আপনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সরকারকে বাতিল করেছেন, শাসনতন্ত্র নাকচ করেছেন, সামরিক আইন ঘোষণা করেছেন এবং আমাকে এই সামরিক শাসন পরিচালনা করার জন্য পরিচালক নিযুক্ত করেছেন।'

তিনি ফিরোজ খান নুনের চিঠিটা বিনা দ্বিধায় লেখলেন। কিন্তু আমাদের সামরিক শাসন পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়ার চিঠি লিখতে তাকে খুব আগ্রহশীল মনে হলো না। আমি ইস্কান্দার মির্জাকে দিয়ে উজিরে আজমের কাছে চিঠি খানি এই জন্য লেখাতে চাচ্ছিলাম যে, এই সিদ্ধান্ত যখন তার, তখন এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তারই গ্রহণ করা উচিত।

সরকারের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যে, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশকে পরিচালিত করা আর সম্ভব নয়। আমি বললাম, 'আপনি অন্তত কিছু করেছেন এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি ঠিক কাজটিই করেছেন, কিন্তু আমি অনুভব করি আপনার কাছ থেকে সেটা আমার লিখিত ভাবে পাওয়া উচিত।' তিনি টালবাহানা করতে লাগলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'তিন দিন পর আমাকে চিঠিটি দিতে সম্মত হলেন। বিপ্লবে সুদীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য প্রস্তুতি, বিস্তারিত পরিকল্পনা, গোপন বৈঠক এবং দেশব্যাপী সেনা-সমাবেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের বেলায় এ রকম কোনও প্রস্তুতি ছিলো না। ঠিক সাধারণতঃ যেমন একটি সামরিক বাহিনীর গতিবিধি হয়ে থাকে তার চাইতে অধিক কিছুই হয়নি। একটি ব্রিগেডকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল মাত্র। বস্তুতঃ করাচীতে দু'টি ব্রিগেডই রাখা হয় - একটি ইনফ্যান্ট্রি, অন্যটি আর্টিলারী। সুতরাং সামরিক আইন ঘোষণার জন্য উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যথেষ্ট সৈন্যবল ছিল কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আমরা একটা অতিরিক্ত ব্রিগেডকে কোয়েটা থেকে করাচীর উপকণ্ঠে জাঙ্গশাহীতে স্থানান্তরিত করেছিলাম। যা কিছু সামরিক প্রস্তুতি তা শুধুমাত্র এই ছিল। অদৃষ্টপূর্ব যে, কোন ঘটনার জন্য সৈন্যবাহিনীর হাতে কিছু না কিছু থাকে। এই ধরনের কোনও প্রকার কর্মপন্থা একবার গ্রহণ করার পর তাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না। যদি এই সামরিক আইনের বিরুদ্ধবাদিতা কেউ কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও করতো তা হলে সাংঘাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। সে জন্যই একটি ব্রিগেডকে জাঙ্গশাহীতে স্থানান্তরিত করার সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। বিপ্লবের রাত্রিতে আমরা প্রধান সৈনাধ্যক্ষদের এবং স্থানীয় সেনাপতিদেরকেও জানালাম

কি ঘটেছে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তাদের কি করা প্রয়োজন সে কথাও বললাম। ব্যাস্, এটাই ছিল আমাদের একমাত্র করণীয়। তারপর আমরা সামরিক শাসন পরিচালকদের সুর নির্দিষ্ট করলাম। তাদের কর্তব্যের সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হলো। ক্রমে ক্রমে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠল।

আমাদের এই কর্মপন্থা যেভাবে কৃতকার্য হতে পারে সেভাবে করেছিলাম। প্রশ্ন হলো যে, এক্ষেত্রে কতদূর যাওয়া যায়। আমি বুঝেছিলাম যে, যদি কোনও বাধা আসে তা হলে সেটা নামমাত্র হবে এবং আমরা মোকাবেলা করতে পারবো। অস্ত্র ব্যবহারের অবকাশ যে হবে তা মনে করিনি। জনসাধারণ দেশের পরিস্থিতি দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং একটি চরম পরিবর্তন কামনা করছিলো। সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের খুব শ্রদ্ধা ছিল।

কিছু সময়ের জন্য এ রকম কথাও উঠেছিল যে, ১৯৫৩ সালে লাহোরে প্রথম যে সামরিক আইন চালু করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গার জন্য যারা দায়ী তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, সেই আইনটিকে আবার পুনর্জীবিত করা হউক। সামরিক আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রথমেই আমরা এটা বিবেচনা করলাম। অবশ্য তা করতে যেসব রাজনীতিবিদরা দেশকে অতল গহ্বরের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার আমরা লাভ করতাম বটে, কিন্তু আমি বললাম আমাদের তা করা উচিত নয়। যাতে লোকেরা সত্বর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে এবং যাতে দেশের পুনর্গঠন এবং সামাজিক পুনর্বাসন ত্বরান্বিত হতে পারে সেটাই আমি গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। আমি চেষ্টা করছিলাম যাতে খুব শিগগিরই উত্তাপটা কমে যায়। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলে যেমন হয় সামরিক আইন ঠিক তেমনিভাবে এসেছিল। সব কিছুই ধারামত চলতে শুরু করেছিল। তার কারণ আমাদের জনসাধারণ ছিল মূলতঃ নিষ্ঠাবান এবং আমাদের বেসামরিক প্রশাসন বিভাগও ছিল অত্যন্ত দক্ষ। এ-সব বিবেচনা করেই আমি লোকদেরকে তাদের অতীত অপকার্যের জন্য শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সামরিক আইন পরিচালনা করিনি। যাদি আমরা সে রকম কিছু করতাম তা হলে আমাদের সব প্রচেষ্টা নেতিবাচক হতো।

যা প্রয়োজন ছিল তা হলো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, প্রস্তুত করার এবং দেশের অর্থনীতিকে একটি কার্যকরী এবং প্রগতিশীল শক্তিতে পরিণত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা। আমাদের সীমিত সম্পদ সংগঠনকার্যে প্রয়োগ না করে তার দ্বারা একটা ভয়াবহ এবং দমনাত্মক আবহাওয়া সৃষ্টি করে তাকে নষ্ট করার কোনও অর্থ থাকতে পারে না। আমার কাছে এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল যে, সামরিক আইন যদি কোনও রকম কাজে লাগাতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক যন্ত্রগুলোকে পুনঃস্থাপিত এবং চালিত করা অত্যাবশ্যক হবে।

সামরিক আইন জারি করার পরের দিন সকালে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারীদের একটি বৈঠক আহ্বান করলাম। দেশে কি ঘটছে তা আমি তাদের ব্যাখ্যা করে বললাম এবং তাদের কি করতে হবে তার নির্দেশও আমি দিলাম। সংগে আমাদের কার্যপদ্ধতির একটি কাঠামো তাদের বুঝিয়ে বলা হলো। একজনকে আমি কিছুটা অপ্রসন্ন দেখলাম। তাঁদের সংগে একটু বোঝাপড়ার প্রয়োজন হলো, এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সুস্থির হয়ে বসল।

আমরা একটি সেক্রেটারী-পরিষদ গঠন করলাম এবং সেটা মাস দুই কাজ করলো। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের ক্ষমতা গ্রহণ করার দিনে যদি কোনও অঘটন ঘটে সেজন্য কোনও কোনও সেনাদলকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দু-একটি ইউনিট টেলিফোনে পরস্পর-বিরোধী আদেশ হয়েছিল বলে মনে হলো। সে মুহূর্ত থেকে সেনাবাহিনীর লোকেরা বেশ সন্দিগ্ধমনা হয়ে পড়লো এবং বলতে কি তারা একজন আর একজনকে সন্দেহ করতে শুরু করলো। কেউ জানত না যে, কে এই সন্দেহের বীজ বপন করে চলেছিল।

আমার মনে হয় তারা এটা বুঝেছিল যে, ইস্কান্দার মির্জার পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আমরা সংবাদ পেলাম যে তার স্ত্রী তার সংগে এ নিয়ে সব সময় বচসায় লিপ্ত হচ্ছিলেন। তার বেগম তাঁকে বলছিলেন যে, তিনি একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। তবে তিনি যখন একবার এর মধ্যে গিয়েছেন এবং কাজটা যখন হয়েই গিয়েছে, এখন তার উচিত আইয়ুব খানকে খতম করা। ইস্কান্দার মির্জা গোয়েন্দা বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্যদের অবস্থান তা জানবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি করাচীর চতুষ্পার্শ্বে সৈন্যদের চলাচলের জন্য নির্দেশনামা কি ছিল, তা জানতে চেষ্টা করছিলেন।

আমার প্রথম কাজগুলোর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়াটাও ছিল একটি। সেখানেই আমাদের বেশীর ভাগ লোক বাস করে। কিন্তু এতে ইস্কান্দার মির্জাকে খুব খুশী দেখলাম না। তিনি আমাকে সতর্ক করলেন, 'সাবধানে থাকবেন, কারণ সেখানে অনেক লোক আছে যারা আপনার রক্ত চায়।' আমি বললাম, 'আমি এতে অভ্যস্ত আছি।'

ঢাকাতে একটা বিরাট জনসভা হয় এবং সেখানে আমি বক্তৃতা করি। আমার মনে হয় তাতে ইস্কান্দার মির্জা বেশ কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এর কিছু পূর্বে আমি নিজেই তাকে বলেছিলাম, 'দেখুন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। একটি বিপ্লব ঘটেছে। আপনি এটাকে ডেকে এনেছেন এবং আমাকে দেশ পরিচালনার ভার দিয়েছেন। এটা একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিপ্লব নয়; এ দেশে একটি মৌলিক এবং সত্যিকার পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, এটাই আমার নীতি। আপনি সঙ্কিত হবেন না। এটা আমার দায়িত্ব। এ বোঝা আমাকেই বইতে হবে, কিন্তু আমি কতকগুলো মৌলিক সংস্কার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আপনি দয়া করে ষড়যন্ত্র কিংবা এ রকম ব্যাপারে জড়িত হবার চেষ্টা করবেন না। আপনার সেরকম কিছু করার প্রয়োজন নেই। কারণ আপনার কর্তৃত্ব মেনে নিতে এবং আপনাকে পূর্ণ আনুগত্য দিতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।'

তিনি বললেন, 'বেশ, তাই হোক।' আমি বললাম, 'ভাল।'

কিন্তু আমরা অনবরত খবর পাচ্ছিলাম যে, তাঁর স্ত্রী আমার বিরুদ্ধে সত্বর কোনও কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য তাকে উত্যক্ত করছেন।

আমি যখন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ফিরে এলাম এবং মৌরীপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম, তখন মেজর জেনারেল শের বাহাদুর আমার কাছে এসে বললেন, 'স্যার, আপনার অনুপস্থিতিতে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডোর রবকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা টেলিফোন করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি এই দেশের প্রতি অনুগত?' রব বলেছিলেন, 'হ্যাঁ আমি অনুগত।' 'আপনি কি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার প্রতি অনুগত?' তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ আমি অনুগত।'

'আপনি আপনার জীবন বিপন্ন করেও কি আমার আদেশ পালন করবেন?'

রব তার জবাবে বলেছিলেন, 'জনাব, আপনি আমাকে জানতে দিন কি আপনার আদেশ।'

ইস্কান্দার মির্জা বললেন, 'আমি চাই আপনি গিয়ে সেনাবাহিনীর তিনজন জেনারেলকে গ্রেফতার করুন। তারা হলো জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল শের বাহাদুর এবং জেনারেল হামিদ।'

এবার কমোডোর রব ইতস্ততঃ করলেন এবং কিছুটা সময় নিলেন। তিনি আভাসে বললেন, 'জনাব আমি আবার আসবো কি? আপনি এটা লিখে দিবেন কি?'

আমি জেনারেল শের বাহাদুরকে বললাম, 'এটাকে এত গুরুত্ব দিও না।'

আমি চাইনি যে অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে উঠুক। সংগে সংগে এও আমি জানতাম যে, ইস্কান্দার মির্জা এ রকম আহাম্মকির কাজ করতে পারে। আহাম্মকি এজন্য যে এটা তক্ষুণি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে

গোলযোগের সৃষ্টি করতো এবং তাহলে যে কি ঘটতো তা খোদাই জানেন। ইস্কান্দার মির্জা যেটা উপলব্ধি করতে পারেননি সেটা হলো, তিনি যদি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু করতে যান তাহলে সেনাবাহিনী প্রথমেই যা করবে তা হলো তাকে খতম করা। সুতরাং আমি তার কাছে গেলাম।

আমি বললাম, 'দেখুন আপনি কি সব মতলব করছেন?'

তিনি বললেন, 'কি?'

আমি বললাম, 'আমি শুনতে পাচ্ছি যে, আপনি সেনাবাহিনী অফিসারদের গ্রেফতার করার হুকুম দিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

তিনি আমাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনাকে ভুল সংবাদ দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোন সত্য নেই।' আমি তাঁকে সতর্ক করে বললাম, 'কোন রকম বাঁদরামি ও ধূর্তামি চলবে না, সাবধান থাকবেন, আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। এসব করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই আপনাকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দিতে প্রস্তুত আছি। তা সত্বেও আপনি এইসব কুকার্যের আশ্রয় নিচ্ছেন কেন?'

ইত্যবসরে সেনাবাহিনীর আইন বিশেষজ্ঞরা তাদের এই মত নিয়ে এলো যে, যেহেতু শাসনতন্ত্র নাকচ হয়েছে, সামরিক আইন ঘোষিত হয়েছে এবং একজন প্রধান সামরিক আইন-পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন সেহেতু প্রেসিডেন্টের পদ এখন অবান্তর। তাদের দৃষ্টিতে এটাই ছিলো আইনসঙ্গত অবস্থা।

আমি বললাম, 'তোমরা বাপু আমার জন্য আরও সমস্যার সৃষ্টি করো না। আমাকে এভাবে উত্যক্ত করছো কেন? এতে কোনও উপকার হবে না।'

যখন এই বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়, আমার মনে পড়ে প্রধান বিচারপতি মুনীর তখন সেখানে ছিলেন। বিপ্লবের আগে কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে তিনি ইস্কান্দার মির্জাকে পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন। আমি তাঁকে ডাকলাম এবং মনে করলাম যে ইস্কান্দার মির্জার সংগেও দেখা করবো। আমি কর্ণেল কাজীকে এ সম্বন্ধে তাঁর মত কি তা জানাতে বললাম। তাঁর মতে নতুন পরিকল্পনায় প্রেসিডেন্টের কোন স্থান নেই। মুনীর একমত হলেন না। আমি কাজীকে বললাম, 'আমি মুনীরের সংগে একমত। এটাই শেষ কথা, এটাকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করো।' তারপর আমি তাঁকে প্রস্থান করতে বললাম।

আমি আশা করেছিলাম যে, ইস্কান্দার মির্জা এই নতুন পরিস্থিতির সংগে খাপ খাঁইয়ে নেবেন। আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। আমি নিজেকে বললাম, 'তিনি যদি স্পষ্টভাবে কোনও অন্যায় না করেন তাহলে আমার পক্ষে তার বিরুদ্ধে যাওয়া আনুগত্যহীনতার কাজ হবে।'

কয়েকদিন পর আমার সেনাবাহিনীর কমাণ্ডাররা আমার কাছে এলেন এবং বললেন, 'এই লোকটি অসহ্য হয়ে পড়েছে।' আমি বললাম, 'একথা বলছো কেন?'

তখন তারা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন যে, 'কিছু একটা করার মতলবে তিনি কয়েকজন লোককে টেলিফোন করে বেড়াচ্ছেন।'

ইত্যবসরে জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছিল যে, যতক্ষণ ইস্কান্দার মির্জা দৃশ্যে উপস্থিত থাকবেন ততক্ষণ ষড়যন্ত্র চলতেই থাকবে এবং গঠনমূলক কিছুই করা যাবে না। আমার সহযোগিরা আমাকে বললেন, 'আপনার অসুবিধাটা আমরা বুঝি। আপনি গিয়ে আপনার বন্ধুকে বলতে চান না যে, তার মধ্যে কোন আনুগত্য নেই। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের চাইতে এটা অনেক বড় জিনিষ। আমরা আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিচ্ছি এবং অনুনয় করছি আপনি দয়া করে উপলব্ধি করুন যে, আমরা তাকে নিয়ে আর চলতে পারি না।' আমি বললাম, 'বেশ আমাকে এটা আবার চিন্তা করে দেখতে

দু'দিন অবকাশ দাও।' আমি আশা করছিলাম যে, তিনি চুপ করে যাবেন এবং আমার সঙ্গীরাও চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু হেডকোয়ার্টারে এবং আমার সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তাঁরা বললেন, 'আপনি যাই করুন না কেন, এই লোকটি সব নষ্ট করে দেবে।' তাঁরা ভয় করেছিলেন যে, তাহলে আমাদের নীতিতে জনসাধারণের কোন আস্থা থাকবে না, দেশেও শান্তি থাকবে না এবং উন্নতি সাধনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, 'যদি তোমরা তাই-ই মনে কর তাহলে আমি তাকে তাই বলব।' তাঁরা বললেন, 'না। আপনি যাবেন না। আপনার পক্ষ থেকে ওঁকে যা বলতে হয়, আমরা বলব।'

তিনজন জেনারেল তার ওখানে গেলেন। জেনারেল বাকী, জেনারেল আজম এবং জেনারেল খালিদ শেখ আমার পক্ষ থেকে মির্জাকে জানালেন, 'আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করছেন না বলে আমরা খুব দুঃখিত। এটাও অতি স্পষ্ট যে, জনসাধারণ আপনাকে চায় না। তারা আপনাকে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। এ রকম অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? পাকিস্তানের স্বার্থ এতে জড়িত রয়েছে। আশা করেছিলাম আপনি তা উপলব্ধি করে অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী নিজেকে সমুন্নত করে তুলবেন।' মনে হলো তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ ক্ষমতা সমর্পণ করতে তিনি সম্মত হলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার মেজর জেনারেল কথরণ তাঁর পুরানো বন্ধু ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইস্কান্দার মির্জা কোথায় যাচ্ছেন।' আমি তাঁকে বললাম, 'তিনি ইংল্যাণ্ডে যেতে চান, কিন্তু তাঁর থাকবার স্থান এবং ঠিকমত বিমান পাওয়াই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চার পাঁচ দিনের মধ্যেও এর কোনও ব্যবস্থা করা গেলো না। আমরা শঙ্কিত ছিলাম যে, তিনি যদি করাচীতে অবস্থান করতে থাকেন তাহলে জনসাধারণ আকস্মিকভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। সুতরাং আমরা তাকে কোয়েটায় যেতে বললাম। তিনি সম্মত হলেন এবং আমরা তাকে বিমানে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম।' কথরণ বললেন, 'আমি তার ওখানে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে চাই।' আমি বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই দেখা করতে পারেন। আপনি যদি তার সংগে যেতে চান, তাও পারেন। তিনি বন্দী কিংবা সে রকম কিছু নন।' তিনি সম্ভবতঃ করাচী বিমানবন্দরে গিয়ে তার সংগে দেখা করেছিলেন। যখন ইস্কান্দার মির্জা সবশেষে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন মৌরীপুর বিমানবন্দরে কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বহু বন্ধু-বান্ধব তার সংগে সাক্ষাৎ করে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

এ সিদ্ধান্তে আমি খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি দুঃখ বোধ করছিলাম যে, কি দুর্ভাগ্য তাঁর যে কারও প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারলেন না। অনেক আছেন যারা মনে করেন ইস্কান্দার মির্জার উপর আমার বিশ্বাস রাখা ভুল হয়েছিল। জনসাধারণ অনেক সময় আশ্চর্য হতো কেন আমি বুঝতে পারিনি যে, বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধন করার মত লোক তিনি ছিলেন না। আমি নিশ্চয়ই বলবো তিনি যখন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী ছিলেন তখন তার কাছ থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া কঠিন ছিল না এবং তার নিজের স্বার্থবিরোধী কিছু না হলে তিনি তৎপরতা ও দক্ষতার সংগে সিদ্ধান্ত দিতেনও। তিনি আমাদের সমর্থন পেলে কৃতকার্যতার সংগে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ করতে সক্ষম হবেন এটা আশা করা এমন কিছু অন্যায় ছিল না। তা ছাড়া তার চাইতে অভিজ্ঞ আর কোন রাজনীতিবিদের কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না। সব রাজনীতিবিদরাই পরীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তারা সবাই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিলেন। বেসামরিক লোকদের মধ্যে কাউকে দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে আর বাকী ছিল না।

সুতরাং অন্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারালেও আমি তাকে বিশ্বাস করে আসছিলাম এবং এটাই আমার স্বভাবের একটা দিক। আমি জীবনে খুব কঠিন জিনিষেরও মোকাবেলা করতে পারি। কিন্তু কঠোর ব্যবহার কিংবা অভদ্রতা করতে পারি না। আমি কারো বিরুদ্ধে তখনই কাজ করি যখন আমার ধৈর্য নিঃশেষিত হয়। এজন্যই সব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমার সময় সময় বিলম্ব হয়। একটা বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিন্ত।

এমন কি যদি ইস্কান্দার মির্জা সাধুতার সংগে কাজ করতে চাইতেন, তা হলেও নতুন যে-সব সংস্কার প্রবর্তিত হতে যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে থেকে সে সবের ফলাফল মোকাবেলা করার মতো সাহস তাঁর হতো না। আমার মনে হয় না যে, তিনি পদে বহাল থাকলে কোন কাজ হতো। তিনি পরিবর্তনের সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতেন না।

সামরিক আইনের যুগে আমি একবার সাংবাদিকদের বলেছিলাম, 'আমি তাড়াতাড়ি কাজ করার লোক। এত কাজ করার রয়েছে অথচ সময় আছে খুব কম।' আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যেকটি জিনিই সর্বাত্মক ক্ষমতার বলে আমি যে করবো তা নয়, জনসাধারণ সেগুলো নিজেরাই করবে। তারা যত শিগগিরই সেগুলো নিজের থেকে করতে শিখবে, ততই মঙ্গল। তারা যত শিগগির তাদের সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করতে পারবে দেশের পক্ষে ততই ভাল। সে জন্যই সামরিক আইন যাতে দ্রুত শেষ হয়ে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় আমি তা-ই চাচ্ছিলাম। কতকগুলো বৃহৎ সংস্কার সাধন করার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সামরিক আইন ছিল এ সংস্কারগুলোকে প্রবর্তিত করার একটা বুনিয়াদ। যদি কেউ এসব সংস্কার সাধন করতে বাধা দিত তা হলে তার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। ভাগ্যক্রমে এ রকম ব্যবস্থা নেবার কোন প্রয়োজন হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ কত আগ্রহের সংগে তাদের গুপ্ত সম্পদের কথা প্রকাশ করেছিল। তারা ১৭০ কোটি টাকার কথা ঘোষণা করেছিল। আমি একজন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি এটা কেন করলেন?' তিনি বললেন, 'আপনার একটি আলোকচিত্র দেখলাম। আপনি ঠিক এভাবে আপনার আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছিলেন এবং এভাবে মুখ কুঞ্চন করেছিলেন। আমি নিজেকে বললাম, এ লোকটি আমাদেরকে ছেড়ে দেবে না। আমরা যদি তার কথা মতো কাজ না করি তাহলে সে আমাদের খোঁজ করে ধরবেই। তখন আমরা সবাই এক জায়গায় একত্রিত হলাম এবং স্থির করলাম আমরাও সোজা পথে চলব। যা হোক, শতকরা পঁচাত্তরের জায়গায় আমরা যখন শতকরা তেত্রিশ ভাগ ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি, তখন ধরতে হবে হাল্কাভাবেই আমরা রেহাই পাচ্ছি। তাহলে এ সুবিধাটা গ্রহণ করবো না কেন?'

পরে তিনি আরও বললেন, যদিও আপনি আপনার আঙ্গুলটি কখনো তোলেননি, তবুও আপনার আলোকচিত্রখানি কৌশলে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল॥"[১৪৫]

দুই

"... কার্যতঃ পার্লামেন্টারি শাসন এদেশে কোন দিনই ছিল না। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ 'পার্লামেন্টের' ফ্লোরে দাঁড়াইয়া সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন: 'আমার বিচারে আমার পার্টি (মুসলিম লীগ) পার্লামেন্টের চেয়ে বড়।' কাজেই তাঁর আমলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তবে কি এক-পার্টি-শাসন ছিল? জনগণের মুখের উপর মুসলিম লীগের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন, তাঁর আমল পার্টি-ডিকটেটর শিপও ছিল না। তারপর প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের পরে পার্লামেন্ট বা মুসলিম লীগকে জিগ্গাসা না করিয়াই গবর্নর-জেনারেল নাযিমুদ্দিন যেদিন প্রধানমন্ত্রী হইলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন ছিল না। আইন-পরিষদে মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও যেদিন তিনি বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক ডিসমিস হইলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন ছিল না। তারপর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যেদিন আমেরিকা হইতে গবর্নর-জেনারেলের বগল-দাবা হইয়া উড়িয়া আসিয়া প্রধানমন্ত্রী হইলেন এবং পরে মুসলিম লীগেরও প্রেসিডেন্ট হইলেন, তখনও দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। এই প্রধানমন্ত্রীই যখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সদলবলে হারিয়া গিয়া বিজয়ী যুক্তফ্রন্টকে গবর্নমেন্ট চালাইতে দিলেন না, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তারপর বেশির

[১৪৫] মোহাম্মদ আইয়ুব খান (প্রেসিডেন্ট)/ফ্রেন্ড নট মাস্টার : আ পলিটিক্যাল অটোবায়োগ্রাফী (মূল : Friends Not Masters : A Political Autobiography/অনু. সৈয়দ আলী আহসান) ॥ [দি স্কাই পাবলিশার্স - আগস্ট, ২০২১। পৃ. ১১৯-১৩০]

ভাগ তথাকথিত পার্লামেন্টারি নেতার নীরব ও সরব সমর্থনে গবর্নর-জেনারেল গণপরিষদ ও পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিয়া যেদিন অর্ডিন্যান্স-বলে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, অর্ডিন্যান্স বলেই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলি উড়াইয়া দিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি ও সাড়ে তিন কোটি লোকের প্রতিনিধিত্ব প্যারিটি প্রবর্তন করিলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল না। তারপর নির্বাচন করিয়া নয়, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া যেদিন একটি নয়া গণ-পরিষদ আদায় করা হইল, চালাকি ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গবর্নর-জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী একই পশ্চিম পাকিস্তান হইতে লইয়া নয়া সরকার গঠন করা হইল এবং সেই সরকার জোড়াতালি দিয়া একটি নির্বাচন-পদ্ধতিবিহীন অসমাপ্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিলেন, সেদিনও দেশে পার্লামেন্টারি শাসন চালু ছিল না। এক কথায় উপরে বর্ণিত কোন সরকারই ভোটারদের নাগালের মধ্যে ছিলেন না। আট বছরে দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই রচিত হয় নাই। শাসনতন্ত্র রচনার পরও দুই বছরে কোন নির্বাচন হয় নাই।

সুতরাং জেনারেল আইউব ১৯৫৮ সালে যা করিলেন তাতে তিনি কোনও গণতন্ত্র হরণ করেন নাই। এক প্যাটার্নের অগণতন্ত্র হইতে অন্য প্যাটার্নের অগণতন্ত্রে দেশকে নিয়া গেলেন মাত্র।

... রাজনৈতিক নেতারা যে অনেক পাপ করিয়াছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর অভিযোগও তাই। নেতারা আট বছরে একটা শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন নাই। পুরাতন শাসনতন্ত্রের দেওয়া বাই-ইলেকশনগুলি পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সরকারের আইনসংগত সমালোচনার জন্য অপযিশন পার্টি গঠন করিতে দেন নাই। সরকারের সমালোচকদের পাকিস্তানের দুশমন, ভারতের চর ও ইসলামের শত্রু আখ্যা দিয়া তাঁদেরে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করিয়াছিলেন। খবরের কাগযের আফিসে তালা লাগাইয়া সাংবাদিক-স্বত্বাধিকারীদেরে জেলে আটক করিয়াছিলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পূর্ববাংলার ন্যায়সংগত দাবিটাকে পশ্চিমবাংলার উস্কানি আখ্যায় গালিগালাজ করিয়াছিলেন। ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালাইয়াছিলেন। পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহীদ সাহেবকে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁর গণ-পরিষদের মেম্বারশিপ কাটিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনবিজয়ী প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের মন্ত্রিসভা বাতিল করিয়া তাঁকে নযরবন্দী করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যায়-অসংগত অগণতান্ত্রিক অত্যাচার চলে আট-আটটা বছর ধরিয়া। কিন্তু তবু এই মুদ্দতে আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী রাষ্ট্র-শাসনে হস্তক্ষেপ করে নাই। তারপর এই আট বছরের অপকর্মীদেরে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া যখন অবশেষে দেশে একটা শাসনতন্ত্র রচিত হইল, যখন সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশময় একটা সাধারণ নির্বাচন হওয়ার দিন-তারিখ স্থির হইল, ঠিক সেই মুহূর্তে মার্শাল ল আসিল।

... সত্য কথা এই যে পাকিস্তান গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পথে চলিয়াছিল। সমস্ত লক্ষণই ঐদিকে অংগুলি নির্দেশ করিতেছিল। আর কিছুদিন গেলে বোধ হয় সত্য-সত্যই ব্যর্থ হইত। তবে এটাও সত্য যে যেদিন আইউব সাহেব বিপ্লব করিলেন, সেদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই। প্রয়োগই হয় নাই, ব্যর্থ হইবে কি? আট বছর ধরিয়া শাসনতন্ত্র রচনা লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইল। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার ডিসমিস করা হইল। কেন্দ্রেও নাযিমুদ্দিন সরকার ডিসমিস হইলেন। এবং সর্বশেষ গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়া হইল। এর যেকোনও একটাকে বিপ্লবের অজুহাত করিয়া প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিলে তাঁর কাজের নৈতিক সমর্থন থাকিত। তিনি জনগণের সমর্থন পাইতেন। ঠিক তেমনি, তিনি যদি ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন, নির্বাচনে তাঁর আশংকিত খুন-খারাবি আরম্ভ হইলে পরে তিনি যদি মার্শাল ল প্রবর্তন করিতেন, তবেই তিনি যুগপভাবে দেশবাসীর ও বিশ্ববাসীর নিকট সম্মান ও সমর্থন পাইতেন।

অথচ তিনি নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্শাল ল করিলেন তাঁর নিজের কল্পিত ও অনুমিত বিপদ ঠেকাইবার জন্য। এমন সময় করিলেন, যখন রাষ্ট্রচালক রাজনীতিকরা অনেকবার পথভ্রষ্ট হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত

টাল সামলাইয়া লইয়াছিলেন। অতীতে অনেকবার বিপ্লব করা দরকার হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল আইউব রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত ছিলেন। বিপ্লব না করিয়া বরঞ্চ তিনি রাজনীতিকদের সহায়তা করিয়াছেন। গণ-পরিষদ ভাংগিয়া দেওয়ার মত অন্যায় বেআইনী ও অগণতান্ত্রিক কাজ হওয়ার সময় তিনি 'বিপ্লব' করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন নাই। বরঞ্চ নিজে রাজনীতিকের অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতে তাঁর সাধু ইচ্ছা এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থাই প্রমাণিত হইয়াছিল। দেশে গণতন্ত্র বাঁচাইবার শেষ চেষ্টায় তিনি রাজনীতিকদের সহায়তা করিবার জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব কথা যদি সত্য হয়, তবে গণতন্ত্র যখন টাল সামলাইয়া উঠিয়াছিল, শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া যখন নির্বাচনের দিন-তারিখ পড়িয়াছিল, তখন তিনি তলওয়ার মারিলেন কেন? রচিত শাসনতন্ত্র অচল বলিয়া? সাধারণ নির্বাচনে খুন-খারাবি হইত বলিয়া? এতই দৃঢ় যদি তাঁর বিশ্বাস ছিল, তবে এটা প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেন নাই। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইউবের বই-এও এর জবাব নাই।

কাজেই যদি মনে করা হয়, পাকিস্তান রক্ষার জন্য নয়, দেশের আর্থিক কাঠামো বাঁচানোর জন্যও নয়, ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা পূরণের জন্যই প্রেসিডেন্ট আইউব রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়াছেন, তবে তা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু সে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখাও দেশ-সেবার জন্য হইতে পারে। হাযার সাধু উদ্দেশ্য লইয়াও সামরিক শক্তি-বলে বা বেআইনীভাবে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কোনও অধিকার কোনও সেনা-নায়ক বা সরকারি কর্মচারির নাই, সেটা আলাদা কথা। এখানে তা আমার আলোচ্যও নয়। এখানে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু এই যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব নিতান্ত সাধু-উদ্দেশ্য-মিশ্রিত-ব্যক্তিগত-উচ্চাকাংখায় মার্শাল ল করিয়াছেন। তা করিতে গিয়া তিনি অনেক ভাল কাজও করিয়াছেন, অনেক খারাপ কাজও করিয়াছেন। তুলনায় যদি দেখা যায়, তাঁর ভাল কাজের ওজন খারাপ কাজের চেয়ে ভারি, তবে তাঁর তারিফ ও তাঁর কাজের সমর্থন করিতেই হইবে।

মার্শাল ল, সামরিক বিপ্লব ও ব্যক্তিগত ডিটেটরশিপের কোনওটাই নির্ভেজাল অভিশাপ নয়। অনেক সময় ঐ সবের দ্বারা পরিণামে দেশ ও দেশবাসী জনসাধারণের উপকার হইয়া থাকে। রাজতন্ত্র ও ডিকটেটরশিপের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধরনের বিপ্লব সর্বদাই দেশের কল্যাণ করিয়া থাকে, তাতে দ্বিমত নাই। তাছাড়াও শুধুমাত্র শাসনতন্ত্র ও সামাজিক-অর্থনীতিক কাঠামো বদলাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লব হইলেও তা দেশের মংগল সাধন করিতে পারে। আইউব সাহেব যদি মোটামুটি দেশের কল্যাণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁর গোড়ার ক্ষমতা দখলের অন্যায় ও বেআইনী কাজটাও জনসাধারণ ও ইতিহাসের বিচারে ভাল কাজ বিবেচিত হইবে।

আগে তাঁর ভাল কাজগুলিরই উল্লেখ করা যাক। তিনি (১) পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার নীতিতঃ অবসান করিয়াছেন, (২) একবিবাহকে কার্যতঃ বাধ্যতামূলক করিয়াছেন, (৩) দুই পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য স্বীকার করিয়াছেন, (৪) রেলওয়ে প্রদেশকে দিয়াছেন, (৫) কয়েকটি নিখিল পাকিস্তানীয় অর্থ-বন্টন প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন, (৬) শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনকে দুই প্রদেশের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছেন, (৭) পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া উভয় পাকিস্তানের নিম্নস্তরের স্বায়ত্তশাসনকে একই প্যাটার্নের করিয়াছেন, (৯) জাতীয় শিপিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন এবং (১০) সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করিয়া বৈদেশিক নীতিকে সুসংগত করিয়াছেন।

এসবই ভাল কাজ। দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ। পার্লামেন্টারি আমলের যে কোনও সরকারের জন্য এর সব কয়টা এবং যে কোনও একটা গৌরব ও অহংকারের বিষয় হইত। কারণ এর মধ্যে কয়েকটি কাজ পার্লামেন্টারি সরকারের পক্ষে করা খুবই কঠিন হইত। মুসলিম ওয়ারিসী ও বিবাহ আইন সংশোধন ও পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদারি উচ্ছেদ এই ধরনের কাজ। পার্লামেন্টারি সব সরকারকেই জনমতের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেজন্য সব কাজই তাঁদের করিতে হয় ধীরে-ধীরে সহাইয়া-সহাইয়া। কোনও ব্যাপারেই বিপ্লবী কোনও পরিবর্তন তাঁরা আনিতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই প্রয়োজনবোধে

জনকল্যাণের জন্যই বিপ্লবের দরকার হয়। বিপ্লবী-সরকার প্রচলিত আইন জন-মত সমাজ-ব্যবস্থা ভুক্তিত অধিকার কিছুই মানিয়া চলিতে বাধ্য নন। কারণ ও-সব ওলট-পালট করিবার জন্যই বিপ্লব আসিয়াছে। ঠিক তেমনি পার্লামেন্টারি সরকারকে কোনও না কোন পার্টি বা অর্গানিযেশনের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রতি কাজে পার্টির অনুমোদন লইতে হয়। তারপর আইন-সভায় যাইতে হয়। সেখানে আইন পাস করাইতে হয়। বাজেট মনযুর করাইতে হয়। তারপর কার্যে পরিণত করিতে হয়। বিপ্লবী সরকারকে এসব কিছুই করিতে হয় না। কাজেই ইচ্ছা করিলেই তাঁরা দেশের কল্যাণজনক ও উন্নয়নমূলক কাজ আশাতীত দ্রুতগতিতে করিতে পারেন। এই হিসাবে আমাদের বিপ্লবী সরকারের কাজ মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। অন্য কাজের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। কারণ কোনটা ভাল আর কোনটা ভাল নয়, তা নিয়া বর্তমান সরকার ও আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু যে বিষয়ে মতভেদ নাই এবং যে কাজটা তাঁরা করিতে চান বলিয়া থাকেন, তার কথাই বলা যাক। এটা কার্টেল-প্রথা ও দুই অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার কথা। এ দুইটা দূর হয়ই নাই, বরঞ্চ দিন-দিন বাড়িতেছে।

কিন্তু এটাও আসল কথা নয়। সরকারের ভাল-মন্দ কাজের বিচারে গণতান্ত্রিক সরকার ও বিপ্লবী সরকারের মাপকাঠি এক নয়। গণতান্ত্রিক সরকারকে ভোটাররা ভোট দিয়া গদিতে বসান। কাজেই তারা যদি ভাল কাজ করেন, তবে তার জন্যও যেমন ভোটাররাই প্রশংসার অধিকারী, তেমনি ঐ সরকার যদি খারাপ কাজ করেন তবে তার নিন্দার ভাগীও ভোটাররা। এটা ন্যায়সংগতও। কারণ তেমন অবস্থায় ভোটাররাই আবার ভোট দিয়া সে সরকারকে বরতরফ করিতে পারেন এবং করেনও।

কিন্তু বিপ্লবী সরকারের কেস তা নয়। ভোটাররা তাঁদের ভোট দিয়া গদিতে বসান নাই। বিপ্লবের নেতারা নিজের ইচ্ছায়, নিজের প্ল্যান প্রোগ্রাম লইয়া ভোটারগণের মত লইয়া অনেক সময় ভোটারদের অমতে জোর যবরদস্তিতে, গদি দখল করেন। উদ্দেশ্য দেশের ভাল করা। দরকার এই জন্য যে ভোটের সরকার দিয়া ঐসব কাজ হইতেছিল না। হওয়ার উপায়ও নাই। গণতন্ত্রী সরকার ঠিকমত দেশকে চালাইতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই বিপ্লবের নেতারা জোর করিয়া তাঁদের হাত হইতে গদি ছিনাইয়া নিয়া নিজেরা বসিয়াছেন। কাজেই ভাল তাঁদের করিতেই হইবে। কোনও অজুহাতেই তাঁদের ব্যর্থ হওয়া চলিবে না। ব্যর্থ হইলে তাঁরা নিজেরা এবং তাঁরা একা অপরাধী হইবেন। সুতরাং ভাল কাজ করিলে তাঁরা প্রশংসা পাইবেন না। কারণ ওটা করা ছিল তাঁদের ফরয। বিপ্লবীর দায়িত্বে মজার ব্যাপার এইখানে। সফল হইলে প্রশংসা নাই কিন্তু ব্যর্থ হইলে নিন্দা আছে।

তথাপি বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন এবং পাইয়াও থাকেন যদি তারা বিপ্লবকে জাসটিফাই করিতে পারেন। অর্থাৎ তারা যদি এমন কাজ করেন যা কোনও গণতন্ত্রী সরকারের দ্বারা সম্ভব হইত না, যত যোগ্য বা যত ভাল সরকারই হউন না কেন। যেমন রাজতন্ত্র তুলিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ধনিকদের ধন বাযেয়াফত করিয়া এক চোটে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এমন বিপ্লবী পরিবর্তন আনা ছাড়া আর কোন কাজের জন্যই বিপ্লবী সরকার প্রশংসা পাইতে পারেন না। সাধারণ মামুলি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ত নয়ই। তাছাড়া দৃশ্যতঃ যে সব কাজ কোনও সরকারের আমলের আসলে সে কাজ তাঁদের নাও হইতে পারে। বাপ আম গাছ লাগাইয়া গেলে ছেলের আমলে তাতে যদি ফল ধরে, তবে সে উন্নতিকে ছেলের আমলের উন্নতি না বলিয়া বরঞ্চ বাপের আমলের উন্নতিই বলিতে হইবে। পাকিস্তানের বর্তমান শিল্পোন্নয়নের অনেক কাজই আগের সরকার করিয়া গিয়াছেন। সবদেশেই অমন হইয়া থাকে। সরকারের মধ্যে একটা কনটিনিউটি একটা অবিচ্ছিন্নতা থাকিলে এই ধরনের কাজ হয় সকল সরকারের। প্রশংসা পান আগে পরের সব সরকাররাই সমানভাবে। বর্তমান সরকার যদি আগের-আগের সব সরকারকেই ধূচিয়া গাল দিয়া সব কাজের কৃতিত্ব নিজেরা নিতে চান, তবেই এ ধরনের হিসাবের কথা উঠে। তবেই লোকের মনে পড়ে: করাচি ও চাটগাঁ বন্দর, আদমজী জুট মিল, কর্ণফুলী পেপার মিল, খুলনা নিউযপ্রিন্ট মিল ও ডকইয়ার্ড, ফেঞ্চুগঞ্জ সার-মিল, কাপ্তাই বাঁধ ইত্যাদি সবই আগের সরকাররা করিয়া গিয়াছেন।

লোকের আরও মনে পড়ে যে বর্তমান সরকারের রূপপুর ঘোড়াশাল ইত্যাদি স্কিম পাঁচ-ছয় বছরের প্রসব-বেদনার পরেও মাঝে-মাঝেই ফলস পেইন প্রমাণিত হইতেছে।

তবু এসব শিল্পিক ও আর্থিক উন্নতি-অবনতি লইয়া বর্তমান সরকার ও অপযিশন নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিতেছে সে বিতর্কে আমি লেখক সাহিত্যিক হিসাবে এই পুস্তকে কোনও একপক্ষ অবলম্বন করিতে চাই না। ওসবের বিচার—ভার ইতিহাসের উপরই ছাড়িয়া দিতে চাই। কোনও লোক গদিতে থাকা পর্যন্ত তাঁর আমল সম্বন্ধে সত্যিকার নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা চলে না। যা চলে তা একদিকে সীমাহীন তোষামোদ, অপরদিকে পক্ষপাতদুষ্ট একতরফা নিন্দা।

একটু গভীরভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এবং বর্তমান শাসকরাও ধীরভাবে যথাসময়ে বিচার করিলে বুঝিবেন, মার্শাল আইন জারির দ্বারা যে বিপ্লব আমাদের দেশে আনা হইয়াছে মোটের উপর তাতে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান হইয়াছে অনেক বেশি। সে লোকসানগুলির কুফল মারাত্মক, সুদূরপ্রসারী। সে সবের প্রতিকার খুব কঠিন, সংশোধন খুবই সময়সাপেক্ষ। এমন কয়টি ব্যাপারের দিকে দেশবাসী এবং বর্তমান শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমার এই 'ইন্টারিম কাল তামামি' শেষ করিতে চাই।

সংক্ষেপে এইসব লোকসানের সংখ্যাও মোটামুটি দশটি। যথা :

(১) মার্শাল ল প্রবর্তনে গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের ইমেজ ভাংগিয়া গিয়াছে। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দুনিয়ার নযরে বর্তমানে ভারতই যে এশিয়ার একমাত্র 'শো পিস অব ডেমোক্র্যাসি' আখ্যা পাইতেছে, এই সার্টিফিকেটের হকদার পাকিস্তানও ছিল। মার্শাল ল প্রবর্তন জাস্টিফাই করিতে গিয়া পাকিস্তানের সে অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

(২) রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন গণতন্ত্রে সুশিক্ষিত এবং স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া পাকিস্তানের জনগণের যে একটা সুনাম ছিল, সে সুনাম কলংকিত হইয়াছে। এটা সাংঘাতিক রকম মারাত্মক হইয়াছে এই জন্য যে পার্শ্ববর্তী এবং গতকালের একই জনতার অংশ ও একই পরিবেশের সৃষ্ট ফল ভারতীয়দের সংগে তুলনায় আমাদেরে হীন ও অনুন্নত জাতি বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এর তাৎপর্য প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের তুলনায় হিন্দুদিগকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছে। ভারতের হিন্দুদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানেরা বাধা দিয়া ইংরাজের তাবেদারি করিয়া ভারতে ইংরাজ শাসন বহাল রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হিন্দুদের এই অভিযোগ সত্য প্রমাণ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিকশিত ও প্রসারিত কাঠামোর উপর রচিত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্রের সংকুচিত কাঠামোর উপর ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র জারি করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে, ভারতবাসী অর্থাৎ প্রাক-স্বাধীনতার ভারতীয় হিন্দু গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য বটে কিন্তু মুসলমানরা সে যোগ্যতা আজো অর্জন করে নাই। তাদেরে ফের-শুরু, সে-শুরু করিয়া ১৯১৯ সালের গ্র্যাজুয়েল রিয়েলিযেশন অব সেল্ফ গবর্নমেন্ট ট্রেনিং দিতে হইবে। সেই জন্যই ১৯১৯ সালের আগের লর্ড রিপনের আমলের মত মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলা বোর্ডে সরকার মনোনীত অফিশিয়াল চেয়ারম্যানের বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে।

(৩) পাইকারীভাবে সমস্ত রাজনীতিকদের অর্ডিন্যান্স বলে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্বই মসি-লিপ্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটা উপরের দুই নম্বর দফায় খুবই পরিপূরক হইয়াছে। বলা হইয়া গিয়াছে যেমন জনতা, তেমনি তাদের নেতা। এই সব দণ্ডিত নেতাদের প্রায় সবাই কায়েদে আযম ও কায়েদে-মিল্লাতের সহচর অনুচর সহকর্মী ও মন্ত্রী ছিলেন। সহচর দিয়াই মানুষের বিচার করা যায় এই নীতির বলে এতে কায়েদে আযম-কায়েদে মিল্লাতেরও বিচারটা হইয়া গেল। প্রাকস্বাধীনতা যুগে হিন্দু-নেতারা মুসলিম-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখে-মুখে যে সব গাল দিতেন, আইউব সাহেব হাতে-কলমে তা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

(৪) ভোটাধিকার খাটাইবার যোগ্যতা নাই, এই অভিযোগেই পাকিস্তানের জনগণের ভোটাধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। এই তহমতের দ্বারা পাকিস্তানের বুনিয়াদী অসুলই উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোট দিয়াই জনগণ পাকিস্তান হাসিল করিয়াছিল। বলা হইয়া গেল ওটাও ছিল ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্যতার প্রমাণ।

(৫) পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামো ভাংগিয়া দিয়া সে স্থলে ঐকিক ইউনিটারি কেন্দ্র দাঁড় করাইয়া পাকিস্তানের মূল পরিকল্পনার ভিত্তি ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাতে পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করা হইয়াছে।

(৬) এতে উভয় অঞ্চলের পাকিস্তানীদের ঐক্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাদের মধ্যে 'আমরা' ও 'তোমরা'-ভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইউব নিজে পূর্ব-পাকিস্তানীদের 'ভারতের আদিম অধিবাসী, ধর্ম-কৃষ্টিতে হিন্দুপ্রভাবাধীন, চির-পরাধীন, সন্দেহপরায়ণ ও স্বাধীন জীবনযাপনে অনভ্যস্ত' আখ্যা দিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিমের গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়া জাতীয় সংহতির ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন। এসব কথা বলিতে গিয়া তিনি শুধু গোটা পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর অবিচারই করেন নাই ; সত্য ও ইতিহাসের তিনি অপমান করিয়াছেন। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির সৃষ্ট নয়, বিপ্লবের কুফল ; কারণ স্বয়ং আইউব সাহেবই বিপ্লবের অবদান।

(৭) জাতির পিতা কায়েদে-আযমের জন্মস্থান ও মৃত্যুস্থান করাচি হইতে জাতির পিতার নিজ হাতে স্থাপিত রাজধানী সরাইয়া পাঞ্জাবে নিয়া যাওয়ায় জাতির পিতার সম্মান, মর্যাদা ও ইমেজে আঘাত করা হইয়াছে। জাতির পিতার ইমেজ তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা ও ওসিয়ত রক্ষার দায়িত্ববোধ আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। সব নব-সৃষ্ট জাতির পিতা সম্বন্ধেই একথা সত্য। ভৌগোলিক ব্যবধান ও অন্যান্য পার্থক্যের দরুন এটাই আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ।



1964, Sheikh Mujib in the public meeting for the election of Fatema Jinnah, the candidate from allied opposition parties.

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মাদারে মিল্লাত ফাতিমা জিন্নাহ'র ঢাকা আগমনে শোভাযাত্রায় শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী এবং মৌলভী ফরিদ আহমদ।

(৮) এই রাজধানী স্থানান্তরে রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্বপাকিস্তানী জনগণের নাগালের বাহিরে নেওয়া হইয়াছে। কোস্টাল ট্রাফিক ন্যাশনালাইজ করিয়া জাহাজের সংখ্যা বাড়াইয়া সাবসিডির সাহায্যে ভাড়া কমাইয়া রাজধানীতে যাতায়াত পূর্ব-পাকিস্তানীদের জন্য সহজ ও সুলভ করিয়া এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া জনগণের স্তরে জাতীয় সংহতিকে সফল করিবার যে বিপুল সম্ভাবনা ও একমাত্র পন্থা ছিল, রাজধানীকে সমুদ্র পথ হইতে বহু দূরে সরাইয়া সে সম্ভাবনা ও পন্থা চিরতরে লোপ করা হইয়াছে।

আইউব যতগুলি সেটল্ড বিষয় আনসেটল্ড করিয়াছেন, তার মধ্যে রাজধানী স্থানান্তরটাই সবচেয়ে মারাত্মক। মারাত্মক এই জন্য যে আইউব-কৃত অন্যান্য ওলটপালটের সংশোধনের মত সহজে এটার সংশোধন হইবে না। হইবে না এই জন্য যে যাদের ঘরের দুয়ারে রাজধানী গিয়াছে তাঁরা ছাড়িতে চাহিবেন না। অর্থ-ব্যয় বারবার রাজধানী স্থানান্তর ইত্যাদি অনেক কুযুক্তি দিবেন। দেওয়া শুরুও করিয়াছেন। রাজধানীর হকদার ছিল পূর্ব-পাকিস্তানীরা। শুধু জাতির পিতার খাতিরে তারা করাচিতে রাজধানী মানিয়া লইয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি কায়েদের স্মৃতির মর্যাদা না দেয়, তবে একা পূর্ব-পাকিস্তানীরা দিলে কি লাভ? অতএব পূর্ব-পাকিস্তানীরা এখন ন্যায়তই চাইবে ঢাকায় রাজধানী আসুক। এটা শুধু মেজরিটির গণতান্ত্রিক দাবিই নয়, শতকরা নব্বইজন পূর্ব-পাকিস্তানী নব্বই বছর বাঁচিয়াও নিজের দেশের রাজধানী দেখিয়া মরিতে পারিবে না, প্রশ্নটা শুধু তাও নয়, রাজধানীর সংগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থ বন্টন ও প্রয়োগ, আঞ্চলিক অসাম্য দূরীকরণ, সরকারি-বেসরকারি চাকুরী, সাপ্লাই, কন্ট্রাকদারি, বিদেশী মিশন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অবস্থাগতিকে অন্যান্য সব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই পূর্বপাকিস্তানীরা রাজধানী ছাড়া বাঁচিতে পারে না। এই জটিল সমস্যাটিই আইউব খুলিয়া দিয়াছেন।

(৯) পার্টি-রাজনীতিকে মসি-মলিন কুৎসিৎ করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সিয়াল বা পার্লামেন্টারি কেবিনেট যে সিস্টেমেই দেশ শাসিত হউক না কেন, রাজনৈতিক পার্টি উভয় ক্ষেত্রেই আবশ্যক। বর্তমান 'বিপ্লব' এই দলীয় রাজনীতিকেই কুৎসিৎ মসিলিপ্ত ও বদ-সুরত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইউব নিজে 'কায়েদে-আযমের পরিচালিত ও পাকিস্তান অর্জনকারী মুসলিম লীগের' নামানুসারে নিজের পার্টি খাড়া করিয়াছেন বটে কিন্তু তাতে ঐ মুসলিম লীগকে পার্টির মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, ক্যারিকেচার করা হইয়াছে মাত্র। কায়েদে-আযম গভর্নর জেনারেল হইয়া মুসলিম লীগের সভাপতিত্বে ইস্তাফা দিয়াছিলেন। আইউব সাহেব হেড-অব-দি স্টেট হিসাবেই হেড-অব-দি-মুসলিম লীগ হইয়াছেন ও থাকিতেছেন। এই মুসলিম লীগের অফিসবিয়ারাররা নির্বাচিত হন না। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত ও পদচ্যুত হন। নির্বাচনে 'মুসলিম লীগ মেনিফেস্টো' প্রচারিত হয় না, হয় 'মাই মেনিফেস্টো'।

(১০) গণতন্ত্রের চেহারা খারাপ করা হইয়াছে। প্রেসিডেনশিয়াল ও পার্লামেন্টারি এই দুইটা পশ্চিমী গণতান্ত্রিক পন্থা ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যে পার্টিডিক্টেটরশিপ চলিতেছে, তাকেও গণতান্ত্রিক বলা যায় এবং বলা হইতেছে। কারণ, সেখানে রাষ্ট্রনায়করা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মত সোজাসুজি ভোটারদের আয়ত্তাধীন না হইলেও পার্টির সদস্যগণের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু আইউব সাহেব যে পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছেন, তাতে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীদের উপর মুসলিম লীগ পার্টির বা আইন পরিষদের অথবা ইলেকটরেল কলেজ নামক ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটদের কোনও ক্ষমতা নাই। কারণ ব্যাসিক ডিমোক্র্যাটরা সরকারি কর্মচারির অধীন। সরকারি কর্মচারিরা প্রেসিডেন্টের অধীন। কাজেই এটা আসলে পার্টি-ডিক্টেটরশিপ নয়, ব্যক্তি-ডিক্টেটরশিপ। এটাকে ব্যাসিক ত দূরের কথা, কন্ট্রোল ডিমোক্র্যাসি বলিলেও 'ডিমোক্র্যাসি' কথাটার অমর্যাদা করা হয়।

এইসব লোকসানের কুফলের সবগুলি মিলিয়া বা এর যে-কোনও দুই-একটা পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে এবং করিতেছে। দেশবাসীর দুর্ভাগ্য এই যে রাষ্ট্র-নেতারা একজনের পর আরেকজন কেবল ভুলের উপর ভুলই করিয়া যাইতেছেন। পূর্ববর্তী সরকারের ভুল-ভ্রান্তির জন্য দেশবাসীর

ভোগান্তির সীমা ছিল না। সেই ভোগান্তির অবসান ঘটাবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যাঁরা আসিলেন, তাঁরা আগের ভুলের প্রতিকারের বদলে নুতন করিয়া মারাত্মক সব ভুল করিতে লাগিলেন॥"[১৪৬]

তিন

"... ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৭ এই এক দশকের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, আধা সামরিক সরকার ইত্যাদি জগাখিচুড়ী উত্থান-পতনের অবসান ঘটে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর মধ্যরাত্রির সামরিক অভ্যুত্থানে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকারে আস্থাশীল কায়েদে আযমের ইহলোক ত্যাগের অব্যবহিত পর হইতেই পাকিস্তানে ক্ষমতাপ্রসূত প্রাসাদ রাজনীতির উদ্ভব হয়। ১৯৫১ সালে মেজর জেনারেল আকবর খানের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠীর সম্মুখে ক্ষমতা দখল ও কুক্ষিগত করণের নূতন দ্বার উন্মোচন করে। সামরিক-বেসামরিক আমলা সম্প্রদায় ও কায়েমী স্বার্থের রক্ষক প্রাসাদ রাজনীতিবিদ চক্র ক্রমশঃ বিদেশী শক্তির সাহায্যসহযোগিতায় ক্ষমতা লাভের বিনিময়ে সামরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে তুলিয়া দিতে থাকে। ঘটনার বিবর্তনে এবং ক্ষমতাসীনদের উত্থান-পতনে জনসাধারণ সরকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং অসহায় নীরব দর্শককে পরিণত হয়। শাসন-শোষণই ছিল রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের 'মূলমন্ত্র'। দুর্নীতি ছিল মন্ত্রী, মেম্বার ও সরকারি আমলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাহারা অবৈধ পথে প্রচুর ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া যোগ্যতা ও সততার কি অমূল্য নিদর্শনই না ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-মেম্বার, নেতা-উপনেতা দেশসেবার বদৌলতে ঢাকায় স্ব-স্ব বাড়ী-ঘর নির্মাণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। ধানমন্ডি এলাকায় আওয়ামী লীগ সদস্যদের নির্মিত ঘরবাড়ীসমূহ 'আওয়ামী লীগ কলোনি' আখ্যা পায়। ইহা আওয়ামী লীগ সরকারের অকৃত্রিম জনসেবার অতুলনীয় স্বাক্ষর বটে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ আচরণ সেক্রেটারিয়েটের মহাজন আমলাদিগকে তাঁহাদের অবাঞ্ছিত পদাংক অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করে এবং আমলাগোষ্ঠী সংখ্যাধিক্য বিধায় লুটপাটের সিংহভাগ তাহারাই পায়। পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিসভুক্ত সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, ফাইনান্স সার্ভিস ইত্যাদির অন্তর্গত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের শতকরা ৯৫ জন ছিলেন দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁহারা চাকুরীর প্রথম জীবনে ছিলেন ৩ শত হইতে ৫ শত টাকার বেতনভুক্ত কর্মচারী। অথচ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার দ্বারা স্বীয় জীবন ভোগের উদগ্র বাসনায় চরম অসুদপায় অবলম্বনে তাহারা কোন সময়ই কুণ্ঠিত হন নাই এবং বিপুল অর্থোপার্জনের মাধ্যমে এই দেশে তাহারাই রামরাজত্ব কায়েম করিয়াছিলেন। ৩, ৪ অথবা ৫ বৎসরের চাকুরী জীবনে রাজধানী ঢাকা অথবা বন্দর শহর চট্টগ্রাম বা খুলনার বুকে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ বা ক্রয়, শহরে, গ্রামেগঞ্জে জোতজমি ক্রয়, স্বীয় ব্যবহারের জন্য গাড়ী ক্রয়, ঠাঁট বজায় রাখিবার অতিরিক্ত জিনিসপত্র যথাঃ রেফ্রিজারেটর, দামী কার্পেট, ড্রইং রুম সেট, ডাইনিং হলসেট, সহধর্মিনীর শাড়ী-গহনা ক্রয়, দেশে-বিদেশে স্বনামে-বেনামে ব্যাংক ব্যালান্সের মোহ তাহাদের পাইয়া বসিয়াছিল। ৩ শত, ৫ শত এমন কি হাজার দুই হাজার টাকা বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের জীবনে এইসব ছিল রূপকথার কাহিনীর ন্যায়। পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নগণ্যসংখ্যক সরকারি কর্মচারী ব্যতীত অধিকাংশের বেলায়ই ইহা ছিল অকাট্য সত্য। জীবন ও যৌবন ভোগের উন্মত্ত নেশায় তাহাদের সচেতন অপরাধ প্রবণতা জাতিকে দুর্নীতির অতল গহবরে নিমজ্জিত করে। এতদবর্ণিত জাতিদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, নীতিদ্রোহী জীবশ্রেণীর বিরুদ্ধে যাহারা কণ্ঠকে সোচ্চার রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রশাসনিক ক্ষমতার দাপটের শিকার হইতে হইত ও পুনঃ পুনঃ কারাবরণ ছিল তাহাদের জন্য অবধারিত। মাওলানা ভাসানীর বিশাল ব্যক্তিত্বকেও বার বার কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী জীবনবোধ

---

[১৪৬] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ৪৫৮-৪৬৯]

ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। মাওলানা ভাসানী সেই যুগের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী শাসনদন্ডের নায়কবৃন্দ যথা নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মীর্জা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ ইসলামী জীবনদর্শন নির্দেশিত জীবনবোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন পর্বতপ্রমাণ বাধা। তাঁহাদের বক্তৃতা-ভাষণে একদিকে ইসলামী জীবনদর্শনের গভীর তাৎপর্য ও ব্যবহারিক জীবনে উহার রূপায়নের খই ফুটিত এবং অন্যদিকে তাঁহারাই আবার মাওলানাকে 'লুঙ্গীসর্বস্ব' 'ইসলামের শত্রু' 'পাকিস্তানের শত্রু' 'ভারতের চর' ইত্যাদি হীন আখ্যায়িত করিতে সামান্যতম ক্লেশ বোধ করেন নাই।

জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয়কালে জনগণ আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে ও বহিঃশক্তির নিকট অবচেতন অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে। আত্মিক শক্তির পরাভব ও অবলুপ্তির এই সন্ধিক্ষণেই ইস্কান্দার মীর্জা আইউব খানের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানান এবং এইভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতির উপর জেনারেল আইউব খানের একনায়কত্বের ভিত রচিত হয়।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সর্বপ্রথম রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সেনাধ্যক্ষ জেনারেল আইউব খান ৭ই অক্টোবর (১৯৫৮) দিবাগত মধ্যরাত্রিতে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল আইউব খান প্রধান সামরিক শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণের কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান সফরে ঢাকা আগমন করেন ও ঢাকা স্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় ভাষণদান করেন। অনস্বীকার্য যে, দুর্নীতির দরুন লোকচোখে হেয় রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক অঙ্গন হইতে বিদায় দেওয়ার কারণে সামরিক অভ্যুত্থানে জনগণ সেই সময়ে আনন্দিত হইয়াছিল এবং জেনারেল আইউব খান সাধারণ লোকের প্রাণঢালা সমর্থনও লাভ করিয়াছিলেন। জেনারেল আইউব খান ঢাকা অবস্থানকালেই ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৮) প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা জেনারেল আইউব খানকে ১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং লেঃ জেঃ মুসাকে জেনারেল পদে উন্নীত করিয়া প্রধান সেনাপতির পদ দান করেন। ২৭শে অক্টোবর সকাল ১০টায় জেনারেল আইউব খান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। দিবা অবসানের কিয়ৎকালের মধ্যেই লেঃ জেঃ আজম খান, লেঃ জেঃ কে. এম. শেখ, লেঃ জেঃ ডবলিউ. এ. বাকী প্রেসিডেন্ট মীর্জার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে পদত্যাগপত্র সহি করিতে বাধ্য করেন। পদত্যাগপত্র সহি করিয়া সস্ত্রীক লন্ডনের পথে রওয়ানা হইবার পূর্বকাল পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ কোয়াটা সার্কিট হাউসে ইস্কান্দার মীর্জা কালযাপন করিতে বাধ্য হন।

সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পরই গভর্নর সুলতানুদ্দিন আহমদের স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জাকির হোসেন গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কালাবাগের নওয়াব পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন॥"[১৪৭]

চার

"... In the martial law regime Iskander Mirza retained his position as President while Ayub Khan became the Chief Martial Law Administrator (CMLA). Mirza described the new order as a 'two-man regime which makes policy for the army to carry out.'

But power has its own logic in an authoritarian regime: there can be no two co-equals in it. Sooner or later, sooner rather than later, one of them becomes more 'equal' than the other. With every passing day Ayub Khan, with the backing of the Pakistan Army, began to gain ascendancy in the new regime. Mirza felt that he had to do something soon before he was

---

[১৪৭] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫ ॥ [বিসিবিএস - অক্টোবর, ২০১২। পৃ. ২৪২-২৪৪]

reduced to the status of a ceremonial head of state. The Military Intelligence under the control of General Yahya Khan was keeping a close watch on Mirza and one day they intercepted a telephone conversation between him and Syed Amjad Ali whose son was engaged to be married to Mirza's daughter. Amjad Ali was anxious to fix a date for the wedding. but Mirza suggested that it should be held when the situation was 'normalised.' When Amjad Ali said that it might take some time to normalise things, Mirza replied that he 'would sort Ayub Khan out in a few days.' Alerted by Yahya Khan, it was Ayub who sorted Mirza out. On 27 October, virtually at gunpoint, Mirza was forced to resign. A week later he was put on a plane bound for London, never to return.

On the morrow of Mirza's resignation Ayub Khan concentrated in his person the offices of President, Prime Minister and Chief Martial Law Administrator. Ayub was at last firmly in the saddle.

Having usurped absolute power Ayub Khan set about the task of establishing a new political structure tailored to his requirements. He proceeded to base it on civil-military partnership, for both the military establishment and the civil bureaucracy were tightly knit cohesive elites sharing a disdain of politicians. He saw himself as a benevolent despot destined to modernise the country with a galaxy of reform measures in education, land tenure system, family law that the politicians could not even dream of, much less implement. To make sure that politicians did not create obstacles in the path of his grand designs, he detained a number of them who were likely to be troublesome and tried to keep others in line by threatening to take legal action against them for corruption and abuse of power when they held ministerial positions in the government. The press, with rare exceptions, became a pliant tool in the hands of the Martial Law regime.

Ayub Khan did not want to give the impression that his rule was based only on coercion. As there were no signs of opposition which could pose any significant danger to the Martial Law regime, troops were withdrawn to the barracks within a month and civilians were appointed to aid the Martial Law Administrators. And within a few weeks he found it unnecessary to make much use of military courts— summary (one-man) or special (three-man) — which had been empowered to give stiff sentences not subject to civilian review. He restored to a large degree the independence of the courts."[১৪৮]

পাঁচ

"... পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইউব খানের আমলটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, বুনিয়াদী গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকার, শিল্পায়ন ইত্যাদি মিলিতভাবে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়ক হলো অনেক। আইউব খানের রাজনৈতিক দর্শন থেকে লক্ষ্য করা যায়, ঐতিহ্যবাহী বেসামরিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তার আস্থা কম ছিলো, তিনি পুরোদস্তুর সামরিকতন্ত্রের কিংবা সামরিক এনায়কতন্ত্রের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কেবল দেশবাসীকে, বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেবার জন্যই তিনি বেসামরিক বুর্জোয়া প্রাতিষ্ঠানিকতার পোশাক ধারণ করেন। এ প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে কোনো নতুনত্ব ছিলো তা বলা যাবে না, তবে এখানে সৃষ্ট তথ্যপ্রবাহ নতুন মধ্যবিত্তের নতুন চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক হলো। পূর্বাঞ্চলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গঠনে, রাজনীতি গঠনে আইউব খানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা ছিলো অনেক। উত্তরকালের রাজনীতি বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, তার হাতে একদিকে পাকিস্তানে পুঁজির বিকাশ

[১৪৮] S. A. Karim/Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy \ [UPL - February, 2020| p. 95-96]

হলো, তেমনি প্রকারান্তরে তার ভূমিকা পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বসূত্র হলো। পরবর্তীতে এগুলোরই সম্প্রসারণ ঘটলো এবং ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর হাতে পাকিস্তানের শেষকৃত্যটি অনুষ্ঠিত হলো।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিজস্ব বুনিয়াদ সৃষ্টি করে তোলার জন্যই আইউব খানের হাতে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতার হিসাবে আপাতদৃষ্টে বিষয়টি যতই অনগ্রসর বলে প্রতীয়মান হোক না কেন, পূর্বাঞ্চলে মধ্যবিত্তের অন্তরে রাজনৈতিক চেতনাপ্রবাহ সৃষ্টিতে এগুলোর যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। ইতিপূর্বে স্থানীয় সরকারগুলো জনচিত্তে সরকারের ছায়ারূপ নির্মাণ করেছিলো, এখন রাজনীতির গুরুত্বকেন্দ্রে পুনর্বসিত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলো। পাকিস্তানের জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে তারা তাৎপর্যহীন ছিলো, কেবল ছিঁটেফোঁটা স্থানীয় উন্নয়ন, স্থানীয় সালিসী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ছিলো। বহু ক্ষেত্রে এখনকার নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রজন্ম তাদের উত্তরাধিকারে গঠিত হলো। আইউব খান বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে রাতারাতি নির্বাচকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে তাদের গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলেন, তাদের মধ্যে জাতীয় গুরুত্বের চেতনা, রাজনৈতিক গুরুত্বের চেতনা সৃষ্টি করলেন পূর্বে যাদের মহকুমা কিংবা জেলা পর্যায়েই কোনো ভূমিকা ছিলো না। প্রাদেশিক রাজনীতিতে আসার কোনো স্বপ্ন যারা কখনো দেখেনি, স্বপ্নে রাজাবাদশাহ হবার মতো তারা যখন পাকিস্তান রাজনীতির মধ্যগগনে এলো স্বাভাবিকভাবেই তারা আইউবী অস্তিত্বের খুঁটি হয়ে দাঁড়ালো, আইউব খানের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে, রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে তারা অভিন্ন হলো, একটি নতুন এলিট গ্রুপ গড়ে উঠলো। ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে নগদ মুদ্রা, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সূত্র তাদের মুদ্রা অর্থনীতির গতিশীলতার মধ্যে সরাসরি টেনে আনলো এবং তাদের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব চেতনা সৃষ্টি করে তুললো। এরা প্রকৃতপক্ষে নাগরিক জীবনের আস্বাদ পাবার পর শহরমুখী হলো এবং অবস্থাভেদে অনেকেই থানা, মহকুমা, এমন কি জেলা পর্যায় পর্যন্ত চলে এলো। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অবস্থানে ও চৈতন্যে সকল অর্থেই শহরবাসী হলো, তাদের রক্তে রাজনীতির পশ্চাদভূমি ছিলো এবং স্বাভাবিকভাবেই ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে তারা নগরভিত্তিক রাজনীতির অনিবার্য অংশ হয়ে দাঁড়ালো। আইউব খান মুসলিম লীগের রাজনীতিকেই নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে, বুনিয়াদী গণতন্ত্রের খুঁটি লাগিয়ে পাকিস্তান রাজনীতির নবতর দর্শন গড়ে তোলেন। বুনিয়াদী গণতন্ত্রে উপবীতধারী সকলেই যে কনভেনশন মুসলিম লীগে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে কিছু নকল জিনিসও তিনি বিক্রী করে ছাড়লেন। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচনের পর গণতন্ত্রী নির্বাচকদের তিনি নগদ মূল্যে কিনে নিলেন এবং তাদের সামনে প্লাকার্ড ঝুলিয়ে দিলেন যে, বুনিয়াদী গণতন্ত্র আর আইউব খানের সিংহাসন সমার্থক। সিংহাসনের ভার বহনের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে তুললেন যাতে অনন্তকাল ধরে তারা এই অবস্থানে থেকে যায়। মানুষ গড়ে তোলে, সময় পরিণত হলে সৃষ্টিকর্তা তা আবার ভেঙ্গেও দেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা যে বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন আইউব খান তা হরণ করে বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের মধ্যে স্থাপন করার প্রচেষ্টা করেন। এ সকল দুষ্কর্মে সাফল্যের একটি মাত্রা আছে, দশ বছরের পরও যখন তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না তখন আর সিংহাসন ধরে রাখতে পারলেন না। কেবল তাই নয়, পাকিস্তান ভেঙে দেবার বীজও তিনি স্বহস্তে রোপণ করে রেখে দিলেন।

আইউব আমলে ষাটের দশকে সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে ধনতান্ত্রিক নতুন পুঁজির একটি বিকাশ ঘটলো। নানা কারণেই বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে স্থবিরতা ছিলো, দাতাদেশগুলো আউইব খানের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে পুঁজির অধিকতর বিকাশের জন্য, পুঁজি বিকাশের অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য প্রচুর অর্থ অনুদান, ঋণ ইত্যাদি প্রদান করলো, এ সকল অর্থ ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, টেকনোক্রাসির বহর গড়ে উঠলো, এগুলোর মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগের একটি ভালো ফীডব্যাকও সৃষ্টি হলো। নিস্তরঙ্গ গ্রাম জীবনে এ সবের স্পর্শ লাগেনি তা নয়, তবে এ আমলে প্রধানত শহরেই পুঁজি বিনিয়োগের, পুঁজি বিকাশের মেদটুকু গিয়ে জমা হলো। ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যেকার

পরিসংখ্যানের ফাঁকিটুকু যখন শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিকট এসে তথ্য আকারে ধরা পড়লো তখন রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম হলো এই শহর থেকেই এবং লক্ষণীয় হলো এ অস্থিরতা জন্ম নিলো তাদের মধ্য থেকে যারা আইউবী আমলের রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ছিলো, যারা আইউবী আমলেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো।

একদিক দিয়ে আইউবী রাজনৈতিক তত্ত্ব নতুন নগরচেতনা সৃষ্টি করলো। নগরকে যদি এখন সভ্যতার মাপকাঠি ধরা যায় তাহলে আইউবী আমল পাকিস্তানের একটি স্বর্ণযুগ ছিলো, কথাটি যদিও পূর্বাঞ্চলের জন্য সঠিকভাবে প্রযোজ্য ছিলো না। আবার অন্য দিকে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উচ্চাভিলাসই চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করলো যা আইউব খানকে ধূলিধূসরিত পথে নামিয়ে দিলো, যা পরিণামে পূর্বাঞ্চল থেকে পাকিস্তানকেই মুছে দিলো। সুতরাং পূর্বাঞ্চলে আইউবী আমলে রাজনৈতিক অসন্তোষের প্রধান কারণ ছিলো পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে তুলনীয় পরিসংখ্যান এবং এ সকল তথ্যের আলোকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উচ্চাভিলাস। প্রক্রিয়াটি এমনই ছিলো যে, আর্থিক ও রাজনৈতিক পুঁজি বিনিয়োগ নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সৃষ্টি করলো, আর্থিক ও রাজনৈতিক পুঁজির নিকটে অবস্থান করে এ মধ্যবিত্তই বিপুল উচ্চাভিলাসী হলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিংবা উচ্চাভিলাস অধিকতর অসন্তোষের সৃষ্টি করলো ও রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিবার্য করলো। বৃত্তাকারে এ সকল উপলব্ধি নতুন নতুন চাহিদার জন্ম দিলো, রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার নতুন নতুন সমস্যা চিহ্নিত করলো এবং সম্মিলিতভাবে এগুলো পূর্বাঞ্চলের পূর্বাকাশে মেঘমালা অপসৃত করে নতুন সূর্যের সম্ভাবনাকে নিকটতর ও অনিবার্য করে তুললো॥"[১৪৯]

ছয়

"... মুসলিম লীগ ছাড়া বাকী দলগুলোর যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বিরাট জয়লাভ করল বটে, কিন্তু সে-জয়কে তারা সার্থকভাবে দেশের কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারল না। কারণ পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তাদের যুক্তফ্রন্ট অতি অল্পদিনেই ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। ফলে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে যেনো একটা ভোজবাজীর খেলা শুরু হয়ে গেল। চার বৎসর ধরে চলল এই খেলা–শুধু প্রাদেশিক পরিষদে নয়, কেন্দ্রীয় পরিষদেও। ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। ফলে খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভার বিলোপ ঘটল। কেন্দ্রীয় পরিষদে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি পার্লামেন্টারী দল হঠাৎ গজিয়ে উঠল সীমান্ত নেতা ডঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে। ডঃ খান সাহেব ছিলেন পাকিস্তান-আন্দোলনের বিরোধী একজন কংগ্রেসী। সিংহগর্জনে যিনি একদিন বিভাগপূর্বকালে লীগের 'ডিরেক্ট একশন' প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, সেই মালীক ফিরোজ খান নুনকে যখন দেখা গেল লীগের ভোল পাল্টে রিপাবলিক পার্টিতে যোগ দিতে, প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম বই কি! কিন্তু পার্লামেন্টারী রাজনীতির সে অরাজকতার দিনে অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। শুধু মালীক ফিরোজ খান নুন নন, পশ্চিম পাকিস্তানের আরো অনেক লীগনেতাই সেদিন রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিয়ে সুবিধাবাদিতার চূড়ান্ত নজির স্থাপন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে সম্ভবত ১৯৫৬ সালের শেষভাগে, গবর্নর-জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং জনাব ইস্কান্দার মীর্জা অস্থায়ী গবর্নরজেনারেল হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পাকিস্তানের নয়া গণপরিষদ এ-সময়ে পাকিস্তানের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তা পাস করে নিল। এই শাসনতন্ত্রের বিধানানুসারে পাকিস্তান 'রিপাবলিক' বলে ঘোষিত হল এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন জনাব ইস্কান্দার মীর্জা। কিন্তু কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহের শাসনব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ও গদি নিয়ে কাড়াকাড়ির লীলা-খেলা চলতেই থাকল। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের

---

[১৪৯] বদিউজ্জামান/মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনীতি ॥ [ইউপিএল - ১৯৯৭। পৃ. ৩৫-৩৭]

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খাঁ এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টি-প্রধান জনাব আবু হুসেন সরকারের মধ্যে কয়েকবার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার গদির অদল-বদল হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা উপর থেকে এমনভাবে কলকাঠি ঘোরাতে লাগলেন যার ফলে কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূহে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা লেগেই রইল। এটা দেশের উন্নয়নব্যবস্থার পক্ষে হয়ে উঠল মারাত্মক। কারণ রাজনৈতিক অশান্ত পরিস্থিতিতে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী রাজনীতিক্ষেত্রে এই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এমন উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করল যে, দেশের রাজনীতিমনা ব্যক্তিদের পক্ষে তা হয়ে উঠল একেবারে শ্বাসরোধকর। এটা চরমে উঠল, যখন পূর্ব পাকিস্তান আইনপরিষদের অভ্যন্তরে ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী নিহত হলেন। এর কয়েকদিন পরেই সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হল এবং ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হলেন। এটা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের কথা।

সামরিক আইনের প্রবর্তন গণতন্ত্রমনা কোনো জাতিই পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানে গণতন্ত্র যেরূপ চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির স্তরে পৌঁছেছিল, তাতে জনসাধারণ যে এই অবাঞ্ছিত সামরিক শাসনকেও সাময়িকভাবে অভিনন্দিত করেছিল, সত্যের অনুরোধে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির প্রতীক জনাব ইস্কান্দার মীর্জা তখনো রাষ্ট্রীয়-প্রধান হিসেবে বিরাজ করছিলেন-এ-সত্যের প্রতি সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ বেশীদিন উপেক্ষাশীল থাকতে পারলেন না। তাই কুড়ি দিন পরে, ২৯শে অক্টোবর তারিখে, প্রেসিডেন্টের আসন থেকে মীর্জা সাহেবকেও অপসারিত করা হ'ল। মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের পদেও অভিষিক্ত হলেন।

এর ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাজনীতিমনা জনসাধারণের বেশীর ভাগ এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে মুক্তির শ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত রাজনীতিকদের একাংশে বিক্ষোভ জেগে রইল–যদিও প্রকাশের ভাষাহীন হয়ে। ফলে শান্ত ও সুশৃঙ্খল পরস্থিতিতে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ অবাধে দেশের উন্নয়নের কাজে হাত দিতে শুরু করলেন। বিভিন্ন দিকের উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমি-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হল–যা পার্লামেন্টারী আমলে সম্ভব হয়ে উঠে নাই। তাছাড়া, যে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা ছিল এতদিন সকলের কৃপার পাত্র, পূর্ববর্তী শাসন-কর্তৃপক্ষসমূহ যাদের অবস্থা সম্পর্কে ভেবে দেখবারও কখনো অবসর করে উঠতে পারেন নাই, সামরিক শাসন-কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সাংবাদিকদের জন্য ওয়েজবোর্ড এওয়ার্ডের ব্যবস্থা হল, আর সাহিত্যিকদের জন্য হল বাৎসরিকভাবে শ্রেষ্ঠ বইকে পুরস্কার দানের ব্যবস্থা। এর ফলে, পার্লামেন্টারী আমলে যে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ছিল না, তারা বেশকিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

সামরিক শাসন-কর্তৃপক্ষ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করেই ক্ষান্ত হলেন না, পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপও বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন। ফলে মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, রিপাবলিকান দল, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে ইসলামী, গনতন্ত্রী দল প্রভৃতি সব দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। দেশের অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি জনমনকে এতটা ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলেছিল যে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপের অবসান সে সময়ে তাদের কাছে পরম কাম্য বলেই মনে হয়েছিল। এমনকি, দুর্নীতিদমনে তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তা-ও তাদের বেশীর ভাগ লোকেরই সমর্থন লাভ করেছিল।

ব্যাঙের ছাতার মতো অনবরত রাজনীতিক্ষেত্রে দলের পর দল গজিয়ে ওঠার ফলে ক্রমবর্ধমান মতবিভেদের প্রসারই যে দেশে এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ডেকে এনেছিল, সে-সময়ে অনেকের মুখে এমন অভিযোগ শোনা গেছে।

চট্টগ্রামের জনৈক নেতৃস্থানীয় লীগ-কর্মীর সাথে একদিন দেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সামরিক আইন জারি হওয়ায় তিনি ভীষণ চটে গিয়েছিলেন এবং মুসলিম লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় তাঁর ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল। তিনি জানালেন : কেন এ সামরিক আইন, আর কেনই বা রাজনৈতিক দলগুলোকে বেআইনী করার বদখেয়াল? আওয়ামী লীগ প্রভৃতি দলগুলো যেরূপ আন-পপুলার হয়ে পড়েছে তাতে আগামী নির্বাচনে আর তাদের আসতে হত না। তাই এভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি বললাম : সামরিক আইন জারি না করে যদি সাধারণ নির্বাচন দেয়া হত তাহলে 'আন-পপুলার' আওয়ামী লীগ প্রভৃতি দলের প্রার্থীরা যে মোটেই জয়ী হতে পারত না, এ সম্পর্কে আপনার মত আমি অতটা নিশ্চিত নই। কারণ যে-ভাবে ব্যালটবক্স ভাঙ্গা হচ্ছে দেখা গেছে, তাতে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোনো কারণই নাই বলে আমার ধারণা। তাছাড়া বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি যেরূপ চরমে উঠেছে, তাতে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারত বলে আমার বিশ্বাস নেই। কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু ছিল না। তেমন অবস্থায় সামরিক আইন জারি করা ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকত না। কাজেই যেটা পরে হত তা দু'দিন আগে হওয়ায় এমন কি দোষের হয়েছে? বরং লাভ হয়েছে এই যে, নিরীহ ভোটারদের রক্তক্ষয় হতে দেয়া হল না।

লীগকর্মী বললেন : আমি আপনার এ-যুক্তি মানতে পারলাম না। নির্বাচন এলাকায় নিযুক্ত পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতিতে ব্যালট-বাক্স ভাঙ্গা এবং রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটার সম্ভাব্যতা আমি স্বীকার করি না।

আমি বললাম : স্বীকার করেন না কারণ আপনি জানেন না, সরকারি কর্মচারী ও পুলিশদের মধ্যেও দুর্নীতি কতটা চরমে পৌঁছে গেছে।

: বেশ, তর্কের খাতিরে আপনার কথা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু তাই বলে গণতন্ত্রের হত্যা তো কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। মনে রাখবেন, এটা গণতন্ত্রের যুগ। এ যুগের মানুষ কি করে এটা সমর্থন করতে পারে? বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও তো উত্তেজনা ও অশান্তির ভিতর দিয়েই মানুষ গণতন্ত্রমনা হয়ে উঠছে দেখতে পাই। এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়েই বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, এ সত্য নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না আশা করি।

: স্বীকার-অস্বীকার আমি কিছুই করছি না। আমি মনে করি, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষারও একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে। সে-সীমা লঙ্ঘন করলে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অচল হতে বাধ্য। সেখানে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হবেই। গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলেই সেখানে মার্শাল-ল' জারির অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

লীগকর্মী বললেন : গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে তার স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করেছে এ কথা কি করে বলেন? অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে কি পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে এই শ্রেণীর গোলমাল হয় না।

আমি বললাম : গোলমাল নিশ্চয়ই হয়–এমন কি, ছোটখাটো মারামারি, চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি হয় বই কি। কিন্তু একেবারে আইনসভার ভিতরে ডেপুটি স্পীকারকে হত্যা করার মতো ব্যাপার হতে বড় দেখা যায় না। এটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা! তাছাড়া সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি এমন চরমে পৌঁছেছে যে, তাতে জনজীবন গতির প্রবহমানতা স্তব্ধ হয়ে পড়ার মতো অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অবাঞ্ছিত হলেও এর অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

: কিন্তু তবু গণতন্ত্রের হত্যা আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছিনা। যা এসছে তাকে গণতন্ত্রের চাইতে ভালো আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না?

আমি বললাম : নিশ্চয়ই না। আমি আগেই এটাকে অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা বলেই অভিহিত করেছি। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক কসরত এমন নিম্নস্তরে পৌঁছেছিল, আর তা জনসাধারণের চিত্তে এমন বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যে তারা এই চরম অবাঞ্ছিত ব্যবস্থাকেও অভিনন্দন জানিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে।

: তবু গণতন্ত্রই হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির আদর্শ এবং এ আদর্শকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারছি না–এ কথা নিশ্চয়ই আপনি মানেন?

আমি বললাম : দেখুন, গণতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির একটা Phase (ফেজ) মাত্র–আদর্শ নয়। জনসাধারণের–সর্ব-মানবের কল্যাণই হচ্ছে আদর্শ। গণতন্ত্র মানুষের কল্যাণ না করেছে এমন নয়। এর আগে যে-সব রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তিত ছিল তাদের দ্বারাও মানুষের কল্যাণ কিছু না হয়েছে, এ কথা বলতে পারা যায় না। আগে রাজতন্ত্র ছিল। কোনো কোনো রাজা মানুষের কল্যাণ-চেষ্টায় আত্মনিয়োগ না করেছেন এমন নয়। কিন্তু যখন দেখা গেল, তাদের স্বৈরাচার সাধারণভাবে জনকল্যাণকে ব্যাহত করেছে, তখনই এলো তার বিলোপের দিন। বর্তমানে রাজতন্ত্র সর্বত্র ধিকৃত। তার স্থান গ্রহণ করেছে গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রও কি আর তার সে-মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছে? আমার মনে হয়, ক্যাপিট্যালিস্টিক গণতন্ত্রের যুগও শেষ হয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র। এ গণতন্ত্র কি বর্তমানে সারা বিশ্বের ধিক্কার লাভ করছে না? আসলে রাজতন্ত্র হচ্ছে মাত্র এক ব্যক্তির শাসন–তার স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বলে তার শাসন সাধারণত জনকল্যাণপ্রসূ নয়। আর গণতন্ত্র? এক ব্যক্তির শাসন নয়। নিশ্চয়ই, কিন্তু বর্তমানে তা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির শাসনেই পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই এটারও সর্বাংশে জনকল্যাণপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে রাজনীতিমনা অধিকাংশ ব্যক্তি গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এবং তাকেই রাষ্ট্রনীতির চরম আদর্শ বলে মনে করেছে। কিন্তু আমি জানি এটাও ভাবীকালে, হয়ত বা সুদূর ভবিষ্যতে, জনকল্যাণকামিতা হারিয়ে ফেলে নতুন আর একটি রাষ্ট্রনীতিকে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

লীগকর্মী বললেন : যাকগে, গণতন্ত্র নিয়ে আর নয়। আচ্ছা, রাজনৈতিক দলগুলোকে যে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে, এটা কি আপনি সমর্থন করেন? দলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এতে আতঙ্কিত হওয়ার কি আছে বুঝি না। দেশের জনসাধারণ ক্রমে রাজনীতিমনা হচ্ছে এটা তো তারই লক্ষণ।

আমি বললাম : দেশের রাজনৈতিক দলের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশবাসীর অধিকতর রাজনীতি সচেতনতার লক্ষণ কিনা, তা সঠিকভাবে বলতে পারছি না। তবে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে দল-সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে গণতান্ত্রিক দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার গতি শ্লথ হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় বলেই আমার ধারণা। যেমন আমাদের দেশে হয়েছে। এমনকি, ফ্রান্সের মতো শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সুউন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও আমরা কি দেখতে পেয়েছি? ভিন্নমতাবলম্বী বেশীসংখ্যক দলের অবস্থিতির ফলে ফ্রান্সে অল্পদিনস্থায়ী মন্ত্রিসভাগঠনের হিড়িক এবং তাতে করে দেশের উন্নয়নকার্য বিলম্বিত হওয়ার নজীর একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। অবশেষে সেখানে এর প্রতিকারকল্পে জেনারেল দ্য গলের মতো ব্যক্তিত্বশালী মহানেতাকে পর্যন্ত দেশের শাসনতন্ত্র সংশোধনে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। ফ্রান্সের মতো সুপ্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশেও যা ক্ষতিকর বিবেচিত হয়েছে, পাকিস্তানের মতো নয়া শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে তা মঙ্গলকর হবে এ ধারণা হাস্যাস্পদ॥"[১৫০]

---

১৫০ আবুল কালাম শামসুদ্দীন/অতীত দিনের স্মৃতি ॥ [খোশরোজ পাবলিকেশনস লি: - জুন, ২০০১। পৃ. ২৬৫-২৬৯]

সাত

আইয়ুব খান এবং তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজ

০১.

'পাকিস্তানী জনসাধারণের জন্য উন্নততর অধিকতর সুখী ও আনন্দদায়ক এবং পূর্ণতা ও অধিকতর সৃজনশীল ও সুনির্দিষ্ট জীবন অর্জন করা'র ঘোষণা সামনে নিয়ে ১৯৫৯ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী করাচীর গোয়ানিজ হলে (গোয়ান এসোসিয়েশন হল) সমস্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব বিশিষ্ট উর্দু-ছোটগল্পকার কুদরতুল্লাহ শাহাব ও আরও কয়েকজন উর্দু লেখকের উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনেই পাকিস্তান লেখক সংঘ বা Pakistan Writers' Guild গঠিত হয়। করাচীর এই লেখক-সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান লেখক সম্মেলন বা Pakistan Writers' Convention। এই সম্মেলনের কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি ছিলেন শহীদ আহমদ দেহলভী। সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাঁর পক্ষে ঢাকার লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের কেন্দ্র ও সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। তখনকার বিধি অনুযায়ী পরিচালকই ছিলেন বাংলা একাডেমীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সম্মেলনে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ থেকে আড়াই শ' লেখক যোগদান করেন। তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৫০ জন লেখক আমন্ত্রিত হন।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, খানবাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, বেগম শামসুননাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৫৯), অধ্যাপক নুরুল মোমন (জ. ১৯০৮), কবি মঈনুদ্দীন, জনাব মতিনউদ্দীন আহমদ, কবি আবদুল কাদির, কবি বেনজির আহমদ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মুতী (জ. ১৯৩০), মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক শওকত ওসমান (জ. ১৯১৭), কবি মতিউল ইসলাম (জ. ১৯১৮), কবি মোফাখখারুল ইসলাম (জ. ১৯২১), কবি কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩), ডঃ এনামুল হক (জ. ১৯৩৭), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, কবি আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক নাজিরুর ইসলাম সুফিয়ান (১৯০৬-১৯৮২), শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ। সম্মেলনের খরচ বাবদ বাংলা একাডেমী, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিটি ফান্ড ও লাহোর-করাচীর কয়েকজন ব্যবসায়ী প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা দান করেন। মঈনুদ্দীন লিখেছেন, 'আলাপ-আলোচনার পর কয়েকজন এই সম্মেলনে যোগদান থেকে বিরত থাকে।' (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ-১৩৬৬)

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ২৯ জানুয়ারী ১৯৫৯, সকাল সাড়ে দশটায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হওয়ার আগে সম্মেলন প্রতিনিধিরা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র মাজার জেয়ারত করেন। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবকপ্রদান অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল।

করাচীর গোয়ান এসোসিয়েশন হলে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কোরান পাঠ করেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান। করাচীর অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ সায়ীদ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। কনভেনশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি শহীদ আহমদ দেহলভী পাঠ করেন সম্মেলনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত রিপোর্ট। এই রিপোর্ট থেকেই সম্মেলনের সূত্রপাত কী করে হয় তা জানা যায়। প্রথমে করাচীর আটজন লেখকের এক সমাবেশে স্থির হয়, পাকিস্তানের সকল ভাষার লেখকদের একটি বড় আকারের সম্মেলন আহবান করা হবে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের ৪ তারিখে তাঁরা মিলিতভাবে একটি যুক্ত-বিবৃতি প্রচার করেন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ওই বিবৃতির সূত্র ধরে করাচী লেখক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

সম্মেলনের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)।

প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সহজেই কমিটি গঠন করতে যেন গোলযোগের বা অযথা জটিলতার সৃষ্টি না হয়, এজন্য বিকালে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করবেন ১১ জন। এরা হলেন : অধ্যক্ষ ইবরাহিম খা, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদদীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১), বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৬-৬৪) আবুল হোসেন, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও মুহম্মদ আবদুল হাই।

এ ছাড়াও স্টিয়ারিং কমিটিতে ছিলেন ১১ জন উর্দু লেখক এবং পশতু সিন্ধী ও পাঞ্জাবী লেখক ১ জন করে। ৩০ জানুয়ারী, ১৯৫৯ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সভায় সভানেত্রীত্ব করেন মিসেস রোজী হুসাইন। তাতে স্টিয়ারিং কমিটির রেজিলিউশন পেশ করা হয়। বাদ-প্রতিবাদের পর তা উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনুমোদন লাভ করে।

করাচীর পাকিস্তান লেখক সম্মেলন ও পাকিস্তান সাহিত্য সংঘ গঠনের কাজ সম্পন্ন হয় সম্মেলনের এই অনুষ্ঠানে।

এই দিন সকালের অধিবেশনেই গঠিত হয় পাকিস্তান লেখক সংঘ বা Pakistan Writers' Guild, সম্মেলনের এই অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন বাঙালী মহিলা মিসেস মোহাম্মদ হোসেন। তাতে ২৫ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ১১ জন বাংলা লেখক, ১১ জন উর্দু লেখক এবং সিন্ধী পশতু ও পাঞ্জাবী লেখক একজন করে। আর সর্বসম্মতিক্রমে গিল্ডের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন জনাব কুদরতুল্লাহ শাহাব। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও করাচী, লাহোর ও ঢাকায় গঠিত হবে তিনটি আঞ্চলিক সমিতি। পাকিস্তানের যেকোন লেখককে আঞ্চলিক সমিতি গিল্ডের সদস্যভুক্ত করে নিতে পারবে। আঞ্চলিক সমিতিগুলিতে সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া সদস্য থাকবেন ১১ জন করে।

সমাপ্তি অধিবেশনের বিকালের বৈঠক বসে চারটায়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাবায়ে উর্দু মৌলবী (ডাঃ) আবদুল হক। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এই অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন : 'The writers of Pakistan who were full of a fighting and creative spirit could make tremendous contribution towards the solidarity of Pakistan. তিনি বলেন : By directing the people through the channels of the spirit of Islam the writers could help them in living a fuller assertive and a better life. '

তার আগে সম্মেলনে 'লেখক ও লেখকের স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন কুদরতুল্লাহ শাহাব, 'আমাদের তামদ্দুনিক সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মমতাজ হোসেন, 'লেখকের দায়িত্ব ও সংগঠন' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ডাঃ আবদুল হক, আবু রুশদ পড়েন 'আজাদী-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানের সৃজনধর্মী রচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, 'লেখকের জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন ডঃ জাবিদ ইকবাল (আল্লামা ইকবালের পূত্র) ও ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন।

পাকিস্তান লেখক সংঘের সুনির্দিষ্ট কোন ঘোষণাপত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখক সংঘের সদস্যদের শপথপত্রকেই তাদের ঘোষণাপত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সেই শপথপত্র ছিল নিম্নরূপ:

'দেশের প্রচলিত সকল ভাষার প্রতিনিধি আমরা পাকিস্তানের লেখকগণ আমাদের মাতৃভূতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, মর্যাদা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মানব জাতির বিকাশের কার্যে আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করছি। জাতি সংঘ রচিত মানবাধিকারের সনদে আমরা বিশ্বাসী। লেখক হিসাবে স্বাধীনভাবে মতামত জ্ঞাপন ও প্রচারের অধিকার আমাদের একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর, কারণ এ অধিকারের অভাবে সৃষ্টিধর্মী রচনা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। সত্যের যথাযথ রূপায়ণ, দেশাত্মবোধের অনুশীলন, আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে

উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করার মহান কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ, কারণ মানব জাতির মর্যাদা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নততর সম্পর্কের উপরই নির্ভরশীল। লেখক হিসাবে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এমন একটি সুখী ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করছি যেখানে সকলের জন্য অবাধে সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে এবং যার ফলে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা, মানবিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিকাশের সহায়ক হবে। কাজেই আমরা বিজ্ঞানের উন্নতিকে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির উপায় বলে বিশ্বাস করি।'

এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আনুকূল্যে লেখক সংঘ বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়॥"[১৫১]

০২.

"... আইয়ুব ক্ষমতা দখল করে অনেকগুলো ভালো সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেন। তার প্রথমটি যদিও কবি-সাহিত্যিকদের জন্য। সংগীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি সব পেশার মানুষের জন্যও সংস্কারের কাজ শুরু করেন। যেমন শিল্পসচিব আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ১২ সদস্যবিশিষ্ট 'বিজ্ঞান কমিশন' ১৯৫৯-এর শুরুতেই। 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন বা জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা'র পরিচালক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এফ আর খান। গঠিত হয় কুদরতুল্লাহ শাহাবের নেতৃত্বে 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড বা পাকিস্তান লেখক সংঘ'। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা নামটি চমৎকার, কিন্তু কী উদ্দেশ্যে সেটি গঠিত তা প্রথমে বোঝা যায়নি।

৩১ জানুয়ারি '৫৯, পাকিস্তানের দুই অংশের খ্যাতিমান লেখকদের এক সম্মেলনে আইয়ুব বলেন :

'পাকিস্তানের লেখকগণের মধ্যে সংগ্রাম করার শক্তি এবং সৃজন করার যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে। তারা পাকিস্তানের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং পাকিস্তানের সংহতির জন্য অভাবনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম।'

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্যে থাকবে পাকিস্তানের আদর্শের রূপায়ণ।' কিন্তু সেই আদর্শ কী? সে প্রশ্নের জবাবও তিনিই দেন :

'পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য অধিকতর সুখী, আরামদায়ক, উন্নত, আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল জীবনব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণই পাকিস্তানের আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে লেখকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।'

শুধু এটুকু নয়, তিনি আরেকটু খোলাসা করে বলেন:

'আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের নীতিগুলোকে আধুনিক মানের উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করা, কারণ আধুনিক ভাষাই হচ্ছে যথার্থ শক্তির ভাষা। এ ভাষা অবশ্যই বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও চলতি ঘটনাবলি প্রকাশের ভাষা হওয়া উচিত; কারণ দুনিয়া ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, আর এখানে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

আইয়ুব খান জাতীয় সংহতি, জাতীয় পুনর্গঠন ও পাকিস্তানি জাতীয় চরিত্র গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং সে কাজে তিনি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা চান এবং তা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পানও। ক্ষমতা দখলের ছয় মাসের মধ্যে জেনারেল আইয়ুব গঠন করেন 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন বা জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা'। ২৩ মার্চ ১৯৫৯, প্রেসিডেন্ট এক বেতার ভাষণে বলেন :

---

[১৫১] ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী / পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১) ॥ [জ্ঞান বিতরণী - মার্চ, ২০০২ । পৃ: ১১২-১১৭]

'আমাদের সম্মুখে জাতীয় পুনর্গঠন ও ব্যক্তিগত চরিত্র পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব রয়েছে এবং কেবল স্ব-স্ব কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেই আমরা তা পালন করতে পারি।'

আমাদের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের 'চরিত্র পরিশুদ্ধ' করার তাগিদ আসে অবাঙালি সামরিক শাসকের কাছ থেকে। দেশের বুদ্ধিজীবীগণের দায়িত্ব সম্পর্কে আইয়ুব খান বলেন, 'চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোক হিসেবে আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি নির্ধারণ ও তার সঠিক সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে তাঁরা খাটি স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেবেন; জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করার এই-ই তাঁদের পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা।'

আমাদের খ্যাতিমান লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা সেদিন বাস্তবিকই 'খাঁটি স্বদেশপ্রেমের' পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেরা খাঁটি স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিতে না পারায় নাজিমুদ্দীন রোডের উচু পাঁচিলঘেরা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা ও পাকিস্তান লেখক সংঘের মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক, এই দুই সংস্থা বেশ কিছু ইতিবাচক কাজও করেছিল, তাতে আমাদের লেখকসমাজ উপকৃত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলেন সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদীরা।

১৯৫৯-এর ৪-৫ জুলাই লাহোরে পাকিস্তান লেখক সংঘের কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান লেখকদের অনেকেই তাতে যোগ দেন। অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার মধ্যে একটি ছিল 'সংঘের তরফ থেকে একটি প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা'। এই সিদ্ধান্তে বাঙালি লেখকেরা খুবই উৎফুল্ল হন। তখন ঢাকায় প্রকাশনা শিল্পের শৈশব অবস্থা। সাহিত্যের বইপত্রের প্রকাশক পাওয়া ছিল খুবই কঠিন।

সংঘের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, 'সংঘের সদস্যদের জন্য একটি বিশেষ সুবিধাজনক জীবন-বীমা পলিসির বন্দোবস্ত করা।' এ সম্পর্কে আমাদের লেখকদের মন্তব্য ছিল, 'এসব সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক'। কারণ, বাঙালি লেখকদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা ছিল খারাপ। অকালে মারা গেলে পরিবার-পরিজন অসহায় হয়ে পড়ত। লেখকদের সুবিধাজনক জীবন-বীমা থাকলে তাদের মৃত্যুর পর পরিবার কিছুটা উপকৃত হতে পারত।

লেখক সংঘের বই প্রকাশের সংবাদে লেখকদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মাহে নও মন্তব্য করেছিল, 'দেশের সকল স্থানের সকল শ্রেণির সৃষ্টিধর্মী লেখকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের উদ্যোগে তাদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশনের যে ব্যবস্থা করছেন, তার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে বাধ্য।'

প্রকাশনা শুরু করার জন্য লেখক সংঘকে একটি তহবিলও করে দেওয়া হয়। পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গিল্ডকে বিনা সুদে এক লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর' করা হয়েছে। 'এই অর্থ দ্বারা গিল্ডের নিজস্ব প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠার মৌলিক পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।' ইতিমধ্যে বলতে ১৯৫৮-র এপ্রিলের মধ্যে।

পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার এক বছর উপলক্ষে এক নিবন্ধে 'মাহে নও' লিখেছিল:

'১৯৫৮ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত গোটা জাতিই এই ব্যাপক নৈরাশ্য আর হতাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, জাতীয় জীবন ও চিন্তাধারার রূপকার ও শিল্পী হিসেবে লেখকগণ হয়ে পড়েছিলেন দিশেহারা।' [মাহে নও, জানুয়ারি ১৯৬০]

এই বক্তব্যটি বস্তুত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সামরিক সরকারের। সামারক শাসনের আগে পাকিস্তানের তথা বাংলার লেখক-শিল্পীরা 'হতাশার অন্ধকারে ডুবে' 'গিয়েছিলেন এবং তাঁরা হয়েছিলেন 'দিশেহারা', তেমন কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। তবে বিভেদ, হিংসা-প্রতিহিংসা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে রাজনীতি খুব খারাপ অবস্থায় গিয়ে পড়েছিল। তাতে মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দেওয়াও স্বাভাবিক।

সরকার-সমর্থক লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বলেন, লেখক সংঘ বা রাইটার্স গিল্ডকে একটি অভিনব ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অভিনব বললাম এই কারণে যে, ট্রেড ইউনিয়নকে যেমন শ্রমিকদের তরফ থেকে মালিকদের কাছে বা সরকারের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করতে হয় এবং সে জন্য হয়তো আন্দোলন করতে হয়, রাইটার্স গিল্ডের বেলায় সে কথাটা একেবারেই খাটে না। কারণ, বর্তমান বিপ্লবী সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার মধ্য দিয়েই এর গোড়াপত্তন হয়েছে। বস্তুত, রাইটার্স গিল্ডের প্রতিষ্ঠা বিপ্লবী সরকারের বহুমুখী প্রগতিশীল কর্মসূচির একটি গৌরবময় অধ্যায় বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

'রাইটার্স গিল্ড প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটাই মূলত একটি বিপ্লবী চিন্তাধারার পরিচায়ক। শুধু এশিয়া ও আফ্রিকাতেই নয়, পৃথিবীর কোনো দেশেই এর নজির বড় একটা চোখে পড়ে না।' [মাহে নও]

লেখকদের জন্য জীবন-বীমা ব্যবস্থা করা ছিল একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যদিও সে উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতায় ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৫৯-এর জুলাইতেই লাহোরে লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়েছিল :

'লেখক সংঘের তরফ থেকে প্রত্যেক সদস্যের জন্য ৫০০০ টাকার একটি জীবন-বীমার পলিসির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পলিসির জন্য লেখক-সদস্যদের মাসিক মাত্র ৫ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে।' তবে সেকালে এমন লেখকই ছিলেন বেশি, যিনি ৫ টাকা প্রিমিয়াম দিলে ১০ দিন বাজার করতে পারতেন না।

১৯৬২-র ৩১ জানুয়ারি লেখক সংঘের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব হয় করাচিতে। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিদলে গিয়েছিলেন পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক মুনীর চৌধুরী, লেখক সংঘ পত্রিকার দুজন সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলামসহ অনেকেই। সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব উপস্থিত থাকতে পারেননি অনিবার্য কারণে।

তিনি লেখকদের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন একটি বাণী। সেই বাণী পাঠ করে শোনান মুনীর চৌধুরী। লেখকদের 'আন্তরিক শুভেচ্ছা' জানিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেছিলেন :

'... পাকিস্তান লেখক সংঘের প্রতি অতীতে প্রেরিত আমার বিভিন্ন বাণী, আপনাদের পেশা, কার্যধারা, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে : সর্বোপরি চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতায় আমার সক্রিয় সহযোগিতা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার গভীর উৎসাহের পরিচয়।

পাকিস্তানের সামনে আজ একটি বড় সমস্যা হলো পাকিস্তানের আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করা। আমি জানি না সবাই এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কি না। এই কর্মে আপনাদের দায়িত্ব সর্বাধিক, কারণ লেখক তার পরিবেশের বাহ্যিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিগন্তের যথার্থ রূপায়ণে ও প্রতিফলনের মাধ্যমে এই ঐক্যকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পারেন।

আমাদের সামনে যেসব সামাজিক সমস্যা রয়েছে, তার মূল উচ্ছেদ কেবল আইনের সাহায্যেই করা সম্ভব নয়, সামাজিক দুর্নীতির ব্যাপক উচ্ছেদ আপনাদেরই দায়িত্ব।

আমাদের উত্তরসূরিরা যেন কখনো বলতে না পারেন যে আমাদের সামনে একটি স্বাধীন ও মহৎ জাতি গঠন করার যে সুবর্ণ সুযোগ ছিল, তা আমরা নষ্ট করেছি। ইতিহাসের পথনির্দেশে আপনাদের লেখনী

অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। আমার আবেদন, আপনাদের লেখনী সর্বপ্রথম দেশের জন্য ব্যবহার করুন, যে ব্যবহার আপনারাই আমার চেয়ে ভালো জানেন। আপনারা সর্বদা আমার পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করবেন।'

বাঙালি লেখকদের প্রভাবশালী অংশ আইয়ুবের দেওয়া কোনো সুযোগই নষ্ট হতে দেননি। এবং লাভ করেছেন তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা ও পেয়েছেন তাঁর আনুকূল্য। ওদিকে প্রগতিশীল ও স্বায়ত্তশাসনকামী রাজনীতিকদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল কারাগারগুলো।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মোহাম্মদ আইয়ুব খান যে উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান লেখক সংঘ এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা বা বিএনআর প্রতিষ্ঠা করুন না কেন পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের জন্য তা ছিল আশীর্বাদের মতো। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার সাহিত্যে বহু আধুনিক চেতনাসম্পন্ন কবিসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাঁদের রচনা প্রকাশের জায়গার ছিল অভাব। পুরোনো দুটি বিখ্যাত সাময়িকী — 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। 'মাহে নও' ছিল সরকারি সাময়িকী। সিকান্দার আবু জাফর প্রকাশ করেন 'সমকাল' - আধুনিকতাবাদীদের মুখপত্র। সেটা বছরে বের হতো তিন-চার সংখ্যা। সব কবিসাহিত্যিককে ধারণ করার ক্ষমতা 'সমকাল'-এর ছিল না। আরও দু-একটি সাহিত্যপত্র বের হচ্ছিল অতি অনিয়মিত। মানসম্মত সাহিত্যের প্রসার ঘটাতে মানসম্মত ও রুচিসম্মত সাহিত্য সাময়িকীর প্রয়োজন। সেই রকম নিয়মিত সাহিত্যপত্র পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ছিল না।

সেই অভাব পূরণে পাকিস্তান লেখক সংঘের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে লেখক সংঘ সাহিত্য সাময়িকী ও বই প্রকাশ শুরু করে। 'লেখক সংঘ পত্রিকা' নামে কবি গোলাম মোস্তফার সম্পাদনায় সংগঠনের সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়। তা সম্ভবত একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। তারপর লেখক সংঘ পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পরিক্রম' — 'পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিপত্র'। প্রথমে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় এবং পরে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় পুরো ষাটের দশক 'পরিক্রম' নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। পরিক্রমের একটি সম্পাদনা পরিষদ ছিল। তাতে ছিলেন সৈয়দ মুর্তজা আলী, আহমদ শরীফ, আবদুর রশীদ খান, আবদুল গনি হাজারী ও জাহানারা আরজু। তবে তাঁরা ছিলেন নামেমাত্র। সম্পাদনার দায়িত্ব পুরোটাই পালন করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম ও হাসান হাফিজুর রহমান। এবং শেষের দিকে কখনো তাদের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন নজরুলবিষয়ক লেখক শাহাবুদ্দিন আহমদ ও রশীদ হায়দার। প্রকাশক হিসেবে নাম থাকত নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখের।

'পরিক্রম' নামটির মধ্যেই আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চাশের দশক থেকে ঢাকার মার্কিন তথ্যকেন্দ্র, যার অফিস ছিল প্রেসক্লাবের উল্টো দিকে, মার্কিন পরিক্রমা নামে একটি ম্যাগাজিন বের করত। লেখক সংঘের কর্মকর্তারা ওই নামটি থেকে প্রভাবিত হয়ে 'পরিক্রমা' নামে সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ নেন। উদ্যোক্তাদের কাছে শুনেছি, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পরামর্শ দেন পরিক্রমা নয়, পরিক্রম নামকরণই হবে যথার্থ। তিনি বলেন, 'পরিক্রমা'র ম-এর আকার ফেলে দাও। মুনীর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম বা হাসান হাফিজুর রহমান কেউই পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন না, তবে একই সঙ্গে বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। অর্থাৎ তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদীও ছিলেন।

লেখক সংঘের পশ্চিমাঞ্চলের কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরে। তাতে যুক্ত ছিলেন উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি প্রভৃতি ভাষার খ্যাতিমান লেখকেরা। সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই

প্রাধান্য ছিল উর্দু লেখকদের। দুই অঞ্চলের লেখকদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে পাকিস্তান লেখক সংঘ।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় 'প্রাচীনপন্থী' ও 'আধুনিকতাবাদী' তরুণ দুই শ্রেণির লেখকই ছিলেন। প্রাচীনপন্থী ও পাকিস্তানবাদী লেখকদের সাহিত্য সাময়িকী ছিল 'মাসিক মাহে নও' - কেন্দ্রীয় সরকারের পত্রিকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হলেও লেখক সংঘের 'পরিক্রম' ছিল আধুনিকতাবাদীদের সাহিত্যপত্র। বিষয়বস্তু হিসেবে মাহে নও-এ যেমন ইসলাম ও মুসলমান প্রাধান্য পেত, পরিক্রমে প্রাধান্য পেত বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিশ্বসাহিত্য। মাহে নও-এর লেখকদের মধ্যে যেমন থাকতেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ বরকতউল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আবুল ফজল, আ ন ম বজলুর রশীদ, সুফিয়া কামাল, ফররুখ আহমদ প্রমুখ; তেমনি পরিক্রম-এ বেশি লিখতেন শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান, খান সারওয়ার মুর্শেদ, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ। নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে জাহানারা আরজু, জাহানারা হাকিম, লতিফা হিলালীসহ ছিলেন কয়েকজন। সৈয়দ শামসুল হকের 'অচেনা' নামে অস্ত একটি উপন্যাস পরিক্রম-এর এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ষাটের দশকের শেষ দিকে। মাহে নও-এর মতো পরিক্রমও লেখকদের পারিতোষিক দিত। সেকালে পূর্ব বাংলার লেখকদের জন্য তা ছিল বড় প্রাপ্তি।

কোথায় ছিল লেখক সংঘের কার্যালয়? কোথা থেকে বের হতো পরিক্রম? বাংলা একাডেমির গেট দিয়ে ঢুকতে বাঁ দিকে ছিল একটি ছোট্ট এক কামরার ঘর। ইট-সিমেন্টের দেয়াল কিন্তু টিনের চাল। ঘরটি তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে বর্ধমান হাউসের নিরাপত্তা প্রহরীদের বসার জন্য। ওই ঘরটি লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখাকে দেওয়া হয়েছিল তাদের কর্মকর্তাদের কার্যালয় হিসেবে। সেখানে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকেরা প্রতিদিন কেউ না কেউ বসতেন। তবে প্রতি মাসে একবার একটি বড় বৈঠক হতো। ছাত্রজীবনে সেসব বৈঠকের কোনো কোনোটিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুর্শিদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন দেশি ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে। কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমি সেই ঘরটি ভেঙে সেখানে একটি দালান বানিয়েছে। স্বাধীনতার পরে ওই ঘরটিতে ছিল বাংলা একাডেমির ডাকঘর। সেই সময়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওই ঘরটি রেখে দেওয়া উচিত ছিল। হতে পারত সেখানে একটি ছোট্ট প্রদর্শনশালা। প্রদর্শিত হতে পারত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সাহিত্য সাধনার জিনিসপত্র।

খুবই সুন্দরভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হতো 'পরিক্রম'। কিছুদিন নিউজপ্রিন্টে ছাপা হতো, পরে কর্ণফুলী মিলের সাদা উন্নতমানের কাগজে বের হতো। মনোটাইপে নির্ভুল ছাপা। অঙ্গসজ্জা ভালো। শুধু লেখকেরা নন, চিত্রশিল্পীরাও পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন লেখক সংঘ থেকে। পরিক্রম-এর প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী এবং দেবদাস চক্রবর্তীই সবচেয়ে বেশি আঁকতেন। লেখক সংঘের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকলেও স্বাধীনতার পরে তারা উভয়েই আইয়ুব সরকার ও লেখক সংঘের ঘোর সমালোচকে পরিণত হন। অব্যাহত সেই সরকারের নিন্দা করতেন।

প্রকাশনাশিল্পের সেই ঘোর দুর্দিনে লেখক সংঘ এবং বাংলা একাডেমি আধুনিক প্রকাশনার সূচনা করে। ষাটের দশকে বাংলা একাডেমি বহু মূল্যবান বই প্রকাশ করেছে, শুধু গবেষণামূলক বই নয়, সৃষ্টিশীল বইও। লেখক সংঘ অত করেনি, তবে যা করেছে তার গুণগত মূল্য অসামান্য। ফররুখ আহমদের কাব্য-নাটক 'নৌফেল ও হাতেম' সম্ভবত লেখক সংঘ প্রকাশনীর প্রথম বই। শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ কবিতার বই 'রৌদ্র করোটিতে' প্রকাশ করে লেখক সংঘ। শামসুর রাহমান তার এলোমেলো স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'বই বাবদ আমার প্রাপ্য টাকাও চটজলদি পেয়ে গেলাম।' সেখানে অন্য প্রকাশকেরা চটজলদি তো দূরের কথা, দেরিতেও টাকা দিতেন না। তিনি আরও লিখেছেন, '...রৌদ্র করোটিতে'র জন্য আদমজী

পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম।... সেবার কথাসাহিত্যে আদমজী পুরস্কার পান শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার তার 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানের আহমদ নদিম কাশমি পুরস্কৃত হন কবিতার জন্য। তিনি একজন প্রগতিশীল উর্দু কবি। এই বর্ষীয়ান কবি ছোটগল্প লিখেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।' [কালের ধুলোয় লেখা, পৃ. ১৫৪-৫৫]

আদমজী, দাউদ প্রভৃতি পুরস্কার সরকারের তত্ত্বাবধানেই প্রবর্তিত হয়। জমকালো পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হতো করাচিতে। শামসুর রাহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ পিআইএ বা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের বিমানে করাচি যান। পুরস্কারটি গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হাত থেকে। শামসুর রাহমানের স্মৃতিচারণা :

'শহীদুল্লাহ কায়সার এবং আমি ১৯৬৩ সালে করাচিতে যাই আদমজী পুরস্কার গ্রহণের উদ্দেশ্যে। শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিচিতি আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল সঙ্গত কারণেই। প্রগতিশীল রাজনীতিতে সমর্পিত ছিলেন তিনি।... পুরস্কারের অর্থমূল্য আহামরি কিছু ছিল না। [কথাটি সঠিক নয়] তবে সেকালের পক্ষে ভালোই। তবে কবিতার জন্য জীবনের প্রথম পুরস্কার লাভের একটি আলাদা শিহরণ বোধ করেছিলাম। পুরস্কারটি গ্রহণ করতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের হাত থেকে, যার বিরুদ্ধে 'হাতির শুঁড়' কবিতাটি লিখেছিলাম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাদের বসতে হয়েছিল একেবারে প্রেসিডেন্টের পাশে। কথা প্রসঙ্গে আইয়ুব খান আমাকে আমার বইয়ের নাম এবং তার অর্থ অনুবাদ করতে বললেন। আমি নির্দ্বিধায় বললাম, 'সানরেইস অন দ্য স্কাল'। সেই মুহূর্তে আমার মুখে 'রৌদ্র করোটিতে'র ইংরেজি এ রকমই এসেছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মৃদু হাসলেন।' [পৃ. ১৫৫]

ষাটের দশকে আইয়ুব খানের পাশে বসার সৌভাগ্য ছিল বিধাতার সান্নিধ্য লাভের মতো।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের সেই স্মৃতি আরও বিস্তারিত আমাদের শুনিয়েছেন অনেকবার। প্রেসিডেন্টের এক পাশে শামসুর রাহমান, অন্য পাশে শহীদুল্লাহ কায়সার। মঞ্চে পশ্চিম পাকিস্তানের পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য লেখক। শামসুর রাহমান তাঁর স্মৃতিকথায় বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন, 'লেখক সংঘ' সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই, যদিও লেখক সংঘের পরিক্রম-এর তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক এবং সেখান থেকে লেখার জন্য সম্মানী পেতেন। লেখক সংঘের বর্ধমান হাউসের ছোট্ট ঘরের আড্ডায়ও তিনি যোগ দিতেন।

লেখক সংঘ প্রকাশনীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মধ্যে ছিল আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'। বিষয়বস্তুর কারণেই হোক বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্যই হোক, এই বইটিও তাকে এনে দেয় প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। মুসলমান লেখকদের নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করায় ১৯৬৫ সালে আনিসুজ্জামান পান দাউদ পুরস্কার। মুনীর চৌধুরীও একই সঙ্গে পুরস্কৃত হন তাঁর 'মীর মানস'-এর জন্য, যা প্রকাশ করেছিল বাংলা একাডেমি। এ সম্পর্কে আনিসুজ্জামান স্বাধীনতার পর ১৯৭২-এ লেখেন :

'দাউদ-পুরস্কার গ্রহণ করা আমাদের উচিত হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিল; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তর্কের ঝড় উঠেছিল পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে মুনীর চৌধুরী ও আমাদের অপর দুই সহকর্মীর বেতার অনুষ্ঠান নিয়ে।' [আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, ১৯৭৫, পৃ. ২৯]

লেখক সংঘ প্রকাশ করেছিল সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'অন্বেষণ', হামেদ আহমেদের উপন্যাস 'প্রবাহ', আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা', হাসান আজিজুল হকের গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য', ইব্রাহীম খাঁর অনুবাদ 'ইতিকাহিনী', হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পের বই প্রভৃতি। মুনীর চৌধুরীর শেকসপিয়ারের অনুবাদ 'মুখরা রমণী বশীকরণ',

নজরুলের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' — 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিককালের ৪৬ কবির নজরুলের ওপর লেখা ৪৬টি কবিতার সংকলন।' এটি সম্পাদনা করেন কবি আবদুল কাদির।

লেখক সংঘ দুটি চমৎকার কবিতার সংকলন প্রকাশ করে। আফ্রিকা ও এশিয়ার কবিদের কবিতার অনুবাদ 'আফ্রো-এশীয় কবিতাগুচ্ছ' এবং সমাজতান্ত্রিক চীনের একটি নাটকের অনুবাদ 'শ্বেতকুন্তলা'। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের তিনটি সংগ্রহ প্রকাশের প্রকল্পও নেয়। পূর্ব বাংলার প্রবন্ধ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন আহমদ শরীফ, পূর্ব বাংলার গল্পের দায়িত্ব পালন করেন মুনীর চৌধুরী এবং পূর্ব বাংলার কবিতার সম্পাদক শামসুর রাহমান। লেখক সংঘে জড়িত থাকার কথা শামসুর রাহমানের কোনো স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায় না।

লেখক সংঘে যারা কাজ করেছেন তাঁরা আমাদের সাহিত্যের উপকার করেছেন। বাংলাদেশ ও বাঙালির তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। আইয়ুব সরকারের প্রশংসা করে প্রচারণাও সেখান থেকে হয়নি। কিন্তু লেখক সংঘের সঙ্গে জড়িত থাকাকে স্বাধীনতার পরে কেন তারা অমর্যাদাকর মনে করেছেন তা বোধগম্য নয়।

... আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর পরই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, সেগুলোর অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রধান ছিল প্রকাশনা। ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থেকে পাকিস্তানে আইয়ুব সরকার প্রকাশনার ওপর জোর দিয়ে থাকবে। যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে, তার মধ্যে পাকিস্তান লেখক সংঘ, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমির অন্যতম প্রধান কাজই ছিল বই প্রকাশ। আইয়ুব সরকার প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক একাডেমিকেও (স্বাধীনতার পরে যার নাম হয় বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ইসলাম ও মুসলমান-সংক্রান্ত বই প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র - ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান - সাময়িকী শুধু নয়, বই প্রকাশের প্রকল্প নিয়েছিল। এসবের বাইরে পাকিস্তান পাবলিকেশনস নামে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাট প্রকাশনা সংস্থা। এই সব সরকারি প্রকাশনা সংস্থা থেকে ষাটের দশকে বহু মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছে। সেসব বইয়ের লেখকেরা ছিলেন অনেকেই খ্যাতিমান ও বিশেষজ্ঞ।

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ইংরেজিতে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন সংক্ষেপে বিএনআর পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার দ্বারা জনগণের বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেয়। সে উদ্যোগ নির্দোষ ছিল না, তাতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভেতর দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িকীকরণ শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সমগ্র সমাজ নয়, তরুণদের একটি অংশ উপলব্ধি করে সাম্প্রদায়িকতা সমাজ বিকাশের জন্য এবং প্রগতির পথে বড় বাধা। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ভাষা আন্দোলন এবং তার পরে ছাত্র-যুব আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চেতনা বিকাশে বিশাল ভূমিকা রেখেছে। তার ফলে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করে, অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি মূলধারায় পরিণত হয়।

সেই ধরনের একটি পরিবেশে বিএনআর যখন জাতীয় সংহতির নামে ইসলাম ও মুসলমানকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে থাকে, তা প্রগতিকামীদের ভালো লাগেনি। পুস্তিকা ও ছোট বই যেমন প্রকাশ করেছে বিএনআর, তেমনি প্রখ্যাত লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ বইও বের করেছে। উদাহরণের জন্য একটি বইয়ের নাম করতে পারি, সেটি মুহম্মদ বরকতুল্লাহ সম্পাদিত 'দর্শনে মুসলমান'।

... 'দর্শনে মুসলমান' বইটির যা বিষয়বস্তু, তাতে এটি কলকাতার কোনো হিন্দু প্রকাশক যদি ছাপতেন কারও কিছু বলার ছিল না। বিষয়টি সর্বজনীন, সাম্প্রদায়িক নয়, যেমন সাম্প্রদায়িক নয় শ্রীচৈতন্য ও বাংলার বৈষ্ণববাদ। এসব হতে পারে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে যেকোনো লেখকের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে বাংলা ভাষার মূলধারার প্রধান লেখকদের কাছে ইসলাম ও মুসলমান ছিল অবহেলার জিনিস। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ দুটি কথা বলেছেন তা বিবেচনার বিষয়, তা হলো 'আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে দেশবাসীর' সামনে তুলে ধরতেই এই বই প্রকাশ। এর অর্থ অতীতের যেকোনো দেশের যেকোনো মুসলমানের যা কিছু অর্জন তার উত্তরাধিকারী পাকিস্তানিরা। আরেকটি কথা বলেছেন, 'জাতিকে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করে তোলা'র লক্ষ্যে এই বই প্রকাশ। এই বক্তব্যে অসাম্প্রদায়িক বাঙালির উত্তরাধিকারের চেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। বাঙালির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি সব ধর্মের উপাদানই রয়েছে। সেই জিনিসটিকে পাকিস্তান সরকার অবহেলা করতে চায়। সেখানেই ছিল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের আপত্তি।

'পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ' প্রচারও ছিল বিএনআরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ বিষয়ে সংস্থাটি সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করেছে এবং তাতে বাঙালি লেখকবুদ্ধিজীবীরা অংশ নিয়েছেন। বিএনআর ১৯৬০-৬১ সালে ইংরেজি ভাষায় একটি ছোট বই প্রকাশ করে তার নাম 'পাকিস্তানি ন্যাশনালিজম'। তাতে ছিল তিনটি প্রবন্ধ, লিখেছিলেন তিনজন, পশ্চিম পাকিস্তানের শরিফ-আল-মুজাহিদ এবং পূর্ব বাংলার মুনীর চৌধুরী ও হাসান জামান। সম্পাদনা করেছিলেন শরিফ-আল-মুজাহিদ। পাকিস্তানের জাতীয় ভাবধারা এবং পুস্তিকাটির লেখকদের নিজস্ব চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার জন্য বইটি বিশেষ সহায়ক। শরিফ-আল-মুজাহিদের প্রবন্ধে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। তাঁর প্রথম বাক্যটি এ রকম :

'Pakistan was born as a result of the Indian Muslim's claim to a separate nationhood in their own right.'

শরিফ সাহেবের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ধারণাটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁর ভাষায় :

'Pakistani nationalism is, thus, essentially an ideological nationalism, as against the territorial, linguistic or social nationalism of the West. Its roots go deep into history.'

মুনীর চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি ছিল তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটির শিরোনাম 'অন রিলিজিয়ন' (ধর্ম সম্বন্ধে), তারপর 'অন ল্যাঙ্গুয়েজ' (ভাষা সম্বন্ধে) এবং 'অন লাইফ' (জীবন সম্বন্ধে)। প্রবন্ধটি সুলিখিত, কিন্তু তাঁর রচনাবলি বা আনিসুজ্জামানের মুনীর চৌধুরী জীবনীগ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। অধ্যাপক চৌধুরী বলতে চেয়েছেন, পাকিস্তানিদের জাতীয় চেতনায় প্রাধান্য পাবে ইসলাম, কারণ পাকিস্তান মুসলমানদের বাসভূমি। মুনীর চৌধুরীর ভাষায় :

'We are Pakistanis. We are, in Pakistan, overwhelmingly Muslims. The ideals of Islam formed a fundamental basis of our inspiration to build this separate homeland for the Muslims of Indo-Pakistan. It is only natural that the elements of our faith in Islam should now constitute the very backbone of our national consciousness.'

'পাকিস্তানি ভাষা' প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর যে পর্যবেক্ষণ, তা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন পায়নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, একদিন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে দুটি নতুন ধরনের উর্দু ও বাংলা ভাষা জন্ম নেবে। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষায় সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পশতু প্রভৃতি ভাষার শব্দ ঢুকে যাবে এবং অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাও আর আগের মতো থাকবে না, সেখানে আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দ যোগ হয়ে এক নতুন 'পাকিস্তানি বাংলা ভাষা'র জন্ম হবে।' তাঁর ভাষায় :

'It is hoped that if the previously mentioned process of mutual give and take strikes deep roots into the speech habits of all Pakistanis then in no time a single new national language

will automatically emerge out of it. It will be neither Urdu nor Bengali, but a very acceptable amalgam of all the languages of Pakistan, East or West.'

সাংঘাতিক বক্তব্য। হাজার মাইল দূরে দু'টি দেশে (হোক এক রাষ্ট্র) একটি অভিন্ন জাতীয় ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না ১০০ বছরেও। যেখানে দু'টি দেশেই রয়েছে কয়েকটি সমৃদ্ধ ভাষা। এসব ছিল কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণির প্রণোদনায় একেবারেই অবাস্তব ও ভুল চিন্তা। বাঙালি মুসলমানের বিভ্রান্তি। কী করে পাকিস্তানের দুই অংশে একটি অভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হতে পারে? পৃথিবীর সেই নতুন ভাষাটির নাম কী হতে পারত?

হাসান জামানের প্রবন্ধটি আরও প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িকতার দোষে কলুষিত। তবে এ ধরনের বিভ্রান্ত চিন্তাই ছিল তখনকার বাঙালি লেখক, বুদ্ধিজীবীদের মাথায়। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় না ঘটলে এ-জাতীয় বিভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকে পড়ে যেত বাঙালি জাতি। চরম ক্ষতি হতো বাঙালি সংস্কৃতির।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ, মৌলিক গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে লেখা খ্যাতিমান লেখকদের প্রপাগান্ডামূলক পুস্তক-পুস্তিকা বিএনআর প্রকাশ করলেও, এই সংস্থা বহু গুরুত্বপূর্ণ বইও বের করেছে। যদিও অনেক বইয়ের বিষয়বস্তু ইসলাম ও মুসলমান, তবু সেগুলো সুলিখিত এবং প্রয়োজনীয় প্রকাশনা। কাজী মোতাহার হোসেনের 'কয়েকটি জীবন' বইটি প্রকাশ করে বিএনআর। তাতে নবাব স্যার সলিমুল্লাহসহ কয়েকজন মুসলমান মনীষীর জীবনকথা আলোচিত হয়।

বিএনআর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করে। তার নাম 'সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ'।

মনোটাইপে ছাপা ২২০ পৃষ্ঠার বইটিতে ছিল চারটি প্রবন্ধ। কাজী দীন মুহম্মদের প্রবন্ধের শিরোনাম 'সুফীবাদের ভূমিকা', আবদুল করিমের প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের সুফী-সম্প্রদায়', মনির-উদ্-দীন ইউসুফের প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব' এবং অধ্যক্ষ শইখ শরফউদ্দীনের প্রবন্ধ 'পূর্ব পাকিস্তানের সুফী প্রভাব'। গ্রন্থে ভূখণ্ডকে 'বাংলাদেশ' বলাও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, খ্যাতিমান লেখকদের যেসব বই বিএনআর থেকে বেরিয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তাঁরা তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের তালিকা থেকে ওই বইগুলোর নাম বাদ দেন। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ও মানসিক দীনতাবশত আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখকেরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন যে তাঁরা বিএনআরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যেখান থেকে রয়্যালটির টাকা পুরোটাই পেয়েছেন। যদিও সে টাকা বাংলাদেশের মানুষেরই টাকা, আইয়ুব বা মোনায়েম খানের ব্যক্তিগত টাকা নয়। তারা ভেবেছেন ওই সব বইয়ের মালিকানা স্বীকার করলে প্রমাণিত হবে তারা পাকিস্তানপন্থী। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী পরিচয়। খুবই বিপজ্জনক ছিল। তবে কেউ স্বীকার করতে না চাইলেও বাস্তবতা হলো ২৫ মার্চ '৭১-এর আগে বাংলাদেশের বাঙালি-অবাঙালি সব নাগরিকই ছিল পাকিস্তানি।

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা বা বিএনআরের প্রথম পরিচালক ছিলেন জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার এফ আর খান। খুব বেশি দিন তিনি ছিলেন না। কোনো একটা অভিযোগে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এক যুগ সময়কালে বিএনআরের পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন কবীর চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ও হাসান জামান। ওবায়দুল্লাহ কবি ও সিএসপি অফিসার। কবীর চৌধুরী ও হাসান জামান শিক্ষাবিদ ও লেখক। তখন কবীর চৌধুরী ছিলেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। বরিশাল বিএম কলেজ থেকে গভর্নর মোনায়েম খান তাঁকে তাঁর নিজ জেলা ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যক্ষ করে নিয়ে আসেন। মৌলিক লেখার চেয়ে অনুবাদেই তার আগ্রহ ছিল বেশি। ১৯৬৯-এর মার্চ থেকে '৭২-এর জুন পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক ছিলেন (তখনো মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি হয়নি)।

হাসান জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের রিডার। তিনি ছিলেন ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানবাদী। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। বেশ কয়েকটি বইয়ের তিনি ছিলেন রচয়িতা, যেমন 'ইসলাম ও কমিউনিজম', 'সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য', 'Basis of the Ideology of Pakistan' প্রভৃতি। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক হলেও তিনি ছিলেন একজন মেধাবী শিক্ষাবিদ। চল্লিশের দশকে তিনি ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী পাকিস্তান আন্দোলনের একজন নিবেদিত কর্মী।

পঞ্চাশের দশকে মুসলমান লেখকদের মধ্যে যারা 'পাকিস্তানি তমদ্দুন', 'পাকবাংলা সাহিত্য' প্রভৃতি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন, হাসান জামান তাঁদের একজন। তাঁদের বক্তব্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য মূলধারার বাংলা সাহিত্যের মতো হবে না, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের মতোও হবে না, তা হবে পাকিস্তানের নীতি-আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ 'পাক-বাংলা সাহিত্য'। অন্য কথায় 'মুসলমান বাংলা সাহিত্য'। সে সাহিত্যের বিষয়বস্তু শুধু নয়, তার ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-অলংকার সবই হবে মূলধারার বাংলা সাহিত্য থেকে অন্য রকম। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত আগে এক আলোচনা সভায় খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন এক প্রবন্ধে বলেন, 'আমাদের সাহিত্যে উপমা-প্রয়োগের যে ধারা চলছে তার পরিবর্তন দরকার, কারণ সেগুলো রাঢ়-বাংলার সংস্কৃতির অনুসারী ও পাকিস্তানি তমদুনের পরিপন্থী।' (পাক-বাংলা সাহিত্য উপমা)

১৯৫৮ সালে, সামরিক শাসন জারির আগে, আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে ঢাকায় এক বড় আকারের সাহিত্যবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগকে। ওই সেমিনারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, খান সারওয়ার মুর্শেদ, নূরুল হোসেন, হাসান জামান, কবীর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, কবি আবুল হোসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আসকার ইবনে শাইখ প্রমুখ। সেকালে ইসলামপন্থী ও সেক্যুলারপন্থীদের মধ্যে বিশেষ বিভাজন ছিল না, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধেরও অভাব ছিল না।

ভাষা আন্দোলনের আট মাস পরে '৫২-র অক্টোবরে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে এক 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত করার অভিপ্রায় এবং সুষ্ঠু ইসলামভিত্তিক চিন্তা-প্রবাহ সৃষ্টি করা। সম্মেলনের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এবং আবদুল গফুর। সম্মেলনের লক্ষ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়:

'আমরা যদি পাকিস্তানকে "ইসলামী রাষ্ট্র" হিসাবে গড়ে তুলতে চাই তবে প্রথমে "ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ" সম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার ধারণা করে নেব। আমরা আধুনিক দুনিয়ার বিভিন্ন মতবাদ ও সমস্যাবলীর তুলনায় ইসলামকে যাচাই করে নিতে চাই। ইসলামই যে শ্রেষ্ঠতম মানবকল্যাণকর আদর্শ তা আমরা কোনো গোঁজামিল না দিয়ে বুঝে নিতে ও অন্যদের বুঝিয়ে দিতে চাই।' (সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পৃ. ২৯-৩০)

ওই সম্মেলনের সাহিত্য-সভার আলোচনায় যারা প্রবন্ধ পাঠ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কবি শাহাদাৎ হোসেন, মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, হাসান জামান প্রমুখ। হাসান জামানের প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'ইসলামী তমদ্দুন'। তিনি প্রবন্ধে 'ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংস্কৃতি পুনর্নির্মাণের' আহ্বান জানিয়ে বলতে চান 'ইসলামের মূল ভাব ও মূল্যবোধ মানবিক ও সর্বজনীন'। তাই সমাজ জীবনে তার প্রয়োগ 'মঙ্গলজনক'। সম্মেলনে কেউ কেউ সরকারের মৃদু সমালোচনাও করেন এবং বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের জন্য তারা সরকারকে সমালোচনা করেননি, তারা সরকারকে সমালোচনা করেছিলেন 'ইসলামী আদর্শ' যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবায়ন না করায়। তখন খাজা নাজিমুদ্দীন ছিলেন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুই সরকারপ্রধানই পূর্ব বাংলার নেতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লক্ষ করা যায়, রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে তথা শাসকদের চেয়ে পূর্ব বাংলার একশ্রেণির কবিশিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ ছিলেন বেশি ইসলামপন্থী। তারা ভুলে গিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বাংলা সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী সব ধর্মের উপাদানই আছে।

পূর্ব বাংলার সাহিত্যের মেজাজ ও চারিত্র পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য থেকে ভিন্ন হবে তা স্বাভাবিক - সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে শুধু নয়, '৪৭-এর পর ভিন্ন রাষ্ট্রীয় সত্তার কারণেও। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণে দুই বাংলার সাহিত্যের ভিন্নতা জোর করে সৃষ্টির চেষ্টা সাহিত্যের জন্য ক্ষতিকর। দুই বাংলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিভাজন চিরকালই ছিল, একই বাংলা ভাষায় সবাই কথা বললেও। পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে নিষ্প্রয়োজনে ইসলামীকরণের চেষ্টা তখনকার তরুণ লেখকেরা সমর্থন করেননি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ কবি ও কথাশিল্পী মূলধারার বাংলা সাহিত্যের লেখক, তাঁরা 'পাক-বাংলা সাহিত্য' সৃষ্টির চেষ্টা করেননি। অবশ্যই তাদের ভাষা ও শৈলী পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও আলাদা।

বিএনআরের শেষ ও নিন্দনীয় পরিচালক ছিলেন হাসান জামান। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি ছিলেন হিন্দুবিরূপ, রবীন্দ্রসংগীত বিরোধিতার প্রশ্নে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সরকারকে সমর্থন দেন যখন জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদাসহ পূর্ব বাংলার প্রধান কবি-সাহিত্যিকেরা সরকারি নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন।

বিএনআর একেবারেই রাজনীতিনিরপেক্ষ শিল্প-সাহিত্য-দর্শনসংক্রান্ত বহু বইপুস্তিকা যেমন বের করেছে, তেমনি তার মূল কাজ ছিল আইয়ুব প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' বিষয়ে প্রচারমূলক বই-পুস্তিকা প্রকাশ করা। বিশেষ করে, এমন কিছু বই বের করেছে, যা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দূষিত। পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মের তরুণেরা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করতেন। তাঁরা '৪৭-পূর্ব সময়ের হিন্দু জমিদার-মহাজনদের নিপীড়ন শোষণের বিষয়টিকে অতীতের একটি অধ্যায় হিসেবেই বিবেচনা করেছেন - বর্তমানের হিন্দুরা তার জন্য দায়ী নন। কিন্তু পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার সেই অতীতকে অব্যাহত স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যেত। অত্যাচারী ও শোষক হিসেবে মুসলমান জমিদারেরা কিছুমাত্র কম ছিলেন না তা সবাই জানেন।

পাকিস্তান আমলের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তাঁরা এদিকেও ছিলেন ওদিকেও ছিলেন। তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন, আবার প্রয়োজনে সরকারের মৃদু সমালোচনাও করেছেন। বিএনআরের দরজা সবার জন্যই খোলা ছিল। মফস্বলের বহু অখ্যাত কবি-লেখকের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের বই প্রকাশ করেছে। হাসান জামান লেখকদের প্রাপ্য টাকা পাণ্ডুলিপি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিশোধ করতেন। তাতে বহু অসচ্ছল লেখক আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। বই প্রকাশিত হওয়ায় লেখক হিসেবে তারা পেয়েছেন পরিচিতি, একজন অবহেলিত লেখকের জন্য তা বড় প্রাপ্তি।

খ্যাত-অখ্যাত এমন লেখক খুব কমই ছিলেন ষাটের দশকে, কবীর চৌধুরী ও হাসান জামানের সময় বিএনআর থেকে যাদের বই প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৮-৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় বিএনআর নিয়ে যখন সমালোচনা হচ্ছিল, তখন হাসান জামান আত্মরক্ষার জন্য চাতুর্যের আশ্রয় নেন। পত্রিকায় ফলাও করে বিরাট এক বিজ্ঞাপন দেন এই মর্মে যে বিএনআর কাদের বই প্রকাশ করে গর্বিত। দেখা গেল, প্রগতিশীল শিবিরের অনেক লেখক আছেন তাঁদের মধ্যে। (অবশ্য ওই তালিকায় আহমদ

শরীফ এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নামও ছিল, কিন্তু তাঁদের কোনো বই বিএনআর থেকে প্রকাশিত হয়নি, অথবা তারা কোনো পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে রয়্যালটির টাকাও নেননি।)

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের উদ্গাতা মওলানা ভাসানী যখন আইয়ুবের 'দুর্গ জ্বালিয়ে দেওয়ার' ডাক দিয়ে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন শুরু করেন, তখন একদিন উন্মত্ত জনতা নবাব আবদুল গনি রোডে বিএনআর কার্যালয় জ্বালিয়ে দেয়। (রেলভবনের পাশে)। টেবিল-চেয়ার-আলমারি পুড়ে ছাই হয়। অনেক ভালো ভালো রচনার পাণ্ডুলিপিও ভস্মীভূত হয়। গুদামে যেসব বই ছিল, সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আধা-পোড়া বই কয়েক দিন রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। অনেক বই ছাপা হয়েছিল নিউজপ্রিন্টে। ১০-১২টি বই আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। ওই সময় একদিন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা একজন লেখককে হাইকোর্টের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখি। কারণ জিজ্ঞেস করে জানি, তিনি ইতিহাসমূলক একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, একটা চেকও পেয়েছেন, বইটি ছাপা হচ্ছিল, কিন্তু সব শেষ।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হাসান জামানের পিএইচডি থিসিস 'Rise of the Muslim Middle Class in India and Pakistan' একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

হাসান জামান ও তাঁর গোত্রের সবাই তাঁদের বিশ্বাসে অনড় ছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের সাবলীলভাবে বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের আবেগ ও স্বপ্ন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নিয়তির পরিহাস এই যে তার বড় ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান এবং তাঁর ছেলে ও ভাগনে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। ১৯৭৮-তে হাসান জামান সৌদি আরবে মারা যান।

...আইয়ুব আমলের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার ছিল 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স প্রেসিডেন্ট পুরস্কার'। ১৯৫৮ সালে জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পরপরই তিনি এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন 'গৌরবজনক সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতি' প্রদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শুরু থেকেই এই সম্মানজনক পুরস্কারটি ছিল বৈষম্যমূলক। পুরস্কারের নীতি হিসেবে বলা হয়েছিল 'কমপক্ষে পাঁচ হাজার এবং উর্ধ্বপক্ষে দশ হাজার টাকা ও তৎসহ প্রেসিডেন্টের পদক প্রদানের রীতি রয়েছে এই পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে।' শুধু সাহিত্যকর্মের জন্য নয়, প্রেসিডেন্ট পুরস্কার দেওয়া হতো বিজ্ঞান, চিত্রকলা, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'গৌরবজনক অধ্যায় সৃষ্টির জন্যও'। কৃতী ব্যক্তিদের এ ধরনের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' দেওয়া হতো বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের কবি-সাহিত্যিকদের। সম্ভবত পাকিস্তানের অন্য কোনো ভাষায় কোনো কবিসাহিত্যিক এই পুরস্কার ষাটের দশকে পাননি। পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধি ও পাঞ্জাবি ভাষার কবি-লেখকও ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পুরস্কার কমিটি গঠন করে দিত, সেই কমিটির সুপারিশমতো মনোনীত হতেন পুরস্কারপ্রাপ্তরা। প্রতিবছর পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্টে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হতো।

একই পুরস্কার কেউ পাবেন পাঁচ হাজার টাকা, কেউ পাবেন দশ হাজার টাকা, কেন এই বৈষম্য, তা সেকালে আমাদের বোধগম্য ছিল না। যারা বাংলা সাহিত্যে পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের কাছেও ব্যাপারটি স্পষ্ট ছিল না। জিনিসটি নিয়ে যে আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা প্রশ্ন তুলবেন, সে সাহসও ছিল না কারও। কেউ কেউ, বিশেষ করে যারা পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছেন, মর্মবেদনায় ভুগতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতেন না। অথচ প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল। গণতান্ত্রিক সমাজে অযৌক্তিক কাজের সমালোচনা এমন কি প্রতিবাদ হয়ে থাকে।

আমরা তখন তরুণ লেখক, সুতরাং ওই পদক-পুরস্কার নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিল না। লক্ষ করেছি, যাঁর সাহিত্যকর্ম কম তিনি পেয়েছেন দশ হাজার টাকা এবং যাঁর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম রয়েছে তিনি পেয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বছর (১৯৫৮) প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পান মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। নিঃসন্দেহে তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। তিনি পান দশ হাজার টাকা। তার সঙ্গে একই বছর পুরস্কৃত হন কবি জসীমউদ্দীন। সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিমেয়। তাঁকে দেওয়া হয় পাঁচ হাজার টাকা। জসীমউদ্দীনের মন খারাপ হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

১৯৫৯ সালেও ওই একই ব্যাপার ঘটে। আজাদ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মুসলিম লীগের সাবেক নেতা মওলানা আকরম খাঁ পান দশ হাজার টাকা। ১৯৬০ সালে কবি গোলাম মোস্তফা পান পাঁচ হাজার টাকা।

১৯৬১ সালে কবি ফররুখ আহমদ পান পাঁচ হাজার টাকা এবং একই সঙ্গে মহিউদ্দীনও পান পাঁচ হাজার টাকা। ১৯৬২ সালে মহিউদ্দীন দ্বিতীয়বার একই পুরস্কার পান পাঁচ হাজার টাকা। বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের অবদান আর মহিউদ্দীনের অবদান কি সমান? তা ছাড়া একই পুরস্কার পরপর দুই বছর একই ব্যক্তির পাওয়ার যুক্তি কোথায়?

রাষ্ট্রীয় পদক-পুরস্কারের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। সে গুরুত্ব শুধু অর্থনৈতিক নয়, মর্যাদারও। ইউরোপের প্রায় সব দেশেই অনেক রকম সাহিত্য পুরস্কার প্রচলিত রয়েছে। ভারতে আছে জ্ঞানপাঠ, আকাদমি পুরস্কার প্রভৃতি। যে উদ্দেশ্যেই আইয়ুব সরকার প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রবর্তন করুক, কাজটি খারাপ ছিল না। মনোনয়ন ক্রটিপূর্ণ ও পক্ষপাতিত্বমূলক হওয়ায় পুরস্কারটির মর্যাদাহানি ঘটে এবং যারা পুরস্কৃত হন তাঁরাও গৌরব থেকে হন বঞ্চিত।

গণতন্ত্রহীন অনুন্নত দেশে সরকারি পুরস্কারের একটি নেতিবাচক দিক আছে, আর তা হলো তাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের শুধু নয়, পুরস্কারপ্রত্যাশী লেখকদের প্রতিবাদী চেতনা নষ্ট করে দেওয়া। সত্য উচ্চারণ থেকে তাঁরা বিরত থাকেন। অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ জোর দিয়ে করতে পারেন না। আইয়ুবের সামরিক একনায়কী শাসনামলেও সেটি লক্ষ করা গেছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী নেতারা লড়াই করেছেন, নির্যাতিত-নিপীড়ন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, বিরল ব্যতিক্রম বাদে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অতুলনীয় সুবিধাবাদী।

১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পান আবুল ফজল পাঁচ হাজার টাকা, পরের বছরও তিনি আবার পুরস্কার পান পাঁচ হাজার টাকা। মহিউদ্দীন ও আবুল ফজল পরপর দুবার পুরস্কার পান পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা। ১৯৬৬ সালে মুহাম্মদ এনামুল হক পেলেন পাঁচ হাজার টাকা, কিন্তু '৬৭ সালে বন্দে আলী মিয়া পেলেন দশ হাজার টাকা। সঙ্গীতে ওস্তাদ আয়েত আলী খান পেলেন দশ হাজার টাকা।

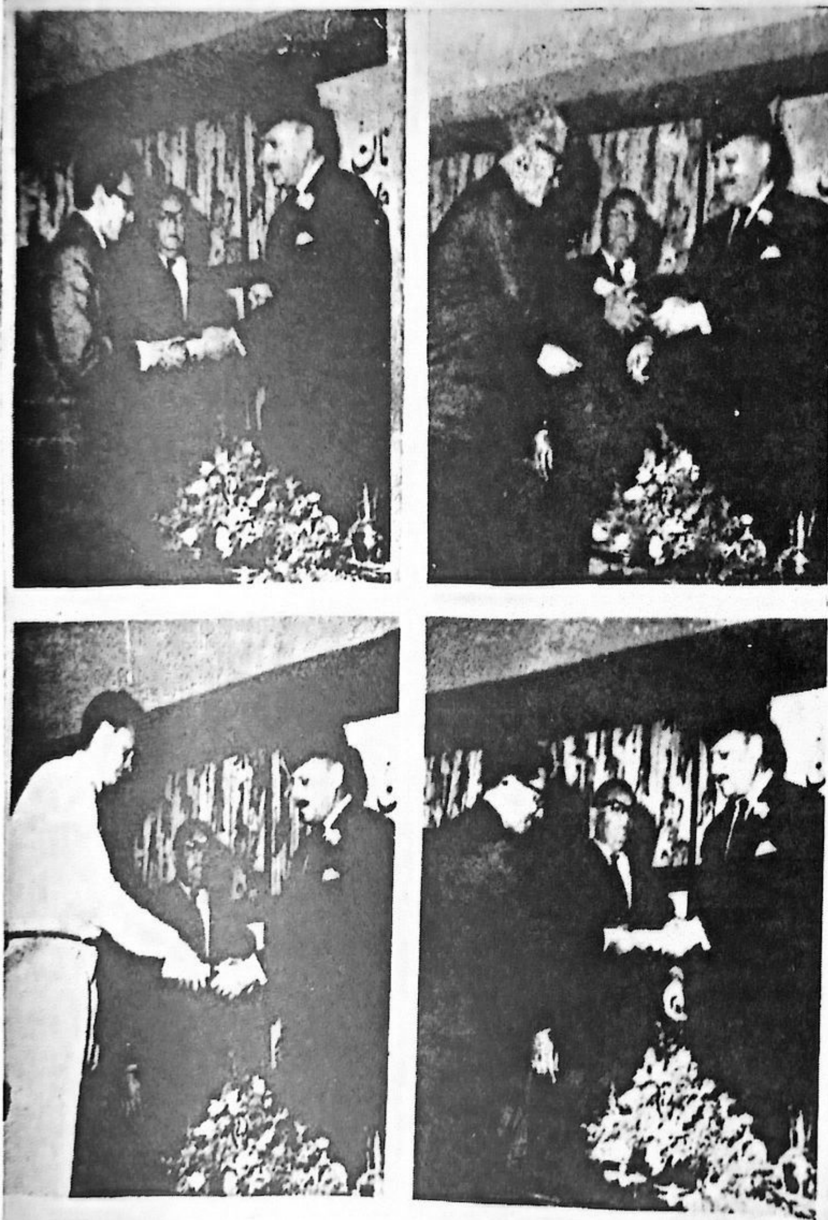
১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পান শওকত ওসমান। তার পুরস্কারপ্রাপ্তির খবর শুনে প্যারিস থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁকে ২৫ আগস্ট '৬৮ এক চিঠিতে লেখেন, 'শুনলাম বড় পুরস্কার পেয়েছ তাই লিখছি। অবশ্য এটা একটা অজুহাত, কারণ তুমি একটা পুরস্কার পেয়েছ তা কী এমন বড় খবর। পুরস্কারে খুশি হওয়ার কথা, তোমার নয়, আমাদেরও নয়। অন্য একটা দিক আছে বৈকি কিন্তু ওটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও বিষয়ে অন্যদের মন্তব্য করার অধিকার আছে বলে মনে হয় না।'

ওয়ালীউল্লাহ যে লিখেছিলেন পুরস্কারের অন্য একটা দিক, তা হলো আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। যখন চালের মণ ছিল ৩০ টাকা এবং সোনার ভরি ১২০ টাকার কম, সেই সময় পাঁচ হাজার/দশ হাজার টাকা বিপুল টাকা। মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারটি যেহেতু ইসলামাবাদ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিত,

সুতরাং তার জন্য ঢাকা থেকে লেখকেরা কতভাবে কী পরিমাণ তদবির করতেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথবা তারাই পুরস্কার পেতেন, যারা সরকারের আস্থাভাজন।

আদমজী পুরস্কার দেওয়া হতো কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, জীবনী প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য বইয়ের জন্য। প্রতিটি পুরস্কারের মান ছিল পাঁচ হাজার টাকা। লেখক সংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের পরামর্শক্রমে স্থায়ী চেয়ারম্যান মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পুরস্কারপ্রাপ্তদের মনোনীত করতেন। ১৯৬০ থেকে আদমজী পুরস্কার চালু হয়। প্রথম বছর পান আবদুস সাত্তার ও রওশন ইয়াজদানী, ১৯৬১তে রশীদ করীম ও আবদুর রাজ্জাক, ১৯৬২তে কাজী আবদুল মান্নান ও শওকত ওসমান, '৬৩তে শামসুর রাহমান ও শহীদুল্লাহ কায়সার, '৬৪তে আহসান হাবীব ও জহির রায়হান, '৬৫তে সুফি মোতাহার হোসেন ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এবং '৬৬তে আবুল ফজল ও ফররুখ আহমদ পুরস্কৃত হন। আদমজী পুরস্কারের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। যে বইটির জন্য পুরস্কার দেওয়া হতো, সেটি ভালো বিক্রি হতো। তাতে লেখক-প্রকাশক উভয়েই উপকৃত হতেন।

আরেকটি মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার ছিল দাউদ পুরস্কার। ১৯৬৩ সালে 'দাউদ ফাউন্ডেশন' এই পুরস্কার প্রবর্তন করে। বাংলা ভাষার জন্য দশ হাজার এবং উর্দু ভাষার সাহিত্যকর্মের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হতো গবেষণা, জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থের জন্য, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত বিষয়সমূহের ওপর গবেষণামূলক কার্যের জন্য। প্রতিটি পুরস্কারের মান ছিল পাঁচ হাজার টাকা। ষাটের দশকে দাউদ পুরস্কার পেয়েছেন মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৯৬৩), জুলফিকার হায়দার আফরিক (১৯৬৩), আকবর উদ্দিন ও আশরাফ সিদ্দিকী (১৯৬৪), মুনীর চৌধুরী ও আনিসুজ্জামান (১৯৬৫), আবদুস সাত্তার ও মুন্সী রইসউদ্দীন (১৯৬৬) প্রমুখ।



প্রেসিডেণ্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান করাচীতে পাকিস্তান রাইটার্স গীল্ড কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬৩-৬৪ সালের সাহিত্যে 'আদমজী পুরস্কার' বিজয়ীদেরকে পুরস্কার বিতরণ করছেন। ছবিতে: (উপরে : বামে) বাংলা কবিতার জন্য জনাব শামসুর রাহমান, (ডানে) উর্দু কবিতার জন্য জনাব আহমদ নদীম কাসমী ; (নীচে : বামে) উর্দু উপন্যাসের জন্য জনাব আবদুল্লাহ্ হুসেইন এবং (ডানে) বাংলা উপন্যাসের জন্য জনাব শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে প্রেসিডেণ্টের হস্ত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

(১০-৫-৬৪)

সাহিত্যে 'আদমজী পুরস্কার' বিজয়ীদেরকে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।

পুরস্কার পাওয়ার কারণে কোনো কোনো বই ও তার লেখক জনপ্রিয়তা পেতেন। যেমন একজন লেখক জগলুল হায়দার আফরিক। তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন তার ভ্রমণকাহিনি 'সিন্ধু নীলাভ দেশ' নামক সুখপাঠ্য বইটির জন্য। ষাটের দশকে বইটি জনপ্রিয় ছিল। জগলুল হায়দার আফরিক চাকরি করতেন দৈনিক আজাদে। আজাদের হিসাব বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তিনি এবং আকরম খাঁর বিশেষ আস্থাভাজন। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। শুনেছি আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দিসহ সাত-আটটি ভাষা জানতেন। চল্লিশের দশকে তিনি অনেক দিন মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন। তাঁর ইংরেজিতে একটি বই ছিল 'Call of the Red Sea'. পঞ্চাশের দশকে তার একটি বই 'পরদা নশিন হওয়া' পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। ষাটের দশকে তাঁর একটি উপন্যাস দেখেছি, নাম 'বিপ্লবী নায়িকা'। স্বাধীনতার আগেই তিনি মারা যান। আমি তাকে দেখেছি। তিনি বিশেষ সজ্জন ছিলেন।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের জন্য আরও যাঁরা দাউদ পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আশরাফ সিদ্দিকী, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল হক, আবদুস সাত্তার, মাযহারুল ইসলাম প্রমুখ। যে বইয়ের জন্য লেখকেরা দাউদ পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার সবই যে বিশেষ মূল্যবান বই, তা বলা যায় না; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বইটির চেয়ে বইয়ের লেখককেই পুরস্কৃত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেকালে ন্যূনতম মানসম্পন্ন না হলে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়া কঠিন ছিল।

পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৬৪ থেকে একটি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করে। ন্যাশনাল ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা মমতাজ হাসান ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের একজন সমঝদার। ষাটের দশকে আমাদের প্রধান চিত্রশিল্পী ও লেখকদের মুখে মমতাজ হাসানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি, তিনি ছিলেন তাঁদের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক। পূর্ব পাকিস্তানে চিত্রকর্ম বিক্রি হতো না বললেই চলে। সে জন্য পঞ্চাশের দশকের চিত্রশিল্পীদের অনেকেই করাচি-লাহোরে যাতায়াত করতেন ছবি বিক্রির জন্য। তারা কেউই নিরাশ হননি। বিশেষ করে, কোনো রকমে মমতাজ হাসানের সঙ্গে গিয়ে পরিচিত হতে পারলে ভাগ্য খুলে যেত। তিনখানা বই লিখে একজন খ্যাতনামা লেখক যা রোজগার করতেন, দু-তিনটি ছবি ন্যাশনাল ব্যাংকে গছাতে পারলে তার কয়েক গুণ বেশি উপার্জন করতেন একজন শিল্পী। মমতাজ হাসান শুধু ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরই নন, সম্ভবত পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবও হয়েছিলেন।

দাউদ বা আদমজী পুরস্কারের চেয়ে ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কারের বিষয় ছিল কিছুটা ভিন্ন। প্রতিবছর ২৫ হাজার টাকা পুরস্কারের জন্য বরাদ্দ করা হয়। বাংলা ভাষায় রচিত দুটি গ্রন্থের জন্য পাঁচ হাজার করে দশ হাজার, একইভাবে উর্দু দুটি গ্রন্থের জন্য দশ হাজার এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত একটি বইয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হতো। এই পুরস্কারটিতে বাঙালি লেখকেরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর বাংলা ও উর্দুতে লেখা দুটি গবেষণাগ্রন্থের জন্য দুটো পুরস্কার দেওয়া হতো এবং পাকিস্তানের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো যেতে পারে, এমন বিজ্ঞানবিষয়ক দুটি বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের লেখকদের পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ছিল। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর ইংরেজিতে রচিত একটি বইয়ের লেখককে ন্যাশনাল ব্যাংক পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিত।

সেকালে সমগ্র পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দেওয়া হতো খুবই সম্মান। মমতাজ হাসান, কুদরতুল্লাহ শাহাব প্রমুখের সুপারিশে ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর স্থায়ী চেয়ারম্যান করা হয় পদাধিকারবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে।

লেখক বা প্রকাশককে বই জমা দিতে হতো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট একাডেমিশিয়ানরা ছিলেন বিচারকমণ্ডলীর সদস্য।

ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কারের প্রশ্নে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের ডাক্তার। তার চেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি আমাদের মতো তরুণদের বামসমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন। তাঁর দীক্ষায় আমাদের বহু বন্ধু ষাটের দশকে বাম ধারার রাজনীতিতে এসেছেন। মস্কো-পিকিং দুই ধারার কমিউনিস্টদের সঙ্গেই তার যোগাযোগ ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষার কাজ তিনি করছিলেন। ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. আলীম চৌধুরী প্রমুখ চাইতেন বাংলায় ডাক্তারি পড়বেন আমাদের ছাত্ররা মেডিকেল কলেজগুলোতে। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ হবে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার প্রথম বছরই পান মোহাম্মদ মোর্তুজা। যে বইটির জন্য তিনি পুরস্কার পান তার নাম 'জনসংখ্যা ও সম্পদ'। তাঁর এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আমরা ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। প্রথম বছর আরেকটি ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার দুই ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল ড. এ কে এম আমিনুল হককে তাঁর 'চিল-ময়না-দোয়েল-কোয়েল' বইটির জন্য আড়াই হাজার টাকা এবং অধ্যক্ষ আবুল কাশেমকে তার একটি রসায়নবিষয়ক বইয়ের জন্য আড়াই হাজার টাকা। ১৬ ডিসেম্বরের পর ঢাকায় এসে ফুলার রোডে গিয়ে যখন শুনলাম আলবদর বাহিনী ডা. মোর্তজাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে, বেদনার সীমা ছিল না। অগণিত শহীদের তালিকায় যুক্ত হলো ফজলে রাব্বি, আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাদের নাম।

১৯৬৫-তে ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার পেয়েছিলেন মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার তাঁর 'খগোল পরিচয়' এবং গোলাম আজম সিদ্দিকী তার 'পাকিস্তানের অর্থনীতি' বইয়ের জন্য। এই পুরস্কারটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো এই জন্য যে তা আমাদের বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির দাবি বাস্তবায়নে সহায়ক ছিল। পুরস্কারের কারণে অনেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক বই লেখায় প্রেরণা ও উৎসাহ পেতেন। ১৯৭০ সালে কবীর চৌধুরী একটি অনুবাদ বইয়ের জন্য ন্যাশনাল ব্যাংক পুরস্কার পান।

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মাধ্যমেই প্রতি দুই বছর পরপর 'ইউনেসকো পুরস্কার' দেওয়া হতো। সেটাও দেওয়া হতো বাংলা ও উর্দু বইয়ের লেখককে। প্রতিবছর তিনটি বাংলা বই এবং তিনটি উর্দু বইয়ের লেখকের প্রত্যেকের জন্য ৪০০ ডলারের সমপরিমাণ টাকা বরাদ্দ ছিল। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পরের বছরই এই পুরস্কার চালু হয়। সাধারণ বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সমঝোতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও নাটক-উপন্যাসের মতো সৃষ্টিশীল বইয়ের জন্যও 'ইউনেসকো পুরস্কার' দেওয়া হতো। ইউনেসকো পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকজন কবি-লেখক হলেন জহুরুল হক (সাত সাঁতার), খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন (যুগস্রষ্টা নজরুল), রাজিয়া মাহবুব (খাপছাড়া), আহসান হাবীব (রত্নদ্বীপ), আলাউদ্দিন আল আজাদ (কর্ণফুলী), আবদুল গনি হাজারী (কতিপয় আমলার স্ত্রী), আবদুল গাফফার চৌধুরী (কৃষ্ণপক্ষ), শাহ ফজলুর রহমান (মহাশূন্যে অভিযান) প্রমুখ। ইউনেসকো পুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলোর মধ্যে সাত সাঁতার, যুগস্রষ্টা নজরুল, কর্ণফুলী বাংলা সাহিত্যে টিকে গেছে।

আইয়ুব সরকার আরেকটি পুরস্কার চালু করেছিল। তার নাম 'জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা পুরস্কার'। এই পুরস্কারটিই ছিল বিতর্কিত। নাটক, শিশুসাহিত্য-বিষয়ক বইয়ের লেখকদের এই পুরস্কার দেওয়া হতো। বড়দের নাটকের জন্য দেওয়া হতো তিনটি পুরস্কার। প্রতিটির মান এক হাজার টাকা। সেকালে সেটাও কম টাকা নয়। প্রায় ১০ ভরি সোনার মূল্যের সমান। বড়দের নাটকের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আশকার ইবনে শাইখ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সিকান্দার আবু জাফর, প্রাবন্ধিক আবদুল হক প্রমুখ। মুনীর চৌধুরী নিহত হওয়ার কথা শুনে মমতাজ হাসান গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন বলে তাঁর ভাই শামসেদ চৌধুরীর কাছে শুনেছি।

কিশোর উপযোগী দু'জন জীবনীলেখককে 'জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা পুরস্কার' দেওয়া হতো। একটি পুরস্কারের মান ছিল ৭৫০ টাকা, আরেকটির মান ৫০০ টাকা। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী একটি কবিতার বইয়ের জন্য ছিল একটি এক হাজার টাকার পুরস্কার। ছোটদের জন্য লেখায় পুরস্কার পেয়েছিলেন আহসান হাবীব, ফয়েজ আহমদ, জহুরুল হক, মোহাম্মদ নাসির আলী, কবি আজিজুর রহমান, রাজিয়া মাহবুব প্রমুখ।

এ ছাড়া ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান (পরে যার নামকরণ হয় জাতীয়। গ্রন্থকেন্দ্র) 'বই প্রডাকশন পুরস্কার' প্রবর্তন করেছিল। ১৯৬২ সালে এই পুরস্কার চালু করে। বইয়ের অঙ্গসজ্জার জন্য বড়দের বইয়ের দু'টি (প্রথম ও দ্বিতীয়) এবং শিশু-কিশোরদের বইয়ের জন্য দু'টি পুরস্কার ছিল। সেটা পেতেন প্রকাশকেরা। প্রথম পুরস্কার এক হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০০ টাকা।

প্রচ্ছদশিল্পীদের ন্যাশনাল বুক সেন্টার দু'টি পুরস্কার দিত। প্রতিটির মান ৫০০ টাকা।

পদক পুরস্কারে লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকেরা উপকৃত হয়েছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের বশে রাখা। এবং তারা বশংবদ ছিলেনও, ব্যতিক্রম দু-একজন ছাড়া। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য লেখকদের কলম থেকে কোনো শক্ত লেখা বের হতো না। যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছে এবং বাংলার মানুষ চাইছে স্বায়ত্তশাসন, তখন তারা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের সহায়তা করেননি। তবে হঠাৎ একদিন তারাই পাকিস্তানি শাসকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর। নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর লেখকেরা আইয়ুব সরকারকে গালাগাল শুরু করলেন। শেখ মুজিবের যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া অবধারিত, আইয়ুব-ইয়াহিয়া থেকে পাওয়ার আর কিছুই নেই, তখন ১৯৭১-এর ২৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান লেখক শিল্পী সমাজ'-এর পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শুনেছি সংবর্ধনায় যেতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না, কবি লেখকদের পীড়াপীড়িতে যান।

বাংলাদেশের লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের বঙ্গবন্ধু খুব ভালো চিনতেন। মঞ্চে বসে পরিচিত কবি-সাহিত্যিকদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের ভালো করে দেখে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন:

'জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছিল, তখন একশ্রেণির শিল্পী, সাহিত্যিক-কবি...মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন?'

স্পষ্টভাষী মুজিব সেদিন আরও একটু খোলাসা করে বলেছিলেন: 'যে মৌলিক গণতন্ত্র ও ডিক্টেটরি শাসনের পতন ঘটানোর জন্য বাংলার বীর ছাত্র-জনতা-শ্রমিক বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদের (আইয়ুবদের) গুণকীর্তন করে, প্রবন্ধ লিখে, বেতার কথিকা প্রচার করে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ পয়সা রোজগার করেছেন। বিএনআরের অর্থানুকূল্যে বই প্রকাশ করেছেন।' (দৈনিক পাকিস্তান)

তার ওই বক্তব্যে অনেক কবি লেখকই মাথা নিচু করে থাকেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো তারাই স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানকে গালাগালি করে আওয়ামী লীগ সরকার ও জিয়াউর রহমানের সরকার থেকে পদক পুরস্কার ও সুবিধা নিয়েছেন।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরা এ দেশে তাদের সহযোগী ও তাবেদারদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন এবং সেসব পেয়ে তারা ধন্য হয়েছেন।

ইংরেজদের অধীনতা যারা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের নানাভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিয়েছে একটি শ্রেণিকে ব্যবসাবাণিজ্য ও দালালি করে বিত্তবান হওয়ার সুযোগ।

অকাতরে তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে ভূসম্পত্তি। তারপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন করে বাংলার মানুষকে চিরদিনের জন্য শোষণের শিকারে পরিণত করে। অবশ্য সেই সব অনুগ্রহভাজন বিত্তবানের ছেলেমেয়েরাই কেউ কেউ দু-তিন পুরুষ পরে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এককালের সুবিধাভোগীদের সন্তানদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বহু জমিদার-জোতদারের সন্তানদের আত্মত্যাগ অসামান্য।

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় ব্রিটিশ শাসকদের যারা বিশ্বাসভাজন, তাদের তারা বিভিন্ন খেতাব দিয়ে ভূষিত করতেন। সবচেয়ে বড় সামন্তপ্রভুদের বা জমিদারদের খেতাব দিতেন 'নবাব বাহাদুর' ও 'নবাব' এবং 'মহারাজা' ও 'রাজা'। নবাব বাহাদুর ও নবাব দিতেন মুসলমানদের এবং মহারাজা ও রাজা হিন্দুদের। যেমন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর এবং নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়। তা ছাড়া সরকারের অনুগত বিশিষ্ট ব্যক্তি, জমিদার, সরকারি কর্মকর্তারা পেতেন 'খান বাহাদুর'/ 'রায় বাহাদুর' এবং 'খান সাহেব' / 'রায় সাহেব। খান সাহেব ও রায় সাহেব ছিল সবচেয়ে ছোট খেতাব। মাসে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় ছিল অথচ সমাজে যারা সম্মানিত, তাঁদের মধ্যে হিন্দুরা পেতেন রায় সাহেব এবং মুসলমানরা পেতেন খান সাহেব খেতাব। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে বহু খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর এবং খান সাহেব ও রায় সাহেব ছিলেন। খেতাবধারীদের সাধারণ মানুষও সম্মান দিতেন। বহু কবি-সাহিত্যিক খেতাব পেয়েছেন।

সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান শুধু পদক-পুরস্কারই প্রবর্তন করেননি, তিনি ব্রিটিশ শাসকদের মতো চালু করেন খেতাব। সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এবং সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে, এমন শিল্পীসাহিত্যিক ও সমাজসেবীদের তিনি ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ওই খেতাব দিয়ে ভূষিত করতেন। অনুগত ও বিশ্বস্ত সরকারি, আধা-সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ভূষিত করা হতো খেতাবে।

আইয়ুব-প্রবর্তিত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ খেতাব ছিল 'হিলাল-ই-পাকিস্তান', তারপর 'হিলাল-ই কায়েদে আজম', 'সিতারা-ই পাকিস্তান', 'সিতারা-ই-সুজাত', 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ', 'সিতারা-ই খিদমত', 'তমঘা-এ-ইমতিয়াজ', 'তমঘা-ই-কায়েদে আজম' প্রভৃতি। খেতাবপ্রাপ্তরা নামের শেষে সংক্ষেপে খেতাব লিখতে পারতেন এবং লিখতেনও। যেমন সৈয়দ মুর্তজা আলী এবং কবি ও আমলা সানাউল হক পেয়েছিলেন 'সিতারাই-কায়েদে আজম'। তিনি তার প্যাডে লিখতেন সানাউল হক এসকিউএ অথবা ইংরেজিতে S.Q.A।

আমার মনে আছে, খেতাব পাওয়ার পর সানাউল হক আমাকে বলেছিলেন, 'জানো, এই উপাধি ব্রিটিশ আমলের "স্যার" উপাধির সমান।' তাঁর একটি বন্ধুচক্র ছিল। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, এ কে এম আহসান, সৈয়দ নাজিমুদ্দিন হাশেম প্রমুখ। তাঁকে জানতাম বাঙালি জাতীয়তাবাদী বলে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় তেমনটি মনে হতো। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ি আখাউড়ার কাছে চাওড়ায় আমাকে নিয়ে গেছেন। পুকুরের মাছ ও বাঙালির নানা রকম পিঠা খাইয়েছেন। তাঁর প্রয়াত বড় ভাইয়ের নামে বাড়িতে 'কায়সার স্মৃতি অধ্যয়ন সমিতি গ্রন্থাগার' নামে একটি ছোট পাঠাগার ছিল।

সুদক্ষ গোয়েন্দাদের রিপোর্টে পাকিস্তান সরকারের বিশ্বাসভাজন না হলে কারও পক্ষে আইয়ুবের খেতাব পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতার পরে সানাউল হককে অত্যন্ত বেশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী বলে মনে হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের তিনি ছিলেন খুবই একজন ভক্ত। সে জন্য তিনি ভালো পোস্টিং পেয়েছেন। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতার জন্যই সচিব হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ অনুরাগী হওয়ায় বঙ্গবন্ধু তাঁকে রাষ্ট্রদূত করে ব্রাসেলস পাঠান। একই সঙ্গে তিনি বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতও ছিলেন।

যেদিন তিনি ব্রাসেলস যাওয়ার জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন, আমি তাঁকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাই। কিছুদিন পরেই আসে ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা ও কূটনীতিক হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর কাছে শুনেছি, পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে সানাউল হকের অস্বাভাবিক আচরণ। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ওই রাতে সানাউল হকের বাসভবনে ছিলেন। সকালে ক্ষমতাবদলের কথা শুনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের চেহারা মুহূর্তে বদলে যায়। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার সঙ্গে তিনি যে আচরণ করেন, তা ছিল একজন কাপুরুষ ও অতি সুবিধাবাদীর মতো। তাই একেক সময় মনে হয়, বাঙালি কখন কী বিশ্বাস করে আর না করে, তা বিধাতার পক্ষেও আঁচ করা কঠিন।

মনে আছে, 'হিলাল-ই-পাকিস্তান' খেতাব যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিচারপতি কর্নেলিয়াস, আবদুল জব্বার খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রমুখ ছিলেন। 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' পেয়েছিলেন নাট্যকার নুরুল মোমেন, সাংবাদিক-লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। লেখকদের মধ্যে 'তমঘাই-ইমতিয়াজ' পেয়েছিলেন শাহেদ আলী, আকবরউদ্দিন, আবু রুশদ, গোলাম মোস্তফা, তালিম হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ এবং চিত্রশিল্পী শফিকুল আমিন। বাঙালি অফিসারদের মধ্যে 'তমঘা-ই-কায়েদে আজম' খেতাব পান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার পরিচালক ও কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। 'তমঘা-ই পাকিস্তান' পান তৎকালীন কেবিনেট ডিভিশনের উপসচিব আবুল মাল আবদুল মুহিত, আরেক সিএসপি অফিসার ফজলুর রহমান খান প্রমুখ। 'তমঘা-ই-খিদমত' পেয়েছিলেন অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের আবু সাঈদ হাফিজুল্লাহ, সিএসপি অফিসার পি এ নাজির প্রমুখ।

আমাদের এক ঘনিষ্ঠজন শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার জিয়াউল হক পেয়েছিলেন 'তমঘা-ই-খিদমত'। এটি ছোট খেতাব। তাকে অভিনন্দন

জানাতে তার কমলাপুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি, আবু জাফর শামসুদ্দিন ও শওকত ওসমান। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। আমাদের অভিনন্দনে বিব্রত হলেন। চুপ করে বসে রইলেন। সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে নয়, সম্ভবত পেয়েছিলেন খেতাবটি, কারণ তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও পরিশ্রমী অফিসার। অফিসের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ছয়-দফা'র ঘোরতর সমর্থক।

ষাটের দশকে পদক-পুরস্কার-খেতাব যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা কেউই কোনো অযোগ্য ব্যক্তি নন। তাঁদের প্রত্যেকেরই কমবেশি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ রয়েছে। মধ্যবিত্তরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিছু প্রত্যাশা করেন। সেই চাওয়াতে এবং পাওয়াতে দোষও নেই। তবে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের পরিবর্তন প্রশংসার কাজ নয়।

একাত্তরের মার্চে স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর বাংলার মানুষ যখন পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করে রাজপথে নেমে আসে, তখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁদের খেতাব বর্জন করেন। কিন্তু সেটা খুব বেশি দেরিতে। ব্রিটিশরা যে খেতাব দিত, তা ইংরেজি শব্দে নয়, বাংলা ও বাঙালির চেনা বা বোধগম্য শব্দে, যেমন খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খান সাহেব, রায় সাহেব। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকেরা যে খেতাব প্রবর্তন করেন, সেসব শব্দের অর্থ আজও অনেকেরই অজানা। অনেকেই বলতে পারবেন না কী অর্থ বহন করে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' কিংবা 'সেতারা-ই-সুজাত' বা 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' শব্দগুলো।

পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা ছিল বাংলা ও উর্দু। সে জন্য সরকারি যেকোনো ব্যাপারে দুটি ভাষার ব্যবহারই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই খেতাবগুলোর কোনোটিই বাংলা ভাষায় নয়। আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদদের বিষয়টির প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। তারা তা করেননি। বিজাতীয় ভাষায় দেওয়া খেতাব গভীর আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং তা সগৌরবে ব্যবহার করতেন।

কৃতী ব্যক্তিদের কাজের স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত নয়। পদক-পুরস্কারে মানুষের মর্যাদা কতটুকু বাড়ে তার চেয়ে বড় কথা, আমাদের মতো গরিব দেশে তারা আর্থিকভাবে কিছুটা উপকৃত হন। পশ্চিম পাকিস্তানি চিত্রশিল্পী জোবায়দা আগা এবং আমাদের কামরুল হাসান একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের পদক পান দশ হাজার টাকা করে। উভয়েই গুণী শিল্পী। পুরস্কার পাওয়ার পর কামরুল হাসান, তিনি তখন আইয়ুব প্রতিষ্ঠিত ডিজাইন সেন্টারের চিফ ডিজাইনার, তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন:

'শিল্প-সাহিত্যের এই ধরনের পুরস্কার নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। এতে ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিল্পীকে মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। বরং শিল্পীর সাধনার এবং শিল্পীর রং ও তুলির মাধ্যমে যে পরিবেশ ও সমাজের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাকেই এই পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।'

নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালন করে যদি কেউ পদক পুরস্কার খেতাব পান, তা নিয়ে তাঁরা গর্ব করতেই পারেন। আবুল মাল আবদুল মুহিত 'তমঘাই-পাকিস্তান' (টিপিকে) পেয়েছিলেন তাঁর যোগ্যতায়; বাংলাদেশের যখন তিনি অর্থমন্ত্রী, তখনো 'স্বাধীনতা পুরস্কার' তিনি পেয়ে থাকবেন তার যোগ্যতার জন্য। তবে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নিজের পুরস্কার নেওয়া শোভন নয়৷"[১৫২]

০৩.

"...পাকিস্তান আমলে ষাট দশকে যখন এদেশে টিভি কেন্দ্র স্হাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয় তখন এদেশীয় কতিপয় বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিসেবী ও রাজনৈতিক নেতা এর বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতা করেন। তখন বলা হয়েছিল সামরিক শাসক আইয়ুব খান তাঁর ব্যক্তি ভাবমূর্তি গড়ে তোলা এবং সামরিক সরকারকে অসামরিক রূপ দেয়ার প্রয়াসে এই টিভি কেন্দ্র চালু করেছেন। ঢাকায় টিভি কেন্দ্র স্থাপন সম্পূর্ণভাবে আইয়ুব খানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এসব বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে আইয়ুব খান প্রথমে এক বিখ্যাত ইউরোপীয় কোম্পানীকে এ দেশে টেলিভিশন কেন্দ্র নির্মাণের অনুরোধ জানান। কিন্তু ঐ ইউরোপীয় কোম্পানী সম্ভাব্যতা পরীক্ষার পর নেতিবাচক জবাব দেয়ায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এ দেশে টেলিভিশন সম্প্রচারকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে জাপানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ঢাকার ডিআইটিতে টিভি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যখন ঢাকায় টিভি কেন্দ্র চালু হয়ে যায় তখন বিরোধিতাকারী রবীন্দ্রভক্তরা এটাকে কব্জা করার জন্যে দলে দলে টিভির চাকুরিতে ঢুকে যায়। শোনা যায়, অনুষ্ঠান পরিচালক পদে প্রথমে নিয়োগ পান একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। পরবর্তীতে তিনি অনেক রবীন্দ্রভক্তকে আকর্ষণীয় পদ এবং লোভনীয় বেতনে বিভিন্ন বিভাগে সরকারী চাকরিরত রবীন্দ্রভক্তদের ছাড়িয়ে এনে ঢাকার টিভি কেন্দ্রে জড়ো করে। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি যখন যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ হয়ে যায় তখন পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রচার শুরু করা হয় দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি' গানটির মাধ্যমে।

প্রায় নব্বই দিন পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের পর ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় তখন পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী জনসভা ছিল। এই জনসভায় অনেক বিরোধী দলীয় নেতা টিভি কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সে সভায় একজন শ্রোতা হিসাবে আমিও উপস্থিত ছিলাম। কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে সেদিন ঢাকা টিভি কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। সেই উদ্বোধনের দিনও নজরুল সঙ্গীত থাকে উপেক্ষিত। দ্বিতীয় দিনেও রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্প্রচার করা হয়। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সংকলনে জামিল চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেন:

---

[১৫২] সৈয়দ আবুল মকসুদ / বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রম ও বিশ্বাসহীনতা ৷ [ডেইলি স্টার বুকস - ২০১৯ । পৃঃ : ৮৮-৯৭ /৯৮-১০৭ /১০৮-১১৯]

'দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান সাফল্য ছিল নৃত্যসঙ্গীতসম্বলিত পঁচিশ মিনিটের একটি স্টুডিও প্রযোজনা। ছায়ানট উপস্থাপিত এই অনুষ্ঠানটি এই কেন্দ্র থেকে অদ্যাবধি প্রচারিত সকল সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে অনায়াসে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। মূলত রবীন্দ্র সঙ্গীত ও তার রূপায়ণমূলক নৃত্যযোগে গ্রথিত এই অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন সনজিদা খাতুন, জাহিদুর রহিম, ফাহমিদা খাতুন, সেলিনা কাইউম ও মন্দিরা নন্দী। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন মনিরুল আলম। অনুরূপ মানের অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য তিনি ছায়ানটের উপর চাপ অব্যাহত রাখেন। ফলস্বরূপ কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধ্যাকালীন কয়েকটি রাগের উপর ছায়ানট একটি অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।'

উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে আমাদের দেশের রবীন্দ্রভক্তরা রবীন্দ্রনাথের গানকে এ দেশে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করতে টিভি'র কতই না প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অথচ নজরুল সঙ্গীতকে নিয়ে সে প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ দেখা যায়নি। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মাঝে নজরুল বিষয়ে যথেষ্ট এলার্জি ছিল। এক সময় আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু গত ৩৪ বছরের রাজনৈতিক প্রচার-অপ্রচার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিলকে তাল করে প্রচার করা হয়েছে। এখনো হচ্ছে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনেই যদি তৎকালে টিভি স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে রবীন্দ্রভক্তের সেখানে নিয়োগের সুযোগ হয় কিভাবে? আইয়ুব খানের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যদি টিভি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এখনকার মতো নগ্নভাবে সেদিন টিভিকে দলীয়করণ করা হয়নি কেন? সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই যদি টিভি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সম্প্রচার শুরু হয় কিভাবে?

... অথচ এটাকে নিয়ে মিথ্যাচারের শেষ নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাদের মিথ্যাচারের একটা পরিমাপ করা যাবে। কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এদের অসংখ্য মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক জবাব হতে পারে। জামিল চৌধুরী রামপুরায় টিভি স্থান ক্রয় ও নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন:

'রামপুরায় স্থায়ী টেলিভিশন ভবন নির্মাণের জন্য কনসোশিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করে সুইডেনের অধ্যাপক পিটার সেলসিংকে ভবন পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হল। সেলসিং-এর নেতৃত্বে তারই কৃতী ছাত্র মাহবুব-উল হক (বর্তমানে বাংলাদেশ কনসালট্যান্টস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক) ভবন পরিকল্পনার বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও খুঁটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত করেন। এ প্রসঙ্গে কনসোশিয়েটস-এর পরিচালক ও নবীন প্রকৌশলী কে, জি, রাব্বানীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১লা বৈশাখ ১৩৭৫ (১৪ এপ্রিল ১৯৬৮) তারিখে রামপুরায় টেলিভিশন ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। রামপুরায় নির্মিত ভবনের রুচিসম্মত অন্তরসজ্জার জন্য আমার পরামর্শে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন-এর নেতৃত্বে একটি অন্তরশোভা কমিটি গঠন করা হল। টেলিভিশন ভবনের প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন খোলা চত্বরে ৩০ ফুট উঁচু একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য স্থাপনের সুপারিশ করা হল। বাঙালি শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতীকরূপে ভাস্কর্যটি হবে নটরাজের অনুকরণে নির্মিত একটি নৃত্যপরা নারীর। প্রস্তাবটিতে রাওয়ালপিন্ডি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও পাওয়া গেল। সমস্যা দেখা দিল এই বিরাট আয়তনের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটি ঢালাই করা নিয়ে।'

অথচ এই জায়গা কেনা ও ভবন নির্মাণের ইতিহাসও আজ হাইজ্যাক হয়ে গেছে। টিভি ভবনে ভাস্কর্য স্থাপনের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মিথ্যাচার থেকে আইয়ুব খান রক্ষা পাননি।

১৯৬৪ সালের ২৭ আগস্ট তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান থেকে একটি চিলড্রেন্স অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। সেদিন উপস্থাপক অনুষ্ঠান ঘোষণা

করে বলেছিলেন-'এখন যে গানটি পরিবেশিত হবে তা Greatest poet of Bengali litearature কাজী নজরুল ইসলাম-এর।' পরদিন একটি জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকের শেষের পাতা 'পাগলে কি-না বলে' শিরোনামে লিখেন-'যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, জীবনানন্দ রয়েছে সে ভাষায় Greatest কবি কি-না নজরুল।' নজরুলের প্রতি এ ধরণের মানসিকতা আজও দূর হয়নি॥"[১৫৩]

০৪.

"... আমাদের পরিবারে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি না থাকলেও অন্য অনেক পরিবারের মতই তারা একভাবে ধর্মচর্চা করতেন, যদিও অনেকেই ধর্মচর্চা বলে কিছু করতেন না। আমাদের বাড়ীতেও আব্বা তত্ত্বগতভাবে ধর্মীয় প্রভাবের অধীন থাকলেও নামাজ রোজা ইত্যাদির ব্যাপার ছিল না। আব্বা আম্মা কেউই নিয়মিত নামাজ পড়তেন না এবং রোজার সময় তিরিশ রোজা রাখার ব্যাপার ছিল না। কোরবানী দেওয়াও হতো না নিয়ম করে। আব্বার ধর্মচর্চার মূল দিক ছিলো আনুষ্ঠানিকতার বাইরে, তত্ত্বচর্চার মধ্যে। সমাজ জীবন সাধারণভাবে ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আইন অনুযায়ী গঠন করা দরকার এটাই ছিল তার ধর্মচিন্তার মর্মবস্তু ও ধর্ম জীবনের মূল দিক।

... ছুটিতে ঢাকায় থাকার সময় ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসের দিকে প্রেসিডেন্ট আইউব খান ঢাকা এলেন। তিনি ঢাকা এলে আব্বার সাথে দেখা করতেন। এবারও তার সাথে প্রেসিডেন্ট হাউসে একদিন সকালের দিকে সাক্ষাতের সময় ঠিক হলো। আব্বা বললেন তোমার সম্পর্কে মোনায়েম খান আইউব খানকে অনেক কথা বলেন। তিনি কয়েকবারই বলেছেন একবার তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে। এখন তুমি যখন ঢাকাতে আছো, আমার সাথে চলো। তার সাথে সব সময় একজনকে তো যেতে হতোই (অন্ধত্বের কারণে)। আমি রাজী হলাম।

যথাসময়ে প্রেসিডেন্ট হাউসে আমরা গেলাম। অপেক্ষার ঘরে বসে তাকে আমাদের আসার খবর দেওয়া হলো। একটু পরই দেখলাম আইউব খান নিজেই বাইরের ঘরে এসে আব্বার হাত ধরে বারান্দা দিয়ে বসার জায়গার দিকে যেতে থাকলেন। বারান্দার শেষ প্রান্তে ছিল বসার একটা ব্যবস্থা। আমরা বারান্দার মাঝামাঝি পৌঁছানোর পরই দেখলাম ফকির আবদুল মান্নান প্রায় দৌড়তে দৌড়তে পেছন থেকে এসে আইউব খানের হাত থেকে আব্বাকে নিয়ে নিজেই বসার জায়গা পর্যন্ত এলেন। আইউব খান তাকে বললেন, আব্বার সাথে এখন কথা বলবেন। কাজেই মান্নান সাহেব চলে গেলেন। তিনি (মান্নান) তখন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

আব্বা আইউব খানকে আমার পরিচয় দিতে তিনি বসতে বললেন। আমার মনে আছে, তার হাতে এক পরিচিত আমেরিকান লেখকের বই দেখে বললাম তিনি তো পাকিস্তানের ওপর একজন এক্সপার্ট। আইউব খান একটু উষ্মার সাথে বললেন, Every American is an expert. তার কথা শুনে মনে হলো, তিনি মার্কিন সরকারের একজন অনুগত লোক হলেও তাদের থেকে এমন কিছু ব্যবহার পেয়ে থাকেন বা লক্ষ্য করেছেন যাতে তাদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ তার মধ্যে আছে। একেবারে পাচাটা লোক না হলে অন্য ডিক্টেটরদের মনেও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মনে হয় এ ধরণের ক্ষভ থাকে। কারণ নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের চাপে কিছু করা কোন সুখকর ব্যাপার নয়।

... আইউব খানের সাথে আব্বার একটা সুসম্পর্ক ১৯৫৯ সালের দিকেই হয়েছিল। ঢাকায় প্রথম যখন তাদের সাক্ষাৎ হয় তখন সাক্ষাতের সময় ছিল আধ ঘন্টার মত। কিন্তু আইউব খান তার সাথে কথা বললেন আড়াই ঘন্টার মত। এ সময় আব্বা ঢাকায় ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা তাকে বলেছিলেন। আইউব খান সেটা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আব্বাকে কাউন্সিল মুসলিম লীগের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বলেন।

---

[১৫৩] সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ / ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত ॥ [বিসিবিএস - জুলাই, ১৯৯৮ । পৃ: ৪৩৭-৪৪৩]

এ ব্যাপারে আব্বার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আইউব খানের কথা তিনি ফেলতে পারেননি। এ নিয়ে তার সাথে আমার মাঝে মাঝেই তিক্ত কথাবার্তা হতো। কিন্তু তিনি বলতেন, আইউব খানই একমাত্র উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি যিনি ১৯৫০ সালে পাকিস্তানে আসার পর তার প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী অনেক রাজনৈতিক শিষ্য পর্যন্ত করেননি। আইউব খান যে তার প্রতি যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যবহার করতেন এটা তার সাথে উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের সময়েই দেখেছিলাম। সেটা না হলে তিনি নিজে বাইরের ঘরে এসে তাকে ঐভাবে নিয়ে যেতেন না। ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠার কথা বললেও আব্বা তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা বাড়ি-ঘর সম্পত্তি বানানোর তদ্বির কখনো করেননি। মৃত্যুর সময় তার থেকে আমরা কোন সম্পত্তিই পাইনি। বস্তুতপক্ষে নিঃস্ব অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছিল। অন্যেরা যেখানে টাকা-পয়সা বানাতে ব্যস্ত ছিলো, সেখানে আব্বা যে তার ধারে কাছেও যাননি, এটা আইউব খানও দেখেছিলেন। যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগের দায়িত্ব তার ওপর থাকলেও সে কাজ তিনি লঘুভাবেই নিয়েছিলেন। তেমন কোন সাংগঠনিক কাজই তিনি করেননি।

তার প্রতি আইউব খানের মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের কারণে তিনি আইউবের প্রতি দূর্বল ছিলেন। আইউব খান থাকলে ইয়াহিয়ার মত কান্ড তিনি ১৯৭১ সালে করতেন না, এটাও তিনি মনে করতেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনী যা করেছিল তিনি তার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। শত চেষ্টা করেও তখনকার সামরিক বাহিনী তাকে কোনভাবেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। আগে তিনি রেডিও টেলিভিশনে মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম করতেন। কিন্তু টিক্কা খানের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি একদিনের জন্যও রেডিও টেলিভিশনে যাননি, অনেক ‘প্রগতিশীল’ ব্যক্তির মত পাকিস্তানের পক্ষে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন বিবৃতিও দেননি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর Arabic Made Easy নামে আরবী ভাষা শিক্ষার যে বইটি তিনি লিখেছিলেন সেটি উৎসর্গ করেছিলেন আইউব খানের নামে। সে সময় আইউব খানের থেকে তার পাওয়ার কিছুই ছিল না॥”[১৫৪]

০৫.

“... ১৯৫৯ সালের ৩১ জানুয়ারি তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের প্রেরণায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক এই (পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড বা পাকিস্তান লেখক সংঘ) সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাসচিব কুদরতুল্লাহ শাহাব ছিলেন এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক। উর্দু ও বাংলা ভাষার ১১ জন করে, পাঞ্জাবী, পশতু, সিন্ধী প্রত্যেকটি ভাষার ১ জন করে মোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কার্যকরী কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত সদস্য ছিলেন, তারা হচ্ছেন - প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদ্দীন, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, কবি আবদুল কাদির, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আজরফ, আসকার ইবনে শাইখ, কবি আবুল হোসেন, মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্। সংঘের প্রাথমিক তহবিল গড়ে উঠেছিল সরকার কর্তৃক বিনাসুদে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের মুখপত্র হিসেবে ‘পূরবী’ নামে ত্রৈমাসিক একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর ‘লেখক সংঘ পত্রিকা’ নামে এর নতুন নামকরণ হয়। মাসিকে রূপান্তরিত পত্রিকাটির কিছুকাল একক সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা। পরে গোলাম মোস্তফা ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করলে মুখপত্রটি ‘পরিক্রম’ নামে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়॥”[১৫৫]

---

[১৫৪] বদরুদ্দীন উমর / আমার জীবন (দ্বিতীয় খন্ড) ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ । পৃ: ২৫১-২৫৩]

[১৫৫] ড. মো: আবুল কাসেম / বাংলা সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনা : ১৯৪০-'৭০ (অভিসন্দর্ভ) ॥ [আহমদ পাবলিশিং - ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ । পৃ: ৩১]

০৬.

"... রাইটার্স গিল্ড যখন হয় তখন অনেকেই একে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, বিশেষত বামপন্থিরা, কেউ কেউ আড়চোখে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল ডান, বাম, মাঝামাঝি, যারা এদিক-ওদিক কোনোদিকেই নয়, তারা সবাই এসে ভিড় করছেন। যেন একটা দারুন লাভের ব্যবসা। সবাই ভাগ চান। ব্যাপারটা ঘটেছিল গিল্ডের পূর্ব পাকিস্তান শাখায়, যাকে বলা হতো 'লেখক সংঘ'। কেন্দ্রে এ রকম কিছু দেখিনি।

... প্রাদেশিক গিল্ডের প্রথম নির্বাচনে সম্পাদক পদের প্রার্থী হয়ে মুনীর চৌধুরী হেরে যান, যত দূর মনে পড়ে মতিন উদ্দিন আহমদের কাছে। কেন্দ্রীয় গিল্ডের প্রথম নির্বাহী পরিষদের কার্যকাল শেষ হলে আমি আর সদস্য হতে চাইনি। তখন বিদেশে এক আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমার নিয়োগ স্থির হয়ে গেছে। এমনি সময়ে এক সকালে তার ছাত্র ও কনিষ্ঠ সহকর্মীকে নিয়ে মুনীর চৌধুরী এলেন আমার বাসায়। তিনি কেন্দ্রীয় গিল্ডের নির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে চান। আমি কি তার নাম প্রস্তাব করতে পারি? আমি সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত ফর্মে সই করে দিলাম। মুনীর নির্বাচিত হয়েছিলেন কিনা জানি না। আমি তখন বিদেশে। যখন দেশে ফিরলাম তখন আইয়ুব খান আর প্রেসিডেন্ট নেই। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডও শেষ॥"[১৫৬]

০৭.

"... আমার লাহোর অভিজ্ঞতা আরও পূর্বের, তবে কবেকার, আমি এখন ভুলে গেছি। ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন আমার লাহোর যাত্রার উপলক্ষ্য তৈরি করে থাকবে।

... ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন মূলতঃ পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীদের নিয়েই গড়েছিল। পাকিস্তানের একত্ব ও অখন্ডত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল এই মহলকে স্বমতে দীক্ষিত করা। সে চেষ্টা খুব সফল হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে ষাটের দশকের শেষ দিকে ব্যুরোর বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে শুরু করেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা। ব্যুরোর পক্ষ থেকে ড. হাসান জামান এর জবাব দিয়েছিলেন। যারা ব্যুরোর অর্থানুকুল্য ভোগ করেছেন তাদের তালিকা তিনি প্রকাশ করে দেন। এটা ওই সময়ে আমাদের অনেক বরেণ্য লেখক-বুদ্ধিজীবীর জন্য বিব্রতকর হয়েছিল। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যে সবাই ধোয়া তুলসীপাতা নন, কথাটা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ড. হাসান জামান ছিলেন একনিষ্ঠ পাকিস্তানি, যেমন ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। এদের চরিত্রে ছিল একধরণের অখন্ডতা ও শুদ্ধতা, যা বিপরীত মতাবলম্বী হলেও আমার শ্রদ্ধা আদায় করে। বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই সুবিধাবাদী বৈপরীত্য দেখা গিয়েছে। তাদের সঙ্গে আমার মতের মিল থাকতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকের চারিত্রিক সততা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন আছে॥"[১৫৭]

০৮.

"... বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থক বুদ্ধিজীবিদের সংখ্যাই সব থেকে বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ১৯৭০ সালের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত তৎকালীন বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের বিপুল অধিকাংশই ছিলেন আওয়ামী লীগের আওতার বাইরে। আওয়ামী লীগের অশিক্ষিত নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিলো না। শুধু তাই নয়, বর্তমানে যে সব বুদ্ধিজীবি আওয়ামী সমর্থক পান্ডা ব্যক্তি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আন্দোলনে সব থেকে বেশি লম্ফ ঝম্ফ করেছে তারাই ছিলো ১৯৭১-এর আগে পর্যন্ত পাকিস্তানী তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যুরো অব ন্যাশনাল রি-কনস্ট্রাকশন (Bureau of National Reconstruction)

---

[১৫৬] আবুল হোসেন (কবি) / আর এক ভুবন ॥ [অবসর - ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ । পৃ: ১২৪-১২৫]

[১৫৭] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী / আমার চলার পথে ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - জুন, ২০১২ । পৃ: ১৫৮-১৫৯]

বা BNR ও লেখক সংঘ (Writers Guild)-এর পূর্ব পাকিস্তানী সংগঠক ও কর্তাব্যক্তি ও সেই হিসেবে আর্থিক সুবিধাসহ অন্য অনেক সুবিধাভোগী। তাদের এই কীর্তির কারণে তাদেরকে খুব সঠিক অর্থেই ১৯৭১-এর পূর্ববর্তী 'সাংস্কৃতিক রাজাকার' হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। যেহেতু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের এই অংশ লুমপেন চরিত্রসম্পন্ন সে কারণে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে, ওপরে উল্লিখিত এই সাংস্কৃতিক রাজাকাররাই বর্তমানে আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবি হিসেবে সব থেকে অস্থির ও সোচ্চার গণতন্ত্রী॥"[১৫৮]

০৯.

"... যারা এখনও জীবিত আছেন তারা হচ্ছেন কবীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, শামসুর রহমান প্রমুখ। এরা প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সজাগ প্রক্রিয়ায় আইয়ুবের গণতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। সে সময় কিছু পুঁজিবাদী ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে কয়েকটি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল। যেমন আদমজী পুরস্কার এবং দাউদ পুরস্কার। সকলেই এ সমস্ত পুরস্কার পাওয়ার জন্য লোলুপ ছিলেন। বোধ হয় তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে, সব পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তৎকালীন সময় আমার কি মানসিকতা ছিল তা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারি। আমি বিশ্বাস করতাম, যিনি যথার্থ লেখক তিনি নিজেকে বিক্রয় করতে পারেন না। এবং যিনি যথার্থ গণতান্ত্রিক তিনি স্বৈরতান্ত্রিক নায়কের আজ্ঞাবহ দাস হতে পারেন না। আমাদের দূর্ভাগ্যক্রমে যে সমস্ত লেখক এ দাসত্ব গ্রহণ করেছিলেন জনতা থেকে ছিন্নমূল এ সমস্ত লেখক আজও প্রতাপ প্রকাশ করে চলেছেন নিজেদের অপরাধকে ঢাকার জন্য এবং অশ্লীলতাকে আড়াল করবার জন্য। কবীর চৌধুরী ঢাকায় বিএনআর-এর যে অফিস তার ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে এই পদে তিনি আসেন সেই সময়। সুতরাং বিএনআর-এর কর্মকান্ড তখন যা তৈরি হয়েছিল সেই কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব কবীর চৌধুরীকে নিশ্চয়ই নিতে হবে।

... মৌলিক গণতন্ত্রকে প্রচার করার জন্য আইয়ুব ভাড়াটে লেখক তৈরি করলেন অনেকগুলো। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকগুলো এবং বাংলাদেশের অনেকগুলো। বাংলাদেশে যারা এই লেখার মধ্যে যুক্ত হলেন তারা হচ্ছেন - গোলাম মোস্তফা, নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান এবং তারপরে আরও, আরও, আরও অনেক। বেসিক ডেমোক্রেসির উপর শওকত ওসমানের গল্প আছে। গোলাম মোস্তফার কবিতা আছে। নুরুল মোমেনের নাট্যাংশ আছে - ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরা মহা আনন্দে এই কাজগুলো করেছেন। এরা কোন বিচার-বিবেচনা করেননি। আনন্দটা কিসের? টাকা পাচ্ছেন সেজন্য। ওরা ভাল টাকা দিয়েছিল।

... পাক-জমহুরিয়াত বলে একটা ট্রেনের নাম দিয়েছিলেন তিনি (আইয়ুব)। পাক-জমহুরিয়াত করাচি থেকে যাত্রা আরম্ভ হয়। সিন্ধের মধ্য দিয়ে যেয়ে একেবারে ফ্রন্টিয়ার পেশাওয়ার টেঁশোয়ার ঘুরে আসে। দশ পনের দিনের সফর। সেই সফর সঙ্গী ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক লেখক। পূর্ব পাকিস্তানের যারা ছিলেন তাদের আমি জানি। শওকত ওসমান ছিলেন, মুনীর চৌধুরী ছিলেন, তার পরে গোলাম মোস্তফা ছিলেন, নুরুল মোমেন ছিলেন, জসিম উদ্দিন ছিলেন, এরকম আরো অনেকে, আরো ৪/৫ জন এবং ঐ গল্পগুলো সবাই জানে॥"[১৫৯]

---

[১৫৮] বদরুদ্দীন উমর / নির্বাচিত প্রবন্ধ ॥ [অন্যপ্রকাশ - ফেব্রুয়ারী, ২০০০ । পৃঃ ৮৯]

[১৫৯] সৈয়দ আলী আহসান / মনীষার মুখ ॥ [সম্পাদনাঃ আবদুল হাই শিকদার। ঝিঙেফুল - ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ । পৃঃ ২২-২৪]

১০.

"... আইয়ুবী শাসনামলে পাকিস্তান লেখক সংঘের সাথে আমরা যে যুক্ত হয়েছিলাম তার বুঝি একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কাজটা ঠিক হয়েছিল কি না সে নিয়ে তখনও প্রশ্ন উঠেছে। পরে প্রশ্ন উঠেছে আরো জোরেশোরে। আমার নিজের দিক থেকে ব্যাপারটা ঘটেছিল এভাবে। লেখক সংঘ সরকারি টাকায় চলে, তার উদ্দেশ্য লেখকদের ওপর পুঁজিবাদের পথ ধরে অগ্রসরমান রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা - এসব তো জানা ছিলই, কিন্তু আমার চিন্তা ছিল এই রকমের যে, প্রতিষ্ঠানটির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ওপর যদি আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে প্রথমত আমাদের হাতে একটা পত্রিকা আসবে, দ্বিতীয়ত আমরা বসবার এবং অনুষ্ঠানাদি করার জন্য একটা জায়গা পাবো - যে দু'টির কোনোটিই তখন আমাদের আয়ত্তে ছিল না, এবং আসবে যে তার সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। সর্বোপরি আমরা তো সরকারের দালালি করবো না, বরঞ্চ যারা করতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করবো এবং এবং যতদূর পারা যায় প্রতিষ্ঠানটিকে কাজে লাগাব পূর্ববঙ্গের পক্ষে বলবার জন্য। সেটা আমরা করেছিও। বাংলা হরফের সংস্কার আনবার জন্য একটা সরকারি উদ্যোগ তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, লেখক সংঘ থেকে আমরা তার বিপক্ষে আলোচনা সভা করেছি, এবং 'পরিক্রম'-এ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। আরো পরে হাসান হাফিজুর রহমান যখন লেখক সংঘের সম্পাদক তখন তিনি খুব বড় আকারে মহাকবি স্মরণোৎসব নামে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল ও নজরুলের ওপর পর পর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, যেখানে সাহিত্যবিচারের নিরিখটা ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। উল্লেখ্য যে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন এবং নজরুলকে সংশোধনের সরকারি উদ্যোগ বিপজ্জনকভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এটা কোন আত্মপক্ষ সমর্থন নয়। লেখক সংঘের কাজে তখন কবি জসীমউদদীন থেকে শুরু করে কাজী মোতাহার হোসেন, মুনীর চৌধুরী, আবদুল গণি হাজারী, খান সারওয়ার মুরশিদ, আসকার ইবনে শাইখ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরসহ আমরা অনেকেই যুক্ত হয়েছিলাম। আমাদের জন্য বিকল্প কোনো সংগঠন গড়া সম্ভব ছিল না। যেটা পরবর্তীকালে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা গড়ে তুলেছিলাম্, লেখক সংগ্রাম শিবির নাম দিয়ে এবং যার কার্যালয় হিসেবে লেখক সংঘের অফিসকেই ব্যবহার করা হয়েছিল, অফিসটি ততদিনে স্থানান্তরিত হয়েছিল পুরানা পল্টনে। লেখক সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে আমরা করাচী ও লাহোরে গেছি, এবং সেখানে কুদরতুল্লাহ শাহাব, জমিলুদ্দীন আলী, ইবনে ইনশা, কাতিল শিপাই - এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এরা সবাই প্রগতিশীল ধারার লেখক ছিলেন।

... আদমজী, বাওয়ানী এরা ছিলেন শিল্পপতি। বোধ করি জাতীয় বুর্জোয়া হবার একটা অস্পষ্ট আকাঙ্খা তাদের ছিল। পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু শিল্পকারখানা ততদিনে তারা স্থাপন করেছেন, এবং লেখক সংঘের প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের জন্য পুরুস্কারও দিচ্ছেন। তারা স্কুল কলেজ বানাচ্ছেন, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল, এবং হাতেনাতেই তো দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-করা শিক্ষককে সম্মান করলেন। এরাও নির্ভেজাল পুঁজিবাদীই ছিলেন, এদেরকে আদর্শায়িত করার কোনো অজুহাতই নেই, তবু শিল্পবিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ে বিনিয়োগ এই দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্যটুকু আছে সেটা বুঝতে পারি বাংলাদেশ হবার পরে যারা পুঁজির মালিক হয়েছে তাদের সঙ্গে এদের আচরণের পার্থক্যটার কথা ভাবলে। বাংলাদেশ-পরবর্তীরা যখন শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে তখন তাতে একটা ঔদ্ধত্য থাকে, এবং তাদের টাকাটা আসে উৎপাদনের মুনাফা থেকে নয়, সরাসরি লুণ্ঠন থেকেই। বাওয়ানীর দরজায় আমরা ধর্ণা দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু দুর্বিনয়ের মুখোমুখি হইনি, এখন যেমনটা হবো বলে আশঙ্কা করি॥"[১৬০]

[১৬০] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী / দুই যাত্রায় এক যাত্রী ॥ [জাগৃতি প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ । পৃ: ৮৭-৯০]

১১.

"... ষাটের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে হাসান হাফিজুর রহমান পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের আঞ্চলিক শাখার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এ সংবাদটিকে আমাদের অনেকেই তখন খোলামন নিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। পাকিস্তান লেখক সংঘের আমরা যে সরাসরি বিরোধী ছিলাম ঠিক তাও নয়। পাকিস্তান লেখক সংঘ ব্যাপারটি তদানীন্তন পাকিস্তানী লেখকদের জন্যে ভালোই ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষার লেখকদের জন্যে সেই লেখক সংঘ কী করছে, কতটুকু করছে বা কী করতে পারবে, সে সম্পর্কে তখনই এক ধরনের সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল। যদিও লেখক সংঘের কোনো দলিলেই এ কথা ঘোষণা করা হয়নি যে পাকিস্তান লেখক সংঘ শুধু মাত্র উর্দু ভাষাভাষী লেখক ও কবিদের প্রতিষ্ঠান, তবু আসলে কিন্তু ব্যাপারটি তাই ছিলো।

লেখক সংঘের হেড কোয়ার্টার ছিলো করাচীতে এবং সঙ্গত কারণেই তার প্রধান কর্মকর্তারা সবাই ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী লেখক ও কবি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডাকা হত করাচীতে, তখন তারা নিমন্ত্রিত হতেন করাচীতে গিয়ে সেই সভায় যোগদানের জন্যে। যেতেনও তারা। কিন্তু গিয়ে সেই সভাগুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কিছু করতেন কিনা কিংবা করার কোনো সুযোগ তাদের ছিলো কিনা তা বোঝার কোনো উপায় ছিলো না। লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা সদস্য ছিলেন তাদের মধ্যে আমাদের আজকের দিনের দু'জন বিশিষ্ট কবির নাম উল্লেখ করতে পারি একজন কবি আবুল হোসেন অন্যজন কবি শামসুর রাহমান। এরা দু'জনই হাসানের বেশ আগে থেকেই পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯৫৮ সালের পর থেকে দীর্ঘসময়ের মধ্যে আর কারা কারা লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আজ আর মনে নেই। কেননা তারা সবাই আমাদের দৃষ্টিতে অনেক প্রবীণ ছিলেন, যেমন কবি গোলাম মোস্তফা। তবে একটি ব্যাপারে আমাদের সকলের মনোভাবই প্রায় এক রকম ছিলো - পাকিস্তান লেখক সংঘ আসলে পশ্চিম পাকিস্তানেরই একটি প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী লেখকদের ভূমিকা সব সময়েই গৌণ ছিল। মূখ্য ভূমিকা, মূখ্য পাওনা এবং মূখ্য কর্মকান্ড সবই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু লেখকদের হাতে। তাদেরকে কেন্দ্র করে।

এমনি লেখক সংঘের কর্মকাণ্ডে যখন হাসান নিজেকে জড়ালেন তখন আমাদের অনেকেই সেটাকে খোলামন নিয়ে গ্রহণ করতে রাজী হলাম না। কেন হলাম না সেটা অবশ্য তখন আমাদের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। আমাদের মনের ভাবটা তখন অনেকটা এই রকম, লেখক সংঘ আছে, থাকুক। অনেকেই সেই লেখক সংঘে যাচ্ছেন, যান। কিন্তু হাসান হাফিজুর রহমান কেন? আমাদের তখন মনে হত, বিশেষ করে আমার মনে হত, হাসানকে লেখক সংঘের সঙ্গে কেমন যেন মানায় না। মনে হত আমার—কিন্তু লেখক সংঘের সরাসরি বিরোধী যে আমরা তখনো পর্যন্ত ছিলাম না সে কথা তো আগেই বলেছি।

কিন্তু হাসান হাফিজুর রহমানের মনোভাবটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেন কিছু একটা করবার জন্যে মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন তিনি। এমনি একটা ভাব। আগেই বলেছি, হাসান তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসে স্পষ্ট ও দৃঢ় ছিলেন। যে কোনো মঞ্চ থেকেই নিজের বিশ্বাসের কাজটি তিনি করে নিতে পারতেন। এবং শেষ পর্যন্ত করলেনও হাসান। সে বিবরণে পরে আসছি। তার আগে লেখক সংঘ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

যতদূর মনে পড়ছে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড ছিলো (পাকিস্তানে এখনো আছে) সেই সময়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারী কুদরত উল্লাহ্ শাহাবের ব্রেইন চাইল্ড। কুদরতউল্লাহ শাহাব শুধু একজন সেক্রেটারীই ছিলেন না ড় আইসিএস হলেও তিনি ছিলেন উর্দু ভাষার একজন বড় লেখক।

অনেকে তাকে বাংলা ভাষার লেখক আইসিএস অন্নদাশঙ্কার রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতোই তিনি ছিলেন উর্দু লেখক আইসিএস। কস্মিনকালেও আইসিএস লেখক ছিলেন না। সেই কুদরতউল্লাহ শাহাব এগিয়ে এলেন পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড গঠনের জন্যে। আইয়ুব খান তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। শাহাবের নীলনক্সা অনুযায়ী করাচীতে পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় সব লেখকদের দাওয়াত করা হলো একটি মহাসম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্যে। কয়েক শ' লেখক অংশ নিয়েছিলেন। সেই লেখক মহাসমাবেশে। পূর্ব পাকিস্তান থেকেও একটি বড় দল গেল এই সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্যে। তখনকার তরুণ লেখকরাও অনেকে গেলেন সম্ভবত মুনীর চৌধুরী, শামসুর রহমান, আবুল হোসেন, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আতোয়ার রহমান এমনি লেখকদের অনেকেই ছিলেন সেই লেখক কাফেলাতে। কবি গোলাম মোস্তফা এবং তার সমসাময়িক প্রবীণ লেখকরাও অনেকে ছিলেন করাচীগামী সেই দলে। আমার এখনো মনে আছে কিছু কিছু ড় বেশ হৈচৈ তখন লেখক মহলে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর লেখালেখি নিয়ে এতো বড় অনুষ্ঠান এর আগে আর কখনোই হয়নি। সেদিক থেকে ভাবলে কুদরতউল্লাহ শাহাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সেদিন। প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢাকা থেকেও বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ছিলেন। গিল্ডের দু'টি আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো ঢাকায় আর লাহোরে। করাচীর সেই সময়কার সবচেয়ে বড় হোটেল মেট্রোপোলে এই বিশাল কান্ডটি ঘটলো মহাসমারোহে।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে কবি আবুল হোসেন ছিলেন লেখক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম প্রধান লেখক। আরো নিশ্চয়ই অনেকে ছিলেন ওঁরা আরো সিনিয়ার - কবি গোলাম মোস্তফার মতো। ওঁদের কর্মকাণ্ডের কথা আমার ভালো করে মনে নেই। আবুল ভাই যে লেখক সংঘের কর্মকাণ্ডে বেশ উৎসাহ দিতেন সেটা মনে আছে।

একদিনের একটি ঘটনা বলি।

আবুল ভাই তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর। বিল্ডিংটাতে তিনি তখন একটি বেশ বড় রুমে বসতেন। বড় রুম, বড় টেবিল। বেশ একটা বড় আমলা আমলা পরিবেশ। কিন্তু আবুল ভাই স্বভাবে কখনোই আমলা ছিলেন না। তিনি অতি মিষ্টি স্বভাবের একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান। এখনো আছেন। এতো মধুর করে হাসতেন যে হাসি অনেককেই হাসাতো। অন্তত সেই সময় শামসুর রাহমানকে যে ভুলিয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সেই সঙ্গে আমাকেও। আমরা দু'জনেই তখন আবুল ভাইকে বেশ পছন্দ করতাম।

সেই সময় একদিন।

শামসুর রাহমান এসে উপস্থিত আমার কাছে। বেশ হন্তদন্ত ভাব। যেন তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার হন্তদন্ত ভাব কেন? কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ, চলুন আপনিও যাবেন।

কোথায়?

আবুল ভাই গতকাল ফিরে এসেছেন করাচী থেকে। আর এখন অফিসে থাকবেন। আমাকে যেতে বলেছেন।

আপনিও চলুন। আমি আপনার নামও বলতে বলেছি গেটে। আমার কোনো কাজ ছিলো না। বললাম চলুন। এবং গেলাম আবুল ভাই-এর সেক্রেটারিয়েটের অফিসে।

রুমে ঢুকতেই আবুল ভাই হাসলেন। সেই হাসি। আমলিন উজ্জ্বল অন্তরঙ্গ। তার ফরসা চেহারায় আশ্চর্য মানানসই। বললেন, এসো এসো।

আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম তার সামনের চেয়ারে।

আবুল ভাই হাসলেন আবার। বললেন, তোমার জন্যে একটা ভালো খবর আছে শামসুর রাহমান। এবং যোগ করলেন, বল তো খবরটা কী?

শামসুর রাহমান অবাক, আমিও অবাক। এমনি সুন্দর পরিচ্ছন্ন নাটক আবুল ভাই-এর স্বভাবের মধ্যে আছে, এটা আমরা জানতাম। তবু অবাক হলাম।

শামসুর রাহমান বললেন, খবর তো আপনার কাছে। আমরা কী করে জানবো?

আবুল ভাই এবার ভালো খবরটা দিলেন। শামসুর রাহমান তুমি পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছো। এমনভাবে বললেন আবুল ভাই যেন সে সময় শামসুর রাহমানের জন্যে সাহিত্য সম্পর্কিত এর চেয়ে ভালো কোনো খবর হতেই পারে না।

আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তেমনটি হলো না যা হওয়া উচিৎ ছিলো। আমার তো লেখক সংঘ সম্পর্কে তেমন কোনো সরাসরি জ্ঞানই ছিলো না তখন। সুতরাং খবরটির গুরুত্ব আমার বোঝার কথা নয়। কিন্তু খবর শুনে শামসুর রাহমানও খুব একটা উত্তেজিত হলেন বলে মনে হল না। মনে হল আবুল ভাই যা ভেবেছিলেন, তার কিছুই ঘটলো না।

এতো বছর আগের এই ছোট্ট ঘটনাটির কথা এ কারণে বললাম যে, এতে দুটি প্রসঙ্গ বেশ স্পষ্ট। একটি আবুল ভাইয়ের জেনারেশান লেখক সংঘকে মোটামুটি একটি খোলামন নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার পরের জেনারেশান অর্থাৎ আমরা এই লেখক সংঘ ব্যাপারটিকে যেমন এক কথায় খারিজ করতে এগিয়ে যাইনি, তেমনি সম্পূর্ণ খোলামন নিয়ে গ্রহণও করতে পারিনি। একটি অনুচ্চারিত দ্বিধা ছিলো আমাদের মধ্যে পাকিস্তান লেখক সংঘকে সরাসরি আমাদের কর্মকাণ্ডে গ্রহণ করতে। কেননা একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার ছিলো আমাদের কাছে তখন লেখক সংঘের সব চাবিকাঠিই আছে দেড় হাজার মাইল দূরে করাচীতে। সঙ্গত কারণেই তাই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ আমাদের যত কাছের ছিলো, পাকিস্তান লেখক সংঘ ততটা হল না। হতে পারেনি। সুতরাং হাসান যখন এলেন লেখক সংঘের কর্মকাণ্ডে তখন তাকে একদিন সরাসরি প্রশ্ন করলাম আমি, আপনি কেন এলেন লেখক সংঘে?

আমার প্রশ্ন শুনে হাসান বললেন, কেন আসবো না, লেখক সংঘের শতকরা ছাপন্ন ভাগ তো আমাদের। ওটা দখল করতে হবে না। সরাসরি স্পষ্ট কথা হাসানের।

হাসানের কথা শুনে বেশ রাগ হল আমার। কী অসম্ভব সব চিন্তা হাসানের। হাতে নেই সেই গিল্ডের ছাপ্পান্ন ভাগ হাসান দখল করবেন। অদ্ভুত সব চিন্তা।

বললাম, কী যে সব অসম্ভব চিন্তা করেন। আপনি হাসান।

আমার স্বাগত সংলাপ শুনে হাসান শুধু সামান্য হেসেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি তো আছো আমার সঙ্গে, দেখো কী হয় আগে আগে। যেন গালিবের ভাষায় বলতে চাইলেন, ইবতেদায়ে ইশক হ্যায়, রোতা হ্যায় ক্যায়া। আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যায় ক্যায়া।

লেখক সংঘের সদস্য আমি হতে পারিনি কোনোদিন। কিন্তু ছিলাম হাসানের সঙ্গে তখন এবং দেখেছিলাম। আগে আগে কী হয়েছিল কী কী ঘটেছিল। যা শুধু হাসানই ঘটাতে পারেন॥"[১৬১]
(ফজল শাহাবুদ্দীন)

১২.

"... সামরিক শাসনের শুরুতেই দেশের উভয় অংশে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন Bureau of National Reconstruction (B.N.R) প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসক গোষ্ঠির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উপর খবরদারি করা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রসারিত করা। পূর্ব পাকিস্তানে বিএনআর এর প্রথম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হলেন তদানীন্তন পুলিশ প্রধান কাজী আনোয়ারুল হক আর আমাকে করা হল তার সাংস্কৃতিক বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর (২২/৫/১৯৫৯)। এই বিএনআর-এর সঙ্গে প্রদেশের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক বিভাগের যোগসূত্র ছিল। এই নতুন পদে আমি প্রথম দিকে কিছুটা ভয়ে ভয়ে কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই এই ভয় কেটে গেল কাজী আনোয়ারুল হক সাহেবের সংস্পর্শে এসে। পুলিশের লোক হলেও তিনি ছিলেন উদারমনা, কর্মদক্ষ এক অসাধারণ ব্যক্তি। তাকে বিশেষভাবে পেয়েছিলাম আমার একজন শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী কর্মকর্তা হিসেবে। বছর খানেক পরে তিনি উচ্চতর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে করাচী চলে গেলেন এবং তাঁর জায়গায় এলেন মুসা আহমেদ সাহেব ; তিনিও পুলিশ প্রধান ছিলেন এবং কাজী আনোয়ারুল হক সাহেবের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তার সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠতে তেমন সময় লাগেনি।

এ সময় দেশের বেশ কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। আমার অনুরোধে তাঁরা শিক্ষামূলক ও দেশাত্মবোধক বহু রচনায় হাত দিয়েছিলেন ; তিন জনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে; তাঁরা হলেন নাট্যকার নূরুল মোমেন — আমার উৎসাহে তিনি রচনা করেছিলেন 'শতকরা আশি' এবং 'নয়া খান্দান'; নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ — তিনি রচনা করেছিলেন 'অনুবর্তন' এবং কবি নূরুন নাহার (সরকারী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক সৈয়দ রফিকুদ্দিন আহমদের স্ত্রী), তিনি বেশ ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। লেখকদের জন্য আকর্ষণীয় পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

অনেকে বলে বিএনআর-এর কাজে আমি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলাম। তবে বাস্তবে সাফল্য কতটুকু অর্জন করেছিলাম জানিনা কিন্তু আনন্দ পেয়েছিলাম প্রচুর।

বিএনআর-এ থাকতে দু'জনের সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা ছিল তাদের একজন হলেন, মীর আনোয়ার আলী। তিনি মূলতঃ ছিলেন সরকারী কলেজের ইতিহাস শিক্ষক, পরে বিএনআর-এ আমার অধীনে কাজ করতেন গবেষণা অফিসার হিসেবে। অমায়িক কর্ম-পটু অফিসার পরে সহকারী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতিও লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় জন হচ্ছেন কবি আবুল হোসেন, তিনি পাবলিসিটি বিভাগে কাজ করতেন। সে সময় আমার অধীনে সহকারী ডাইরেক্টর হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের এএসএম নূর মোহাম্মদ। তিনি আমারই ছাত্র; তিনি ই.এ.-তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন (১৯৫৪) এবং সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানের পরীক্ষায়ও সফল হয়েছিলেন। আর ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছিল যার সঙ্গে তিনি হলেন জনাব কফিল উদ্দিন মাহমুদ সিএসপি; তিনি তখন বিএনআর-এর প্রশাসনিক বিভাগে ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন॥"[১৬২]

---

[১৬১] হাসান হাফিজুর রহমান স্মারকগ্রন্থ / সম্পা: আনিসুজ্জামান ॥ [হাসান হাফিজুর রহমান সংসদ - জুন, ২০০০ । পৃঃ ১২৩-১২৬]
[১৬২] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান / জীবনের ঘাটে ঘাটে ॥ [আহছানিয়া বুকস - জুলাই, ২০০১ । পৃঃ ১০২-১০৩]

১৩.

"...লেখক সংঘ মানে লেখকেরা কি ভাববেন, কি চিন্তা করবেন, কি লিখবেন, কিভাবে লিখবেন জঙ্গীলাট নির্দিষ্ট করে দেবেন। তিনি যা বলবেন — এরা তা লিখবেন। বিনিময়ে লেখকদের দেয়া হল অঢেল সুযোগ-সুবিধা। তাদের জন্য আদমজী পুরস্কার, ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন। সেদিন বাংলাদেশে একজন লেখকও লেখকের সুস্থ এবং স্বাধীন মননশীলতার বিরোধী এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করেননি। বরং সকলে বগল বাজিয়ে আপনা থেকেই এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করেছেন। খ্যাতনামা পশ্চিমা দালালদের কথা বলে লাভ নেই। যারা কমিউনিস্ট, সর্বহারার অন্দোলনে বিশ্বাসী বলে পরিচিত ছিলেন, তাদেরও অনেককে দেখা গেছে। ধনপতিদের হাত থেকে অর্থ পুরস্কার গ্রহণ করতে পেরে জীবন ধন্য মনে করেছেন।

চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীলরা তো প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সহযোগিতা করত। সেটা জানা কথা। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিশীল এবং কমিউনিস্টদেরও দেখা গেছে কার্যত জঙ্গীলাটের সহায়তা করতে। আদমজী পুরস্কার, দাউদ পুরস্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক এবং হাবীব ব্যাংক পুরস্কার যারা গ্রহণ করেছেন, সে তালিকাটা আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। তাতে এমন ক'জন মানুষের নাম রয়েছে, যাদেরকে এক শ্রেণীর মানুষ দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। আজকের বাংলাদেশের যে সকল খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক আছেন, তাদের বেশিরভাগই একভাবে না একভাবে সামরিক সরকারের সহযোগিতা করেছেন। এদের সকলে কি আইয়ুব খানের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেননি? শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এদের কেউ কেউ জীবনপাত করেছেন বলে শোনা যায় ড় আদমজী, দাউদের দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করে কোন শ্রেণীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা তারা কামনা করেছিলেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সৎ-লেখক ও সৎ-বুদ্ধিজীবী ছিলেন না বললেই চলে। মুখে সর্বহারার রাজনীতি কিন্তু কাজের বলোয় বাঙালি-সংস্কৃতিরও বিরোধিতা করেছেন অনেকে।

বিএনআর-কে দোষ দেয়া হয়ে থাকে - দোষ দেয়া হয় শুধু হাসান জামানকেই। কিন্তু বিএনআর-এ যাননি কোন লেখক? সকলেই টাকা নিয়েছেন — আবার জনগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সকলেই বিএনআর-এর গোষ্ঠী উদ্ধার করছেন। চমৎকার রসিকতা। বাংলাদেশের সমস্ত নামকরা কবি-সাহিত্যিক যারা সোনার বাংলা নামে কেঁদে-কুটে বড় বড় পদ দখল করে বসেছেন — তাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগই যে অকাণ্ডকুকাণ্ড করেছেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ হাজির করা যায়॥"[১৬৩]

১৪.

"... পাকিস্তান আমলের বিখ্যাত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আত্মবিক্রয়ের কীর্তিকলাপ ঢেকে রেখে এবং নানাপ্রকার কল্পিত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যারা পার্বণিক স্মৃতি-রোমন্থন-কর্ম সম্পাদনার্থে পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে প্রচারমূলক লেখা প্রকাশ করেছেন, ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবী হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন, সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী নানারকম সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে জনমতকে বিশেষ খাতে প্রবাহিত করার জন্য তৎপরতা চালিয়েছেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উপর ভর করে আত্মোন্নতির সিঁড়ি ডিঙিয়েছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই 'সর্বজনশ্রদ্ধেয়' বুদ্ধিজীবীরা ঘটনাপ্রবাহের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার কোনো চেষ্টাও করেননি; তাদের চিত্র অনুর্বর মস্তিষ্কের অসৎ বুদ্ধি ও দুষ্ট কল্পনা দিয়ে তৈরি - তাতে চটক আছে, চমকও আছে; নেই শুধু সত্য ও ন্যায়ের উপস্থিতি।

যারা 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' ও 'বিশুদ্ধ শিল্পে'র স্লোগান তুলে অসৃষ্টি ও অনাসৃষ্টিকে সৃষ্টি বলে প্রচার করেছেন, উন্মুক্ত জনপথ ত্যাগ করে সঙ্কীর্ণ কানাগলি দিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছেন, দেশ-কালের প্রতি রুষ্ট হয়ে

---

[১৬৩] আহমদ ছফা / সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস ॥ [খান ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০১১ । পৃ: ৫৭-৫৮]

নিজস্ব বিবর সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়েছেন এবং পাঠকদেরকে সেই কানাগলিতে, সেই বিবরে আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেদেরকে যৌনতাস্পৃষ্ট, নিঃসঙ্গ, উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত ইত্যাদি বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাদের ভূমিকাও বোধ হয় আত্মপ্রতারনার ছাপমুক্ত নয়।

যে কালে দেশের সর্বস্তরের প্রায় সকল মানুষ অভীষ্ট পরিবর্তনের জন্য এত উৎকণ্ঠিত ও সংগ্রামমুখর ছিল, যে কালে দেশের মানুষের - বিশেষ করে তরুণদের জানার-বোঝার-তর্ক করার ও নতুন কিছু সন্ধান করার আগ্রহ এত প্রবল ছিল এবং যে কালে বিপুল জনগণ নতুনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিদ্রোহে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, একটি জাতির জীবনে যে কালের আগমন বহু শতাব্দীর ব্যবধানে ঘটে, মহৎ ও বিরাট প্রতিভার আত্মপ্রকাশের পক্ষে সেই কাল প্রতিকূল ছিল? উনিশ শতকের বাঙালির জাগরণ বহমান ছিল এই শতকের প্রথমার্ধব্যাপী; তার উপর বিশ শতকের একেবারে শুরু থেকেই সূচিত হয় রাজনীতিভিত্তিক গণজাগরণ। কি ভাবের জগতে, কি কর্মের জগতে বিরাট মহান প্রতিভার আত্মপ্রকাশ দাবি করেছিল এই কাল, এবং বিরাট মহান প্রতিভার আত্মপ্রকাশের পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল সময়টা। পরিবেশের প্রতিকূলতার দোহাই দিয়ে, কিংবা ফেরিওয়ালাসুলভ ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে যেসব প্রতারক, ধূর্ত, দু:শীল, চতুর, অসংস্কৃত, বিবেকহীন নির্দয় কথা ক্রমাগত বলা হচ্ছে, সেগুলোর স্বরূপ উপলব্ধির শক্তির উদ্বোধন কি আমাদের মধ্যে ঘটবে না?

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিতে ঘটনাপ্রবাহের সকল পর্যায়ের ও সকল দিকের প্রতি সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপে যদি আমরা অগ্রসর হই, তা হলেই দেখতে পাই - আমাদের তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের অধিকাংশ সদস্য যে নিদারুণ অধ:পতনের শিকার হয়েছেন, তার জন্য মূলত তারা নিজেরাই দায়ী, পরিবেশের প্রতিকূলতা থাকলেও সে অধ:পতনের জন্য পরিবেশ মূলত দায়ী নয়। পরিবেশের প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেই পৃথিবীর সর্বত্র চিরকাল সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা কাজ করে থাকেন। লেখক-সমাজের অভ্যন্তরে হীন স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবীদের কর্তৃত্ব আর প্রলোভন, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্তি ও আলস্য এত প্রবল ছিল যে, মহত্তম প্রতিভার সম্ভাবনাও বিপর্যস্ত, বিকৃত, বিধ্বস্ত ও নি:শেষ হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিল্প-সাহিত্যিক গবেষকদের সামনে প্রলোভনের টোপ ছড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে টোপ গেলার জন্য কিছু লোকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তুমুল প্রতিযোগীতা। দল-মত নির্বিশেষে প্রায় সকল শিল্পী-সাহিত্যিক-গবেষক একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সরকারী নীতির প্রতিধ্বনিতে হুক্কা-হুয়া করেছেন, প্রতিবাদ করেননি প্রায় কেউই (স্মরণীয় : 'আমাদের হুক্কা হুয়া রব আছে ভাই/হুক্কা হুয়া রব আছে/আমাদের সব আছে ভাই সব আছে' - সিকান্দার আবু জাফর), এবং বিষাক্ত টোপ গিলে নিজের হৃৎপিন্ডে ও মগজে পচন ধরাননি - এমন ব্যক্তির সংখ্যাই নমস্য। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তারা তো হারিয়ে যাচ্ছেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে কিংবা অপক্রিয়ার প্রবল স্রোতে। আমাদের বিদ্বৎসমাজের ইতিহাস কোথায়?

অর্থসম্পদ ও আরাম-আয়েসের প্রয়োজন আর ক্ষমতা ও খ্যাতি প্রতিপত্তির বাসনা মানুষ মাত্রেরই আছে, এবং লেখকদের মধ্যেও এসবের অস্তিত্ব খুবই স্বাভাবিক। তবে মহৎ প্রতিভার ছিটেফোঁটাও যাদের মধ্যে থাকে, তাদের মধ্যে সংযম বলেও একটা ব্যাপার থাকে, আর থাকে সৃষ্টিসামর্থ্যের অপরাজেয় অহংবোধ, - থাকে বিচারশক্তি প্রয়োগের, সকলের সাথে মিলিত থেকে সাধারণ স্বার্থ - ন্যায়-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্লীল-ইতর-হীন-ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার প্রবণতা। কিন্তু এই কালে আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজের মধ্যে যে নীতির একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায় তা হল, 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও/বাকির খাতায় শূন্য থাক।' ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও দলাদলির কারণে তারা সেই সংঘশক্তিরও পরিচয় দিতে পারেননি যা মহান প্রতিভাবানকে লালন করে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে যে সার্বিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তার পটভূমি পাকিস্তান কালেই তৈরি হয়েছে।

... পাকিস্তানবাদী চিন্তাধারার বিরোধীতায় ও বাঙ্গালি-চেতনার বিকাশ সাধনে প্রগতিশীল বলে কথিত 'অসাম্প্রদায়িক' লেখক-শিল্পীরা কোনো পারস্পর্যশীল সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন - এটা বলা যায় না। প্রায়শ তারা নীতি ত্যাগ করেছেন, অযৌক্তিকভাবে আপোস করেছেন - আত্মবিক্রয়ও করেছেন। সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে মিলিয়ে সূক্ষ্ণভাবে 'অসাম্প্রদায়িক'দের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, তাদের অনেক কাজই বাঙালি-স্বার্থের ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছে। সে ইতিহাস উদ্ধার করলে, সন্দেহ নেই, গৌরবের চেয়ে কলঙ্কের চিত্রই বেশি পাওয়া যাবে।

আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাভাষায় মৌলিক গণতন্ত্রের, উন্নয়ন দশকের, পাকিস্তানি জাতীয় সংহতির ও আরো অনেক বিষয়ের মাহাত্মকীর্তনের জন্য পাঞ্জাবিদের বাংলা শিখতে হয়নি। এইসব কীর্তন গাওয়া থেকে 'অসাম্প্রদায়িক' লেখক-শিল্পীরা মোটেই বিরত থাকেননি। অপরদিকে যেসব বিষয়ে আমাদের 'অসাম্প্রদায়িক' লেখক-শিল্পীদের ভূমিকা গৌরবজনক বলে স্বাধীন বাংলাদেশে বার বার প্রচার করা হয়েছে, তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেগুলোও তেমন গৌরবজনক ব্যাপার নয়।

যেমন ধরা যাক, বহুল প্রচারিত ১৯৬৭-৬৮ সালের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাংলা বর্ণমালা বিষয়ক বিতর্ক। এই বিতর্ককে 'অসাম্প্রদায়িক' লেখকেরা তখন খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তখন এসব বিষয়ে তারা অনেক লিখেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন, নেপথ্যে থেকে রাজপথের আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর কালে নিজেদের গৌরবের কথা বার বার প্রচার করেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখা যাবে, এ দুটি বিষয় তখন প্রকৃতপক্ষে বিশেষ গুরুত্বলাভের মতো বিষয়ই ছিল না। এসব বিষয় তাত্ত্বিক আলোচনার পর্যায় অনেক আগেই অতিক্রম করেছিল, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল তার প্রমাণ। ১৯৬৭-৬৮ সালে রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ - লেখকদের কাছে সময়ের দাবি তখন ছিল সমাজ ও জাতি গঠনমূলক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের দূরদর্শী চিন্তা - যে-চিন্তার অভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের আজ এই বিপর্যয়। এই বিপর্যয় সেদিনকার চিন্তার দৈন্য ও অদূরদর্শিতারই ফল। ১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অনতিপূর্বে যে রাজনৈতিক বাস্তবতা দেশে বিরাজ করছিল, তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর বর্ণমালা সংক্রান্ত বিতর্ক আসল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ারই সহায়ক হয়েছিল।

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রচারে, পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির পক্ষে প্রকাশ্য ও গোপন সহযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ বিষযে চতুর নীরবতা, লেখক সঙ্ঘের কার্যকলাপ, বেতার-টেলিভিশন-পিইএন-কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম ইত্যাদিতে আত্মবিক্রয় ও আরো নানাপ্রকার অপকর্মের ফলে 'অসাম্প্রদায়িক' লেখকরা তখন সমাজের চোখে নিতান্তই হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। এই অবস্থা থেকে আত্মোদ্ধারের কৌশল হিসেবেই কি তারা তখন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিহার করে নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে একটি স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমাজের চোখে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষযে পরিণত করতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন? অবশ্য এসবের প্রকৃত মূল্য না থাকলেও প্রতীকী মূল্য ছিল। প্রশ্ন হল, প্রতীককে প্রত্যক্ষের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এবং প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা করে কি জাতির ক্ষতি করা হয়নি? বাংলাদেশে উন্নত নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির লক্ষে যারা কাজ করবেন তাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে এ-প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে॥"[১৬৪]

১৫.

"... গোর্কীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে একটি অনুষ্ঠান হয়। এর আয়োজন ঠিক কারা করেন মনে নেই, তবে তারা মস্কোপন্থী নামে পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। সেই সভায় আমি ছিলাম একজন নির্ধারিত বক্তা।

[১৬৪] আবুল কাসেম ফজলুল হক / বাংলাদেশের রজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ॥ [কথাপ্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ । পৃ: ৩৭-৩৯/৪৫-৪৬]

অন্য নির্ধারিত বক্তাদের মধ্যে শুধু শহীদুল্লাহ কায়সার ও শওকত ওসমানের কথা আমার মনে আছে। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক।

বক্তৃতা দিতে উঠে শওকত ওসমান এক পর্যায়ে বললেন যে, নোবেল পুরস্কার পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের পুরস্কার। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা লোক বাছাই করে পুরষ্কার দেয়। এজন্য প্রতিক্রিয়াশীলরাই এ পুরষ্কার পেয়ে থাকে। কাজেই গোর্কীকে যে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়নি, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

আমরা নির্ধারিত বক্তারা মঞ্চে বসেছিলাম। আমার পাশেই ছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সার। শওকত ওসমানের বক্তৃতার পর আমাকে বলার জন্য আহ্বান করা হলো। আমি অন্য কথার পর শওকত ওসমানের উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বললাম যে, তার বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে তার বক্তব্যের সাথে আমি কিছু যোগ করতে চাই। নোবেল প্রাইজ প্রসঙ্গে শওকত ওসমান বলেছেন যে, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের বাছাই করা লোকদেরকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে থাকে। তিনি যা বলেননি তা হলো, আমাদের দেশেও এ ধরণের পুঁজিবাদীরা আছে এবং তারাও একই কারনে বাছাই করে লোকদেরকে বিভিন্ন পুরষ্কার দিয়ে থাকে। আদমজী পুরষ্কার, ন্যাশনাল ব্যাংক পুরষ্কার, ইউনাইটেড ব্যাংক পুরস্কার ইত্যাদি হলো এই ধরণেরই পুরষ্কার।

শওকত ওসমান, শহীদুল্লাহ কায়সার এবং অন্য অনেকে সেই সব পুরষ্কার পেয়েছিলেন। কাজেই আমি দেশীয় পুরস্কারগুলো সম্পর্কে একথা বলায় পরিপূর্ণ হলের দর্শকদের মধ্যে এক ধরণের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েন। লক্ষ্য করলাম মঞ্চে শহীদুল্লাহ কায়সার ও দর্শকদের প্রথম সারিতে ডক্টর হাবিবুল্লাহ খুব হাসছেন, কিন্তু শওকত ওসমানের মুখ খুব গম্ভীর।

সভা শেষ হওয়ার পর শওকত ওসমান উত্তেজিতভাবে আমাকে বলতে থাকলেন, এসব কথা বলা একেবারেই ঠিক হয়নি। তার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় আমি বিস্মিত ও বিরক্ত হলাম। আমার এই 'অবিবেচনা প্রসূত' বক্তব্যের জন্য শওকত ওসমান আমাকে মাফ করেননি। শুধু তাই নয়, বাকি জীবন তিনি আমার শত্রুতা করার কোন সুযোগই ছাড়েননি, তাতে তার নিজেকে যত নীচেই নামাতে হোক। রাজ্জাক সাহেব ও হাসান হাফিজুর রহমান পাশেই ছিলেন। রাজ্জাক সাহেব হাসতে হাসতে হাসানকে বললেন, উমরকে একটা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, দেখা যাবে কি হয়। ১৯৭৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান যখন বাংলা একাডেমীর পুরস্কার কমিটির সদস্য ছিলেন তখন ঐ বছর আমাকে আমার ভাষা আন্দোলনের বইয়ের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার দেওয়া হয়। তারা দেখেছিলেন আমাকে পুরস্কার দেওয়ার পর কি হয়॥" [১৬৫]

১৬.

"... ১৯৬৫ সালের শেষভাগে দেশে ফিরে দেখি তাঁর 'মীর-মানস' বেরিয়ে গেছে এবং তার ভূমিকায় আমার সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন মুনীর চৌধুরী। আমার পক্ষে বিস্ময় ও আনন্দের কথা। আমি কখনো মনে করিনি যে তাঁর রচনা সম্পর্কে আমার মন্তব্য এতটা স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। এ বইয়ের প্রবন্ধগুলো দীর্ঘকাল ধরে লেখা। 'বসন্তকুমারী নাটক' লেখা হয়েছিল তাঁর বিদেশযাত্রারও আগে — ১৯৫৬ সালে। আর 'বিষাদ সিন্ধুর পুনর্বিচার' লেখা হয়েছিল ১৯৬৪-তে। সামান্য বিষয় নিয়ে অসামান্য আলোচনার উদাহরণ হিসেবে বইটি উল্লেখযোগ্য। পরের বছরে এ বইয়ের জন্যে তিনি দাউদ-পুরস্কার লাভ করেছিলেন। একইসঙ্গে 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্যে'র জন্যে আমিও একই পুরস্কার লাভ করি।

---

[১৬৫] বদরুদ্দীন উমর / আমার জীবন (দ্বিতীয় খন্ড) ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ । পৃ: ২৮০-২৮১]

দাউদ-পুরস্কার গ্রহণ করা আমাদের উচিত হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তর্কের ঝড় উঠেছিল পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে মুনীর চৌধুরী ও আমাদের অপর দুই সহকর্মীর বেতার-অনুষ্ঠান নিয়ে। বিদেশে থাকায় এসব অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু অনেকে অভিযোগ করেছিলেন যে, যেসব সাহিত্যকর্ম থেকে অংশবিশেষ পাঠ করা হত এ-অনুষ্ঠানে, তাতে সাম্প্রদায়িকতার ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। পাকিস্তান বেতারের পক্ষে তা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু মুনীর চৌধুরী যে তার সঙ্গে যুক্ত হবেন, এ ছিল অবিশ্বাস্য — বিশেষতঃ আমার পক্ষে। কী যে এসব অনুষ্ঠানে পড়া হয়েছিল, তা খুঁটিয়ে জানবার আগেই মুনীর চৌধুরীকে সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত করলেন সরকার। এতেই তাঁর সম্পর্কে নিন্দার মাত্রা পূর্ণ হল। অথচ খেতাবলাভের অল্পকাল আগে চীন ভ্রমণের জন্যে লেখক সংঘের মনোনয়ন পেয়েও তিনি পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেননি॥"[১৬৬]

১৭.

"„ The other man whom I have mentioned, Mr Qudratullah Shahab, proved equally useful to the leftists. A story writer in Urdu, he wanted around him admirers and flatterers and did all he could to eliminate from positions of authority anyone who did not see eye to eye with him. He gave President Ayub the idea of "Writers" Guild which could be used to procure him the support of the intellectuals. Though one could see through the game, I would admit that in a country such as Pakistan where the majority of the writers were indigent, an officially backed organisation capable of doling out patronage could have achieved its object. But again Mr Shahab's own sympathies turned it in next to no time into a leftist stronghold.

I recall vividly the first Conference where the decision to form the Guild came formally adopted. This was in January 1959. I was one of the delegates from East Pakistan, and found myself on the Constitution Committee along with two other representatives from this Wing. They were Mr Jasimuddin and the late Mr Ghulam Mustafa. Mr Abul Hussain attended the meetings of the Committee as an observer. Mr Shahab proposed that the Central Executive of the Guild should consist of five or seven members each from Urdu and Bengali and three each to represent the regional languages. The proposal sounded innocuous, but I realised that the moment it was adopted the leftists would start saying that East Pakistan as such had been denied the representation which was its due. For Urdu and the regional languages, Punjabi, Sindhi and Pushto, all meant West Pakistan. That would give the West fourteen or sixteen votes against five or seven for East Pakistan Neither Mr Jasimuddin nor Mr Ghulam Mustafa would point this out. Finally I opened my mouth and quietly told Mr Shahab that his proposal would produce adverse reactions. He was startled by my objection. He demanded to know what was my alternative. I said that since the Writers' Guild as an organisation would in any case have a semi-political status, the best course was to adopt the principle of parity between the two Wings; that would be least calculated to breed misunderstanding. Any other arrangement, I said, would unnecessarily tarnish the Guild with a stigma which would make its functioning difficult.

No sooner had I concluded my remarks, than Mr Shahab stood up. He was shaking with anger. Pointing an accusing finger at me, he commanded: 'You must not mention the word parity again. All that went wrong in the last ten years has been in the name of parity'.

Mr Shahab was, I should mention in parenthesis, then Secretary to General Ayub Khan. His power and influence were unlimited.

---

[১৬৬] আনিসুজ্জামান / মুনীর চৌধুরী ॥ [থিয়েটার - ডিসেম্বর, ১৯৭৫ । পৃ: ২৮-২৯]

To cross swords with him meant taking a real risk. His tone indicated that he had been offended by my remark. But I felt that to retract would be an abdication of judgement. I insisted that unless he agreed to modify his proposal, I could be no party to it. This made him absolutely furious. He threatened to walk out. I said he could do as he liked, but in my opinion the proposal he had put forward would exacerbate feeling in East Pakistan and give a handle to those who constantly complained of discrimination against this province by the West. Finally, discovering that I would not resile from my stand, Mr Shahab, in a fit of assumed exasperation, offered me the majority of the seats on the Executive Committee rather than agree to parity. I retorted by announcing my acceptance. Mr Shahab felt cornered, and sought a way out of the imbroglio by finally acceding to parity, eleven for East and eleven for West Pakistan.

The occasion was made memorable for me by the utter failure of Mr Jasimuddin and Mr Ghulam Musfata to back me up. I knew that outside the Committee they, particularly Mr Jasimuddin, would have been the first to stigmatise Mr Shahab's proposal as evidence of Western colonialism. But they would not open their lips. On the contrary, Mr Jasimuddin who poses as one of the great champions of Bengali nationalism extended his support to Shahab when he was called upon to express his views. I could only feel disgusted.

The incident was typical of the manner in which relations between East and West Pakistan were progressively poisoned. The Bengalis would not protest openly, when they felt that something wrong was being done, but believed in confabulating secretly among themselves and complaining conspiratorially of discrimination and injustice. In the present instance, I am quite convinced that had Mr Shahab's proposals been carried through, the Bengalis would have reacted by adopting a pose of injured innocence. But now that I took upon myself the risk of voicing their grievances, they, in their characteristic fashion started flattering Mr Shahab and pretending that I had exceeded my limits in raising the question of a fairer distribution of seats.

Mr Shahab took his revenge against me later. First, after the first three years I was dropped from the executive. The next step taken was to eliminate me from the panel of judges for the Adamjee Literary Prizes and appoint Dr Sarwar Murshid, the present (1973) ViceChancellor, Rajshahi University, one of the chief henchman of the Awami League in the University as a substitute.

I have given some details of this incident intentionally. It shows how things drifted in Pakistan and how the leftists came to power in East Pakistan with the blessings and support of the West Pakistanis themselves. It also throws light on the reasons why the language movement grew from strength to strength, thriving on the nourishment it received from the Centre itself."[১৬৭]

---

১৬৭ Syed Sajjad Husain / The Wastes of Time : Refelctions on the Decline and Fall of East Pakistan \ [Notun Safar Prokashani - February, 1995 | p. 7 / 189-191]

দ্বিতীয় পর্ব

৬ দফা : বিভক্তির পথে যাত্রা

এক

ছয় দফা এবং শেখ মুজিবুর রহমান

০১.

[১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে '৬ দফা দাবি' পেশ করেন। ৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে পৌছান এবং তার পরদিন ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা সম্বলিত ছয় দফা কর্মসূচির এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।]

" ... মুখবন্ধ :

একটি রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি, সংহতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে উহার আভ্যন্তরিণ শক্তির উপর। সেই শক্তির উৎস সন্তুষ্ট জনচিত্ত। আঠার বৎসর পূর্বে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও ইহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো গণসমর্থনের মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। পাকিস্তানের মূল ভিত্তি ১৯৪৩ সালের যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল পরবর্তীকালে ঐ মূল ভিত্তি হইতে বিচ্যুতিই এই অবস্থার আসল কারণ। এই বিচ্যুতি ঘটাইবার মূলে ছিল একটি কায়েমী স্বার্থবাদী শোষক দলের স্বার্থান্বেষী কারসাজী। ইহারা ইসলাম ও মুসলিমের নামে সারা পাকিস্তানের গোটা সমাজকে শোষণ করিয়া নিঃশেষ করিতেছে; অপরদিকে পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই বিশেষ মহলই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের নামে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়িয়া, পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ শোষন চালাইয়া যাইতেছে। ফলে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ সর্বহারায় পরিণত হইতেছে, অপরদিকে জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিবাদ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক ভুলবুঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে অবাধ শোষন চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ মহল ঐক্য ও সংহতির জিগীর তুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বিগত আঠার বৎসরব্যাপী আবেদন নিবেদন ও আন্দোলনের মাধ্যমে উক্ত মহলকে বোধগম্য কারণেই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করিতে সম্মত করা সম্ভব হয় নাই। বরং নানারূপ সূক্ষ্ম কৌশলে ইহারা উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বৈরীভাব সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছে।

সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের নাজুক অবস্থা, সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সবল কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারিতার শ্লোগানীরূপের অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানের কোন মঙ্গলকামীকে, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার-বঞ্চিত অসহায় জনসাধারনকে, আর সস্তা বুলিতে ধোকা দেওয়া চলিবে না। তাহারা আজ দেশের প্রকৃত সংহতি, নিরাপত্তা, শক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির সঠিক পন্থা নিরূপণ ও আশু বাস্তবায়নের দাবি করেন।

পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান-সম্ভূত প্রশ্নে বিগত আঠার বৎসরব্যাপী সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের শিক্ষার আলোকে বিচার করিলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী উপরে উল্লেখিত গণদাবির প্রশ্নে এক বাস্তব, সুষ্ঠু ও কার্যকরী উত্তর। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই ছয়-দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের ঈপ্সিত কল্যাণ, প্রকৃত সংহতি ও কার্যকরী নিরাপত্তা বিধান করিবে বলিয়া সকল বাস্তব চিন্তাশীল মহলের বিশ্বাস। এই কর্মসূচীতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি অপরিহার্য মূল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বর্তমানে নাজুক পূর্ব পাকিস্তান সকল বিষয়ে সবল ও শক্তিশালী হইয়া সারা পাকিস্তানকেই অধিক শক্তিশালী ও সুসংহত করিবে এবং উভয় অঞ্চল সমতালে অগ্রসর হইয়া যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করিতে সক্ষম হইবে।

শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে এক বিশেষ মহল সবিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানকে ভালবাসেন এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করেন এমন কেহ এই কর্মসূচীর পাইকারী বিরোধিতা করিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করিনা। তবে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও তাহাদের অনুগতদের কথা আলেদা। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ নিহিত নাই এমন কোন ভাল কর্মসূচীকে কখনও সমর্থন দিয়াছে তাহার নজীর বিশ্ব ইতিহাসে নাই, বরং নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হইলে ইহারা যে মরিয়া হইয়া উহার বিরোধিতা করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণ বর্তমান। তাই আমি শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সাধারণ মানবাধিকারে আস্থাবান সকল মহলের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই কর্মসূচীর ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% অধিবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির সন্ধান পাইবেন এবং তাহাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে সুদৃঢ় তথা পাকিস্তানকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের কাছে আমার আরজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হইয়া তাহারা যেন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জীবন-মরণ সমস্যাগুলি বাস্তবের আলোকে বিচার করিয়া দেখেন। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোন কর্মসূচী নহে। একজন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানীর ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইগণও পাকিস্তানের উন্নতি, অগ্রগতি, সংহতি ও নিরাপত্তার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথাও ভাবেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে শক্তিশালী করিবার দাবি উঠিলে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের মত আতঙ্কিত না হইয়া যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তাহারা এই দাবির প্রতি সমর্থন দিবেন ইহাই স্বাভাবিক ও আমি ইহাই বিশ্বাস করি।

তাজ উদ্দীন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক,
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।

ভারতের সাথে বিগত সতের দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নূতনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্প দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরী অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে।

এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দুটি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরও সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতাহারটির লক্ষ্য তা-ই। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিম্নলিখিত ছয়-দফা কর্মসূচী পেশ করছি।

শেখ মুজিবুর রহমান

সাধারণ সম্পাদক,

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

প্রস্তাব-১

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন-ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরণের। আইন পরিষদের (Legislatures) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদ নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা :

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে–যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩

মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দু'টির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে :-

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪

রাজস্ব, কর, বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় একটি রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কতৃর্ত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।"[১৬৮]

০২.

শেখ মুজিবুর রহমানের রোজনামচায় ছয়-দফা প্রসঙ্গ

"... ২রা জুন ১৯৬৬

এক অভিনব খবর কাগজে দেখলাম, মর্নিং নিউজ কাগজে ন্যাপ নেতা মিঃ মশিউর রহমানের ফটো দিয়ে একটা সংবাদ পরিবেশন করেছে। ইত্তেফাক ও অন্যান্য কাগজেও খবরটি উঠেছে। তিনি ছয় দফার দাবি সম্বন্ধে তার মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ছয় দফা কর্মসূচী কার্যকর হইলে, পরিশেষে উহা সমস্ত দেশে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবে। এমনকি তিনি যদি প্রেসিডেন্ট হতেন তাহা হলে ছয় দফা বাস্তবায়িত হতে দিতেন না।' এদের এই ধরনের কাজেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধরা পড়ে গেছে জনগণের কাছে। জনগণ জানে এই দলটির কিছু সংখ্যক নেতা কিভাবে কৌশলে আইয়ুব সরকারের অপকর্মকে সমর্থন করছে। আবার নিজেদের বিরোধী দল হিসেবে দাবি করে এরা জনগণকে ধোকা দিতে চেষ্টা করছে। এরা নিজদেরকে চীনপন্থী বলে থাকেন। একজন এক দেশের নাগরিক কেমন করে অন্য দেশপন্থী, প্রগতিবাদী হয়? আবার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে চিৎকার করে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে যদি তদন্ত করা যায় তবে দেখা যাবে, মাসের মধ্যে কতবার এরা পিন্ডি করাচী যাওয়া-আসা করে, আর পারমিটের ব্যবসা বেনামীভাবে করে থাকে।

[১৬৮] নুরুল ইসলাম কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে ১৫ নং পুরানা পল্টন ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং সেগুনবাগান প্রেস, ১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা হইতে মুদ্রিত।

এদের জাতই হলো সুবিধাবাদী। এর পূর্বে মওলানা ভাসানী সাহেবও ছয় দফার বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ দুই পাকিস্তান নাকি আলাদা হয়ে যাবে।

মওলানা সাহেবকে আমি জানি, কারণ তিনিই আমার কাছে অনেকবার অনেক প্রস্তাব করেছেন। এমন কি ন্যাপ দলে যোগদান করেও। সেসব আমি বলতে চাই না। তবে 'সংবাদে'র সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী সাহেব জানেন। এসব কথা বলতে জহুর ভাই তাকে নিষেধও করেছিলেন। মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে এক কথা বলেন, আর পূর্ব বাংলায় এসে অন্য কথা বলে। যে লোকের যে মতবাদ সেই লোকের কাছে সেই ভাবেই কথা বলেন। আমার চেয়ে কেউ তাকে বেশি জানে না। তবে রাজনীতি করতে হলে নীতি থাকতে হয়। সত্য কথা বলার সাহস থাকতে হয়। বুকে আর মুখে আলাদা না হওয়াই উচিত।

৮ই জুন ১৯৬৬

ছয় দফা যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি, পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী যে আর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশি দিন করতে পারবেনা, সে কথা আমি এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামে গঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোনো শাসকের চক্ষু রাঙানি তাদের দমাতে পারবে না। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য শাসকশ্রেণীর ছয়দফা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা উচিত।

১৪ই জুন ১৯৬৬

Rawle Knox (Daily Telegraph, June 7, 1966) 'East Pakistan's Case' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার ব্যক্তিগত মতামত। কাগজ যে কোন মতামত দিতে পারে তাতে আমার কিছুই বলা উচিত না। তবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর জুলুমের খবর আজ আর ছাপে নাই। ৬ দফা দাবি পেশ করার সাথে সাথে দুনিয়া জানতে পেরেছে বাঙালিদের আঘাত কোথায়? বাঙালিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা এমনকি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুই নাই। ১৯ বৎসর পর্যন্ত চলেছে শোষণ আর লুণ্ঠন। এখন এরা বুঝে ফেলেছে এদের জুলুম করার কায়দা কৌশল। তবে আর বেশি দিন নাই। যদিও জাতি হিসেবে বাঙালি পরশ্রীকাতর জাতি। 'পরশ্রীকাতরতা' দুনিয়ার কোনো ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না, একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া। এটি আমাদের চরিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকার যেভাবে বাংলাকে শোষণ করেছিল তার চেয়েও উলঙ্গভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি কলোনিয়াল শোষকরা পূর্ব বাংলাকে শোষণ করছে। ইংরেজদের শাসনের সময়ও ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য বাঙালির অভাব হয় নাই। আজও হবে না। তবে যারা ত্যাগ করতে পেরেছে–ত্যাগ করে যাক, দুঃখ ও আফসোস করার কোনো দরকার নাই। সাংবাদিক Rawle Knox একটি সত্য কথা লিখেছেন, 'If Rawalpindi continues to believe that the revolutionary spirit of Bengal is something of a joke, the Pakistani capital could be making quite a mistake.'

পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য আমারও মনে হয় ৬ দফা দাবি মেনে নেওয়া উচিত - শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ করে আইয়ুব খান ও তার অনুসারীদের। তা না হলে পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাঙালির একটি গোঁ আছে, যে জিনিস একবার বুঝতে পারে তার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণও করতে পারে। পূর্ব বাংলার বাঙালি এটা বুঝতে পেরেছে যে এদের শোষণ করা হতেছে চারদিক দিয়ে। শুধু রাজনৈতিক দিক দিয়েই নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে।

২৫শে জুন ১৯৬৬

ন্যাপের কোনো কোনো নেতা ৬ দফা গোপনে গোপনে সমর্থন করলেও লজ্জায় বলেন না, আর কেউ কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। দিন আসছে ৬ দফা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মেনে এদেশে রাজনীতি করতে হবে না। তবে রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন অনেকেই।

২৮শে জুন ১৯৬৬

খবরের কাগজ এসেছে। ভাসানী সাহেবের রাজনৈতিক অসুখ ভাল হয়ে গেছে। যখন গুলি চলছিল, আন্দোলন চলছিল, গ্রেপ্তার সমানে সমানে চলেছে তখন দেখলাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার দেখলাম দুই তিন দিন পরে কোথায় যেতে ছিলেন পড়ে যেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। হঠাৎ অসুস্থ মানুষ আবার বাড়ির বাহির হলেন কি করে? যখন আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য কর্মীরা কারাগারে, এক নারায়ণগঞ্জে সাড়ে তিনশত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে, তখনও কথা বলেন না। আওয়ামী লীগ যখন জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করল তখন একদল ভাসানী পন্থী প্রগতিবাদী(!) এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে সরকারের সাথে হাত ও গলা মিলিয়েছে। এখন তিনি হঠাৎ আবার সর্বদলীয় যুক্তফ্রন্ট করবার জন্য আহবান জানিয়েছেন এবং নিজে ময়দানে নামবেন।

মওলানা সাহেব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আইয়ুব খানকে সমর্থন করে চলেছেন। মাওলানা সাহেবের সাথে যদি যুক্তফ্রন্ট করতে হয় তবে আইয়ুব সাহেবই বা কি অন্যায় করেছেন? মওলানা সাহেব তো দেশের সমস্যার চিন্তা করেন না। বৈদেশিক নীতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশে গণআন্দোলন বা দেশের জনগণের দাবি পূরণ ছাড়া বৈদেশিক নীতিরও কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। জনগণের সরকার কায়েম হলেই, জনগণ যে বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করতে বলবে, নির্বাচিত নেতারা তাহাই করতে বাধ্য। ডিক্টেটর যখন দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছে এবং একটা গোষ্ঠীর স্বার্থেই বৈদেশিক নীতি ও দেশের নীতি পরিচালনা করছে তার কাছ থেকে কি করে এই দাবি আদায় করবেন আমি বুঝতে পারছি না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, খাদ্য, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে তখন পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে এখন এসেছেন যুক্তফ্রন্ট করতে। আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতা ও কর্মী কারাগারে বন্দি, কেহ কেহ আত্মগোপন করে কাজ করছে, এখন যে কয়েকজন বাইরে আছে তারা কিছুতেই এদের সাথে যোগদান করতে পারে না। আর ছয় দফা দাবি ছেড়ে দিয়ে কোনো নিম্নতম কর্মসূচি মেনে নিতে পারে না। ছয় দফাই নিম্নতম কর্মসূচি। কোনো আপোষ নাই। জনগণ যখন এগিয়ে এসেছে দাবি আদায় হবেই। আওয়ামী লীগ সংগ্রাম করে যাবে। জনগণকে আর ধোকা দেওয়া চলবে না। অনেক জগাখিচুড়ি পাকানো হয়ে গেছে। আর না। ভাসানী সাহেব এগিয়ে যান আইয়ুব সাহেবের দল নিয়ে। এখন তো তিনি সুখেই আছেন, আর কেন মানুষকে ধোকা দেওয়া? আওয়ামী লীগ বা তার নেতারা যদি ছয় দফা দাবি ত্যাগ করে আপোষ করতে চান তারা ভুল করবেন। কারণ তাহলে জনগণ তাদেরও ত্যাগ করবে।

২রা জুলাই ১৯৬৬

আজ আইয়ুব সাহেবের মাস পহেলা বক্তৃতা পড়লাম। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বেতার ভাষণে বলেন যে, 'মানুষের আবেগ প্রবণতা নিয়া খেলা করতে অভ্যস্থ এইরূপ একটি গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করিয়াছিল। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়া তাহারা এমন একটি কর্মসূচি চালু করতে প্রয়াসী হইয়াছিল যাহা দেশের বিভিন্ন অংশে কেবলমাত্র ঘৃণা ও বিদ্বেষেরই প্রসার ঘটাইত। সরকার ধৈর্য সহকারেই এই সব লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ায় সরকার বাধ্য হইয়া কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।'

তিনি বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত এবং জনগণ ভুল পথে পরিচালিত হওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে।' তিনি এইজন্য আল্লাহ তায়ালাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।'

প্রেসিডেন্ট বলেন যে, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ চিরদিনই যে অবিচ্ছেদ্য থাকবে, তা আমার পক্ষে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নাই। উভয় অংশের জনগণের সম্মুখে একই বিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।' তিনি আরও অনেক কিছু বলিয়াছেন, দেশের অন্যান্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব গোড়ায়ই গলদ করেছেন। যে কর্মসূচির কথা উনি আলোচনা করেছেন তার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করার কোনো কর্মসূচি নাই। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন নয় এবং যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম করা হয়েছিল তার মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথা পরিষ্কার ভাষায় লেখা ছিল। তিনি সে সম্বন্ধে ভাবলেন না। আর যে গোষ্ঠীর কথা বলেছেন, তারা পাকিস্তান কায়েম করার জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি যাদের নিয়ে শাসন করছেন তারা অনেকেই পাকিস্তানের আন্দোলনে শরীক তো হনই নাই, বৃটিশকে খুশি করার জন্য বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি যদি সময় না পেয়ে থাকেন পড়তে, তাঁকে আমি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান–দুইটা রাষ্ট্র গঠন হওয়া সম্বন্ধে কিছু ইতিহাস দিতে চাই। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ যে অবিচ্ছেদ্য সে সম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ নাই। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন চায়, কারণ ১৯ বৎসর পর্যন্ত ছলে বলে কৌশলে এবং মীরজাফরদের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে এমন এক জায়গায় আনা হয়েছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে, শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম করা ছাড়া তাদের উপায় নাই। যখন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়ার কথা হয়েছে, তখনই এই একই কথা একইভাবে সকলের মুখ দিয়েই শুনেছি। তবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সাময়িকভাবে অত্যাচার করে বন্ধ করলেও অদূর ভবিষ্যতে এমনভাবে শুরু হতে বাধ্য, যারা ইতিহাস পড়েন তারা তা জানেন। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি শাসকগোষ্ঠী যদি অত্যাচার করে দাবাইয়া দিতে চান তার পরিণতি দেশের জন্য ভয়াবহ হবে।

ভারতের মুসলমানরা যখনই তাদের অধিকারের জন্য দাবি করেছে তখন বর্ণ হিন্দু পরিচালিত কংগ্রেস তার বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছে, 'মুসলমানরা স্বাধীনতা চায় না'। মুসলমানরা ফেডারেল ফর্মের সরকার দাবি করেছিল, কিন্তু কংগ্রেস এককেন্দ্রিক সরকার গঠন করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকল। মুসলমানরা বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হলে এই কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শাসন চালাতে পারে, এ জন্য ফেডারেল ধরনের শাসনতন্ত্র দাবি করল।

১৯২১ সালে মওলানা হসরত মোহানী যখন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'The fear of Hindu majority can be removed, if an Indian Republic was established on federal basis, similar to that of United States of America.'

ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া হলে যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানে মুসলমানরা শাসন করতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস এতে রাজি হলো না, যদিও এই বৎসর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা স্থায়ী শান্তি প্রচেষ্টা খুব ভালভাবে চলছিল।

১৯২৪ সালে মি. জিন্নার সভাপতিত্বে লাহোরে মুসলিম লীগের যে সভা হয় সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব করা হয়েছিল। তা এই, 'It envisaged that the existing provinces shall be united under a common government on federal basis, so that each province shall have full and complete provincial autonomy, the functions of the central government being confined to such matters only as are of general and common concerns.'

এই প্রস্তাবেও কংগ্রেস রাজি হতে পারলো না। ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় কনফারেন্সে মতিলাল নেহেরুকে ভার দেওয়া হলো একটা রিপোর্ট দাখিল করতে, যাতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ রিপোর্ট আরও বিভেদ সৃষ্টি করল।

এর পরেই কলিকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হলো নেহেরু রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা ও তা গ্রহণ করার জন্য। মি. জিন্না তখন কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব দিলেন এবং দুনিয়ার বহুদেশের শাসনতন্ত্রও সেখানে উল্লেখ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার একটি সংশোধনী প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল না। তিনি চোখের পানি ফেলে বের হয়ে এসেছিলেন। মি. জিন্নাকে 'হিন্দু মুসলমানের মিলনের দূত' বলা হতো। এর পরেই ছোট ছোট যে দলাদলি মুসলমানদের মধ্যে ছিল তা শেষ হয়ে গেল। স্যার মহম্মদ সফি ও মি. জিন্নার দল একতাবদ্ধ হয়ে ১৯২৮ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স ডাকলেন দিল্লীতে। সেখানে তাঁদের পুরানা দাবি ফেডারেল সরকারের প্রস্তাব দিলেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের দাবি কি হবে সেগুলিও গ্রহণ করলেন। সেখানে তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এরপরেই জিন্না সাহেবের ১৪ দফা বের হলো। এতে ছিল, 'It pointed out that no constitution would be acceptable to Muslims unless and until it is based on federal principles with residuary powers vested in the province.'

১৯৩০-৩১ সালে যে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স বিলাতে হয় তাতে ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই একই দাবি স্যার সফি করেছিলেন। এমনকি মওলানা মহম্মদ আলি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী র‌্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে ১৯৩১ সালে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, মুসলমানদের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ফেডারেল শাসনতন্ত্র–যেখানে প্রদেশগুলি পাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।

১৯৩৭ সালে কয়েকটা প্রদেশে কংগ্রেস শাসিত মুসলমানদের উপর ভাল ব্যবহার করা হলো না। আলোচনা হয়েছিল প্রদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হউক। কংগ্রেস রাজি হয় নাই। তার পরেই ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগ গ্রহণ করে। যার ফলে আজ ভারতবর্ষ দুই দেশে ভাগ হয়েছে।

আজ যারা ৬ দফার দাবি যথা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করার দাবি বলে উড়াইয়া দিতে চায় বা অত্যাচার করে বন্ধ করতে চায় এই আন্দোলনকে, তারা খুবই ভুল পথে চলছে। ছয় দফা জনগণের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা মরার দাবি। এটাকে জোর করে দাবান যাবে না। দেশের অমঙ্গল করা হবে একে চাপা দেবার চেষ্টা করলে। কংগ্রেস যে ভুল করেছিল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ফেডারেল শাসনতন্ত্র না মেনে আমাদের শাসকগোষ্ঠীও সেই ভুল করতে চলেছেন। যখন ভুল বুঝবে তখন আর সময় থাকবে না। আমরা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করি, তবে আমাদের ন্যায্য দাবিও চাই, অন্যকেও দিতে চাই। কলোনি বা বাজার হিসেবে বাস করতে চাই না। নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার চাই।

১৯শে জুলাই ১৯৬৬

মওলানা ভাসানী সাহেব হঠাৎ সুস্থ হয়ে ঢাকায় এসেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ৬ দফা সমর্থন করেন না। তবে স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেন। কারণ, তার পার্টির জন্ম হয় স্বায়ত্তশাসনের দাবির মাধ্যমে। কাগমারি সম্মেলনের কথাও তিনি তুলেছেন। তিনি নাকি দেখে সুখী হয়েছেন যে, একসময়ে যারা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করবার জন্য তার বিরোধিতা করেছেন তারাই আজকাল স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছে। মওলানা সাহেব বোধহয় ভুলে গিয়াছেন, ভুলবার যদিও কোনো কারণ নাই, সামান্য কিছুদিন হলো ঘটনাটা ঘটেছে। খবরের কাগজগুলি আজও আছে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের কর্মীরা আজও বেঁচে আছে। তারা জানে, বিরোধ ও গোলমাল হয় বৈদেশিক নীতি নিয়ে। সে গোলমালও মিটমাট হয়ে গিয়েছিল সম্মেলনের পূর্বের রাতে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ।

মওলানা সাহেবই সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সমর্থন করে ওয়ার্কিং কমিটিতে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের ১২ জন সদস্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আছে, শহীদ সাহেবকে নিয়ে ৮০ জন সদস্যের মধ্যে। ১২ জনের নেতা প্রধানমন্ত্রী, কেমন করে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করা সম্ভবপর হবে। শহীদ সাহেব যখন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন করে দিয়েছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা জনগণকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন তাড়াতাড়ি সাধারণ নির্বাচন দিতে তখন আমরা বৈদেশিক নীতি নিয়ে আর হৈচৈ করবো না - যে পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন না হয়'। ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, 'পার্লামেন্টারী পার্টির হাতে ক্ষমতা দিতে। বৈদেশিক নীতি বিষয়ে পার্লামেন্টারী পার্টি যাহা ভাল মনে করে, করবেন।' সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যাওয়ার পরে মওলানা সাহেব খবরের কাগজে অসত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, 'বৈদেশিক নীতির প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং ভাসানীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে'। বৈদেশিক নীতির উপরে কোনো প্রস্তাবই নেওয়া হয় নাই, আর হবেনা বলেও ঠিক করা হয়েছিল। মওলানা সাহেব জানতেন, কাউন্সিল সভায় তাঁর কোনো প্রস্তাবই পাশ হবে না। কারণ, সদস্যগণ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে শ্রদ্ধা করতেন এবং সমর্থন করতেন। কয়েক মাস পরে ঢাকার নিউ পিকচার্স হাউস ও গুলিস্তান সিনেমা হলের সম্মেলনে ভাসানী সাহেব মাত্র ৪৩ ভোট পেয়েছিলেন ৮৩৪ ভোটের মধ্যে। সেখানে স্বায়ত্তশাসনের কোনো কথাই ওঠে নাই। কারণ, আওয়ামী লীগের যেদিন জন্ম হয় সেইদিন থেকেই স্বায়ত্তশাসনের বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করছে। মওলানা সাহেব বোধহয় ভুলে গেছেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে পার্লামেন্টে যখন শাসনতন্ত্র তৈয়ার হয়, তখন স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করে আওয়ামী লীগ প্রত্যেক দফায় সংগ্রাম করেছিল। এখনও কেন্দ্রীয় আইন সভার রেকর্ড থেকে তা পাওয়া যাবে। আর আমার কাছেও সেগুলি আছে। এমনকি জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব বলেছিলেন, 'আমরা দুইটা দেশ; কিন্তু একটা জাতি তৈয়ার করতে হবে' (বাকি কথাগুলি আমার ঠিক মনে নাই)। সেইজন্যই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এই রকম শত শত এমেন্ডমেন্ট আবুল মনসুর আহমদ সাহেব, জহিরুদ্দিন, দেলদার সাহেব, খালেক সাহেব, আমি ও আরও অনেকে দিয়েছিলাম। স্বায়ত্তশাসন না দেওয়ায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবসহ আমরা সকলে ওয়াক আউট করেছিলাম।

আওয়ামী লীগ ভেঙে যখন ন্যাপ করা হলো, তখন বৈদেশিক নীতির উপরই হয়েছিল বলে এতদিন মওলানা সাহেব বলতেন, এবার নতুন কথা শুনলাম। কিছুদিন বেঁচে থাকলে অনেক নতুন কথাই তিনি শোনাবেন। যেমন, তিনি কোনোদিনই মওলানা পাশ করেন নাই তবুও মওলানা সাহেব না বললে বেজার হন।

ন্যাপ কেন হয়েছিল? আদর্শের জন্য নয়। মওলানা সাহেবের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা খুব বেশি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেন নাই এবং তার মধ্যে এতো ঈর্ষা দেখা দেয় যে, গোপনে ইস্কান্দার মির্জার সাথে হাত মিলাতেও তার বিবেকে বাধে নাই। তিনি মির্জা সাহেবকে মিশরের নাসের করতে চেয়েছিলেন। তাকে লোকে চিনতে পেরেছে, তার অনশন আমার জানা আছে। নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি আইয়ুব সাহেবকে সমর্থন করবেন, না আন্দোলন করবেন তার কথায় বোঝা কষ্টকর। মওলানা সাহেব ৬ দফা সমর্থন না করলেও আন্দোলন চলছে, চলবে এবং আদায়ও হবে। জনগণ ৬-দফাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে।

২৩শে মার্চ ১৯৬৭

পাকিস্তান দিবস আজ। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলীম লীগ লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করে। মরহুম শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এইদিনে পাকিস্তানকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয়। এই দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র তৈয়ার না করার জন্য দুই পাকিস্তানে আজও ভুল বুঝাবুঝি চলছে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি কলোনিতে পরিণত করা হয়েছে। আমি যে ৬ দফা প্রস্তাব করেছি, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে - লাহোর প্রস্তাব ভিত্তি করে, সে প্রস্তাব করার জন্য

আমি ও আমার সহকর্মীরা কারাগারে বন্দি। ইত্তেফাক কাগজ ও প্রেস বাজেয়াপ্ত এবং মালিক ও সম্পাদক মানিক ভাই কারাগারে বন্দি। এই দাবির জন্যই ৭ই জুন ৭ শত লোক গ্রেপ্তার হয় এবং ১১ জন জীবন দেয় পুলিশের গুলিতে। আমি দিব্যচোখে দেখতে পারছি দাবি আদায় হবে, তবে কিছু ত্যাগের প্রয়োজন হবে। আজকাল আবার রাজনীতিবিদরা বলে থাকেন লাহোর প্রস্তাবের দাম নাই। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দিলে পাকিস্তান দুর্বল হবে। এর অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি লোককে বাজার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যদি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। চিরদিন কাহাকেও শাসন করা যায় না, যতই দিন যাবে তিক্ততা আরও বাড়বে এবং তিক্ততার ভিতর দিয়ে দাবি আদায় হলে পরিণতি ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা আছে। লাহোর প্রস্তাব আমি তুলে দিলাম : 'Resolved that it is the considered view of this session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, namely, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western and Easter Zones of India, should be grouped to constitute Independent States in which constituent units shall be autonomous and sovereign'."[১৬৯]

০৩.

সত্তরের নির্বাচনী বক্তৃতায় ছয়দফা প্রসঙ্গ

"... ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এ সব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট চাহিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্নের চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে।

কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যারা আঁৎকিয়া উঠেন, তারা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

তারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দূর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দূর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া

---

[১৬৯] শেখ মুজিবুর রহমান/কারাগারের রোজনামচা ॥ [বাংলা একাডেমি - মার্চ, ২০১৭। পৃ. ৫৭-৫৮/৭৩/৮৮-৮৯/১২৫/১৩২-১৩৩/১৩৯-১৪২/১৬৯-১৭১/২১৩-২১৪]

যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল রাখিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুষমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন - কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তারই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ।

আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

... ৬ দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে - সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি শেষবারের মত আহবান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনকিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না।

আমরা এ শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ। কোরান ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোন আইন এদেশে পাশ হতে বা চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না॥”[১৭০]

(রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত ভাষণ–১০.১০.১৯৭০ইং)

দুই

রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা ছয়দফা

০১.

“... ছয় দফার প্রণেতা কে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন সিভিল সার্ভিসের কয়েকজন সদস্য এটা তৈরি করে শেখ মুজিবকে দিয়েছিলেন, কেউ কেউ সে কৃতিত্ব কিংবা দোষ দিয়েছিলেন কয়েকজন সাংবাদিককে। তাদের পেছনে কোন শক্তি কাজ করছিল, সে বিচারও হয়েছিল। প্রথমে উঠেছিল ভারতের নাম। কিন্তু পাকিস্তান হওয়া অবধি তো দেশের বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ভারতের প্ররোচনা বলে। পরে বড়ো করে যে নাম উঠলো, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব এবং ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্টের বন্ধুত্বের কারণে পাকিস্তান ভাঙার উদযোগ নিচ্ছে মার্কিনরা, এমন একটা ধারণা খুব প্রচলিত হয়েছিল। আমরা যারা একটু বামঘেঁষা ছিলাম, তারা এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলাম। ফলে, ফেডারেল পদ্ধতি ও স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষপাতী হলেও ছয় দফাকে আমরা তখন গ্রহণ করিনি। আমরা আরো শুনেছিলাম যে, পাকিস্তান ভাঙতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি করতে দেওয়া হবে; সুতরাং এ কাজে মার্কিনদের উৎসাহ তো থাকবেই। যদি প্রশ্ন উঠতো যে, পাকিস্তান তো সেনটো-সিয়াটোর সদস্য, তাহলে জবাব পাওয়া যেতো যে, পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ওসব জোটের অসারতা প্রমাণ হয়ে গেছে এবং পাকিস্তান যে কোন সময় তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। পাকিস্তান কখনোই এসব সামরিক জোট ছাড়েনি, তবে আইয়ুব খানের ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্সে’র প্রচারিত নীতি কিছুটা এ ধারণাকে পুষ্ট করেছিল॥” [১৭১]

০২.

“... (তাসখন্দে) কয়দিন আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আয়ুব ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী একটি যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সিদ্বান্ত হল, শান্তিপূর্ণ ভাবে উভয় পক্ষ নিজেদের ছোট বড় সমস্যার সমাধান করবে।

---

[১৭০] শেখ মুজিবুর রহমান/মুজিবরের রচনা সংগ্রহ ॥ [প্রকাশক: সোমেন পাল/রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন (কলিকাতা) - ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৮ (প্রথম প্রকাশ)। পৃ. ১৮-১৯/৫৫]

[১৭১] ড: আনিসুজ্জামান/কাল নিরবধি ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী, ২০০৩। পৃ. ৪২৮]

আশ্চর্যের কথা, যা' নিয়ে যুদ্ধ, অর্থাৎ কাশ্মীর, তার নামগন্ধও এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রইল না। এত কান্ড করে, এত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, সারা পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত হল, ওম্ শান্তি।

পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য শহর বাজার গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেরা সৈনিক নিহত হয়েছেন। পৃথিবীর কোন যুদ্ধে নাকি এত অল্প সময়ে এত অফিসার নিহত হয় নাই। তাদের স্থান পূরণ সম্ভব হবে না। তাই, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিরুপ ছিল। এত ক্ষয়ক্ষতির পর আয়ুব খাঁ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে অপমান-জনক একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এই চুক্তি অপরাধ স্বীকৃতির শামিল বলে তারা মনে করে।

যে সব সৈনিক কর্মচারী শহীদ হয়েছেন তাদের বিধবা স্ত্রী ও পরিবারবর্গ এক মিছিল বার করল লাহোর শহরে। ধ্বনি তুলল, আমাদের স্বামী পুত্র ফেরত দাও। তারা শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নাই। অনর্থক আপনি তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন। অকারণে তাদের অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। যদি দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য হতো, তা হলে আপনি এমন চুক্তি কেন স্বাক্ষর করলেন? ইত্যাদি -

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ-ছয় তারিখে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করলেন। এই উপলক্ষে চৌধুরী মহম্মদ আলি ও নবাবজাদা নসরুল্লাহ খাঁ ঢাকা এসে সব দলের সাথে আলাপ আলোচনা করে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। বললেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক এই মূহুর্তে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।

জামাত, নিজাম ও কাউন্সিল লীগ যোগদানে সম্মতি দিল। আওয়ামী লীগেরও দোমনাভাব। শেখ মুজিবের মতামতই দলের মত। প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন অভিমত নাই। শেখ মুজিব কনফারেন্সে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এন-ডি-এফ সভা করে মত প্রকাশ করল যে, কনফারেন্সের পক্ষে আমাদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে, তবে বর্তমান অবস্থায় কোন সদস্য এতে যোগদান করতে পারছেনা। শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোনে বললেন, আপনারা ঠিকই করেছেন। আমরাও যাবনা।

পরদিন সংবাদপত্রে দেখি, শেখ মুজিব সদলবলে লাহোর যাচ্ছেন। প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন এক দলে। ব্যাপার কি? হঠাৎ মত পরিবর্তন। মতলবটা কি?

লাহোর কনফারেন্স শুরু হল গভীর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে।

অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ একটি বোমা নিক্ষেপ করলেন - 'ছয় দফা'। প্রস্তাব বা দাবির আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হল। কোন বক্তৃতা বা প্রস্তাব নাই, কোন উপলক্ষ নাই, শুধু কাগজ বিতরণ। পড়ে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয় কনফারেন্সে এই দাবি নিক্ষেপ করার কি অর্থ হতে পারে? কনফারেন্স ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে। এই দাবি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, এই সম্মেলন ও এই সময় তার উপযোগী নয় - সম্পূর্ণ অবান্তর।

তারপর দলবলসহ শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে এসে মহাসমারোহে 'ছয় দফা' প্রচার করলেন সংবাদপত্রে। শেখ মুজিবের দাবি ও নিজস্ব প্রণীত বলে ছয়-দফার অভিযান শুরু হয়ে গেল।

ছয় দফার জন্মবৃত্তান্ত নিম্নরুপ : কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল লোক দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরাবস্থার কথা আলাপ আলোচনা করেন। আমাদের ইঙ্গিত ও ইশারা পেয়ে তারা একটা খসড়া দাবি প্রস্তুত করলেন। তারা রাজনীতিক নয় এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টও নয়। তারা 'সাতদফার' একটা খসড়া আমাদের দিলেন। উদ্দেশ্য, এটা স্মারকলিপি হিসাবে আয়ুব খাঁর হাতে দেওয়া, কিংবা জাতীয় পরিষদে প্রস্তাবাকারে পেশ করার ব্যবস্থা করা।

এই খসড়ার নকল বিরোধীদলীয় প্রত্যেক নেতাকেই দেওয়া হয়। শেখ মুজিবকেও দেয়া হয়। খসড়া রচনার শেষ বা সপ্তম দফা আমরাও সমর্থন করি নাই। শেখ মুজিব সেই দফা কেটে দিয়ে ছয়দফা তারই প্রণীত বলে চালায়ে দিল। তারপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ছয় দফার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক মর্ম ও তাৎপর্য লেখায়ে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজি ও বাংলায় মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয় সারা দেশব্যাপী।

লাহোর কনফারেন্স বানচাল হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকেই এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেন। তারা অভিযোগ করেন, শেখ মুজিব সরকার পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে এই কর্ম করেছেন। লাহোরে পৌঁছার সাথে সাথে আয়ুব খাঁর একান্ত বশংবদ এক কর্মচারী শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে কি মন্ত্র তার কানে ঢেলে দেয় যার ফলেই শেখ মুজিব সব উলটপালট করে দেয়। তারা এও বলে যে আওয়ামী লীগের বিরাট বাহিনীর লাহোর যাতায়াতের ব্যয় সরকারের নির্দেশে কোন একটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহন করে। আল্লাহ আলীমূল গায়েব।"[১৭২]

০৩.

"... While the 'Six Points' gave rise to a lot of controversy, unfortunately no one thought it fit to find out who could be the author of such an outlandish scheme calculated to bring about radical change in the structure of the government of the country. Apart from the question of merit, a lot of thought and political acumen must have been devoted in the preparation of such a scheme which, prima facie, not only looked simple, but was calculated to provide answers to many of the political and economic problems besetting the province. A note-worthy aspect of the scheme was that it did not ask the central government to do more for the province; on the contrary, it contemplated a change in the constitution to enable the province to do more for itself, and relieve the centre of such functions which it was not in a position to perform to the satisfaction of the province.

Although the demand for autonomy was not anything new in the political firmament of the country, there was no indication that the Awami League or any other party ever devoted itself to working out a feasible scheme of a new set-up as an alternative, in keeping with their ideas. The exercise itself would have generated a lot of discussion and attracted attention of the intelligentsia before the scheme could be finalized. No one could imagine that such a scheme could be the brainchild of Sheikh Mujibur Rahman; it could be an exercise from which others had to be excluded until it emerged in the form of the Six Points. None came forward to claim its authorship. The scheme was designed to meet the requirements at a psychological moment, when the people were thrown into a state of perplexity regarding the future of their province and were in search of a panacea for their emancipation."[১৭৩]

০৪.

"... এক বছর সময় পেয়েছিল ন্যাপ সংগঠিত করতে। এরপরই মার্কিন অনুপ্রাণিত সামরিক শাসন প্রবর্তন হলো পাকিস্তানে। ফলে নতুন দল হিসেবে জনগণের কাছে পৌঁছানোও সেভাবে সম্ভব হলো না। কিন্তু আওয়ামী লীগ ৯ বছরের পুরনো যে অবকাঠামো গড়ে তুলেছিল, সেটি টিকে ছিল এই দুর্যোগেও। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সুযোগটা বেশি ছিল। তাই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৬৯ সালের জুনে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে ব্যাপক

---

১৭২ আতাউর রহমান খান (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)/স্বৈরাচারের দশ বছর ॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - ১৯৭০। পৃ. ৩৫৪-৩৫৫]

১৭৩ Kazi Anwarul Huque/In Quest of Freedom \ [UPL - April, 1991| P. 168-169]

গণতান্ত্রিক ১৪ দফা কর্মসুচি প্রণয়ন করেছিল তা খুব বেশি প্রচার পেল না। অথচ ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ যে ৬ দফা জনসাধারণকে পেশ করল তাতে অনেক বেশি চমক ও চটক সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া আওয়ামী লীগ এতদিনের মওলানা ভাসানীর গড়ে তোলা দল তার ভিত্তি অনেক মজবুত ছিল বলে ৬ দফার প্রচার প্রচারণা ব্যাপক হলো এবং দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক শাসকেরা এবেলা গ্রেফতার করে ওবেলা ছেড়ে দিচ্ছিল, বারবার গ্রেফতার এবং মুক্তির কারণে জনগণের মধ্যেও এক ধরণের কারিশমা গড়ে উঠেছিল॥"[১৭৪]

০৫.

"... মুনতাসীর মামুন : ৬-দফা সম্পর্কে আপনার মত কী?

জেঃ রাও ফরমান আলি : কথা ছিল ছয়দফার সংশোধন করে তা সহনীয় করে তুলবেন। কেননা, ওটা কোনও কুরআনী কানুন তো ছিল না। ৬-দফা আর যা-ই হোক বেহেশত থেকে আসেনি। আর এও আমাদের জানা ছিল আওয়ামী লীগের ভেতরেই কিছু লোক ছিল যাদের মধ্যে ছয়দফার বিষয়গুলির ধারণা নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুজিব যদি কম ভোট পেতেন তাহলে তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই সবকিছু করার অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত সুযোগ পেতেন। কিন্তু কল্পনাতীত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলেন তিনি। মাত্র দুটি আসনে হারতে হয় তাকে। আর এর পরিণতিতে তিনি ৬-দফার দাবিদারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। কাজেই ছয়দফার প্রশ্নে সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষনা ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর রইল না। ৬-দফা চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠল। ৬-দফা হয়ে গেল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন - এ জাতীয় অনিবার্য কিছু। অথচ রাজনীতিতে লেনদেনমূলক আলাপ-আলোচনা চলছিল এমন সময়ে এটি হওয়া উচিত ছিল না॥"[১৭৫]

০৬.

"... Mujib's programme, on which he based his election campaign and won a landslide victory in East Pakistan, was like many other political programmes - capable of more than one interpretation. The identity of its real authors or draftsmen is still a matter of speculation. Rumour went so far as to make the author Altaf Gauhar, one of the most trusted and close members of the ruling elite during the Ayub era; the hint was made in certain quarters that Ayub himself asked Altaf Gauhar to do this job at a time when there was great unrest in West Pakistan over the Tashkent agreement, and that Ayub wanted to divert the attention of West Pakistan by raising the specter of the secession of East Pakistan.

But during my four years stay in Islamabad, both during and after the fall of Ayub, I could find no basis for such a rumour. Nor can I believe that Ayub with his very real patriotism could resort to such a trick; with all his limitations, Ayub was a great Pakistani leader and a statesman. A shrewd document like this was most likely the joint product of several intellectual advisers and associates of Mujib."[১৭৬]

০৭.

"... অনেকের, এমনকি খোদ আওয়ামী লীগারদেরও অনেকের, বিশ্বাস, 'ছয় দফা' আমিই রচনা করিয়াছি। যুক্তফ্রন্টের 'একুশ দফাও' আমিই রচনা করিয়াছিলাম। এই সুপরিচিত তথ্য হইতেই সকলে ঐ সহজেই 'ছয় দফাও' আমার রচনার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন। আসল সত্য তা নয়। আমি 'ছয় দফা'

---

[১৭৪] কামাল লোহানী/রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতার ॥ [ভূমিকা - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ৩১]

[১৭৫] মুনতাসীর মামুন/পরাজিত জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ ॥ [সময় - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯। পৃ. ১০৯]

[১৭৬] G. W. Choudhury (member of the Pakistan cabinet - 1967-71)/The Last Days of United Pakistan \ [UPL - 1994 (first ed. 1974)] P. 134]

রচনা করি নাই। 'ছয় দফার' ব্যাখ্যায় বাংলা-ইংরেজি যে দুইটি পুস্তিকা 'আমাদের বাঁচার দাবি' ও 'আওয়ার রাইট টু লিভ' প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত হইয়াছে, এই দুইটি অবশ্যই আমি লিখিয়াছি এবং বরাবরের মত নির্ভুল ছাপা হওয়ার গ্যারান্টি স্বরূপ আমি নিজেই তাদের প্রুফও দেখিয়া দিয়াছি। মুজিবের ভালর জন্যই একথাটা গোপন রাখা স্থির হইয়াছিল। সে গোপনতার হুঁশিয়ারি হিসাবে প্রুফ নেওয়া-আনার দায়িত্ব পড়িয়াছিল তাজউদ্দিনের উপর। মানিক মিয়া, মুজিব, তাজউদ্দিন ও আমি এই চারজন ছাড়া এই গুপ্ত কথাটা আর কেউ জানিতেন না। অথচ অল্প দিনেই কথাটা জানাজানি হইয়া গেল। মুজিব তখন জেলে। আমি ভাবিলাম, মুজিবের কোনও বিরোধী পক্ষ তার দাম কমাইবার অসাধু উদ্দেশ্যে এই প্রচারণা চালাইয়াছে। কাজেই আমি খুব জোরে কথাটার প্রতিবাদ করিতে থাকিলাম। পরে শেখ মুজিবের সহকর্মী মরহুম আবদুস সালাম খাঁ ও যহিরুদ্দিন সাহেবানদের মুখে যখন শুনিলাম, স্বয়ং মুজিবই তাদের কাছে একথা বলিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত ও আস্বস্ত হইলাম॥"[১৭৭]

০৮.

"... The right wing Opposition in West Pakistan condemned the Tashkent Declaration as a humiliating document. A two-day conference of Awami Party, was convened in Lahore on 5 February where a resolution moved by Maulana Maududi was unanimously adopted, condemning the Tashkent Declaration as detrimental to Pakistan's interests. The West Pakistan government imposed a black-out on the proceedings of the meeting. It was at this meeting that Sheikh Mujib presented his six-points programme. None of the Opposition leaders criticized that programme, nor did anyone dissociate himself from it. To cover their own political bankruptcy they floated a ridiculous rumour that Mujib's six-points had been drafted by the Information Secretary (present writer) at the behest of Ayub to disunite the Opposition."[১৭৮]

০৯.

"... দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ছয়-দফা বনাম এগার-দফা। ছয়-দফাকে কেউ কেউ পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সনদ বলে অভিহিত করছেন। অথচ যিনি ছয়-দফার উদ্গাতা তিনিও এ দাবি করেননি। ছয়-দফা একান্তভাবেই একটি শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা, যা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত করেছে। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি আওয়ামী লীগের পত্তন থেকেই এ দলের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান খুঁটি ছিল। আওয়ামী লীগ - যে কারণে জনপ্রিয়তা অর্জন করে তার মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি ছিল অন্যতম প্রধান দাবি। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে যে দুটি কারণে আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়ে গেল সেগুলো ছিল স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্ন। এ দুটো প্রশ্নে দলীয় নীতি বিসর্জন দেওয়া হয়েছে - এই অভিযোগ উত্থাপন করেই মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অধ্যাপক মোজাফফর, তোয়াহা, মহিউদ্দীন প্রমুখ নেতা ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মেনিফেস্টোতে দেশরক্ষা, মুদ্রা ও বৈদেশিক নীতি কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকী সব ক্ষমতা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত রাখার দাবি স্থান পেয়েছে। দশ বছর পর, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য ও মুদ্রার ক্ষেত্রেও কতগুলো বিশেষ অধিকার দাবি করেন। ছয়-দফা তারই অভিব্যক্তি। কাজেই ছয়-দফা মূলত: স্বায়ত্তশাসনেরই দাবি। এ স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা কি হবে, কি কি শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ প্রয়োজন, সেটা নিশ্চয়ই জনপ্রতিনিধিরা এক সাথে বসে ঠিক করবেন। সেখানে একটিমাত্র ফর্মুলাই সঠিক, অন্যগুলো সঠিক নয় এটা মনে করার কোন কারণ নেই। এখন প্রশ্ন হল, ছয়-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন

---

[১৭৭] আবুল মনসুর আহমদ/আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ॥ [খোশরোজ কিতাব মহল - সেপ্টেম্বর, ২০১৩। পৃ. ৫৩২]

[১৭৮] Altaf Gauhar (Information Secretary - 1963-69)/Ayub Khan : Pakistan's First Military Ruler \ [UPL - 1996| P. 275]

এলেই কি পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মুক্তি এসে গেল? কিম্বা তাদের জীবনের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে গেল? তা হবে না। কারণ স্বায়ত্তশাসন জনপ্রতিনিধিদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণের একটা উপায়মাত্র। জনপ্রতিনিধিরা সে ক্ষমতা কার জন্য এবং কীভাবে প্রয়োগ করবেন সেটা নির্ধারিত না হলে এর দ্বারা গণজীবনে বাঞ্ছিত ফললাভ হবে না এবং এই প্রশ্নেই ছয়-দফা নীরব। শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পাবে কিনা, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারীরা আহার ও বাসস্থানের নিরাপত্তা পাবে কিনা, কৃষক তার জমির উপর অধিকার পাবে কিনা - সে সম্পর্কে ছয়-দফায় কোন উল্লেখ নেই। কাজেই ছয়-দফাকে জনগণের মুক্তির সনদ আখ্যায়িত করা ভুল এবং ছয়-দফা হাসিল হলে গণজীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা মনে করা ভুল। মিঃ জিন্নার ১৪ পয়েন্ট এবং লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কেও এক সময় দাবি করা হত। বলা হত এতেই মুসলিম জনগণের সমস্যার সমাধান হবে। বাস্তবে কি তা হয়েছে? হয়নি। কারণ ১৪ পয়েন্ট কিম্বা লাহোর প্রস্তাব জনগণের মৌলিক অধিকার, জনগণের আহার, বাসস্থানের এক কথায় তাদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েমী স্বার্থেরই পোয়া বারো হয়েছে। ধনী আরও ধনী হয়েছে। গরীব আরও গরীব হয়েছে। একদিকে জমেছে মুনাফার পাহাড়, অন্যদিকে বিস্তার লাভ করেছে দারিদ্র, দুঃখদুর্দশা। সামাজিক পুনর্বিন্যাস ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যতীত বিপুলসংখ্যক দেশবাসীর পর্বতপ্রমাণ সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব নয়। এ কথাটা বুঝতে আমাদের আর কতদিন লাগবে?"[১৭৯]

১০.

"... ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে মওলানা ভাসানী বলেন, সিআইএ'র একটি দলিল সংরক্ষণের জন্য মোহাম্মদ তোয়াহার নিকট দেওয়া হয়েছিল। সেই দলিলখানি অবিলম্বে প্রকাশ করার জন্য তিনি আহবান জানান।

তোয়াহা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, উক্ত দলিল সংরক্ষণের জন্য তাকে দেওয়া হয়নি। দলিলখানি ন্যাপের ট্রেজারার সাঈদুল হাসানের নিকট দেওয়া হয়েছিল বলে সে প্রকাশ করে। ১৯৬৯ সালের ৫ই নভেম্বর জনৈক 'সাংবাদিক বন্ধু' দলিলখানি প্রথমে মওলানা ভাসানীকে দেন। তিনি দলিলখানি আর এক বন্ধুর হাতে দেন। ১৯৭০ সালের ৬ই জানুয়ারী সন্তোষে শ্রমিক সমাবেশ শুরু হওয়ার মাত্র তিন দিন আগে মওলানা সাহেব উক্ত বন্ধুর নিকট থেকে দলিলখানির বাংলা অনুবাদ সংগ্রহ করতে বলেন। তোয়াহা তাকে বলে, মাত্র দু'দিনের মধ্যে দলিলখানি ছাপানো সম্ভব নয়। ইংরেজি দলিলখানির কয়েক শ' সাইক্লোস্টাইল করা কপি সন্তোষে রয়েছে।

তোয়াহা আরও বলে, ইংরেজি দলিলখানির কপি সন্তোষে বিলি করা হয়নি। মওলানা সাহেব দলিলের কপি প্রেসিডেন্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণরের নিকট পাঠিয়েছেন বলে সে প্রকাশ করে। (পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা, ৩১শে মে, ১৯৭০)।

ভারতীয় সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত এই দলিল সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত এক গ্রন্থে তিনি বলেন, ভাসানীপন্থী ন্যাপের সদস্য জাহাঙ্গীর কবীর নতর দাম কলেজের ছাত্র ছিল। জনৈক আমেরিকান দলিলখানি তাকে দিয়েছিল। পরে সে দলিলখানি ফেরৎ পাওয়ার চেষ্টা করে। অল্প কিছু দিন পর ছাত্রটি মারা যায়। হাসপাতাল সুত্রে প্রকাশ, বিষ প্রয়োগের ফলে তার মৃত্যু হয়।

এক কৃষক সমাবেশে মওলানা ভাসানী দলিলটির মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। এই দলিলে ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে একটি 'কনফেডারেশান' এবং চীনের বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে 'বেঙ্গসাম্' নামক একটি নতুন 'স্টেট' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।

---

[১৭৯] শহীদুল্লাহ কায়সার/শহীদুল্লাহ কায়সারের নির্বাচিত কলাম। সম্পাঃ শমী কায়সার ॥ [মাওলা ব্রাদার্স - এপ্রিল, ১৯৯৪। পৃ. ৪১-৪২]

এই দলিলখানি মওলানা ভাসানীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীর কবীরকে দেওয়া হয়েছিল। 'বেঙ্গসাম' আন্দোলনের জন্য বিপুল আর্থিক সাহায্যেরও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।(হিস্টরী অব ফ্রিডাম মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ, জ্যোতি সেনগুপ্ত)॥"[১৮০]

১১.

"... বিগত ১৯৬৯-এর নভেম্বরে শেখ মুজিব লন্ডন যান। সেখানে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় চক্রান্তের অন্যতম জাঁদরেল মুখপাত্র মিয়া মমতাজ দৌলতানার সাথে তার এক বৈঠক হয়। এ সময় কলকাতার 'আকাশবাণী' হতে বলা হয়, 'শেখ মুজিব মিয়া মমতাজ দৌলতানার সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন'। 'সমঝোতার' অর্থ অতীব সহজ। ভোটের জন্য ৬-দফা প্রচার করা হবে বটে কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তা কার্যকর করা হবে না। এর প্রমাণ মিলে মুজিবের বক্তব্যে। লন্ডন হতে করাচী পৌঁছে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, '৬-দফা কোরান বা বাইবেল নয়। প্রয়োজনে এর রদবদল করা যাবে।'

'আকাশবাণী'র শেখ মুজিব সম্পর্কে অপপ্রচারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বিগত ১৯৬৯-এর নভেম্বর থেকে 'আকাশবাণী' শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছেন। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী আশা করে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে আওয়ামী লীগকে নিয়ে গণচীন বিরোধী ভারতীয় পরিকল্পনাকে খুব জোরদার করা যাবে। মুজিব ও ইন্দিরাদি এই পরিকল্পনা বৃক্ষে 'এক বৃন্তে দুই ফুল' হয়ে শোভা পাবেন॥"[১৮১]

১২.

"... ছয়দফা কর্মসূচীর অন্যতম রচয়িতা হিসাবে আমার স্বামীর নাম বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ায় আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে সত্য উদঘাটিত করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এ উদ্দেশ্যে আমি আমার পরিচিত যে সকল ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু জানতে পারেন বলে আমার ধারণা হয় আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে জানতে চাই। আমার এ প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে যখন আমি ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর সাথে দেখা করে জানতে চাই যে ছয় দফার খসড়া কে রচনা করেছিলেন। তখন তিনি বিনা দ্বিধায় জবাব দেন যে আহমদ ফজলুর রহমানই ছয় দফা কর্মসূচীর প্রকৃত রচনাকারী। শুনে আমি চমকিত হলাম। আমি জানতে চাইলাম কোন সূত্র থেকে তিনি এ তথ্য জানতে পেরেছেন। তখন আমি এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানতে চাইলাম। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুজাত আলী সাহেব সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হন। আমার অনুরোধে তিনি কোন অবস্থায় এবং কি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু আহমদ ফজলুর রহমানকে ছয়দফা কর্মসূচীর রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছিলেন তা খুলে বলেন। ক্যাপ্টেন সুজাত আলী বললেন : 'পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে একদিন শেখ সাহেব আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন, সাথে আমার ভাগ্নে আহমদ ফজলুর রহমান। আমি তখন নারায়নগঞ্জে আমলাপাড়ায় একটা বাসায় থাকতাম। শেখ সাহেব নারায়ণগঞ্জে গিয়েই হাজির হলেন। তিনি আসলে গিয়েছিলেন আমাকে আওয়ামী লীগের কর্মী হিসাবে নির্বাচনে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে। তিনি হয়তো অনুমান করেছিলেন যে আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হব না। কারণ আমরা ছিলাম দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম লীগের সমর্থক। আমি সে কথাই শেখ সাহেবকে বললাম। তাছাড়া আমি আগে শুনেছিলাম যে আহমদ ফজলুর রহমানকে দেবীদ্বারের ঐ আসনে প্রার্থীপদ দেওয়া হবে। সে কথাও বললাম। কিন্তু শেখ সাহেব বললেন যে এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে ন্যাপের মোজাফফর আহমদের সাথে। এটা হবে জোর লড়াই। আহমদ ফজলুর রহমানের রাজনীতিবিদ

---

[১৮০] আবদুল মতিন/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় ॥ [র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স - ডিসেম্বর, ১৯৯৬। পৃ. ১৫০-১৫১]

[১৮১] অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ/অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ রচনা সমগ্র - ১ ॥ সম্পাদনা : আনু মুহাম্মদ ॥ [মীরা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০০৪। পৃ. ২৬৪-২৬৫]

হিসেবে তেমন পরিচিতি নেই। আমি বললাম, আমিও তো রাজনীতি করি না, ব্যবসা করি। শেখ সাহেব বললেন, সমাজকর্মী হিসাবে এলাকায় আপনার যথেষ্ট পরিচিতি আছে। তবুও আমি রাজী হচ্ছি না দেখে শেখ সাহেব বললেন, ছয়দফা কে ড্রাফট করেছিল? আপনার ভাগ্নে করেননি? কি ফজলুর রহমান সাহেব, কে করেছিল? আহমদ ফজলুর রহমান আমার সামনেই স্বীকার করল যে সে করেছিল। তখন শেখ সাহেব বললেন, আপনার ভাগ্নে ছয় দফা ড্রাফট করল আর আপনি তার মামা হয়ে তাকে বাস্তবে রূপ দেবেন না? শেখ সাহেব বারবার অনুরোধ করায় শেষ পর্যন্ত আমি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করেছিলাম এবং জয়লাভও করেছিলাম। যা হোক, এভাবেই আমি শেখ সাহেবের নিজের মুখ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে ছয়দফা কর্মসূচী প্রণয়ণের ব্যাপারে আহমদ ফজলুর রহমানও জড়িত ছিল।'

... আমি যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম সেগুলো হচ্ছে:

১। বঙ্গবন্ধু আবদুল গাফফার চৌধুরীকে বলেছেন যে ছয়দফা কর্মসূচী রচনার কাজে তাজউদ্দিন আহমদ এবং রুহুল কুদ্দুস সাহায্য করেছেন। হানিফ সাহেব খসড়া কর্মসূচীটি টাইপ করেছিলেন।

২। বঙ্গবন্ধু ক্যাপ্টেন সুজাত আলীকে বলেছিলেন যে ছয়দফা আহমদ ফজলুর রহমান লিখেছিলেন।

৩। তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুই ছয়দফার রচয়িতা।

৪। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন যে আওয়ামী লীগের বাইরে বঙ্গবন্ধুর একটি গোপন গোষ্ঠী (ইনার সার্কেল) ছিল যাদের সাথে বঙ্গবন্ধু পরামর্শ বা আলোচনা করতেন। মিজানুর রহমান ধারনা করেছেন যে এই ইনার সার্কেলের দুই সদস্য রুহুল কুদ্দুস এবং আহমদ ফজলুর রহমান - এ দুজনেই ছয়দফা কর্মসূচী রচনা করেছিলেন।

৫। রুহুল কুদ্দুস বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বলেছেন যে ছয়দফা কর্মসূচীর শতকরা একশ ভাগই তার রচনা।

৬। অলি আহাদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ইংরেজিতে লেখা ছয়দফা কর্মসূচীর অন্ততঃ দুটি খসড়া টাইপ করা হয়েছিল।

... তবে আরো একটা সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না। আবুল মনসুর আহমদের বড় ছেলে জনাব মাহবুব আনাম একস্থানে বলেছেন যে, ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গবন্ধু কোন এক প্রসঙ্গে তাকে বলেছিলেন যে, আবুল মনসুর আহমদ ২১ দফার স্রষ্টা ও ৬ দফার রচয়িতা। আবুল মনসুর আহমদ-এর 'শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের ভূমিকায় মাহবুব আনাম সাহেব একথা লিখেছেন।

কথাটা বঙ্গবন্ধু সাধারণভাবেও বলতে পারেন আবার সুনির্দিষ্ট অর্থেও বলে থাকতে পারেন। বিশেষতঃ ছয় দফা কর্মসূচীর বাংলা পুস্তিকাটিতে কিছু সংখ্যক আরবী ফার্সী শব্দ আছে যেগুলো বঙ্গবন্ধু সচরাচর ব্যবহার করতেন না। অপরপক্ষে আবুল মনসুর আহমদ ঐ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাই, এটা অসম্ভব নাও হতে পারে যে তিনিই বাংলা পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন॥"[১৮২]

১৩.

"... তাজউদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে ছোট্ট একটি গ্রুপ মূল খসড়াটি তৈরী করে এবং পরে ৬৫ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং একজন বেসরকারি অফিসার রুহুল কুদ্দুস তা চূড়ান্ত করেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে দলীয় অন্যান্য সদস্যকে তা জানানো হয়নি। এটা ছিল প্রাথমিকভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত, উদীয়মান ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের আশা আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহাসিকভাবে জনপ্রিয় একটি

---

[১৮২] হাছিনা রহমান/বাঙালীর মুক্তিসংগ্রাম ও আহমদ ফজলুর রহমান ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩। পৃ. ৬১-৬৩। ৬৭-৬৮]

আন্দোলন হিসেবে অচিরেই ছয় দফা নিম্নমধ্যবিত্ত, ছাত্র, শ্রমিক এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবী মহলের সমর্থন অর্জন করে। প্রাথমিকভাবে উঠতি বাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই আন্দোলনের জন্য অর্থসংস্থান করে এবং ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেস-এর ধনাঢ্য মালিক বিনামূল্যে প্রচারপত্র ছেপে দিয়ে সাহায্য করেন।

ছয় দফা কর্মসুচী প্রকাশ্যে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পুরো সরকারি প্রশাসনযন্ত্র মুজিবের সুনামহানিতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং কর্মসূচীটিকে রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রণীত বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশন মুসলিম লীগের জনসভায় আইউব খান এই বলে হুমকি প্রদান করেন যে, যারা ছয়দফা কর্মসূচীর কথা বলবে সেসব বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে 'অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করা হবে'। কর্মসূচীটিকে আইউব খান 'বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা' হিসাবে চিহ্নিত করে বলেন যে, এটি পাকিস্তানকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। সরকার ছয়দফাকে পাকিস্তানকে দ্বিধাবিভক্ত করার কর্মসূচী হিসেবে ধরে নেন, যা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও অখন্ডতা ধ্বংস করে দেবে।

কেবলমাত্র সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নয়, পাকিস্তানের প্রায় সবকয়টি রাজনৈতিক দল ছয়দফার তুমুল সমালোচনা করে। চারদিকে বিতর্ক এবং রাজনৈতিক যুক্তির ঝড় বয়ে যায়। কাউন্সিল মুসলিম লীগ কর্মসূচীটিকে 'পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন' হিসাবে চিহ্নিত করে বলে যে, এটা হলো ফেডারেশন নয়, কনফেডারেশনের দাবি। তাদের মতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ছয় দফা ছিল গ্রহণের অযোগ্য। জামায়াতে ইসলামী বলে যে, 'পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করে পাকিস্তানের অস্তিত্বের ওপর প্রত্যক্ষ হুমকি হিসেবে ছয় দফা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটা হলো বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যে পরিচালিত'। নেজামে ইসলাম কর্মসূচীকে প্রত্যাখ্যান করে মুজিবকে এককভাবে ও একনায়ক কায়দায় সিদ্ধান্ত নেয়ায় নিন্দা করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এই যুক্তিতে ছয় দফা কর্মসূচীকে এড়িয়ে যায় যে, এতে ভুখা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কোনো নির্দেশনা নেই এবং এতে 'সাম্রাজ্যবাদীর দালালদের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার কোনো দাবি সংযোজিত হয়নি'। কোনো কোনো ন্যাপ নেতা ছয় দফাকে সি আই এ আয়োজিত পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ও ৫ই জুন অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ন্যাপ একটি ১৪ দফাভিত্তিক কর্মসুচী গ্রহণ করে ও তাতে স্বায়ত্তশাসনকে অন্যতম একটি দাবি হিসেবে উল্লেখ করে। আওয়ামী লীগের ছয়দফা আসলে যেখানে ছিল কেবলমাত্র এক দফা, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন, সেখানে ন্যাপ তার দাবিতে স্বায়ত্তশাসনের অধীনে কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় ও মুদ্রাব্যবস্থা ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব জানায়।

সমালোচনাকালে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ছিল বেশী সোচ্চার এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলো মনে করে যে ছয় দফা বাস্তবায়িত হলে উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক দলগুলোর সমালোচনা ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু। ন্যাপের পশ্চাদপসরণের বিষয়টি ছিল সবচাইতে আকর্ষণীয়, বিশেষ করে আইউবের চীনা নীতির কারণে তাকে ন্যাপ সমর্থন দেয়।

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তর থেকেও ছয় দফা কর্মসূচীর সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে দলের পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা ছিলেন কর্মসূচীর বিরুদ্ধে, যা আওয়ামী লীগে একটি ভাঙনের সুচনা ঘটায়। এর প্রথম সমালোচনাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন দলের জাতীয় সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান। অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাও তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন। এভাবে অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানী কর্মসূচীর সমর্থন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বিরোধিতা করায় আওয়ামী লীগে অঞ্চলভিত্তিক ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। শেষ পর্যন্ত নসরুল্লাহ খান আওয়ামী লীগের সংসর্গ ছেড়ে ১৯৬৭ সালের মে মাসে নতুন রাজনৈতিক দল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গঠন করেন এবং দেশে গণতন্ত্র পুনর্বহালের দাবি জানান। আবদুস সালাম খানের মতো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কতিপয় বিক্ষুব্ধ সদস্যের সমর্থনও তিনি অর্জন করেন।

সমালোচনাকালে ডানপন্থীরা ছয়দফাকে 'ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে' ধ্বংসকারী কমিউনিস্ট ভারতের আয়োজিত এবং বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রেরণার ফল হিসেবে অভিহিত করেন। অবশ্য সরকার কিংবা কোনো রাজনৈতিক দল কেউই ছয়দফার বিরোধিতা করার কারণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেননি। তাদের প্রাথমিক উদ্বেগ ছিল নেতিবাচক ধরনের এবং তাদের কেউই এর পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করতে সক্ষম ছিলেন না।

সরকারের সুপরিকল্পিত ছয়দফা কর্মসূচী বিরোধী প্রচারনা এবং বিশেষ করে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনার পাশাপাশি চলতে থাকে বড় ধরনের রাজনৈতিক নিবর্তন, যদিও কর্মসূচীতে অখন্ড পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছে এবং কোথাও 'বাঙালী' শব্দটি উল্লেখমাত্র করা হয়নি। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থন যোগানদানকারী এবং বহুদিন যাবৎ আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে অভিহিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় এবং এর প্রেস বাজেয়াপ্ত করে সম্পাদক মানিক মিয়া হিসেবে সুপরিচিত তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিব তার ছয়দফা প্রচারকার্যে বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে সরকারি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে বাধা দেন। এপ্রিল মাসে ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশে মুজিবকে তিনবার গ্রেফতার করা হয়। ৯ই মে ভোরবেলা 'দেশের নিরাপত্তা এবং আইন শৃংখলা রক্ষার' জন্য পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ নং অনুচ্ছেদবলে (১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্বলিত জরুরী বিধান) তাঁকে চুড়ান্তভাবে গ্রেফতার করা হয়। এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতাসহ কয়েক হাজার কর্মীকেও জেলে পাঠানো হয়। এসমস্ত গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল আহবান করা হলে পুলিশের গুলীবর্ষণে ৪১ জন নিহত হন ও প্রায় ১০০০ আওয়ামী লীগ সদস্যকে আটক করা হয়। প্রদেশ ব্যাপী আওয়ামী লীগের কর্মীদের গণ-গ্রেফতারের ফলে দলের তৎপরতা স্থবির হয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ বিদ্যমান জাতীয় রাজনীতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে দুই বছরাধিককাল আওয়ামী লীগের কোনো তৎপরতা ছিল না। সরকারের নিবর্তনমূলক পদক্ষেপে ছয়দফার পক্ষে গণঅনুভূতির অপমৃত্যু ঘটে ও পরিস্থিতি ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে। সরকার মনে করতে থাকেন যে তাঁর পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচীকে বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন থেকে প্রতিবন্ধকতা বিহীনভাবে পাকিস্তানের অখন্ডতা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে॥"[১৮৩]

১৪.

"... ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ৬-দফার পক্ষে দলীয় অনুমোদন গ্রহণের জন্য ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথমে ওয়ার্কিং কমিটির (১৩ মার্চ) ও পরে কাউন্সিল সভা (১৮-১৯ মার্চ) অনুষ্ঠিত হলে, তাতে এই দাবির ব্যাপারে দলের কয়েকজন সিনিয়র নেতার মতান্তর প্রকাশ পায়। তাদের কাছে এই প্রস্তাবকে আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবির চেয়ে বেশি বা মারাত্মক কিছু বলে মনে হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছাড়াও এটাও একটা কারণ যেজন্য তারা সেদিন ৬-দফার প্রশ্নে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। খোদ সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ৬-দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এই কাউন্সিলেই শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে দলের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ৬-দফা প্রশ্নে দলের নেতপর্যায়ে এই মতান্তর প্রকট হয়ে ওঠে আরো পরে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি যখন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) নামে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। এ সময় মওলানা তর্কবাগীশ, আবদুস সালাম খান, জহিরুদ্দিন, মশিউর রহমান (যশোর), মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) প্রমুখ দলের কয়েকজন সিনিয়র নেতা 'পিডিএম পন্থি' আওয়ামী লীগের

---

[১৮৩] মওদুদ আহমদ/বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ॥ [ইউপিএল - ১৯৯২। পৃ. ৭৭-৮০]

ব্যানারে সমবেত হন। যদিও কর্মীপর্যায়ে তাদের কোনো সমর্থন ছিল না। এই নেতারা পরে দল হিসেবে পিডিএম-এ একীভূত হয়ে যান। ১৯৭০এর নির্বাচনের প্রাক্কালে, ৬-দফার পক্ষে বিপুল জনসমর্থনের মুখে, এঁদের কেউ কেউ যেমন : মওলানা তর্কবাগীশ, জহিরুদ্দিন, মশিউর রহমান (যশোর) আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন ও দলীয় টিকেটে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন। এদের মধ্যে শেষোক্তজন ১৯৭১-এ পাকবাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে শহিদ একমাত্র জাতীয় পরিষদ সদস্য॥"[১৮৪]

১৫.

"... বাস্তবিকপক্ষে, ড. সাদেক যা লিখেছেন, ১৯৫৬ সালের গণপরিষদে আবুল মনসুর আহমদ যা বলেছেন, ঐ একই বছর পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির সম্মেলনে আতাউর রহমান খান যা বলেছেন এবং ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাঙনপূর্ববর্তী কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী যা উল্লেখ করেছিলেন এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও আতাউর রহমান '৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে যা বলেছিলেন এগুলিকে ক্রমান্বয়ে দেখলে বোঝা যায় 'আওয়ার রাইট টু লিভ' পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ছয়-দফা ফর্মুলাটি এসেছে ড. সাদেক কর্তৃক রচিত 'ইকনমিক ইমার্জেন্স অব পাকিস্তান' (Economic Emergence of Pakistan, vol. II) গ্রন্থে প্রদত্ত পরামর্শসমূহের সরল অনুসরণে।

... ছয়-দফা ফর্মুলার বিবর্তন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় সম্বন্ধে নানা ধরনের ভাষ্য রয়েছে। এদের একটিতে এই ফর্মুলার খসড়া রচনার কৃতিত্ব দেওয়া হয় আলতাফ গওহরকে আর তিনি নাকি সেটি করেন লাহোরে বিরোধীদলীয় কনভেনশনকে কূটাঘাত করার জন্য। কিন্তু ছয়-দফা ফর্মুলার ক্রমগঠন প্রক্রিয়াটির হদিস বের করার পর মনে হয়, উল্লিখিত সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যদিও এটি অবশ্য খুবই সম্ভব যে, আইয়ুব খানের একজন একনিষ্ঠ নিশানবরদার হিসেবে গওহর হয়তোবা শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁর ঐ ফর্মুলাটি আইয়ুববিরোধী লাহোর কনভেনশনে পেশ করতে। আর তার নেপথ্য মতলব ছিল আইয়ুবের সমালোচকদের ভঙ্গুর ঐক্য ভেঙে দিয়ে তাদের দৃষ্টি তাসখন্দ চুক্তির 'ভ্রান্তি' থেকে সরিয়ে ছয়-দফার 'ফলাফলে' আকৃষ্ট করা। আবুল মনসুর আহমদই ছয়-দফার প্রণেতা বলে যে দাবি করা হয়ে থাকে সেটি বরং বেশি বোধগম্য। কিন্তু খোদ আবুল মনসুর আহমদ তা অস্বীকার করেছেন যদিও তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রকাশিত পুস্তিকার লেখক বলে দাবি করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদ ও কামরুদ্দিন আহমদ ছাড়াও এ ব্যাপারে কয়েকজন আমলার নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন: শামসুর রহমান সিএসপি, ফজলুর রহমান সিএসপি, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, সানাউল হক সিএসপি, এ কে এম আহসান সিএসপি প্রমুখ। এঁদের মধ্যে তিনজন পরবর্তীকালে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' দোষী সাব্যস্ত হন। ওয়াকেফহাল সূত্রের তথ্য অনুযায়ী লাহোর বিরোধীদলীয় কনভেনশনে যে আকারে ফর্মুলাটি পেশ করা হয় প্রকৃতপক্ষে রুহুল কুদ্দুস সে আকারেই ফর্মুলার খসড়া তৈরি করেন আর অন্য আমলারা বিষয়টি জানতেন। তবে তারা শেখ মুজিবের সাথে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির কোনো কোনো সদস্য এবং মকসুমুল হাকিম, এ. কে. মুসা, সাংবাদিক আবদুল গফফার চৌধুরী ও একজন পূর্ব পাকিস্তানী ব্যাঙ্কার খায়রুল কবির বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন। শেষোক্ত ব্যক্তির অফিসে ফর্মুলার খসড়াটি টাইপ করা হয়॥"[১৮৫]

---

[১৮৪] মোরশেদ শফিউল হাসান/স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক ॥ [অনুপম প্রকাশনী - জানুয়ারি, ২০১৮। পৃ. ১০৭]
[১৮৫] শ্যামলী ঘোষ/আওয়ামী লীগ : ১৯৪৯-১৯৭১ ॥ [ইউপিএল - ২০০৭। পৃ. ১২৫/১২৭-১২৮]

১৬.

"... পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং তার রূপরেখা ৬ দফা ফর্মুলা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং অনেক কিছু লেখা হয়েছে। আদতে এ কর্মসূচি উদ্ভূত হয় বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে। পরে নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টিও যুক্ত হয়। ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধ, তাসখন্দ চুক্তি এবং সেই চুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে সৃষ্ট অসন্তোষের পটভূমিতে আইয়ুববিরোধী একটি জোট গঠন করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক কনভেনশন ডাকা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গোড়ার দিকে এ কনভেনশনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ না দেখালেও পরে দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঐ কনভেনশনে যোগদান করেন। মাওলানা তর্কবাগীশ ছিলেন দলের প্রেসিডেন্ট। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান তার ৬ দফা কর্মসূচি পাঠ করেন। কনভেনশনের আয়োজকরা ৬ দফা দাবিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন।

আব্বা (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া) ৬-দফা দাবির কথা জানতে পেরে খুবই আশ্চর্য হলেন এবং দুশ্চিন্তায় পড়লেন। আব্বা জানবেন না, আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা জানবেন না অথচ শেখ মুজিব লাহোরে এতবড় একটি প্রোগ্রাম ছুঁড়ে দিবেন। আব্বা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন এ ভেবে যে সরকার ৬ দফা দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখবে এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন চালাবার সুযোগ পাবে।

তখনও পূর্ব পাকিস্তানের দাবি তো বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। স্বায়ত্তশাসন লাভ। কারা বঙ্গবন্ধুকে কী বুঝিয়েছেন তা তিনিই জানেন। আব্বা চিন্তার মধ্যে পড়লেন যে ৬-দফা দাবি কাদের দেয়া। দেশের কোনো অংশ ঘোষণা দিয়ে আলোচনা করে বিচ্ছিন্ন হয় না। এ ধরনের দাবিতো স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার মতো। আব্বা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত ৬ দফা দাবির পক্ষ নিতে রাজি হলেন না। তিনি আবুল মনসুর আহমদের সাথে আলোচনা করে ৬ দফার একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন এটা প্রস্তাব মাত্র। এ নিয়ে আলোচনা হতে হবে। একটি লিখিত পুস্তিকাও প্রকাশ করলেন। আব্বার সন্দেহ ছিল শেখ মুজিবকে তার শত্রুরা ব্যবহার করছে এবং তাকে চরম অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এদিকে আইয়ুব সরকার জনগণকে এটা বুঝাতে চেষ্টা করে যে ৬ দফার সমর্থকরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধ্বংস করার জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগ করার হুমকি দেয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয়। সরকার জনসাধারণের অংশগ্রহণ ঠেকাতে পুলিশি নির্যাতন ও ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক নেতাদের দেশরক্ষা আইনের ৩২ বিধির আওতায় গ্রেফতার করে। সংবাদপত্রে সরকারি ভাষ্য ছাড়া হরতাল সম্পর্কে কিছু লেখার অধিকার ও সুযোগ হরণ করে। আমি দিনের বেলায় গাড়িতে সংবাদপত্রের স্টিকার লাগিয়ে আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা শহরে ঘুরতে বের হই। আব্বা যেমনটি আশা করেছিলেন তেমন আন্দোলনের চেহারা দেখতে না পেয়ে কিছুটা নিরাশ হন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কিছু সহিংস ঘটনা ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে মনু মিয়াসহ বেশ কয়েকজন শ্রমিক মারা যান। আব্বাকেও চরম মূল্য দিতে হয়। ১৬ জুন তাকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির আওতায় গ্রেফতার করা হয় এবং দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই প্রেস থেকে দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা টাইমস ও পূর্বাণী প্রকাশিত হতো।"[১৮৬]

---

[১৮৬] মইনুল হোসেন/আমার জীবন আমাদের স্বাধীনতা ॥ [বিনিময় প্রিন্টার্স - সেপ্টেম্বর, ২০১৭। পৃ. ৬৭-৬৮]

১৭.

"... ১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা জিন্না এভিনিউতে আলফা ইস্যুরেন্স অফিসে (শেখ মুজিবুর রহমান তখন আলফা ইস্যুরেন্সের পূর্ব পাকিস্তান জোনের ম্যানেজার। আমি বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম।) বসে যখন আমাকে কনভেনার করে চট্টগ্রামে মহিলা আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করার প্রস্তাব দেন, তখন তার কাছে সাজেদার (সাজেদা চৌধুরী) নাম আমি উত্থাপন করেছিলাম। বলেছিলাম, 'আমি রাজনীতি বুঝি না কিন্তু আমি এমন একজন মেয়েকে দেব যে আপনার সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করবে এবং আপনার সংগঠনের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ হবে বলে মনে করছি।'

... সেইদিনই সাজেদাকে আহ্বায়িকা করে চট্টগ্রাম মহিলা আওয়ামী লীগ শাখা গঠিত হয়। এটা গঠন করে দেয়ার পিছনে আমার উদ্যোগী হবার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল–আমার পত্রিকা 'বান্ধবী'তে আলফা ইস্যুরেন্সের বাৎসরিক বিজ্ঞাপন পাওয়া। আলফা ইস্যুরেন্সের মালিক উসমান হারুনীর সাথেও একদিন পরিচয় হয় শেখ মুজিবুর রহমানের অফিসরুমে বসেই। তিনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। মনে পড়ে, সেইদিন আমি তার রুমে বসে চট্টগ্রামে আমার ঘরে ফোনে বাচ্চাদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় ইউসুফ হারুন এসেছিলেন শেখ সাহেবের রুমে। মুজিবুর রহমান সাহেব তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া ও তাকে আমার পত্রিকা দেখানোর পর আমি আবার ফোনে কথা বলতে থাকলাম। সে-সময় তারা যে কথাবার্তা বলেছিলেন তার মধ্যে 'সিক্স-পয়েন্ট' শব্দটি আমি বারবার শুনছিলাম। পরবর্তীতে আমার মনে হয়েছিল আওয়ামী লীগের ছয়-দফা তৈরির ক্ষেত্রে এই আলফা ইস্যুরেন্সের মালিক ইউসুফ হারুনেরও অবদান রয়েছে॥"[১৮৭]

১৮.

"... Although the demand for full regional autonomy, which was the Central theme of the Awami League's six-point programme launched in 1966, had been initiated a decade earlier by the leftist group within the Awami League, which eventually broke away and formed the NAP in July 1957, its President, Maulana Bhashani, adopted a different line in 1966 on the six-point autonomy programme. In a changed situation he was not only opposed to the six-point progrmme, but announced his own 14-point programme which was published on 12 June 1966. Bhashani's programme reiterated his party's stand on provincial autonomy and foreign policy. A cleavage which had far reaching consequences developed not only between the AL and NAP leadership, but also within the NAP itself.

... The pro-Bhashani elements, 'Suspected foreign governments behind 7 June movement'. Maulana Bhashani himself in a statement on 17 June 1966 maintained that :

'The country is faced with grave problems today. Pakistan, especially East Pakistan, finds itself in the vortex of imperialist intrigues in South East Asia. And the imperialists are threatening its very existence .... I have said it many times before and I say it again with all the emphasis at my command that we lay down our lives to save the integrity of Pakistan against any onslaught by the imperialists or their allies. For this purpose we will welcome any help from any direction."

It is significant that Bhashani's remarks did not directly refer to the six-point autonomy movement, but it was evident that he faced certain contradictions in this situation as a result of which he could neither openly disown the radical autonomists nor whole-heartedly join them. In explaining why it did not join the AL-sponsored six-point autonomy movement of 1966, the pro-Bhashani faction of the NAP argued that:

---

[১৮৭] বেগম মুশতারী শফী/স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন ॥ [মূর্ধন্য - ফেব্রুয়ারি, ২০১১। পৃ. ২৬০-২৬১]

(1) Its programme was a Bengali version of bourgeois democracy. It could not be supported by peasants and workers. But the fact remains that it was the first political movement in which the industrial workers and urban poor people participated and some of them were killed.

(2) It was internationally patronized by the neo-colonial powers. It seems highly improbable that the Americans, who created the Pakistani capitalists, would encourage an autonomy movement in any region of Pakistan, and least of all the Bengali movement which aimed directly at reducing the political and economic power of the Pakistan ruling elite.

The pro-Bhashani leftists were perhaps confused by the government propaganda to the effect that the six-point movement of East Pakistan was engineered by the C.I.A. For example, when the province-wide general strike in support of the six-point movement took place on 7 June, the members of the ruling PML in the National Assembly warned that the 'American C.I.A. was fostering East Pakistan's secession through Calcutta'.

... Although it is an undeniable fact that Maulana Bhashani, as first President of both AL and NAP, contributed greatly to the anti-imperialist, anti-feudal and anti-capitalist direction of Bangladesh politics since 1949, his metamorphosis became manifest after his release from jail on 3 November 1962, when he began to talk of 'Islamic Socialism'. On this subject, a Bengali political writer made the following significant comment:

'Non-communalism, which is nothing other than eliminating religious factors from politics, is the basis of all democratic movements and politics. Without that the talk of antifeudal, anti-big capital and anti-imperialist politics is nothing short of political bankruptcy. That is the reason why the simultaneous talk of Islamic Socialism and anti-feudal, anti-big capital and anti-imperialist politics of the Maulana sounds quite misleading.'

Maulana Bhashani never really accepted scientific socialism. He could not get rid of his religious mysticism although he had genuine and profound feeling for the masses. It is interesting to know that Maulana's slogan of 'Islamic Socialism', found an echo in President Ayub Khan, who became very sympathetic to Bhashani on account of his pro-Peking policies in the mid-sixties. President Ayub who was 'ideologically and by faith' a votary of 'free enterprise' began to talk in November 1966 about 'Islamic Socialism', which, according to him, is 'interchangeable with welfare state.' Thus, despite Maulana Bhashani's threat of civil disobedience movement to be started if the demands like adult franchise, release of political prisoners, autonomy and neutral foreign policy were not realized by 15 December 1963, he placed himself at the head of the seven-man Government delegation to attend the Chinese Republic Day celebrations in Peking on 1 October 1963. In this respect The Times of London commented on 4 December 1963:

'President Ayub appointed him (Bhashani) to lead a delegation and that journey from which he returned this week appears to have changed all his ideas. The achievements of China had so impressed him that, realizing how backward Pakistan was in comparison, he was inclined, he said to spend the rest of his life in prayers. He was calling off the civil disobedience movement.'

The spectacular success of socialist China in the socio-economic field was bound to impress visitors and to increase the revolutionary zeal of progressive political leaders. But the visit to China, in this case, seems to have weakened the militant spirit of Maulana Bhashani,

since his Civil Disobedience Campaign was abandoned. The reason for his eclipse in the 1960's may be found in his reply to a question by Tariq Ali about his conversations with the Chinese leaders during his visit. Bhashani said (according to Tariq Ali) :

"Mao said to me that at the present time China's relationship with Pakistan was extremely fragile and that the United States, Russia and India would do their utmost to break this relationship. He (Mao) said, 'you are our friends, and if at the present moment you continue your struggle against the Ayub Government it will only strengthen the hand of Russia, America and India. It is against our principles to interfere with your work, but we would advise you to proceed slowly and carefully. Give us a chance to deepen our friendship with your Government'."

Thus Bhashani seemed to be inclined to strengthen Ayub Khan's apparent alliance with China even at the cost of his own alienation from the current political movement of the country. The pro-Bhashani leftist section of the NAP appeared to be satisfied with 'certain anti-imperialist features' in Ayub's foreign policy which, of course, simultaneously maintained Pakistan's anti-communist military ties with the imperialist powers.

... However, the pro-Bhashani faction of the NAP faced a great dilemma which it could not resolve. As a result, people who participated in the six-point autonomy movement found in the AL leadership the 'meaningful opposition' in the Province to the dictatorial regime of President Ayub. Had Maulana Bhashani not alienated himself from the political movement in East Bengal at that time, the democratic petty bourgeois leadership could not get easily so much upperhand in politics there. And in that case the subsequent political movements would have become more radical and the leadership of the progressive NAP would have been well-established. Tariq Ali in his obituary of Maulana Bhashani, who died on 17 November 1976 confirmed this view :

It was their (Chinese leaders, Mao Tse Tung and Chou En-Lai) advice which encouraged him (Bhashani) to reach an accommodation with the Ayub dictatorship from 1966. This collaboration with military regime laid the basis for his displacement as the central opposition leader in Bengali politics by his former secretary, Shiekh Mujibur Rahman."[১৮]

১৯.

"... ৬-দফা পেশ করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান (৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬), অন্যদিকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়েছিল ১১-দফা কর্মসূচী (১৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯)। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী হিসেবে পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে প্রতিকুল অবস্থান গ্রহণের পর স্বায়ত্তশাসনের একই দাবি নিয়ে '৬৬ সালে শেখ মুজিবের উত্থানের ঘটনাটি রহস্যাবৃত হলেও ৬-দফার মাধ্যমে তিনি মূলতঃ নতুন কোনো কর্মসূচী উপস্থাপিত করেননি। বস্তুতঃ ২১-দফার ১৯ নম্বর দফার সম্প্রসারিত রূপই ছিল শেখ মুজিবের ৬-দফা।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে শেখ মুজিবের ৬-দফা একটা বড় রকমের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানী কায়েমী শোষক গোষ্ঠীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই ৬-দফা। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ভিত রচনায়ও এই ৬-দফার অবদান কিছু কম নয়।

তবে কি শেখ মুজিব তার অতীত ভুল শুধরে ৬-দফার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শামিল হতে চেয়েছিলেন? এ প্রশ্নের একটা সদুত্তর পেতে হলে ৬-দফাকে ঘিরে যে রহস্যের

---

[১৮] Rangalal Sen/Political Elites in Bangladesh \ [UPL - April, 1986| p. 215-220]

অবগুণ্ঠন রয়েছে তার গ্রন্থি উন্মোচন করা দরকার। আর সেই সাথে দরকার পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের জনগণের সাথে শেখ মুজিবের আচরণের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন।

রহস্যের উন্মোচন করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে–শেখ মুজিব ৬-দফা কোথায় পেলেন? কে তার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ৬-দফা? একথা ঐতিহাসিক সত্য এবং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব কর্তৃক স্বীকৃত যে, আওয়ামী লীগের কোন পর্যায়ের কোন সভায় বা বৈঠকে ৬-দফা কর্মসূচী আলোচিত বা গৃহীত হয়নি–পাকিস্তান আওয়ামী লীগে তো নয়ই, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোনো ফোরামেও নয়। শেখ মুজিব গেলেন করাচী হয়ে লাহোরে। লাহোরে তিনি পকেট থেকে বের করলেন ৬-দফা। ঢাকা-করাচী-লাহোরের পথে অপরাপর যে সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতা তার সহযাত্রী ছিলেন তারা পর্যন্ত কিছু জানতে পারেননি এক মূহূর্ত আগেও। অতঃপর লাহোর থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব ঘোষিত ৬-দফা অনুমোদন করে। এজন্য শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একখানা পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

৬-দফার উৎস সংক্রান্ত এ রহস্যময়তা প্রসঙ্গে ৩টি তত্ত্ব প্রচলিত আছে।

প্রথম তত্ত্বটা হল : ৬-দফা একান্তভাবেই বাংলাদেশের কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা যেমন–রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান খান ও আহমদ ফজলুর রহমান এবং বাংলাদেশের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের তৈরী। অথবা অধ্যাপক ও আমলাদের দ্বারা যৌথভাবে তৈরী।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো : ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর আইয়ুব খান যে তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করেন সেই চুক্তি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অন্যান্য জেনারেল এবং সাধারণ মানুষ মেনে নেয়নি। সারা পাকিস্তানে এর প্রতিবাদ হয়। ভুট্টো পদত্যাগ করেন। এই সব কারণে আইয়ুব খান ঘাবড়ে গিয়ে তার মূল সমর্থক পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং কিছু রাজনীতিবিদকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান। এই উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান তখনকার পাকিস্তানের বিশেষ পরিচিত সিভিল সার্ভেন্ট আলতাফ গওহরের মাধ্যমে ৬-দফা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই ধরণের কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে উঠলে তৎকালীন পাকিস্তানের মিলিটারী ব্যুরোক্রেসী ও রাজনীতিকরা আবার তার হাত শক্ত করতে আসবেন। জনাব আলতাফ গওহরই নাকি এই কর্মসূচীটি জনাব রুহুল কুদ্দুসের কাছে দেন। রুহুল কুদ্দুস দেন খায়রুল কবীরের (প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কৃষি ব্যাংক) কাছে। জনাব খায়রুল কবীর দেন এই ড্রাফট শেখ মুজিবের কাছে।

তৃতীয় তত্ত্ব হল : এই ৬-দফা কর্মসূচী ভারতের কাছ থেকে আসে কমিউনিস্ট পার্টির খোকা রায়ের কাছে। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তারা দেন খায়রুল কবীরের কাছে। খায়রুল কবীর দেন শেখ মুজিবের কাছে।

এই তিনটি তত্ত্বের কোনটি সঠিক? তবে মনোরঞ্জন ধরও দাবি করেছেন এই ৬-দফা কর্মসূচী বস্তুত: তাদেরই তৈরী। ১৯৫০ সালে তারা পাকিস্তানের সংবিধানের 'মৌলিক নীতিমালা কমিটি'র সদস্য হিসাবে যে নীতিমালা তৈরীর সুপারিশ করেন, ৬-দফা মোটামুটি তারই বাস্তবায়ন। অলি আহাদ সাহেব বলেছেন, 'এই ৬-দফা দাবি শেখ মুজিব সাহেব প্রথম দিন দিয়েছিলেন তৎকালীন গভর্ণর হাউসে এক সভায় নুরুল আমীনকে। নুরুল আমীন তখন সম্মিলিত বিরোধী দলীয় জোট এনডিএফ-এর চেয়ারম্যান। নুরুল আমীন ৬-দফাকে দেখেই বললেন–এই দাবির অর্থ পাকিস্তান ভেঙ্গে দেয়া'।

এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক মেঘনা (১২ মার্চ, ১৯৮৬) লিখেছে : 'লাহোর বিরোধী দলীয় কনভেনশনে যাবার সময় শেখ মুজিবের সাথে ছিলেন আবদুল মালেক উকিল ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তারা দুজনেই এই প্রতিবেদককে বলেছেন, এই দলিলটি লাহোর না যাওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আমাদের দেখাননি।"

এদিকে ছাত্রলীগ, মুজিব বাহিনী, আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাবেক নেতা বর্তমানে বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের মতে, '৬-দফা এর মূল কপি আমি দিয়েছিলাম মনি ভাইকে, তিনি এটি হারিয়ে ফেলেন।' শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন ও আবদুস সালাম খান প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগের একটি টীম আইয়ুব খানের সাথে আলাপ করার জন্য 'টকিং পয়েন্ট' হিসাবে নাকি এটা নিয়ে যান। আবার সাবেক সিএসপি রুহুল কুদ্দুস দাবি করেছেন যে, তিনিই নাকি ৬-দফার প্রণেতা।

তবে রহস্যের মূলে আরও কিছু আলোক সম্পাত করতে হলে ৬-দফার প্রেক্ষিতটাও আলোচনা করা দরকার।

শেখ মুজিব ৬-দফা দিয়েছেন ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী। এর আগে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ১৭ দিনের একটা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলাফলটা আইয়ুব খানের জন্য আনন্দদায়ক ছিল না। ফলে তাসখন্দ চুক্তি করে তিনি দেশে ফিরে এলে প্রচন্ড প্রতিবাদের মুখোমুখি হন।

এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আইয়ুব খানকে বিশেষভাবে পীড়িত করে। পাকিস্তান আমেরিকার সাথে যুদ্ধ জোটে আবদ্ধ। ভারত জোট নিরপেক্ষ দল। সে ক্ষেত্রে আইয়ুব খানের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। কিন্তু কার্যত: যুক্তরাষ্ট্র সযত্নে এমন ধরণের কাজ থেকে বিরত থেকেছে–যা ভারতের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

উল্লেখ্য, '৬২-এর চীন-ভারত যুদ্ধের অজুহাতে ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র সরবরাহ করে আসছিল। এ অস্ত্রও স্বাভাবিক কারণেই পাক-ভারত যুদ্ধে ভারত ব্যবহার করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আইয়ুবের ক্ষোভের কারণ হয়েছে। ক্ষুব্ধ আইয়ুব খান অত:পর আমেরিকার সেই সময়কার জানী দুষমন, চীনের সাথে দারুণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পেতে ফেলেন। পিকিং-এ তাকে বিশ্ব-নায়কোচিত সম্বর্ধনা দেয়া হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে আইয়ুব খান 'ফ্রেন্ডস নট মাষ্টারস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে মার্কিন ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল। এসব ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রকেও ক্ষুব্ধ করেছিল।

স্বাভাবিক কারণে, যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রয়োজন পড়েছিল আইয়ুব খানকে কিছুটা 'উচিত শিক্ষা' দেয়ার। বিশেষত: ১৯৫৮ সালে এই আইয়ুব খান মার্কিন মদদেই পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তার এতবড় স্পর্ধা আমেরিকা নীরবে সহ্য করবে কেন?

৬-দফা কি আইয়ুব খানকে সেই 'উচিত শিক্ষা দেয়ার' দফা হতে পারে না? এ ক্ষেত্রে ধারণাটাকে আরও পরিষ্কার করার জন্য যে সংযোগসূত্রগুলো দরকার তা হচ্ছে :

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যখন উড়ে এসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসনটি জুড়ে বসেছিলেন তখন মার্কিন মদদপুষ্ট সে মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবের আদর্শিক নেতা সোহরাওয়ার্দীরও একটি সম্মানজনক আসন ছিল। (সোহরাওয়ার্দী-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক)

২. এই সোহরাওয়ার্দীই আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার দল আওয়ামী লীগ প্রধান মওলানা ভাসানীর প্রচন্ডতম বিরোধিতার মুখে যখন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ও বিভিন্ন যুদ্ধ জোটের পক্ষে ওকালতি করেন - শেখ মুজিব গ্রুপ তখন দলের নেতা 'অ-মন্ত্রী' মওলানা ভাসানীর পরিবর্তে মার্কিনী ইচ্ছার বাহক ও ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকেই সমর্থন দিয়েছিলেন। (মুজিব-সোহরাওয়ার্দী-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক)

৩. ৫১-এর দশকে শেখ মুজিব সংখ্যাসাম্য, এক ইউনিট ও জাতীয় সংহতির প্রবক্তা। ৬-দফার বক্তব্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত–স্বাধীনতার একেবারে কাছাকাছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও কিন্তু ৬-দফা সম্পূর্ন নীরব।

৪. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক হিসাবে শেখ মুজিব মোটা বেতনে চাকুরী করতেন (কাজ করতে হত না) আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানী নামক একটা বীমা প্রতিষ্ঠানে। এ প্রতিষ্ঠানটির মালিক ছিল কুখ্যাত ২২ পরিবারে অন্যতম হারুন গ্রুপ। আইয়ুব খান আবার ছিলেন এই হারুণ গ্রুপের জানী দুষমন। ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় এসে আইয়ুব খান এই হারুণ গ্রুপের প্রধান ব্যক্তিকে সামরিক আদালতের বিচারে বেত্রাঘাত দিয়েছেন, তাদের কোটি টাকার ব্যবসা নষ্ট করেছেন।

৫. '৫৮ সালে আইয়ুব খান স্বয়ং শেখ মুজিবকেও কিন্তু দুর্নীতির মামলায় ঝুলিয়েছিলেন।

অবশ্য স্বীকার্য, এ সিদ্ধান্তটি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (Circumstantial Evidence) প্রসূত। তবে, এর স্বপক্ষে আরও শক্ত প্রমাণ রেখে গেছেন স্বয়ং শেখ মুজিব–'৭১-এর ১ মার্চ (৬-দফা চাপিয়ে দেয়া হবে না ঘোষণা করে) এবং ২৩ মার্চ (৬-দফাকে বাদ দিয়েই রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে সমঝোতা করে)। এই সাথে, কুখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের (ইন্দোনেশিয়ায় '৬৫ সালে সুকর্ণ বিরোধী অভ্যুত্থান ও গণহত্যার সময় জাকার্তায় কর্মরত ছিলেন) সাথে শেখ মুজিবের বুড়িগঙ্গা নদীতে গোপন অভিসার, ৭ মার্চ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' উচ্চারণ করার পাশাপাশি সংবাদপত্রে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতিদান, পাকিস্তানী বাহিনীর কাছে ২৫ মার্চ আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলে সম্ভবত: আর কিছু অপরিষ্কার থাকে না।

সে যা-ই হোক, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ৬-দফা আইয়ুবের জন্য 'কাল' হলেও আইয়ুবও সাময়িকভাবে ৬-দফাকে আত্মরক্ষার অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাই ৬-দফা ও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদের আক্রমণও হয়েছিল সর্বাত্মক। পাশাপাশি, অন্যদিকে আবার সরকারি নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দিনগুলিতে অরক্ষিত পূর্ব বাংলার অনিশ্চয়তার দিকটিকে প্রাধান্যে এনে স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিকে তুলে ধরার ফলে ৬-দফাও দ্রুত পরিচিতি লাভ করেছিল।

তথাপি ৬-দফা বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো সফল আন্দোলন নির্মাণ করতে পারেনি। শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের গ্রেফতারের পরপর '৬৬ সালের জুনেই এর অকাল পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময়ে সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন অর্জনে ব্যর্থতা ছিল এই পরিণতির প্রধান কারণ। 'ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ' করার মত ২১-দফায় ঘোষিত কোনো কর্মসূচী ৬-দফায় ছিল না। ফলে কৃষক-শ্রমিক মেহনতী জনতাকে যেমন আকৃষ্ট করা যায়নি, তেমনি শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো কর্মসূচীর অনুপস্থিতির কারণে ছাত্র সমাজকেও টেনে আনা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া শোষণের ব্যবস্থা হিসেবে সামন্তবাদ বা পুঁজিবাদ এতে চিহ্নিত হয়নি। ওদিকে, '৫৪ সাল থেকে স্বায়ত্ত্বশাসনের প্রমাণিত প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও ৬-দফায় অর্থবহ নীরবতা পালিত হয়েছিল। অন্য কথায় পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত এবং অবদমিত বাঙ্গালী উঠতি ধনিক শ্রেণীর সমর্থন সমাবিষ্ট করার লক্ষ্যেই প্রধানত: ৬-দফা প্রণীত হয়েছিল। সেই সাথে ছিল এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কারণ, যে ইঙ্গিত আগেই দেয়া হয়েছ।

উদ্দেশ্যের এই সীমাবদ্ধতা এবং আন্দোলন নির্মাণে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ৬-দফাই শেষ পর্যন্ত কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রধান দাবিতে রুপান্তরিত হয়েছিল। এর কারণ, '৬৮-র ডিসেম্বরে সূচিত মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলনের পথ ধরে নির্মিত ১১-দফা ভিত্তিক '৬৯-এর সফল ছাত্র-গণ অভ্যুত্থান। এই ছাত্র-গণ অভ্যুত্থান আইয়ুব সরকারের পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে একইযোগে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসেবে বিচারাধীন বন্দী শেখ মুজিব। বাস্তবে শেষ দিকে সমগ্র আন্দোলনই আবর্তিত হয়েছিল শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিটিকে কেন্দ্র করে। এই জনপ্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি তার বিস্মৃতপ্রায় ৬-দফাকে পরে সুকৌশলে পুনর্বাসিত করেছিলেন ১১-দফার সাথে ৬-দফাকে জুড়ে দিয়ে। এ পর্যায়ে প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত '৬-দফা ও ১১-দফা' বলার পর

ধীরে ধীরে তিনি ৬-দফাকেই তার প্রধান শ্লোগান বানিয়েছিলেন। এর ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত না হলেও ১১-দফাকে বাস্তবে ৬-দফার মধ্যে পরিণতিলাভ করতে হয়েছিল।

বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মনে মারাত্মক পশ্চিম পাকিস্তান বিদ্বেষের সংক্রমণ ঘটানো ছিল শেখ মুজিবের প্রধান কৌশল। এই প্রচারণা অবলম্বনের ফলে ৬-দফার ভিত্তিতে '৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রদেশের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতেই আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ করেছিল। নির্বাচনোত্তর সাংবিধানিক সংকট এবং সবশেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনার পেছনেও প্রধান কারণ হিসেবে ক্রিয়া করেছিল ৬-দফাই। মুজিব স্বাধীনতা না চাইলেও এবং পাকিস্তানের মধ্যেই সমাধান অন্বেষণ করলেও 'বাঙ্গালীর মুক্তির সনদ' হিসেবে কথিত ৬-দফা পরিস্থিতিকে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাও হয়ে পড়েছিল অনিবার্য।

৬-দফার সমগ্র কর্মসূচীই পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর প্রেক্ষিতে রচিত। স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতার পর এর বাস্তব কার্যকারিতা এবং প্রয়োগ যোগ্যতা কোনোটাই ছিল না। তবে, ছাত্র সমাজের ১১-দফাসহ তার নির্বাচনী ওয়াদা তথা বাংগালীর সার্বিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি পালন মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাভাবিক নৈতিক কর্তব্যে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক ঘোষণার ফলেও তা অবশ্য পালনীয় হয়ে পড়েছিল।

সুতরাং ৬-দফা-১১-দফা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ১১-দফা ও ৭০-এর নির্বাচনী কর্মসূচীর মানদন্ডে মূল্যায়ন করাই হবে সংগত ও সঠিক। সেই সাথে ৬-দফার যেটুকু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটুকুও অবশ্য মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন।

৬-দফাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শেখ মুজিবের রাজনীতির রহস্যময়তা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই, শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রশ্নে যে আদৌ সৎ ও আন্তরিক ছিল না এবং 'ফ্রেন্ডস নট মাষ্টারস' এর লেখক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে শায়েস্তা করাই যে এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, তার প্রমাণ, আইয়ুবের পতনের পর পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ৬-দফা ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোগত প্রস্তাব–যাতে কেন্দ্রের হাতে কেবলমাত্র দুটি বিষয়–দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি রাখা হয়েছে (২ নম্বর দফা)। অন্য দফাগুলো এই মূলনীতিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সুতরাং কোন এক দফাকে বাদ দিয়ে অন্য দফার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু এই শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে বিরোধ যখন একেবারে তুংগে, তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানকে রক্ষার চেষ্টা হিসাবে ৬-দফা বিসর্জন দিতে কিন্তু কার্পণ্য করেননি। ৬-দফাকে বাদ দেয়ার কথা বলা–'৭১-এর সেই গণ অভ্যুত্থান যুগে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। অথচ সে ঝুঁকিও শেখ মুজিব নিয়েছিলেন ১ মার্চ। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির দেয়া এক সম্বর্ধনার জবাবে তিনি এদিন ঘোষণা করেনঃ "৬-দফা কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না"। মজার ব্যাপার হল: এ খবরটি অতি কৌশলে পূর্ব পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকায় ছাপতে দেয়া হয়নি। এটা ছেপেছিল করাচীর দৈনিক 'ডন'। উল্লেখ্য, আলফা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নামে যে বীমা প্রতিষ্ঠানে শেখ মুজিব চাকুরী করতেন তার মালিক পাকিস্তানের ২২ পরিবারের অন্যতম হারুন গ্রুপ এই 'ডন' পত্রিকার মালিক। আরও উল্লেখ্য, মার্শাল ল' জারীর পর এই হারুন গ্রুপ আইয়ুব খানের হাতে নিদারুণভাবে নির্যাতিত হয়েছিল।

যে ৬-দফার জন্য শত শত ছাত্র-জনতা আত্মাহুতি দিয়েছে হাজার হাজার মানুষ মামলা-মোকদ্দমা-জেল-জুলুম ভোগ করেছে–অতঃপর সেই ৬-দফা নিয়েই কি-না এই মর্মান্তিক লুকোচুরি খেলা। ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভংগের এমন রাজনীতি ইতিহাসে বিরল॥"[১৮৯]

---

[১৮৯] আবদুর রহিম আজাদ/বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রকৃতি ও প্রবণতা : ২১-দফা থেকে ৫-দফা ॥ [সমাজ বিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্র - জুন, ১৯৮৭। পৃ. ১৪-২১]

তৃতীয় পর্ব

আগরতলা ষড়যন্ত্র : ভাঙনের নীল নকশা

এক

ষড়যন্ত্র ও মামলার পটভূমি এবং শেখ মুজিবুর রহমান

০১.

"... রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী গ্রেফতার (তারিখ ৭ জানুয়ারী, ১৯৬৮ / দৈনিক পাকিস্তান)

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রঃ ভারতীয় কূটনীতিক বহিষ্কারঃ অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আগরতলার সামরিক অফিসারদের সঙ্গে গোপন বৈঠকঃ মোটা অংকের অর্থ লাভঃ হীন চক্রান্ত সম্পর্কে দেশের উভয় অংশে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার (নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত / রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই জানুয়ারী)

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ভারত সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একজন সরকারি মুখপাত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে প্রকাশিত তালিকাটি এ যাবৎ ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা।

আজিকার ঘোষণায় সরকারের ইতিপূর্বেকার একটি প্রেসনোটকেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আগের প্রেসনোটে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার দায়ে কতিপয় লোককে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দেশে নানা ধরনের জল্পনার সৃষ্টি করেছিল। আজকের ঘোষণায় ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করায় সব রকম জল্পনার সমাপ্তি ঘটেছে।

এদের সবাইকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই ষড়যন্ত্রে তাদের নিজ নিজ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। এদের কেউ কেউ কমপক্ষে একজন ভারতীয় কূটনীতিক মিঃ ওঝার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এরা আগরতলাস্থ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেননের সাথে দেখা করেছিলেন। ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল।

তবে আজ যে ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বের কোন ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে ভারতের নেই। কাশ্মীর বিরোধ এবং অন্যান্য বিরোধগুলো পাকিস্তানের প্রতি একটি গভীর শত্রুতারই প্রকাশ।

ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দু'জন সি,এস,পি অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং জনাব রুহুল কুদ্দুসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সামরিক শাসনামলে স্ক্রিনিং কমিটি এদের দু'জনের প্রতি নোটিশ দিয়েছিল। পরে প্রেসিডেন্ট উভয়কেই ক্ষমা করেন এবং আর একবার সরকারি কাজ করার সুযোগ দেন।

এপিপি পরিবেশিত সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, একটি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অর্থ সংগ্রহ করাই তাদের আসল উদ্দেশ্যে ছিল। এরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল তেমন সাক্ষাৎ প্রমাণও পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম জেলা অওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী সহ ধৃত আরো কতিপয় ব্যক্তির মারফত তারা টাকা পেয়েছে।

অস্ত্রশস্ত্রের তালিকাসহ (যার কথা আগরতলায় আলোচিত হয়েছে) বহু দলিলপত্র সরকারের হস্তগত হয়েছে।

প্রেসনোটে বলা হয়, বিশৃংখলা সৃষ্টির এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই দেশের উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে সরকার সে সম্পর্কে সচেতন। তাই সরকার তদন্তের ফলাফল, অগ্রগতি এবং এদের বিচার সম্পর্কিত সব তথ্য জনসাধারণকে জানাবে।

প্রেসনোটে বলা হয়, এ ব্যাপারে তদন্ত সমাপ্তির পথে এবং বিচার শীঘ্রই শুরু হবে।

ধৃত ব্যক্তিদের তালিকাঃ

প্রেসনোটে ধৃত ব্যক্তিদের তালিকা দেওয়া হয়েছে এরা হলেনঃ আভ্যন্তরীণ নৌচলাচল সংস্থায় কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি ডাক্তার সাঈদুর রহমান, সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালের (সুইজারল্যান্ড) পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব এম, আলী রাজা, জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, সি,এস,পি (স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৬৬ সাল থেকে ছুটি ভোগ করছেন), জনাব রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি (অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি ছুটি ভোগ করছিলেন এবং একটি ট্রেনিং কোর্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন), জনাব মুহিবুর রহমান (প্রাক্তন ন্যাভাল স্টুয়ার্ড), জনাব কামাল উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল পেটি অফিসার), জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ন্যাভাল লিডিং সী-ম্যান), মীর্জা এম, রমিজ (পিআইএতে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), জনাব আমীর হোসেন (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), এ,বি,এম,এ সামাদ (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্পোরাল), জনাব খুরশীদ আলম (প্রাক্তন ন্যাভাল লীডিং সীম্যান), লীডিং সী-ম্যান পদের প্রাক্তন সার্জেন্ট ইত্যাদি পদের জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ আলী, জনাব এ,বি,এম ইউসুফ, জনাব তাজুল ইসলাম, জনাব খুরশিদ মিয়া, জনাব দলিলুদ্দিন, জনাব মাসুদ আর চৌধুরী, জনাব আনোয়ার হোসেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ডাক্তার ক্যাপ্টেন খুরশিদুদ্দিন, এ,এম, সি, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (পাকিস্তান সেনাবাহিনী), সার্জেন্ট এ,এম,এফ, হক (বিমান বাহিনী), সার্জেন্ট শামসুদ্দীন (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) এবং হাবিলদার ইনসাফ আলী।

ওঝা বহিষ্কৃতঃ

অপর এক খবরে প্রকাশ, পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র এখানে জানান যে, আজ বিকেলে ভারতীয় হাইকমিশনকে পররাষ্ট্র দফতরে ডেকে আনা হয়। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ ওঝাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করতেও তাঁকে বলা হয়েছে। মুখপাত্র আরো বলেন, মিঃ ওঝাকে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করতে তাঁকে বলা হয়েছে।

রয়টার্স পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারতের একজন সরকারি মুখপাত্র আজ রাতে নয়া দিল্লীতে বলেন যে, পাকিস্তান ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ পি,এন ওঝাকে বহিষ্কার করেছে। মুখপাত্র আরো বলেন, মিঃ ওঝাকে আজ রাতে ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

এম. আহমদকে নয়াদিল্লী ত্যাগের নির্দেশঃ

নয়াদিল্লী ৬ই জানুয়ারী (এ,এফ,পি): পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার বহিষ্কারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারত আজ পাকিস্তানের নিকট নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী হাইকমিশনের উপদেষ্টা জনাব এম, আহমদের অপসারণ দাবি করে....।

জনাব আহমদকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নয়াদিল্লী ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রাত্রে নয়াদিল্লীতে পাকিস্তানী হাইকমিশনের নিকট প্রেরিত এক নোটে ভারত জনাব আহমদের অপসারণ দাবি করে। তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও ভারতের নিরাপত্তা বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ভারতের জাতীয়তা বিরোধী চক্রকে অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়॥"[১৯০]

০২.

"... ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ছয়দফা কর্মসূচীর ওপর আঘাত হানার পর থেকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত শান্ত। পশ্চিমা সংবাদপত্র গুলো আইউব খানকে 'প্রাচ্যের লৌহ মানব' বলে সম্মানিত করে। দেশের অভ্যন্তরেও অনুভূতি ছিল একই রকম। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আইউব খানকে নিয়ে তেমন সমালোচনা ছিল না। বাঙালী ব্যবসায়ীরা মাঝে মধ্যে আরো সুযোগ নেয়ার জন্য অনুযোগ জানালেও, পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে বেশ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করছিলেন। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কিংবা সরকারি অফিসার মাসে অনধিক ১০০০ টাকা রূপী আয় করেও ব্যাংক থেকে ঋণের সুযোগ পেয়ে একটা নতুন ভোক্সওয়াগন মোটরগাড়ী কিনতে সক্ষম ছিলেন। আইউবের ব্যাপক গ্রামীণ কর্মসূচী বাঙলার গ্রামাঞ্চলের জন্য নিয়ে এসেছিল সমৃদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতি।

জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি ছিল পুরোপুরিভাবে আইউবের কনভেনশন মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে। হতাশাগ্রস্ত কতিপয় আওয়ামী লীগার পি ডি এম গঠন করলেও তারা জনগণের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হন। অত্যল্প সংখ্যক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী যারা জেলের বাইরে ছিলেন, তারা দিন কাটাচ্ছিলেন ভয় ভীতির মধ্য দিয়ে। আইউবের শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি রাজনৈতিক পরিধিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে, তাতে রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতাদের কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে যখন সরকার ঘোষণা করলেন যে শেখ মুজিব ও আরো ৩৪ জনকে পাকিস্তান বিচ্ছিন্নকরণের দায়ে অভিযুক্ত করে বিচার করা হবে, যে অপরাধে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে - তখন ছয় দফার প্রতি সমর্থন দানকারীরা শংকিত হয়ে পড়েন। তারা আরো নির্যাতনের আশংকা করতে থাকেন। যে সমস্ত ব্যবসায়ী ছয়দফা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে অর্থসাহায্য করেছিলেন,

[১৯০] স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (দ্বিতীয় খন্ড)/সম্পা : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮২। পৃ. ৩০৫-৩০৭]

তারা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। দলের যে সব কর্মী পরস্পরের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখছিলেন, তা বন্ধ করে দেন ও অনেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবারই সাহস পাননি।

হাইকোর্ট বারেও পরিস্থিতি ছিল একই রকম। বেশীর ভাগ আইনজীবী, বিশেষ করে যারা শেখ মুজিবকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন কিংবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এ ঘটনায় নিরুৎসাহ প্রদর্শন করেন। ফলে সরকার যখন ঘোষণা করলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে, তখন শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্য নামকরা কোনো আইনজীবীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনজন তরুণ ব্যারিস্টার, যাদের আওয়ামী লীগ অথবা শেখ মুজিবের জন্য কিছু করার কারণ ছিলনা, মুজিবের পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিকভাবে বা বাঙালীদের স্বার্থরক্ষায় মুজিবের ত্যাগ স্বীকারের কথা ভেবেই আমরা তাঁকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেই। অনেক মাস অবধি সিনিয়র কোনো আইনজীবী মুজিবের পক্ষে এগিয়ে আসেননি।

... কিছু ইংরেজ বন্ধু ও ইংল্যান্ডে অবস্থানরত বাঙালীদের সক্রিয় সহযোগিতায় লন্ডনের বিখ্যাত আইনজীবী প্রতিষ্ঠান 'বার্নার্ড সেরিডান' এর মাধ্যমে মিঃ থমাস উইলিয়ামস (বর্তমানে স্যার থমাস) কিউ, সি, এম, পি, কে মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ আরেক দফা ইস্ট পাকিস্তান হাউস এবং স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন-এর বামপন্থী ছাত্ররা এভাবে টম উইলিয়ামস-এর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব করে দিয়ে বাঙালীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। লন্ডনের দি টাইমস্ পত্রিকায় ঘটনাটি প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বৃটিশ আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করার গোটা ব্যাপার যথেষ্ট গোপন রাখা হয়েছিল।

এভাবে আরেকবার ইংল্যান্ডে অবস্থানরত বামপন্থীদের সঙ্গে দেশে নেতৃত্ব প্রদানকারী বামপন্থীদের মতান্তর ঘটতে দেখা যায়। দেশে বামপন্থীরা চীনা নীতির কারণে আইউবকে সমর্থন করছিলেন এবং তাদের অনেকে প্রকাশ্যে ছয় দফা কর্মসূচীর সমালোচনা করছিলেন। প্রস্তাবিত বিচারের কথা ঘোষণা করা হলে অনেকে এই ভেবে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন যে মুজিবকে এবার রাজনীতি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে এবং তারা নিজেরাই তখন দেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবেন। প্রবাসী বাঙালীরা ছিলেন আরো বেশী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং তারা মনে করছিলেন যে কেবলমাত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ থেকে উৎসারিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশের প্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে।

... মুজিবের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগ ছিল নিম্নরূপঃ

(১) ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুজিব করাচী সফরকালে মুয়াজ্জম আহুত একটি বৈঠকে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ পান। এর আগেই মুয়াজ্জম পূর্ব পাকিস্তান দখল করার উদ্দেশ্যে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার বিষয়ে প্রণীত একটি পরিকল্পনা সম্পর্কে মুজিবের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। মুয়াজ্জম দাবি করেন যে ইতিমধ্যেই তিনি নৌবাহিনীর কতিপয় সদস্যকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে একটি জঙ্গী বাহিনী গঠন করেছেন। উক্ত বৈঠকে মুয়াজ্জম রাজনৈতিক নেতা এবং বেসামরিক অফিসারদের কাছ থেকে সমর্থন এবং সহযোগিতা কামনা করেন। শেখ মুজিব শুধু তাতে সম্মতিই দেননি, উপরন্তু তিনি বলেন যে তিনিও একই চিন্তাভাবনা করছেন। যখন ৬ নং অভিযুক্ত আহমেদ ফজলুর রহমান এতে ভারতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চান তখন মুজিব বলেন যে এটা তার নিজের মাথাব্যথা। শেখ মুজিব তাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ ধরনের তৎপরতার প্রয়োজন নাও হতে পারে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান, আহমেদ ফজলুর রহমান এবং ১ নং সাক্ষী মুজাম্মিল হোসেন।

(২) ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে মুজিব পুনরায় করাচী এলে তিনি মুয়াজ্জমের বাসায় অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে মুজিব বলেন যে, 'একমাত্র যে পথে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন সেটি হলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।' তিনি আর্থিক সাহায্য এবং এর পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন এবং সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানারিত করে বিপ্লবী গ্রুপের তৎপরতা জোরদার করার পরামর্শ দেন।

(৩) মুয়াজ্জম ৩ নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৪ নং অভিযুক্ত সুলতানের মাধ্যমে শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে ২৯ শে আগস্ট মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় এক বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকে মুয়াজ্জম দাবি করে যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে সম্মত রয়েছেন সশস্ত্র বাহিনীর এমন প্রচুর সংখ্যক সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন। মুয়াজ্জম তহবিল, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুজিব 'ভারত থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহের' প্রতিশ্রুতি দেন। মুজিব সাময়িকভাবে মুয়াজ্জমকে স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানের মাধ্যমে ২০০০ ও ৪০০০ রুপীর কতিপয় কিস্তীতে ১ লাখ রুপী দেয়ার দায়িত্ব নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন মুয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিব, সুলতান, রুহুল কুদ্দুস এবং আমির হোসেন।

(৪) ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ৩ নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাসায় মুজিবের কাছ থেকে ৭০০ রুপী সংগ্রহ করেন।

(৫) ১৯৬৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর (পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধকালীন সময়ে) স্টুয়ার্ড মুজিব শেখ মুজিবর রহমানের কাছ থেকে ৪০০০ রুপী সংগ্রহ করেন।

(৬) ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত গ্রুপের একটি বৈঠকে ঘটনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং শেখ মুজিবর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। উপস্থিত পাঁচজনের মধ্যে অন্যজন ছিলেন ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেন।

(৭) মুয়াজ্জম ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেনকে একটি মানচিত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের একটি তালিকা দেন যেন শেখ মুজিবর রহমান চাইলে তা মুজিবের কাছে পৌছে দেয়া হয়।

(৮) ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের সায়কা হোটেলে ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেনের কক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ১২ নং অভিযুক্ত মানিক চৌধুরী এবং ৭ নং সাক্ষী সায়েদুর রহমান ৩নং সাক্ষী আমির হোসেনকে বলেন যে শেখ মুজিবর রহমান গ্রুপের প্রতি তার আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন।

(৯) ১৯৬৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেনের কাছে লেখা এক চিঠিতে মুয়াজ্জম লেখেন, 'তিনি পরশ-এর (শেখ মুজিবর রহমানের সাংকেতিক নাম) সঙ্গে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এখন ভয়ের কিছু নেই'।

(১০) ১৯৬৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ শেষে মুজিব চট্টগ্রামের এনায়েতবাজারে ১২, রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী লেন-এ একটি বৈঠক আহবান করেন এবং ৭ নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানকে গ্রুপের একটি বৈঠকের জন্য স্থান নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বলেন। বৈঠকে অংশ নেন স্টুয়ার্ড মুজিব, মানিক চৌধুরী এবং সায়েদুর রহমান।

(১১) একই মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬) শেখ মুজিবর রহমান গ্রুপের জন্য আর্থিক সাহায্যের আরেকটি উৎস আবিষ্কার করেন। ১১ নং সাক্ষী মোহসিন আগেই মুজিবকে অর্থ সাহায্য করে আসছিলেন। এবার মুজিব তাকে গ্রুপের জন্য অর্থ সাহায্য করতে বলেন। তদানুসারে দুই কি তিন দিন পরে মোহসিনের কাছ থেকে স্টুয়ার্ড মুজিব দুই কিস্তিতে ৭০০ রুপী সংগ্রহ করেন।

(১২) ১৯৬৬ সালের ১২ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান তাজউদ্দিনের বাসায় গ্রুপের আরেকটি বৈঠক আহবান করেন। তাজউদ্দিন সে সময় বাসায় ছিলেন না। একটি ভ্যান-এ চড়ে আসা অংশগ্রহণকারীদের

মুজিব একটি বাস স্টপ থেকে অভ্যর্থনা করে উক্ত বাসায় নিয়ে যান। মুয়াজ্জম, স্টুয়ার্ড মুজিব, রুহুল কুদ্দুস এবং ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেন সেই বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে মুয়াজ্জম আশা প্রকাশ করেন যে ডি ডে তে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত জনগণ তাদের পেছনে থাকবেন। অংশগ্রহণকারীদের সকলেই একমত প্রকাশ করেন যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত সকলকে অস্ত্র দেয়ার এবং অস্ত্রের ব্যবহার প্রশিক্ষণ দেয়ার চূড়ান্ত সময় এসে গেছে। ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনার জন্য কতিপয় প্রতিনিধিকে পাঠাবার বিষয়টিও বৈঠকে বিবেচনা করা হয়।

(১৩) ১৯৬৬ সালের ৩রা এপ্রিল ৩ নং অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিব এবং ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেন শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় যান এবং তাকে বলেন যে গ্রুপের ছোট অস্ত্র এবং গোলাবারুদ কিনতে আরো 'তহবিলের প্রয়োজন'। শেখ মুজিবর রহমান স্টুয়ার্ড মুজিবকে ৪০০০ রুপী দেন এবং তিনি তা ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেনকে পৌঁছে দেন।

(১৪) ১৯৬৬ সালের ৬ই এপ্রিল লেখা এক চিঠিতে মুয়াজ্জম ৩ নং সাক্ষী আমির হোসেনকে একটি বাজেট তৈরী করতে বলেন। আমির হোসেন অস্ত্রের বিস্তারিত কারিগরী দিকটি সম্পর্কে জানতেন না বলে শেখ মুজিবর রহমান না চাওয়া পর্যন্ত বাজেট তৈরী না করার সিদ্ধান্ত নেন।

(১৫) ১২ নং অভিযুক্ত মানিক চৌধুরী ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেখ মুজিবর রহমানের বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মুজিব সেখানে উপস্থিত ৪ নং অভিযুক্ত সুলতানের কাছে টাকা দেয়ার জন্য মানিক চৌধুরীকে নির্দেশ দেন। তিনদিন পরে সুলতান চট্টগ্রামে মানিক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সুলতানকে ষড়যন্ত্রের কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫০০ রুপী দেন।

(১৬) ১৯৬৬ সালের ৬ই মে শেখ মুজিবর রহমানকে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন কতিপয় 'তৎপরতার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে' পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ নং অনুচ্ছেদ বলে গ্রেফতার করা হয়।

একশত প্যারা সম্বলিত মামলার অভিযোগনামার বাকী অংশে মুজিবের নাম উল্লেখ করা হয়নি কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। ব্যতিক্রম ছিল কেবল তাঁর গ্রেফতারের পরে জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠক। ১৪ নং সাক্ষী কর্পোরাল জামিল বলেন যে শেখ মুজিবর রহমান এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক অফিসার 'তাদের তৎপরতা জোরদার করেন'। এভাবে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্রের ৪১ নং প্যারায় মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শেষ হয়ে যায়। উপরন্তু, মামলার অভিযোগ অনুসারে ষড়যন্ত্রকারী এবং ভারতীয় অফিসারদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই যার এক বছর আগে থেকে মুজিব ছিলেন জেলখানায়।

... ট্রাইব্যুনালে দেয়া তাঁর বক্তব্যে মুজিব নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তিনি বলেন যে মামলাটি হল 'আমার, আমার দল এবং বাঙালীদের সসম্মানে বাঁচার অধিকারের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র'। উপরোক্ত তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিলনা বলে মুজিব দাবি করেন। বিবৃতিতে তিনি তার নিজের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং তিনি যে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন তার বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি জানান যে তিনজন বেসরকারি কর্মকর্তা ছাড়া অভিযুক্তদের আর কাউকে তিনি আদালতে আসার আগে দেখেননি এবং বেসরকারি কর্মকর্তারা তিনি মন্ত্রী থাকাকালে তার সঙ্গে কাজের সুবাদে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি বলেন, 'আমি কখনো তাদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করিনি এবং মানিক চৌধুরী এবং সায়েদুর রহমান হলো আওয়ামী লীগের শত শত সাধারণ কর্মীর মতোই দুজন'। আদালতে যাওয়ার আগে মুজিব বলেন, 'আমি কখনো মুয়াজ্জম হোসেন, আমির হোসেন, সুলতানউদ্দিন আহমদ, কামালউদ্দিন আহমদ সার্জেন্ট হামিদুল্লাহ এবং মামলায় অভিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করিনি'। তিনি করাচীতে মুয়াজ্জম কিংবা কামালউদ্দিনের কোনো বৈঠকে অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করেন।

তিনি আরো বলেন, 'তথাকথিত এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আমি কখনো কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা করিনি। এদের কেউই কখনো অমার বাড়ীতে আসেননি এবং আমি উক্ত ষড়যন্ত্রের সম্পর্কিত কোনো কারণে কাউকে কখনো টাকা পয়সা দেইনি। তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করার জন্য আমি মানিক চৌধুরী অথবা সায়েদুর রহমানকে কখনো কোন নির্দেশ দেইনি। আমার রাজনৈতিক দলে তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৪৪ জন নির্বাহী কমিটি সদস্য, একজন জেনারেল সেক্রেটারী এবং ৮ জন সেক্রেটারী রয়েছেন। আমার দলে রয়েছেন সাবেক মন্ত্রী, আইন পরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্যগণ। চট্টগ্রামেও নগর জেলা শাখার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের মধ্যে রয়েছেন পরিষদ ও সংসদের সদস্যগণ, তাদের কেউ কেউ অত্যন্ত ধনী ও প্রভাবশালী। এটা অসম্ভব যে আমি মানিক চৌধুরীর মতো একজন সাধারণ ব্যবসায়ী কিংবা সায়েদুর রহমানের মতো একজন এল এম এফ ডাক্তারের কাছে সাহায্য চাইবো। উপরন্তু সায়েদুর রহমানকে ১৯৬৫ সাল থেকে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। আমি কখনো সায়েদুর রহমানের বাসায় যাইনি'।

... যদিও মুজিব সর্বাংশে সত্যি কথা বলেননি, তবু তার বিবৃতি ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হয়। মুজিব লেঃ কমান্ডার মুয়াজ্জম হোসেন, সুলতানউদ্দিন, কামাল উদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিব এবং গ্রুপের নেতৃস্থানীয় আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার হওয়ার আগে চিনতেন না এটা ঠিক নয়। এটাও ঠিক নয় যে তিনি তাদের সঙ্গে কোনো বৈঠকে মিলিত হননি। অথবা তিনজন উচ্চপদস্থ বাঙালী সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেননি। এ ব্যাপারে খুব একটা সন্দেহ ছিল না যে মুজিবও উক্ত গ্রুপের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। জানা যায় যে ১৯৬৬ সালের কোনো এক সময়ে মুজিব গোপনে আগরতলাও গিয়েছেন। তবে উক্ত ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কোনো ঘটনায় এই সফরের অবদান ছিল কিনা তা জানা যায় না।

ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মুজিবের ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পর্কে বলা যায়, মামলায় উল্লেখিত অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হলেও দেখা যেতো যে তিনি একটি সশস্ত্র বিদ্রোহে কেবল একজন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকাই পালন করেছেন, কোনো সশস্ত্র বিপ্লবীর ভূমিকা নয়। তার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের শ্রেণীচরিত্র এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। এই পরিকল্পনার স্থপতি ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার মুয়াজ্জম হোসেন, শেখ মুজিবর রহমান নন।

... মুয়াজ্জমের মতে, তাদের পরিকল্পনার সফল প্রচারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা এবং সিভিল সার্ভিস অফিসারদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। কাজেই তারা রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য একজন নির্ভিক জাতীয়তাবাদী শেখ মুজিবর রহমান এবং কয়েকজন বাঙালী আমলার সংস্পর্শে আসেন। শেখ মুজিব তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় জানতেন, তার দলের শক্তি এই ছোট গ্রুপটির চাইতে অনেক বেশী। তাই তিনি তাদের ওপর এক ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। যেহেতু তারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থে কথা বলছিলেন সেহেতু শেখ মুজিব তাদের সমর্থন না জানিয়ে পারেন নি! তাদের তৎপরতার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুজিব তাদের অর্থনৈতিকভাবেও সাহায্য করেছিলেন। এভাবে মুজিব তার নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে একটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। গ্রুপটি ওঝার সংগে দেনদরবার চালানো, অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা প্রণয়ন, ট্রেনিং এর জন্য বাড়ি ভাড়া করা এবং বৈঠক অনুষ্ঠানের মতো তৎপরতা শুরু করার আগেই ১৯৬৬ সালে মে মাসে শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে যান। মুজিব ট্রাইব্যুনালের সামনে তাদের কারো সঙ্গে তাদের পরিচিতির কথা অস্বীকার করলেও পরবর্তীকালে গোপনে স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাদের জানতেন এবং সাহায্য করেছেন, তবে তাদের সংগঠন নিয়ে তার কিছু করার ছিল না।

.... স্বাধীনতার পরে মুজিব অবশ্য জোর দিয়ে বলতে শুরু করেন যে, তার সঙ্গে উক্ত (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত মোয়াজ্জেম হোসেন) গ্রুপের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল এবং তিনিই তা গঠন করেছেন।

তবে এই দাবির পেছনে যথার্থতা খুব সামান্যই। স্বাধীনতার পরে মুজিব যুদ্ধকালে তার অনুপস্থিতি এবং এর আগে স্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনতা না ঘোষণা করার দুর্বলতা ঢাকার জন্য এসব এবং অন্যান্য অনেক রকম বক্তব্য জোরেশোরে প্রচার করতে থাকেন।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে জোর দিয়ে মুজিব আমাকে স্বাধীনতার পর এ-ও বলেছিলেন যে, দিল্লীতে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ তার একটি গোপন অফিসও ছিল। এই বক্তব্যের কোনো সত্যতা ছিল না। তাজউদ্দিন সহ আওয়ামী লীগের যেসব নেতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তাদের সকলেই এ ধরণের প্রচারণা সত্য নয় বলে দাবি করেছেন॥"[১৯১]

০৩.

একনজরে মামলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মামলার সূচনা

"১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি দুজন বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, 'গত মাসে (ডিসেম্বর ১৯৬৭) পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ঘাটিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' কয়েক দিন পর (১৮ জানুয়ারি) একই অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মামলার নাম

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য। তবে এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবেই বেশি পরিচিত।

মামলার আসামি ৩৫ জন

১. শেখ মুজিবুর রহমান, ২. মোয়াজ্জেম হোসেন (লেফটেন্যান্ট কমান্ডার, নৌবাহিনী, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শহীদ), ৩. মুজিবুর রহমান (স্টুয়ার্ড, নৌবাহিনী, স্বাধীনতার পর নিখোঁজ, খুঁজে পাওয়া যায়নি), ৪. সুলতানউদ্দীন আহমদ (লিডিং সিম্যান, নৌবাহিনী, মারা গেছেন), ৫. নূর মোহাম্মদ (লিডিং সিম্যান, সিডিআই, নৌবাহিনী), ৬. আহমদ ফজলুর রহমান (সিএসপি, মারা গেছেন), ৭. মফিজউল্লাহ (ফ্লাইট সার্জেন্ট, বিমানবাহিনী, মারা গেছেন), ৮. এ বি এম আবদুস সামাদ (করপোরাল, বিমানবাহিনী, মারা গেছেন), ৯. দলিল উদ্দীন (হাবিলদার, সেনাবাহিনী, মারা গেছেন), ১০. রুহুল কুদ্দুস (সিএসপি, পরে বাংলাদেশ সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, মারা গেছেন), ১১. মো. ফজলুল হক (ফ্লাইট সার্জেন্ট, বিমানবাহিনী, পরে সাংসদ, ১৯৭৩, মারা গেছেন), ১২. ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক, মারা গেছেন), ১৩. বিধান কৃষ্ণ সেন (রাজনীতিক, মারা গেছেন), ১৪. আবদুর রাজ্জাক (সুবেদার, সেনাবাহিনী, মারা গেছেন), ১৫. মুজিবুর রহমান (হাবিলদার ক্লার্ক, সেনাবাহিনী, মারা গেছেন), ১৬. মো. আবদুর রাজ্জাক (ফ্লাইট সার্জেন্ট, বিমানবাহিনী, মারা গেছেন), ১৭. জহুরুল হক (সার্জেন্ট, বিমানবাহিনী, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলাবস্থায় ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদ), ১৮. মোহাম্মদ খুরশিদ (এবি, নৌবাহিনী, মারা গেছেন), ১৯. শামসুর রহমান খান (সিএসপি, পরে রাষ্ট্রদূত। মারা গেছেন), ২০. এ কে এম শামসুল হক (রিসালদার, সেনাবাহিনী, মারা গেছেন), ২১. আজিজুল হক (হাবিলদার, সেনাবাহিনী, মারা গেছেন), ২২. মাহফুজুল বারী (এসএসসি, বিমানবাহিনী, মারা গেছেন), ২৩. শামসুল হক (সার্জেন্ট, বিমানবাহিনী, মারা গেছেন), ২৪. শামসুল আলম (ডা. মেজর, সেনাবাহিনী), ২৫. মো. আবদুল মুত্তালিব (ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী,

[১৯১] মওদুদ আহমদ/বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ॥ [ইউপিএল - ১৯৯২। পৃ. ৮৩-৮৫/৯২-৯৭/১০২/১০৭]

পরে মেজর, মারা গেছেন), ২৬. এম শওকত আলী (ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী, পরে কর্নেল, সাংসদ [১৯৭৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৪] এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার, মারা গেছেন), ২৭. খন্দকার নাজমুল হুদা (ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী, পরে কর্নেল, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নিহত), ২৮. এ এন এম নূরুজ্জামান (ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক ও রাষ্ট্রদূত। মারা গেছেন), ২৯. আবদুল জলিল (সার্জেন্ট, বিমানবাহিনী), ৩০. মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী (মারা গেছেন), ৩১. এস এম এস রহমান (লেফটেন্যান্ট, নৌবাহিনী, মারা গেছেন), ৩২. এ কে এম তাজুল ইসলাম (সুবেদার, সেনাবাহিনী, মারা গেছেন), ৩৩. মোহাম্মদ আলী রেজা (মারা গেছেন), ৩৪. খুরশিদ উদ্দীন আহমদ (ডা., ক্যাপ্টেন, সেনাবাহিনী, পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল), ৩৫. আবদুর রউফ (লেফটেন্যান্ট, নৌবাহিনী, পরে নৌবাহিনীর কমান্ডার ও গণফোরাম নেতা, মারা গেছেন)

রাজসাক্ষী ১১ জন

১. মোজাম্মেল হোসেন, লেফটেন্যান্ট, ২. মো. আমির হোসেন মিয়া, করপোরাল, ৩. শামসুদ্দীন মিয়া, সার্জেন্ট, ৪. সাইদুর রহমান, ডা., ৫. মীর্জা এম রমিজ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, ৬. আবদুল আলিম ভূঁইয়া, ক্যাপ্টেন, ৭. জামালউদ্দীন আহমদ, করপোরাল, ৮. সিরাজুল ইসলাম, করপোরাল, ৯. মো. গোলাম আহমদ, ১০. এ বি এম (আবুল বাশার মোহাম্মদ) ইউসুফ (পরে তাঁকে বৈরী সাক্ষী ঘোষণা করা হয়), ১১. আবদুল হালিম, সার্জেন্ট।

বৈরী সাক্ষী

কামালউদ্দীন আহমদ, আবুল হোসেন ও বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত প্রমুখ।

ট্রাইব্যুনালের বিচারক তিনজন

বিচারপতি শেখ আবদুর রহমান প্রধান বিচারক (পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি)

মাকসুমুল হাকিম (বাঙালি)

মুজিবুর রহমান খান (বাঙালি)

বিবাদীপক্ষের আইনজীবী ২৬ জন

আবদুস সালাম খান (বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৌসুলি), খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, আমিনুল হক, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন, বদরুল হায়দার চৌধুরী (পরে প্রধান বিচারপতি), আতাউর রহমান খান, জহিরুদ্দিন, জুলমত আলী খান, মির্জা গোলাম হাফিজ, ড. কামাল হোসেন, আমীর-উল ইসলাম, মওদুদ আহমদ ও মইনুল হোসেন প্রমুখ। এ ছাড়া ট্রাইব্যুনালের বৈধতা সম্পর্কে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়েরের জন্য বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী টমাস উইলিয়াম। উল্লেখ্য, আইনজীবীরা পৃথকভাবে ওকালতনামা দাখিল করলেও মামলা পরিচালনার জন্য তাঁরা আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিন্ন মোর্চা গঠন করে অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

সরকারপক্ষের প্রধান আইনজীবী

মঞ্জুর কাদের (পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল) ও টি এইচ খান (বাঙালি)।

বিচারের স্থান

ঢাকা সেনানিবাসের সিগন্যাল অফিসার মেস।

বিচার শুরু
১৯ জুন ১৯৬৮ ইং।

মামলা প্রত্যাহার
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ইং।

এদিন শেখ মুজিবুর রহমানসহ সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয় ॥"[১৯২]

০৪.

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য

[১৯৬৯ সনের ৬ জানুয়ারী সকাল ৯টায় শেখ মুজিবুর রহমান আদালতের অনুমতিক্রমে তার লিখিত জবানবন্দী পাঠ করেন। নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হল]

"স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদের এবং পরে জাতীয় সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তি লাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হয়। যেমনঃ ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেসাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারীর প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী

---

[১৯২] আগরতলা মামলার অনুচ্চারিত ইতিহাস ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক/সম্পাঃ নাজনীন হক মিমি ও ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ॥ [জার্নিম্যান বুকস - ২০১৫। পৃ. ৪৯২]

দলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহবান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমিও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থনা করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান, আমরা বিশ্বাস করি যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান - ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ছয়দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসন যন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' গৃহ যুদ্ধ ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে এইবারের মত প্রথম গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমার জামীনে অসম্মত হন। কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামীন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের

মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামীনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামীন প্রদান করেন। কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা ময়মনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন ময়মনশাহী লইয়া যাওয়া এবং একইভাবে ময়মনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামীন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামীনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ আটই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুলস-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহসভাপতি জনাব মুজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ অন্যান্য। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মুনসুর আলী, প্রাক্তন এম এন এ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহমদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীহ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্ম ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৩২ ধারার (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র - পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বারস অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়।

পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শঃই তাহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারী সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে যতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃংখলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহিঃজগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক, মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌসুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘণ্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয়দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান - এই তিনজন সি এস পি অফিসারদের আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্যসম্পাদনকালে তাহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসভবনে কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাইদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র করিতে বলি নাই। তাহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম এন এ ও এমপি এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশ জন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ, প্রাক্তন এম এন এ, এম পি এ ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও

একজন সাধারণ এল এম এফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মেদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডাঃ সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাঃ সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল - দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদ্যপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায় বিচার চাহিয়াছিলাম - ছয়দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গন্ডীর ভিতর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসা বশতঃ মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে। তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং শিঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্ত স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাঁহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোন কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

ইতি স্বাক্ষর:

শেখ মুজিবুর রহমান

৬৭৭, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা

সড়ক নং-৩২ ঢাকা

তারিখ : ঢাকা জানুয়ারী, ১৯৬৮ ...॥"[১৯৩]

[১৯৩] মো: শফিকুর রহমান/জাতীয় রাজনীতি : শেরেবাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু ॥ [বিশ্বসাহিত্য ভবন - ডিসেম্বর, ১৯৯৯। পৃ. ৯৪-৯৯]

০৫.

"... সন ১৯৬২, সারা বাংলাদেশ যেন অসার, সর্বত্র একটা স্থবির ভাব। আয়ুব খানের শাসনকে মনেপ্রাণে অপছন্দ করলেও সেই শাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে যে আন্দোলন দরকার তা করতে কেউ আগ্রহী নন। বাঙালি তার সংগ্রামী চেতনা যেন কিছুকালের জন্য হলেও বিস্মৃত হয়েছে। আয়ুব খান তখন তার সামরিক জ্ঞানসমৃদ্ধ শাসনতন্ত্র জারি করার পায়তারা করছেন। এই শাসনতন্ত্র জারির অবশ্যম্ভাবী প্রতিবাদ ঠেকাতে তিনি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে করাচী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠালেন। সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হলো। মিঞাভাইর গতিবিধির ওপর সরকারের কড়া নজর। প্রায় সর্বত্র গোয়েন্দা পুলিশের চরদের সাদা পোশাকে আনাগোনা, যে কোন মুহূর্তে আমরা তার গ্রেফতার আশঙ্কা করছি। বিরোধী মহল চিন্তিত, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলে আন্দোলন ঝিমিয়ে যাবে। বিরোধী দলের চরমপন্থী গ্রুপের কয়েকজনের সঙ্গে মিঞাভাইর ছিল বিশেষ হৃদ্যতা। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন উনি দেশত্যাগ করবেন। প্রথমে ভারত, তারপর সেখান থেকে লন্ডনে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবেন। আর একই সঙ্গে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলবেন, যেমনটি করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

এই অন্তর্ধান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনজন - প্রয়াত রুহুল কুদ্দুস সি এস পি, আহমেদ ফজলুর রহমান সি এস পি এবং মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী নামে সিলেটের একজন চা বাগান মালিক। ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে। ওদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলেই মিঞাভাই আগরতলা যাবেন, সেখানে মোয়াজ্জেম থাকবে। সে আগে থেকেই আগরতলা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করে রাখবে। চকিতে আমার মনে পড়লো ইতোপূর্বের পঞ্চাশের দশকের জাঁদরেল আমলা প্রয়াত দত্ত চৌধুরীর এই একই লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকার কথা, যা বিভিন্ন কারণে তখন অগ্রসর হতে পারেনি। সে আর এক কাহিনী।

মিঞাভাই যাবেন কুলাউড়া দিয়ে। এখান থেকে ট্রেনে করে সীমান্ত স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে ওপার পৌঁছবেন। আমাকে একদিন বল্লেন, 'এখন তুই আমার কুলাউড় যাওয়ার বন্দোবস্ত কর।' তখন ছিল মিঞাভাইর ওপর সরকারের অন্তরীণাদেশ। তাই তাকে ঢাকার বাইরে যেতে হলে যেতে হবে গোপনে এবং আগরতলার উদ্দেশে তাকে টঙ্গি রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে হবে। ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে সর্বদা গোয়েন্দা পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি রুহুল কুদ্দুসের বার্তার অপেক্ষায় রইলাম।

ইতোমধ্যে এই বিপজ্জনক সফর বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু করে দিলাম। স্থির হলো কুর্মিটোলা পর্যন্ত মিঞাভাইকে গাড়ি করে নিতে হবে। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট প্রবেশের সময়ে সব ধরনের যানবাহনকেই চেক করা হতো। যাতে চেক করা না হয় এমন গাড়ি নিতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে সেই গাড়ি? হঠাৎ মনে হলো বন্ধু হারুনের কথা। হারুন সিলেটের স্বনামধন্য প্রশাসক ইয়াহিয়া আহমেদ চৌধুরীর পুত্র। হারুনের ভগ্নিপতি সালাউদ্দিন সাহেব তখন প্রাদেশিক সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। হারুনকে সমস্যার কথা বলতেই সে বল্ল যে তার ভগ্নিপতির গাড়ি নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট পার হতে পারবে। গাড়ির লাল রঙের নাম্বার প্লেট দেখলে ক্যান্টনমেন্টের সেন্ট্রি আর চেক করবে না। আরো স্থির হলো ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন থেকে আরোহণ করবেন দু জন ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। একজন মিঞাভাইর বিশেষ অনুসারী চট্টগ্রামের তারেক চৌধুরী, প্রয়াত (আততায়ীর গুলিতে নিহত) অভিনেতা সোহেল চৌধুরীর পিতা, আর একজন আমার বন্ধু রেজা আলী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ টি আলীর পুত্র এবং মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর ভাগিনেয়। স্থির হলো কুর্মিটোলা রেল স্টেশনে আমি মিঞাভাইকে নিয়ে গাড়িতে তৈরি থাকব। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছুলেই রেজা আলী টর্চ জ্বালাবে। মিঞাভাই আমার গাড়ি থেকে নেমে ট্রেনের কামরায় উঠবেন আর রেজা আলী নেমে এসে আমার গাড়িতে বসবে। সমস্ত অপারেশনটাই চালাতে হবে অতি দ্রুত, কারণ কুমিল্লাগামী ট্রেনের ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। সব ঠিকঠাক করে

রুহুল কুদ্দুসের সবুজ সংকেতের আশায় বসে রইলাম। কিছুদিনের মধ্যেই রুহুল কুদ্দুস ভাই আমাকে টেলিফোন করে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

তখন রুহুল কুদ্দুস থাকতেন ঢাকা কলেজের কাছে। ধানমন্ডি ১ নম্বর রোডের পাশেই একটি রাস্তা, ওই রাস্তার ওপরই একটি বাসাতে। কুদ্দুস ভাইর সঙ্গেই আমার যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো আর তার কাছ থেকেই সরাসরি সব নির্দেশনা পেতাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বল্লেন, 'মোয়াজ্জেমের কোন খবর পাচ্ছি না, তার তো আগরতলা গিয়ে থাকার কথা, সেখানে সে শেখ মুজিবকে রিসিভ করবে। দিল্লি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল এসে গেছে। শেখ মুজিবের অবিলম্বে আগরতলা পৌঁছা উচিত। তুমি তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা কর।' আমি যাওয়ার যে ব্যবস্থা করেছি সেটা তাঁকে জানালাম। উনি আর কিছু বল্লেন না। তারেক চৌধুরীর কথা মিঞাভাইকে জানালাম। তারেক চৌধুরী, মরহুম কামাল ও জনাব গনি এই তিনজন ছিলেন চট্টগ্রামের বাসিন্দা আর মিঞাভাইর ভক্ত ও শিষ্য। মিঞাভাইর যে কোন দুর্দিনে তাঁরা এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেননি।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশে ঠিক যখন গাড়িতে উঠব, ভাবী বল্লেন, 'তুইও যাস। উনার সঙ্গে।' মিঞাভাই ধমকে উঠলেন, 'অসম্ভব, ও আমার সাথে থাকলে তোমাদেরকে কে দেখবে। ও আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে।' গাড়ি চলতে শুরু করলো। হারুন চালক, আমি তার পাশে। মিঞাভাই পেছনের সিটে শুয়ে পড়লেন। নির্বিঘ্নে পার হলাম ক্যান্টনমেন্ট গেট। রেল স্টেশনে পৌঁছুলাম। আমার ভাবীর কথা মনে পড়লো। শেষবারের মতো অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমি মিঞাভাইকে অনুরোধ করলাম, 'তারেক ভাইর বদলে আমি যাই আপনার সঙ্গে।' মিঞাভাই মানলেন না, বল্লেন, 'আমি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াচ্ছি। তোকে রেখে গেলাম, তুই সবাইকে দেখবি।' স্টেশনে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ট্রেন পৌঁছুল, সেই সঙ্গে জ্বলে উঠল একটা কামরা হতে টর্চলাইট। অন্ধকারে মিঞাভাই সমস্ত গা কালো চাদরে মুড়ে কামরাতে উঠে পড়লেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল রেজা আলী। ট্রেন চলতে শুরু করলো। আমি রেজা আলীকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সমস্ত অপারেশনটাই কোনরূপ মহড়া ছাড়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। মাঝপথে, হারুণের বাসার কাছে আমার গাড়ি রেখে হারুণের গাড়িতে উঠলাম।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এক সপ্তাহ কাটেনি। শবে-বরাতের রাত অথবা রোজার প্রথম কি দ্বিতীয় রাত হবে। এতদিন পরে সঠিক তারিখটা মনে নেই। সেহরির সময় ভাবী ও আমি কথা বলছি। হঠাৎ শুনি দরজায় নক। আমি উঠে দরজা খুলেছি, দেখি মিঞাভাই দাঁড়িয়ে আছেন। লুঙ্গি পরিহিত, সারা গা ও মাথা চাদর দিয়ে ঢাকা। চুল উস্কখুস্ক, মুখে খোচা-খোচা দাড়ি। ভাবীকে বল্লেন, 'আমাকে কিছু খেতে দাও আগে, আমি খুব ক্লান্ত, সারা রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছি।' আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। খাওয়াদাওয়া করে একটু স্থির হয়ে মিঞাভাই বল্লেন সব কথা। সীমান্ত পার হতেই তাকে বি এস এফ গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক আগরতলাতে যে আগে থেকে মোয়াজ্জেম চৌধুরীর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব ঠিক করে রাখার কথা ছিল, তা তিনি করেননি। মিঞাভাইর সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোনরূপ অসৌজন্যমূলক আচরণ করেনি, কিন্তু ওখান থেকে তাকে লন্ডন যেতে দিতে তারা রাজি হয় নি। তারা নাকি তাকে আগরতলা থেকেই পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা করতে অনুমতি দিতে চেয়েছিল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মিঞাভাই চলে আসেন। মিঞাভাইর ওপর তখনও সরকারি অন্তরীণাদেশ। তাই লোকচক্ষুর আড়ালে তাকে পায়ে হেটে আসতে হয়েছে৷"[১৯৪]

[১৯৪] মমিনুল হক খোকা/অস্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জল : বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - আগস্ট, ২০০০। পৃ. ৮৪-৮৭]

০৬.

"... পাকিস্তানে সামরিক বেসামরিক চাকরিতে ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের যে অতিক্ষমতাসম্পন্ন মার্কিনী লবি ছিল তার প্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিশেষ সহকারী (Special Assistant to President) ফিদা হাসান। আগরতলা মামলা দায়েরের পর মার্কিনী লবির বৈঠকে যখন সিদ্ধান্ত হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে পূর্ব পাকিস্তানে তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠাতে হবে, তখন শক্তিধর ফিদা হাসান প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে ঐ মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়ানোর পরামর্শ দেন। আইয়ুব তা উপেক্ষা করেন এই যুক্তিতে যে, শেখ মুজিবকে মামলায় জড়িয়ে জনপ্রিয় করা ভুল হবে। ফিদা হাসান তখন গভর্নর মোনায়েম খাঁর সাথে যোগাযোগ করে একই পরামর্শ দেন এই বলে যে, আগরতলা মামলার আসামী হলে শেখ মুজিব হবে শেষ এবং সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে কনভেনশন মুসলিম লীগের এবং মোনায়েম খাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মোনায়েম খাঁ ফিদা হাসানের কূট পরামর্শ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের উপর এমন পীড়াপীড়ি ও চাপ সৃষ্টি করে যে, আইয়ুব খান তার একান্ত অনুগত গভর্নরের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামী করার বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেন। তখন আরো জানা যায় যে, এই প্রবীণ আমলা ফিদা হাসানেরই উপদেশে গভর্নর মোনায়েম ইতোপূর্বে শেখ মুজিবকে ঘন ঘন গ্রেফতার ও মুক্তি প্রদান করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে ফিদা হাসানের উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট ঘেঁষা মওলানা ভাসানীর অপরিসীম জনপ্রিয়তার বিপরীতে আমেরিকার বিশ্বাসভাজন শেখ মুজিবকে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা মার্কিনী লবি প্রায় এক দশক ধরে চালিয়ে আসছিল॥"[১৯৫]

০৭.

"... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালে জেল থেকে বেরিয়ে আরহাম সিদ্দিকীর (বলিয়াদীর জমিদার পুত্র ও ব্যবসায়ী) গুলশানের বাংলোতে গিয়ে দু'দিন বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন। বাসায় তার বিশ্রাম নেয়া সম্ভব হতো না। সাক্ষাৎকারীদের ভীড় এড়ানো যেত না, তাই উঠেছিলেন আরহাম সিদ্দিকীর বাংলোয়। সেখানে আলোচনার জন্য ডেকে ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরীকে।

চৌধুরীঃ বঙ্গবন্ধু, আপনার দল আওয়ামী লীগে নব্য বাঙ্গালী ধনীদের দ্রুত সমাবেশ ঘটেছে। এরা নিজেদের স্বার্থে ৬ দফাকে ব্যবহার করবে। আপনি তাদের কি করে ঠেকাবেন?

বঙ্গবন্ধুঃ তুমি কেবল নব্য ধনী ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের দেখছো? পাকিস্তানের সিভিল ব্যুরোক্রাসি ও আর্মির ভেতরে ছোট হলেও যে বাঙ্গালী অফিসার্স সেকশনটি গড়ে উঠছে, সেদিকে থেকে বিপদের কথা ভাবছো না?

চৌধুরীঃ তারা কি এতোই শক্তিশালী যে বিপদ ঘটাতে পারে?

বঙ্গবন্ধুঃ এই বাঙ্গালী সিভিল এবং আর্মি অফিসারদের বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কমিটমেন্ট খুব কম। এরা কমবেশি ক্যারিয়ারিষ্ট। পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারের বৈষম্য নীতির দরুণ এদের পদোন্নতি না হওয়াতে এরা ক্ষুব্ধ। এরা জেনারেল হতে চায়। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে বড় বড় পদে প্রোমোশন চায়। কিন্তু বাঙ্গালী বলে তাদের জন্য এই দুয়ার রুদ্ধ।

এরাও তাই এখন ৬ দফার সমর্থক। কিন্তু আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে এরা বাংলাদেশের মানুষের হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিতে চায় না। এরা চায় গোপন ষড়যন্ত্র করে, আইয়ুব বা ইয়াহিয়া খানকে হঠাৎ হত্যা করে বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করতে এবং বাংলাদেশে বাঙ্গালী মিলিটারী শাসন কায়েম করতে।

---

[১৯৫] সিরাজুল হোসেন খান (প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং শ্রমিক নেতা, সাবেক মন্ত্রী)/উপমহাদেশের সামাজিক- রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত ॥ [ঝিনুক প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী, ২০০২। পৃ. ১২৮-১২৯]

গাফফার, তোমাকে বলছি এটা এখন প্রকাশ করো না। জেলে থাকতে আমার কাছে কয়েকবার এই বাঙ্গালী মিলিটারি অফিসারেরা প্রস্তাব পাঠিয়েছে, আপনি ছ'দফা নিয়ে আন্দোলন করবেন না। তাতে আইয়ুব খান সতর্ক হয়ে যাবে। আপনি চুপ থাকুন, আমরা হঠাৎ বাংলাদেশের কয়েকটা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়ে তারপর পিন্ডির সাথে কনফেডারেশন করব। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হবার পর কর্ণেল মোয়াজ্জেমের আমার বিরুদ্ধে বিবৃতি, তার ছয়দফা নয়, একদফা, এসব ইস্তাহার দেখে তোমরা কি কিছু আন্দাজ করতে পারনি?"[১৯৬]

৩৮.

"...ট্রাইবুনাল কক্ষ। ৩০ আগস্ট, ১৯৬৮। পাকিস্তানের দুইজন সাবেক পররাষ্ট্র উজির গতকাল বৃহস্পতিবার বিশেষ ট্রাইবুনাল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। জনাব মঞ্জুর কাদের রাষ্ট্রের পক্ষের প্রধান কৌসুলি - তাঁহার বিপরীতে বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন পাকিস্তানের অপর সাবেক পররাষ্ট্র উজির ও বর্তমানে পিপলস পার্টির প্রধান জনাব জেড. এ. ভুট্টো। দর্শক ও কৌসুলিদের মধ্যে তাহার উপস্থিতি গতকাল বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল।

তিনি কি বিবাদী পক্ষের কৌসুলিরুপে কোর্টে যোগদান করিবেন?

এই প্রশ্নটি গতকাল অনেকের মুখেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাংবাদিকদের সরাসরি এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো সংক্ষেপে বলেন, কাল দেখা যাইবে।

গত বুধবার তিনি ঢাকা আগমন করেন এবং প্রাথমিক কর্মসূচী অনুযায়ী তিনি এই মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় আছেন। ট্রাইবুনালের অধিবেশন শুরু হইবার কয়েক মিনিট পূর্বে জনাব ভুট্টো কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি অভিযুক্তের কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া যান এবং তাহার সহিত করমর্দন করেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তাহারা দুই এক মিনিট কথাও বলেন। জনাব ভুট্টো একটি আসনে ফিরিয়া আসেন। সাংবাদিকদের একক প্রশ্ন - কোন পক্ষের জন্য আপনি আসিয়াছেন?

জনাব ভুট্টো মৃদু হাসিয়া তাহার বাম দিকের বিবাদী পক্ষের কৌসুলিদের আসন দেখাইয়া দেন।

বিরতির পর মূহুর্তেই জনাব ভুট্টো অভিযুক্তদের কাঠগড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবের সাথে দশ মিনিটকাল গভীরভাবে আলাপ করেন। পরস্পরের কাঁধে হাত রাখিয়া আলাপ করার সময় দুইজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল কাঠগড়ার আবক্ষ উচ্চ রেলিং॥" (*দৈনিক আজাদ*-এ লেখকের মামলার নিয়মিত রিপোর্টিং)

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ (প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা) কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত পত্র

"... ১৯৬৩ইং আমার ভাই MLA শ্রী উমেশলাল সিং সমভিব্যাহারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জিলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আগরতলায় আমার আগরতলার বাংলোয় রাত্র ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর সাথে দেখা করি। আমার সাথে ছিলেন শ্রী শ্রীরমন চীফ সেক্রেটারি। তাকে (শ্রীরমনকে) শ্রী ভান্ডারিয়ার বিদেশ সচিবের রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ চীনের সাথে লড়াইয়ের পর এতোবড় ঝুঁকি নিতে রাজি হন নাই।

---

[১৯৬] বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা/সম্পাদনা : আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার ॥ [কাকলী প্রকাশন - মার্চ, ১৯৯৬। পৃ. ৯০-৯১]

তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি (শেখ মুজিব) ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। সোনামুড়া পশ্চিম ত্রিপুরারই এক মহকুমা কুমিল্লার সাথে সংলগ্ন। শেখ মুজিব রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়॥"[১৯৭]

০৯.

"... উল্লেখ্য, মামলাটির রাষ্ট্রীয় নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রচারযন্ত্রে মামলাটির শিরোনাম বিকৃত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করা হয়। ফলে এখনো পত্রপত্রিকায় মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে। আজও মামলাটির প্রসঙ্গ এলে প্রায় সবাই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে থাকেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যারা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলাম, 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নেব, তাদের বন্দী করব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব। এ কথা ঠিক, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধুসহ আমরা সবাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছিলাম। বাঙালি জাতিও মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে তা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল। তা ছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের কথা। কিন্তু এখন তো ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

... প্রথম দিকে অনেকের মতো আমিও ভেবেছিলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই মামলায় মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু নিজে আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতেন না বা আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন না। তিনি বড়জোর আমাদের পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু Accused Dock-এ অভিযুক্তদের সঙ্গে বসে অভিযোগনামা শুনতে শুনতে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, বঙ্গবন্ধু আমাদের সার্বিক পরিকল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন এবং সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। আমার এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয় মামলা শুরু হওয়ার পরবর্তী দিনগুলোতে। আমার মনে আরও বিশ্বাস জন্মাতে থাকে, বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাঙালি জাতির সুখ-দুঃখ-বেদনা-বিক্ষোভ তিনি নিজের জীবনে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই যেকোনো পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতির মুক্তির চিন্তা করতেন এবং সে লক্ষ্যে কাজ করতেন। আইনের দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই প্রখর, যা তার মধ্যে অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত আইনের দ্বারা মামলাটির নিস্পত্তি হয়নি। রাজনৈতিকভাবেই মামলাটির নিস্পত্তি হয়েছিল, অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণেই মামলাটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। আমি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য শুরু হওয়ার প্রথম দিন জনাব মনজুর কাদেরের মুখে অভিযোগনামার বিবরণ শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃতপক্ষেই একজন তুলনাহীন নেতা। আমি ভেবে গর্বিত হয়েছিলাম, আমার নেতা 'মুজিব ভাই' এই মামলায়ও আমার নেতা। অভিযুক্ত নং ১-এর আসনটি তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিল। আইয়ুব খানের বিবেচনায়ও মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে মূল ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুই ছিলেন। তাই তো মামলার সরকারি নামকরণ করা হয়েছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।

আমার নেতা 'মুজিব ভাই' সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে ইতিহাসে তার নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, এ কথা ভেবে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। যদিও মূল পরিকল্পনা

[১৯৭] ফয়েজ আহমদ/আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮। পৃ. ৫৭/১২৮]

বাস্তবায়নে শহীদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের (অভিযুক্ত-২) অবদান ছিল অসামান্য। ২৬ মার্চ ১৯৭১ ভোরবেলা তিনি পাকিস্তানিদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি। আরেকজনের নাম আমি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। তিনি হলেন অভিযুক্ত ৩ স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃতদেহও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার বিচারকার্য শুরু হওয়ার পর ট্রাইবুনাল কক্ষেই একদিন একান্তে বঙ্গবন্ধুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য কি না। এর উত্তরে বঙ্গবন্ধু আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ'। বঙ্গবন্ধুর উত্তর শুনে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকালেন এবং আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আমি জানি, তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগও সত্য। আমিও তোমার জন্য গর্বিত'॥"[১৯৮]

১০.

যেভাবে 'বঙ্গবন্ধু' হলেন

ক.

"... গণসংবর্ধণা অনুষ্ঠান নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) দিবাগত রাতে সমস্ত রাত ইকবাল হলের প্রভোস্ট অফিসে আমাদের তদানীন্তন প্রভোস্ট আবদুল মতিন চৌধুরীর রুমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় - কে কে বক্তৃতা দেবেন, মঞ্চে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থাকবেন - ইত্যাদি অনেক আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, শেখ সাহেব একাই বক্তৃতা করবেন। এবং মঞ্চে মণি সিংহ, মাওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহাম্মদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও থাকবেন। কিন্তু ছাত্রলীগ জননেতা শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কোন দলের কোন নেতার মঞ্চে থাকার বিরোধিতা করেন। এমতাবস্থায় মানিক ভাই ছাড় না দেওয়ার জন্য আমাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের একটি চিরকুট পাওয়ার সাথে সাথে আমার সাথে পরামর্শ না করেই সংগ্রাম পরিষদের সভা মঞ্চে আর কেউ থাকার প্রয়োজন নাই বলে প্রস্তাব দেন। আমি অবাক হয়ে যাই কারণ তিনিই আমাকে ছাড় দিতে না করেন। মানিক ভাই ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মতামতই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু তিনিই তো আমাকে শক্ত থাকতে বলেন। যাই হোক, আমি ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সভা আহবান করি এবং সেখানে মানিক ভাইয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

২২ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সারারাত ধরে যে মিটিং হয় সেই মিটিং-এ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কেউ কোন প্রস্তাব দেননি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সংবর্ধনায় তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হবে। আমি মনে করি একজন নেতা তার জীবনবাজী রেখে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম ও সামরিক আদালতের প্রহসনের রায়ের মৃত্যুদন্ডাদেশের পরোয়া না করে জাতীয় নেতায় উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন - তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করার বিরোধিতা কেউ করত বলে মনে করি না। এহেন পরিস্থিতিতেও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে তোফায়েল আহমেদ তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের দুই হাত তুলে সমর্থন দান খুবই স্বাভাবিক থাকলেও একটি বিষয় রাজনৈতিক ইতিহাসে জানার স্বার্থেই আমি উল্লেখ করছি মাত্র। সেই বিষয়টি হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদানে কোন আপত্তি কারোই ছিল না বা নাই। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাউকে না জানিয়ে যে পদ্ধতিতে তার মতো নেতাকে এই উপাধি দেয়া হয়, তা না করে উচিৎ ছিল আনিষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংকটের একটি নমুনা হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। যিনি দলীয় নেতা থেকে

[১৯৮] কর্নেল শওকত আলী/সত্য মামলা আগরতলা ॥ [প্রথমা প্রকাশন - জানুয়ারি, ২০১১। পৃ. ভূমিকা। ১৩৬-১৩৭]

জাতীয় নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক হিসেবে স্বীকৃত তার ক্ষেত্রে ঐ সংকীর্ণতার কোন প্রয়োজন ছিল না॥"[১৯৯]

খ.

"...২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় ও এই মামলায় আটক সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। অপরাহ্নে বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। সন্ধ্যায় মণি সিংহসহ সকল নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। দীর্ঘ এক যুগ পর কারাগার রাজবন্দীশূন্য হয়। এই সকল ঘটনায় জনগণ আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে উৎসব শুরু হয়ে যায়। এই বিজয় উৎসবের তরঙ্গ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ-সময়ে ১১-দফা না মানলে পূর্ব বাংলায় তা কার্যকর করা হবে, প্রয়োজনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে এই ঘোষণা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-জনসভায় ছাত্র ইউনিয়ন ঘোষণা করে।

মণি সিংহসহ সদ্যমুক্ত নিরাপত্তা বন্দীরা শহীদ মিনারে জমায়েত হলে হাজার হাজার মানুষ তাদের সংবর্ধনা জানাতে আসে। এই সমাবেশে মণি সিংহ বক্তৃতা করেন। হাজার হাজার মানুষ শেখ মুজিবের বাড়ীতেও উপস্থিত হয়।

সকালের দিকে শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করে বের হয়ে এলে স্যাক-এর পক্ষ থেকে তার সম্বর্ধনার জন্য ছাত্র লীগের তরফ থেকে প্রস্তাব আসে। ছাত্র ইউনিয়ন তাতে রাজী হয়। দুপুর থেকেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে, আওয়ামী লীগের অর্থানুকূল্যে শেখ মুজিবের সম্বর্ধনার জন্য প্রচার শুরু হয়। স্থান ঠিক হয় রমনা রেসকোর্স।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল রাজবন্দী মুক্তি পেয়ে আসলে ছাত্র ইউনিয়ন দাবি করে যে, স্যাক থেকে পরের দিন রেসকোর্সে সকল মুক্তবন্দীকে একযোগে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হোক। ছাত্র লীগ এতে রাজী হয় না। তারা বলে যে, প্রথমে শেখ মুজিবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এটা কেবল শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা হবে। পরে মণি সিংহসহ অন্যদের সম্বর্ধনা দেয়া হবে। ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র লীগের এই সঙ্কীর্ণতা সহ্য করতে রাজী হয় না। ফলে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্যাক ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় পার্টির তরফ থেকে বলা হয়, যেন ছাত্র লীগের প্রস্তাব গ্রহণ করে স্যাক-এর ঐক্য রক্ষা করা হয় এবং সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে ১১-দফা সমর্থন করিয়ে নেয়া হয়। ফলে, স্যাক-এর ঐক্য রক্ষা পায়। কিন্তু সঙ্কীর্ণতা কেবল ছাত্রলীগের নয়; প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব একাই ঐ জনসভায় ভাষণ দিতে চাচ্ছিলেন। তার বক্তব্য ছিল যে, এই সভা থেকে 'আমি জনগণের ম্যান্ডেট লইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে চাই।'

২৩শে ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ন্যূনপক্ষে ৫ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ জনসমাবেশ হয়েছিল। সভায় ছাত্র নেতারা প্রথম বক্তৃতা করেন। তারা দাবি করেন যে, শেখ মুজিবকে সুস্পষ্টভাবে ১১-দফা সমর্থন করতে হবে এবং এ-কথা তাঁকে বলতে হবে যে, ছাত্র-জনতা বুকের রক্ত দিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়েছে। তাই শেখ মুজিব ১১দফার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শেখ মুজিব ১১-দফা সমর্থন করেন এবং একই সঙ্গে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। জনগণের সমর্থন নিয়ে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার কথা এই সভাতেই ঘোষণা করেন॥"[২০০]

---

[১৯৯] মোঃ সামসুদ্দোহা ('৬৯-এর ছাত্র নেতা এবং ১১ দফার প্রণেতা)/ইতিহাসের অল্প কথা ॥ [অঙ্কুর প্রকাশনী - জুলাই, ২০০০। পৃ. ৯০-৯১]

[২০০] উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান/মোহাম্মদ ফরহাদ ॥ [দ্যু প্রকাশন - জানুয়ারি, ২০১৯। পৃ. ১১৫-১১৬]

গ.

"... একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন, তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। ২২ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঢাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনের নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী (পরে মেজর জেনারেল) ঢাকা সেনানিবাসের বন্দিশালা থেকে শেখ মুজিবকে নিজে গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেন।

ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাছে প্রস্তাব আসে শেখ মুজিবকে গণসংবর্ধনা দেওয়ার। ঠিক হয়, রেসকোর্সে (পরে নাম হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার আয়োজন করা হবে। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে সব রাজবন্দী মুক্তি পেলে ছাত্র ইউনিয়ন দাবি করে যে পরদিন রেসকোর্সে সবাইকে একযোগে সংবর্ধনা দেওয়া হোক। ছাত্রলীগ এতে রাজি হয়নি। তাদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়, যেহেতু শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেছে, তাই এটি শুধু শেখ মুজিবেরই সংবর্ধনা হবে। পরে মণি সিংহসহ অন্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগের এই সংকীর্ণতা সহ্য করতে রাজি ছিল না। ফলে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বলা হয়, যেন ছাত্রলীগের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য রক্ষা করা হয় এবং সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে এগারো দফা সমর্থন করিয়ে নেওয়া হয়। ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য রক্ষা পায়। কিন্তু সংকীর্ণতা কেবল ছাত্রলীগের নয়। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব একাই ওই জনসভায় ভাষণ দিতে চাচ্ছিলেন। তার বক্তব্য ছিল যে 'এই সভা থেকে আমি জনগণের ম্যান্ডেট লইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে চাই।'

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা এ নিয়ে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি ওই সভায় যেতে অস্বীকার করেন। সামসুদ্দোহার বর্ণনামতে, ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে ইকবাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরীর অফিসকক্ষে সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় শেখ মুজিব একাই ভাষণ দেবেন এবং মণি সিংহ, মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ নেতা মঞ্চে থাকবেন। কিন্তু ছাত্রলীগ শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কোনো নেতার মঞ্চে উপস্থিত থাকার বিরোধিতা করে। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এ বিষয়ে কোনো ছাড় না দিতে সামসুদ্দোহাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ একটি চিরকুট পাঠান। যেখানে বার্তা ছিল, মঞ্চে অন্য কারও থাকার দরকার নেই। এই চিরকুট পেয়ে সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ছাত্রলীগের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এতে সামসুদ্দোহা ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ভাষ্য হলো :

'মানিক ভাই ছিলেন সংগঠনের সভাপতি, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মতামতই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু তিনিই তো আমাকে শক্ত থাকতে বলেন। যা হোক, আমি ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করি এবং সেখানে মানিক ভাইয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করি। সারা রাত এবং পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর পর্যন্ত না ঘুমিয়ে আর কিছুতেই থাকা যাচ্ছিল না, তদুপরি মানিক ভাইয়ের ওপর ক্ষোভ ও অভিমান খুবই হয় বিধায় ইকবাল হলে আমার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।'

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। ঢাকায় এর আগে সম্ভবত এত বড় জনসভা আর হয়নি। জনসভা আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা ও সিরাজুল আলম খান। ওই সভায় শেখ মুজিব ঘোষণা দেন, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন, বাংলার মানুষের দাবি আদায় করবেন। সভাপতির ভাষণে তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে ঘোষণা দেন। এত বড় জনসভা, কিন্তু কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ছিল না। ঢাকার ডেপুটি কমিশনার এম কে আনোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল।

তিনি সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তোফায়েলের 'বঙ্গবন্ধু' ঘোষণা নিয়ে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সামসুদ্দোহা বলেন :

'২২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সারা রাত ধরে যে মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কেউ কোনো প্রস্তাব দেননি যে শেখ মুজিবুর রহমানের গণসংবর্ধনায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হবে।...বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদানে কোনো আপত্তি কারোরই ছিল না বা নাই। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাউকে না জানিয়ে যে পদ্ধতিতে তাঁর মতো নেতাকে এই উপাধি দেওয়া হয়, তা না করে উচিত ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংকটের একটি নমুনা হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে।...ওই সংকীর্ণতার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় তোফায়েল আহমেদ ছিলেন 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির ঘোষক। শেখ মুজিবের জন্য এই নাম তৈরি হয়েছিল আগেই। ছাত্রলীগের ঢাকা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক ৩ নভেম্বর (১৯৬৮) ছাত্রলীগের প্যাডে 'আজব দেশ' শিরোনামে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম সম্বন্ধে একটি লিফলেটের খসড়া লিখেছিলেন। মোশতাক 'সারথি' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। লেখাটির শেষ পৃষ্ঠায় শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি লেখেন, পূর্ব বাংলার নয়নমণি–মুক্তি দিশারি — বঙ্গবন্ধু–সিংহ শার্দুল জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আজব ও অভিনব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি টিকে থাকতে পারে–নতুবা নয়। ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার বুলেটিন 'প্রতিধ্বনি'র শেষ পৃষ্ঠায় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি প্রথমবারের মতো ছাপা হয়। বুলেটিনটি সম্পাদনা করেছিলেন আমিনুর রহমান। সিরাজুল আলম খান রেসকোর্স ময়দানে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি ঘোষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এভাবে :

'রেজাউল হক মুশতাক আর শেখ কামাল একটা ওয়ালপেপার বের করেছে। আহসানউল্লাহ হলের (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ২১৪ নম্বর রুমে থাকতাম আমি। ওরা আমাকে আসতে বলল। গিয়ে দেখি যে বড় একটা পোস্টার, 'বঙ্গবন্ধু' লেখা। এটি লাগাবে, পরামর্শটা চাচ্ছে। কাগজটা মুড়ি দিয়ে বললাম কাউকে কিছু বোলো না। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে যাচ্ছি। গাড়িতে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমি আর তোফায়েল। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে এসে লিডার কানের কাছে মুখ এনে বললেন যে কী বলবেন-টলবেন। বললাম, আমাদের সব ঠিক আছে। তোফায়েল বলল, 'কী বলব?' আমি বললাম যে তুমি একটা টাইটেল দেবা। আমি বাঁয়ে ঝুঁকলাম লিডারকে বলার জন্য। তোফায়েল একটা জিনিস দেবে আপনাকে। উনি এটি বুঝলেন, সেন্স করেছেন। জিজ্ঞেসও করলেন না। উনার ওপর আমার একটি বিরাট কনফিডেন্স হলো। তোফায়েলকে বললাম, তোমার বক্তৃতা শর্ট হবে। এ জায়গায় এটি বলবা, রিসেপশনটা ভালো হবে। এটি আমরা আনলাম ইঞ্জিনিয়ারিং করে।'

রাজনীতিতে শেখ মুজিবের একক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এটি পরে তার নামের অপরিহার্য অংশ করে তোলার চেষ্টা হয়। ফলে রাজনীতিতে ব্যক্তির কাল্ট প্রতিষ্ঠার পথে আওয়ামী লীগ এক ধাপ এগিয়ে যায়॥"[২০১]

---

[২০১] মহিউদ্দিন আহমদ/আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) ॥ [প্রথমা প্রকাশন - ডিসেম্বর, ২০১৬। পৃ. ১৯০-১৯৪]

দুই

ষড়যন্ত্রে ভারত : ভূমিকা ও প্রচেষ্টা

০১.

"... কতিপয় প্যারায় ভারতীয় সাহায্য সম্পর্কে কয়েকটি শিথিল এবং অসংলগ্ন বিবৃতি ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সাহায্যের অভিযোগ প্রথম উত্থাপন করা হয় ৪২ প্যারায় এবং সেটি করা হয় মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পরে। মামলার অভিযোগে বলা হয় যে, মুজিবের বাসভবনে আওয়ামী লীগের একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যোগদানের আগে মানিক চৌধুরী ৭ নং সাক্ষী ও একজন রাজসাক্ষী সায়েদুর রহমানকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী পিএন ওঝার কাছে তার অফিসে নিয়ে যান এবং ওঝা সায়েদুর রহমানের বিবরণ নোট করে তাকে পরে দেখা করতে বলেন। সায়েদুর রহমান সেই অফিস থেকে বের হয়ে আসেন এবং মানিক চৌধুরী আরো কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন।

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে মুয়াজ্জম ৭ নং সাক্ষী সায়েদুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেন যে, গ্রেফতার হওয়ার আগে মানিক চৌধুরী (ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্রববিহীন কতিপয় কারণে মানিক চৌধুরীকে ১৯৬৬ সালের ২১শে মে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়।) ষড়যন্ত্রের কাজে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রের একটি তালিকা পিএন ওঝার কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সায়েদুর রহমান ওঝাকে চেনেন কিনা মুয়াজ্জম জিজ্ঞেস করলে তিনি হাঁ বাচক জবাব দেন। মুয়াজ্জম সায়েদুর রহমানকে অস্ত্রের তালিকাটি ওঝার কাছে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ জানালে সায়েদুর রহমান এই বলে তাতে অসম্মতি জানান যে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

কয়েকদিন পর এক সকালে ওঝা চট্টগ্রামে সায়েদুর রহমানের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হন এবং অভিযোগ করেন যে তার অনুরোধ সত্ত্বেও সায়েদুর রহমান কেন তার সঙ্গে ঢাকাস্থ অফিসে আর দেখা করেননি। সে সময় সায়েদুর রহমান মানিক চৌধুরীর যে অস্ত্রের তালিকাটি পৌঁছে দেয়ার কথা ছিল সে বিষয়ে মুয়াজ্জমের বক্তব্য ওঝাকে অবহিত করেন।

পরদিন ওঝার নির্দেশে সায়েদুর রহমান মুয়াজ্জমের কাছ থেকে তালিকাটি সংগ্রহ করেন এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে তা ওঝার কাছে হস্তান্তর করেন। সে সময় ওঝা ঢাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সায়েদুর রহমানকে একটি সাংকেতিক শব্দ দেন এবং জানান যে মুয়াজ্জম যেন তার (ওঝার) সঙ্গে ঢাকায় দেখা করেন।

কয়েকদিন পরে ২ নং অভিযুক্ত মুয়াজ্জম হোসেন সায়েদুর রহমানের উদ্যোগে ধানমন্ডিতে ভারতীয় হাইকমিশনারের সরকারি বাসভবনে ওঝার সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। ওঝা মুয়াজ্জমকে নিশ্চয়তা দেন যে তিনি অস্ত্রের তালিকাটি অনুমোদনের জন্য ভারতীয় সরকারের কাছে পাঠাবেন। অবশ্য ওঝা তখনকার মতো ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো টাকা দেয়ার ব্যাপারে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বারের মতো সায়েদুর রহমান ওঝার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে মুয়াজ্জম এবং ওঝার মধ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। ওঝা মুয়াজ্জমকে জানান যে ভারতীয় সরকার ষড়যন্ত্রকারীদের অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন এবং কবে নাগাদ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হবে তা যথাসময়ে মুয়াজ্জমকে জানাবেন।

১৯৬৬ সালের অক্টোবরে সায়েদুর রহমান তৃতীয় বারের মতো ওঝার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে ওঝা এবং মুয়াজ্জমের মধ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। ওঝা সেখানে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে ভারতীয় আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কারণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের দিনক্ষণ স্থির করা যায়নি। তিনি ভারতে সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া অবধি অস্ত্রশস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করতে ষড়যন্ত্রকারীদের পরামর্শ দেন।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে মুয়াজ্জম মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে (২৩শে জানুয়ারী আটকাদেশ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত) ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে ওঝার সঙ্গে তার চতুর্থ বৈঠকের আয়োজন করেন। ১০ই মার্চ মুয়াজ্জম, মানিক চৌধুরী এবং সায়েদুর রহমান ওঝার সঙ্গে দেখা করলে ওঝা তাদের জানান যে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া অবধি অস্ত্র সরবরাহের দিনক্ষণ নির্ধারিত করা যাবে না। ওঝা তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বৈঠক শেষে ওঝা তাদের নগদ ৫০০০ রুপী প্রদান করেন।

১৯৬৭ সালের ৩১শে মার্চ মুয়াজ্জম মানিক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চমবারের মতো ওঝার ঢাকার বাসভবনে ওঝার সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকে ওঝা জানান, ভারতীয় সরকার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের আগে ষড়যন্ত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ভারতের কতিপয় অফিসারের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন। ওঝা বলেন যে ভারতের আগরতলা পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত হতে বেশী দূরে নয় বলে সেখানেই বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তিনি প্রতিনিধিদের নাম প্রস্তাব করার জন্য মুয়াজ্জমকে পরামর্শ দেন। সেই উপলক্ষে ওঝা ১০,০০০ রুপীও দেন।

১৯৬৭ সালের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুয়াজ্জম মানিক চৌধুরীকে একটি খামসহ ঢাকা পাঠান এবং খামটি ওঝার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেন। সেদিন বিকেলেই তিনি সেই আদেশ পালন করেন। খামে প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সীমান্ত পারাপারের স্থানের সাংকেতিক নাম দেয়া হয়। মোহাম্মদ আলী রেজা এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের নাম প্রতিনিধি দলের তালিকায় রাখা হয়। রেজা ছিলেন প্রতিনিধিদলের নেতা।

১১ই জুলাই আরো তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ মনোনীত প্রতিনিধি দুজন ফেনী আসেন এবং ফেনী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দিনুফা হোটেলে ওঠেন। সেদিন সন্ধ্যায় স্টুয়ার্ড মুজিব ১২ নং সাক্ষী রশিদকে (চট্টগ্রামে পি আই এ তে কর্মরত) ফেনী আসার জন্য টেলিফোনে নির্দেশ দেন। তদনুসারে রশিদ ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে একটি পি আই এর স্টাফ কারে ফেনী আসেন।

১২ জুলাই বিকাল আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে ১২নং সাক্ষী রশিদ ২০ নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে রেজা এবং স্টুয়ার্ড মুজিবকে পি আই এ-র স্টাফ কারে করে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তের কাছে মেইন রোডে নামিয়ে দেন। এর পর একই রাতে তারা চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। ১৭ নং সাক্ষী জালাল দুজন প্রতিনিধিকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যেতে সাহায্য করেন।

১৯৬৭ সালের ১৩ই জুলাই একই রাতে দুজন প্রতিনিধি একটি ট্রাকে করে আগরতলা থেকে দিনুফা হোটেলে ফিরে আসেন।

একই সালে, ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে মুয়াজ্জম, মানিক চৌধুরী এবং সায়েদুর রহমানকে সাথে নিয়ে শেষবারের মতো ওঝার ঢাকাস্থ বাসায় ওঝার সঙ্গে দেখা করেন। ওঝা মুয়াজ্জমকে বলেন যে তিনি তার সরকারের কাছ থেকে আগরতলা বৈঠকের কোন ফলাফল এখন পর্যন্ত পাননি। তবে গোপনে তিনি মানিক চৌধুরীকে জানান যে ভারতীয় অফিসারেরা প্রতিনিধিদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এই বিবৃতির মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান সরকার দায়েরকৃত মামলায় আগরতলা ষড়যন্ত্রে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগ শেষ হয়ে যায়।

ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুরো ঘটনাকে ভারত ও পাকিস্তানের পরস্পরের প্রতি মনোভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। পাকিস্তানের প্রধান দুর্বলতা ছিল একক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এবং এটা ছিল স্বাভাবিক যে ভারত সবসময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বিরোধের দিকে নজর রাখবে ও যখন সম্ভব সে সুযোগ কাজে লাগাবে। কোনো দেশের তা করা উচিত নয় এ কথা ঠিক, কিন্তু কঠিন বাস্তবতা হলো এই যে জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভব এবং বিবেচনাসম্মত বলে মনে

হলে সকলেই তা করছে। আগরতলা ষড়যন্ত্রের কতটুকু গভীর পর্যন্ত এবং কি পর্যায় অবধি আসলেই ভারত জড়িত ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। খুব সম্ভবতঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যারা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেকার বৈরী সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ভারতীয় সাহায্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার অর্জনের সংগ্রামে পারস্পরিক স্বার্থে এ ধরনের পারস্পরিক সমঝোতাভিত্তিক সাহায্য বিনিময় নতুন কোনো ঘটনা নয়। এতে বর্তমানে বাংলাদেশের বাস্তবতা এবং বিগত দিনের কষ্ট, ত্যাগ এবং সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বাঙালীদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের সংগ্রামের প্রেরণা কোনো ভারতীয় পরিকল্পনার ফসল ছিল বলে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। কোনো বাঙালীই এ ধরনের আত্মঘাতী এবং নীচু মানের প্রস্তাব কখনো মেনে নেবে না।

অবশ্য এটা নতুন কোন বিষয় নয় যে বাঙালীরা ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেক গ্রুপ এবং জনসাধারণের অনেকেও একই লাইনে চিন্তা করছিলেন। লন্ডনের বামপন্থী ছাত্ররা ইতিমধ্যেই একই উদ্দেশ্যে শক্তিশালী একটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন।

কাজেই এটি কোনো অসম্ভব ঘটনা ছিল না যে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে সমর্থন, তহবিল এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধার কথা সামনে রেখে যোগাযোগ করেছিলেন। ভারতীয় হাইকমিশন তাদেরকে এ ধরনের সহায়তা দানের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত সাহায্য করেও থাকবেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের কোন সাহায্য আসেনি কারণ সংগঠনটিতে কাংক্ষিত নেতৃত্ব ছিল না। সংক্ষেপে বলা যায়, ছোট্ট এই গ্রুপটির উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু বিদ্রোহ পরিচালনার মত নেতৃত্ব তাদের ছিল না॥"[২০২]

০২.

"... Then there was an attempt to kidnap and assassinate Ayub in December 1967 while he was on tour in East Pakistan. The plot was unsuccessful and unpublicized - only the foreign press published the news, and All-India Radio also broadcast it with the usual exaggeration. It affected Ayub's image with his armed forces: he was no longer regarded as 'supreme boss', and became uvlnerable.

Soon after the attempt on Ayub's life, the Pakistan political scene was rocked by the startling news of a case of conspiracy with alleged Indian help to bring about secession of East Pakistan through armed uprisings. On January 2, 1968, the Govement of Pakistan announced the discovery of a plot to bring about the secession of East Pakistan, with Indian help. It was disclosed that twenty-eight persons had been arrested: in collaboration with the First Secretary of the the Indian mission in Dacca, Mr P. N. Ojha, they were alleged to have been engaged in anti-state activities and were reported to have contacted the Indian officials to get arms and other material aid across the border at Agartala (India).

Even before the Government's announcement of the conspiracy on January 7, 1968, the market place was full of reports relating to plots, arrests, coups, and so on. In fact, some arrests took place while Ayub was still in Dacca in late December 1967. A meeting of the professors of political science of various universities in both East and West Pakistan was arranged at the President's House during Ayub's stay at Dacca. The theme of discussion at the meeting was how to project the content and spirit of the Muslim nationalist movement for Pakistan. Ayub's two top civil advisers, Altaf Gauhar and Q. Shahab, were present.

---

[২০২] মওদুদ আহমদ/বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ॥ [ইউপিএল - ১৯৯২। পৃ. ৯৭-১০০/১০৩]

I was also asked to participate and as soon as I entered the President's House, I could sense an 'atmosphere of emergency', The meeting was abruptly cut short. Ayub could hardly talk, though he was usually fond of taking his part in such discussions. After the abrupt ending of the meeting. I had a few minutes with him and when I expressed my reaction to the abrupt cancellation of the meeting, his reply was incoherent and inconclusive. I could realize that something grave had happened. The same evening, the usual banquet by the Governor of East Pakistan in honour of the visiting President began late; Ayub appeared after about two hours - an unusual phenomenon on his part. At the provincial Government House. I had a discussion with the Chief of Civil Intelligence (Central), a senior and capable Bengali officer. He gave me the first inkling of the impending crisis or plot although on that occasion I could get little information or data.

The most serious development of the Agartala conspiracy case was Mujib's implication in it - a few days later, the Government announced that Mujib, who had been in jail since the movement for six points in 1966, as also involved in the Agartala case. The reaction to Mujib's arrest in the case was most unfavourable in East Pakistan. I was in Dacca when the government announcements of the conspiracy case and of the subsequent arrest of Mujib were made. The reaction among the Bengali intelligentsia, particularly those at Dacca University, was one of utter disbelief - and to the masses in East Pakistan Mujib became a martyr overnight. Ayub could do then no greater disservice or harm than to make Mujib a hero.

What were the factors which led the Government to arrest Mujib and to give undue prominence and publicity to the Agartala case? Subversive activities of this kind had not been uncommon in the subcontinent since 1947; both India and Pakistan accused each other of internal subversion and with some justification. Pakistan's hands were not clean in Kashmir nor in the Mizo unrest in Assam; similarly Indian involvement in the agitation and upheaval in East Pakistan was nothing new or unusual.

Some explanations can be given relating to Mujib's arrest. Ayub's Provincial Governor in East Pakistan, Monem Khan, and one of Ayub's Bengali cabinet ministers thought that the best and most effective way to meet Mujib's challenges was to implicate him in an Indian-inspired conspiracy which, it was expected, would ruin his political career. Such calculations may have been made and Ayub may have received such advice, but I cannot vouch for such an interpretation of Mujib's arrest. After joining the Pakistan cabinet in 1969, when the Argartala case had already been withdrawn, I read the intelligence reports, both civil and military, relating to it carefully. According to these reports, which were also vouched for by a senior Bengali intelligence officer whose integrity I did not doubt and who now holds a top position in Mujib's government in Bangladesh, Mujib's indictment was based on the following data :

Ojha of the Indian Mission at Dacca used to have regular rendezvous with one of Mujib's closest followers, who is now in a key position in the ruling Awami League party in Bangladesh; in fact, he was like a member of his family and was often in his residence at Dacca. Ojha's meetings with Mujib's man were carefully observed by the intelligence Service, and there were photographs of his movements. Mujib's man, after lengthy discussions with Ojha, would go to Mujib's residence at dhanmondhi, Dacca, following a roundabout way from the place of his meeting with Ojha at an obscure spot in the old quarter of Dacca city. Mujib's wife, though an uneducated woman, began to take an active part in politics after her husband's arrest in 1966; both his wife and Mujib's follower had regular meetings with him at the Dacca Central Jail where Mujib was detained and, thanks to the sympathetic attitude of the Bengali officers and staff of the jail, Mujib had no difficulty in discussing any political plan or plot, even from his confinement.

This, according to the intelligence people, was the basis of Mujib's involvement in the case. But the public, who were never told the inside story, were naturally furious over Mujib's arrest. They asked, quite legitimately, how he could be a party to the conspiracy since he was already in prison.

After the creation of Bangladesh, Mujib himself confessed that he had been working for the secession of East Bengal for some time. But the reaction to Mujib's arrest over the Agartala case in East Pakistan could not have been worse. Not only Mujib's arrest but the stupid way the case, which was otherwise based on facts, was handled by the Ayub régime portended ill for Pakistan's viability as a united country; it had an effect in bringing nearer the final dismemberment of Pakistan in the same way as the much-publicized and frequent observance of 'Anti-Pakistan Days' by the Indian parties, like Hindu Mahasabha had made 'Pakistan' known and popular among the masses of Indian Muslims in the 1940s.

... The drama unfolded in the fullest glare of publicity, and the Dacca newspapers were giving banner headlines to the proceedings of the case. Talk of secession was no longer covert or underground; it was now freely discussed and debated, thanks to the wonderful publicity given by the Ayub regime itself. To draw another comparison with pre-independence days in undivided India, the Agartala case had given the same impetus to the cause of Bengali nationalism as Jinnah's vigorous publicity campaign against Congress rule in the Muslim minority provinces in 1937-9 gave to the creation of Pakistan. Jinnah was successful in making the Indian Muslims realize that there was a conspiracy by the majority Hindu community to destroy the Muslim culture, ways of life, economic and political interests; he observed a 'Day of Deliverance' when Congress rule came to an end in 1939. The publicity in the Agartala case did not expose Mujib or even the Indian involvement; Mujib's chief defence lawyer, Abdus Salam, an Awami Leaguer, himself told me that he had no doubt about India's involvement in the case. It only exposed the Ayub Government's apathy and neglect of the Bengalis' legitimate rights and interests and thereby added arguments in favour of a separate state for the Bengalis.

... Mujib and his close followers began to work for secession of East Pakistan and seemed to have been assured of help and assistance from India. The internal conflict in the country was complicated and aggravated by foreign intervention. The East Pakistan crisis became 'foreign-linked'. The Agartala conspiracy case and Mujib's followers' direct, and his indirect involvement, as I have shown, were based on facts. It is a pity that the conspiracy case had to be withdrawn because of the internal political confusion created during the four month-long agitation against Ayub and his political order. The result was that Mujib, instead of being exposed, became a hero among the Bengalis. Its forced withdrawal of the case made the Pakistan Government appear to be persecuting a leader who only demanded the Bengalis' legitimate rights for regional autonomy. I have heard a tape-recorded version of Mujib's talks with his top political aides in 1970 in which he attributed to Ayub his own unique popularity among the Bengalis."[২০৩]

০৩.

"... ওপরে চাকরি, আড়ালে ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ :

এবিএম সামাদ (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৮নং অভিযুক্ত। পূর্ণ নাম আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদ। কর্পোরাল সামাদ নামেই বেশি পরিচিত। ২০০৭ সালের ২১শে মার্চ এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ

[২০৩] G. W. Choudhury/The Last Days of United Pakistan \ [UPL - 1994| p. 22-25/26-27/230]

করা হয়) জানান, রুহুল কুদ্দুসের বাসা থেকে হায়দরাবাদে ফিরে চাকরিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর ছুটির সময় হলে তিনি চলে আসেন ঢাকায়। আসার সময় মোয়াজ্জেম তাকে বলেছিলেন, ঢাকার গ্রিণ রোডে সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিপরীতে আহমদ ফজলুর রহমানের পেট্রোল পাম্প 'গ্রিন ভিউ'তে যোগ দিতে। আহমদ ফজলুর রহমান সেখানে তাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেন। একটা গাড়িও দেন বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসার জন্য। এই পেট্রোল পাম্পে শেখ মুজিব মাঝে-মধ্যে আসতেন। কিন্তু তার সঙ্গে সামাদের সরাসরি কোনো আলাপ হয়নি। একদিন মিজানুর রহমান চৌধুরী এসেছিলেন আহমদ ফজলুর রহমানকে খোঁজ করতে। তিনি না থাকায় তার জন্য একটা চিঠি দিয়ে যান সামাদকে। সেটি তার পকেটে ছিল। পাকিস্তানি সেনারা চিঠিটি পেয়ে বলেছিল, 'তোমাদের নেতারা যে এখানে আসতেন এই চিঠি তো তার প্রমাণ'।

সামাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রিণ ভিউতে চট্টগ্রামের ভূপতিভূষণ চৌধুরী (১২নং আসামি) ও ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পিএন ওঝাসহ সংশ্লিষ্ট আরও কেউ কেউ আসতেন পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। সামাদের কাজ ছিল সংশ্লিষ্টদের মাঝে নির্দেশমতো যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

১৯৬৬ সালে মোয়াজ্জেম চট্টগ্রাম বিআইডাব্লিউটিএর (অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ) দায়িত্বে থাকার সময় ঢাকায় এসে দেখা করতেন সামাদের সাথে। তিনি সামাদকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে আলাপ করার জন্য। তার পরামর্শ অনুযায়ী সামাদ ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দেন বাঙালিদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য।

সামাদের ভাষায়, 'ভারতীয় দূতাবাসের তৎকালীন দুজন সচিব প্রায় সময় আমার এখান থেকে পেট্রোল নিতেন; তাঁদের একজন মি. জর্জ। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরের ঘটনা। মোয়াজ্জেমের পরামর্শ অনুযায়ী একদিন আমি মি. জর্জকে আমার অফিসের ভেতরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু জরুরি ও গোপনীয় কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি কথা বলতে রাজি হলে তাকে বললাম, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাই, এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা দরকার।' তিনি বললেন, 'এখানে এসব কথাবার্তা বলা সুবিধে হবে না। বরং আপনি অমুক দিন (দিনটি মনে নেই) বিকেল পাঁচটার সময় আমাদের ধানমন্ডি ৮নং সড়কের বাসায় আসুন, সেখানেই কথা হবে'। নির্দিষ্ট সময়ে আমি তার বাসায় গিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছের কথা জানাই এবং এতে ভারতের সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা বলি। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'কেন কোন্ যুক্তিতে ভারত বাঙালিদের সহযোগিতা দেবে?' আমি মোয়াজ্জেমের কথামত বলেছিলাম, 'দেখুন, আমরা পাকিস্তানের একাংশ আছি পূর্ব দিকে, ওরা আছে পশ্চিমে। আর আপনারা (ভারত-পাকিস্তান) একে অপরকে শত্রু ভাবেন। আপনাদের দু'দিকেই সব সময় পাহারায় থাকতে হয়। কিন্তু পূর্বদিকে যদি আমাদের নিয়ে আপনাদের একটি বন্ধু রাষ্ট্র হয় তাহলে আপনাদের আর দুশ্চিন্তা থাকে না'। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা এর পেছনে কারা আছে জানতে চাইলে আমি তাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরের চলমান তৎপরতার কথা জানাই। মি. জর্জ আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'আপনার কথাতো ভাল। আমরাও বুঝি আমাদের একটা কিছু করা উচিৎ। তবে আমাদের দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পিএন ওঝা সপ্তাহখানেক পর ছুটি থেকে এলেই তাকেই বিষয়টি বলবেন'।

সপ্তাহখানেক পর মি. জর্জ পেট্রোল পাম্পে এসে মি. ওঝার আসার খবর দিয়ে তার সেগুন বাগিচার কার্যালয়ে যেতে বলেন। দুজনের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক হলো, কেউ কখনও প্রশ্ন তুললে বলতে হবে যে, ভারতীয় দূতাবাসের গাড়ির জন্য নেওয়া তেলের বিলের লেনদেনের হিসাবের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে।

তা ঠিক করার জন্যই আমি সেখানে (দূতাবাস কার্যালয়ে) গিয়েছি। সে অনুযায়ী হিসাবের একটি খাতাও তৈরি করে নিলাম। মি. জর্জ আমাকে একটি চিঠি লিখে দেন যাতে দূতাবাসের ভেতর ওঝার কাছে যেতে আমার অসুবিধা না হয়।

এরপর একদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমি সেগুনবাগিচায় ভারতীয় দূতাবাস কার্যালয়ে গিয়ে মি. ওঝার সঙ্গে দেখা করে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'এরকম একটা সিদ্ধান্তের বিষয়টি আগে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করে নিতে হবে।' যোগাযোগ করে পরদিনই ভালমন্দ জানাবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। কথামতো পরদিন আমি আবার মি. ওঝার কার্যালয়ে গেলে তিনি প্রাথমিক একটা বৈঠকের জন্য আমাদের পক্ষে কে কে থাকবেন তার একটা তালিকা দিতে বলেন। পরদিন আমি মোয়াজ্জেমের সঙ্গে কথা বলে আমরা দুজন (আমি এবং মোয়াজ্জেম) থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিই। তার পরদিন সকালে মি. ওঝা তেল নেওয়ার জন্য পেট্রোল পাম্পে এলে আমি তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ওইদিন সন্ধ্যায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করি। ইতিমধ্যে মোয়াজ্জেমও ঢাকা এসে পৌছেন।

কথা হলো বৈঠক হবে মি. ওঝার বাসায়। কিন্তু সেখানে যেতে হবে যাতে কেউ কোনো কিছু বুঝতে বা ধারণা করতে না পারে। তখন ফার্মগেট সড়কটি ছিল ছোট। রাস্তার পাশে কিছু ফার্ম (খামার) ছিল। সেখান থেকে শ্যামলীর দিকে একটি সড়ক চলে গেছে। ঠিক হলো আমরা সেই সড়কমোড়ে সন্ধ্যা ছয়টার পর অবস্থান করব। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। আমি আর মোয়াজ্জেম ঠিক সোয়া ছয়টায় সেখানে পৌছার একটু পরই একটা গাড়ি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। ভেতরে লাইট নেই। আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে অন্য একদিকে ঘুরে গাড়িটি ধানমন্ডির ২নং সড়কে মি. ওঝার বাসায় পৌছে। তাঁর তৃতীয় তলার বাসায় আমাদের একটি কক্ষে বসানো হয়। সেখানে দেখি, একটা টেবিলে কতগুলো গরম মশলা, দারুচিনি, এলাচি, কিসমিস ইত্যাদি রাখা আছে। কুশল বিনিময়ের ফাঁকে অল্পক্ষণের মধ্যে চা-পান করতে করতেই কথা শুরু হয়। মি. ওঝা আমাদের পরিকল্পনা এবং ভারতের কাছে কী ধরনের সাহায্য চাই জানতে চান। আমাদের পক্ষে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম বললো, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাই। আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলায়) ক্যান্টনমেন্ট, গভর্নর হাউস সবকিছু দখল করে নেব। সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবো। তার আগে প্রাথমিকভাবে কিছু ছোট অস্ত্র দরকার লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আমাদের প্রস্তুতি শেষ হলেই আমরা আক্রমণ শুরু করবো। আপনাদের দেখতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যাতে অস্ত্র ও সৈন্য আসতে না পারে। সেজন্য আকাশ ও নৌপথ বন্ধ করে দিতে হবে'। রাজনৈতিক শক্তির অবস্থানের ব্যাপারে মি. ওঝা জানতে চাইলে মোয়াজ্জেম তাঁকে জানান, 'আমাদের পেছনে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে করাচিতে আমাদের কথা হয়েছে।'

সব কথা শুনে মি, ওঝা জানান, 'বাংলাদেশের পক্ষে একটা প্রতিনিধি দল ভারতের আগরতলা যেতে হবে। সেখানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট কর্মকর্তারা থাকবেন। ওই বৈঠকে উভয়পক্ষের লোকজন বসে বাংলাদেশের কী কী সাহায্য দরকার, ভারতীয়রা কী কী সাহায্য দিতে পারেন আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।'

ভারতের সীমান্তে গিয়ে সমস্যায় না পড়ার জন্য দুটি পাসওয়ার্ড দেওয়া হয় দূতাবাস থেকে। এর একটি হলো 'বাস্কেট।' ফেনী থেকে সীমান্তে গিয়ে চেকপোস্টে প্রহরীদের 'বাস্কেট' বললেই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অপরটি হলো 'ফ্লাওয়ার।' ভেতরে যাওয়ার পর সেনা কর্মকর্তারা কে পাঠিয়েছেন জানতে চাইবেন। তখন ফ্লাওয়ার বললেই তারা বুঝবেন সঠিক লোকই গেছেন এবং আলোচনায় রাজি হবেন।

সামাদ জানান, এই বৈঠক থেকে আসার কয়েকদিন পরই আগরতলায় যাওয়ার জন্য তিনজন প্রতিনিধি ঠিক করা হয়। একজন আলী রেজা (তখনকার ইস্ট্রাক্টর পিএসপি) আর একজন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও অন্যজন নৌবাহিনীর লে. মতিউর রহমান। খবর পেয়ে তিনি (লে. মতিউর) করাচি থেকে এসে বললেন, 'আমরা যদি ওখানে (সীমান্তে বা ভারতে) কোনো কারণে মারা পড়ি তাহলে আমাদের পরিবারের অবস্থা কি হবে? কাজেই আমাদের একটা গ্যারেন্টি দিতে হবে'।

মোয়াজ্জেমের বক্তব্য ছিল, এটাতো অলিখিত-অঘোষিত সংগ্রামের পথ। এখানে তো গ্যারান্টি দিয়ে কিছু হতে পারে না। এরপর লে. মতিউর রহমান অগ্রিম আর্থিক সাহায্যের কথা বললে সেরকম আর্থিক ক্ষমতাও নেই বলে জানান মোয়াজ্জেম। এ অবস্থায় মতিউর রহমান আগরতলা যেতে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবকে আগরতলা পাঠানো হয়। সামাদের ওপর দায়িত্ব ছিল তাদেরকে ফেনী চেক পোস্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসা।

কথামত সামাদ আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিবকে চেক পোস্টের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন। সেখান থেকে এসে আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড মুজিব জানান, বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরে আরও বৈঠকের প্রয়োজন আছে। সামাদের মতে, আগরতলায় ওই বৈঠকের সূত্র ধরেই পাকিস্তান সরকার মামলাটিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে সাজিয়েছিল।

... নিউ এজেন্সির টাকা গোপন আন্দোলনে :

মানিক চৌধুরীর (আগরতলা মামলার ১২নং অভিযুক্ত। পূর্ণ নাম ভূপতিভূষণ চৌধুরী) ছেলে দীপঙ্কর চৌধুরী ও সহযোগী বিধান সেনের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মানিক চৌধুরী, এম এ আজিজ ও বঙ্গবন্ধুর যৌথ পরিচালনায় খাতুনগঞ্জের আছদগঞ্জ এলাকায় 'নিউ এজেন্সি' নামে একটি ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং ও ইনডেনটিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। এটির দেখাশোনার মূল দায়িত্বে ছিলেন মানিক চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানের আয়ের সিংহ ভাগই খরচ হতো আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে। একটা অংশ গোপনে যেতো সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতিমূলক কাজে জড়িতদের কাছে। বিধান সেনের মতে, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির গোপন পরিকল্পনার ব্যাপারটি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সম্ভবত মানিক চৌধুরীকেই প্রথম জানান বঙ্গবন্ধু। আর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিধান সেনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয় মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে। আগরতলা মামলার আরও একাধিক আসামি গোপন বিপ্লবী আন্দোলন প্রক্রিয়ায় মানিক চৌধুরীর সম্পৃক্ততা এবং তার মাধ্যমে সংগঠনের জন্য অর্থ পাওয়ার বিষয়টি এ লেখককে জানিয়েছেন। সবিতা চৌধুরী ও ছেলে দীপঙ্কর চৌধুরী জানান, তারা জেনেছেন যে, '৭১ সালের মার্চে মুজিব-ভুট্টো আলোচনার সময় অন্যদের সঙ্গে মানিক চৌধুরীও কয়েকবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদই তাকে তখন ফোনে ঢাকায় ডেকে পাঠান। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন মানিক চৌধুরী।

... ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে :

ভারতের সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র খ্যাত আসামিদের যোগাযোগ প্রসঙ্গে কর্নেল (অব.) শওকত (আগরতলা মামলার ২৬নং অভিযুক্ত। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য। ২০০৭ সালের ১০ মার্চ এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়) জানান, 'ভারতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তার নিজস্ব পরিকল্পনা ও সূত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। সেটা আইউব খানের সামরিক শাসনের প্রথম দিককার ঘটনা। বঙ্গবন্ধু নিজেই আমাদের বলেছিলেন যে, তিনি আগরতলা গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ভারতের ভেতর দিয়ে লাহোর গিয়েছিলেন। তার সেই আগরতলা বা ভারতে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের আলোচ্য আগরতলা মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। তবে আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দুজন লোক (আলী রেজা ও স্টুয়ার্ড

মুজিব) আগরতলা যান অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। বঙ্গবন্ধু তখন জেলে। আগরতলা মামলার অভিযোগপত্রের মধ্যেও বিষয়গুলো এসেছে। তবে পরবর্তী সময়ের নানা ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারতের একটা যোগাযোগ অবশ্যই ছিল, যাতে প্রয়োজনের সময় ভারত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

... বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারত গমন :

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী আবুল হোসেন (আগরতলা মামলার বৈরী সাক্ষী। ২০০৯ সালের ৪ জানুয়ারি এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বলেন, '১৯৬২ থেকে ৬৪ সালের দিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই-তিনবার বিলোনিয়া-সীমান্ত দিয়ে ইন্ডিয়া গিয়েছি। একবার স্টুয়ার্ড মুজিবও ছিলেন। সেখানে এক জায়গায় বঙ্গবন্ধু ওদের (ভারতের) কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তবে কী কথা হয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি শুধু তাঁর সঙ্গী হিসেবে যেতাম আর আসতাম। একবার বিলোনিয়ার এক জায়গায় ইন্ডিয়ান লোকজন কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিতে দেখেছিলাম। কিন্তু ওদের পরিচয় জানতাম না'॥"[২০৪]

০৪.

"... পূর্ববর্তী ঘটনার সূত্র ধরে ঘটে যাওয়া একটির পর একটি (কোনোটি বড় মাপের ও কোনটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়) ঘটনাকে ক্রমানুযায়ী বিস্তারিত বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য। শেষ পর্যন্ত র'-এর বাংলাদেশ অপারেশন এ যুক্ত হবার জন্য ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর একটি পরিষ্কার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে হলে একজনকে অবশ্যই ১৯৬৮ সালে 'র'এর জন্ম সালের পরপর ঘটে যাওয়া গোয়েন্দা কার্যাদির পর্যালোচনা করতে হবে। কিন্তু ততোদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানের 'মুজিবপন্থী' (Pro-Mujib) একটি অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট ও 'মুজিবপন্থী'দের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

কর্নেল মেনন (Menon) যিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও মুজিবপন্থী অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিলেন (আসলে কর্নেল মেনন ছিল শংকর নায়ারের গৃহীত ছদ্মনাম), তিনি আগরতলা বৈঠকের পর ইঙ্গিত পান যে, মুজিবপন্থী গ্রুপ আন্দোলন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। কর্নেল মেনন তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তার মতে সঠিক ফলদায়ক সিদ্ধান্তে আসার সময় এখনো হয়নি। এ ক্ষেত্রে তারা যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও এভাবে কাজ না হবার সম্ভাবনাই বেশি। কর্নেল মেনন ঠিক কথাই বলেছিলেন - 'তারা অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং ঢাকাস্থ ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস (এখানে আসলে হবে EPR বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস - অনুবাদক) অস্ত্রাগারে হামলা চালায়, কিন্তু এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আসলে এ পদক্ষেপ একটি ধ্বংসাত্মক ফলাফল ডেকে আনে, ঠিক যেরূপ কর্নেল মেনন ধারণা করেছিলেন। এর কয়েক মাস পর ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন পাকিস্তানীর বিচার করা হবে। শেখ মুজিবকেও বারদিন পর একজন দোষী হিসেবে জড়িত করা হয়। এ মামলাই পরবর্তীতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি পায়। অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে কামালউদ্দীন আহমেদের সত্য বলে উল্লেখ করা স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে অভিযোগে গঠন করা হয়। পাকিস্তানী পত্রিকা 'ডন' (Dawn)-এ হাইকোর্টের বিচারকার্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে 'মেজর মেনন' ও 'কর্নেল ত্রিপাথী' নামের দু'জন ভারতীয় এজেন্টের যোগাযোগ ছিল। এটা নিশ্চিতই যে, পাকিস্তান সরকার ভারতকে জড়ানোর চেষ্টায় দু'জন

---

[২০৪] মুহাম্মদ শামসুল হক/স্বাধীনতার সশস্ত্র প্রস্তুতি : আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দি ॥ [বলাকা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ৫১-৫৪/৬৫/৯৪/১৩৭]

এজেন্টের উল্লেখ করে, কিন্তু তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ তথ্যের ছিটেফোঁটা লাভেও ব্যর্থ হয়। তারা দু'জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা নির্ধারণেই ভুল করে বসে; যারা আসলে ছিলেন কর্নেল মেনন ও মেজর ত্রিপাঠী এবং পাকিস্তানীদের ধারণা করা এর উল্টোটা নয়।"[২০৫]

০৫.

"...It was July 1966, when the counter intelligence section of the Inter Services Intelligence (ISI) Directorate of Pakistan through one of its sources came to know that an organization has been created and was assigned to separate East Pakistan from West Pakistan. The head of the counter intelligence, Lieutenant Colonel Muhammad Amir Khan (a Bengali citizen of East Pakistan), was flabbergasted when he learnt that Lieutenant Commander Muazzam Hussein (Pakistan Navy) and Sheikh Mujib-ur-Rehman were the key participants of the newly-formed organization. Therefore, Colonel Amir continued to follow-up the lead with several trips to East Pakistan. Eventually, he succeeded in seeking out a tape of a conversation between the suspected persons. He also noted that frequent meetings between the Indian High Commission officials and the Awami League leadership were taking place at Agartala. The occurrence of such covert meetings was admitted by both Mujib and the Indian authorities after the creation of Bangladesh. Such meetings were taking place since 1962. To illustrate, Subir Bhaumik in his book The Agartala Doctrine asserts that,

'An entry in the diary of the late Smarajit Choudhary, then the sub divisional officer of Khowai, is perhaps the only document available that helps us to establish the date and time of Bangabandhu Sheileh Mujib-ur-Rehman's visit to Agartala. The diary entry dated Monday, 5 February 1962 says: Today at about 1300 hrs, Mr Mujib-ur-Rehman, Amir Hussain and T. Choudhary arrived through Asharambari. They have been sent to Teliamura under an instruction from District Magistrate. From Teliamura, Mujib and two of his associates were driven to Agartala in tuo jeeps by Umesh Chandra Singha, brother of CM Schindralal Singha.' (Subir Bhaumik, The Agartala Doctrine, Oxford University Press, New Delhi, 2016, p. 13)

The Indians assured the members of the Awami League and the disgruntled elements of the armed forces that India would provide the needed arms and ammunitions for their struggle against united Pakistan. Such promises were made by Mr P. N. Ojha in September 1966. Thereafter, a meeting was fixed on 12th July 1967 in which members of the Indian intelligence and conspirators from East Pakistan met at Agartala for talks on Indian military aid. Meanwhile, after gathering insightful information about these meetings, the Ayub regime ordered the apprehending of all those involved directly. Consequently, forty-six East Pakistanis were held on the charges of anti-state activities and planning for East Pakistan's secession. The East Pakistani press lambasted the plotters and demanded punishment for them. The real trouble started after Mujib's name was included as an accomplice. Subsequent to this claim, the press of East Pakistan asked for open trials. The Awami League went for strikes and instigated students to hold demonstrations against the inclusion of their leader's name. Mujib's popularity at that time can be gauged by looking at the number of protestors. Safdar Mahmood in his book 'Pakistan Divided' writes that, 'the demonstration was not joined by more than 150 students. It seemed that the reaction was not as expected.' (Safdar Mehmood, Pakistan Divided, Ferozsons Ltd., Lahore, 1984, p. 48)

---

[২০৫] ইনসাইড 'র' : ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায় (মূল. Inside RAW : The Story of India's Secret Service/Asoka Raina)/অনু. আবু রুশদ ॥ [বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং - ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ । পৃ. ৬৩]

Although, Mujib's popularity dwindled after his involvement in the Agartala Case, but the unfortunate mishandling of the Agartala case by the Ayub's government generated sympathizers for Mujib which allowed his group of traitors to grow gradually. The political chaos and uprising against Ayub's regime in late 1965 diverted the government's attention away from Mujib. In the whole month of January 1969, demonstrations were staged in East Pakistan against Mujib's arrest."[২০৬]

০৬.

"... পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএসআই'র চালানো কার্যক্রমের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষীদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা দানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বাধীন সরকার এ ফলাফলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানালে ১৯৭১ সালের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক অসন্তোষ ও গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন বিদ্রোহ শুরু করে তখন 'র'-এর বয়স মাত্র আড়াই বছর। বিদেশের ভূখণ্ড এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্তের ওপারে গোপন তৎপরতা চালানোর সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়ার ব্যাপারে পেশাদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জন্য এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। তখনো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'র'কে তৈরি করার প্রক্রিয়া চলমান ছিল।

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) উত্তরাধিকারী সংস্থা হিসেবে 'র' আইবি'র গোয়েন্দা সংগ্রহগুলো এবং পাকিস্তান ও চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট গোপন তৎপরতার নেটওয়ার্কের অধিকারী হয়। পশ্চিমা দেশগুলো এবং ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার মান অনুযায়ী এগুলো মোটেই উত্তীর্ণ ছিল না। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্তর্ঘাত প্রতিরোধে আইবি'র কার্যক্রমে অনেক অপূর্ণতার বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৬৮ সালে ২১ সেপ্টেম্বর 'র' গঠন করার সময় আইবি'র বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখার প্রধান রামেশ্বরনাথ কাওকে নতুন সংস্থার শীর্ষ পদে বসানো হয়। র গঠনের প্রথম কয়েক মাসে তিনি দুটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেন। প্রথমত, পাকিস্তান ও চীনে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা সুসংহত করা। দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে গোপন তৎপরতা বৃদ্ধি ও সুসংহত করা।

দু'বছরের কিছু বেশি সময় কার্যকর গোপন কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য খুবই সামান্য হলেও 'র' তা করতে সক্ষম হয়। বাস্তবে এই সক্ষমতা প্রমাণিত হয় পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সাহায্য করার ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত নেয়ার পর।

... ফিল্ড মার্শাল (তখন জেনারেল) এস এইচ এফ জে মানেকশ'র নেতৃত্বে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং পরলোকগত কে এম রুস্তমজির নেতৃত্বে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর (বিএসএফ) প্রকাশ্য এবং র' ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর গোপন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। তবে ইন্দিরা গান্ধী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তা না হলে এ প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না। এর সাথে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুকূল পরিবেশ তৈরির কাজ করেন। তারা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে আসা লাখ লাখ উদ্বাস্তুর জন্য মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম সংগঠিত করেন।

---

[২০৬] Junaid Ahmad/Creation of Bangladesh : Myths Exploded \ [AJA Publishers (Karachi) – 2016| p. 125-128]

... 'র' এ সময় পাঁচ পর্যায়ে ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, নীতিনির্ধারক ও সশস্ত্র বাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ: দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দান; তৃতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তান ও বিদেশে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি কর্মকর্তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা; চতুর্থত, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ শিবির ও নিরাপদ আস্তানাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা এবং পঞ্চমত, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা এবং শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সংগঠিত করা।

'র' ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে নীতিনির্ধারকদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহের প্রবাহ ছিল অবিরাম ও ব্যাপক। পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙালি সরকারি কর্মকর্তার সহযোগিতা এবং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর দুর্বল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কারণে এটি সম্ভব হয়েছিল।

'র' গঠনের পর কাওয়ের প্রথম কাজ ছিল পাকিস্তান ও চীনের কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্মি সিগন্যাল কোরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি মনিটরিং বা তদারকি বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আইবি'র একজন সংকেত বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে একটি সংকেত শাখা স্থাপন। চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সংকেত শাখার সাফল্য হতাশাব্যঞ্জক হলেও এ শাখা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ইন্টারসেপ্ট করা বা আড়িপাতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব কোড ব্যবহার করত তা ভাঙতে তারা সক্ষম হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং সিনিয়র কর্মকর্তারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে নিরাপত্তা নির্দেশনা দেয়ার জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সর্তকতাও অবলম্বন করত না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে ইন্টারসেপশন প্রতিরোধে স্ক্রাম্বলিং ডিভাইস ব্যবহারের প্রাথমিক সতর্কমূলক পদক্ষেপও তখন পাকিস্তানের শীর্ষ কর্মকর্তারা গ্রহণ করতেন না। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান ও অন্যরা তাদের কর্মকর্তাদের সাথে যে টেলিফোন আলাপ করতেন তার বিবরণ প্রায় প্রতিদিনই চলে যেত ইন্দিরা গান্ধী এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তার আস্থাভাজন ভারতীয় কর্মকর্তাদের হাতে।

১৯৭১ সাল ছিল ভারতের পেশাদার গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জন্য এক ধরনের স্বপ্নময় পরিস্থিতি। গোয়েন্দা তথ্যের জন্য তাদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো না বরং এসব তথ্য তাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির হতো। পূর্ব পাকিস্তানের পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে তখন এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য তাদের নেতৃবৃন্দ ও ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে সরবরাহ করত। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ গোপন তথ্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সরবরাহ করা এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা দানকে তাদের দেশপ্রেম ও দায়িত্বের অংশ বলে মনে করত।

১৯৬৮ সালের আগে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) এবং পরে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগে নেটওয়ার্ক তৈরি করে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে বাঙালি নেতা ও কর্মকর্তাদের অপদস্থ ও নিগৃহীত হওয়ার বোধ এ নেটওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করে। এই নেটওয়ার্কের কারণেই 'র' এবং পূর্ব পাকিস্তানের নেতা ও কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়

অবকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষিত নিজস্ব যোদ্ধা এবং আমলাদের সমন্বয়ে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়॥"[২০৭]

০৭.

"... Now, the question was: who was to fly with Mujibur Rahman as Officer on Special Duty, acting as PM Indira Gandhi's personal envoy on the flight? On the advice of the RAW Chief, Ram Nath Kao, the PM's key political advisor PN Haksar, and the Foreign Secretary, TN Kaul, I was chosen for the job. I was briefed that it was a very important political mission and that I would be carrying with me my PM's very own brief, laying down what to talk about with the Bangladesh leader. It was a once in a lifetime opportunity for me to play this role. Needless to say, I got ready as fast as I could to do the job as well as it was possible for me to perform.

Why me, of all people? It was because I had met Mujibur Rahman at his own request on the night of 24/25 December 1962, which became the first ever meeting he had had with an Indian official.

The meeting was shrouded in secrecy. Mujib was accompanied by Manick Mia, the editor of The Ittefaq, a widely circulated Bengali language nationalist newspaper. Manick Mia was also known as Taffazul Hussain. The meeting lasted three hours. To cut a long story short, Mujibur opened his book in a business-like manner into what he wanted from India. He wanted India's 'no-holds-barred' support to a Bangladesh Liberation Struggle which he was to lead, backed by the super cerebral Manick Mia as his ideologue.

Honestly, I was bowled over well and truly, seeing the most deeply thought through line up. Mujibur Rahman handed me a letter in an open envelope, dated 25 December 1962, containing a personal communication addressed to the then Prime Minister, Jawaharlal Nehru, requesting him for India's support to Mujib's Bangladesh Liberation Struggle. Mustering all my courage, I ventured to ask the Bangladesh leader if he had a Plan B if India, for whatever reason, was unable to do what he wanted. His reply was a categorical 'No'. He had no Plan B. For him, a negative reply from India was not an option.

After wide-ranging internal consultations, PM Nehru conveyed the agreement, which was India's first such venture of this kind, to extend support to Mujibur Rahman's revolutionary cause, as requested. But this decision was not written with pen on paper. Also the Indian PM conveyed a message to Mujib at an authoritative level, that the 'Liberation Struggle' which he would lead, should be driven by the ideals of Bengali nationalism, anchored on secularism; it should be a pluralist democratic movement, and non-violence should be the avowed creed.

Taking note of the geographical distance between West Pakistan and East Pakistan of more than a 1000 miles between them, it was obvious that it was a strategic decision taken in the light of the real possibility of the gamble ending up in an all-out war. The provocation was Pakistan's unending cross-border tactical pin pricks.

The decision regarding me flying with the Bangladesh leader was in the backdrop of my nearly 10-year-old association with him since 1962."[২০৮]

---

[২০৭] বি রমন/র এর কাওবয়েরা : স্মৃতির সিঁড়িতে অবরোহন (মূল. The Kaoboys of R&AW : Down Memory Lane । অনু. মাসুমুর রহমান খলিলী) ॥ [প্রতীতি প্রকাশন - ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ । পৃ. ১৩-১৫]

[২০৮] Sashanka S Banerjee/Mujibur Rahman's First Secret Meeting with an Indian Officer — Me \ [The Quint (Online) - 17 Mrach, 2020]

০৮.

"... জওহরলাল নেহেরু মনে প্রাণে আসমুদ্র হিমাচল প্রসারিত একটি বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন দেখতেন এবং এই স্বপ্নকে তিনি ভারতের শাসক নেতৃশ্রেণীর মনে ভালো করে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। জার্মানদের ফাদারল্যান্ড এবং ইহুদীদের হোলিল্যান্ডের মতো বৃহত্তর ভারতের স্বপ্নও ভারতীয় নেতৃশ্রেণীর মর্মের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তারা মনে করতেন বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন মিথ্যা হওয়ার নয়, প্রশ্নটা শুধু সময়ের।

... ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে ফলাও করে প্রচার করেছিল ভারতীয় প্রচারমাধ্যম এবং পত্রিকাসমূহ। এই প্রচারণা মধ্যে একটি অবহেলিত অঞ্চলের জনগণ যে সংগ্রাম করে আপন ভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন এবং আরও নানা দাবিদাওয়া আদায় করে নিচ্ছেন, তার চাইতে অধিক কিছু ছিল। পাকিস্তানের ভাঙনের বীজটি অঙ্কুরিত হতে দেখে তারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। সেই মনোভঙ্গীটুকুও প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। উলঙ্গ হুঙ্কার এবং হম্বিতম্বির চাইতে ধীরেধীরে সময় বুঝে কাজ করাই ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য।

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ মূলত: পশ্চিম রণাঙ্গনেই সীমিত রেখেছিল। আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব বিগড়ে যাবে এ আশঙ্কা করেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বলতে গেলে একেবারে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানে স্থলপথে, জলপথে কিংবা বিমানপথে কোনো আক্রমণ করেনি। কোনরকমের সামরিক হামলা না করে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতকে জয় করার ইচ্ছাই ছিল তার মূলে, এ কথা স্বয়ং ভারতীয় জেনারেল কাউলও তার আত্মকথায় স্বীকার করেছেন।

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পরে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হয় এবং ছয়দফা আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে যে ছড়িয়ে পড়ে তা নিশ্চয় ভারতীয় শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। ছয়দফার অন্তর্ভুক্ত দফাসমূহের একটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের লোক দিয়ে একটা প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করতে হবে এবং অন্য একটি দফায় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ-সুবিধা মতো যে কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করার অধিকার। ভারত এই ছয়দফার মধ্যে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। পাকিস্তানের দু'অংশ যদি শ্লথভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসবে। পাকিস্তান যখন তখন আর যুদ্ধের হুঙ্কার দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক শক্তিবর্গ সংহত পাকিস্তানকে যেভাবে অস্ত্র সাহায্য করে, অর্থের যোগান দিয়ে ভারতের সমপর্যায়ের একটি শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখত, শিথিল পাকিস্তান বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে সেরকম গুরুত্ব বহন করবে না। পাকিস্তান দূর্বল হয়ে পড়লে তার যুদ্ধংদেহী মনোভাব আপনা থেকেই প্রশমিত হয়ে আসবে। তখন বৃহৎ শক্তিবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে ভারত-ঘেঁষা নীতি প্রণয়ন করতে বাধ্য হবে।

ছয়দফার একটা দফায় পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের অধিকারের কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তাতেও ভারত নিজের স্বার্থটি খুব বড় করে দেখতে পেয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গে হুগলির পাটকলগুলো কাঁচামালের অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান বিদেশে অঢেল পাট রপ্তানী করে এবং তাকে বিদেশ থেকে প্রচুর কয়লা আমদানী করতে হয়। ভারতের কয়লার বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাট আমদানী করতে পারলে চটকল শিল্পের মতো ভারতের একটি বুনিয়াদি শিল্পের সংকটের সহজ সমাধান হয়ে যায়। ইত্যকার বিষয় বিবেচনা করে শুরু থেকেই ভারতের শাসক কংগ্রেস আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি একটি অনুকুল মনোভাব তৈরি করে রেখেছিল। ছয়দফা আন্দোলন যখন ধাপেধাপে বেগ ও আবেগ সঞ্চয় করে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি উৎক্রান্তিতে আওয়ামী লীগ যে কৌশল এবং প্রচারপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, ভারতের শাসক কংগ্রেস পত্রপত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমগুলোতে যে ঢালাও প্রচার করেছিল, তা ভারতীয় জনগণের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার আন্দোলনের প্রতি একটি স্বত:স্ফূর্ত অনুরাগ জন্মলাভ করতে সহায়ক হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার দল আওয়ামী লীগ কখনো সুভাষচন্দ্র বসুর মতো তেজোদ্দীপ্ত অনাপোষী ভঙ্গীতে বক্তব্য হাযির করেছেন, কখনো চিত্তরঞ্জন দাশের মতো উদার বাঙালীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আবার কখনো বা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতো সমাজতন্ত্র ঘেঁষা উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয়দফা আন্দোলনের শেষ পর্বে অহিংস অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণার পরবর্তী পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় জনগণের দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র হিসেবে দেখা দিলেন।

অহিংসা ছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ। সর্বকাজে সর্বচিন্তায় নিজেকে হিংসামুক্ত রাখাই হলো গান্ধী-দর্শনের মূলকথা। চৌরিচৌরার সংঘর্ষে মাত্র ক'জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে জেনে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্যে তাকে কম জবাবদিহি করতে হয়নি। তথাপি তিনি তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়েননি। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংসামন্ত্রে বিশ্বাসী বলার কোনো উপায় নেই। তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত সন্ধান করলে এমন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, তিনি অহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তিনি অহিংস আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ট্যাকটিকস হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

আর বাংলাদেশ আন্দোলন সত্যিকার অহিংস ছিল না। বিস্তর হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছে। জ্বালানো, পোড়ানো, লুঠতরাজ এবং খুন-জখমের অনুষ্ঠানও হয়েছে বিস্তর। আওয়ামী লীগ হাই-কম্যান্ড এসবের বিরুদ্ধে মৌখিক বক্তব্য রাখলেও থামানোর জন্যে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তার ফলশ্রুতিতে বিহারী এলাকাগুলোতে নানারকম নৃশংস কার্যকলাপের অনুষ্ঠান ঘটে।

এই নৃশংসতা দমনের অছিলা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পঁচিশে মার্চের রাতের অন্ধকারে ঢাকা শহরের ঘুমন্ত নগরবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতীয় জনগণের পক্ষে বাংলাদেশী অহিংসা চোখে দেখার উপায় ছিল না। তারা কাগজে দেখেছেন, বেতারে শুনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। শেখ মুজিবের মধ্যে ভারতীয় জনগণ একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহেরু এবং মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাদের প্রতি ভারতীয় জনগণের যে একটি সুপ্ত শ্রদ্ধাবোধ মনের ভিতরে লুকায়িত ছিল, শাসক কংগ্রেসের প্রচারণায় শেখ মুজিবকে আশ্রয় করেই তা পল্লবিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সামনে একেবারে নব্য-দেবতার বেশে দেখা দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান॥"[২০৯]

০৯.

"... জেলের বাইরে থাকতে শুনেছিলাম ভারত-পাকিস্তান এক করার চেষ্টা হচ্ছে। নাগাল্যান্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্তান নাকি সহায়তা করছে। ঢাকা জেলে এই দু'টি ব্যাপারেই আমার ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো। পরস্পর জানতে পারলাম নাগাল্যান্ড বাহিনীর প্রধান সেনাপতি (সিএনসি) ঢাকা জেলের ২০ নাম্বার সেলে আছেন। তাকে নাকি জেলখানায় রেখেই আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান সম্পর্কে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানালে তাকে নাকি গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়। জেলখানায় আমার তিন রাজবন্দির সঙ্গে দেখা হয়। তারা বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী। এই তিনজন হচ্ছেন আবদুর রহমান সিদ্দিকী, হাবিবুর রহমান এবং আর এম সাঈদ। দেশ স্বাধীন হবার পর আর এম সাঈদ রক্ষী বাহিনীর গুলিতে মারা গেছেন। জেলখানায় আর এম সাঈদ ও হাবিবুর রহমানের সঙ্গে আমি এক ওয়ার্ডে ছিলাম। হাবিবুর রহমানকে আমি পড়াতাম। তাদের কথা কতটুকু সত্য জানি না। তারা বলেছিলেন, ভারত-পাকিস্তান এক করার জন্য তারা নয়াদিল্লিতে নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। নেহেরু তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। তাদের পাঠিয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাদের পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা কালাচরণ ঘোষের কাছে। এর বেশি কিছু তাদের কাছ

[২০৯] আহমদ ছফা/বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা ॥ নির্বাচিত প্রবন্ধ ॥ [মাওলা ব্রাদার্স - ফেব্রুয়ারি, ২০০২। পৃ. ১৭৮-১৮২]

থেকে জানতে পারিনি। তাদের নাকি পাঠিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আবুল মনসুর আহমেদ। আজকে যারা স্বাধীনতার অবিকৃত ইতিহাস লিখতে চান, জানি না তারা এ ঘটনা জানেন কিনা॥"[২১০]

১০.

"... ছায়ানটের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নানা বাধার কথা উল্লেখ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। সে কারণে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যালয়কে স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে বারবার। কখনও তা আজিমপুরের অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে, কখনও বাংলা একাডেমীতে, কখনও কলাবাগানে, কখনওবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলে। এ ক্ষেত্রে সমস্যাও কম ছিল না।

'বিপদ কম আসেনি। সরকারি অর্থ নেওয়া হয় না, তবু জনশিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরেট থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শন হল, আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার নির্দেশ এল কড়া ভাষায়। আসল ব্যাপার, কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ছায়ানট সম্পর্কে নানা তথ্য স্তূপীকৃত হওয়ায় তারা প্রাদেশিক সরকারকে এই বিপজ্জনক বাঙালী বা তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতির আখড়াটি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাবার আদেশ করেন। গভর্নর মোনেম খাঁ সাহেব জনশিক্ষা বিভাগকে ঘন ঘন তাগাদা দিয়ে ছায়ানটের প্রকৃত পরিচয় জানতে চান। ছায়ানটের ব্যয় নির্বাহ হয় কি দিয়ে–এইটেই প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। ঢাকার অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য লাভের পর ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারে না। অথচ ছায়ানট সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে এমন সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিসের জোরে? তথাকথিত হিন্দু অর্থাৎ বাঙালী সংস্কৃতির চর্চা যখন ছায়ানটের লক্ষ্য — তবে নির্ঘাৎ ভারতীয় অর্থেই এই প্রতিষ্ঠান পুষ্ট।' (সন্‌জীদা খাতুন/সবারে করিব আহ্বান (স্মরণিকা) - ৮ জানুয়ারী, ১৯৮৭। পৃ. ১৯)

তবে সন্‌জীদা খাতুনও তার প্রবন্ধে ছায়ানটের অর্থ সংস্থানের কোন সুনির্দিষ্ট সূত্রের কথা উল্লেখ করেননি।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা কমিটির অর্থ সংস্থান সম্পর্কে সাঈদ-উর-রহমান একটি তথ্য দিয়েছেন। 'ঢাকার প্রেস ক্লাবে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক সাংবাদিক সমবায়ে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি গঠিত হয়েছিল। সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র-পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।' (দৈনিক আজাদ - ২৯ মার্চ, ১৯৬১)

এ সম্পর্কে ডঃ সাঈদ-উর রহমান (জ. ১৯৪৮) লিখেছেন :

'ঢাকার এই কমিটিকে ভারতীয় দূতাবাস অর্থানুকূল্য করেছিলেন বলে প্রাদেশিক সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গোপন রিপোর্টে উল্লেখ আছে। রিপোর্টটি একবার আমি দেখেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের অফিসে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।' (সাঈদ-উর- রহমান / পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা। ঢা.বি - ১৯৮৩। পৃঃ ৮১)॥"[২১১]

১১.

"... অক্সফোর্ডের আর একটি ঘটনা আজও মনে পড়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় যে সীমান্ত-নির্ধারণ কমিশন দু'দেশের এলাকা নির্ধারণ করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন স্যার র‍্যাডক্লিফ। কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ। আসলে অতি তাড়াহুড়ো করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়সারাগোছের ব্যবস্থা

---

[২১০] নির্মল সেন/আমার জবানবন্দি ॥ [ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃ. ২১৭-২১৮]

[২১১] ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী/পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন : ১৯৪৭-১৯৭১ ॥ [বাংলা একাডেমী - জানুয়ারি, ১৯৯৬। পৃ. ১৩৩-১৩৪]

নিয়ে কমিশন কাজটি সমাধা করে। আমরা তখন হামেশা শুনতে পেতাম যে, তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত-সমস্যা দেখা দিয়েছিল অনেক বেশি। সে কারণে র‍্যাডক্লিফ অনেকের কাছে বেশ বিতর্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

র‍্যাডক্লিফ অক্সফোর্ডে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে তুমুল বচসা হলো, বিশেষ করে উপস্থিত ভারতীয় ও পাকিস্তানিদের মধ্যে। র‍্যাডক্লিফ বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেই বিভিন্ন সমালোচনার জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন। এক পর্যায়ে দু'একজন অভ্যাগত বলে বসলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের পূর্ব পাকিস্তানি নাগরিকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবঞ্চনার মাধ্যমে পাট থেকে অর্জিত সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে এই বক্তব্যের জোর প্রতিবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ একথা ভাবতে কিছুটা আশ্চর্য লাগতে পারে যে, পাকিস্তান অর্জনের এক দশক পার না হতে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তার উদ্রেক কীভাবে ঘটেছিল? কেবল র‍্যাডক্লিফের ঐ সভাতেই নয়, বিলাতে আমাকে কোনো কোনো ভারতীয় এ বিষয়ে তির্যক প্রশ্নও করতেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি তখনো পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অনৈক্যজনিত বিভাজনের সম্ভাবনা ততটা প্রকট হয়ে ওঠেনি॥"[২১২]

১২.

"... We have seen how Mujib had entered into a secret dialogue with the leaders of the Communist Party to start a movement with the aim of establishing a separate state in East Bengal. The talks had failed not because of any discord over the goal of independence but on the question of timing. Now Mujib began to ponder another radical approach: seeking the support of India, Pakistan's unfriendly neighbour, for a separatist movement in East Bengal. Given the longstanding animosity between Pakistan and India it seemed reasonable for Mujib to assume that his proposal would not fall on deaf ears. What Mujib wanted from India was technical help to set up a transmitter on Indian soil near the border to broadcast his propaganda.

Mujib sent a trusted lieutenant named Nasser, not prominent enough to attract police attention, to have a clandestine meeting with an official of the Deputy High Commission of India in Dhaka known to be an intelligence officer working under a cover post. Since it was not practicable for Mujib to meet an Indian official in Dhaka itself it was suggested to him that a meeting between Mujib and a competent Indian official of high standing should be arranged in Agartala, the capital of the Indian state of Tripura, which juts into the territory of East Pakistan within reasonable distance of Dhaka. He was assured that the Pakistani side of the border between East Pakistan and Tripura was not well-guarded so that it would be easy for Mujib to slip into Tripura across the porous border and then slip back to Dhaka after the discussion.

The meeting between Mujib's emissary and the Indian consular officer in Dhaka took place in early August, a couple of weeks before the release of Suhrawardy from prison in Karachi. Soon afterwards he came to Dhaka to energise the NDF campaign for the restoration of democracy. He then went on a 'whirlwind tour' of all the four divisions of East Pakistan, accompanied by Mujib and other NDF leaders. Suhrawardy was unaware of Mujib's approach to the Indian Deputy High Commission in Dhaka when he was in prison and it seems unlikely that he was told about it during his visit to East Pakistan.

---

২১২ সুলতান-উজ জামান খান/স্মৃতির সাতকাহন : এক আমলার আত্মকথা ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - জানুয়ারি, ২০০৭। পৃ. ১২৪-১২৫]

... Since September, when the first skirmishes between Indian and Chinese forces in the Himalayas took place, Indian leaders and officials were preoccupied with the Chinese threat. Mujib's request for a meeting with a competent Indian official to discuss his proposal got lost in the maze of bureaucracy with the result that authorities in Tripura were not informed about Mujib's proposal to go to Agartala.

Mujib had not taken into account the dramatic change that had been wrought in India's foreign policy priorities as a result of the border war. Encouraged by some of his close associates — especially Syedul Hasan, a businessman-he went ahead with his preparations for the Agartala trip. (In 1971 Syedul Hasan was taken into custody by the Pakistan Army and disappeared.)

Preparations were finalised by the end of 1962. Mujib was satisfied with the arrangements that had been made. But he had to wait because Suhrawardy was scheduled to visit East Pakistan in early January and Mujib had to be at hand. However Suhrawardy suffered two serious heart attacks in Karachi and had to be hospitalised.

On 27 January 1963 Mujib boarded the night train for Sylhet at Tongi with four companions. It was a cold night. They reached Srimangal train station around four o'clock in the morning. Two of Mujib's companions continued their journey to Sylhet while Mujib with his two other companions disembarked and proceeded to the Deanston Tea Garden belonging to the firm of Finlays. Qais Chaudhury, the Assistant Manager, entertained them to breakfast. For their onward travel to the border a Land Rover had been procured from the Madhupur Tea Garden belonging Ahmedul Kabir. A sardar from a tea garden acted as guide to the which was along a shallow stream. They reached the border before daybreak when the likelihood of detection by prying minimal. The principal danger that Mujib and his two companions had to worry about was wild boars who are numerous in this sparsely populated location. They are most vicious in the early hours of the morning and this time of the day the area is shrouded by thick fog in the winter season which often reduces the visibility to a few yards. Fortunately the border crossing was uneventful.

However, on their way to Agartala they were apprehended by local authorities in the sub-divisional town in Khoai. The SDO had received no information regarding Mujib and his party and decided to send them to Agartala. In Agartala the Chief Secretary was apparently in favour of returning them to East Pakistan under police escort but the Chief Minister of Tripura decided otherwise.

In 1991 Chief Minister Satindranath Sinha recorded this version of what then happened:

'In 1963, my brother Sri Umeshlal Sinha, Member of the Legislative Assembly, arrived at my bungalow in Agartala around midnight with Sheikh Mujibur Rahman and ten people in his party who had come via Khoai sub-division of Palam district. After preliminary talks Sheikh Sahib went to the house of Hemangini Devi, my sister, about one and a half miles away from my bungalow. Arrangements were made there for their meal and lodging. In accordance with the proposal made by Mujibur Bhai I went to visit our Prime Minister Pundit Jawaharlal Nehru. Chief Secretary Sriraman was with me. I met the Prime Minister alone, leaving Sriraman in the room of Sri Bhandaria, the Foreign Secretary. The Prime Minister did not agree to Mujibur Rahman undertaking any publicity activity from Agartala. For he was not desirous of undertaking such a serious task so soon after the war with China. So, after fifteen days Mujib had to leave Tripura through Sonamura sub-division which adjoins Comilla. Sheikh Mujib, however, was assured of all help.'

It was a long and arduous journey back to Dhaka, all the more so because no preparations had been made for their return by this route. When Mujib reached his home his feet were swollen and he suffered of discomfort. Mujib and some of his associates were questioned police about his whereabouts during this period but were unable to any useful information from them. The visit remained a well-kept secret and even after the independence the participants involved in this episode were reticent to talk about it. Mujib himself briefly referred to it in 1974 to Shamsuzzaman Khan, under the condition that he was not to be quoted until after twenty years. Asked about the Agartala Conspiracy Case, Mujib said, 'What conspiracy? Call it our striving for independence ... Yes. I did go to Agartala. I was drenched. I was feverish. I had to go on foot for a long distance. But I had useful and fruitful discussion with the leaders there.' It is curious that Mujib should have mentioned his visit to Agartala while talking about the Agartala Conspiracy Case, since in reality there was no connection between them. Was it because he wanted to impress his listeners that he had thought about independence for a long time?"[২১৩]

তিন

আগরতলা ষড়যন্ত্রের উপেক্ষিত কুশীলবেরা

০১.

"... শেখ মুজিব ২২শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেলেন। তাঁর সঙ্গে আগরতলা মামলার অন্যান্য আসামিরাও মুক্তি পেলেন। আগরতলা মামলার (শেখ মুজিব ব্যতিরেকে) আসামিদেরকে জনতা পল্টন ময়দানে সংবর্ধনা দিলেন। ছাত্রলীগের নেতারা সংগ্রাম পরিষদের কোনো আলোচনা ব্যতিরেকে মাইকযোগে প্রচার করে দিলেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাকে রেস কোর্সে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ছাত্রলীগের এই ধরনের ঐক্য বিরোধী কার্যকলাপে সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে উষ্মার ভাব সৃষ্টি হল। এ নিয়ে ইকবাল হলের ছাত্রসংসদ অফিসে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতভর মিটিং হল। সকাল ১০টা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হল না। আমরা প্রস্তাব করলাম সকল রাজবন্দিকেই একযোগে সংবর্ধনা দিতে হবে। কারণ রাজবন্দি হিসেবে সকলেই আমাদের নিকট সমান। এমনকি জনাব ভুট্টোও সেই সংবর্ধনা সভায় থাকবেন। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। মুক্ত রাজবন্দিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যারা দশ বছরেরও বেশি কাল আইয়ুবের কারাগারে বন্দি ছিলেন। দেশবাসীর জন্য তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা কম নয়। কিন্তু মস্কোপন্থীদের নমনীয় ভূমিকার ফলে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবকে আলাদা সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

দুপুর ২টার দিকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ একটি জিপ সহযোগে তাকে নিয়ে আসতে তার বাসভবনে গেলেন। সেবারই প্রথম আমার শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয়। শেখ মুজিব বললেন 'হুজুর কী বলেন (মওলানা)? তিনি ঠিক থাকলে এবার বাঙালির সব দাবি দাওয়া আদায় হবে।' আমি বললাম আপনাকেও তো ঠিক থাকতে হবে।

যথাসময়ে রেসকোর্সে জনসভা শুরু হল। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখলাম। আমি আমার বক্তব্যে শেখ মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিলাম জনগণের বহু দাবিদাওয়া এখনো পূরণ হয়নি। জনগণের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাসকগোষ্ঠী গোল টেবিল বৈঠকের টোপ ফেলেছে। এবার যদি শেখ মুজিব ১১ দফার প্রশ্নে আপাস করেন জনগণ তা হলে তাঁকে ক্ষমা করবেন না। আমার বক্তৃতার একটি বিস্তারিত বিবরণ ২৫শে ফেব্রুয়ারি আজাদ পত্রিকায় বেরিয়েছিল, আমি যখন বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লাম শেখ মুজিব আমার পিঠে হাত চাপড়ালেন। বললেন, 'খুব তো বক্তৃতা দেওয়া শিখেছিস কিন্তু আমাকে বেকায়দায় ফেলেছিস।' এমন সময় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের স্বঘোষিত আহবায়ক জনাব

---

[২১৩] S. A. Karim/Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy \ [UPL - 2009| p. 108-111]

তোফায়েল আহমেদ মাইকের সামনে উঠে দাড়ালেন এবং বললেন, "আমি জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে জনতার পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করছি"। জনতাকে তিনি হাত তুলে এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে বললেন। জনতা এই প্রস্তাবকে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের প্রস্তাব মনে করে হাত তুলে সমর্থন জানাল। শেখ মুজিবের শাসনামলে জনাব তোফায়েল আহমেদের ভাগ্যোন্নতির জন্য এটা একটা বড় কারণ। তিনি শেখ মুজিবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, অথচ তখনকার সময়কার ছাত্রলীগের মূল দুজন নেতা জনাব আবদুর রউফ ও জনাব খালেদ মোহাম্মদ আলীর আন্দোলন সংগঠিত করার প্রশ্নে বিরাট অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের সেই অবদানের স্বীকৃতি পাননি। জনাব তোফায়েল আহমেদকে সংগ্রাম পরিষদের স্বঘোষিত আহবায়ক বলেছি এ কারণে যে, সত্যিকার অর্থে সংগ্রাম পরিষদে কোনো নির্ধারিত বা মনোনীত আহবায়ক ছিল না। 'ডাকসু'র সহ-সভাপতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অতীতরীতি অনুসারে সংগ্রাম পরিষদের সভাগুলোতে তিনি সভাপতিত্ব করতেন। এতেই তিনি জনগণের নিকট সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক প্রতিভাত হয়েছেন। পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেনি।"[২১৪]

০২.

"... ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রেই এক বেতার ঘোষণায় আইউব খান ঘোষণা করেছিলেন যে, আগরতলা মামলার আসামীসহ সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে। বিকেলের দিকেই শোনা গেল যে, আগের রাতের ঘোষণা অনুযায়ী আগরতলার মামলা প্রত্যাহার করে সরকার শেখ মুজিবসহ অন্যদেরকে মুক্তি দিয়েছেন এবং সেই সাথে জেল খালি করে দিয়ে দীর্ঘদিনের অনেক কমিউনিস্ট রাজবন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর লোকজন এই আশা করে পল্টনের দিকে দলে দলে আসতে শুরু করলো যে, শেখ মুজিবর রহমান সেখানকার সভায় উপস্থিত হবেন। সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

শেখ মুজিব পল্টনের সেই সভায় এলেন না। কিন্তু সাবেক সিএসপি শামসুর রহমানসহ আগরতলার অন্য আসামীরা এবং ঢাকা জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট নেতারা পল্টনে উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে মনি সিংহ ছিলেন বলে আমার মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। যাই হোক, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবাদীরা সেই সমাবেশে এইভাবে উপস্থিত হওয়ায় বাইশে ফেব্রুয়ারীর নির্ধারিত কর্মসূচী আর সম্ভব হলো না। জেল মুক্তদেরকে একভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো আমাদের দ্বারা তৈরী বিশাল মঞ্চ তৈরী থাকার ফলে। আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচী হলো না, তবে মঞ্চের যে ব্যবহার হলো সেটা যে বড় রকম সদ্ব্যবহার তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী ঐদিন শেখ মুজিব পল্টন ময়দানে জনগণের কাছে না আসা শেখ মুজিব ও তার দলের জন্য কোন গৌরবের ব্যাপার ছিল না। যে জনগণের প্রবল ও ব্যাপক আন্দোলনের ফলে মুজিব মুক্তি লাভ করলেন সেখানে অন্যদের সাথে একই মঞ্চে এসে তিনি জনগণকে দেখা না দিয়ে নিজের সম্বর্ধনার জন্য যে পৃথক ব্যবস্থা করলেন বা যে ব্যবস্থা তাঁর জন্য করা হলো, তার মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, জনগণের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের জন্য পৃথক সম্বর্ধনার আয়োজন করতে চাইলে বাইশ তারিখে পল্টনে তার উপস্থিতির কারণে কোন অসুবিধাই হতো না। পরদিন তারা অনায়াসে শেখ মুজিবের জন্য আবার পৃথক ব্যবস্থাও করতে পারতেন। কিন্তু না, তারা দেখাতে চাইলেন যে, শেখ মুজিব এমন এক নেতা যার পক্ষে অন্য লোকদের সাথে একত্রে দাড়িয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হওয়া চলে না। তাতে তাঁর 'গৌরব' ক্ষুন্ন হয়। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে তাদের রাজনৈতিক চরিত্রই প্রতিফলিত হয়েছিলো তাতে আর সন্দেহ কি?"[২১৫]

---

[২১৪] মাহবুব উল্লাহ/ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ॥ [জ্ঞান বিতরণী - ফেব্রুয়ারি, ২০০১। পৃ. ৩৮-৩৯]

[২১৫] বদরুদ্দীন উমর/আমার জীবন (তৃতীয় খন্ড) ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - জুন, ২০০৯। পৃ. ৩৪-৩৫]

০৩.

"... তবে একটি নাম আমাদের দেশে বড্ড অনাদৃত। আজকে কেউ নৌবাহিনীর মোয়াজ্জেমের কথা স্মরণ করে না। অথচ এই মানুষটি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি বিদ্রোহের অন্যতম ব্যক্তি। কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রের তিনিই ছিলেন প্রকৃত নেতা। মামলাটি অভিযুক্তদের পক্ষে তিনিই পরিচালনা করতেন। পাকিস্তান সরকার তাকে সঠিকভাবে চিনেছিল। তাই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভোরে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল।

অথচ সে নামটি আজ কোথাও উচ্চারিত হয় না। কত নামে মিনার হয়, কতজনের স্মৃতিচারণ করা হয় - কিন্তু কমান্ডার মোয়াজ্জেম আজ বিস্মৃত। মনে হয় তার কোনো প্রভাবশালী মামা বা চাচা ছিল না। ছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার উদগ্র বাসনা॥"[২১৬]

০৪.

"... ২২শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তবৃন্দ মুক্তি পান। ঢাকায় সংগ্রামী লক্ষ লক্ষ জনতা তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানায় অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত পল্টন জনসভায়। লক্ষণীয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান এই জনসভায় উপস্থিত হন নাই।

অধিকন্তু সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে গণ-সম্বর্ধনা দানের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সদ্যমুক্ত অন্যদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য নাই।

এইভাবেই ষড়যন্ত্র মামলার সকল কৃতিত্ব ও ত্যাগ তিতিক্ষার নৈবেদ্য ও জনপ্রিয়তা সুচতুর শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক মূলধনে পরিণত হয়। মামলার প্রকৃত ত্যাগী অভিযুক্ত লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সকল ভূমিকা একপাশে পড়িয়া রহিল - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শিরোপা এককভাবে কুক্ষিগত করিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, জন কয়েক যুব নেতার বদৌলতে তিনি ভূষিত হইলেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

কাহার প্রাপ্য কে আত্মসাৎ করে? রাজনীতির চাণক্যচাল কি ইহাকেই বলে? আসলে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করিবার গোপন আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উক্ত আন্দোলন লক্ষ্যের বন্ধু ও সমর্থক মাত্র॥"[২১৭]

০৫.

"... বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, পুরনো অনেক রাজনীতিবিদ এবং এই প্রজন্মের সন্তানেরা ভাষা আন্দোলনের পরেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনীরূপে ঊনসত্তর সালের গণঅভ্যুত্থানের কাহিনী বলে থাকেন। কিন্তু উক্ত বিদ্রোহের কাহিনী তারা জানেন না এবং যারা জানেন তারা উচ্চারণও করেন না। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের ঘটনা আমাদের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। একে এড়িয়ে যে সব রাজনীতিবিদ গণঅভ্যুত্থান থেকে আমাদের আন্দোলনের কথা শুরু করেন, তারা রাজনৈতিক দিক থেকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ঘটনাটিকে এড়িয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। এর অর্থ অবোধগম্য নয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত) মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত ব্যক্তি শামসুর রহমানের (সি.এস.পি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী

---

[২১৬] নির্মল সেন/মা জন্মভূমি॥ [তরফদার প্রকাশনী - ডিসেম্বর, ২০০৭। পৃ. ৩০-৩১]

[২১৭] অলি আহাদ/জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে '৭৫ ॥ [বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি - অক্টোবর, ২০১২ (পঞ্চম সংস্করণ)। পৃ. ৩৪১]

আতাউর রহমান খানের ভ্রাতা।) সাথে আলাপ হচ্ছিল। প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন এই মামলা ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রজন্মকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে অথবা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না?' তিনি আমার সাথে এই ব্যাপারে অনেক আলাপের পর একটি কথাই কেবল উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়েছেন, 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। ঘটনাটা, বলতে পারো, রাজনৈতিক।'

দ্বিতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং মূল বিদ্রোহের প্রধান কর্মকর্তা কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাকিস্তান বাহিনী একাত্তরের ২৬ মার্চ সকালে ঢাকায় তার বাসভবনের নিচেই নির্মমভাবে বুলেট চালিয়ে হত্যা করেছে। তিন নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি তেজী পুরুষ স্টুয়ার্ট মুজিবকে কে বা কারা দেশমুক্ত হবার পরেই ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি সচিবালয় থেকে জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে বের করে এনে জিপে তুলে নিয়ে যায়। তিনি মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। তারপর তাকে হত্যা করে তার লাশ গুম করা হয়েছিল।

মামলার সময় গুলিবিদ্ধ ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পরে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। গত ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৪ ঢাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই অভিযুক্ত সাহসী ও অমায়িক ব্যক্তিকেও মৃত্যুর এক মাস পূর্বে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক ধারায় কৌশলগত কারণে ইতিহাস অনেকভাবেই প্রভাবিত হয় - ভিন্ন পথও অবলম্বন করে। আপনি নিজেই এর উপসংহার টানুন। স্বাধীনতা অর্জনের এই বিদ্রোহ ও মামলা এদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এনেছিল। মামলাটি সত্য হওয়ার পরও আমরা বোধগম্য কারণে পরবর্তীকালে নিশ্চুপ ছিলাম।'

সামরিক কারাগারে আটকাবস্থায় হাবিলদারের গুলিতে নিহত অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহিরুল হকের ভাই আমিনুল হক মামলায় একজন কৌসুলি ছিলেন। তিনি বর্তমানে এটর্নি জেনারেল। তিনি বলেন, 'এই সমগ্র মামলার ঘটনাবলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই সাহসী ব্যক্তিদর অকুতোভয় ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনো হয়নি'॥"[২১৮]

০৬.

"... শেখ মুজিবের প্রতি আমার যে পরিমাণ আস্থা ও তার সম্পর্কে আমার যে পরিমাণ উচ্ছাস, লক্ষ্য করলাম যে মোয়াজ্জেম সাহেবের (শহীদ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামি।) অবস্থা ঠিক তার উল্টো। শেখ সাহেবের ওপর তিনি যেন খুবই বিরক্ত এবং বেশ বিক্ষোভ আছে মোয়াজ্জেম সাহেবের অন্তরে। ভাবটা এ রকম যেন শেখ মুজিবই এই ব্যর্থতা ও মামলায় বন্দী হওয়ার জন্য দায়ী। পরবর্তী পর্যায়ে দেখেছি যে, শেখ সাহেবও মোয়াজ্জেম সাহেবের ওপর বেশ বিরক্ত এবং বিক্ষুব্ধ। মনে হতো তিনি যেন কোনো একটি ব্যর্থতার জন্য মোয়াজ্জেম সাহেবকেই দায়ী করছেন। তাদের পরস্পরের প্রতি যে বিক্ষোভ তার রহস্য আমরা তখন তো বটেই শেষ পর্যন্তও বুঝতে পারিনি॥"[২১৯]

০৭.

"... আদতে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার উদারতার অভাব ছিল শেখ মুজিবের মানসিকতায়। তার অবর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই কখনো তিনি একবারও আমাকে জিজ্ঞেস করেননি কী কষ্ট আমরা করেছি, কী যন্ত্রণা আমরা সয়েছি অথবা কিভাবে আমরা যুদ্ধ করেছি। সৈয়দ নজরুল ইসলামও আমাকে বলেছেন, তার কাছেও স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানতে চাননি শেখ মুজিব। অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর রেসকোর্সের ময়দানের সংবর্ধনা সভায় মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের মঞ্চে তুলে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতেন। তা করেননি একই কারণে।

---

[২১৮] ফয়েজ আহমদ/আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮। পৃ. ৩৭-৩৯]

[২১৯] কমান্ডার আবদুর রউফ (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি)/আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন ॥ [মীরা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২। পৃ. ৭৩]

অন্যদিকে ১৯৭২ সালে পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা ফেরার কয়েকদিন পরই তিনি সোজা চলে যান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ খবর করতে। এ ব্যাপারটি আমাদেরকে তখন বিক্ষুব্ধ করে তোলে দারুণভাবে।"[২২০]

(সাক্ষাৎকার : রুহুল কুদ্দুস / আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তণ সিএসপি, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের মূখ্যসচিব)

০৮.

"... আগরতলা মোকদ্দমা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি সেখানে বক্তৃতা করেন যে, ইন্দোনেশিয়ার কতকগুলি দ্বীপ একত্রে থাকতে পারলে, পাকিস্তানের দুই অংশ একত্রে কেন থাকতে পারবে না? আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে অভিযোগের এটা পাল্টা জবাব। সে মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের পর তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, এই ষড়যন্ত্রের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বাংলাকে আলাদা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন। তিনি এখন সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি করায় জনগণ তাজ্জব বনে গেল॥"[২২১]

০৯.

"... আগরতলা ষড়যন্ত্রের সকল আসামীর মুক্তির পরে একদিন লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম সাহেব আফসোস করে আমাকে বলেছিলেন যে, প্রকৃত বিদ্রোহ ও আগরতলা ষড়যন্ত্র নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি করেছিলেন, আর ভাগ্যের কী পরিহাস এই ষড়যন্ত্রের ফল পেল শেখ মুজিবুর রহমান।

২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে পাক বাহিনী যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম আঘাত হানল তখন সর্ব প্রথম মোয়াজ্জেমকে গুলি করে হত্যা করা হলো আর শেখ মুজিবুর রহমানকে নেয়া হল মিলিটারী হেফাজতে। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারেও কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব সত্য বলে প্রতিপন্ন হলো॥"[২২২]

১০.

"... এমনি ডামাডোলের মাঝখানে সরকার আর একটা মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করল। শেখ মুজিবকে অন্য কোনভাবে পর্যুদস্ত করতে না পেরে ওরা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কিছুসংখ্যক বাঙালি সেনা-সদস্যকে জড়িত করে দেশের বিরুদ্ধে একে বিরাট ষড়যন্ত্র বলে চালাবার প্রয়াস পেল। জনাব রুহুল কুদ্দুস, সার্জেন্ট জহিরুল হক, আহম্মেদ ফজলুর রহমান, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, স্টুয়ার্ড মুজিব প্রভৃতিকে সহআসামি করে বিরাট মামলা সাজাল ওরা। এই স্টুয়ার্ড মুজিবকে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতাকে তখন সবাই সন্দেহের চোখে দেখত॥"[২২৩]

১১.

"... লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত :

তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করেছেন। মামলার দুই নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেন এবং করপোরাল এ,বি,এম আবদুস সামাদ যথাক্রমে কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

---

[২২০] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে র এবং সিআইএ/মাসুদুল হক॥ [প্রচিন্তা প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ১৪৬]

[২২১] আতাউর রহমান খান (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)/স্বৈরাচারের দশ বছর॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - ১৯৭০। পৃ. ৪২৯]

[২২২] মেজর (অব.) মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন/আমার দেখা বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ॥ [বুলবুল প্রকাশনী - নভেম্বর, ১৯৯৩। পৃ. ১৬৬]

[২২৩] শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন / বলেছি বলছি বলব ॥ [অনন্যা - সেপ্টেম্বর, ২০০২। পৃ. ২৭]

কমিটির এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, 'বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জন্য ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে জনমত সৃষ্টি করার জন্য' এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সম্পাদক এবং যুগ্মসম্পাদক স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজে 'সকল রাজনৈতিক' ছাত্র, শ্রমিক প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণ এবং বিশেষ করে যুবসমাজকে কমিটির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা, সাহায্য দান এবং 'আমাদের এক দফার লক্ষ্যকে' সাফল্যমন্ডিত করার আবেদন জানান হয়।

কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ষ্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক এম, এস সুলতান উদ্দিন আহমদ এবং সার্জেন্ট আবদুল জলিলকে যুগ্ম-সম্পাদক এবং সুবেদার তাজুল ইসলাম, রিসালদার শামসুল হক, এস, এস, নুর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক এবং এ,বি, এম, খুরশীদ সদস্য মনোনীত হয়েছেন॥"[২২৪] (*দৈনিক পূর্বদেশ* / ৩০ মার্চ, ১৯৭০)

১২.

"... ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মত একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়। এটিই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই কাজে মুজিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই মামলায় শেখ মুজিব এতদসংক্রান্ত সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। শেখ মুজিব দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করে চলেছিলেন। ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীর অধিকারের কথা বলতেন। আর ভারতও জানত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত যত মজবুত হবে পাকিস্তানের বুনিয়াদ তত দূর্বল হবে। সেই পথ ধরেই পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে যা ছিল ভারতের আরাধ্য। বাংলাদেশ হওয়ার পর শেখ মুজিব যে এই সব ষড়ন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর দল এ জন্য গৌরব বোধ করে। তিনি যে ভারতীয় স্বার্থের রক্ষক হিসেবে এদেশে কাজ করতেন তা অনেকেরই জানা। ১৯৭২ সালে ৮ ও ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগের দলীয় কাউন্সিলে দেয়া এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা ছিল না। আমি কোনদিনই এ স্বাধীনতার উপর বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি বহুপূর্ব থেকেই এদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে আসছিলাম। শেখ মুজিব আরও বলেছিলেন সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ভারতের সঙ্গে পূর্বেই তার চুক্তি হয়েছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত সাহায্য ও আশ্রয় দেবে এসব চুক্তি তিনি আগে থেকেই সম্পন্ন করেছিলেন।

ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলছিল তখন তার পক্ষ নেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কতিপয় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী শিক্ষক। এসব শিক্ষকের সামাজিক অবস্থান অর্জিত হয়েছিল পাকিস্তান হবার ফলেই। কলকাতার জগতে এদের কোন স্থান ছিল না। অথচ এরাই মুজিবের সাথে মিলেমিশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

এরকম কয়েকজন প্রফেসরের কথা আমার মনে পড়ছে। প্রফেসর রেহমান সোবহান, আব্দুর রাজ্জাক, আবু মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ, খান সরওয়ার মোরশেদ প্রমুখ। রেহমান সোবহান ছিলেন টু ইকনমির প্রবক্তা। একটা দেশে দুটো ইকোনমি কি করে চলে তা বোঝা বেশ মুশকিল হত। আসলে তারা টু ইকোনমি চাননি। টু কান্ট্রিই চেয়েছেন। এই রেহমান সোবহানদের সাথে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগও ছিল মধুর। শোনা যায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তারা সে সময় বহু অর্থ বানিয়েছেন।

শেখ মুজিবের মামলায় আরও যারা সমর্থন করেছিলেন তাদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। একজন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এম মোরশেদ। আর একজন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

---

[২২৪] স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (দ্বিতীয় খন্ড)/সম্পা : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮২। পৃ. ৫০৫]

মোরশেদ সাহেবের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় আসেন। মোরশেদ ভাল লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু পাকিস্তানের আদর্শে তার কতটুকু বিশ্বাস ছিল সে কথা বলা মুশকিল। আমার মনে আছে ষাটের দশকে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে তিনি বিচারপতির আসনে বসে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন॥"[২২৫]

১৩.

"... (৭ জুলাই, ১৯৭৪) গতকাল শেখ সাহেবের একসময়ের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু (জানি না এখন সেই বন্ধুত্ব কতটা আছে) আগরতলা মামলার আসামি ভূতপূর্ব সিএসপি আহমদ ফজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েই বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সরকারে ফিরে যাওয়া বিরাট ভুল হবে। তার মতে, আমার সাধ্য নয় এই শাসকদের অধীনে কাজ করি, ন্যূনতম আত্মসম্মান সম্পন্ন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা করলেন তিনি। বললেন তার প্রচণ্ড জেদ ও অহমিকার কথা।

ফজলুর রহমান সাহেবের শ্যালক আতিক মাহমুদের কাছে প্রায়ই শুনতাম শেখ সাহেব তাকে কতবার ডেকে পাঠাচ্ছেন। হঠাৎ তার এই বিরাগের কারণ বুঝলাম না॥"[২২৬]

১৪.

"... বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তখনকার অরাজক পরিস্থিতিতে লালবাহিনী নামে পরিচিত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কয়েকজন লোক একবার আহমদ ফজলুর রহমানকে (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬ নং আসামী) জোর করে ধরে নিয়ে আটক করে রাখে। পরে বঙ্গবন্ধু খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এ অপমানের কথা রহমান সাহেব কখনও ভুলতে পারেননি। হয়তো এ কারণেও তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন।

... দিনটা ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৩, সোমবার। সকাল দশটা এগারটার দিকে অনেকগুলো লোক গাড়িতে করে এসে আমাদের ধানমন্ডাইয়ের ৩০ নম্বর রোডের বাড়িতে ঢুকল। লোকগুলোর চেহারা ছিল গুন্ডামার্কা আর তাদের মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা ছিল। সবাই জানত এরা লাল বাহিনীর লোক আর লাল বাহিনী ছিল শ্রমিক লীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুল মান্নানের নিজস্ব গুন্ডাবাহিনী। এ লোকগুলো এসে রহমান সাহেবকে জোর করে ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে তাদের গাড়ীতে তুললো, তারপর দ্রুত গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গেল। রহমান সাহেব বললেন যে, তিনি নিজের গাড়িতেই তাদের সাথে যাবেন, কিন্তু ঐ লোকগুলো তার কথায় কোন রকম কর্ণপাতই করল না। বরং যাওয়ার আগে টেলিফোনের তারতা ছিঁড়ে দিয়ে গেল। তাদের চলে যাওয়ার আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম বাড়ির বাইরেও তাদের অনেকগুলো গাড়ি ও লোকজন ছিল।

... লাল বাহিনীর নেতা আবদুল মান্নানের অবৈধ আচরণে রহমান সাহেব খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। মনে মনে তিনি এ ঘটনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করেছিলেন এবং সে কথা প্রকাশ করেও বলেছিলেন। ৩০শে এপ্রিলের ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে বঙ্গবন্ধু একবার আমাদের বাসায় এসেছিলেন রহমান সাহেবের দেখা-সাক্ষাৎ এবং গল্প করার জন্য। কিন্তু রহমান সাহেব সরাসরি তাকে আক্রমণ করে বললেন, 'আপনিই তো আমাকে লাল বাহিনী নিয়ে ধরিয়েছিলেন'॥"[২২৭]

---

[২২৫] ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৮১-৮২]

[২২৬] কাজী ফজলুর রহমান/আশা ও ভগ্নআশার দিনগুলি : দিনলিপি ১৯৭২-৭৫ ॥ [প্যাপিরাস - ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। পৃ. ৯১]

[২২৭] হাছিনা রহমান (এ এফ রহমানের স্ত্রী)/বাঙালীর মুক্তিসংগ্রাম ও আহমদ ফজলুর রহমান ॥ [আগামী প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩। পৃ. ১৯/১২৩-১২৫]

চতুর্থ পর্ব

উত্তাল উনসত্তর : দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর

এক

পশ্চিমের দৃশ্যপট

"... পাকিস্তানব্যাপী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এর আগে আর কখনও এ-ভাবে হয়নি, যা বিগত '৬৮-'৬৯-এর নভেম্বর-মার্চ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, প্রতিটি ভাষাভাষী জাতির সাধারণ মানুষ প্রধানত আইয়ুবশাহীর অবসানের লক্ষ্য নিয়ে এই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে। এটা সত্য যে, সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি, নেতৃত্ব, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বহুদিক থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংগ্রামের মধ্যে তারতম্য ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির জনগণের আন্দোলনের মধ্যেও অনুরূপ তারতম্য ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলা চলে যে, স্বৈরাচারী আইয়ুব-শাসনের বিরুদ্ধে সারা পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের একই সাধারণ পটভূমি গড়ে উঠেছিল।

... '৬৪-'৬৫ সালের বুনিয়াদী নির্বাচনের মাধ্যমে সারা পাকিস্তানের জনগণ আইয়ুবশাহীর পতনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই পন্থায় সরকারের পরিবর্তন ঘটানো ছিল অসম্ভব। কাজেই '৬৫-এর নির্বাচনে আইয়ুব সরকার ক্ষমতাসীন থেকে যায়। অবশেষে গণঅভ্যুত্থানের আগে আইয়ুব সরকার '৬৯-'৭০ সালে বুনিয়াদী নির্বাচন ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিষয়ে ঘোষণা জারী করলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে পুনরায় জোয়ার আসতে থাকে। এরই পরিণতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নড়াচড়া শুরু করে এবং একটা ঐক্যফ্রন্ট গঠনের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি ওয়ালী খান ও পি.ডি.এম-নেতাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং অক্টোবর মাসে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় ঐক্য বিষয়ে প্রস্তাব গৃহিত হয়। এই সময় মওলানা ভাসানী ঐক্য বিষয়ে আলোচনা বৈঠক ডাকেন। পাকিস্তান ন্যাপ দ্বিধা-বিভক্তির পর থেকেই নানা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ব্যাপকতম ঐক্যফ্রন্ট গঠনের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালাতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি করতে শুরু করে। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এই ছিল অবস্থা।

... এই সময়েই করাচীতে প্রথম ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ৯ই অক্টোবর থেকে মূলত জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে শিক্ষাগত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে করাচীর ছাত্ররা দাবি সপ্তাহ পালন করতে আরম্ভ করেন। ১৩ই অক্টোবর করাচীর ছাত্র বিক্ষোভের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ১৪ই অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৫ই অক্টোবর করাচীর ছাত্ররা মারমুখী হয়ে ওঠে এবং সরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ১৬ই অক্টোবর থেকে করাচীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে দেয়া হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে ছাত্রসমাজের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এটা শোনা যায় যে,

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (রাশেদ গ্রুপ, চীনপন্থী বলে খ্যাত ছিল) উচ্চ মহলের যোগসাজশে ছাত্র বিক্ষোভ সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে নভেম্বর মাসে শিক্ষাগত দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে যে তীব্র ও ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, করাচীর ছাত্র আন্দোলন ছিল তারই সূচনা।

... করাচীর ছাত্ররা সরকারের কাছে ১লা নভেম্বর এক চরমপত্র প্রদান করে বলেন যে, ৬ই নভেম্বরের মধ্যে তাদের দাবি পূরণ না করা হলে ধর্মঘট শুরু হবে। ২রা নভেম্বর থেকে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তান সফর শুরু করেন। এই সময় ভুট্টোর প্রধান বক্তব্য ছিল আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান। সরকার পক্ষ দ্রুত মন্তব্য করে যে, 'ভুট্টো বিপ্লব করিতে বাহির হইয়াছে।' একই সঙ্গে ওয়ালী খানের বিরুদ্ধেও সরকারি হুমকি চলতে থাকে। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সরকার বেসামাল হয়ে পড়েছে। এই সময় ৭ই নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টোর সম্বর্ধনা সভায় জমায়েত হওয়ার জন্য আগত ছাত্রদের একটি মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। ফলে পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের বারুদে যেন অগ্নিসংযোগ ঘটে। এর আগে ৪ঠা নভেম্বর ভুট্টোর জনসভায় পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে। পিন্ডির গুলিবর্ষণের ঘটনা সারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয় এবং জনগণকেও আন্দোলনে সামিল করিয়ে দেয়। অবস্থার কিছুটা তুলনা চলে পূর্ব বাংলার '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের সাথে।

৮ই নভেম্বর পিন্ডিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুনরায় গুলিবর্ষণ হয় এবং ছাত্র-জনতা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে পিন্ডিতে সান্ধ্যআইন জারী ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। বিভিন্ন স্থানে ৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। করাচী, পিন্ডি, পাঞ্জাব, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। এই সময়ে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র চিনিসঙ্কট দেখা দেয়। চিনিসঙ্কট রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ মানুষকেও আন্দোলনে সামিল করে। এই সময় থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৩ই নভেম্বর ন্যাপ সভাপতি ওয়ালী খান ও ভুট্টোসহ ১৩ জন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। লাহোরে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। গভর্নর মুসা কঠোর হুশিয়ারী প্রদান করেন। কিন্তু আন্দোলন প্রশমিত না হয়ে আরো তীব্র ও ব্যাপক হতে শুরু করে। ১৪ই নভেম্বর ন্যাপ নেতা ওসমানীসহ ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শহরে আইনজীবীদের বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। এই ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শহরগুলিতে আন্দোলন চলতে থাকে। পুলিশের লাঠি চার্জ, কাঁদানে বোমাবর্ষণ, ১৪৪ ধারা জারী, গ্রেফতার ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়। এই সময় প্রধানত ন্যাপ নেতা ও কর্মী এবং ভুট্টোর পিপলস পার্টির নেতা ও কর্মীরাই অধিকাংশ গ্রেফতার হন। ন্যাপের ওপরেই নিরঙ্কুশ আক্রমণ চলে। এই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনে রাজনৈতিক কোন কর্মসূচী সুস্পষ্টভাবে ছিল না। এদের পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও শিক্ষাগত দাবি-দাওয়া ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক বক্তব্য বিশেষ ছিল না। সারা পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও কোন সুসংগঠিত নেতৃত্বাধীনে একই তালে সর্বত্র আন্দোলন অগ্রসর হতো না। প্রথমাবস্থায় পিন্ডি, পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান প্রভৃতি পাঞ্জাব ও ফ্রন্টিয়ার অঞ্চলের শহরগুলোতেই আন্দোলনের তীব্রতা ছিল বেশী। আইনজীবী ও ছাত্র - এই দুইটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কিছুটা সংগঠিতভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করত। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতার তুলনায় রাজনৈতিক দলসমূহের দুর্বলতা সহজেই বোঝা যেত। ন্যাপ, পিপলস পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা স্থানীয় ভিত্তিতে আন্দোলনে কাজ করত। অনেক স্থানে প্রথম দিকে এই দুই দলের কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবেও কাজ করেছেন। এই সময় সারা পাকিস্তানে ভুট্টোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনের পটভূমিতে এয়ার মার্শাল আসগর খান রাজনীতিতে (১৭ই নভেম্বর) অংশগ্রহণ করেন, যদিও এই বিষয়ে তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই অভূতপূর্ব গণআন্দোলন সারা পাকিস্তানে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক হতাশা দূর করে। একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিত্তি রয়েছে বলে অনুমান করা হতো–সেই পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়ায় শাসকগোষ্ঠী ও আইয়ুব সরকার বে-কায়দায় পড়ে যায়। ১৩ই নভেম্বর আইয়ুব-মুসা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকার ছাত্রদের কতগুলো দাবি মেনে নেবে বলে প্রচার শুরু করে। কিন্তু দমননীতি, গ্রেফতার অব্যাহত রাখে।

... ২৫শে নভেম্বর লাহোরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বন্দীমুক্তি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, পূর্ণ গণতন্ত্র, ভোটাধিকার প্রভৃতি দাবি এই হরতালে ওঠে। শাসকগোষ্ঠীর ভিত্তি বলে পরিচিত পাঞ্জাবের এই হরতাল আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার পর থেকেই আসগর খান সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে সফর করে অসংখ্য বৈঠক ও জমায়েতে ভাষণ দিতে থাকেন। সাধারণত পি.ডি.এম., পিপলস্ পার্টি প্রভৃতি দলের কর্মী তার বৈঠক ইত্যাদির ব্যবস্থা করত। আসগর খানের জমায়েতে অসংখ্য মানুষ জমায়েত হতো। এই সকল জমায়েতে আসগর খান আইয়ুবশাহীর অবসান, গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা দাবি করতেন ও ঐক্য গঠনের আবেদন জানাতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ না ঘটিয়ে আন্দোলনকে তার নিজস্ব গতিপথে চলতে দেয়ার দাবিও তিনি করতেন। সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অনেকেই এই সময় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর আজম খানও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সকল ব্যক্তির প্রধান কথা ছিল এই যে, আইয়ুব শাসনের অবসান না ঘটাতে পারলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দেশরক্ষা বাহিনীর বড় বড় কর্মচারী, সাবেক বিচারপতি প্রভৃতির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানেও জনগণের মধ্যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। ডিসেম্বর মাসে আসগর খান পূর্ব পাকিস্তানে এসে অনেক জেলায় সফর করেন। সে সময় এখানেও তার সভা-বৈঠকে জনসমাগম হত। বিচারপতি মুর্শেদ আসগর খানের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করতেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে ২৮শে নভেম্বর ন্যাপের আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। প্রধানত পাঞ্জাব ও পেশোয়ার অঞ্চলেই এই দিবস সফলভাবে পালিত হয়। করাচী-সিন্ধু অঞ্চলে ব্যাপক গ্রেফতারের ফলে ন্যাপের কমিটি সভ্যরা প্রায় সকলেই আটক থাকায় সেসব অঞ্চলে প্রতিবাদ দিবস ভালভাবে পালিত হতে পারেনি। লাহোরে ন্যাপের আয়োজিত মিছিলে পুলিশ লাঠি চার্জ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের নিরবিচ্ছিন্ন গণআন্দোলন সারা দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ভাবে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতারা আইয়ুবশাহীর অবসানের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং আমলাতন্ত্র ও দেশরক্ষা-বাহিনীর মধ্যেও আইয়ুব-বিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদীরাও আইয়ুবের পরিবর্তনে বাধাদান করবে না বলে নানা মহলের কথাবার্তা শোনা যায়।

... প্রকৃতপক্ষে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ থেকেই সারা পাকিস্তানে ঐক্যজোট গঠনের কথা ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের নেতারাই ছিলেন এই প্রচারের উদ্যোক্তা। এটা প্রচার করা হতে থাকে যে, জানুয়ারি (১৯৬৯) মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ঐক্য গঠনের জন্য সকল দল মিলিত হবে। কাসুরী প্রমুখ ন্যাপ নেতাও অনুরূপ বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। আসগর খান ইতিমধ্যেই ঢাকায় এসে গিয়েছিলেন। (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮) এবং বিভিন্ন জেলা সফর করছিলেন। তিনিও ঐক্যের আবেদন জানাতে থাকেন এবং ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকায় তার সংবর্ধনা সভায় বলেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা চলবে না। এই সময় গুজব ছড়ায় যে, আইয়ুব সরকারের পতন শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সংকটের জন্যই

অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কাজেই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রী হওয়ার আশা করতে আরম্ভ করেন। আরও একটি গুজব ছড়ায় যে, আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পুনঃহস্তক্ষেপের আশঙ্কাও আছে। মওলানা ভাসানী সেই সময়ে আকস্মিকভাবে 'নির্বাচন বর্জন', 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ', 'ঘেরাও', 'আইয়ুব সরকারের অপসারণ' ইত্যাদি প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং কৃষক সমিতির বৈঠক ছাড়াই ২৯শে ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী কৃষকদের 'ঘেরাও আন্দোলনের' আহ্বান জানান।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনে আর একটি নতুন লক্ষণ দেখা দেয়। কনভেনশনপন্থীরা গুন্ডা দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। একজন কর্মরত সাংবাদিককে পিন্ডিতে কনভেনশনপন্থী কমিটির জনৈক সহ-সভাপতি গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে সারা পাকিস্তানে ১০ই ডিসেম্বর সাংবাদিকরা সম্পূর্ণ সফল ধর্মঘট পালন করেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিক থেকে সিন্ধুর ছাত্ররা আন্দোলনে জোরদারভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তারা এক ইউনিট বাতিলের দাবি সামনে আনেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তখন ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশের লাঠি চার্জ, গ্রেফতার ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

... ৮ই জানুয়ারি ন্যাপ নেতা ওসমানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্যজোট 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রকাশ করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনেই 'ডাক'-এর ৮ দফা কর্মসূচীর সকল দাবি পূরণ না হলে নির্বাচন বয়কটের আহ্বান এবং ১৭ই জানুয়ারি সারা পাকিস্তানে ৮-দফা দাবির ভিত্তিতে দাবি দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। আরও বলা হয় যে, দেশের উভয় অংশে আঞ্চলিক কমিটি গঠনের পর সারা পাকিস্তানে হরতাল আহ্বানের তারিখ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। 'ডাক'-এর মধ্যে দেশের ৮টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়। মওলানা ভাসানীর দল ও ভুট্টোর দল এর বাইরে থাকে। মওলানা ভাসানী অবশ্য ১১ই জানুয়ারি ডাকের নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেন; কিন্তু ঐক্যজোটে সামিল হতে রাজী হন না।

... ঐক্যজোট 'ডাক' গঠনের পর পূর্ব বাংলায় যে খুব ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে, তা নয়। প্রথমত, এর পাঞ্জাবী নেতা ও পূর্ব বাংলার নুরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী প্রভৃতি নেতা সম্পর্কে জনমনে অনেক প্রশ্ন ছিল। দ্বিতীয়ত, 'ডাক'-এর কর্মসূচীতে স্বায়ত্তশাসনের দাবি না থাকায় শহরগুলিতে মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সম্প্রদায় খুব উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। তৃতীয়ত, সাধারণভাবেই এটা মনে করা হচ্ছিল যে, এই ঐক্যজোটের আসল নেতারা শেষ পর্যন্ত আপোষ করে ক্ষমতা দখল করতে চাইবে, আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবেনা। অবশ্য এটা সত্য যে, ন্যাপ এবং আমাদের কর্মীরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। শহরাঞ্চলে জনসাধারণ উৎসাহিত বোধ না করলেও, অবশ্য আইয়ুবের বিরুদ্ধে একটা শক্তি অনুভব করছিলেন। গ্রামাঞ্চলে 'ডাক'-এর আহ্বান পৌঁছানোর আগেই ছাত্র আন্দোলন ও ১১-দফার সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

... ছাত্রলীগ ও স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়ন রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোট গঠন সম্পর্কে প্রথম থেকেই বিরোধী অভিমত প্রচার করতে থাকে। ছাত্র লীগ মনে করে যে, পাঞ্জাবীদের নেতৃত্বে নতুন পি.ডি.এম. করা হচ্ছে এবং এটা বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র লীগের মতো একই ধরনের চিন্তা করত এবং ঐক্যজোট গঠনের চেষ্টাকে 'সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের কারসাজি' হিসেবে ব্যাখ্যা করত। এই সময় সরকারি ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ দুইটি পরিষ্কারভাবে ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষ মোনায়েম গ্রুপের বিরোধিতা করে কিছুটা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনসমূহের নৈকট্যে আসতে থাকে। পরে এই গ্রুপটিই দোলন গ্রুপ হিসেবে পরিচিত হয়।

বিরোধী দলীয় বৃহত্তর ঐক্যজোট সম্পর্কে চিন্তার মিল থাকার ফলে ছাত্র লীগ ও মেননপন্থীরা একটা সমঝোতায় উপনীত হয় এবং এপসু (ছাত্র ইউনিয়ন)-কে 'পাঞ্জাবীদের নতুন দালাল' হিসেবে সাধারণ

ছাত্রসমাজের সামনে হেয় করার চেষ্টা করতে থাকে। সাধারণভাবে ছাত্র সমাজের মধ্যেও পাঞ্জাবীদের উদ্যোগে রাজনৈতিক ঐক্যজোট সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই বেশী ছিল। এই সময় ইসলামী ছাত্র সংঘ 'রাজনৈতিক ঐক্যজোট' গঠনের পক্ষে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু এদের গণভিত্তি নেই। এপসু ঐক্যজোটের পক্ষে. সে কথা সকলেই জানত। এই অবস্থায় এপসুকে বেশ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

... ইতিমধ্যে উগ্র বামপন্থীগণ ঐক্যজোট 'ডাক'-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু করেছিল। এরা ছাত্রদের প্রদত্ত ১১-দফা কর্মসূচীকে 'ডাক'-এর ৮-দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে মরণপণ সংগ্রাম শুরু করে। 'ডাক'কে এরা স্বৈরাচার-সাম্রাজ্যবাদের দালাল আখ্যা দেয়, 'ডাক' নেতাদের শকুনি আখ্যা দেয়। এই উদ্দেশ্যে এরা ছাত্রদের সর্বদলের নামের নকল করে ইশতেহার প্রকাশ করে। ছাত্রনেতারা এর তীব্র প্রতিবাদ করে ঐ ইশতেহারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারীও সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। এরা আন্দোলনের কর্মী সেজে নানারকম অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ শুরু করতে চেষ্টা করে। এই সময় থেকেই মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যরা স্বতস্ফূর্তভাবে পদত্যাগ করতে আরম্ভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেন। একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের হিসেব মতে, ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৮ থেকে ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৬৯ পর্যন্ত মোট ৭৬ দিনের আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ৩ জন ও পূর্ব বাংলায় ৮ জন।

... ২৪শে জানুয়ারির অভ্যুত্থান ছিল অবিশ্বাস্য। ন্যূনপক্ষে অর্ধ লক্ষ বিক্ষুব্ধ জনতা এই দিন ঢাকা শহর তছনছ করে ফেলার অবস্থা করে। সরকারি বড় বড় আমলাগণ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ-ই.পি.আর, অচল হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেস ট্রাস্টের দুইটি পত্রিকা-মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তানের অফিস জ্বালিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা আরজু হোটেলে আগুন দেয়। এই হোটেলের মালিক আগরতলা মামলায় সরকারি সাক্ষী ছিলেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের অনেক নেতার বাড়ী জনতা ঘেরাও করে। মধ্যাহ্নে বিক্ষুব্ধ জনতা সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করে ও আগুন দিতে চেষ্টা করে। ২৪শে জানুয়ারি ছিল পূর্ববর্তী দুই তিন মাসের আন্দোলনের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই দিন সকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ মিছিলে বের হয়। এদের মধ্যে শহরের গরীব বস্তিবাসী, ছোট-খাটো সর্বপ্রকার কারখানার মজুররাই ছিল সংখ্যায় বেশী। সর্বপ্রকার অফিস-আদালতের কর্মচারীরাও বের হয়ে আসে। আদমজী, তেজগাঁও, পোস্তগোলা, ডেমরা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা হাজারে হাজারে মিছিল করে পল্টনে এসে উপস্থিত হতে থাকে। পল্টনের ময়দান ভেসে যায় - জনতার ভীড় পথে পথে জমে যায়। সকালে সচিবালয়ের সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন কিশোর মতিয়ুর। ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ড, গুলিবর্ষণ, সংঘর্ষ, রক্তপাত ঘটে যায়। পরিস্থিতি এমনভাবে বিস্ফোরিত হয় যে, তা প্রত্যক্ষ করে জঙ্গী ছাত্র নেতারাও অবস্থা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে —এই আশঙ্কায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য বহুভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

... ২৪শে জানুয়ারির গণ-সংগ্রামে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অরাজকতাপূর্ণ ঘটনা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই সকল কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই বিক্ষুব্ধ জনগণের জঙ্গী মনোভাব প্রকাশ ঘটে থাকে। তাই এতে প্রগতিশীল কর্মী ও নেতাদের, বিশেষত কমিউনিস্টদের আতঙ্ক বোধ করার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে এ-বিষয়ে আতঙ্কবোধ ও নেতিবাচক মনোভাবও লক্ষ করা যায়। কোন কোন নেতৃস্থানীয় কমরেড জনগণকে এ-সকল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে বিরত করার জন্য বুর্জোয়াসুলভ পদ্ধতিও অনুসরণ করেন।

২৪শে জানুয়ারি ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের পেছনে প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের একটি সংগঠিত গ্রুপ কাজ করেছিল। পরবর্তী সময়ে 'আগরতলা মামলায়' অভিযুক্ত জহুরুল হক সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি সংঘটিত ঢাকার অগ্নিকাণ্ডের জন্যও এ গ্রুপটিই ছিল উদ্যোগী।

... ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৬৯ করাচীতে কারফিউ জারী করা হয়। জনতা-পুলিশের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কারফিউ ঘোষণা করা হয়। ২৭শে জানুয়ারি লাহোরে 'ডাক' নেতাদের উদ্যোগে ঢাকার ছাত্র-জনতার ওপর জুলুমবাজির প্রতিবাদে এক অভ্যুত্থান জেগে ওঠে। এই দিন লাহোরে ঐতিহাসিক হরতাল পালিত হয় এবং লক্ষাধিক লোকের জঙ্গী মিছিল বের হয়। মিছিলের সামনে 'ডাক' নেতারাও ছিলেন। সেনাবাহিনী এই মিছিলের গতিপথ রুদ্ধ করে মেশিনগান বসিয়ে মিছিলকে বাধা দিলে, জনতা তা অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে শুরু করে। এক দারুণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। জনতার চাপে সেনাবাহিনী রাস্তা ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করে। এইদিন লাহোরের বিক্ষুব্ধ জনতা, বিশেষত ছাত্র-যুবক-শ্রমিকরা কনভেনশন মুসলিম লীগের 'কোহিস্থান' পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করলে লাহোরেও কারফিউ জারী করা হয় ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়।

২৮শে জানুয়ারি পেশোয়ারে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। ২৯শে জানুয়ারি পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালায় কারফিউ ঘোষণা করা ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। করাচীতে পুলিশ-জনতা ও কনভেনশন লীগের গুণ্ডাবাহিনী ও জনতার সংঘর্ষ নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। এই সময় সোয়াত রাজ্যেও ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়।

এইভাবে পূর্ব বাংলার গণঅভ্যুত্থানের তরঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানে বিস্তার লাভ করে ও সেখানেও গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে তখন পূর্ব বাংলায় সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ড ও তীব্র দমননীতির প্রতিবাদে জঙ্গী আন্দোলন চলতে থাকে।

... ১লা ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তার মাস পহেলা বেতার ভাষণে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের নেতাদের সাথে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলোচনার জন্য 'গোলটেবিল বৈঠক' প্রস্তাব করেন। আইয়ুব খান এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, শাসনতন্ত্র কোন ঐশী বাণী নয়। ফলে রাজনৈতিক গতি-প্রবাহে আর একটি প্রধান স্রোত এসে পড়ে। গণ-সংগ্রাম একটি স্তর পার হয়ে আর একটি অধ্যায়ে উপনীত হয়।

... ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাতেই ওয়ালী খান ও ভুট্টোকে সরকার মুক্তিদান করে এবং ঘোষণা করে যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'জরুরী অবস্থা' প্রত্যাহার করা হবে। এইভাবে সরকার 'গোলটেবিল'-এর পূর্বশর্তসমূহ পালন করতে আরম্ভ করে।

এই দিনই পশ্চিম পাকিস্তানে দেশরক্ষা আইনে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে ঠিক পূর্ব বাংলার মত শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়নি। লাহোরে পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং দুইজন শহীদ হন। পিন্ডিতে লাঠিচার্জ হয়। করাচীতে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। করাচী, লাহোর ও হায়দরাবাদে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারির জনসভা ও হরতালই ছিল 'ডাক'-এর উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় প্রথম ও শেষ জনসভা ও হরতাল। এর সফলতায় সরকার আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। শক্তিশালী বিরোধী দল গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে ১৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'ডাক'-এর বৈঠকে মিলিত হয়।

... ১৫ই ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের অদূরে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সরকারি দলের চীফ হুইপের বাসা ছাত্র-জনতা ঘেরাও করলে চীফ হুইপের ভাই গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে দুই জন ছাত্র শহীদ হন। ফলে নারায়ণগঞ্জে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারি সরকার সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু সংবাদ স্বীকার করে ও শহীদের লাশ তার আত্মীয়স্বজনের নিকট অর্পণ করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে দ্রুত জানাজা নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। ও অপরাহ্নে জানাজা নামাজের শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। কয়েক হাজার ছাত্র-শ্রমিক-

জনতা মিছিলে জমায়েত হয়। ঢাকা শহর আবার জঙ্গী রূপ ধারণ করে। এই মিছিল আজিমপুর গোরস্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে বিক্ষুব্ধ জনতা মন্ত্রীদের বাড়ীতে আগুন দিতে আরম্ভ করে। মন্ত্রীদের বাড়ীতে প্রহরারত পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে একজনের মৃত্যু হয়। ফলে বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আগুন আব্দুল গনি রোড থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী হাসান আসকারীর পরীবাগস্থ বাড়ী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা কনভেনশন মুসলিম লীগের নির্মীয়মাণ অফিস ও রেসকোর্স পুড়িয়ে দেয় ও সরকারি গেস্ট হাউস আক্রমণ করে। এই গেস্ট হাউসে আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতি থাকতেন। তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পাহারারত পুলিশরাও বিভিন্ন স্থান থেকে পালাতে থাকে। ছাত্র-জনতা ৬-৭টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ছাত্ররা পর দিন হরতাল আহ্বান করে। প্রধান শ্লোগান ওঠে, 'আগরতলা মামলা প্রত্যাহার কর', 'মণি সিংহ সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাও।'

এই অবস্থায় সরকার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ঢাকায় দ্বিতীয়বারের জন্য কারফিউ ঘোষণা ও সেনাবাহিনী তলব করে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের অগ্নিকাণ্ডের পেছনে ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের একটি অংশের প্রধান ভূমিকা ছিল।

... ঢাকায় যখন এই পরিস্থিতি, লাহোরে তখন 'ডাক' বৈঠকে অচলাবস্থা দেখা দেয়। প্রধানত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার আগেই পূর্বশর্তগুলো সম্পর্কে এই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে প্রধান বিষয়ই ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার। আওয়ামী লীগ গোলটেবিলে তাদের দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের জন্য শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করে। 'ডাক'-এর মধ্যে পূর্বশর্ত সম্পর্কে লড়াইয়ে বলিষ্ঠ ও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ। আওয়ামী লীগ ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। তাদের মধ্যে একটি মত ছিল যে, গোলটবিলে গিয়ে আগরতলা মামলা সম্পর্কে ফয়সালা করা। দক্ষিণপন্থীরা এই মতের আসল উদ্যোক্তা ছিল। এই জটিলতার কারণে 'ডাক' গোলটেবিল বৈঠক ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে পিছিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারি বসবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। আইয়ুব সেটা স্বীকার করে নেয়।

... ড. জোহার হত্যাকাণ্ড সারা পূর্ব বাংলার সংগ্রামকে আরও জঙ্গী করে তুলে। শিক্ষকরা ধর্মঘট ঘোষণা করেন। কুষ্টিয়ার জনগণ বন্দুকের দোকান লুট করে ও ই.পি.আর.-পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু ঘটে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি জনগণ নোয়াখালীতে সেনবাগ থানা আক্রমণ করে। এইখানে প্রায় সারাদিন ধরেই দলে দলে মানুষ মিছিল করে আসতে থাকে এবং সারাদিনই গুলি বর্ষিত হয়। অসংখ্য আহত হয়, মৃত্যু ঘটে তিন জনের। চট্টগ্রামে ১৯শে ফেব্রুয়ারি শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। জনতা একজন সরকারি নেতার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এই সময় করাচীতেও পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ও কনভেনশনপন্থী গুণ্ডাদের সাথে জনতার সংঘর্ষ বাঁধে। ফলে করাচীতেও পুনরায় কারফিউ জারী হয়।

... সেবার ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপকতমভাবে উদযাপিত হয়। সর্ববৃহৎ গণ-জমায়েত সর্বত্র হয়। সভা, মিছিল, অনুষ্ঠান, শহীদ মিনারে শপথ গ্রহণ প্রভৃতি এই দিবসের বিশেষ কর্মসূচী ছিল। সর্বত্র হরতালও পালিত হয়। সরকার এই দিন সরকারি ছুটি প্রদানের দাবি আগেই মেনে নিয়েছিল। ঢাকায় এইদিন পল্টনে সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ (৩ থেকে ৪ লক্ষ লোক) হয়। এই সভা থেকে ছাত্র নেতারা বক্তৃতা করেন। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রাজনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে করণীয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। এবারে ২১শের চিত্র-প্রদর্শনী এবং পার্টি নেতাদের নামে হুলিয়া ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবিতে নাম-মুদ্রিত পোস্টার ছিল খুবই আকর্ষণীয়। শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালিত হয়।

... এইদিনই সন্ধ্যায় আইয়ুব আকস্মিকভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না। ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতা চিরদিন থাকে না। এই ঘোষণায় তিনি আরও বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত না হলে তিনি স্বয়ং শাসনতন্ত্র সংশোধন করবেন ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেবেন, পার্লামেন্টারী সরকারও প্রবর্তন করবেন। আইয়ুবের ঘোষণার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনের আর একটি বিজয় সূচিত হয়। জনগণ উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু এর চেয়ে আরও বড় বিজয় জনগণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় ও এই মামলায় আটক সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। অপরাহ্নে বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। সন্ধ্যায় মণি সিংহসহ সকল নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। দীর্ঘ এক যুগ পর কারাগার রাজবন্দীশূন্য হয়। এই সকল ঘটনায় জনগণ আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে উৎসব শুরু হয়ে যায়। এই বিজয় উৎসবের তরঙ্গ সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

... গ্রামাঞ্চলে এই সময় বি.ডি. সদস্যদের পদত্যাগকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এরও প্রধান ভিত্তি ছিল গ্রামাঞ্চলের ছাত্রগণ। তাছাড়া শহরের ছাত্ররাও গ্রামাঞ্চলে কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামাঞ্চলের ছাত্ররা রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে দুর্বল। তারা এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে অনেক স্থানে অরাজকতা সৃষ্টির পথেও যেতে থাকে। কোন কোন স্থানে তারা জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে। আবার কোন কোন স্থানে শস্তায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার প্রভৃতিদের বাধ্য করতে থাকে। গ্রামের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলোও আন্দোলন সমর্থন করার নামে ছাত্রদের অরাজকতার পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় স্যাক-এর তরফ থেকে এইসব বিষয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও অরাজকতা সৃষ্টি না করার জন্য আবেদন প্রচার করা হতে থাকে। ঢাকা থেকে ছাত্র কর্মীদেরও বিভিন্ন স্থানে পাঠানো শুরু হয়।

এই সময় থেকে সরকারি প্রশাসন বিভাগ তাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করতে আরম্ভ করে। অবশ্য আন্দোলনের ফলে পুলিশের পক্ষে তাদের কর্তব্য পালন করাও কঠিন হয়ে ওঠে। জনগণ পুলিশ দেখলেই মারমুখী হয়ে উঠত। এইসব কারণে প্রশাসন ব্যবস্থার দিক থেকে ক্রমে একটা শূন্যতা দেখা দিতে আরম্ভ করে। শহরাঞ্চলগুলোতে ছাত্ররা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে এগিয়ে আসে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এটা সম্ভব হয় না। এই সময় থেকেই গ্রামাঞ্চলে গরুচোর, চোর-ডাকাত হত্যা করার লক্ষণ দেখা যেতে থাকে।

... পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশী ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক শাসন জারী করা হবে–এই রকম প্রচার সে-সময় সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হচ্ছিল। ভুট্টো, আসগর খান প্রমুখ এর বিরোধিতা করে বলতে থাকেন যে, এ-ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করার কথাও শেষের দিকে নতুন করে শোনা যেতে থাকে।

কনভেনশনপন্থী এম.এন.এ.-রা অনেকেই বলতে আরম্ভ করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে ফয়সালার পক্ষে তারা ভোট দেবেন না, তাঁরা এক ইউনিট বাতিল, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয়েও সংশোধনী আনয়ন করবেন। আসলে এই সকল জনপ্রিয় শ্লোগান ও দাবির আড়ালে এঁদের অনেকেই গোলটেবিল বৈঠকের ফয়সালাকে বিনষ্ট করা ও জটিলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন।

এইসব ঘটনা সত্ত্বেও সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার কয়েকদিন আগে থেকে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে শুরু করেছিল। ছাত্রসমাজ, গণতান্ত্রিক দলসমূহ ও সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রচার ও প্রচেষ্টার কিছুটা ফল পাওয়া যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে প্রথমে পশ্চিমে ও পরে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরদ্বয়কে পরিবর্তন করা হয়। মোনায়েম খানের বিদায়ে জনমনে উল্লাস সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে নতুন গভর্নর হিসেবে মোহাম্মদ নূরুল হুদা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের জরুরী দাবিসমূহ বিবেচনা করা

প্রধান ও আশু কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেন। পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটতে শুরু করে। ২৫শে মার্চ গভর্নর ঘোষণা করেন যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ও অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ২৫শে মার্চ রাত ৮:১৫ মিনিটে আইয়ুব দেশের শাসনভার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়। পাকিস্তানে কায়েম করা হয় দ্বিতীয়বারের জন্য সামরিক শাসন। গণঅভ্যুত্থানের ওপর নেমে আসে এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ।

সামরিক শাসন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশে কোন স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়নি, যদিও চট্টগ্রাম, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ছাত্র-যুবকরা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু সারা পূর্ব বাংলায় এ-ধরনের ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হলো:

(ক) ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে এ-ধরনের কোন আহ্বান ছিল না।

(খ) পূর্ব বাংলার গণ-আন্দোলনে যে-ছাত্রসমাজ অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে কার্যত বন্ধ থাকায় ছাত্ররা জমায়েত ছিল না, শ্রমিকরা নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে ঘেরাও আন্দোলনে এত বেশী লিপ্ত ছিল যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি ঘটে যাচ্ছে, সে-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।

(গ) গোলটেবিল বৈঠকের পরে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জনসাধারণের একটা অংশের মধ্যে 'মার্শাল ল হওয়া অস্বাভাবিক নয়' —এইমতো মনোভাব দেখা দিয়েছিল। জনগণের এই মনোভাব কাটিয়ে তাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জমায়েত রাখার জন্য সুস্পষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে কোন দলই কাজ করেনি। আমাদের পক্ষ থেকে এই বিপদের হুঁশিয়ারি দেয়া হলেও 'কি করিতে হইবে?'-জনগণকে সেভাবে প্রস্তুত রাখা হয়নি।

(ঘ) সামরিক শাসন ঘোষণার আকস্মিকতায় ব্যাপক মানুষ হতচকিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া গোলটেবিল বৈঠক-উত্তর পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই সকল কারণে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ, স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়নি॥"[২২৮]

দুই

পূর্বের দৃশ্যপট

"... ১৯৬৮ সাল। পরের বছর পাকিস্তানে নির্বাচন হবার কথা। আয়ুবের সংবিধান অনুযায়ী এটা হবে দ্বিতীয় নির্বাচন। এর আগে ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল, যখন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ। পাঁচ বছর পর আবার নির্বাচনের সময় এসেছে। মওলানা ভাসানী ও ন্যাপ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা বন্দি। একমাত্র ওয়ালী ন্যাপ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তথাকথিত মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

৬ ডিসেম্বর ১৯৬৮ সাল। মওলানা ভাসানী পল্টনে জনসভার ডাক দিয়েছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন সভা থেকে গভর্নর মোনম খানের বাসভবন (তখন বলা হত গভর্নর হাউজ, যা এখন রাষ্ট্রপতি ভবন) ঘেরাও করা হবে। সভায় প্রায় হাজার তিরিশেক লোক হয়েছিল। মওলানা ভাসানী বললেন, 'আয়ুব খানের দুই রান দুই দিকে টেনে ছিঁড়ে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াব।' খুবই জ্বালাময়ী ভাষণ। পরদিন রিকশা ও স্কুটার ধর্মঘট হবার কথা ছিল। রিকশা-স্কুটার শ্রমিক নেতা কমরেড সেলিম মঞ্চে বসেছিলেন। তিনি ভাসানী ভক্ত ছিলেন। তিনি বারবার ভাসানীকে অনুরোধ জানালেন, ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন দেবার জন্য।

---

[২২৮] উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান/মোহাম্মদ ফরহাদ ॥ [দ্যু প্রকাশন - জানুয়ারি, ২০১৯। পৃ. ২৫-১৫৮ (সংক্ষেপিত)]

কী মনে ছিল ভাসানীর জানি না, তিনি ধর্মঘট প্রসঙ্গে কিছুই বললেন না। আমিও মঞ্চে ছিলাম। আমার কাছে অবাক লেগেছিল। কারণ শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি তিনি তো সবসময়ই সমর্থন দেন। কেন কমরেড সেলিমের অনুরোধ উপেক্ষা করলেন, তা আমার তখনও বোধগম্য হয়নি।

স্বল্পস্থায়ী সভা সমাপ্ত করে ভাসানীর নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক মানুষের মিছিল চলল গভর্নরের বাড়ির দিকে। গভর্নরের বাড়ির প্রধান সড়ক বন্ধ ছিল। পুলিশ-মিলিটারি বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আমিও সেই ঘেরাও অনুষ্ঠানে ছিলাম। জনতা নানা ধরনের স্লোগান দিচ্ছে। কেউ কেউ পায়ের স্যান্ডেল ছুঁড়ে মারছে গেটের দিকে। পাহারারত পুলিশ সেনারা অবশ্য সংযত ছিল।

তখন রোজার দিন ছিল। ইফতারের সাইরেন বাজল। মওলানা ভাসানী ফিরে গেলেন, হেঁটেই গেলেন বায়তুল মোকাররম মসজিদে। মসজিদের চত্বরে সিঁড়িতে তখন অপেক্ষমাণ কয়েক হাজার মানুষ। নামাজ শেষে মওলানা ভাসানী মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন পরদিন সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে। এখন বুঝতে পারছি ভাসানী কেন রিকসা ধর্মঘটকে সমর্থন করেননি। আসলে তার মাথায় ছিল অন্য চিন্তা। পরদিন হরতাল আহ্বান করার কথা তিনি আগের থেকেই ভেবে এসেছিলেন। ভাসানীর মুখ থেকে হরতালের ডাক শুনে উপস্থিত জনতা তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল হরতালের শ্লোগান দিতে দিতে।

তখনও আমি অন্তত ভাবিনি যে পরদিন সত্যিই হরতাল সফল হবে। কারণ এক রাতের মধ্যে কতটুকু প্রস্তুতি নেয়া যাবে? কিন্তু পরদিন ৭ ডিসেম্বর অভূতপূর্ব হরতাল হয়েছিল। পুলিশ লাঠিচার্জ, গুলি করে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সারা শহরে পুলিশ। জনতার খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ। মওলানা ভাসানী তখন ইস্কাটনে সাইদুল হাসানের বাসায় ছিলেন। আমি নিজে বায়তুল মোকাররমের কাছাকাছি ছিলাম। হরতালের কাজে ছিলাম। বেলা বারোটা বোধ হয় হবে। এমন সময় দেখি হরতালের মধ্যে রিকশা করে মওলানা ভাসানী বায়তুল মোকাররমের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে দেখে কয়েকশ মানুষ এগিয়ে এল। পুলিশ ও ইপিআর ছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীও মোতায়েন থাকতে পারে, আমার ঠিক মনে নাই। কয়েকশ' লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে দেখে তারা বাধা দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠিক তখনই মওলানা ভাসানী তার গায়ের চাদরটা রাস্তায় ফেলে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। যারা নিহত হয়েছেন, তাদের জন্য গায়েবী জানাজা। পুলিশ মিলিটারি একটু থেমে গেল। নামাজে তো বাধা দেয়া যায় না। নামাজ শেষে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন, তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন। এই বলে হাঁটা শুরু করলেন। পেছনে কয়েকশ মানুষ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হল। জনতাকে ঠেকাতে এক অবাঙালি সেনা বন্দুক উচিয়ে ভাসানীর দিকে এগিয়ে যেতেই ভাসানী চিৎকার দিয়ে উঠলেন 'খামুশ'। এই বলে বৃদ্ধ ভাসানী পাকসেনার রাইফেলটা এক হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। এমন দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। ভাসানীর বহু বক্তৃতা আমি শুনেছি, কিন্তু এমন মূর্তিও কখনও দেখিনি। এই দৃশ্যটি ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছিল এবং পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ অর্ধশিক্ষিত পাকসেনাটি এই অবস্থায় কী করত জানি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনৈক অবাঙালি সেনা অফিসার এগিয়ে এসে সৈনিকটিকে সরিয়ে নেয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কিছুদূর মিছিল হল। মওলানা ভাসানী ঘোষণা দিলেন, পরদিন আবার হরতাল হবে।

সেদিন দুপুরের দিকে আমি প্রেসক্লাবে গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানে চরম উত্তেজনা। সবার মুখে মুখে সকালের ঘটনা। যারা ভাসানীর সমালোচক ছিলেন তারাও মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছেন। সকালের এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাসানী সবার মন জয় করে নিয়েছেন।

... পরদিন ৮ ডিসেম্বর সারাদেশে হরতাল পালিত হল। ঢাকাসহ দেশের প্রায় সর্বত্র জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ। গুলি ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। গুলিতে নিহতের সংখ্যা বাড়ছেই। সেদিন মওলানা ভাসানী হাট হরতালের ডাক দিলেন। ২৯ ডিসেম্বর হাট হরতাল। হাট হরতালের আহ্বানটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আন্দোলন শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। হাট হরতাল সংগঠিত করতে ন্যাপ ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টির (পিকিং পন্থি বলে

পরিচিত) এবং কৃষক সমিতির কর্মীরা তৎপর হয়ে উঠল। শহরের আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে লাগল গ্রামেও। মনে আছে, এই রকম সময় আমার ছোট ভাই জুনো আমাকে বলেছিল, '৬২-এর চেয়ে বড় আন্দোলন হবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেও ভাবেনি, আমিও ভাবিনি, এমনকি আর কেউ ভেবেছিল বলে মনে হয় না যে, এই আন্দোলন এক বিশাল গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিতে যাচ্ছে।

২৯ ডিসেম্বর দেশের বহু গ্রামে হাট হরতাল সফল হয়েছিল। গুলি হয়েছিল নড়াইলে ও বর্তমানের নরসিংদী জিলার মনোহরদি থানার হাতিরদিয়ায়। কয়েকজন শহীদ হন। হাতিরদিয়ার হাট হরতাল সংগঠিত করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন আসাদ। তিনি তখন ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাড়ি শিবপুরে। মান্নান ভূঁইয়ার খুব ঘনিষ্ঠ। ছাত্রকর্মী হলেও কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সেদিন হাতিরদিয়ায় গিয়েছিলেন হাট হরতাল সংগঠিত করতে। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার গায়ে সরাসরি গুলি না লাগলেও তিনি খুব সম্ভবত লাঠিচার্জের কারণে আহত হয়েছিলেন। মাথায় লেগেছিল। মাথার একটা দিক ফেটেও গিয়েছিল। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে তিনি সন্ধ্যার মধ্যেই ঢাকা চলে আসেন। বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে হাতিরদিয়ার সফল হাট হরতাল ও পুলিশের গুলির খবর দিয়েছিলেন। আমাদের তখন খিলগাঁওয়ে একটা গোপন আস্তানা ছিল, সেখানে কাজী জাফর আত্মগোপনে থাকতেন। আসাদ সেটা জানতেন। তিনি সেখানেও গিয়েছিলেন আমাদেরকে খবরটা দিতে। আমরা তখনও জানতাম না যে, আজ তিনি আহত হয়েছেন হাতিরদিয়ার গ্রামে, আর কদিন পর তিনি ঢাকা শহরে শহীদ হবেন। ২০ জানুয়ারি আসাদ যখন পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন, তখন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় নির্মল সেন লিখেছিলেন, 'আসাদ খবর দিতে এসেছিল, এখন এল খবর হয়ে।' সত্যিই ২৯ ডিসেম্বর আসাদ দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় এসেছিলেন খবর দিতে, মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে আহত অবস্থায়। আর ২০ জানুয়ারি আসাদের শাহাদত বরণ শুধু খবরই ছিল না, এই খবর তৈরি করেছিল অভ্যুত্থানের দাবানল।

এদিকে মওলানা ভাসানীর একক নেতৃত্বে যখন আন্দোলন এগিয়ে চলেছে, তখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও মাঠে নামার কথা ভাবতে শুরু করে। ভাসানী ও ন্যাপকে বাদ দিয়ে সরকার বহির্ভূত সকল দল জোট বাঁধল। গঠন করল ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে ডাক। এর মধ্যে ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী-মোজাফফর), পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নসরুল্লাহ), পাকিস্তান মুসলীম লীগ (দৌলতানা), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (নূরুল আমীন), জামাত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম, জামাতে ওলামায়ে ইসলাম। ভাসানীর আন্দোলন ও ডাকের আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকল। ডাক'ও কয়েকটি দিবসের ও হরতালের ডাক দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও মস্কোপন্থি ন্যাপ ছাড়া বাদ বাকি দলগুলো ছিল চরম দক্ষিণপন্থি। এখানে লক্ষণীয় যে আওয়ামী লীগ বা মস্কোপন্থি ন্যাপ ভাসানীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন না করে দক্ষিণপন্থিদের সঙ্গে জোট করতে আগ্রহী ছিল। এটা সেই সময় যখন আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতা কারাগারে এবং শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী। তবু ভাসানীর নেতৃত্বে এত বড় গণউত্থান সৃষ্টি হচ্ছে, এটা তারা সহ্য করতে পারছিলেন না। এর মধ্যে কেবল ঈর্ষা বা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতাই ছিল না। এর মধ্যে যেটা কাজ করছিল তা হল বাম ও কমিউনিস্ট ভীতি। এদিকে মস্কোপন্থি পার্টিও ন্যাপ ও ভাসানীর সঙ্গে থাকার চেয়ে চরম দক্ষিণপন্থিদের সঙ্গে জোটবাঁধাকে পছন্দনীয় মনে করেছিল। এমনই ছিল তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

... '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিলে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল আমার দেখা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। মানুষের কী প্রচণ্ড শক্তি আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম। গোটা সমাজ ছিল অগ্নিগর্ভ। ১৯৬৮-এর ৬ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সামান্য আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তা যে এত দ্রুত বিশাল দাবানলে পরিণত হবে, তা তখনও আমি ভাবতে পারিনি। সম্ভবত মওলানা ভাসানী নিজেও ভাবেননি। মনে আছে ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝির দিকে মওলানা ভাসানী

গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, আমি একটু গুড় লাগিয়ে দিয়েছি, এখন যা হবার তাই হতে থাকবে। গুড়ের গল্পটি এই রকম - জামাই আসবে তাই বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ভর্তি মাটির পাত্র একটার উপর একটা সাজানো আছে। সবচেয়ে উপরের পাত্রের উপর শয়তান এক টুকরা গুড় রেখে দিয়েছে। গুড় খেতে এসেছিল টিকটিকি। টিকটিকি দেখে আসল ইঁদুর। ইদুরকে দেখে আসল বিড়াল। বিড়াল দেখে লাঠি হাতে তাড়া করল বাড়ির ছেলেরা। বিড়াল বেড়া টপকিয়ে চলে গেল পাশের বাড়িতে। কিন্তু এ বাড়ির ছেলেরা বিড়ালকে তাড়া করে পাশের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করল। পাশের বাড়ির বৌ রান্না ঘরে বসে ছিল। এ বাড়ির ছেলেরা বিড়ালকে লাঠি দিয়ে মারতে গেলে লাঠির ঘা গিয়ে পড়ল বৌয়ের পিঠে। দুই বাড়ির মধ্যে বেঁধে গেল সংঘর্ষ। দুই পক্ষে হতাহত হল বেশ কয়েকজন। তারপর চলল মামলা, দুই বাড়িই শেষ হয়ে গেল।

গল্পটি মওলানা ভাসানী বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললেন। মুখে অল্প গল্প হাসি। ৬ ও ৭ ডিসেম্বর তিনি একটু গুড় রেখেছিলেন। গভর্নর ভবন ঘেরাও ও হরতাল। এর থেকে গণবিস্ফোরণ ঘটে গেল। বস্তুত গণবিস্ফোরণের অবস্থা তৈরিই ছিল। মওলানা ভাসানী ঈষৎ হাসিমুখে বললেন, আয়ুব খানের দিন শেষ। মনে আছে ফেব্রুয়ারির দিকে যখন আয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান দেন, তখন ভাসানী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঘরোয়া বৈঠকে আমাদের বলেছিলেন, আয়ুবের সঙ্গে আবার কী বৈঠক। মরা মানুষের সঙ্গে কী কথা হয়। আয়ুব তো এখন মরা মানুষ।

... ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা প্রণয়নের পর ১৮, ১৯, ২০ জানুয়ারি তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (এখন তা মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি) থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলের আয়োজন করে। বেশ সুশৃঙ্খল ছিল মিছিলটি। অনতিদূরে অবস্থানরত একটি পুলিশের গাড়ি থেকে মিছিল লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। আসাদ গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। আমি সেদিন ঢাকায় থাকলেও, সেই মিছিলে ছিলাম না। কারণ এটা ছিল শুধু ছাত্রদের মিছিল। তবে আসাদের পাশেই মিছিলে ছিল আমার ছোট ভাই জুনো। তার কাছ থেকে ও অন্যদের কাছ থেকে আসাদের শহীদ হবার বিবরণ শুনেছি। ঘটনাটি ঘটে সকালের দিকে। দুপুরের দিকে আমি খবর পাই। তখন আমার পাশে ছিলেন মান্নান ভূঁইয়া। তিনি হু হু করে কেঁদে উঠলেন। পরবর্তীকালে মান্নান ভূঁইয়াকে অনেক বেদনাদায়ক মুহূর্তে দেখেছি। কিন্তু কখনও এমন করে কাঁদতে দেখিনি।

আসাদের মৃত্যু সংবাদ দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আসাদের মৃত্যু যেন আগের থেকেই প্রস্তুত উত্তপ্ত বাংলাদেশে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আসাদের মৃত্যু আরও বিশেষ করে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এই কারণে যে, কমরেড আসাদ সাধারণ পথচারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সচেতন রাজনৈতিক কর্মী।

... মার্চ মাসে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটি থানায় জনগণ আক্রমণ করে বন্দুক লুট করে। কিন্তু তেমন ঘটনা খুব বেশি নয়। বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে আগুন জ্বলছিল, দাউ দাউ করে জ্বলছিল। অধিকাংশ বিডি মেম্বার আর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করতে শুরু করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এই আহ্বান ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম দফা গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি তখন অবিসংবাদিত নেতা। তবু পূর্ব পাকিস্তান ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল।

গ্রামে গ্রামে তহসিল অফিসে জনগণ আগুন দেয়। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় তহসিলদারদের ওপর জনগণের আক্রোশ ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই সময় ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে খুন-খারাবি হয়নি। অর্থাৎ এখন যেমন সমাজটা অত্যন্ত সহিংস হয়ে উঠেছে, তখন তেমনটি মোটেই ছিল না। কিন্তু জনগণের মেজাজ ছিল খুবই জঙ্গি। তার কারণ আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত মাফিয়া গোষ্ঠীর জন্ম তখন হয়নি। তবে চাঁদপুর, ময়মনসিংহে, জামালপুর এবং এই রকম আরও কয়েকটি অঞ্চলে গরুচোরদের ধরে অথবা সাধারণভাবে খুবই ঘৃণিত ব্যক্তিদের ধরে প্রকাশ্যে গণআদালত করে বিচার করে জবাই করা হয়েছিল।

ঠিক যেন ফরাসি বিপ্লবের মতো। আমি স্বচক্ষে এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি। তবে পরবর্তীসময়ে সেরকম অঞ্চলে আমি গেছি। কারা সংগঠিত করল গণআদালত, কারা শত্রু চিহ্নিত করল, কারাই বা জবাই করল? আমি এ ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট দলকে চিহ্নিত করতে পারিনি। যারা শত্রু চিহ্নিত করে গরুচোরদের ধরে এনেছিল, তারা সাধারণত মধ্য কৃষক ছিল। গণআদালতে উপস্থিত জনতা ছিল একেবারে নিচের তলার গরিব মানুষ। গরুচোর কেন বিশেষভাবে টার্গেট হল এটাও আমি ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি। বস্তুত সে সময় সংঘবদ্ধ গরুচোর ছিল এবং তাদেরকে পেছন থেকে সহযোগিতা করত স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রশাসন। কৃষকের গরু হারানো যে কত বড় বেদনাদায়ক ব্যাপার, তা যারা কৃষক সমাজের সঙ্গে ভালোভাবে সম্পর্কিত নন, তারা বুঝবেন না। খাজনাট্যাক্সের জুলুমটাও কৃষককে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতাও প্রভাব ফেলেছিল। এই কারণে তহসিল অফিসে আগুন দেয়া আন্দোলনের একটা সাধারণ ফর্মে পরিণত হয়েছিল।

... মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গেলেন। সেখানেও তিনি বিরাট বিরাট জনসভা করেছিলেন বলে জানতে পেরেছি। মওলানা ভাসানী ভালো উর্দু বলতে পারতেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি কিষাণমজদুর এবং মজলুম জনতার মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন, যা পশ্চিম পাকিস্তানের গরিব মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তখনকার দিনে গরিব মানুষের কথা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা বলতেন না বললেই চলে। জামাত-ই-ইসলাম ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রচার সবসময়ই করত। পশ্চিম পাকিস্তানে জামাত ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো ক্রমেই বেশি বেশি করে ভাসানীর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। তিনি যখন ট্রেনে সফর করছিলেন, তখন পাঞ্জাবের শাহিওয়াল স্টেশনে ১৬ মার্চ কিছু ইসলামী মৌলবাদী গুণ্ডা ভাসানীকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দৈহিকভাবে আক্রমণ করে। এর প্রতিবাদে পরদিন ঢাকায় হরতাল হয়। ঢাকাতেও চিহ্নিত কিছু জামাতপন্থি লোককে জনতা মারধরও করেছিল।

এদিকে গুজব ছিল যে, দেশে আবার মার্শাল ল' হতে যাচ্ছে। পরিস্থিতি যা তাতে এরকম অনুমান করাটা অস্বাভাবিক নয়। কাজী জাফরের মামা কাজী মহিউদ্দিন সাহেব জাহাজী শ্রমিকদের নেতা ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগ করতেন এবং শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বরিশালে থাকতেন। তিনি ঢাকায় এসেছিলেন তার ভাগ্নের খবর নিতে এবং একটা জরুরি খবর দিতে। কাজী জাফরকে তিনি জানালেন যে, আয়ুব খান আর থাকছেন না এবং ২৫ মার্চ সামরিক শাসন জারি হচ্ছে। তিনি শেখ মুজিবের কাছ থেকে এই খবরটি গোপনে জানতে পেরেছেন। হাজার হোক ভাগ্নে তো, ভিন্ন দল করলেও ভাগ্নে কাজী জাফরকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাই কাজী মহিউদ্দিন ভাগ্নে কাজী জাফরকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন। কাজী জাফরের কাছ থেকে আমরাও খবরটা পেলাম, কিন্তু তেমন আমল দি'নি।

পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষ করে মওলানা ভাসানী ঢাকা বিমানবন্দরে নামলেন খুব সম্ভবত ২২ মার্চ। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, ইতিপুর্বে শেখ মুজিবুর রহমান কথা প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন, মওলানা সাহেবকে যদি আমি ঢাকায় নামতে না দিই। কথাটা আমাদের মনে ছিল। একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানে ভাসানীর ওপর দৈহিক আক্রমণ হয়েছিল, সেটা অবশ্য মৌলবাদী ইসলামপন্থি দলের দ্বারা। এবার যদি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তেমন কোনো আক্রমণ না হোক, অপমান করার চেষ্টা করা হয়। তাই আমরা প্রস্তুতি নিলাম। টঙ্গী থেকে দশ হাজার শ্রমিক এলেন বিমানবন্দরে ভাসানীকে সংবর্ধনা দেবার জন্য। সবার হাতে দেয়া হল শক্ত লাঠি, যাতে মারামারি লাগলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সবার হাতে লাঠি। এটা কেমন দেখায়? তাই প্রত্যেকটি লাঠির মাথায় লাল পতাকা লাগিয়ে দেয়া হল। কাজী জাফর ও আমি টঙ্গীতে থেকে এই পুরো ব্যবস্থাটি করেছিলাম। বিমানবন্দরে বড় চমৎকার লাগছিল দৃশ্যটি। দশ হাজার মানুষের প্রত্যেকের হাতে লাল পতাকা। চারদিক লালে লাল। তারা উচ্চস্বরে ধ্বনি তুলে তাদের প্রিয় নেতাকে লাল সালাম জানাচ্ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, কট্টর ইসলামপন্থি ও প্রতিক্রিয়াশীলরা কখনও মওলানা ভাসানীকে খাঁটি মওলানা বলে স্বীকার করত না। বিদেশী পত্রিকায় তার সম্বন্ধে বলা হত 'রেড মওলানা'।

যাহোক, মওলানা ভাসানী নামলেন বিমান থেকে। তার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সামনে একটা ট্রাক ছিল, সঙ্গে মাইক লাগানো ছিল। টঙ্গীর শ্রমিকরা এবং সংবর্ধনা উপলক্ষে আগত অন্যান্যরা শোভাযাত্রা করে শহীদ মিনারে যাবেন। সেখানে সভা হবে এবং মওলানা ভাসানী বক্তৃতা করবেন, এই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, এই সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা আমরা অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি করেছিলাম। ন্যাপ বা অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টি বা গ্রুপগুলোর কোনো ভূমিকা ছিল না বললেই চলে।

বিমানবন্দরে মওলানা ভাসানীর এক অদ্ভুত আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম। তিনি বললেন, মাইক কোথায়? তারপর ট্রাকের সঙ্গে মাইক বাঁধা রয়েছে দেখে তিনি ট্রাকে ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে মানুষটি জীবনে এত বড় বড় জনসভা করেছেন, এত বক্তৃতা করেছেন, তিনি কেন বক্তৃতা করার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়লেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমরা বললাম, ট্রাক নয়, আপনার জন্য আলাদা গাড়ি আছে। আপনার জন্য শহীদ মিনারে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে বক্তৃতা করবেন। তারপর তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠলেন। দীর্ঘ শোভাযাত্রা শেষে শহীদ মিনারে জনসভা হল। মওলানা ভাসানী তাঁর স্বভাবসুলভ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। (১) তিনি বললেন, 'আয়ুবের কনস্টিটিউশন (তখন সংবিধান কথাটি বেশি চালু ছিল না) মানি না, মানব না'। (২) 'আয়ুবের নির্বাচন মানব না। নির্বাচন বর্জন করুন, বয়কট করুন, বানচাল করুন'। (৩) 'আমি গভর্নর হুদার বাড়ি (ইতিপূর্বে শেখ মুজিবের দাবি অনুসারে মোনেম খাকে গভর্নরের পদ থেকে সরিয়ে ড. নুরুল হুদাকে গভর্নর বানানো হয়েছে) ঘেরাও করে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসব'। তিনি গভর্নর হুদাকে মাত্র সাতদিনের সময় দিয়েছিলেন।

শহীদ মিনারের সভা শেষে মওলানা ভাসানী উঠলেন ন্যাপ নেতা সাইদুল হাসানের বাসায়। আমরাও ছিলাম। চা নাস্তা খাবার পর তিনি বেশ আরাম করে বসে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'সিআইএ বোকা!' এর অর্থ আমি বুঝিনি। কোন্ প্রসঙ্গে কেন বললেন তাও বোঝা গেল না। অনেকটা আপন মনেই বলে গেলেন। আবার বললেন, আমেরিকা থেকে সাবধান থেকো। আমেরিকাকে কখনও বিশ্বাস করো না। আমেরিকা সম্পর্কে আমাদের যে সামান্যতম মোহ নাই, তা তো ভাসানীর জানা। কিন্তু কেন এমন কথা বললেন, তারও অর্থ খুঁজে পাইনি। এই কথাগুলো আজও আমার কাছে রহস্যজনক মনে হয়। হয়ত তিনি কিছু সংবাদ জানতেন। কিন্তু আমাদের কাছে তা পরিষ্কার করেননি। এর বেশ পরে যখন ভিড় কিছুটা কমেছে, তখন তিনি বললেন, দেশে মার্শাল ল' হতে যাচ্ছে এবং তারিখও বললেন, ২৫ মার্চ।

কাজী জাফর আহমদের মামা শেখ মুজিবের কাছ থেকে ঠিক যে তারিখটি শুনেছিলেন, মওলানা ভাসানীও সেই তারিখের কথা বললেন। বাস্তবে ঠিক ২৫ মার্চ আয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং সামরিক শাসন জারি হয়। ইয়াহিয়া খান হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক।

পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে বিমানবন্দরে নেমে ভাসানী কেন বক্তৃতা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণও এখন বুঝতে পারলাম। মাত্র দু'দিন পর সামরিক শাসন হতে যাচ্ছে। তিনি হয়ত আর কথা বলার সুযোগ নাও পেতে পারেন। তাই জনগণের সামনে তার বক্তব্যটি বলে রাখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

ভাসানী নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সৎ, নির্লোভ, সংগ্রামী এবং গরিব দরদী জননেতা ছিলেন। কিন্তু তিনি বুর্জোয়া রাজনীতির নানা ধরনের কৌশলও গ্রহণ করতেন, যদিও ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই। শহীদ মিনারে তার বক্তৃতাটি ছিল তেমনই এক কৌশলের অংশ।

তিনি জানতেন যে, মার্শাল ল' হতে যাচ্ছে, সংবিধান থাকছে না, নির্বাচনও হচ্ছে না। তাই তিনি আগেই ঘোষণা করলেন কনস্টিটিউশন মানি না। নির্বাচন বর্জনের ডাক ১৯৬৮ সালেই দিয়েছিলেন, এবার তিনি একই ডাক আবার দিলেন এটা নিশ্চিত জেনে যে, আয়ুবের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে না। লোকে ভাববে তার ধমক কাজে লেগেছে। যেহেতু মার্শাল ল'র অধীনে আগের গভর্নরও থাকছে না, তাই তিনি খুব সহজেই বলতে পারলেন যে, সাতদিনের মধ্যে তিনি গভর্নর হুদাকে টেনে রাস্তায় বের করে আনবেন। তখনকার পরিস্থিতিতে এই ধরনের বক্তব্য অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তবে গণঅভ্যুত্থান চূড়ান্তভাবে বিজয়ী না হলে গভর্নরকে রাস্তায় টেনে বের করে আনা সহজ বিষয় ছিল না। অবশ্য তিনি জানতেন, সাতদিনের যে নোটিশ দিয়েছেন তার আগেই ড. হুদার গভর্নরগিরি থাকছে না।

পরে যেটা জানতে পেরেছি তা হল, শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ভাসানী উভয়ই (এবং ভুট্টোও) জানতেন যে, ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। এবং রটনা আছে যে, তিন নেতাই এতে সম্মতি দিয়েছিলেন॥"[২২৯]

তিন

পালাবদলের অন্তরালে (০১)

"... আইয়ুব খান বড় ধরনের কোনো উপদ্রব ছাড়াই দেশ শাসন করে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার হার্ট অ্যাটাক হয়। মাস দেড়েক তাকে চিকিৎসা নিতে হয়। এ সময় তিনি অফিস করেননি। তখন তাকে জড়িয়ে নানা রকম গুজব ছিল। আইয়ুবের পরিবারের সদস্যরা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। একসময় এ রকমও মনে করা হচ্ছিল, আইয়ুব খান আর বাঁচবেন না। তিনি তার মেজ ছেলে গওহর আইয়ুবকে উত্তরাধিকারী হিসেবে তৈরি করছিলেন। আইয়ুবের পরিকল্পনা ছিল, যদি কোনো অঘটন ঘটেই যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ও সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) মুসা অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হবেন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দেবেন। নির্বাচনে গওহর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন এবং তাকে জয়ী করা হবে। এ পরিকল্পনার কথা জেনে মুসা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েন। এই ঝুঁকি নেওয়ার মতো সাহস তার ছিল না।

নভেম্বর থেকে সারা দেশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নভেম্বর (১৯৫৮) পেশোয়ারের জিন্নাহ্ পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় এক তরুণ পাঠান আইয়ুবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও আন্দোলন মোকাবিলা করার মতো শক্ত অবস্থান তখন তার দল মুসলিম লীগের ছিল না। সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে ডেকে আইয়ুব তাকে (আইয়ুবকে) প্রধান রেখে সামরিক আইন জারি করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেন। ইয়াহিয়া অবশ্য তাৎক্ষণিক জবাবে বলেছিলেন, সশস্ত্র বাহিনী সব শক্তি নিয়ে প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়াবে। এর পর থেকে প্রায় সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীর জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার কাজীকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যেতেন এবং রুদ্ধদ্বার সভা করতেন। সপ্তাহে তিন দিন অন্তত দুই ঘন্টা তারা সলাপরামর্শ করতেন। একদিন সন্ধ্যায় কাজী একা এলেন এবং ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রস্তাব দিলেন;

১) সংবিধান বাতিল করে প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন জারি করবেন;

২) রাষ্ট্রপতির আদেশবলে ইয়াহিয়া খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হবে;

৩) আইয়ুব দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে যাবেন, যত দিন না দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ইয়াহিয়ার মতলব বুঝতে আইয়ুব খানের এতটুকু অসুবিধা হলো না। ১৯৫৮ সালের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে আছে। তখন ইস্কান্দার মির্জা তাকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন এবং ২০ দিনের মাথায়

---

[২২৯] হায়দার আকবর খান রনো/শতাব্দী পেরিয়ে॥ [তরফদার প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। পৃ. ১৫৯-১৭০/১৯১-১৯৬]

আইয়ুব মির্জাকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আইয়ুব খান বিকল্প চিন্তা শুরু করলেন। তিনি তিনটি সম্ভাব্য পদক্ষেপের কথা ভাবলেন:

১) ইয়াহিয়া খানকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তার সহযোগী আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু এ সময় এটি করা ঠিক হবে না। এতে করে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং প্রেসিডেন্টের দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতে পারে।

২) শক্তিশালী রাজনৈতিক একটি দলের সঙ্গে সমঝোতায় আসা। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোন দলের সঙ্গে?

৩) ইয়াহিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া।

আইয়ুব খান তার পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সদস্য এবং তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত তথ্যসচিব আলতাফ গওহরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কার্যকর সমঝোতায় আসার পক্ষে তারা মত দেন। এ রকম দল বলতে তখন মাত্র দুটো - ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। দুজনই তখন কারাগারে বন্দী। ভুট্টোর ব্যাপারে আইয়ুব খানের ছিল প্রচণ্ড রকম আপত্তি। 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপ সত্ত্বেও মুজিবকেই তার পছন্দ হলো। তার মনে হলো, এ পরিকল্পনায় মুজিবকে হয়তো পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রপতির এডিসি আরশাদ সামি খান অত্যন্ত কাছ থেকে এ রাজনৈতিক নাটকটি মঞ্চস্থ হতে দেখেছেন। তিনি বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

'প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিলেন, কারাগারে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানানো দরকার। তিনি আলতাফ গওহরকে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। আমি নিজে দেখেছি, বেশ কয়েকবার রাতের বেলা মুজিব ছদ্মবেশে আলতাফ গওহরের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হলে এসেছেন। প্রতিবার তারা তিনজন ঘন্টার পর ঘন্টা কথাবার্তা বলতেন। মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের এ গোপন বৈঠকের খবর কেমন করে জানি বিরোধী পক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে যায়।'

আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে এবং ফেব্রুয়ারির (১৯৬৯) দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় এসেছিলেন। সম্ভবত ওই সময় গোপন বৈঠকগুলো হয়েছিল। যখন এ বৈঠকগুলো চলছিল, তখন ঢাকা ছিল উত্তপ্ত। মওলানা ভাসানী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে হরতাল পালিত হচ্ছিল। আলতাফ গওহর অবশ্য এ বৈঠকের বিষয়টি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, ১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির আগে আইয়ুবের সঙ্গে শেখ মুজিবের কখনো দেখা হয়নি।

তত দিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটাল হয়ে পড়েছে। জানুয়ারির (১৯৬৯) দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এগারো দফা আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। ১৮ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। প্রতিদিনই সভা-মিছিল চলছিল। ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি করলে আসাদুজ্জামান নামে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) একজন সদস্য নিহত হন। আসাদ একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র এবং শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। এমএ পাস করে তিনি সেন্ট্রাল ল কলেজে আইন পড়তেন। নরসিংদী এলাকার শিবপুর থানার ধানুয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। তার বাবা মাওলানা আবু তাহের শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে নেজামে ইসলাম থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। পরিবারটি ছিল খুবই গোঁড়া। কিন্তু আসাদ ছিলেন এর উল্টো। বাবার চাপে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর আসমাতুন্নেসা হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন। স্কুলে যোগ দিয়েই তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং মিছিলে অংশ নেন। আসাদের মৃত্যু এগারো দফা আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে।

... শেখ মুজিব ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি আইয়ুবের ডাকা গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন। তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাকসহ একটি অগ্রবর্তী দল ইতিমধ্যে রাওয়ালপিন্ডি চলে গেছে।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল, গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তার জামিনের ব্যবস্থা করা। যে অর্ডিন্যান্সের অধীনে আগরতলা মামলার বিচার চলছিল, তাতে জামিনের কোনো সুযোগ ছিল না। তখন একটি উপায় বের হলো, মুজিব প্যারোলে মুক্ত হয়ে বৈঠকে যোগ দেবেন। মুজিব রাজি হলেন। তিনি ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে প্যারোলের আবেদন করতে নির্দেশ দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি প্যারোল বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এই প্যারোল নিয়ে রীতিমতো একটি নাটক হয়। যুবনেতা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক বেগম মুজিবের কাছে ধরনা দেন, যেভাবেই হোক 'নেতার' প্যারোলে বের হওয়া ঠেকাতে হবে; কারণ মানুষ এটিকে একটি আপস হিসেবে দেখবে এবং নেতার 'ইমেজ' তাতে নষ্ট হবে। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত লে. আবদুর রউফ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

'শুনলাম, তিনি প্যারোলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও শুনলাম যে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সামনের রাস্তায় একটি গাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখলাম। গাড়ি থেকে নেমে এলেন বেগম মুজিব। শেখ মুজিব উঠে গেলেন এবং স্ত্রীকে ভেতরে আসতে বললেন। কিন্তু বেগম মুজিব ভেতরে না এসে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'শুনলাম তুমি নাকি প্যারোলে যাচ্ছ। যদি তাই যাও, তাহলে আমিই তোমার বিরুদ্ধে মিছিল করব। আর সেই মিছিলে তোমার পুত্র-কন্যারাও থাকবে।' এ কথা বলেই বেগম মুজিব দ্রুত গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। এ ঘটনার পর শেখ মুজিব আরও বিপন্নবোধ করতে লাগলেন। মনে হলো তিনি যেন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে রেডিওর খবরে বলা হলো, মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিলে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এ খবর শুনেই তিনি চিৎকার করে রুম থেকে বের হয়ে বললেন, ডাকো তাদের... জিওসিকে খবর দাও। আমাকে জিজ্ঞেস না করে রেডিওতে নিউজ দিল কেন? সম্ভবত বেগম মুজিব চলে যাওয়ার পরই শেখ মুজিব প্যারোলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন, তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। ২২ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঢাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনের নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী (পরে মেজর জেনারেল) ঢাকা সেনানিবাসের বন্দিশালা থেকে শেখ মুজিবকে নিজে গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেন।

... ২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব করাচি ও লাহোর হয়ে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছান। তার ১৭ জন সফরসঙ্গীর মধ্যে আইনজীবী ছিলেন তিনজন—ড. কামাল হোসেন, আমীর-উল-ইসলাম ও মওদুদ আহমদ। অন্যরা প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের নেতা। এই সুযোগে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমানের সঙ্গে তার বাসায় দেখা করেন। শেখ মুজিবের সৌজন্যবোধ ছিল অসাধারণ। তিনি বিচারপতি রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে তার (বিচারপতি রহমান) পক্ষপাতহীন আচরণের জনাই তিনি (শেখ মুজিব) রক্ষা পেয়েছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি রাতেই শেখ মুজিব আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করেন। আইয়ুব তখনো মুজিবের সঙ্গে একটি আপসরফার আশা ছাড়েননি। ইতিমধ্যে আলতাফ গওহর ছাড়াও আরও দুজন দৃশ্যপটে হাজির হয়েছেন। তাঁরা হলেন পাকিস্তানের ধনী বাইশ পরিবারের অন্যতম হারুন ভ্রাতৃদ্বয়। হারুনেরা ছিলেন ভুট্টোর ঘোর বিরোধী। ভুট্টো যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। ভুট্টো যখন ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করেন, আইয়ুব তখন আলতাফ গওহরের মাধ্যমে হারুন ভাইদের পক্ষে টেনে আনেন। মাহমুদ হারুনকে লন্ডনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করা হয়। ইউসুফ হারুনকে পরে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ভবনে গোপন আলোচনা চলল খুবই আন্তরিক পরিবেশে। ঠিক হলো, দেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার চালু করা হবে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন

দেওয়া হবে। মুজিবের পছন্দমতো এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হবে। আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকবেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলে ওই রাতে আইয়ুব খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের একান্তে দেখা ও কথা হয়। তারা প্রেসিডেন্ট ভবনে একসঙ্গে রাতের খাবার খান। শেখ মুজিব কথা দেন যে তিনি গোলটেবিল বৈঠক সফল করতে চেষ্টা চালাবেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন, প্রেসিডেন্ট যে পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, এটি একটি বড় ভুল। ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব তার ডায়েরিতে লেখেন :

'কাল রাতে মুজিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমাদের কথাবার্তা ছিল খোলামেলা। তাকে একটু আপসমূলক মনে হলো। যদিও সে এটি বোঝাতে চেয়েছে যে তাকে পূর্ব পাকিস্তানের মুকুটহীন রাজা হিশেবে মেনে নিতে হবে। তার কথায় দেওয়া-নেওয়ার কোনো আভাস ছিল না। তার ওপর তার দলের চরমপন্থীদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং ছাত্ররা ছিল তার নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি বাইরে।'

শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে আইয়ুব খান তার ডায়েরিতে কিছু লেখেননি। ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলাপের সময় শেখ মুজিব বলেছিলেন, ১৯৬৯ সালে লাহোরে গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে আইয়ুব খান তাকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আইয়ুব-মুজিব আপসরফার ব্যাপারটি সেনাসদরে ভালো চোখে দেখা হলো না। ভুট্টো তার বন্ধু জেনারেল পীরজাদার মাধ্যমে এ গোপন আলোচনার খবরটি পেয়ে যান। মুজিব খুব বিপন্নবোধ করতে শুরু করলেন। এ রকম অবস্থায় এ ধরনের একটি সমঝোতা করার ঝুঁকি ছিল অনেক। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তখন খুবই ঘোলাটে। মওলানা ভাসানীর আহ্বানে সর্বত্র চলছে ঘেরাও আন্দোলন। অন্যদিকে আইয়ুব খান ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ অবলম্বন হিসেবে মুজিবকে আঁকড়ে ধরে পার পেতে চাইছেন।

ভুট্টো চেয়েছিলেন গোলটেবিল বৈঠক বরবাদ হোক। শেখ মুজিব যাতে এই বৈঠকে যোগ না দেন, ভুট্টো সেই চেষ্টা করেছিলেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল গুল হাসান খান (পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান)। গুল হাসানের বর্ণনা অনুযায়ী :

'একদিন সকালে একটি টেলিফোন কল এল করাচি থেকে। লাইনের অপর প্রান্তে জে এ ভুট্টো। বললেন, তিনি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলতে চান। শেখ তখনো মুক্তি পাননি। জবাবে বললাম, সে ক্ষেত্রে তাকে ঢাকায় রিং করতে হবে। তিনি বললেন যে ইতিমধ্যেই তা করেছেন। কিন্তু সেখানকার সামরিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি দিতে পারেন একমাত্র সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) অর্থাৎ, আমি। আমি ভুট্টোকে বললাম যে আমার কাছে এটি এক নতুন খবর, যেহেতু আমার দায়িত্ব ও করণীয় কী কী তা বলার সময় কেউ আভাসমাত্র দেননি যে শেখের জিম্মাদারির ভারও আমার ওপর। তার মেজাজটা যে বিগড়ে গেল তা বুঝতে পারলাম। বললেন যে জরুরি ভিত্তিতে শেখের সঙ্গে তার কথা বলার ব্যবস্থা আমাকেই করে দিতে হবে। কারণ, ব্যাপারটায় জাতীয় গুরুত্ব রয়েছে। বললাম, বিষয়টা যদি অতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয় তাহলে তিনি প্রেসিডেন্টকে রিং করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শামাল দেন। রেখে দিলাম ফোনটা। জানি না শেখের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন নাকি পারেননি। সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার জন্য শেখকে রাজি করানো।'

২৫ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। ওই দিনই সভা মুলতবি হয়ে যায়। শেখ মুজিব দলবলসহ ঢাকায় ফিরে আসেন। দুদিন পর তিনি ঈদ উদযাপনের জন্য গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় যান। ৩ মার্চ

হেলিকপ্টারে চড়ে ইউসুফ হারুন হঠাৎ টুঙ্গিপাড়ায় এসে হাজির হন, কয়েক ঘণ্টা আলাপ করেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। তারপর ফিরে যান। তিনি আইয়ুবকে ধারণা দেন, সব সমস্যা মিটে যাবে।

১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক আবার শুরু হলে শেখ মুজিব ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি এক ব্যক্তি এক ভোট এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে চারটি প্রদেশ পুনর্বহালের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবে অনেকেরই আপত্তি ছিল। শেখ মুজিব বৈঠক ছেড়ে চলে যান। ফলে গোলটেবিল বৈঠক ভেঙে যায়। রাজনৈতিক মঞ্চে সেনাবাহিনীর আগমনের আলামত দেখা যাচ্ছিল। আইয়ুব-মুজিব গোপন বৈঠকের কথা সেনাসদরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সামরিক জান্তার মুজিববিরোধী অংশটি শেখ মুজিবকে আইয়ুবের কথায় পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় না গিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সামনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে পরামর্শ দেয়।

১২ মার্চ শেখ মুজিব সেনাপ্রধান ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছিলেন। তিনি ইয়াহিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ছয় দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাঙালিদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহিয়া সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন, আইয়ুব ও মোনায়েম খান ছয় দফাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেওয়ার মনোভাব দেখিয়ে ভুল করেছেন।

শেখ মুজিব ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি আচকান-পাঞ্জাবি পরা পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের কঠোর সমালোচনা করেন। মওলানা ভাসানীকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দেন। ২২ মার্চ শেখ মুজিব আইয়ুবের কাছে '৬২ সালের সংবিধানের কতগুলো সংশোধনী প্রস্তাব পাঠান। আইয়ুবের মনে হলো, এগুলো বাস্তবায়ন করলে পাকিস্তান আর টিকবে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, শেখ মুজিব দলের চরমপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন।

আইয়ুব খান আইনমন্ত্রী আলভিন রবার্ট কর্নেলিয়াস ও তথ্যসচিব আলতাফ গওহরের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন, সংবিধানে দুটি সংশোধনী আনতে হবে। এগুলো হচ্ছে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু করা। তিনি তাদের অনুরোধ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা করতে। দুপুরেই এ আলোচনাপর্ব শেষ হলো। সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন। তাঁর মত হলো, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সংবিধান পরিবর্তন করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যাবে না। নতুন গভর্নরদের হাতে কোনো জাদুর কাঠি নেই। সুতরাং তাকেই (ইয়াহিয়া) তাঁর কর্তব্য পালন করতে হবে। এটি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না, ইয়াহিয়া আসলে কী বলতে চাইছেন।

আইয়ুব খান অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন, সামরিক আইন জারি করা ছাড়া উপায় নেই। মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে তিনি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। সভায় ইয়াহিয়া উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষ হওয়ার পর আইয়ুব আর ইয়াহিয়া একান্তে আলোচনা শুরু করলেন। আইয়ুব জানতে চাইলেন, তিনি ইয়াহিয়ার সমর্থন পাবেন কি না। ইয়াহিয়া সামরিক আইন জারির আগে কয়েকটি বিষয় বাস্তবায়নের কথা বললেন। এগুলো হচ্ছে গভর্নরদের বরখাস্ত করতে হবে; জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙে দিতে হবে; সংবিধান বাতিল করতে হবে। শেষ প্রস্তাবটিতে আইয়ুব খুবই মর্মাহত হলেন। কেননা তার বানানো সংবিধান তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আইয়ুব বুঝতে পারলেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

২৪ মার্চ আইয়ুব জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের চিঠির খসড়া তৈরি করেন। পরদিন বেলা ১১টায় তাঁর ভাষণ রেকর্ড করা হয়। ২৫ মার্চ ক্ষমতার পালাবদল হলো। সাড়ে ১০ বছর প্রবল প্রতাপে ক্ষমতার চূড়ায় বসে থেকে আইয়ুব খান প্রায় নিঃশব্দে মঞ্চ থেকে সরে গেলেন॥"[২৩০]

---

২৩০ মহিউদ্দিন আহমদ/আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) ॥ [প্রথমা প্রকাশন - ডিসেম্বর, ২০১৬। পৃ. ১৮৩-১৯৮]

চার

পালাবদলের অন্তরালে (০২)

"... ২১ শে ফেব্রুয়ারী আইউব খান ঘোষণা করলেন যে তিনি আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না এবং স্বয়ং এই ঘোষণাকে চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ঘোষণা আইউবকে উৎখাতকরণে আগ্রহী কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাকে সন্তুষ্ট করলেও পূর্ব পাকিস্তানে তা খুব একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।

একই রাত্রিতে আইউব খান এই শর্তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুজিবকে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে হবে। পরদিন সকালে, ২২ শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া হয়।

... ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুজিব ১৭ জন সহকর্মী এবং উপদেষ্টা সঙ্গে নিয়ে বহুগুণে বর্ধিত জাতীয় ভাবমূর্তি সহকারে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছেন। লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁকে ব্যাপক সংবর্ধনা দেয়া হয়। একই সন্ধ্যায় মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের ডাক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেন যাদের অনেকেই ঢাকার জনসভায় ছয় দফার ওপর মুজিবের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হননি। বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী ডাক নেতা, বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা ছিলেন ছয়দফা কর্মসূচীর বিরোধী এবং তারা মুজিবকে এই কর্মসূচী সংশোধনের অনুরোধ জানান। মুজিব তাঁর প্রতিপক্ষকে শান্ত করার জন্য ব্যক্তিগত আলোচনাকালে বলেন যে ছয় দফা কর্মসূচী দেনদরবার সাপেক্ষ এবং তাতে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মুজিব ভালো করেই জানতেন যে তিনি অসমসত্ব মিশ্রণের এই ডাক নেতাদের সঙ্গে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারবেন না এবং সামগ্রিকভাবে ডাক কখনোই ছয় দফাকে শাসনতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে মেনে নেবেনা। সেজন্যই তিনি বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর মতো ছোটো ছোটো প্রদেশগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেন, যাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধারণা বিনিময় করা ছিল সহজতর। তাদের কাছ থেকে তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমর্থন অর্জনে সক্ষম হন।

ফেব্রুয়ারীর ২৫ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল কেবলমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক ঘটনা। আইউব খান নেতাদের স্বাগতম জানিয়ে একটি ভাষণে প্রত্যাশা করেন যে, এই বৈঠকে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের বিদ্যমান সংকটের অবসান ঘটবে। সেদিন সভায় কোন বাস্তব অগ্রগতি হয়নি। ২৬ শে ফেব্রুয়ারী মুজিব ঢাকা ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য নেতার বাস্তব সমঝোতা ও দেনদরবারের পর্যায় শুরু হয়। পরবর্তী দু'সপ্তাহে মুজিবের সঙ্গে ভুট্টো, ওয়ালী খান, আসগর খান, দৌলতানা, শওকত হায়াত খান, বিজেঞ্জো, জি এম সাইয়্যিদ ও মওদুদীসহ অন্যান্য নেতার একের পর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে ১৯৬৯ সালের ১০ ই মার্চ গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় শুরু হয়। প্রায় ৩৫ জন নেতা বৈঠকে যোগ দেন। এদের মধ্যে বিচারপতি এস এম মোরশেদ এবং এয়ার মার্শাল আসগর খানের মতো বেশ কয়েকজন নেতা ব্যক্তি হিসেবে বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

... ১১ই মার্চ সকালে ১৯৬২ সালের সংবিধানের খসড়া প্রণেতা এবং আইউব খানের প্রধান শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা মঞ্জুর কাদিরের সঙ্গে হঠাৎ আমার রাওয়ালপিন্ডি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লবীতে দেখা হয়ে যায়। সরকারের কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকলেও প্রয়োজনবোধে যে কোনো শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য আইউব তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এক সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি ছিলেন হার্ডকোর পাঞ্জাবী এলিটদের একজন। ঢাকায় তিনি ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আন্দোলনমুখর ঢাকার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরেএসেছিলেন।

আমাকে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে তিনি জানান যে, তিনি আমার খোঁজ করছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ডিনারের সময় তিনি ঢাকার গণঅভ্যুত্থানের সময় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এই ষাট বছরের প্রৌঢ় আমাকে বলেন যে এখন তিনি পাঞ্জাবী এবং বাঙালীদের মধ্যেকার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারছেন এবং মত প্রকাশ করেন যে পাকিস্তান এই ধরনের জনতার সমম্বয়ে একক একটি জাতি গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। পাঞ্জাবী এলিটদের মধ্যে মিল্লাত বা একত্ববাদ - এক আল্লাহ এক জনগণ এবং এক দেশ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল। ইকবাল এবং গালিব ছিলেন তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অগ্রদূত, যেখানে বাঙালীদের জন্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসিমউদ্দীন ও আরো অনেকে। তিনি বলেন তোমরা আমাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এর আগে আমার ধারণা ছিল যে তোমরাও ইকবাল ও গালিবের আদর্শ ও চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত।

তিনি বলেন, আগের দিন গোলটেবিলে মুজিবের দেয়া বিবৃতিকে সামনে রেখে পরিস্থিতির প্রয়োজনে, ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন করে নেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উভয় পক্ষের শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের একসঙ্গে বসা উচিত। পরদিন ১২ই মার্চ কনফারেন্স চলাকালে আমরা তাঁর হোটেলের স্যুইটে মঞ্জুর কাদিরের সঙ্গে দেখা করি। আইউবের আইন মন্ত্রী এস এম জাফর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিবের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কামাল হোসেন, আমি এবং আমিরুল ইসলাম। প্রথমে সাধারণ আলোচনার পর আমরা ১৯৬২ সালের সংবিধান নিয়ে সম্ভাব্য সংশোধনীর আলোচনা শুরু করা মাত্র এস এম জাফর এই বলে প্রতিবাদ শুরু করেন যে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আইউব খান মেনে নেবেন না। তাঁরা চাচ্ছিলেন আমরা যেন পরদিন আইউব শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর পক্ষে যে প্রস্তাব আনবেন তা মেনে নেই। ফলে এই বৈঠক এক ঘন্টাও স্থায়ী হয়নি। মঞ্জুর কাদির আমাদের দেয়া পরামর্শের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানালেও বৈঠকের দুঃখজনক পরিণতিতে মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। এতে বোঝা গেল, কনফারেন্স যে পর্যায়েই তর্কবিতর্ক হোক না কেন, আইউব তাঁর সিদ্ধান্ত আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। এভাবে অচলাবস্থা একরকম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

নিষ্ফল এই বৈঠক চলাকালীন অন্যদিকে ভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসার ও কামাল হোসেনের আত্মীয় এক ভগ্নিপতি আমান উল্লাহ খান খবর নিয়ে এলেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমানের আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। ব্যক্তিগত ভিত্তিতে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল বলে আর কাউকে তা জানানো হয়নি। সেদিন ১২ই মার্চ সন্ধ্যায় কামাল হোসেন, আমিরুল ইসলাম এবং আমি আমানুল্লাহ খানের সঙ্গে সেনা অধিনায়কের রাওয়ালপিন্ডিস্থ বাসভবনে যাই। বাসাটি ছিল প্রেসিডেন্ট ভবন এবং গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানরত অতিথি ভবনের খুবই কাছে। এই প্রথমবারের মত ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি তাঁর ঔপনিবেশিক কায়দায় দেয়ালে তরবারী ও বাঘের চামড়া দিয়ে সাজানো সুসজ্জিত লিভিং রুমে আমাদের অভ্যর্থনা জানান। প্রথমেই তিনি এসব তরুণ কয়েকজন আইনজীবীকে শেখ মুজিবর রহমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরামর্শক আইনজীবী হিসেবে দেখতে পেয়ে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং অবশ্যই তাঁর কণ্ঠে ছিল প্রশংসার সুর। নিজের অবস্থানে আত্মপ্রত্যয়ী মনে হলেও তিনি দেশে চলমান সংকটজনক পরিস্থিতির কারণে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের এই বলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন যে দেশে এমন অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না এবং ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে সেনাবাহিনী দায়িত্ববদ্ধ। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, এ অবস্থায় 'সেনাবাহিনী বসে থাকতে পারেনা' এবং কথা প্রসঙ্গে একই কথা কমপক্ষে পাঁচবার উচ্চারণ করেন। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি আমাদের এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন যে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তাঁর কোনো ধারণা নেই এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোনো ধারনা ছিলনা।

ইয়াহিয়াকে তখন পর্যন্ত আইউবের অত্যন্ত অনুগত বলে মনে হচ্ছিল এবং আইউবের জন্য তিনি একটি শেষ সুযোগ দিতে চাইছিলেন। তিনি বললেন, গোলটেবিল বৈঠকে কোনো রাজনৈতিক সমাধান না এলে সেনাবাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রস্তাব রাখেন, ওই বুড়োকে (আইউব) প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকতে দাও, শেখ মুজিব হোক প্রধানমন্ত্রী এবং দৌলতানা অর্থমন্ত্রী বা সে ধরনের অন্য কিছু। এটা কোনো পরামর্শ না হয়ে শোনাচ্ছিল হুমকির মতো। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, এ ধরনের কোনো সমঝোতায় না এলে সেনাবাহিনী ক্ষমতা হাতে তুলে নেবে। বাস্তবে তিনি আমাদের এই ধারণা দিয়ে দিলেন যে সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং তারা কেবলমাত্র গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে। এ-ও স্পষ্ট হয়ে গেলো যে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ আর আইউবের হাতে নেই, এখন তা চলে গেছে সেনাবাহিনীর হাতে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় সেনাবাহিনী চেষ্টা করছিল যতদিন সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানকে করায়ত্ত রাখার।

ইয়াহিয়া বললেন, সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এখনই তিনি আইউব খানকে টেলিফোন করে এই ব্যবস্থার কথা জানাতে পারেন। তিনি পরামর্শ দিলেন আমাদের মধ্যে থেকে একজন মুজিবের কাছে গিয়ে এই 'শেষ সমাধানের' বিষয়টি জানিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারি। তাদের সবাই ঠিক করলেন যে মুজিবের কাছে আমারই যাওয়া উচিত। ফলে আমার গত্যন্তর রইলোনা। মেরুন রঙের গাড়ীতে ইয়াহিয়া খানের একজন স্টাফসহ আমাকে মুজিবের কাছে এই বার্তা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। অনেক দ্বিধা নিয়ে ইস্ট পাকিস্তান হাউসে গিয়ে আমি দেখলাম যে মুজিব তাঁর কক্ষে বালুচী নেতাদের সঙ্গে মনোযোগের সঙ্গে আলোচনা করছেন। আমি তাঁকে বাথরুমে নিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মুজিবকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমাদের আলোচনা এবং তাঁর দেয়া প্রস্তাবের কথা জানালে মুজিবের ঠোঁট কেঁপে ওঠে। তিনি আমার মতামত জানতে চান। কয়েক মিনিট আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্তে আসি মুজিবের পক্ষে এমন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা বিবেচনা সম্মত হবে না। জনগণ ধরে নেবেন যে মুজিব ক্ষমতায় যাবার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। খুব সম্ভবতঃ এটি ছিল মুজিবের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য একটা ফাঁদ। মুজিবের মূল শক্তি ছিল তাঁর জনগণ এবং একমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই তিনি ক্ষমতায় যেতে আগ্রহী ছিলেন। রাজধানী ইসলামাবাদে পাঞ্জাবী আমলা পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে কোনো সমস্যা সমাধান করা বা কোনো কিছু অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, ভিনদেশী সেনাবাহিনীকে তাঁর রাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারটি মুজিব মেনে নিতে পারেননি। মুজিবের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্তক্রমে আমি সেনা অধিনায়কের বাসভবনে ফিরে গেলাম। তাঁকে (ইয়াহিয়া) জানালাম যে মুজিব আলোচনার জন্য অন্যত্র ব্যস্ত রয়েছেন বলে খুঁজে বের করতে পারিনি। পরবর্তীকালে আমরা চলে আসার এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ইয়াহিয়া খান তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, মুজিব সেসময় ইস্ট পাকিস্তান হাউসেই ছিলেন এবং আমার সঙ্গে তাঁর অবশ্যই দেখা হয়েছে। কাজেই ইয়াহিয়া যুক্তিযুক্তভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসেন যে তাঁর প্রস্তাব মুজিবের মনঃপূত হয়নি এবং আমার মনগড়া কাহিনী ছিল অত্যন্ত ভদ্রভাষায় তাঁর 'শেষ সমাধানের' ব্যাপারে 'না' বলে দেয়ার কৌশল মাত্র॥"[২৩১]

পাঁচ

'ডাক'—ঐক্যবদ্ধ অনৈক্য

"... The Democratic Alliance Committee (DAC) — which consisted of such parties as Maulana Maudoodi's Jamaat-i Islami, Mufti Mahmood's Jamiat-ul-Islam, Wali Khan's

---

২৩১ মওদুদ আহমদ/বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা॥ [ইউপিএল - ১৯৯২। পৃ. ১২০-১২৮]

National Awami Party, Nurul Amin's National Democratic Front, Daultana's Council Muslim League, Mujibur Rahman's Awami League and Awami League (Nawabzada Nasrullah group) — had been formed in January 1969. Faced with the competing egos of the senior politicians, a tactful solution was found by giving the chairmanship of the DAC to the relatively untested Nawabzada Nasrullah Khan. In the absence of the jailed Mujib, Bhutto and Wali Khan, this committee had the political field — with the sole exception of the boycotting Maulana Bashani — all to itself. On 5 February, the desperately placed Ayub Khan invited the Opposition parties for talks. The DAC agreed to meet with him provided he withdrew the State of Emergency (and its Defence of Pakistan Rules which had been imposed since the 1965 War), release all detained politicians and students protesters and lift the ban on public meetings and processions. The government met these conditions and the talks that are now known as the 'Round Table Conference' were re-scheduled from 17 to 19 February. All the jailed politicians were released.

Soon after being released, Bhutto decided to boycott the Round Table Conference. At the time suspicions were raised, but now it has been confirmed that Bhutto was prompted to reject these talks at the behest of General Peerzada. Rafi Raza reveals in his book that Bhutto had entered into a secret understanding with the senior generals which was referred to by a mutual code designated as the 'Ceylon Tea Party'. In the end Bhutto's boycott proved of little consequence as the talks failed for reasons of their own. But the inescapable fact remains that senior generals had already commenced their political manæuvring. And Bhutto, who during his days of political wilderness was always concentrating on retaining the confidence of the Army, was ever ready to oblige them.

Despite freeing Bhutto, Wali Khan, and other politicians as promised, the regime had refused to release Mujib and the other alleged conspirators in the Agartala case. This now led to another crisis. Awami League, which by now largely controlled the situation in East Pakistan, refused to attend the talks until these people were released. Initially, the government offered to release them on parole, but on facing adamant opposition backed down completely. Mujib and the thirty-four co-accused were set free unconditionally. But already greater damage had been done. A few days earlier on 15 February one of the Agartala accused, Flight Sergeant Zahural Haq, was shot dead supposedly during an attempt to escape from custody. This triggered off very severe riots in Dhaka-two central ministers' houses were set on fire and the arriving fire fighting machines and police jeeps were destroyed by the mob. Later the State Guest House and the offices of Convention Muslim League were also burnt down.

In order to facilitate the Round Table Talks, Ayub Khan announced that he would not seek re-election in the election scheduled for 1970. The talks commenced on 26 February, and consisted of a brief session and included Ayub Khan and three of his ministers, leaders of the DAC, Mujib and Asghar Khan. A clear consensus emerged on the need for a parliamentary system of government and direct elections through universal adult suffrage. The second session was scheduled for 10 March. By now the different views held by the various opposition parties had come to the surface and some had begun squabbling with each other. Many of the leaders participating in the RTC were without any popular base. Events were moving fast and soon by-passed them altogether. In a last desperate attempt, Ayub Khan tried to hold secret talks with Mujib but these met with failure. It is felt that Mujib was worried that these talks might jeopardize his image at home, but it has also been a suggested view that senior generals had tempted Mujib with the prospect of getting elected to power in the near future as opposed to getting there through the 'back-door' via Ayub Khan.

By March the situation had deteriorated even further as labour power had now begun to assert itself in the urban areas. On 4 March 5000 workers at the Valika mills went on strike, later setting the textile mill on fire. In Punjab mill workers attempted to burn the Saigol family's Kohinoor textile mill. On 6 March the clerical staff at the National Bank of Pakistan's head office gheraoed the bank and confined the bank's president and managing director to their offices. In the eastern wing the Adamjee Jute Mill and Pakistan Tobacco Company's factory were both gheraoed and the management of both were forced to accept the workers' demands. Strikes and gheraos were multiplying rapidly and this was having a serious impact on the country's economy.

The penultimate blow to the regime was Mujib's decision to withdraw from the second session of the talks. This led to a strike call from the All-Pakistan Students Action Committee which at Dhaka halted all train services and government work in the eastern wing. A reign of terror was unleashed. Police stations were attacked and officials were clubbed to death. A large number of BD members were forced to resign, and others were slaughtered in cold blood, some being burnt to death. Executive authority ceased to exist and anarchy prevailed. The Governor, Monem Khan, faced with a situation totally beyond his control, fled to the security of Islamabad along with his family members. As a final desperate attempt, on 19 March Ayub Khan appointed Dr N. M. Huda and Yusuf Haroon as the new governors of East and West Pakistan. Theirs proved to be the shortest governorships in the country's history — they were to last in their offices for no more than a week.

The final blow to Ayub Khan came from his own constituency, the Army. By March 1969 he had largely lost the confidence of his armed forces. The President, disoriented by a world created by his courtiers, seemed oblivious to the fact that he had damaged his standing within the Army as a result of the Tashkent Declaration, and that the resentment within the officers and ranks had continued to fester. In 1966 he had moved the loyal General Musa Khan from the Army, making him the Governor of West Pakistan. He replaced him as Commander-in-Chief with General Yahya Khan, by-passing a number of more senior generals. It is believed that Yahya Khan was chosen largely for his non-political and non-serious nature, in the hope that he would be content with convivial and suitably alcoholic social evenings. Yahya Khan's long-standing friendship with General Peerzada was clearly overlooked. It has been suggested that it was Peerzada's personal ambitions and his influence on the new Commander-in-Chief that led Yahya Khan to detach himself from the 'Supreme Commander' and assert his own independent position. At the height of the unrest Ayub Khan's request for the imposition of limited Martial Law in the key cities of disturbance was flatly rejected by General Yahya Khan. According to one commentator, Yahya Khan had by now become convinced by his colleagues that by providing unqualified support to the beleaguered President, he might relinquish his own opportunity to exercise supreme power. Yahya Khan and his generals had already begun to enter into political conspiracies with the likes of Bhutto and, as has been suggested by some, Mujib, to prevent the possibility of any consensus emerging between Ayub Khan and the opposition leadership.

The President now faced a situation bordering on total anarchy, which had clearly gone beyond the power of civilian authorities. It had exposed the unreality of his attempt to create political stability through bureaucratic discipline. His claimed desire to prepare people for a democratic life through Basic Democracy proved to be a total failure, largely because of the oppressive methods he had adopted to further his own rule. Even his planned economic development had kindled hatred for him and the public had come to resent the rapid accumulation of enormous wealth by a handful of families. The beginning of his eventual

collapse started with the rigging of the 1965 presidential elections. The 1965 War and the Tashkent Declaration served to add fuel to the growing disillusionment. Charges of corruption and nepotism blackened his reputation. On 25 March the beleaguered President-after eighteen years of being in power, first as a forceful Commander-in-Chief of the Army, then as a dictator—finally decided to throw in the towel, and in complete contravention of his 1962 Constitution, he handed over power to General Yahya Khan and the armed forces."[২৩২]

ছয়

আন্দোলনে লাল-ধারা

"... 'ডাক' নেতৃত্বের অধিকাংশই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে সম্মত হন। কেননা ইতোপূর্বে তারা আলোচনার জন্য যে পূর্বশর্ত আরোপ করেছিলেন, সরকার পরপর সব কিছুই একে একে মেনে নেয়। ৯ তারিখে ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। ঐদিন একটি সরকারি মুখপত্রে ঘোষণা করা হয় যে, ২ দিনের মধ্যে জরুরি আইন প্রত্যাহার করা হবে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কনভেনশন মুসলিম লীগ অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হচ্ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরদের সাথে তার আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিল করার বিষয়টি প্রধান্য পায়। অন্যদিকে, ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যাপক সংখ্যক রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান শুরু হয়। এদিন কেবল ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ১৪৪ জন রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১০ তারিখে চারজন বিশিষ্ট বিরোধী দলীয় নেতা মুক্তি পান। ১২ ফেব্রুয়ারি ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র নেতা রাশেদ খান মেননসহ ৬৫ জন রাজবন্দী মুক্তিলাভ করেন। অন্যদিকে, 'ডাক'-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, শেখ মুজিব সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচনার পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা রইল না। তবে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সাথে 'ডাক'-এর অন্য দলগুলির তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ ৭ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করে যে, শেখ মুজিবকে ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকে তারা যোগদান করবে না। 'ডাক'-এর অন্যান্য দল শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নিষ্পত্তির সাথে সম্পর্কিত বলে অভিমত ব্যক্ত করে। তাদের মতে যার বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে এমন গুরুতর অভিযোগ রয়েছে সেরকম একজন ব্যক্তির মুক্তির দাবিকে এ ধরনের একটি বৈঠকে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপ করা ঠিক নয়। এ প্রশ্নে মস্কোপন্থী ন্যাপ অন্যদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করলেও ঐক্যের স্বার্থে সেটি 'ডাক'-এর অধিকাংশ দলের সাথে অভিন্নতা প্রকাশ করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও তখন সুযোগ বুঝে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ১১ ফেব্রুয়ারি বলেন, ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সাথে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত।

অন্যদিকে, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও তার ন্যাপ দল এ সম্পর্কে তখনও স্পষ্ট কোন অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি। সাধারণভাবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিপক্ষে তারা অভিমত প্রকাশ করতে থাকে। তবে এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মওলানা ভাসানী খুবই শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবতেন এ উপমহাদেশে ভারত এমন একটি রাষ্ট্র, যার অখণ্ড অস্তিত্ব যতদিন বজায় থাকবে ততদিন এ এলাকার কোন দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানে মার্কিন পুঁজি নির্ভর বুর্জোয়াশ্রেণি এমন একটি পর্যায়ে পৌছেছে যে, পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ইত্যাদি এলাকার জাতিসমূহ ও জনসাধারণের বিকাশের পথ রুদ্ধ।

---

[২৩২] Sherbaz Khan Mazari/A Journey to Disillusionment \ [UPL - 2000| p. 141-145]

সে কারণে তিনি একদিকে যেমন চাইতেন পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি ও জনগণের পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ঠিক তেমনই চাইতেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা। আর তাই তিনি যখন দেখতে পান যে, পূর্ব পাকিস্তানে অব্যাহতভাবে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার চরম চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী ধারায় মেরুভূত হয়ে যাচ্ছে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা। একারণেই তিনি আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনকে শ্রেণি-আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে গিয়ে যখন ব্যর্থ হলেন তখনও এ ব্যাপারে আর তার তেমন উৎসাহ থাকেনি। কিন্তু তার উৎসাহ ছাড়াই যখন ছাত্র-জনতার আন্দোলন এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন - সে সময় মওলানা ভাসানী এ আন্দোলনে নিজস্ব রাজনীতির একটি ছাপ রাখার জন্য শেষে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এ পর্যায়ে মওলানার অনুভূতি কি ধরনের ছিল তা বোঝার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ঘটনার সাক্ষী শরদিন্দু দস্তিদার বলেন:

"আসাদ মারা গেছে। ২০ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত ছাত্রদের ব্যাপক অভ্যুত্থান চট্টগ্রামেও হয়েছে। ২৪ তারিখের অভ্যুত্থানের পর আরো কয়েকদিন ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ চলছে। এ পর্যায়ে আইয়ুব গোল টেবিলের আহ্বান জানালো। আমরা গোল টেবিল বর্জন করার কথা বলছি। বিশাল বিশাল মিছিল করছি। পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসলো ছাত্ররা যা করার করলো, কিন্তু এরপর কি। গোল টেবিল বৈঠকের প্রশ্ন এমন একটি সময়ে এসেছিল যে, সে সময় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে দু'টি প্রশ্নই আসতে পারতো–এক, ১১ দফা মেনে নেওয়া, আর দুই, শেখ মুজিবের মুক্তি। ১১ দফা এমন একটি কর্মসূচি ছিল যার বাস্তবায়ন পুরো আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলানোর সাথে সম্পর্কিত ছিল; আর 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' ব্যাপারটি এমন আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যে, শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করা মানেই আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ানো। আর আন্দোলন সফল হওয়ার অর্থই শেখ মুজিব এবং তার দেওয়া ৬ দফা কর্মসূচির সামগ্রিক বিজয়। এসব নিয়ে আমরা উভয় সংকটে রয়েছি। এমন একটি সময়ে মওলানা ভাসানী চট্টগ্রাম গেলেন। গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত দু'টি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে এসে আমাকে ডাকালেন।... মওলানা আমাকে বললেন, 'আমার কাজতো আমি করলাম। তোমরা তো কেন্দ্রীয় কমিটির। তোমরা কি ক্ষমতা দখল সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?' আমি চুপ করে আছি। কিছু বলতে পারছি না। মওলানা বললেন, 'চুপ করে আছ কেন। তাহলে কি তোমরা ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত নও'? আমি বললাম, 'মুভমেন্টতো একটা হল। সামনে মিটিং আছে। বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।' মওলানা বললেন, 'বুঝলাম। ধন্যবাদ'।

বলাবাহুল্য, শরদিন্দু দস্তিদার ছিলেন তৎকালীন গোপন চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ইপিসিপি(এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সে যাহোক, শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে এ আলোচনার পরই মওলানার কথাবার্তা আর বক্তৃতার ভাষা পাল্টে যায়। সেদিনই তিনি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের এক বিশাল জনসভায় সরাসরি আইয়ুব সরকারকে উৎখাতের আহ্বান জানালেন এবং পুলিশের গুলীতে নিহত একজনের লাশ নিয়ে এমন জঙ্গি মিছিল করলেন যে, তাতে চট্টগ্রামের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। অর্থাৎ শরদিন্দু দস্তিদারের সাথে আলাপ করে মওলানা যখন বুঝলেন যে, কমিউনিস্টরা যতই সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলুক, তাদের ক্ষমতা দখলের কোন পরিকল্পনা নেই, তখন ভাসানী আর বসে থাকেননি। শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি আপোসহীন সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

যে সময় সমগ্র পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের মানুষ এক মরিয়া আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সে সময় পিকিংপন্থী গোপন কমিউনিস্ট পার্টি কি ধরনের কাজে অবতীর্ণ ছিল সে সম্পর্কে আর একজন কেন্দ্রীয় নেতার অভিজ্ঞতা এখানে উদ্ধৃত করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।

তৎকালীন ইপিসিপি (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী সদস্য এবং পিকিংপন্থী ন্যাপের খুলনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

'দেশে তখন ছাত্ররা তাদের কালো দিবস, শপথ দিবস ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন করছে। পার্টির (ইপিসিপি-এম-এল) জেলা কমিটির মিটিং ছিল সেদিন। আমরা ভোর থেকে বসে সারাদিন মিটিং করলাম। আলোচনার বিষয় ছিল চারু মজুমদারের লাইন গ্রহণ করা হবে কি হবে না। এ নিয়ে সারাদিন আমরা তীব্র বিতর্ক করলাম। গোটা জেলা কমিটির সদস্য সেখানে উপস্থিত। তার অর্থ জেলার সকল নেতাই আমরা মিটিং-এ। সন্ধ্যার সময় মিটিং সেরে যখন আমরা বের হচ্ছি তখন দেখি অন্তত ১০ হাজার শ্রমিক আমাদের সামনে দিয়ে উগ্র শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এত বড় মিছিল যে খুলনার শ্রমিকরা সরকারের বিরুদ্ধে করতে পারে এ ধারণাই আমাদের তখন ছিল না।'

এ দুটি ঘটনা থেকে একথা খুব পরিষ্কার যে, যখন দেশের সমগ্র জনতা এক মরণপণ সংগ্রাম অবতীর্ণ হয়েছে তখনও পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন নেতা বিদ্যমান বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিহীন সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছেন॥"[২৩৩]

সাত

'৬৯-এর দুই প্রতীক : শহীদ আসাদ এবং মতিউর'

০১.

গণআন্দোলন ও শহীদ মতিউর

"... আগে থেকেই চলা গণ-আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছিল জানুয়ারির বিশ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ছাত্রসমাজ। সাথে যোগ দিল সর্বস্তরের মানুষ। মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে আন্দোলন যে আরো বেগবান হবে, তা তো জানা কথা। তাহলে ওই পুলিশ অফিসারটি 'খুব কাছ থেকে রিভলবার উঁচিয়ে' একজন ছাত্রের বুকে গুলি ছুড়ল কেন? এটা কি কোনো আকস্মিক ঘটনা বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ? গণ-আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, এ ধরনের ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে না। আন্দোলনের চাপই প্রতিপক্ষের হিসাব গুলিয়ে দেয়। তারা এমন উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয় যা আখেরে আন্দোলনের পক্ষেই সঞ্চয় হিসাবে কাজ করে। যদি আন্দোলনে জনসমর্থন থাকে, যদি দশের আকাঙ্ক্ষা আর মতি আন্দোলনের সাথে একাকার হয়, তাহলে এরকমই ঘটার কথা। আসাদ ওই আন্দোলনের সক্রিয় 'কর্তাপক্ষ' ছিলেন। মৃত্যুর সম্ভাবনার মধ্যেই ছিলেন। যেমন ছিল আরো অনেকে। মৃত্যু তাঁকে পরিণত করল আন্দোলনের প্রতীকে। সহসা তিনি হয়ে উঠলেন বিশেষ। মৃত্যু তাঁকে আলাদা করে দিল।

মতিউরের বাবা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মতিউর বিশ জানুয়ারি ঘটনাস্থলে ছিলেন। দূর থেকে এ হত্যাকাণ্ড তিনি দেখেছেন। বাসায় গিয়ে ঘটনার বিবরণও দিয়েছেন। শহিদ আসাদের জানাজা আর মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। আর, তাঁর বাবার ভাষ্য-মোতাবেক, সেদিনই বইপুস্তক বেঁধে ড্রয়ারে তালাচাবি দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, লেখাপড়া আর নয়। এখন অন্য কাজের সময়। এ ধরনের ক্ষেত্রে অন্য বাবা-মা যা করেন, মতিউরের বাবা-মাও তা-ই করেছিলেন। ছেলেকে চোখে চোখে রাখছিলেন। কিন্তু যে নিজের কাজ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে আর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে তো আটকে রাখা সম্ভব নয়। চব্বিশ জানুয়ারি মতিউর ঠিকই যোগ দিয়েছে ক্রমশ অগ্নিকুণ্ড হয়ে ওঠা সেই মিছিলে। তারপর আর ফেরেনি।

(তৎকালীন *আজাদ পত্রিকায়* গণঅভ্যুত্থান নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ।)

চব্বিশ জানুয়ারি ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা হরতাল। পুরো ঢাকা শহর ছিল মিছিল আর বিক্ষোভের নগরী। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলন চলছিল। কিন্তু যে কোনো গণ-আন্দোলন তুঙ্গ মুহূর্তে সবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন কাঠামো ভেঙে পড়ে।

---

[২৩৩] লেনিন আজাদ/উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০১৯। পৃ. ৫৯৪-৫৯৭]

নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ টুটে যায়। ওইদিনও তা-ই হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত জনতা মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দিল। সরকার-দলীয় নেতাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। পুড়িয়ে ছাই করে দিল সরকারি বার্তাবাহক পত্রিকার অফিস। পুলিশও হয়ে উঠেছিল বেপরোয়া। যত্রতত্র গুলি চলছিল। সেই গুলিতেই নিহত হলেন মতিউর। মতিউরদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণেই গণ-আন্দোলন জোরদার হচ্ছিল। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন রূপ নিল গণ-অভ্যুত্থানের। চব্বিশ জানুয়ারির সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতীকী প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন মতিউর।

কিন্তু মতিউর কেন? ইতিহাস বলছে, সেদিন মতিউর ছাড়াও নিহত হয়েছিলেন মকবুল, রুস্তমসহ আরো কেউ কেউ। রুস্তমের বাবা জানাচ্ছেন, তাঁকে খবর দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, গুরুতর আহত মতিউরকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তিনি সেখানে গিয়ে রুস্তম, মকবুল ও আলমগীরের লাশ দেখলেন। কিন্তু মতিউরকে পেলেন না। মতিউরের লাশ তখন পল্টন হয়ে শহিদ মিনার হয়ে চলে গেছে জহুরুল হক হলে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জিম্মায়। কেন কেবল মতিউরের লাশ আনা হল, তার তাৎক্ষণিক নানা কার্যকারণ থাকতে পারে। সেগুলো হয়ত ঠিকমতো আর কখনোই জানা যাবে না। কিন্তু কিছু অনুমান করা যেতে পারে, ইতিহাস-পাঠের দিক থেকে যেগুলোর হয়ত বিশেষ মূল্য আছে। কম বয়স সম্ভবত মূল কারণ নয়। কারণ, ওইদিন মৃত আরো কেউ কেউ কম বয়সী ছিলেন। তবে মতিউর যে ছাত্র ছিলেন, সে তথ্য সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

তখনকার বাংলাদেশে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বিকাশের সেই অপরিণত অবস্থায়, ছাত্র বর্গটির বিশেষ মূল্য ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে 'ছাত্রের মৃত্যু' বর্গটি বিশেষভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। উনসত্তরেও 'কিছুদিনের জন্য হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। নবকুমার ইনস্টিটিউশনের ছাত্র হিসাবে মতিউর হয়ত বাড়তি মনোযোগ পেয়ে থাকবেন। এর মধ্যে অবশ্য এক ধরনের শ্রেণি-পক্ষপাতের ব্যাপার আছে। জাতীয়তাবাদী বয়ান শ্রেণিবৈশিষ্ট্যের ব্যাপারগুলো সাধারণত রেখে-ঢেকে রাখে। মতাদর্শিক আবেগের প্রাবল্যে শ্রেণি-পার্থক্যের দিকটা অংশত চাপা পড়ে যায়। কিন্তু পক্ষপাতের ব্যাপার যে জোরালোভাবে থাকেই, তার ঘোরতর প্রমাণ মেলে খোদ উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের বিবরণীতে। এ সংগ্রামে বিপুল পরিমাণ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই শ্রমিক ও গতরখাটা মানুষ। কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিয়ে উদযাপন করি সাকুল্যে যে কয়জনের মৃত্যু, হয়ত কাকতালীয় নয়, তাঁদের সবাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্তরের অংশ। ক্ষমতাসীনদের শ্রেণি-সহানুভূতি এর প্রধান কারণ। অন্য জোরালো কারণও আছে। কৃষক আর শ্রমিক শ্রেণি হিসাবে নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেই দেখতে পায়। ছাত্রত্বই মূলত এই দুই শ্রেণির সংযোগস্থল। তাই ছাত্রদের ব্যাপারে ওই শ্রেণির একটা সহমর্মিতা থাকাই স্বাভাবিক।

মতিউরের ক্ষেত্রে অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই অন্য বাস্তবতা ছিল। তখনকার বহু মিছিলে মতিউর ছিলেন সামনের সারিতে। নেতৃবৃন্দের কারো কারো সাথে যে তাঁর অল্পবিস্তর জানাশোনা ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই বাস্তবতা যদি তাঁর মৃত্যুকে অধিকতর আবেগাকুল করে তুলে থাকে, অবাক হওয়ার কিছু নাই। এভাবেই হয়ত তিনি সেদিনের অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থানের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে শেষ আনুকূল্য জুগিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তৎকালীন ইকবাল হলে সমবেত হাজারো ছাত্রজনতার সামনে তিনি বলেছিলেন, 'মতিউরের শাহাদাতবরণে আমি গর্বিত। গর্বিত এ-কারণে যে, সে এদেশের স্বাধিকার ও মুক্তির চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আমার চোখের সামনে। এক মতিউরকে হারিয়ে আমি হাজার মতিউরকে পেয়েছি! সেইদিন বেশি দূরে নয় যখন এদেশের ছাত্রসমাজই এই দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে।' মতিউরের পিতা আজহার আলী মল্লিকের জন্য, অনুমান করা যায়, সময়টা বক্তৃতার উপযোগী ছিল না। ছাত্রনেতাদের কেউ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেও থাকতে পারেন। হয়ত তিনি কথাগুলো ঠিক এভাবে বলেননি। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতাদের সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, তিনি মোটের উপর এই কথাগুলোই বলেছেন। বলতেই হয়,

সম্ভাব্য সবচেয়ে জরুরি কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। সময়ের প্রচন্ড-চাপই তাঁকে দিয়ে কথাগুলো বলিয়ে নিয়েছিল। এই সময়ই গড়ে তুলেছিল একজন মতিউর রহমান মল্লিককে।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে মতিউরের জীবনীগ্রন্থ কিশোর শহীদ মতিউর রহমান। আখতার হুসেন প্রণীত বইটি বেশ পরিকল্পিত। অন্য জীবনীগ্রন্থগুলোর সাথে এর একটা প্রকট পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে জীবনীগ্রন্থে ব্যক্তির বিবৃতি যতটা প্রাধান্য পায়, এ বইতে ততটা নাই। একজন কিশোরের জীবনের কী তাৎপর্যের কথাই বা পাঠকের জানার আর লেখকের জানানোর থাকতে পারে? স্বভাবতই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন ওই সময়কে। আঁকতে চেয়েছেন মুহূর্তটিকে, যার মধ্যেই কেবল কিশোর মতিউর বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে বসতে পারেন চালকের আসনে। লেখক ঠিক কাজটিই করেছেন। জীবনীগ্রন্থে ব্যক্তি অযাচিতভাবে প্রাধান্য পায়। ব্যক্তির কোনো বিশেষ মুহূর্তের কাজ বা অবদান বিচার করার সময় আমরা সাধারণত ব্যক্তিজীবনের পূর্ব-ইতিহাসের খবর নিই। বুঝতে চাই, কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যক্তি ওই বিশেষ অবদান রাখতে পারল। এ ক্ষেত্রে অবজেক্টিভ কনডিশন বা পরিস্থিতিকে আমরা সাধারণত কম মূল্য দিই। ব্যক্তি সম্পর্কে এ এক প্রভাবশালী মিথ বা কুসংস্কার। ব্যক্তি সময়ের বিচিত্র প্রভাব আর চাহিদা থেকে অতটা মুক্ত কোনো অস্তিত্ব নয়। বলা যায়, তার কর্তাসত্তা আসলে সামষ্টিক কর্তাসত্তার অংশ হিসাবেই কাজ করে। ব্যক্তির মধ্যে কখনো কখনো ইতিহাসের চাহিদা বা দায় বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। মতিউরের জীবনী এ সত্য আমাদের বিশেষভাবে বুঝতে দেয়। নিতান্ত কিশোর বয়সে মারা গিয়েছিলেন বলেই ব্যক্তিজীবন-ভজনার প্রচলিত রেওয়াজ থেকে তিনি অনেকটা মুক্ত থেকেছেন। আমাদের বুঝতে দিয়েছেন, অন্য জীবনীগুলোতেও সময়ের-সমষ্টির অংশ আসলে যতটা লেখা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি।

কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মতিউর হাওয়া হয়ে যান না। তাঁর নিজের প্রস্তুতিও উল্লেখ করার মতো। প্রস্তুতিটা তিনি নিয়েছিলেন সময়ের আহবানে সাড়া দিতে গিয়ে। সিদ্ধান্তটা নিজেকেই নিতে হয়েছিল। নিজেকে বদলাতে হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক সূত্র বলছে, মতিউর মনোযোগী আর নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। অকারণে বাসা থেকে বের হতেন না। মতিউরকে কিছুটা চিনতেন এমন একজন রাজনীতিক জানাচ্ছেন, পোস্টার লাগাতে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অনীহা ছিল। প্রথম প্রথম মিছিলে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্রুত তাঁর সিদ্ধান্তের বদল হয়। তিনি হয়ে ওঠেন মিছিলের সামনের সারির লড়াকু সৈনিক।

এ পরিবর্তনটাকে পুরোপুরি নাটকীয় পরিবর্তন বলা যাবে না। বেশ বোঝা যায়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আর তৎপরতার সাথে তাঁর এক ধরনের সংযোগ ছিল। তা না হলে মিছিলে যাওয়া বা পোস্টার লাগানোর কথা উঠত না। এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল। বিশেষভাবে ছিল স্কুলে। তাঁর এক সহপাঠী জানাচ্ছেন, নবকুমার ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররা তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে নিয়মিত যোগ দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায়ই স্কুল-প্রাঙ্গণে উত্তপ্ত বক্তৃতা দিতেন, আর বক্তৃতার পর ছাত্ররা প্রায়ই ক্লাস বর্জন করে রাজপথে স্লোগান দিতে দিতে শহর পরিক্রমণ করতেন। মতিউর নিঃসন্দেহে এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিতে হয়েছে নিজেকেই। মৃত্যুর পর তাঁর পকেটে যে চিরকুট পাওয়া গেছে তাতে লেখা ছিল, 'প্রত্যেক মানুষকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। ... আজ হোক কাল হোক একদিন যেতে হবে।' অকুতোভয় কিশোরের এ এক বিস্ময়কর উপলব্ধি। যদি এ চিরকুট না-ও পাওয়া যেত, তবু আমাদের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হত না যে, তিনি প্রয়োজনে জীবনদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তা না হলে কেউ ওরকম পরিস্থিতিতে মিছিলের অগ্রসৈনিক হিসাবে আবির্ভূত হয় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মতিউর নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত আর সক্রিয় কর্তাসত্তার ঘোষণা দিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

ইতিহাসের নায়ক হিসাবে মতিউর খোদ ইতিহাসপাঠেরই দিক-নির্দেশনা দেন। তিনি আমাদের গণ-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সচেতন করেন। কোন পরিস্থিতি বিপুল

মানুষের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে বড় পরিবর্তনকে সম্ভবপর করে তোলে, সে দিকে নজর ফেরাতে উৎসাহিত করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রভাবশালী বয়ানগুলোতে প্রায়ই লেখা হয়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আপামর জনতার বিপুল অংশগ্রহণ ছিল। জাতীয়তাবাদী আবেগের ভিত্তিতেই সাধারণত এ বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা হয়। এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনকও নয়, পর্যাপ্তও নয়। মহাশ্বেতা দেবী একবার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাস পড়তে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ইলিয়াসের উপন্যাসে তিনি সেই আমজনতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁরা একাত্তরের বিজয়কে সম্ভবপর করেছিল। এ মন্তব্য নিগূঢ়ভাবে সারবান। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই কেবল সাধারণ মানুষকে লড়াকু সৈনিকে বদলে দিতে পারে। ঊনসত্তরের বাংলাদেশ সেই সোনালি সময় উদযাপন করেছে। চেনা মানুষগুলো অচেনা হয়ে সম্ভবপর করেছে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মুহূর্ত। কিশোর শহিদ মতিউর সেই প্রক্রিয়ারই ফসল, আবার একই সাথে সে প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান নির্মাতা৷"[২৩৪]

০২.

শহীদ আসাদ : ব্যক্তি ও পরিবার

"... যোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তানই ছিলেন আসাদ। শহীদ আসাদের পিতা আলহাজ্ব মৌলভী মোহাম্মদ আবু তাহের অত্র এলাকার এক কিংবদন্তী পুরুষ। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি একজন বিশিষ্ট আলেম। এতদঞ্চলে তাহের মৌলভী নামে তিনি সমধিক পরিচিত। আসাদের পিতার পরিচয় ছাড়া আসাদকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই সেদিন (৩০ অক্টোবর, ১৯৯২) আসাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম আসাদের বাবার সাথে সাক্ষাত করার জন্য। মসজিদ সংলগ্ন পাকা বৈঠকখানার খোলা বারান্দায় বসে মাত্র আধ ঘন্টা সময় পেয়েছিলাম তাঁর সাথে কথা বলার। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের কথা স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করা উনি জীবনে অসম্ভব। এই বিরানব্বই বছর বয়সেও মনে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন যুবকের মতই তেজীয়ান।

বৃটিশ ভারতে তখন মুসলমানদের চরম দুরাবস্থার দিন। শিক্ষা দীক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, ইংরেজ হটাও, অসহযোগ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এমনি এক অবস্থার মাঝে থেকে তিনি ১৯২২ সালে মেট্রিক, ১৯২৫ সালে জমাতে উলা, ১৯২৭ সালে ইন্টারমেডিয়েট এবং ১৯৩২ সালে ডিসটিংশন নিয়ে বি.এ পাশ করেন। সে সময় উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান যুবকের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বহু লোভনীয় সরকারী চাকুরী তিনি অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষকতা, তথা "মানুষ গড়ার কাজ" কে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে মুসলমান ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজকে জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হিসেবে কাঁধে তুলে নেন। বি.এ পাশ করার অব্যবহিত পরেই যে ব্রত পালনে নিজকে নিয়োজিত করেছিলেন একটানা সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে ১৯৭২ সালে শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায়ই ১৯৩৮ সনে তিনি বি.টি পাশ করেন। শিমুলিয়া ও পোড়াদিয়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা শেষে ১৯৪০ সনে নবপ্রতিষ্ঠিত হাতিরদিয়া হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৮ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্কুলটিকে গড়ে তোলেন। এই হাতিরদিয়াতেই ১৯৪২ সনে ১০ই জুন তারিখে আসাদ জন্মগ্রহণ করেন। আসাদের শৈশব কেটেছে হাতিরদিয়ায় - কর্মজীবনের বিচরণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছে এই হাতিরদিয়ারই মাটিতে। ১৯৪৮ সনে মৌলানা সাহেব হাতিরদিয়া ছেড়ে নিজ বাড়ি সংলগ্ন শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এই স্কুল থেকেই তিনি মেট্রিক পাশ করেছিলেন, অতপর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই তার কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য আসাদও এই স্কুল থেকেই মেট্রিক পাশ করেন।

[২৩৪] মোহাম্মদ আজম/ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা : ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও শহিদ মতিউর৷ [প্রথম আলো - ৪ নভেম্বর, ২০১৬]

... আদর্শ মানুষ গড়তে হলে নিজে আদর্শ হতে হবে তিনি ছিলেন এ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই সারা জীবন শুধু নানা আদর্শেরই অনুশীলন করেছেন। জীবনে তিনি কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি, মিথ্যা লিখেননি, এমন কি 'ব্যাক ডেইটে' সই পর্যন্ত করেননি। জীবনে ধূমপান করেননি, দাড়িতে ক্ষুর লাগাননি, নামাজ কাযা করেননি, লেইট ওয়াক্তে নামাজ পড়েননি, পারতপক্ষে জমাতে নামাজ পড়া ছাড়েননি, বেলা উঠার পর ঘুম থেকে উঠেননি। অতিভোজন করেননি। জীবনে সুদখোর ও ঘুষখোরের বাড়িতে বা বে-নামাজীর বাড়িতে পানি বা পান পর্যন্ত খাননি। আজীবন সত্য ও সততার প্রশ্নে ছিলেন পাহাড়ের মত দৃঢ় ও আপোষহীন। 'সরল জীবন যাপন ও উচ্চ আকাঙ্খা পোষণ', এবং 'ধর্মহীন শিক্ষা শয়তানী শিক্ষা'-এই দুটো শ্লোগান ছিল তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের জীবনের 'মটো'। তাঁর স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের মাথায় টুপি পরা ও জামাতে জোহরের নামাজ আদায় করা ছিল বাধ্যতামূলক।

সাহিত্য চর্চা ও খেলাধূলায় তিনি খুবই আগ্রহী। ভাল ফুটবল খেলোয়ার হিসেবে তিনি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাল্য বন্ধু সহপাঠী কবি বেনজীরের সাথে প্রতিগৌতার ভিত্তিতে কবিতা লিখতেন ও একসাথে ফুটবল খেলতেন। সে কালে বেনু-তাহের জুটি ফুটবল খেলার অঙ্গনে খুবই প্রিয় নাম ছিল। তিনি দুনিয়া, নামায, আযান, ইত্যাদি উচ্চ ভাবধারার অনেক কবিতা রচনা করেছেন, পাঞ্চ সূরা ও আমপারার কবিতানুবাদ ও বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ করেন। নেয়ামুল হাদীস, এশকে এলাহী ও সালাতুল আশেকীন পুস্তক রচনা করেন। 'শহীদ আসাদ' নাম করনে একটি বই লিখেন। পৃষ্ঠপোষতা ও প্রেরণার অভাব, সর্বোপরি সীমিত আয় ও দারিদ্রের কারণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর স্ফুরিত প্রতিভার প্রকাশ ঘটেনি।

বর্তমান অবসর জীবনে তিনি তাসাউফের গহীন ক্ষেত্রে বিচরণ করছেন। নামায ও নফল এবাদাত অজিফায় কাটান দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়। জীবনের প্রতিটি কাজ নিয়ম ও রুটিনে বাধা এখনও সেই আগের মত। হক্কুল এবাদের (বান্দার হক) ব্যাপারে সুক্ষ হিসেবী, কথা বার্তায় ও আচরণে সংযত। নিজের প্রাণ প্রিয় সন্তান আসাদকে 'শহীদ' বলা যাবে কিনা এ নিয়েও তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল বহুদিন। তাঁর কথায় আসাদ ছিল ঈমানদার ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে আসাদ প্রাণ দিয়েছে। মহানবী (সঃ)-এর হাদীস- 'আপনার অধিকার রক্ষায় যারা মৃত্যুকে বরণ করে, তারাও শহীদ।' তাই উক্ত হাদিসের আলোকে এবং ঈমানের হালতে অত্যাচারীর গুলিতে নিহত আসাদকে শহীদ বলা যায় বলে তিনি এখন মনে করেন।

... ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তিনি 'নেজামে ইসলাম' অঙ্গদল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অপর অঙ্গদলের বিতর্কিত প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। এসময়ে নির্বাচনের সর্বস্তরে কূটনীতি, মিথ্যাচার ও মোনাফেকীর চরম অনুশীলন দর্শনে এহেন রাজনীতির প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তাঁর অন্তর বিদগ্ধ হয় এবং সক্রীয় রাজনীতি পরিহার করে জনসেবায় মনোযোগ দেন। শিক্ষা, ন্যায়নীতি এবং পরহেজগার খাঁটি মুসলমানী জিন্দেগী এই ছিল জীবনের আদর্শ। পর্দার ভিতর থেকে নারী শিক্ষার তিনি পৃষ্ঠপোষক। নিজের বিবি, শহীদ আসাদের মাতা ছিলেন নারায়ণগঞ্জ আই,ই,টি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। তাদের দুই কন্যা উভয়েই বোরখা পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাশ করেন, যা এক বিরল উদাহরণ। শিবপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা করেন। তার পরিবারের সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। বর্তমানে (৩ বছর যাবত) তিনি বাড়ির ১০০ বছরের পুরানো ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ২০ জন ছাত্রের একটি আবাসিক হাফেজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন। মাদ্রাসা ঘরটিকে একটি বিল্ডিং-এ পরিণত করা এবং ইহাকে ৪০ জন ছাত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক হাফেজিয়া মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করে যাওয়াই তার একমাত্র অন্তিম ইচ্ছা। বাড়িতে দিবা-রাত্র কচিকণ্ঠের কোরান তেলাওয়াত এবং বাড়ির পাশে জামে মসজিদে গ্রামবাসী ও ছাত্রদেরকে নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত জমাতে নামাজ আদায়ের মধ্যেই তিনি জীবনের সবচেয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি পান বলে প্রকাশ করেন। তাই ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলে-মেয়েদের সান্নিধ্যে বৃদ্ধ বয়সে একটু আয়েসের মোহ ছেড়ে গ্রামে নিজ বাড়িতে থাকতেই তিনি বেশী পছন্দ করেন।

... ১৯৬২ সালে আসাদ সিলেট এম সি কলেজে আইএ ক্লাশে পড়ত। তখন হতে সে তাঁর জীবনের বহু কথা তাঁর দৈনন্দিন ডায়েরীতে লিখে রাখতো। তারই কতক এখানে অবিকল উদ্ধৃত করা হলো :

'আমার জীবন নাট্যে যে সকল দৈনন্দিন ঘটনা ঘটবে তাই লেখার মানসে আমার এই বইখানা।'

ইতি-

এ, এম, এ, জামান

১-১-১৯৬২

(১) বিগত কয়েকদিন যাবত সূর্যোদয়ের পর আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিতেছি। পিতা আমার উপর সব সময় ভরসা করিয়া আসিতেছেন আমি নাকি সূর্যোদয়ের আগে উঠি এবং নামাজ কাযা করি না। কিন্তু হায়, আমি নরাধম পিতার ইচ্ছাকে আমি বাস্তবে রূপ দিতে পারিতেছি না, যদিও নামাজ কদাচ আমি ত্যাগ করি না। সূর্যোদয়ের আগে আমি ঘুম হইতে উঠিতে পারি না। জানিনা রাহমানুর রাহিম আমার উপর সন্তুষ্ট কিনা?

(২) মানুষ ভাবে এক, কিন্তু করে আরেক। নতুবা যে মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ববোধ পাকাপাকিভাবে শিকড় গাড়িয়াছে তাহার মনে আসিবে কেন অপকাজের চিন্তা। যে মন আমার স্বচ্ছ পানির ন্যায় গণ্ডানিমুক্ত ছিল, সে মনে পরনারীর প্রতি চাহিবার লোভ-লালসা কেন? যে আধুনিক নারীকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না তাদের প্রতি বারে বারে ফিরে তাকাই কেন? অবশ্য জানি এটা আমার ক্ষণিকের দুর্বলতার সুযোগ, আমার মোহ। আমার বিবেকই আমাকে সজাগ করিয়া দেয়। কিন্তু আমার এই মোহ আসে কেন? আমার মনটাকে সব সময় দাবাইয়া রাখিতে পারি না? জানি, ইহার উত্তর লক্ষজনের মধ্যে একজনও দিতে পারিবে না। কারণ তারা আমার চেয়ে আরও বেশী নারীদের প্রতি মোহাসক্ত। আর হবেই না বা কেন? যেভাবে তারা আধুনিকতার আস্তর মেখে পুরুষদের চোখের সামনে চলাফেরা করে তাতে যে কোন যুবক তাদের প্রতি মোহাসক্ত হবে তাতে আশ্চর্য কি? সত্যই আশ্চর্য আজকের আধুনিকারা, কিভাবে তারা চক্ষু লজ্জা হারাইয়া ফেলিয়াছে। পাশ্চাত্যের আধুনিকতার ছাপ তাদের প্রতি স্তরে স্তরে লক্ষিত হয়। আমাদের যে ব্যক্তিগত কৃষ্টি সভ্যতা আছে তারা সবই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আজকের Musical chair-এ যে নাট্যের অবতারণা হইয়াছে তা আর কি বলব। জানি না তারা কি করে এতগুলি লোক চক্ষুর সম্মুখে এভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পারল। এই দুস্কৃতির কি একদিন অবসান হবে না? (১৭-১-১৯৬২)

(৩) মানুষ অমর নয়। একটা নির্দিষ্ট সময় এই পৃথিবীতে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া তাহাকে আবার পাড়ি জমাইতে হইবে পরপারে। যে সকল লোক এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীকেই সবকিছু মনে করিয়া এই পৃথিবীর আমোদ আহলাদে লিপ্ত তাহাদের জন্য অনন্তকালের জগৎ সুখের হইবে না। এই পৃথিবী কর্মের স্থান। যে এখানে ভাল করিবে পরপারে সে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। কিন্তু যে শুধু আমোদ আহলাদেই লিপ্ত থাকিয়া পৃথিবীকে রঙ্গীন মনে করিয়াছে, অনন্তকাল তাহারা দুঃখ ভোগ করিবে। বিধাতা যে কর্মনির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, পৃথিবীর মহামানবগণ সে পথে করিয়াছে গমন। সেটাই আমাদের শ্বাশত সত্য পথ। সেইটা ধরিয়া অগ্রসর হইলে আমরা অনন্তকালের সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু এই স্বল্পকালের পৃথিবীকেই সবকিছু মনে করিয়া যাহারা নানা পাপাচারে লিপ্ত থাকে তাহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করিবে।

তাই পৃথিবীর এই আমোদ-আহলাদকে বর্জন করিয়া আমি শাশ্বত সত্য বাছিয়া লইয়াছি। কিন্তু মাঝে মাঝে অবুঝ মন এই পৃথিবীর রঙ্গরসে লিপ্ত থাকিবার জন্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু শার্দুল হয়ে বিবেক মনকে বশে আনিয়া ঠিক পথে চালিত করি। কিন্তু জানি না আমি ঠিক পথে চলিয়াছি কিনা।(২০-১-১৯৬২)

(৪) আজ পবিত্র দিনের শুভ প্রভাত। ইসলামের আর একটি পবিত্রময় দিন আজ। আজিকার রাত্রিতে যে এবাদত বন্দিগীতে আল্লাহর নামে রাত্রি অতিবাহিত করিবে তাহার অশেষ পূণ্য হইবে। কিন্তু আমি অভাগা

পাপী ব্যক্তি এই পবিত্রময় দিনটিকে এবাদত বন্দিগীতে অতিবাহিত করিতে পারি নাই। জানি না কি বড় পাপ করিয়াছি? যাহার ফলে আজকের রাত্রে শাহজালালের দরগায় গিয়া পবিত্র মাজারে বসিয়াও আমার মন খোদার দিকে ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। তদুপরি আমার চক্ষু হইতে এক ফোঁটা পানিও বাহির হয় নাই। জানি না মহান পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালা আমার ভাগ্যাকাশে আজ রাত্রিতে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, খোদা আমার উপর বিমুখ হইলে আমার স্থান কোথায় দাঁড়াইবে। আজকের রাত্রিতে যে কতক্ষণ এবাদতে ছিলাম নানা চেষ্টা করিয়া আমার কলবকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে রুজু করিতে পারি নাই। খোদা তাঁর এই পাপী বান্দাকে মাপ করুন। (২২-১-১৯৬২)

(৫) আজকের রাত্রি নিশীথে উঠিয়া আল্লাহতালায় এবাদতে মশগুল থাকিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি অভাগা রাত্রিতে দূরে থাকুক সূর্যোদয়ের আগে ঘুম হইতে উঠিতে পারি নাই। নামাজ পড়িয়াছি ৮-৩০ মিনিটে। জানিনা আমার পাপের বোঝা দিন দিন কি পরিমাণ বর্ধিত হইতেছে। খোদা এ পাপীকে মাফ করুন। সৎ রাস্তায় আমার জীবনকে পরিচালিত করুন। করুণাময়ের কাছে এই প্রার্থনা। সমস্ত দিনটা আমার কি করিয়া কাটিয়া গেল আমি নিজেও বলিতে পারিব না। বেলা ১টা কোন দিক দিয়া হইয়া গেল কিছুই বলিতে পারি না। দুপুরটা ঘুমাইয়া কাটাইলাম। বিকালে ডিএফও'র বাসায় গিয়া আড্ডা দিয়া রাত্রি ৯ টায় বাসায় ফিরিলাম। এখন হইতে যদি আমি এইরূপ পড়াশুনা করি তবে আমার অদূর ভবিষ্যতে যে মন্দ তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি কিন্তু পড়িতে বসিলেই আর পড়াতে মন বসেনা কেন? কি করিব। আমি নিজেই জানিনা।(২৩-১-১৯৬২)

(৬) ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানুষকে কুপথ হইতে সুপথে আনিবার জন্য, মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য, জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য, স্বর্গীয় সুখ পাবার জন্য, সৃষ্টি কর্তাকে চিনিবার জন্য, পরপারে অনন্ত সুখ পাবার জন্য ইসলামের আগমন। কলুষতার স্পর্শ নেই ইসলামে। ইসলামে নাই পৃথিবীর রঙ্গিন নেশায় মজিবার স্পৃহা। পৃথিবীর নাট্য মঞ্চে যে রূপের হাট বসেছে তাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের স্থান নেই। আরাম আয়াসের স্থান পৃথিবীতে নেই- একথা আমি বলছিনা, কিন্তু মুসলমানদের উচিত আরাম আয়াসকে বর্জন করা। কারণ আরাম আয়াসই মানুষের মনকে নানা দিকে প্রলুব্ধ করে, পৃথিবীর রঙরসে মনকে আকৃষ্ট করে। এই পৃথিবীই যে সব নয় তাহাকে অন্য এক জগতে যাইতে হইবে, সেখানে তার কর্মকে পুংখানুপুংখরূপে হিসাব করা হইবে। কিন্তু হায়, মানুষ এ কথা ভুলিয়া গিয়া পৃথিবীতে মজিয়াছে।(২৫-১-১৯৬২)

(৭) মানুষের পরিণতি কোথায়? এই কি তাহার শেষ স্থান? সে কি জানে না এই রঙরসের স্থান দুই দিনের। পরপারের ডাকে তাকে একদিন সারা দিতেই হইবে। কিন্তু মানুষ পৃথিবীর এই রঙ্গরসে মজে ভুলিতে বসিয়াছে সেই কথা। পাশ্চাত্যের বুলি আওড়িয়ে তাহারা ভুলিতে বসিয়াছে তাহাদের নিজস্ব ধর্মকে। সত্যই দুঃখ লাগে এই মুসলিম সমাজের জন্য তাহারা নিজেদের ধর্মকে খুইয়ে পৃথিবীর আমোদ-আহলাদে, পাশ্চাতের নির্লজ্জ পারিপার্শ্বিকতায় নিজেকে মজিয়েছে।(২৬-১-১৯৬২)

(৮) আমাদের দেশের লোকেরা শিক্ষিত হইয়া কোন্ পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে তাহা আজ প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করিলাম। শিক্ষিত হইয়া তাহাদের ধর্ম বিশ্বাসকে হারাইয়া, নৈতিক চরিত্রকে হারাইয়া আজ কোন্ পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে তাহাও দেখিলাম। .....সাহেবকে যদিও আমি জানি, সে নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, ধর্মের কোন বিধি নিষেধই মানিয়া চলে না। কিন্তু তাহার যে এতটুকু অধঃপতন হইয়াছে তাহা আমি জানিতাম না। সে নাকি খুব ধার্মিক যদিও সে নামাজ রোজা করে না। 'মাদ্রাসায় শিক্ষা করিয়া কি হইবে? আর ইসলাম অন্য ধর্ম হইতে কিসে শ্রেষ্ঠ? পাকিস্তান হওয়া বেশী ভাল হয় নাই। ভারত হইতে পাকিস্তানকে আলাদা করা অন্যায় হইয়াছে' - এইসব নানা বিষয়ে আজ সে কথা বলিয়াছে। খোদা, জানি না তাহাদের মনের গতি কখন ফিরবে।(২৭-১-১৯৬২)

(৯) দুনিয়ার গতি আজ কোন্ দিকে? নানা অরাজকতায়, নানা কুৎসিৎ কার্য দ্বারা আজ পৃথিবী পরিপূর্ণ। পাশ্চাত্য হালফেশান আজ আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমান। ধর্মের ধার আজকে আমাদের শিক্ষিত লোককে ধারতে হয় না। নামাজ রোজা না করিয়াও আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ধার্মিক। মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা একটা কুসংস্কার। তাই নারীকে আজ তাহারা পুরুষের সামিলে আনিয়া ফেলিয়াছেন। আর পুরুষদের পাঠিয়েছেন অন্তঃপুরে। পর পুরুষের সাথে আজ মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করিতেছে। অনেকদিন পূর্বে কোন একটা কথা প্রসঙ্গে আমার একজন ছাত্রবন্ধু বলিয়াছিল, মেয়েরা না নাচিলে, গান না গাইলে দেশের উন্নতি হইবে না। দেখেন না পাশ্চাত্যের দেশগুলি এ দিকদিয়া আজ কত উন্নত। তর্ক বৃথা জানিয়া আর কোন কিছু বলি নাই। মনে মনে বলিয়াছিলাম হাঁ ঠিকই, নতুবা পৃথিবীতে অধঃপতন আসিবে কিরূপে। (২৮-১-১৯৬২)

(১০) সবে কদর; পবিত্রতম রাত্রি। এক হাজার মাসের ইবাদত হতে মহত্তর। আমি এই রাত্রি। ইবাদতে কাটালাম। সারা রাত্রি আল্লাহর নামের উপর কাটিয়ে দিলাম।

সূর্যাস্তের সময় আমি চল্লিশ আয়াত পাঠ করলাম। মাগরিবের নামায আদায় করে গোসল করলাম। ইহার পর সারারাত ইবাদতে কাটালাম। গত দিনগুলোতে আমি জেনে না জেনে যে গুনা করেছি ছোট গুনা, বড় গুনা, দৃশ্য গুনা, অদৃশ্য গুনা, যাহা কিছু করেছি, এরূপ গুনা আর করব না বলে প্রতিজ্ঞা করলাম এবং আল্লাহর মাগফিরাত কামনা করলাম। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ আমাকে যেন বল দেন আল্লাহর রাস্তায় চলবার জন্য। আমি আমার গুনার জন্য কাঁদলাম। আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম। (২৫-২-১৯৬২)

(১১) মুস্তফা আমাকে নিয়ে একদিন সিনেমা দেখবার ইচ্ছা করেছিল। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারি নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সিনেমা দেখব না। কিন্তু সে ভাবলো অন্য কিছু। ইহাতে সে মনঃক্ষুন্ন হলো। কিন্তু আমারতো কিছু করবার নাই। যাই হউক না কেন, আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না। ইহার পর সে আমার সঙ্গে কথা বলে না। (২০-৫-১৯৬২)

(১২) রাত্রিতে একদিন তারাবীর নামাজ পড়তেছিলাম, হঠাৎ করে আমার মনটা আমার জীবনের আশা ও কল্পনার দিকে ঘুরে গেলো। প্রথমে আমার বিবাহের কথা ভাবলাম, একজন ধর্মপরায়ণা মেয়েকে বিবাহ করবো। অন্ততঃ সে একজন গ্রাজুয়েট হবে, এর জন্য আমি একজন কোরআন হাফেজ মেয়েকে বিবাহ করতে চাই।(১১-২-১৯৬৩)[২৩৫]

০৩.

আসাদ হত্যা মামলা

"... শহীদ ছাত্রনেতা এ, এম, আসাদুজ্জামানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকৌশলী এফ, এম, রশীদুজ্জামান, বিগত ২০ মার্চ, ১৯৬৯ তারিখে তদানীন্তন ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের আদালতে তার ভাইকে (শহীদ আসাদকে) মিছিলের বাইরে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এই মর্মে ঢাকার ডিএসপি বাহাউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দন্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেট জনাব জি, খান অভিযোগ শ্রবণ করেন।

---

[২৩৫] এইচ এম মোস্তফা কামাল / আসাদ থেকে গণ-অভ্যুত্থান ॥ [শহীদ আসাদ পরিষদ - জানুয়ারী, ১৯৯৩ । পৃঃ ৪০-৪৩ / ১০১-১০৯]

অভিযোগের বিবরণে জনাব রশীদজ্জামান বলেন, তার ছোট ভাই মরহুম আসাদুজ্জামান এম এ ঢাকা সিটি ল কলেজের ছাত্র, রোল নং ২৫১। বিগত ২০ জানুয়ারী, ১৯৬৯ সনে কয়েক হাজার ছাত্রের একটি মিছিল চাঁনখার পুলের নিকট রেল সড়ক (তৎকালে রেল সড়ক ছিল) পার হয়ে নাজিমুদ্দিন রোড ধরে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। মিছিল রেল লাইন অতিক্রম করে গেলে আসাদ এর শেষ প্রান্ত থেকে একশত গজ উত্তরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পূর্ব পার্শ্বের ফুটপাতের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি পুলিশের গাড়ি কাছে এসে থামে। গাড়ি থেকে পিস্তল হাতে একজন পুলিশ অফিসার ও অপর কয়েকজন কনস্টেবল দ্রুত নেমে এসে আসাদকে ঘিরে ফেলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যমতে পুলিশ অফিসারটি ছিল জনাব বাহাউদ্দিন আহমদ। সে মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে আসাদের বুকে গুলি করে। এ সময়ে আসাদ দু হাত উর্ধ্বে তুলে আত্মসমর্পনের কথা জানায়। সকল সুযোগ থাকা সত্বেও এ সময়ে পুলিশ আসাদকে গ্রেফতার না করে তাকে হত্যা করে। ছাত্রনেতাকে হত্যা করে আন্দোলন দমানোর পরিকল্পিত নীল নকশার অংশ হিসেবে পুলিশ এই হত্যাকান্ড সংগঠিত করে যা ছিল সম্পূর্ণরূপে পুলিশের কর্তব্য বহির্ভূত। অভিযোগকারী, অভিযুক্ত বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীরও আবেদন জানান। বাদী পক্ষের মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট খান বাহাদুর, নাজির উদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মহিউদ্দিন আহমেদ ও এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন।

বিজ্ঞ হাকিম বাদীর জবানবন্দী শ্রবণের পর এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, আসামী একজন সরকারী কর্মচারী এবং কর্তব্য সম্পাদনের সময় তিনি কাজটি করেছেন বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৯৮ সনের ৫নং আইনের ১৯৭ ধারায় বর্ণিত বিধানমতে সরকারের অনুমোদন ব্যতীত তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারী মোকদ্দমা চলতে পারেনা। এই কারণে ২৮-৪-১৯৬৯ তারিখে মহকুমা হাকিম মোকদ্দমাটি খারিজ করে দেন।

মোকদ্দমা খারিজের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ এবং ৪৩৫ ধারা মতে বাদী মাননীয় দায়রা জজ আদালতে একটি রিভিশন পিটিশন দায়ের করেন। মাননীয় অতিরিক্তি দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা, বাদীর আপীল শ্রবণ করেন এবং একই কারণে মামলাটি নাকচ করে দেন।

দায়রা আদালতের মাননীয় অতিরিক্ত দায়রা জজের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্টে ৬৯১/১৯৭৯ নং আপীল মামলা রুজু করা হয়। হাইকোর্টও বাদীর আপীল নাকচ করে।

অতঃপর মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আবেদন পেশ করা হয়। বলাবাহুল্য আপীল বিভাগ ০৩-৫-১৯৭৬ তারিখে যে রায় প্রদান করে তাতে নিম্ন আদালতের রায়কেই সমর্থন করা হয়। হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে বাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ডঃ আলীম আল-রাজী এবং এডভোকেট আমিনুল হক (বর্তমানে এটর্নী জেনারেল)। সুপ্রীম কোর্টের রায়টি ঢাকা ল' রিপোর্টের ২৮নং খন্ডে রেকর্ডভুক্ত করা আছে॥"[২৩৬]

[২৩৬] এইচ এম মোস্তফা কামাল / আসাদ থেকে গণ-অভ্যুত্থান ॥ [শহীদ আসাদ পরিষদ - জানুয়ারী, ১৯৯৩ । পৃ: ৩০-৩১]



শহীদ আসাদ হত্যাকান্ডের পর আইয়ুব গেটের তাৎক্ষণিক নাম পরিবর্তন।

আসাদ হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

(APPELLATE DIVISION)

Criminal Appeal No. 22 of 1974

Decided On: 03.05.1976

Appellants: F.M. Rashiduzzaman

Vs.

Respondent: Bahauddin Ahmed and another

Hon'ble Judges:
Syed A.B. Mahmud Husain, C.J., A.F.M. Ahasanuddin Chowdhury, Kemaluddin Hussain and Dabesh Chandra Bhattacharya, JJ.

Counsels:
For Appellant/Petitioner/Plaintiff: Amirul Huq, Advocate-on-Record

For Respondents/Defendant: A.T.M. Afzal, Deputy Attorney-General, instructed by A.M. Khan Chowdhury, Advocate-on-Record

Subject: Criminal law

Relevant Section:
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1898 - Section 177; CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1898 - Section 197

Acts/Rules/Orders:
Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 144; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 177; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 197; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 200; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 203; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 435; Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) - Section 436.

Prior History:
Appeal from the judgment and Order dated 13th October 1969 passed by the High Court Division in Criminal Revision No. 691 of 1969.

Disposition:
Appeal dismissed

Discussed 4

JUDGEMENT

A.F.M. Ahasanuddin Chowdhury, J.

1. This appeal is by special leave granted to examine the following points:-

(1) Whether an accused public servant falling in the category mentioned in section 197, Cr. P. C. is entitled to protection under the section before any evidence whatsoever is let in, suggesting that the said public servant was engaged in the discharge of an official duty; and

(2) Whether any and every act done or committed by such a public servant in course of the discharge of an official duty will be protected by the said section without reference to the circumstances attending the occasion. The Appellant F. M. Rashiduzzaman filed a complaint before the Sub-Divisional Magistrate (S), Dacca against the respondent Mr. Bahauddin Ahmed, Deputy Superintendent of Police, Dacca City alleging that Bahauddin Ahmed had intentionally and deliberately shot at and killed A. F. M. Asaduzzaman, a younger brother of the complainant on 20th January, 1969 and thereby committed an offence punishable under section 302, B. P. C.

2. Sub-Divisional Magistrate (S), Dacca examined the complainant under section 200, Cr. P. C. He was of the opinion that since Bahauddin Ahmed was a public servant on duty and that the action he took was in discharge of his public duties, it was necessary to obtain sanction from the Government before he could be prosecuted. The complainant having failed to obtain any sanction from the Government for starting prosecution, the Sub-Divisional Magistrate dismissed the case under section 203, Cr. P. C. on 28. 4. 1969. Against the said order of the Magistrate the Sessions Judge was moved under Section 435 read with Section 436, Cr. P. C. The Additional Sessions Judge, 3rd Court Dacca who heard the revisional application upheld the order of the Sub-Divisional Magistrate that the respondent Bahauddin Ahmed could not be prosecuted without sanction from the Government as enjoined under section 197 Cr. P. C. This order of the Additional Sessions Judge was challenged before the then High Court in Revision No. 691 of 1969 which the High Court summarily rejected. Whereupon the leave as mentioned above was obtained.

3. Mr. Aminul Huq, the learned Advocate on Record contended that no sanction under section 197, Cr P. C. was necessary to prosecute the respondent who, in the discharge of his official duty, acted beyond the scope thereof. It was, therefore, urged that the learned Judges of the High Court seriously erred in not holding that the courts below dismissed the petition of complaint on the basis of speculation of the defense story without going into the merit of the case and this has caused a miscarriage of justice.

4. In this connection it is necessary to refer to the petition of complaint and also to the papers filed on behalf of the respondent. The petition of complaint shows that on 19th of January, 1969 various organizations and groups of students decided to take out a peaceful procession on the following day, that is, on 20th January, 1969. Accordingly, on the 20th January, 1969 at about noon the students of various Halls, Colleges and Hostels assembled several thousands strong and proceeded from University Arts Building towards the Dacca Medical College. When the processionist passed railway crossing near the Medical College compound and entered the Nazimuddin Road, dozens of the E. P. R. personnel armed with rifles with fixed bayonets and many police arrived there, started lathi charge and fired several rounds of tear gas shells in the midst of the procession. When major section of the processionist proceeded towards south along Nazimuddin Read towards the Dacca Central Jail, the tail end of the procession was intercepted by E. P. R. and Police personnel. To avoid tear gas, lathi and bayenet charges many of them ran away along the railway line. Late Asaduzzaman and some others ran along the foot path with a view to taking shelter inside the Medical College compound. While Asaduzzaman and some others were on the foot path, the respondent Bahauddin along with a few other armed police constables came in a jeep from the north, alighted therefrom with a drawn revolver in his hand and proceeded

towards late Asaduzzaman and others forming a cordon. When Asaduzzaman and his associates surrendered by raising their hands up and were absolutely unarmed, the respondent Bahauddin fired at his chest from a very close range. Asaduzzaman fell down on the road and thereafter he was picked up and taken to the hospital where he succumbed to his injuries. It was thus alleged that respondent without any provocation whatsoever want only and deliberately shot at and murdered Asaduzzaman.

5. The Government version which was released in press notes is as follows :-
FLAG PRESS NOTE

"The Pakistan Observer"

dated January 21, 1969.

PRESS NOTE.

The following is the Press Note issued by the Government of East Pakistan in Dacca on Monday Night:-
A procession was brought out at noon to-day by some 3000 students of Dacca University, Engineering University and neighboring institutions. This was in violation of section 144, Cr. P. C. in force in the city. A police party, therefore, met the processionist at the crossing near Nazimuddin Road and asked them to disperse. Instead of dispersing the students who were heavily armed with lathis, axes, shovels and other lethal weapons, attacked them causing serious injuries to 60 constables and officers. They also subjected the force to heavy brick-batting and to throwing of inflammable materials from all directions. The processionist who had earlier set up road blocks on the roads caused serious dislocation to the traffic in the area. They also set fire to garbage truck belonging to Dacca Municipality.

One Naik and a constable were grabbed by them and assaulted with iron rods. Both of them fired 4 rounds at the attackers in order to save themselves. Four persons were injured as a result of the firing. One of them later succumbed to his injuries. It has been alleged by some quarters that the deceased was a student.

It was found on verification from Dacca University and Central Law College authorities that the deceased was not a student of either the University or the Central Law College. In fact he had left Dacca University on the 8th of February, 1968.

SECOND PRESS NOTE.

Following is the second Press note issued by the Government of East Pakistan in Dacca on Monday Night :-
Further to the Press Note issued earlier it transpires on inquiry that the person who succumbed to injuries in the firing on the 20th January, 1969 was Asaduzzaman, son of Taher Maulvi of village Dhannua, P. S. Shibpur, District-Dacca.

He had been an F.I.R. named accused in Shibpur P.S. case No. 4 dated 28. 11. 1968 for offence of rioting and attempted murder. He had also been an F.I.R. named accused in the Hatirdia case, P.S. Monohardi.

6. Press Notes show that an order under section 144 Cr.P.C. was in force in the city and a procession of many thousand students was brought out in violation of the order. The law and order was extremely disturbed and they committed various acts of violence and thereby created a serious law and order situation. The law enforcing agency, namely, E. P. R. as

well as the police were put into action to restore law and order. With that end in view they faced the processionist at the crossing near Nazimuddin Road and asked them to disperse. Instead of dispersing the students who are said to have been heavily armed with lathis, axes, shovels and other lethal weapons attacked them causing serious injuries to as many as 60 constables and officers. They also brickbatted and throw inflammable materials from various directions. According to the Government press notes in such circumstances the police, namely, the law enforcing agency had to open fire in discharge of their official duty. In view of this serious situation that was created by the processionist, Mr. A. T. M. Afzal, learned Deputy Attorney General submitted that it could never be said that the police and for the matter of that, respondent Bahauddin Ahmed committed excess in the discharge of his official duty simply because one Asaduzzaman lost his life due to firing by the police.

7. Section 197, Cr. P. C. provides that when any public servant is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the authority concerned. It was urged that respondent Bahauddin Ahmed was entitled to the protection provided under section 197 Cr. P C. in as much as he did not act beyond the scope of his official duty in view of the situation created by a procession comprising several thousands of students and doing various acts of violence disturbing the normal life and thereby creating serious law and order situation in violation of the order promulgated under section 144 Cr. P. C. There is no reason to think that whatever was done or purported to have been done was beyond the scope of the official duty of respondent Bahauddin Ahmed.

8. Mr. Aminul Huq contended that under Rule 157 of Police Regulations, Bengal, 1943 there ought to have been a full executive Inquiry to ascertain whether the firing was justified and whether the regulations were obeyed, when in the instant case, the police used fire arms. There is nothing on record to show that the inquiry as contemplated under Rule 157 was not held.

9. It has been held by their Lordships of the Privy Council in the case of H. H. B. Gill Vs. The King, A.I.R. 1948 (P. C.) 128 that a public servant can only be said to act or to purport to act in the discharge of his official duty, if his act is such as to lie within the scope of his official duty. The test may well be whether the public servant if challenged, can reasonably claim that, what he did in virtue of his office. In the case of Matajagdobry Vs. H. C. Bhari, in P.L.D. 1957 (S.C.) (India) 160 the view expressed is that sanction would be necessary when the offeree alleged to have teen committed must have something to do or must be related in some manner with discharge of official duty, that is to say, the only point to determine is whether it was committed in the discharge of official duty and there is a reasonable connection between the act and the official duty. In the case of Syed Ahmad Vg. The State, 1958, 10 D. L. R. (S. C.) 12 PLD 1958 (S.C.) 27 it has been held that if acts of a public servant in the discharge of his official duty can reasonably be connected with such duty regarding which a reasonable person might assume that the public servant could or might act in that way then his acts shall be deemed to be covered by section 197, Cr.P.C. In the case of Baijnath Vs. State of M.P. in A.I.R. 1966, 220 it has been held that it is not every offence committed by a public servant that requires sanction for prosecution under Section 197 Cr. P. C. nor even every act done by him while he is actually engaged in the performance of official duties, but where the act complained of is directly concerned with his official duties so that, if questioned it could be claimed to have been done by virtue of the office then sanction would be necessary. It is thus obvious that the trend of judicial decisions is to see whether the offence complained of was done or could have been done in the discharge of official duty.

10. According to the case made out in the petition of complaint itself, a big procession comprising thousands of students was brought out, admittedly in violation of the order under section 144 Cr. P. C. This procession was sought to be dispersed by the police and E. P. R. personnel by resorting to lathi charge and firing tear gas shells and in immediately thereafter when the deceased along with some others were on the foot-path the accused respondent at that moment arrived at the spot on a jeep along with a few other aimed constables. From this narration it is obvious that the accused came to the spot for the discharge of his duties in the matter of maintenance of law and order. The petitioner in his petition of complaint further adds that the accused alighted from the jeep with revolver in hand and proceeded towards the deceased and others forming a cordon. Such an action assuming it to be true can certainly be related to the duty which the accused was to perform in enforcing law and order under the aforesaid situation. It is of course the case of the prosecution that the deceased raised his hand by way of surrender but the accused fired a shot killing him on the spot. But it is not the case of the complainant that the accused committed the said act out of any malice pretense The accused went to the spot accompanied by a police contingent in the discharge of his duties under the aforesaid circumstances and whatever action was taken by him there including the firing of the shot may very well be claimed by him to have been done in the discharge of his official duty. We are not however concerned here with the question whether firing was justified or net but whether the accused can very well under the circumstances stated above set up his defense that he had to reset to firing to bring the situation under control and to restore law and order. We are of the view that the respondent accused Bahauddin Ahmed could not be prosecuted without any sanction as enjoined under section 177 Cr. P. C. as he could claim that he acted or purported to have acted in the discharge of his official duty. We have given our anxious thoughts to the version of the complainant-appellant and also to those on behalf of the respondent. Though we feel that a premising life at its budding time has been lost due to the police firing which was resorted to under compelling circumstances the officer alleged to have been responsible for the loss of the promising life cannot be prosecuted as the said officer Bahauddin acted in the discharge of his official duty.

In the result the appeal is dismissed.[237]

আট

ক্ষমতা-হস্তান্তর পত্র

"... প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করা হয়, জনাব আবদুল মোনায়েম খানকে গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করে ড. এম. এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সাথে রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তবু অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। জনগণের সরকারবিরোধী মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ২৪ মার্চ (১৯৬৯) এক পত্রে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ করেন। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর ক্ষমতা দখল করেন - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবিলা করার জন্য আইয়ুব খান চেয়েছিলেন আবার জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবেন। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সহযোগিতা চান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। অন্যদিকে ক্ষমতা দখলের উচ্চভিলাষে জেনারেল ইয়াহিয়াও বিরোধী দলকে পরোক্ষভাবে উসকে দিয়ে যান। যার কারণে আইয়ুব খানকে শেষ পর্যায়ে কোনো সহায়তা না করে আইয়ুব খানের ফোনও রিসিভ করেননি জেনারলে ইয়াহিয়া। ফলে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ইয়াহিয়া খানকে।

২৩৭ Source : Dhaka Law Report (Vol. 28) / Appellate Division - 1976 | p. 181 \

তার ঐ ক্ষমতা হস্তান্তর পত্রটি ছিল এ রকম :

প্রেসিডেন্ট ভবন

২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

ইয়াহিয়া খানকে আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর পত্র।

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। যদি বর্তমানের আশঙ্কাজনক গতিতে অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে তাহা হইলে সভ্যভাবে জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প নাই। বর্তমান সময়ে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য দেশরক্ষা বাহিনীই একমাত্র কার্যকর ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠান। খোদা চাহে তো অবস্থার পরিবর্তন সাধনপূর্বক পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। একমাত্র তাহারাই দেশে সুস্থতা ফিরাইয়া আনিতে পারে এবং বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে অগ্রগতির পথে ফিরাইয়া নিতে পারে। আমাদের বিশ্বাসের মৌলিক নীতিমালা এবং আমাদের জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক পূর্ণ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইহা বজায় রাখাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এর মধ্যেই আমাদের জনগণের মুক্তি নিহিত। আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলি সমৃদ্ধ আমাদের জনগণের পৃথিবীতে একটি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যখন আমরা সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম তখনই আমরা কাণ্ডজ্ঞানহীন বিক্ষোভের শিকারে পরিণত হই। ইহাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য যে নামই ব্যবহার করা হইয়া থাকুক না কেন, সময়ে প্রমাণিত হইবে যে, এই বিক্ষোভ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে যাহাদিগকে বিপুলভাবে প্রণোদিত করা হইয়াছে এবং মদত জোগানো হইয়াছে।

আইনশৃঙ্খলার ন্যূনতম চিহ্ন বজায় রাখা কিংবা নাগরিক স্বাধীনতা এবং জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ তাহারা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। প্রশাসনের প্রতিটি অঙ্গ এবং সুস্থ জনমত প্রকাশের প্রতিটি মাধ্যমের উপর অমানবিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। ত্যাগী মনোভাবাপন্ন অথচ নিরাপত্তাহীন সরকারি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের ক্রুর সমালোচনা অথবা ব্ল্যাকমেইলের শিকারে পরিণত হয়। ফলে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো বিনষ্ট হইয়া পড়ে এবং সরকারি যন্ত্র কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলে। দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আইন-বহির্ভূত এবং নৃশংস কাজ করিবার জন্য কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত করা হইতেছে। একদিকে সন্ত্রাসের হুমকির মুখে অধিক পারিশ্রমিক, বেতন ও সুযোগ সুবিধা আদায় করা হইতেছে। অন্যদিকে উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। রপ্তানি ক্ষেত্রে মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে এবং আমার আশঙ্কা অতি সত্বরই দেশ মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতির কবলে নিপতিত হইবে।

এইসব হইতেছে ঐ সমস্ত ব্যক্তির নৈরাজ্যমূলক আচরণের ফল যাহারা গত কয়েক মাস ধরিয়া গণ আন্দোলনের নামে দেশের ভিত্তিমূলে একটির পর একটি আঘাত হানিতেছে। দুঃখের বিষয়, বিপুল সংখ্যক নির্দোষ লোক এই অসৎ পরিকল্পনার শিকারে পরিণত হইয়াছে।

সকল অবস্থার মধ্যে আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী দেশবাসীর খেদমত করিয়াছি। অবশ্য যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি রহিয়াছে কিন্তু যাহা অর্জন করা হইয়াছে তাহাও নগণ্য নয়। এমন অনেকে আছেন যাহারা আমি যাহা করিয়াছি এমনকি পূর্বতন সরকার যাহা করিয়াছে তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিবে। কিন্তু সবচাইতে দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক চিন্তা হইল যে, এমন অনেকে এখন ক্রিয়াশীল রহিয়াছে যাহারা কায়েদে আজমের অবদান অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টিকেও ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহিবে।

বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য আমি সকল বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পন্থা প্রয়োগ করিয়াছি। যাহারা জনগণের নেতা হিসাবে পরিচিত তাহাদের সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব দিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহাদের অনেকে একটি কনফারেন্সে যোগ দিয়াছিলেন তখনই যখন আমি তাঁহাদের সকল পূর্বশর্ত পূরণ করিয়াছিলাম। কয়েকজন উক্ত কনফারেন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন; এই অস্বীকৃতির কারণ তাঁহাদেরই ভালো জানা। একটি সর্বস্বীকৃত ফরমুলা উদ্ভাবন করিবার জন্য আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম। কয়েকদিনের আলোচনা সত্ত্বেও তাঁহারা উহা করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা দুইটি বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন এবং আমি ঐ দুইটি বিষয়ই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তারপরে আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম, যে সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য হয় নাই সেইগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে যখন জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হইয়া আসিবেন তখন তাঁহাদের বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে। আমার যুক্তি ছিল - এই কনফারেন্সে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ যাহারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই তাঁহারা সকল বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয় ও নিজেদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেইগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দাবি করিতে পারেন না।

যে দুইটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলি বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদ আহ্বান করিবার কথা আমি চিন্তা করিয়াছিলাম কিন্তু ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ইহা নিরর্থক প্রচেষ্টা। পরিষদের সদস্যরা আর স্বাধীন প্রতিনিধি নন এবং যে দুইটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইগুলি বিশ্বস্ততার সহিত গৃহীত হয় এমন কোনো সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃতপক্ষে পরিষদ সদস্যদেরকে এই মর্মে হুমকি প্রদানেও বাধ্য করা হইতেছে যাহাতে তাহারা হয় অধিবেশন বয়কট করেন অথবা এমন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত হইয়া যায়, সশস্ত্রবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, দেশের অর্থনীতি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে এবং পাকিস্তান ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এমন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদ আহ্বান করিবার অর্থই হইতেছে পরিস্থিতিকে আরও সংকটাপন্ন করিয়া তোলা।

শুধু বিদেশি আগ্রাসনই নয়, বরং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব আপনার। জাতি আশা করে, দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি এই দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২ কোটি মানুষের এই বিক্ষুব্ধ দেশে শান্তি ও সুখ ফিরিয়া আসুক। আমি বিশ্বাস করি, দেশের বর্তমান কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করিবার মতো ক্ষমতা, দেশপ্রেম, ত্যাগী মনোভাব ও প্রজ্ঞা আপনার রহিয়াছে। আপনি এমন এক বাহিনীর নেতা যার সমগ্র বিশ্বে সম্মান রহিয়াছে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর আপনার সহকর্মীদের অনেকেই সম্মানিত ব্যক্তি এবং আমি জানি, আপনি সর্বসময়েই তাঁহাদের সমর্থন পাইবেন। পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীকে অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার হাত হইতে পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিটি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকের নিকট আপনি এই কথা পৌঁছাইয়া দিবেন যে, তাহাদের সুপ্রিম কমান্ডার হিসাবে তাহাদের সহিত সম্পর্কিত হওয়াতে আমি গর্বিত; সেজন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

তাহাদের জানা উচিত, বর্তমান সংকটাপন্ন মুহূর্তে তাহাদিগকে পাকিস্তানের রক্ষক হিসাবে কাজ করিতে হইবে। তাহাদের আচরণ ও কাজ ইসলামের নীতিমালা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার মনোবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া পাকিস্তানের সাহসী ও অনুপ্রাণিত জনগণের খেদমত করিতে পারিয়া আমি পরম সম্মানিত বোধ করিতেছি। আল্লাহ তাঁহাদিগকে অধিকতর অগ্রগতি ও গৌরবের পথে পরিচালিত করুন।

আপনার দ্বিধাহীন আনুগত্যের কথাও আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতেছি। আমি জানি, আপনার সমগ্র জীবনে দেশপ্রেমই হইতেছে সর্বময় প্রেরণার উৎস। আমি আপনার সাফল্য এবং আমার দেশবাসীর কল্যাণ ও সুখের জন্য দোয়া করি। খোদা হাফেজ। (সাধুভাষায় অনূদিত ও লিখিত পত্রগুলো সাধুভাষায় রাখা হয়েছে)

আপনার বিশ্বস্ত

স্বা/ এম. এ. খান

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক আইন জারি করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন; গণবিক্ষোভের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগের পর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন।

সংবিধান বাতিল করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন, গভর্নর ও মন্ত্রীদের স্ব স্ব পদ থেকে অপসারিত করেন এবং সমগ্র দেশকে দুটো সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক আইন অঞ্চলে লে. জেনারেল আতিকুর রহমান এবং পূর্ব পাকিস্তান সামরিক আইন অঞ্চলে মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনকে সামরিক শাসক নিযুক্ত করা হয়। সামরিক আইন জারি ও গভর্নর পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অপসারণ করার পর ড. এম এন হুদার গভর্নর হিসেবে কার্যকালের সমাপ্তি ঘটে৷"[২৩৮]

[২৩৮] মাহমুদুল হাসান নিজামী/স্বৈরশাসক আইয়ুব খান : সংস্কার, শাসন ও উন্নয়ন ৷৷ [হাওলাদার প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০২২। পৃ. ৭৩-৭৭]

পঞ্চম পর্ব

সত্তরের নির্বাচন : সমাপ্তির শুরু

এক

নির্বাচনের আইনি কাঠামো এবং প্রস্তুতি

০১.

"... অবশেষে ১৯৭০ সালের ৩১ শে মার্চ ঘোষণা করা হয় আইন কাঠামো আদেশ বা Legal Framework Order (LFO)) । এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় একটি প্রস্তাবনা, ২৭টি অনুচ্ছেদ, তিনটি তফসিল, পরিষদের কার্য বিবরণীসহ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সবরকমের নিয়মবিধি, শর্ত ও বিধিনিষেধ।

এই আদেশের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ গঠনের বিধিবিধান, নির্বাচন পরিচালনা ও মূলনীতি, নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন, জাতীয় পরিষদ ও তার সদস্যবর্গের সুযোগ ইত্যাদি। আদেশের ২৪ নং অনুচ্ছেদে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের সময়সীমাও বেঁধে দেয়া হয়। এর প্রস্তাবনা এবং ইসলাম, কোরআন ও সুন্নাহ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কতকগুলো মৌলিক বিষয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ওপর নির্দেশনা দেয়া হয়। ২০ নং অনুচ্ছেদের মৌলিক নীতিমালা ছিল নিম্নরূপঃ

(১) পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রিপাবলিক যার নাম হবে ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। এর প্রদেশসমূহ এবং সীমানাভূক্ত অঞ্চলসমূহ এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকবে যে দেশের স্বাধীনতা, সীমানাগত অখন্ডতা এবং জাতীয় সংহতি নিশ্চিত হবে এবং ফেডারেশনের ঐক্য বিনষ্ট হবে না;

(২) ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণ করা হবে এবং দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম।

(৩) গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালা অব্যাহত রাখতে গিয়ে জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে অবাধ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে, জনসাধারণের মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দেয়া হবে এবং সুবিচার সাধন ও মৌলিক অধিকার বলবৎকরণে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে;

(৪) আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করা হবে যাতে করে প্রদেশগুলো সর্বোচ্চ পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে পারে অর্থাৎ প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করা হবে সর্বাধিক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকবে যার মাধ্যমে কেন্দ্র সহজে তার ওপর অর্পিত বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ক দায়িত্বাবলী সম্পাদন করে দেশের স্বাধীনতা ও সীমানাগত অখন্ডতা সংরক্ষণ করতে পারে এবং

(৫) এমন নিশ্চয়তা দেয়া হবে যাতে করে পাকিস্তানের সকল এলাকার জনগণ সর্বপ্রকারের জাতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পান এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও কার্যকর করে বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সবরকমের বৈষম্য দূর করা যায়।

উপরোক্ত ১, ২, এবং ৩ নং নীতিমালা অনুসারে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলই মেনে নিয়েছিল বলে সেগুলো নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ ছিল না। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে পেশকৃত আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী বিলেও ইসলামী আদর্শবাদ সংক্রান্ত প্রস্তাব বহাল রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মূলনীতি আদায়ের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলো। বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা বৈষম্য নিরসনের বক্তব্যটি ছিল অস্পষ্ট, কারণ আইউব খানের আমলেই এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ১৫৪ (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বৈষম্য দূরীকরণের শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতাটি ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রেই সম্প্রসারিত করে রাখা হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়টি ৪নং মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা ছিল এতো অস্পষ্ট এবং ব্যাপক একটি বিবৃতি যে তা থেকে কেউ মূল বক্তব্যটি খুজে বের করতে পারেননি। এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, ক্ষমতা দখলকারীরা আসলে জাতিকে নতুন কোনো প্রতিশ্রুতিই দেননি। পক্ষান্তরে তারা তখন অবধি ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বর্ণিত শক্তিশালী কেন্দ্রবিশিষ্ট ফেডারেশন কাঠামোই বহাল রাখার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তখন অবধি বিকেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার ধারণাটির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি।

আইন কাঠামো আদেশের আরো দুটি অনুচ্ছেদ পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, 'সংবিধান বিল জাতীয় পরিষদে গৃহীত হবার পরে তা প্রত্যায়িতকরণের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হবে। প্রেসিডেন্ট তা প্রত্যায়িতকরণে অস্বীকৃতি জানালে জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে যাবে।' এটা ছিল পুরোপুরিভাবে একটি অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব। গণতান্ত্রিক নীতমালা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইন প্রণয়ন, ইত্যাদির গালভরা বুলি প্রচারের পরেও ইয়াহিয়া খান তার হাতে এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা রেখে দেয়ায় সকলেই একে শাসন প্রণেতাদের ব্ল্যাকমেইল করার নামান্তর বলেই বিবেচনা করেছেন। ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়নকালে ইস্কান্দার মীর্জাও একই বিধান সংযোজন করেছিলেন। আইন কাঠামো আদেশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ২৭ নং অনুচ্ছেদেও একই ধরনের একটি অগণতান্ত্রিক বিধান সংযোজন করা হয়েছিল। এতে বলা হয় :

'এই আদেশের কোনো ব্যাখ্যা নিয়ে সন্দেহ বা প্রশ্ন দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন এবং সেই সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত ও কোনো আদালতে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। এই আদেশে কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন হলে জাতীয় পরিষদ নয়, বরং প্রেসিডেন্ট সেই সংশোধনের ক্ষমতা রাখবেন।'

এই অনুচ্ছেদ দু'টি দেশের দুটি অংশেই ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি করে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে তার মাত্রা ছিল বেশী। জনগণ স্বভাবতঃই ক্ষমতা দখলকারী গোষ্ঠীর বাস্তব উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। একমাত্র এ কারণেই বামপন্থী ও সংস্কারবাদী মহল উপরোক্ত শর্তাধীনে নির্বাচন বয়কট করার দাবি উত্থাপন করেন। এই অনুচ্ছেদে প্রমাণ হয়ে যায় যে, পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর অনুমোদন ছাড়া কোনো সংবিধান গৃহীত হবেনা। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপকে শান্ত রাখতে গিয়েই এই ক্ষমতা হাতে রেখে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শক্তিশালী এই গ্রুপটি ছিল নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনের আগে সংবিধান প্রয়োগ করার পক্ষে। অবশ্য এই বিষয়টিতে ইয়াহিয়া বারংবার মুজিবকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এ ধরনের কিছু ঘটবেনা। মুজিব আরো সিদ্ধান্ত নেন যে এ হিসেবে ঝুঁকি গ্রহণ করলে

এবং একবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলেই তার অবস্থান উন্নত হবে, তাতে ক্ষমতাসীন জান্তা যে ক্ষমতাই প্রয়োগ করুক না কেন। মুজিব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি তার দলের ক্ষমতা সংহত করতে পারবেন যা এতদিন যাবৎ শৃংখলা এবং সংহতির অভাবের সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন হলে মুজিব তার নেতৃত্বে বৈধতা এবং দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর কথা বিবেচনায় রাখছিলেন। তিনি আরো চিন্তা করলেন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ক্ষমতায় আইনগত কর্তৃত্ববিহীন সেনাবাহিনী তার সঙ্গে ঐকমত্যে না এলেও বিশ্বজনমত মুজিবের পক্ষেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত এই কৌশলকে সামনে রেখেই আইন কাঠামো আদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও মুজিব নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, যা ছিল তার রাজনৈতিক জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জুয়াখেলার সামিল॥"[২৩৯]

০২.

"... আইনগত কাঠামো সংশোধনের আহবানঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত আইনগত কাঠামো গণতান্ত্রিক মূলনীতির পরিপন্থী। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান।

১লা এপ্রিল ১৯৭০ : ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিনব্যাপী জরুরী বৈঠক শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা বানচালের দরুন যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা এড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের আহবান জানানো হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

(দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল)

১লা এপ্রিল সংবাদপত্রের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তার সমালোচনা করে বলেন, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক পাকিস্তানীরই এই ধারণা হবে যে, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোন কথা বলারই অধিকার থাকবে না।

(দৈনিক পাকিস্তান, ১লা এপ্রিল)

প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করে দেশের প্রায় সব ক'টি রাজনৈতিক দলই তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করে। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই বিধানকে 'গণতন্ত্র অর্থ ও রেওয়াজের পরিপন্থী' বলিয়া অভিহিত করেন।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা এপ্রিল)

প্রাদেশিক ন্যাপ প্রধান (রিকুইজেশন) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ২রা এপ্রিল চট্টগ্রামের এক জনসভায় নির্বাচনের আইনগত কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ ধারার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তাদের দল এ দু'টি ধারার বিরোধী।

(দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা এপ্রিল)॥"[২৪০]

---

২৩৯ মওদুদ আহমদ/বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ॥ [ইউপিএল - ১৯৯২। পৃ. ১৫৮-১৬০]

২৪০ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (দ্বিতীয় খন্ড)/সম্পা : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮২। পৃ. ৫২৫]

০৩.

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার

AWAMI LEAGUE MANIFESTO

"No greater challenge has faced a people than that which faces the people of Pakistan as we enter into the decade of the seventies. The great hopes and expectations that the advent of independence and the creation of Pakistan had enkindled in the hearts and minds of our people have given a way to a sense of frustration, indeed to deep sense of betrayal. The promise that independence held forth was the promise of a new society, of the establishment of a real living democracy in which people would live in freedom and in which justice and equality would prevail.

This promise has yet to be fulfilled. Democracy itself was not allowed to take root and power which rightfully belonged to the people was usurped, by one coterie after another. These coteries engaged themselves in the naked pursuit of their own narrow interests, leading to the consolidation of political power and the concentration of wealth in their hands, while the forgotten millions of Pakistan were reduced to mere objects of exploitation. Thus, independence instead of bringing freedom to the people brought a greater servitude.

The physical handicaps which our society faced were formidable. Our resources in relation to our rapidly growing population were not abundant. The two wings of the country were separated by over a thousand miles. The task of creating a just society was, therefore, ntrinsically difficult. For 22 long years this task has hardly been recognised. Instead we nave witnessed the selfish pursuit of power and wealth by the privileged few.

Today, therefore, the task has assumed critical proportions. The toiling masses, both in the countryside and in the cities, have awakened and cannot tolerate the deprivation of their rights. A nation of 120 million people cannot reconcile itself to the rule by a privileged coterie. They are determined to wrest away from that coterie the power that belongs to them. The people of Pakistan have revolted against the perpetuation of injustice between man and man, between region and region.

The concentration of wealth in the hands of the privileged few and the total neglect of the needs of the rest of the population have created pressures for immediate and radical change in the structure of the economic system. The glaring disparities between the two wings of Pakistan have continued to widen at an alarming pace. As a result, the entire economy of East Pakistan is faced with destruction. This creates an irresistble pressure for radical change in the constitutional structure whereby full regional autonomy, including the powers of management of the economy, would be granted to the regions, in order to enable their governments to undertake on an emergency basis the task of saving the regional economies from ruination.

Our people are our greatest resources. Radical institutional and structural changes have to be made in our society in order to make it possible for the people actively and collectively to involve themselves in the common venture of rebuilding of our society on the foundation of justice. What is required, therefore, is a social revolution to be wrought through the democratic process. To bring it about we need a new constitutional, political, economic and social structure.

This is the great challenge which faces us. It is a challenge we must accept, for it involves our very survival.

We must break loose from the institutional framework which is a legacy from colonial times. The institutions needed for promoting rapid economic and social change are to be designed to meet the urgent needs of our society and its people.

The very creation of the Awami League by the late Huseyn Shaheed Suhrawardy was an early demonstration of the people's determination to vindicate their rights through democratic struggle. This struggle has continued unabated till this day. Great sacrifices have been made. In the face of onslaught after onslaught from the ruling group, countless lives and families have been destroyed. Indeed the late Huseyn Shaheed Suhrawardy himself is a martyr to the cause of the people. Thousands have laid down their lives so that the flame of freedom may not be extinguished in our country. Countless persons have suffered deprivation of liberty through long terms of detention, and have sacrificed their family, property and careers in order to sustain this struggle.

It is in the background of this tradition of relentless and determined people's struggle, that the Awami League resolves to accept the challenge which faces us today. The courage and determination required to accept this challenge is born of our faith in our nation, of the faith in our people and above all faith in the Almighty.

It is, therefore, to bring about a revolution through the democratic process and thereby to replace the present structure of injustice by a new constitutional, political economic and social order in which justice between region and region, and between man and man, shall prevail, that the manifesto of the party has been drawn up. The manifesto presents in outline a comprehensive strategy for securing justice for each of the regions of Pakistan and for every citizen of the country.

BASIC FEATURES OF THE CONSTITUTION

Real Living Democracy :

A real living democracy shall be established in which people shall live in freedom and with dignity, and in which justice and equality shall prevail.

Islam :

Islam is the deeply cherished faith of the overwhelming majority of the people. Awami League affirms that a clear guarantee shall be embodied in the Constitution to the effect that no law repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah shall be enacted or enforced in Pakistan. The sanctity of the religious institutions shall be constitutionally guaranteed. Adequate provisions shall be made for extending religious education at all levels.

Minorities :

Minorities shall enjoy complete equality before the law and equal protection of the law. They shall enjoy the full rights of citizenship. Their right to profess, practice and propagate their respective religions and their right to establish and manage their religious institutions and to impart religious education to the members of their faith shall be constitutionally guaranteed. No person shall be compelled to pay a tax to propagate any religion other than his own. No person shall be required to receive instruction or to take part in any religious worship or ceremony, if such instruction, worship and ceremony relates to a religion other than his own.

State's Responsibility to Ensure Basic Necessities of Life :

The Constitution shall acknowledge a fundamental responsibility on the part of the State to ensure that every citizen is provided with the basic necessities of life including food, clothing, shelter, education, medical care and the opportunity of employment at reasonable wages.

Equality before the Law :

Every citizen shall constitutionally be guaranteed equality before law and equal protection of the law. To ensure that this gurantee is effective, it shall be the State's responsibility to take measures to enforce that every citizen is provided with the requisite legal aid and assistance necessary to secure his rights. The Jirga system shall be abolished and all discriminatory tribal laws shall be repealed.

The Awami League reaffirms its faith in the fundamental dignity of the human person and the principle of equality of all citizens, irrespective of caste, colour, religion, linguistic or ethnic origin and looks upon all citizens as full citizens in all respects of a democratic society.

Fundamental Rights and Freedoms :

The fundamental rights and freedoms shall be constitutionally guaranteed including freedom of speech and expression, freedom of the press, freedom of convening public meetings, freedom of association, freedom of movement, freedom of religion, protection against retrospective punishment and above all against arbitrary arrest or detention. Untouchability, slavery and forced labour shall be prohibited. Human rights as enumerated in the Universal Declaration of Human Rights shall be guaranteed to every citizen.

Further it shall be constitutionally provided that fundamental rights cannot be curtailed except during a period of actual hostilities during a war. No such curtailment would be permitted on the pretext of 'national emergency.

Independence of the Judiciary :

The independence of the judiciary shall be constitutionally guaranteed. Complete separation of judiciary from the executive shall also be constitutionally guaranteed. Constitutional provisions shall be made to ensure that only those persons are appointed as members of the judiciary, who possess the integrity, and the intellectual and moral excellence required to uphold and maintain the independence of the judiciary.

Federal Provisions :

Pakistan shall be a Federation granting full autonomy on the basis of the six-point formula to each of the Federating Units:

Point No. 1 The character of the Government shall be Federal and Parliamentary, in which the election to the Federal Legislature and to the Legislatures of the Federating Units shall be direct and on the basis of universal adult franchise. The representation in the Federal Legislature shall be on the basis of population.

Point No. 2 The Federal Government shall be responsible only for defence and foreign affairs and, subject to the conditions provided in (3) below, currency.

Point No. 3 There shall be two separate currencies mutually or freely convertible in each wing for each region, or in the alternative a single currency, subject to the establishment of a Federal Reserve System in which there will be regional Federal Reserve Banks which shall devise measures to prevent the transfer of resources and flight of capital from one region to another.

Point No. 4 Fiscal policy shall be the responsibility of the Federating Units. The Federal Government shall be provided with requisite revenue resources for meeting the requirements of defence and foreign affairs, which revenue resources would be automatically appropriable by the Federal Government in the manner provided and on the basis of the ratio to be determined by the procedure laid down in the Constitution. Such Constitutional provisions would ensure that the Federal Government's revenue requirements are met consistently with the objective of ensuring control over the fiscal policy by the Governments of the Federating Units.

Point No. 5 Constitutional provisions shall be made to enable separate accounts to be maintained of the foreign exchange earnings of each of the Federating Units, under the control of the respective Governments of the Federating Units. The foreign exchange requirements of the Federal Government shall be met by the Governments of the Federating Units on the basis of a ratio to be determined in accordance with the procedure laid down in the Constitution. The regional Governments shall have power under the Constitution to negotiate foreign trade and aid within the framework of the foreign policy of the country, which shall be the responsibility of the Federal Government.

Point No. 6 The Government of the Federating Units shall be empowered to maintain a militia or a para-military force in order to contribute effectively towards national security.

Dissolution of One Unit :

Consequent upon the dissolution of One Unit, matters of common concern, if any, shall be left to be dealt with in such manner as shall be determined by reference to the just aspirations of the people of the different Federating Units of West Pakistan.

Representation in Federal Government ;

Constitutional provisions shall be made to ensure that just representation of persons from all parts of Pakistan are secured on the basis of population in all branches of the Federal Government and in all Federal Services. Existing under-representation shall be remedied within the shortest possible time by accelerated recruitment from the underrepresented areas, in particular East Pakistan. An initial corrective measure would be to shift the Naval Headquarters and training establishments at present situated in Karachi to Chittagong.

Democratic Administration :

The existing administrative machinery was designed to discharge the functions of a colonial government. It needs to be radically re-structured in order to serve the needs of a dynamic, democratic society. The essential features of the new administrative arrangements which shall be reflected in the Constitution are:

Abolition of present all-Pakistan and Central Superior Services :

Creation of Federal Services, for the purpose of administering federal subjects of foreign affairs and defence to which recruitment shall be made from all parts of Pakistan on the basis of population;

Creation of specialised professional cadres recruited and controlled by the governments of the federating units; such cadres shall be subject to a new framework of service rules, which shall provide for greater mobility based upon performance and evaluation of merit; Entrustment of the district administration to elected councils assisted by specialised staff;

Adopting measures for strengthening local government institutions including reducing the size of the basic administrative unit by converting sub-divisions into districts;

Adoption of effective measures for supervision and control of administrative action in order to eliminate corruption, nepotism and arbitrariness in the discharge of administration."[২৪১]

০৪.

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ইশতেহার

"... মূলনীতি ও কর্মসূচী :

এক.

সাধারণ নীতি

১। এটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত যে, পাকিস্তান একটা ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই বুনিয়াদকে কখনো চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না। এই রাষ্ট্রকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করা কিংবা এখানে অন্য কোনো মতবাদ চালু করার যে কোনো চেষ্টাই মুলতঃ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার প্রয়াসের নামান্তর। আর কোনো বিদেশী ও বিজাতীয় মতবাদকে ইসলামের লেবেল দিয়ে চালানোর প্রচেষ্টা জনগণের সাথে ধোকাবাজীর শামিল। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এ ধরণের প্রতিটি আন্দোলনের মোকাবেলা করব।

২। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা আমরা নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। এ দেশের জনগণকে বংশীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ করে তাদের পরস্পরকে সংঘর্ষে লিপ্ত করার যে কোনো আন্দোলনই আমাদের দৃষ্টিতে চরম ধ্বংসাত্মক। আমাদের মতে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐক্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টি এবং সবার প্রতি সুবিচার ও সন্তোষজনক ব্যবহার করতে সক্ষম একটি ন্যায়বিচারপর্ণ ব্যবস্থা কায়েমের ওপরই পাকিস্তানের স্থিতি, এর সকল নাগরিকের শান্তি এবং এর আজাদী ও স্বাধিকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

৩। আমাদের মতে, যে কারণগুলো পাকিস্তানের ঐক্যানভুতিকে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেগুলোর মধ্যে বিগত শাসনকালগুলোতে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতি কৃত অবিচারই বহুলাংশে দায়ী। আমরা এই সকল অবিচার ও বেইনসাফীর প্রতিকার করা একান্ত জরুরী মনে করি এবং দেশের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রেখে প্রত্যেক এলাকার লোকদেরকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে একান্ত ইচ্ছুক।

৪। আমাদের মতে যে সব মুসলমান ভারতে বাস্তুভিটা ছেড়ে পাকিস্তানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, দেশের প্রাচীন বাশিন্দাদের সাথে তাদের সকল ক্ষেত্রেই সমান অধিকার রয়েছে। তারা যে এলাকায়ই এসে বসতি স্থাপন করেছে, সে এলাকার পুরোনো বাশিন্দা এবং এই নয়া বাশিন্দাদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে কোনরুপ পার্থক্য করা আদৌ বৈধ নয়। আমরা 'দেশ মাতৃকার সন্তান' (son of the soil) এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনৈসলামী বলে মনে করি। পরন্তু বহিরাগত মুসলমানরা ভাষা, চালচলন ও জীবনধারার দিক দিয়ে আপন এলাকার লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বিদেশীর ন্যায় ব্যবহার করার দৃষ্টিভঙ্গিকেও আমরা নেহাত অবাঞ্ছিত মনে করি। তারা যদিও স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবেই, কিন্তু এটি তাদের সমান অধিকার দেয়ার ব্যাপারে কোনো পূর্ব-শর্ত হতে পারে না।

৫। আমরা বাংলা ও উর্দু ভাষাকে সারা দেশের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করি এবং এর কোনটিকেই বিশেষ কোনো এলাকার নির্দিষ্ট ভাষা আখ্যা দেয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী।

---

[২৪১] Sheelendra Kumar Singh/Bangladesh Documents (Vol. 01) \ [South Asia Books (Delhi) - June, 1999] p. 66-70 (abridged)]

৬। আমাদের মতে দেশের প্রতিটি নাগরিক পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানদারীর সাথে নিম্নোক্ত ছয়টি মূলনীতি সম্পর্কে একমত না হলে এবং কার্যতঃ এর অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে পাকিস্তানে কোনো স্থায়ী ও সৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না :

প্রথম এই যে, দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু অধিবাসী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী। এ কারণে যারা এর সাথে একমত নয়, তাদেরও সংখ্যাগুরু জনগণের মত অনুসারে দেশে উক্ত জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিতে হবে এবং অগণতান্ত্রিক পন্থায় এর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে যারা ষড়যন্ত্র ও হাঙ্গামার সাহায্যে পাকিস্তানে কোনো অনৈসলামী জীবন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসী, তারা এ দেশের ঘোর দুশমন এবং তাদেরকে প্রতিহত করা দেশের প্রতিটি শুভাকাংখীর পরম কর্তব্য।

দ্বিতীয় এই যে, দেশ সমগ্র দেশবাসীর - কোনো বিশেষ শ্রেণীরও নয়, গোষ্ঠীরও নয়। এ কারণে সাধারণ অধিবাসীকে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে বেদখল করে শাসন কর্তৃত্বকে নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার কারুর নেই।

তৃতীয় এই যে, দেশের সরকার পরিচালনা করা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ আর সরকারি কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে তাদের নির্দেশ অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেসব সরকারি কর্মচারী জনপ্রতিনিধিদের আনুগত্য করতে ইচ্ছুক নয় কিংবা তাদের গৃহীত নীতিতে সন্তুষ্ট নয় অথচ নিজেদের বিশেষ মতবাদকে চালু করতে ইচ্ছুক, তাদের উচিত চাকুরী ছেড়ে গণতান্ত্রিক ও নিয়মানুগ পন্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা কিন্তু সরকারি চাকুরীতে বহাল থেকেই একটি রাজনৈতিক চক্র গড়ে তোলা এবং দেশের প্রশাসন ও প্রতিরক্ষার জন্যে দেয়া ক্ষমতাকে দেশ দখলের জন্য ব্যবহার করার অধিকার কারুর নেই।

চতুর্থ এই যে, জনগণ যাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচিত করবে, তারাই হচ্ছে দেশের সত্যিকার প্রতিনিধি। প্রলোভন, চাপ, ধোকা, দুর্নীতি এবং সরকারি প্রভাব দ্বারা নির্বাচন বিজয়ীরা মূলতঃ জবর-দখলকারী এবং গণতন্ত্রের হত্যাকারী। এ দেশের রাজনৈতিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি লোকেরই এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত যে, ভবিষ্যতে তারা নিজেরাও কখনো নির্বাচনে এই পন্থাগুলো অবলম্বন করবেনা আর জাতির সাথে এরূপ গাদ্দারীতে লিপ্ত ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর সাথেও সহযোগিতা করবে না।

পঞ্চম এই যে, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে জনমত গঠনের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলেরই রয়েছে। এই অধিকারের ওপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত নয় এবং এ পথে রাষ্ট্রক্ষমতা পর্যন্ত উপনীত হওয়া প্রত্যেকের জন্যেই বৈধ। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা কারুর পক্ষেই বৈধ নয়। কেউ এভাবে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলেও দেশের মঙ্গলের খাতিরেই তার এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

ষষ্ঠ এই যে, জাতীয় সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ইত্যাকার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জনগণ দেশের পরিস্থিতি ও বিভিন্ন মহলের মতামত জানতে এবং জাতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে মত স্থির করতে পারে। এই মাধ্যমগুলোকে কখনো সত্যকে গোপন করার এবং কারুর পক্ষে একতরফা প্রচারে নিয়োগ করা উচিত নয়। জনগণ যদি দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত না হয় এবং প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকরূপে তাদের সামনে উপস্থিত না হয়, তাহলে গণতন্ত্র কখনো বিকাশ লাভ করতে পারবে না।

৭। আমাদের মতে পাকিস্তানে কর্মরত রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নোক্ত আচরণবিধি মেনে না চললে এখানকার রাজনৈতিক জীবন সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে না :

(১) পাকিস্তানের আদর্শ (অর্থাৎ ইসলামী জীবন পদ্ধতি) এবং দেশের সংহতি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কাজ করবে না।

(২) যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ও সমালোচনার সীমা অতিক্রম করে কোনো পার্টি কিংবা তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা অপর কোনো পার্টি কিংবা তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও অশালীন প্রচার চালানো কিংবা এমন কোনো অপবাদ দেবেন না যার প্রমাণ পেশ করতে তারা অপারগ। দেশের আইনেও এটা নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত যে, নির্বাচনের কথা ঘোষিত হবার পর যে ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো পার্টি কিংবা তার কোনো নেতা অথবা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবে, তার প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে। যদি সে অপবাদ প্রমাণ করতে না পারে, তবে তাকে আইনতঃ শাস্তি দেয়া হবে। পরন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো পার্টি যদি অন্য কোনো পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালায় তাহলে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে অযোগ্য ঘোষিত হবে।

(৩) প্রত্যেক পার্টিরই সভা, শোভাযাত্রা ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভকে পন্ড করার কিংবা তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারুর নেই। বিশেষ করে নির্বাচনী অভিযান কালে কোন পার্টি যদি এরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করে, তাহলে তার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে না–এই মর্মে নির্বাচনী আইনেও ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৪) দেশে হিংসাত্মক পন্থায় বিপ্লব অনার চেষ্টা করা এবং তার পক্ষে প্রচার চালানো কিংবা গণতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে জোরপূর্বক দেশের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক অভিযান চালানোর অধিকার কারুর নেই। যে পার্টি এরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করবে, তাকে একটি পার্টি হিসেবেই কাজ করার অধিকার দেয়া উচিত নয়।

(৫) কোনো ব্যক্তি, কোনো পার্টি কিংবা তার কোনো নেতা ইচ্ছা করলে নির্বাচন বয়কট করতে পারেন; কিন্তু কেউ যদি এই মর্মে ঘোষণা করে যে, নির্বাচন হতে দেবেনা কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের জোরপূর্বক বাধা দেয়া হবে অথবা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের কার্যক্রম চলতে দেয়া হবে না, তাহলে তার দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারই শুধু ছিনিয়ে নেয়া উচিত নয়, বরং এরূপ কথাবার্তাকে আইন অনুসারে পুলিসের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ ঘোষণা এবং এসবের শাস্তিও নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।

(৬) নির্বাচনের কথা ঘোষিত হবার পর এবং নির্বাচনী অভিযান কালে প্রত্যেক পার্টি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণ পরিহার করবে :

(ক) টাকার বিনিময়ে কিংবা অন্য কোনো প্রলোভনে ভোট সংগ্রহ করা,

(খ) ভোটারদের ওপর সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে কিংবা আপন কর্মী ও সমর্থকদের মাধ্যমে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করে ভোট সংগ্রহ করা,

(গ) আঞ্চলিক, ভাষাগত, গোষ্ঠীগত কিংবা বংশগত দোহাই পেড়ে ভোটের আবেদন জানানো।

(৭) প্রত্যেক পার্টিকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে সে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিহার করবেঃ

(ক) সরকারি কর্মচারী এবং সরকারি উপায়-উপকরণকে পার্টির স্বার্থে ব্যবহার করা।

(খ) দেশের প্রচারমাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলোকে আপন পার্টির পক্ষে ও বিরোধী পার্টিগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারে নিয়োগ করা,

(গ) সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মঞ্চের স্বাধীনতার ওপর আপন পার্টির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা,

(ঘ) লাইসেন্স, পারমিট কিংবা অন্য কোনো আর্থিক স্বার্থের দ্বারা অন্য পার্টিতে ভাঙ্গন ধরানো অথবা তাদের সাহায্যে আপন পার্টির সংখ্যা-শক্তি বাড়ানো কিংবা আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে এইসব উপায় অবলম্বন করা।

(৮) কোনো পার্টি যদি পাকিস্তানের ইসলামী ভিত্তিকে না মানে কিংবা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায় অথবা পাকিস্তানের অখন্ডতা ও নিরাপত্তার বিরোধী হয়, তবে তার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে না।

দুই.

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বায়ত্ব শাসন

১। আমরা প্রথম পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে নিম্নরূপ সংশোধনের পর দেশের শাসনতন্ত্র বলে ঘোষণা করতে চাই:

(১) ফেডারেল কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করা হবে। নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব থাকবে আর উচ্চ পরিষদে সকল প্রদেশকে সমান প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে। উভয় পরিষদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে যৌথ অধিবেশন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ভোট দানের এমন পদ্ধতি রাখা হবে, যাতে যৌথ অধিবেশনের সিদ্ধান্তে দেশের কোনো এলাকার প্রতি অবিচার হতে না পারে।

(২) এক ইউনিট ভেঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশগুলো বহাল করা হবে। কোয়েটা ও কালাত বিভাগ এবং লাসবেলাকে একটি পূর্ণ প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হবে। করাচীকে সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং বাহাওয়ালপুরকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হবে।

স্বায়ত্ব শাসন

(৩) প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, মুদ্রা ও ফেডারেল অর্থ, (Federal Finance) বৈদেশিক ও আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ এবং অন্যান্য সর্বসম্মত বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং এই বিভাগগুলো পরিচালনার জন্যে কেন্দ্রের সরাসরি ট্যাক্স ধার্য করারও অধিকার থাকবে।

(৪) উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয় শাসনতন্ত্র মোতাবেক উভয় অঞ্চলে গঠিত সরকারগুলোর হাতে ন্যাস্ত করা হবে এবং তাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন থাকবে।

(৫) বর্তমান আজাদ সীমান্ত এলাকাগুলোকে পুরোপুরি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতি অনুযায়ী ভোটের অধিকার দেয়া হবে। সেখানে পাকিস্তানের সকল আইন-কানুন জারী করা হবে এবং পাকিস্তান থেকে তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা সকল দিক থেকে খতম করে দেয়া হবে।

২। উল্লেখিত সংশোধনীর পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র যদি দেশের শাসনতন্ত্ররূপে স্বীকৃতি পায় এবং শাসন ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের কাছে ন্যাস্ত করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা উক্ত শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনীর চেষ্টা করবো:

(১) কোরআন ও সুন্নাহকে আইনের প্রধান উৎস (Chief Source of Law) বলে স্বীকার করা হবে।

(২) অতীতের সকল অনৈসলামী আইন-কানুনকে যথাসম্ভব শীগগীর ইসলামী ধারায় পরিবর্তিত করার জন্যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) সর্বস্তরে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হবে। পাকিস্তানের প্রত্যেক অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেয়া হবে কিংবা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) রীতি অবলম্বন করা হবে।

(৪) মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো থেকে সমস্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বিধিনিষেধ খতম করা হবে। বিশেষত নিবর্তনমূলক আটকের বিধিকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে, যাতে করে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান ছাড়া কারুর ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যেতে না পারে।

(৫) বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও পুরোপুরি স্বাধীন করে দেয়া হবে।

(৬) জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার ক্ষমতা নাকচ করা হবে।

(৭) সামরিক আইন জারী এবং ইন্ডেমনিটি এ্যাকটের ন্যায় আইন তৈরীর সীমাহীন ও শর্তহীন অধিকারকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সীমিত করা হবে।

(৮) পাকিস্তানের সাধরণ নাগরিকদের যেমন বেসামরিক আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার রয়েছে, তেমনি সামরিক কর্মচারীদেরকে সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার অধিকার দেয়া হবে।

(৯) প্রেসিডেন্ট পদ, উজির পদ এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যে শপথ নেয়া হয়, তাতে এ বিষয়টিও শামিল করা হবে যে, তাঁরা বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে আপন দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলামী বিধান মেনে চলবেন।

(১০) সামরিক কর্মচারীসহ সকল সরকারি কর্মচারীদের থেকে এই শপথ নেয়া হবে যে, তারা কখনো দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করতে উদ্যোগী উর্ধতন অফিসারের নির্দেশ মানবেন না।

(১১) যারা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহর (ছ) পর অন্য কাউকে নবী বলে মানে এবং তার নবুয়্যতের প্রতি অবিশ্বাসী লোকদেরকে কাফের বলে আখ্যা দেয়, তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করা হবে। কেননা তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের মুসলমানরাই অমুসলিম সংখ্যাগুরু।

তিন.

পূর্ব পাকিস্তান

১। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করা এবং সকল দিক থেকে একে পশ্চিম পাকিস্তানের সমমানে উন্নীত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপায় অবলম্বন সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হবে :

(১) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় (যার মধ্যে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যত বৈদেশিক ঋণও থাকবে) পূর্ব পাকিস্তানের আনুপাতিক হিস্যা আদায়ের পর সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় করা হবে। পরন্তু আর্থিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন।

(২) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম-সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক এলাকার সদস্যরা আলাদা আলাদাভাবে এই বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করবেন।

(৩) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি পাচার প্রতিরোধ এবং এর কার্যকারণ দূর করার জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হবে। তাছাড়া এখানে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগকে (Capital Formation and Investment) সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল চাকুরীতে জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

(৫) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে সকল সম্ভাব্য উপায়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এ উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানেও সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। এছাড়া, স্থল, নৌ ও বিমান এই তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আনুপাতিক হারে লোক ভর্তি করা হবে এবং পাকিস্তান নৌ বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হবে। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (Defence Council) গঠন করা হবে।

(৬) স্থল ও বিমান বাহিনীর ডেপুটি প্রধান সেনাপতিদেরকে (Deputy Commander in Chiefs) পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনের সময় কার্যকর ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণের উপযোগী ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

(৭) দেশের সম্পদ ও উপায়-উপকরণ এমনভাবে বণ্টন করা হবে, যাতে উভয় অঞ্চলের মাথাপিছু আয় সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ, গঙ্গা ও তিস্তার ওপর অবিলম্বে বাধ নির্মাণ, ব্রহ্মপুত্র বাধ ও পুল প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং পূর্ব পাকিস্তানে পানি সেচ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে, যাতে করে কৃষকরা খুব কম মূল্যে ব্যাপক পানি সেচের সুবিধা পেতে পারে।

(৯) ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে যত আমানত (Deposits) ও কিস্তিমূল্য (Premium) আদায় করবে, তা পুরোপুরি পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় করা হবে॥"[২৪২]

০৫.

পাকিস্তান মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহার (সংক্ষেপিত)

"... পাকিস্তান একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং ইসলাম পাকিস্তানের অপরিহার্য শর্ত। পাকিস্তানের প্রতিটি অঙ্গে ইসলামী জীবনবোধ এবং মূল্যমানের বিশ্বস্ত রূপায়ন, বাস্তবায়ন এ সংসাধনের যোগ্যতা আমাদের থাকিতে হইবে, কারণ আমাদের এই যোগ্যতার উপর নির্ভর করে পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি এবং উত্তরোত্তর উন্নতি।

নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদিন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমাদের আলোচনা অনিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থক সংশয়াপন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সীমিত রহিয়াছে। ফলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, শাসন ও নিয়ম পদ্ধতি বলতে বস্তুত কি বুঝায় সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জ্ঞানের পরিবর্তে দেশ অভ্যন্তরে এবং বাহিরে মানুষের মনে শুধু মাত্র সংশয়ের গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টি করিতেই আমরা সক্ষম হইয়াছি। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারি যে, আমরা এমন এক ক্রান্তিকালের সম্মুখীন যখন ইসলামী মূল্যমানই পাকিস্তানী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূল গঠন করিবে, এমতবস্থায় ইসলামী মূল্যমানের সুস্পষ্ট এবং বাস্তব সংজ্ঞাদান এই মুহূর্তে অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত ইহাও আমরা অনুভব করি যে, আমরা ইসলামী জীবনবোধের বাস্তব রূপায়নের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দানে ব্যর্থ হইলে শুধুমাত্র জীবনবোধের ব্যাখা এবং প্রচার দ্বারা অমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে সক্ষম হইব না। ইসলামী মূল্যমান অমর বলিয়াই অপরিবর্তনীয়। ইসলামী মূল্যবোধ সবকালে সবযুগে গতিশীল পৃথিবীর যেকোন চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করতে সক্ষম। জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতার সহিত তাল রাখিয়া তাই মূল্যবোধ

---

[২৪২] নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭০/জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান॥ [প্রচার বিভাগ - ২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯। পৃ. ৭-১৭ (সংক্ষেপিত)]

বাস্তবায়িত করিবার গতিও অবশ্যই পরিবর্ত্তীত হইতে পারে। ইহা সুস্পষ্টরুপে প্রতিয়মান যে জোড়াতালি দিয়া পাকিস্তানে ইসলামী পদ্ধতির প্রবর্তন কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছুই নহে। ইহার জন্য সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজন এবং গনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় বিপ্লব সম্ভব।

পাকিস্তানের জনগনের প্রতি এই দলের অবিচলিত আস্থা এবং অটুট বিশ্বাস রহিয়াছে। এই দল বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে জনগনের হাতেই চরম ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। কাজেই মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ ভাবে জনগনের নিকট হইতে শক্তি অর্জন করিতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাইবে।

১৯৫৮ সালে সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করার পর ১৯৬২ সালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং দলীয় কর্মীদের প্রতিনধিত্বশীল একটি কনভেনশন কর্তৃক করাচিতে মুসলিম লীগ পুনর্জীবিত করা হয়। বিস্তৃত কার্যসুচীসহ পাকিস্তান মুসলিম লীগকে একটি গনতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে পুনঃগঠিত করা হয়।

কোন সংগঠনই ত্রুটিহীন নহে। এতদসত্বেও, পিএমএল দ্বিধাহীন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে দাবি করিতে পারে যে, ইহাই পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় দল যাহা একদিন কায়েদে আযমের নেতৃত্বে সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান হাসিল করিয়াছে এবং অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ঐক্য এবং সংহতির জন্য কার্যরত রহিয়াছে। পৃথিবীতে আদর্শ শান্তির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিবর্তন সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য।

... কোরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রনয়ন করা হইবে না ইহা বলাই যথেষ্ঠ নহে, কারণ ইসলাম শুধুমাত্র আইন সঙ্গত বিধি ব্যবস্থায়ই নহে বরং ইসলাম ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধিও বটে। সুতরাং জনগণের দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিটি দিকের সমুচিত পরিপুষ্টির জন্য মুসলিম লীগ প্রচেষ্টা চালাইবে।

মানব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শ দ্বারা মুসলিম লীগ অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হইবে। দেশের সামগ্রিক আইন ব্যবস্থাকে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সংশোধিত করা হইবে। মুসলিম লীগ ইসলামের মুলনীতির প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যকারে বিশ্বাস করে যে, ইসলাম শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেই বিশ্বাসী নহে অধিকন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক গণতন্ত্রেও বিশ্বাসী। প্রতিটি লোকেরই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার থাকিবে। যদি না সে অধিকার জনসাধারণের অধিকার নষ্ট করে।

মুসলিম লীগ এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে অভিলাষী যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে ইসলামি শিক্ষার বিশ্বস্ত রূপায়ন ঘটবে, যেখানে পৈতৃক সুত্রে প্রাপ্ত অথবা অন্য উপায়ে দখলীকৃত সম্পত্তি অথবা পেশা দ্বারা কোন মানুষের সামাজিক মর্যাদা নিরুপিত হইবে না, বরং কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে ব্যক্তিগত গুনাবলি এবং সমাজের কল্যান হইবে তাহার মাপকাঠি।

আল কোরআন আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, “সর্বাপেক্ষা সৎ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত।”

পাকিস্তান মুসলিম লীগ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ঘোষনা করিতেছে যে, ইহা এমন এক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাহে যাহা ইসলামী হইবে। এবং গণতান্ত্রিক হইবে কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক হইবে না। সরকারের সকল বিভাগ এই ভাবেই গঠন করা হইবে। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সংজ্ঞার নিকট পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রভৃতি শক্তি সমূহ মাথা নত করিতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ তাহার প্রিয় নবীর মাধ্যমে যে সমাজ কায়েম করিয়াছেন তাহার চেয়ে ভাল সমাজ ব্যবস্থা আর হইতে পারে না।

পাকিস্তানে বর্তমানে বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও বাস্তব বিধি ব্যবস্থাকে মুসলিম লীগ দলীয় ঘোষনা পর্বের আকারে সুস্পষ্ট ভাষায় পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে জনসমক্ষে পেশ করিতেছেঃ

ইসলামী বিধি ব্যবস্থা : কোরআন এবং সুন্নাহর বিধিকে দেশে চূড়ান্ত আইন রূপে গন্য করা হইবে। কোরআন এবং সুন্নাহর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রচলিত আইন বিধিকে সংশোধিত করা হইবে। দেশের সকল আইন কলেজ গুলিতে ইসলামী আইন বিধি সমূহ পাঠ্য তালিকায় রাখতে হইবে।

সামাজিক অনাচার : মুসলমানদের জন্য মদ্য এবং নেশা জনীত দ্রব্যাদি পাকিস্তানে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হইবে এবং মাদক দ্রব্যাদির ব্যবসা পাকিস্তান হইতে তিরোহিত করা হইবে। সকল প্রকার বিলাসীতা ও জাক জমকের প্রতি অর্থনৈতিক এবং প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাধা নিষেধ আরোপ করা হইবে। সরকারি এবং বেসরকারি অফিস সমূহে কোন প্রকার আড়ম্বর প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হইবে।

সহজ ও সৎজীবন যাপন সম্মানিত ও উৎসাহিত করা হইবে। ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া ও অন্যান্য সামাজিক অনাচার নির্মূল করা হইবে এবং রাষ্ট্র ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

বায়তুলমাল : জাকাত, তবলিগ এবং ওয়াক্ফ এবং বদান্যতা ও বৃত্তিমূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, অন্ধপঙ্গুসহ অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন এবং তাহাদের জন্য বিভিন্ন কার্যালয় সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রবর্তন করা হইবে। এই বিভাগের কার্য সম্পাদনের জন্য বায়তুলমাল পৃথকভাবে সৃষ্টি করিতে হইবে।

প্রশাসন : রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র জনগনের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে। অহেতুক হয়রানি বা কর্তৃত্বের জন্য নয়। সরকারি কর্মচারীদের ট্রেনিং জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক হইবে। প্রশাসন ক্ষেত্রে লাল ফিতার দৌরাত্ম অবশ্যই নিরসন করিতে হইবে। প্রশাসন বিভাগ প্রত্যেক ব্যাপারে আইন পরিষদের নিকট জবাবদিহি থাকিবে।

রাজনৈতিক ভূমিকা : পাকিস্তান মুসলিম লীগ পাকিস্তানে এমন একট গণ সরকার কায়েম করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা জনগণের আশা আকাঙ্খা রূপ লাভ করিবে।

ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার পাকিস্তানে প্রবর্তন করা হইবে। কর্তব্য পালনে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে নিম্নলিখিত বিষরের দায়িত্ব অর্পিত হইবে :

১। দেশ রক্ষা ২। পররাষ্ট্র ৩। মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় কর ব্যবস্থা। ৪। আন্তঃ অঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ৫। বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য দেশরক্ষা বিভাগ কেন্দ্রীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হইবে, কিন্তু সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগে, সামরিক অফিসারদের ট্রেনিং, সামরিক অস্ত্রসম্ভার ও উৎপাদনসংরক্ষণ ও সুসজ্জিত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী ইত্যাদি বিভাগে যাহাতে পাকিস্তানের পূর্ব-পশ্চিম উভয় অংশ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে এবং দেশ রক্ষা ব্যবস্থায় পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণ সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা অনুভব করে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

* নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হইবে। সামরিক বাহিনীর সহকারী কমাণ্ডার ইন-চীফ এর সদর দফতর পূর্বপাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে।
* প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রদেশের প্রয়োজনীয় বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে এবং বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের বিলিবন্টন জনসংখ্যার ভিত্তিতে করা হইবে।
* পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্য হইতে মুক্ত করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। বৈদেশিক সাহায্য না পাইলে কোন জাতি নিঃশ্বেস ধ্বংস হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা অবাস্তব।

আইন পরিষদ :

* কেন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন পূরনার্থে করধার্যসহ আইন প্রনয়নের ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ফেডারেল সরকারের কর্তব্য আন্ত: আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

* সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠিত হইবে। এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি আইন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনযন্ত্রেও প্রদেশগুলি প্রতিনিধিত্ব করিবে।

* পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হইবে।

স্বায়ত্বশাসন :

* মুসলিম লীগ ফেডারেল পদ্ধতির সরকারের আওতায় পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর। মুসলিমলীগ বিশ্বাস করে যে ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখিয়া ফেডারেল সরকারের অধিনস্থ প্রতিটি প্রদেশকে সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা অর্পনের নিশ্চয়তা বিধান করবে। অন্যান্য বিষয়াদি ও অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের নিকট ন্যাস্ত হইবে। এই নীতি অনুসারে প্রতিটি অঞ্চল ও প্রদেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য ক্ষমতা এবং জাতি গঠণ মূলক বিষয়গুলি ফেডারেল সরকারের আওতাভুক্ত প্রদেশগুলির কতৃত্বাধীনে রাখা হইবে।

* সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠিত হইবে এবং প্রত্যক্ষ গণভোটের মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

বিচার বিভাগ আইন সংস্কার :

* বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বনির্ভর করা হইবে। বিচার বিভাগের অফিসারগণকে অভিজ্ঞ আইনজীবি ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইবে।

* পাকিস্তানে সুপ্রিম কোর্ট আপিলগ্রহণের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে গণ্য হইবে। সুপ্রিম কোর্টের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরীত করা হইবে।

* ন্যুন ব্যয় ও তৃরিত বিচারের নিশ্চয়তা করে আইন সংশোধন করা হইবে।

* শোষনমূলক ও অনৈসলামিক বিধি দূরিকরনার্থে আদালত ও ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হইবে।

মৌলিক অধিকার :

ধর্ম, সম্প্রদায় ও বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের স্বাধীনতা আইনের আদালতে যুক্তিযুক্ত হইতে হইবে।

পররাষ্ট্র নীতি : পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ইহার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিরূপিত হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অন্যান্য জাতির সহিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরন : বৈষম্য দূরীকরণ এক জাতীয় সমস্যা। গত ২২ বছর যাবৎ এই সমস্যা জাতীয় সংহতিতে বাধার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কাজেই এই সমস্যা জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে সমাধান করিতে হইবে।

আন্তঃ প্রাদেশিক ও আভ্যন্তরীন বৈষম্যের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দশ বছরের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নিম্নোক্ত বিধি ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে :-

* কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতর সমূহের সামরিক চাকুরী সহ ১ম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে প্রদেশগুলির জনসংখ্যানুপাতে লোক নিয়োগ করিতে হইবে। প্রদেশগুলির জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য সহকারে সামগ্রীক ক্যাডারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হইবে এবং এই বাস্তব ভিত্তিতেই বিভাগীয় পদন্নোতি নিরূপণ করা হইবে।

* অনুন্নত প্রদেশ সমুহের উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় করা উচিৎ এবং উন্নয়নের জন্য এই সমস্ত প্রদেশের অনুন্নত এলাকাগুলিকে উন্নয়নের জন্য সুস্পষ্টভাবে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। বরাদ্দানুপাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদেশের দায়িত্বে থাকিবে।

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল প্রতিরক্ষা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান সমূহে আসন সংরক্ষন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আরও প্রতিরক্ষা ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

* বিদেশ ও পাকিস্তানী ব্যবসা প্রতিষ্টানসমূহের ডিষ্ট্রিবিউটরশিপ ও সোল এজেন্সী যে দেশে বিতরণ ও বেচাকেনা হইবে সেখানকার জনগনকে অবশ্যই দিতে হইবে।

* ষ্টেট ব্যাঙ্ক, শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, গৃহ নির্মান সাহায্য সংস্থা পিকিক, আইসিপি প্রভৃতি সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে।

* এক প্রদেশ হইতে অন্য দেশে পুঁজিপাচার, অনুন্নত এলাকার পুঁজি বিনিয়োগ, চাকুরীতে জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব, উন্নয়ন ও বাণিজ্য খাতে বরাদ্দ এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের অন্যান্য পন্থার উপর সতর্ক দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের উদেশ্যে পরিষদ সদস্য সমবায়ে একটি বোর্ড গঠন করা হইবে।

মোহাজির পুনর্বাসন : পাকিস্তান হাসিলে অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের অপূর্ব কোরবানী কোন সচেতন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ভুলিয়া যাইতে পারে না। যে সমস্ত মুসলমান বলপ্রয়োগে তাহাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে পাকিস্তানে আসিতে হইয়াছে, বিনা বাধায় তাহাদের পুনর্বাসন ও পাকিস্তানী নাগরিকের সম মর্যাদা ও নাগরিকত্ব প্রদান করা হইবে। পাকিস্তানের পাক জমিনে মুহাজিরদিগকে পুনর্বাসনের ব্যাপারে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালানো পাকিস্তান মুসলিম লীগ ফরজ বলিয়া মনে করে। বাস্তুহারাদের সম্পত্তিজনিত সমস্যা ও সম্পত্তি বিনিময় সযত্নে সমাধান করা হইবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় : পাকিস্তানে সংখ্যাগুরুদের ন্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ধর্মীয় জ্ঞান লাভ ও ধর্মকার্যে সমঅধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে। জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, প্রার্থনার স্থান সমুহ এবং সমস্ত সম্পত্তি সযত্নে রক্ষার নিশ্চয়তা সরকার প্রদান করিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকুরীতে সংখ্যলঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিবে॥"২৪৩

০৬.

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ

[সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত রাজনৈতিক সম্প্রচার শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ তিনি বেতার ও টিভিতে নিম্নলিখিত ভাষণ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে ইংরেজিতে রেকর্ডিং করা হয়। বাংলা ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো।]

---

২৪৩ ঘোষণাপত্র ১৯৭০/পাকিস্তান মুসলিম লীগ॥ [প্রাদেশিক মুসলিম লীগ (ঢাকা) - ১৯৭০। পৃ. ১-৩০ (সংক্ষেপিত)]

আন্তঃ প্রাদেশিক ও আভ্যন্তরীন বৈষম্যের পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দশ বছরের মধ্যে এই সমস্য সমাধান করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নিম্নোক্ত বিধি ব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে :-

* কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দফতর সমূহের সামরিক চাকুরী সহ ১ম শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে প্রদেশগুলির জনসংখ্যানুপাতে লোক নিয়োগ করিতে হইবে। প্রদেশগুলির জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য সহকারে সামগ্রীক ক্যাডারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হইবে এবং এই বাস্তব ভিত্তিতেই বিভাগীয় পদন্নোতি নিরূপণ করা হইবে।
* অনুন্নত প্রদেশ সমুহের উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন বাজেটের দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় করা উচিৎ এবং উন্নয়নের জন্য এই সমস্ত প্রদেশের অনুন্নত এলাকাগুলিকে উন্নয়নের জন্য সুস্পষ্টভাবে শিহ্নিত করা প্রয়োজন। বরাদ্দানুপাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদেশের দায়িত্বে থাকিবে।
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল প্রতিরক্ষা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান সমূহে আসন সংরক্ষন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আরও প্রতিরক্ষা ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।
* বিদেশ ও পাকিস্তানী ব্যবসা প্রতিষ্টানসমূহের ডিষ্ট্রিবিউটরশিপ ও সোল এজেন্সী যে দেশে বিতরণ ও বেচাকেনা হইবে সেখানকার জনগনকে অবশ্যই দিতে হইবে।
* ষ্টেট ব্যাঙ্ক, শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, গৃহ নির্মান সাহায্য সংস্থা পিকিক, আইসিপি প্রভৃতি সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে।
* এক প্রদেশ হইতে অন্য দেশে পুঁজিপাচার, অনুন্নত এলাকার পুঁজি বিনিয়োগ, চাকুরীতে জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব, উন্নয়ন ও বাণিজ্য খাতে বরাদ্দ এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের অন্যান্য পন্থার উপর সতর্ক দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের উদেশ্যে পরিষদ সদস্য সমবায়ে একটি বোর্ড গঠন করা হইবে।

মোহাজির পুনর্বাসন : পাকিস্তান হাসিলে অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের অপূর্ব কোরবানী কোন সচেতন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ভুলিয়া যাইতে পারে না। যে সমস্ত মুসলমান বলপ্রয়োগে তাহাদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের সন্ধানে পাকিস্তানে আসিতে হইয়াছে, বিনা বাধায় তাহাদের পুনর্বাসন ও পাকিস্তানী নাগরিকের সম মর্যাদা ও নাগরিকত্ব প্রদান করা হইবে। পাকিস্তানের পাক জমিনে মুহাজিরদিগকে পুনর্বাসনের ব্যাপারে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালানো পাকিস্তান মুসলিম লীগ ফরজ বলিয়া মনে করে। বাস্তুহারাদের সম্পত্তিজনিত সমস্যা ও সম্পত্তি বিনিময় সযত্নে সমাধান করা হইবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় : পাকিস্তানে সংখ্যাগুরুদের ন্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ধর্মীয় জ্ঞান লাভ ও ধর্মকার্যে সমঅধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিবে। জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, প্রার্থনার স্থান সমুহ এবং সমস্ত সম্পত্তি সযত্নে রক্ষার নিশ্চয়তা সরকার প্রদান করিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকুরীতে সংখ্যলঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিবে৷৷"[২৪৩]

০৬.

শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী ভাষণ

[সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত রাজনৈতিক সম্প্রচার শীর্ষক বক্তৃতামালায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বক্তা ছিলেন। ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ তিনি বেতার ও টিভিতে নিম্নলিখিত ভাষণ দেন। পূর্ব পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্যে ইংরেজিতে রেকর্ডিং করা হয়। বাংলা ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো।]

---

২৪৩ ঘোষণাপত্র ১৯৭০/পাকিস্তান মুসলিম লীগ ॥ [প্রাদেশিক মুসলিম লীগ (ঢাকা) - ১৯৭০। পৃ. ১-৩০ (সংক্ষেপিত)]

"আমার প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম। আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

জনগণের মুক্তির জন্যে যেসব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন সেসব বীর সন্তানদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন দিয়ে তারা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত, আমি আজ জাতীয় বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছাইনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতেই হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত ২২ বছর ধরে পাকিস্তান শাসন করেছেন, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেইসব গোষ্ঠী যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্যে সক্রিয় থাকবে। এজন্যে প্রয়োজন হলে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োজিত করবে। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনগণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষের আপোসহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তার জয় অবশ্যম্ভাশী হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশেপাশেই থাকবে, স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবিলায় সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে। কোন জাতি কোনদিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায়নি। পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবিলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হলে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম আর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যেই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি। ক্ষমতাসীন চক্র আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্যে হামলার পর হামলা চালিয়েছে, আঘাতের পর আঘাত হেনেছে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো তারা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি, বিজয়ী হয়েছি। এই বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে সংকট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে, সে সংকটসমূহের অবসান ঘটাতেই হবে। আজকে জাতীয় সংকটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়ত, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানত এগুলো বাঙালিদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবহেলিত মানুষেরও আজ একই উপলব্ধি।

আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে এবং মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা করা হয়েছে। দেশের প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের মেনিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মতো যে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে আছে তাকে অবশ্যই নির্মূল করতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাংকিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা-সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগও দুটি পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাংকের লগ্নিকৃত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ আজ মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর প্রথা কায়েম রয়েছে তা বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ অর্থ আদায় হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় করা হয়। অপরপক্ষে লবণের মতো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ও চায়ের মাধ্যমে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিম ভাবে নিম্নাহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ ও অর্থ বরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। ছিটেফোঁটা ভূমি-সংস্কার সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। তারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প, শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা, মজুরি যা বাড়ছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত ২২ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের ১৫ শত কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে। অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য তারা আমদানি করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিন গুণ বেশি বিদেশী দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি ২ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানি করতে পেরেছে। তার কারণ, বাংলাদেশের অর্জিত ৫০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করেছে। তার উপরও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানও একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার ২২ বছর গত হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বাঙালির সংখ্যা আজও শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে।

জনগণকে শুধু অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে তার শিকারে পরিণত হতে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে যেক্ষেত্রে প্রতি মণ মোটা চালের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সেক্ষেত্রে বাংলায় সে চালের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতি সের সরিষার তেলের দাম আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলায় সরিষার তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচিতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা। ঢাকায় সে সোনার মূল্য ১৫০ থেকে ১৬৫ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত ২২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছে, এসব অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন, অতীতের অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে সে যে ব্যর্থ চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি, যে কর্মসূচি ১১-দফা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কর্মসূচি আঞ্চলিক অন্যায়-অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথ নির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশী ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয়-বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। প্রস্তাবিত এই স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই দিতে হবে। এ জন্যেই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি।

এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা ও ফেডারেলের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার উর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলোকে অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেল সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষে মুদ্রাব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে এক ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল সরকার কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকরিতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ফেডারেল ইউনিটগুলো যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারি বাহিনী গঠন করে তবে তারা কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলে মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান বোধগম্য কারণেই তারা আমাদের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমাদের বিশ্বাস শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব। অন্যান্য অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন।

আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী এখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে - যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সবল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করার আশ্বাস দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম অংশ কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হতে হবে সরকারি অর্থাত জনগণের মালিকানায়।

নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মুলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারি পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে।

শৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিততর করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারী পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতি একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেইজন্যে আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসা জাতীয়করণ করা আবশ্যক। তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদনহ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারি, জায়গীরদারি, সর্দারি প্রথার অবশ্যই বিলুপ্তি সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষি ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি-সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ভূমি-রাজস্বের চাপে নিস্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি-রাজস্ব প্রথা তুলে দেবার কথা ভাবছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বনজ সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি সম্পদ গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মৌলিক ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তম্ভ সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটি সুসংহত ও

সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে বিজলী। বিপুলভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যাপকভাবে বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা পাঁচশত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে হবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিই। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধু নদীর উপর এবং বুড়িগঙ্গা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যার উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল-ব্যবস্থার উপরেও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছি। সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদকের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।

পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো নিম্ন আয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলো বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনদের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথা কুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি করে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন দরকার। চিকিৎসা 'গ্রাজুয়েটদের জন্যে ন্যাশনাল সার্ভিস' প্রবর্তনের প্রয়োজন। পল্লী এলাকার জন্যে বিপুল সংখ্যক প্যারা-মেডিকেল পার্সোনেলদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার।

শিল্প শ্রমিকরা গণআন্দোলনের মতোই অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকবার মতো মজুরি, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প কারখানায়

শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যাদানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি আশা করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হলে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে সেই মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে-অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এই শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোন আইনই এ দেশে পাস হতে পারে না, চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোন মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এজন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যিকারের স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে হবে।

আমরা ইতিপূর্বে 'সিয়াটো-সেন্টো' ও অন্যান্য জোট থেকে সরে আসার দাবি জানিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব - এই নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

আমরা মনে করি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচি ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচন জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ করে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট রূপে আমরা গ্রহণ করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এই কারণেই আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্রবাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসেবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে - আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবিলা করবোই। প্রকৃত ও প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশের সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইনশাআল্লাহ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো॥”[২৪৪] (*দৈনিক আজাদ*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০)

০৭.

মওলানা ভাসানীর নির্বাচনী ভাষণ

[The following is the English rendering of the text of the Radio and Television address by National Awami Party Chief, Maulana Bhashani, which was broad-cast and telecast on November 5.]

"... The object of the next elections is to frame the best possible constitution for Pakistan. A constitution serves as a heart for the country. A country cannot be administered without a constitution as a man cannot live without a heart.

I appeal to the people and request them that the election should be completed in a peaceful manner and in a democratic fashion. The people should place their demand before the candidates contesting the forthcoming elections, so that these demands are implemented.

I also appeal to the candidates that the election process should be completed peacefully, there should be no trouble so that the Nation does not have to face with more chaos. Nothing should be done to make bloodshed in the country and all possible steps should be taken to complete the elections in an atmosphere of love and affinity, and in spite of ideological differences, friendships can be maintained.

In every country of the world democracy is established through election, and we should feel it as our duty to maintain law and order, and make every effort for this purpose.

I had even earlier asked president Yahya Khan that whether you are from East or West, you should call a National Convention of all Political Parties, Minorities, Trade Unions. Peasants and Student Leaders, so that they can present their view point for the formulation of an agreed constitution.

Love Pakistan. Even if there are thousands of differences among us; all should love Pakistan. We have to formulate such a constitution as could safeguard the integrity of the country, by way of meeting the demands and needs of peasants, workers, class III and class IV employees, primary, secondary and higher teachers, and their demands are implemented. Capitalists and moneyed people should not be allowed, not they be the only persons to become people's representatives.

---

[২৪৪] আনু মাহমুদ/বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ॥ [ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স - ফেব্রুয়ারি, ২০১৭। পৃ. ৪৩-৫৩]

I had suggested earlier that through mutual consultations, if an agreed portion of the constitution was first framed, at a National conference the remaining constitution making work will become easier inside the Constituent Assembly. But the Government did not accept my request till today.

The name of this country is Pakistan, there is no such country anywhere in the world.

If somebody indulges in getting bribes, and tries to represent the people he will never frame a law to punish corrupt officials. The one who himself is corrupt, can never have a good advice for others. The persons, who drink or indulge in blackmarketing and exploit the people, are destroying the country.

The people who have connection with foreign countries, and even with enemylike countries, they can never do anything for the welfare, prosperity, and progress of Pakistan. That's why it should have been arranged that black marketers, drunkards, and those who do not love Pakistan, or spy for other countries, should not be allowed to become people's representatives.

It is regrettable that it has become a custom in my country that those who come in power do not properly represent their people.

Since the creation of Pakistan, no honest, poor Pakistani could get a chance to become a representative. The reason is quite clear that the Government have imposed a restriction that anyone desirous to fight elections must deposit a sum of rupees one thousand as security. The peasants who constitute 85 percent of population do not have rice or flour and how they can deposit a security of rupees one thousand. Therefore, they remain completely deprived.

The workers who constitute 10 percent of the population also live a miserable life and the wages they get are the lowest in the world.

Condition of peasants and laborers in both wings of the country is similar, and both lack ever-basic facilities here including food, education.

Ninety-five percent of the population is illiterate; they cannot write even their names. Therefore, I had demanded that on population basis 95 percent seats in the Assemblies should be reserved for peasants and laborers. A peasant or a laborer cannot contest elections against jagirdars, industrialists and corrupt retired Government officials. Therefore, in the prevailing circumstances he can never have an access to the Assemblies. They can neither have a hand in the affairs of constitution making nor in law-making.

In West Pakistan jagirdars own land and cultivators have nothing. If a cultivator dies he does not have small piece of land for his grave.

In such circumstances if he opposes jagirdar or nominates his own representative or he votes against the landlord, the landlord will subject him to forceful eviction from the land.

It is an old custom that the peasants are forced to favor their landlord. They are considered duty bound to vote for the man who happens to be their landlords. If we do not do so we will die unfed, we will be forced to die along with our hungry families.

In such conditions no peasant will vote against his landlord. Neither he will support anyone else than his jagirdar, because everyone is aware of the consequences to follow.

Even during the British rule over the Indo-Pak sub-continent, a few seats had been reserved for laborers but after that laborers of Pakistan could not get even that right.

I appeal to the Government and all political leaders in the name of God to make a constitution which could ensure food, education, and provision of all fundamental rights to the peasants and reserve seats in Assemblies for laborers and peasants on population basis. Minimum wage of laborers should be fixed at Rs. 250.00 per month.

In our country big officials get high salaries, live a luxurious life and possess big buildings but on the other hand school teachers, other Government employees and laborers are starving. You cannot send your children to school even up to primary standard. Education up to Secondary standard should be made compulsory, free and without any expenditure. This demand should be fulfilled.

I request that land should be distributed among the landless peasants and agricultural laborers. Those jagirdars, who possess 10 or 12 bungalows and have six sons 10 augment the income of their families, will not fall short of money is their jagirdaris are abolished. But how landless peasants whose number runs in to thousands and lakhs can make both ends meet should be realized by you.

If the state confusion continues, the constitution would not prove useful, no Government will be permanent, the poor people will continue lamenting, the problems will continue to increase, the confusion will increase. In this state of affairs, no Government backed by imperialism or by capitalists will be able to survive for more than two years. Such a Government will not last even for one year. The Government will be compelled to call the army again. It is better that we should create conditions so that we do not call the army for the second time. It is, therefore, imperative that the demands of the working classes should be included in the constitution in full. The demands of the peasants and the students should also be included in the constitution.

Education has become so costly that poor people cannot afford to send their children to schools. The expenditure side has gone up one hundred times higher. Therefore, I demand from the Government and the future representatives of the people that they should frame such a constitution which could become popular with the peasants, the labor classes and the low-paid employees. If it is not done, you will have to call the army again and the Government will have to be run with the help of the army. It is a matter of shame.

The Quaid-i-Azam had also said that the Government in Pakistan would be a democratic country. There would be no dictatorship in Pakistan nor there a military Government.

The Quaid-i-Azam had also said that the Government in Pakistan would be run by the people. The sufferings of the peasants would end. The difficulties faced by the laborers and the students would be removed.

The Quaid-i-Azam had said that every citizen of Pakistan would have equal opportunity to educate his children.

But it is a pity that despite the passage of 23 years during which several Governments came and went down, no one realized that 95 percent of the population neither knows Urdu nor Bengali nor English nor Arabic. No step was taken during the past 23 years in this direction.

It was the duty of the Government to educate the people on the significance of the vote. The people should have been taught as to why a, vote is cast. This should have been done through education and publicity media.

The people should have been told as to what the meaning of vote is and what qualities are required in a person seeking vote from the people.

This is my conviction that until the Government is controlled by the jagirdars and capitalists, nothing will be done for the betterment of the peasants and the laborers. Therefore, I am of the firm belief that the salvation of the poor lies only in the path of socialism. But now when the elections have started, I will call upon the people that there should be no corruption in the elections.

The corruption has increased more than 100 percent. The corrupt people whether they are in the mills, or happen to be jagirdars or businessmen or black marketers, all of them are destroying Pakistan. You should be aware of such people and should not cast your votes for money, If all the people turn corrupt and the corruption spreads among the peasants also, this country will be ruined.

The remedy is that the people should think collectively as to how the future constitution for the country is to be framed. If possible, political leaders should afford an opportunity to meet and discuss the question of framing of constitution. If Pakistan survives, we will survive. If Pakistan is ruined, everybody including the peasants, the laborers and jagirdars, the capitalists, educated and the uneducated will all be ruined. Therefore you should move unitedly to save the country from the external and internal enemies.

You, therefore, should unite to save Pakistan from internal and external enemies, make efforts to preserve security of Pakistan, to make Pakistan prosperous, to promote unity and to do away with disruption.

Unity is the most needed thing, we pray to guidance of Allah to unite all of us, to create understanding between all the political parties to unite them so that they are on their guard against the external enemies. We are surrounded by enemies from all nooks and corners who are out to destroy Pakistan.

If Pakistan exists all the political parties in it will exist. Nobody can even dare to set up a political party of his own choice to achieve its objective if Pakistan is merged into India or assumes any other shape or becomes a confederation.

We, therefore, should stand united to make Pakistan strong and prosperous, to eliminate drinking from Pakistan to cut down unnecessary expenditure, to drive out corruption, to wipe out blackmarketing, and to prevent smuggling of edibles like rice, pulses, chilies, ghee and other articles of daily use worth lakhs of rupees to India. We should unite to award exemplary punishments to defaulters. Whosoever loves his homeland namely Pakistan is a true Pakistani.

But the one who lives in Pakistan and wants to harm it is a traitor, dishonest and an enemy of Pakistan.

I repeat my appeal to you that at least 95 percent of you should strengthen our organisation so that we can establish with God's help the rule of peasants and laborers. We will definitely establish it.

May God enable us to do so. O' God grant us the power to become honest.

We may abhor what has been prohibited by you. O' God guide us, give guidance to all the Pakistanis, give guidance to the people at the helm of affairs so that they should ignore selfish gains, should rise above their personal ends and losses, should give up gambling, should give up corruption, blackmarketing and smuggling.

O' God grant us thc power that we, the 13 crore Pakistanis, should stand united, become strong to preserve the integrity of Pakistan and to make it a strong and prosperous country.

In the event of an aggression against Pakistan we will fight to the last and never accept subjugation. We are a free nation and we will live with free thinking and in accordance with the dictates of God and the Holy Prophet. Ameen. Pakistan Zindabad. Pakistan Paindabad."[২৪৫] (এ. পি. পি, ৫ নভেম্বর, ১৯৭০)

০৮.

শহীদুল্লাহ্ কায়সারের নির্বাচনী অভিমত

"... শনিবার দিন প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে কয়েকটা শ্লোগান আমাকে বিস্মিত করেছে। বাঙ্গালীর উপর জুলুম চলবে না, অবাঙ্গালী পুঁজিপতি সাবধান - এর অর্থ কি? এর অর্থ এই দাঁড়ায় যাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলে না তাদের উপর শোষণ করলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গালী পুঁজি শোষণ করে না। যে কারখানাকে কেন্দ্র করে এই মর্মন্তুদ ঘটনা ঘঠলো, তার মালিক বাঙ্গালী। শ্রমিকরা বাঙ্গালী, যে সব পুলিশ সেখানে কর্মরত ছিল তারা বাঙ্গালী। যে পুলিশ অফিসারটি মারা গেলেন তিনি বাঙ্গালী। জেলা প্রশাসক বাঙ্গালী, তা সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী রূপ দেওয়ার চেষ্টা গর্হিত অন্যায়। অনেক তরুণ ছাত্রকেও আমি উপরোক্ত শ্লোগান দিতে শুনেছি এবং মর্মাহত হয়েছি। এই তরুণ বন্ধুদের বলি, এ মনোভাব ভ্রান্ত। এতে শ্রমিকদের স্বার্থ কিম্বা ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। বরঞ্চ এতে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের হস্তকেই শক্তিশালী করা হয়। যে সব শ্রমিক মারা গেছেন তারা বাংলাভাষী না হয়ে যদি উর্দূভাষী হতেন তবে কি তারা প্রতিবাদ করতেন না? শোষণ এবং জুলুম - সেটা যেখান থেকেই আসুক তার প্রতিবাদ করাই তরুণের ধর্ম। এ প্রতিবাদ সকল সুস্থ ও দেশ প্রেমিক নাগরিকের। এ কথাটা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।' (*দৈনিক সংবাদ* - ২৫ মে, ১৯৭০)

'... ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ যেমন ইসলাম, মুসলমান ও পাকিস্তানের নামে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করে কানা-ল্যাংড়া-খোঁড়াদের পাশ করিয়ে নিয়েছিল, ঠিক সেই কৌশল অনুসরণ করে আওয়ামী লীগও বাংলা, বাঙ্গালী তথা জয়বাংলার ধ্বনিকে তেমনি উন্মাদনার স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে তারা শতকরা শতভাগ ভোট দাবি করছেন। তাদের প্রত্যেকটি ইশতেহারে, বক্তৃতায় তারা একটা কথার উপরই জোর দিচ্ছেন। সেটা হল, আগামী নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের উপর রেফারেন্ডাম। আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার অর্থ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ভোট দেওয়া তথা বাংলার পক্ষে ভোট দেওয়া। এই দাবির ভিত্তিতেই তারা দেশবাসীর কাছ থেকে প্রত্যেকটি ভোট চাইছেন এবং বলছেন প্রত্যেক সিটে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকেই জয়যুক্ত করতে হবে।

জয় বাংলা ধ্বনিকে ঠিক পাকিস্তান ধ্বনির মত চরম উন্মাদনায় তুলে নিয়ে শতকরা শতভাগ সিট পাবার আশা তারা রাখছেন এবং ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের কৌশল অনুসরণে সমালোচকদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন। অনেকেই সেদিন মুসলিম লীগের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল কি তার অর্থনৈতিক কর্মসূচী? পাকিস্তান হলে সেখানে কোন ধরণের সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা হবে, কী হবে সেই দেশের গঠণতন্ত্র?

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন। একমাত্র বাংলা লীগের জনাব আবুল হাশিম এবং তার কয়েকজন ভক্ত মুসলিম লীগের গায়ে একটা প্রগতিশীল কর্মসূচীর জামা পরাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এটা জানা কথা ছিল যে, তারা যা বলছেন সেটা নেহাৎ প্রশ্নমুখর মধ্যবিত্ত তরুণদের

---

২৪৫ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)/সম্পা : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮২। পৃ. ৫৬৩-৫৬৭]

পক্ষে আনার জন্যই বলা হয়েছিল, আসলে মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণে তাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। বাস্তবে তা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রমিক কি ন্যায্য মজুরি পাবে? কৃষক কি জমি পাবে? পুঁজিপতিদের মুনাফা কি সংযত করা হবে? এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হয়ে মুসলিম লীগ কোন কর্মসূচীর পরিবর্তে বলেছিল - যারা এসব প্রশ্ন করে তারা 'কওমী গাদ্দার', ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন।

ঠিক অনুরূপভাবে জয় বাংলার নামে উন্মাদনা সৃষ্টি করে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ জনসাধারণের অন্যান্য জরুরী প্রশ্নগুলোকে চাপা দিয়ে কিম্বা এড়িয়ে গিয়ে বিরাট জয়কে সুনিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বভাবত:ই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) তা পারবে না এবং করবে না। মুসলিম লীগের উন্মাদনার ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে 'হিন্দু বিদ্বেষ' সৃষ্টি হয়েছিল সেটা নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করেছিল। আজও জয় বাংলার উন্মাদনা যে 'অবাঙ্গালী বিরোধী মনোভাব' সৃষ্টি করছে সেটা আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করবে, অন্য কারও পক্ষে নয়।' (*দৈনিক সংবাদ* - ২৪ জুলাই, ১৯৭০)

'... এতদসত্ত্বেও আগামী ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৭ই ডিসেম্বরের আর মাত্র তিন দিন বাকী রয়েছে। এই প্রসঙ্গে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলা একান্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয় মনে করছি।

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও দলের একতার প্রয়োজন ছিল, সেখানে আওয়ামী লীগ প্রগতিশীল সংগ্রামী দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যেখানে যেখানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সেখানেই আওয়ামী লীগ সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি ও অর্থ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জামাত নয়, মুসলিম লীগ নয় - ন্যাপকে পরাজিত করতে হবে, এটাই আওয়ামী নেতাদের রণধ্বণি।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কেননা আওয়ামী নেতৃত্ব প্রগতিশীল কোন কর্মসূচীতে ওয়াদাবদ্ধ হতে গররাজি। অথচ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে কোন নির্বাচনী সমঝোতা করতে হলে একটি প্রগতিশীল কর্মসূচীতে তাকে ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে এবং সেই প্রগতিশীল কর্মসূচী নিয়েই নির্বাচকমন্ডলীর কাছে যেতে হবে। কাজেই ছয় দফার জযবা তুলে সমস্ত গণদাবিকে তার আড়ালে চাপা দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার পরিকল্পনা তারা নিয়েছে। এই জযবা দ্বারা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকেও কোণঠাসা করা হবে এবং জনগণকেও ধোঁকা দেওয়া যাবে, এটাই তারা ভাবছেন। কিন্তু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে কোন রকম নির্বাচনী মৈত্রী করলে এই ধরণের ভাসা কথায় চলবে না, শ্রমিক-কৃষকের দাবিগুলোর কথা বলতে হবে, বৈদেশিক নীতির কথা বলতে হবে, অতএব তাদের সঙ্গে তো যাওয়া চলবেই না বরং তাদের মুখও বন্ধ করে দিতে হবে।

যে দল আইয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেছে এবং সংগ্রাম করতে গিয়ে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছে, জেল-জুলুম ভোগ করেছে সেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আওয়ামী লীগ এটাই প্রমাণ করেছে যে, সততা ও আন্তরিকতার বালাই তাদের নেই, তারা যা যা বলেন তা শুধু লোক ভোলানোর জন্য, ভোট আদায়ের জন্যই বলে থাকেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মোজাফফর আহমদের বিরুদ্ধে তারা একজন বি-ডি চেয়ারম্যান ও কনভেনশন দলীয় পাটের দালালকে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন - পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্র আদায় করার জন্য - কোন পাগলও এটা বিশ্বাস করবে না। তরুণ ত্যাগী ও নির্ভীক কর্মী কাজি আবদুল বারীর (পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক কর্মী যিনি ১৯৬০ সালে সামরিক আইনে বেত্রাঘাত পেয়েছিলেন) বিরুদ্ধে লাফাঙ্গার মার্কা প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছে - পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র

আনার জন্য - এটা কেউ বিশ্বাস করবে? বিশ বছরের জেল খাটা, পুলিশের লাঠি খাওয়া প্রবীণ ত্যাগী কর্মী আলতাফ আলীর বিরুদ্ধে কোন দিন জেলের নাম শোনেনি এমন এক নাবালককে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে - স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য?

এভাবে আওয়ামী লীগ আইয়ুব-মোনেম আমলের কন্ট্রাক্টর, বি-ডি ও চেয়ারম্যানদের দিয়ে দল বোঝাই করে তাদের পিঠে আওয়ামী লীগ ছাপ মেরে ন্যাপ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। অতএব, আজ জনগণের কর্তব্য হবে এসব ছদ্মবেশী মুসলিম লীগারদের পরাস্ত করা এবং দেশবাসীর বহু সংগ্রামের পরীক্ষিত সৈনিক ন্যাপ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা।

আওয়ামী লীগের ছাপ থাকলেও এ সব বর্ণচোরা ও সুবিধাবাদীরা নির্বাচনে সুবিধা করতে পারবে না এই আশঙ্কায় আওয়ামী লীগ সেই অতি ধিকৃত অতি নিন্দিত 'কলাগাছ' শ্লোগান তুলেছে। অর্থাৎ প্রার্থী চোর, জুয়াচোর, কি পকেটমার এ সব প্রশ্ন তুলো না - প্রার্থী "শেখ মুজিবের কলাগাছ", অতএব কলাগাছকেই ভোট দাও। কলাগাছকে ভোট দিয়ে ছয়দফা কায়েম কর। এসব সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল মালগুলো গছাবার জন্য তারা এমন কথাও বলছে যে, ভোট তো ঐ কলাগাছগুলো পাবে না, ভোট পাবে শেখ মুজিব। কাজেই তোমরা তো শেখ মুজিবকেই ভোট দিচ্ছ - অমুক কন্ট্রাক্টর, অমুক বি-ডি যে এককালের কনভেনশনী চাঁই তো নিমিত্ত মাত্র। অর্থাৎ শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে, তাকে ভোট দিতেই হবে। কোন নেতার জনপ্রিয়তা বিক্রির এ এক অভিনব পন্থা এবং সহজ ভাষায় ধোঁকাবাজি। হায়, আমার দেশ। বার বার কত ধোঁকাবাজি এই দেশ দেখল, এখন দেখছে আওয়ামী লীগের ধোঁকাবাজি।

অবশ্য এতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। আওয়ামী নেতারা মুসলিম লীগই করতেন সেদিন পর্যন্ত এবং মুসলিম লীগের রাজনীতিকে তারা বর্জন করতে পেরেছেন, এটা দাবি করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে বৈকি। মুসলিম লীগ যা যা করত, করেছে আওয়ামী নেতারা ঠিক ঠিক তাই করছেন। মুসলিম লীগ বলেছিল কলাগাছকে ভোট দাও। আওয়ামী লীগও বলছে কলাগাছকে ভোট দাও। যারাই ভিন্ন মত পোষণ করত মুসলিম লীগ তাদের বলত হিন্দুর দালাল, কংগ্রেসের দালাল ইত্যাদি। আওয়ামী লীগও ছয় দফার সমালোচনা করলেই অমনি মুসলিম লীগের কায়দায় চেঁচিয়ে ওঠেন, অমুকে পাঞ্জাবীর দালাল, পশ্চিম পাকিস্তানীর দালাল। মুসলিম লীগেরও জযবা ছিল 'কায়েদে আযম'। আওয়ামী লীগও তেমনি জযবা সৃষ্টি করে নিয়েছে 'বঙ্গবন্ধু'।

কাজেই প্রার্থী নির্বাচনের বেলায় রাজনৈতিক নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই মুসলিম লীগ স্টাইলই অনুসরণ করা হচ্ছে। মুসলিম লীগের আগে আওয়ামী শব্দটা যোগ দিয়ে কিছুটা উন্নতি হবে বলে যারা আশা করেছিলেন তারা হতাশ হলেও সত্যিকার সংগ্রামী কর্মীরা এতে বিস্মিত হবেন না। এই নীতি অনুসরণ করে মুসলিম লীগ সারা পাকিস্তানে যা হাসিল করতে চেয়েছে আওয়ামী লীগও একই মুসলিম লীগ পন্থা অনুসরণ করে পাকিস্তানে তা হাসিল করতে চাইছে - অর্থাৎ, মুসলিম লীগ মার্কা স্বৈরাচারের স্থলে আওয়ামী লীগ মার্কা স্বৈরাচার। এ উদ্দেশ্যেই তারা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ত্যাগী কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। কাজেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জনতার স্বার্থে, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এসব আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পরাস্ত করে নয়, প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে হবে।'

(*দৈনিক সংবাদ* - ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭০)

'... আওয়ামী লীগ কেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রগতিশীল ও সংগ্রামী কর্মী এবং নেতাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে, গত দুদিন ধরে তার রাজনৈতিক কারণ ও পটভূমিটা বিশ্লেষণ করছিলাম। এই বিশ্লেষণ আজ একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরুদ্ধে পার্টি দাঁড় করিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের যে সুবিধাবাদী নীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তা থেকে একটি সিদ্ধান্তই টানা যায়। সে সিদ্ধান্তটি হল, আওয়ামী লীগ প্রগতির পক্ষে থাকছেন না, থাকবেন না। আওয়ামী লীগ থাকবেন প্রতিক্রিয়ার পক্ষে।

সেই প্রতিক্রিয়ার পক্ষে থাকতে গেলে জনপ্রিয়তা হারাতে হবে, কাজেই এমন শ্লোগান নাও যাতে সেই প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটা ঢাকা দেওয়া যায়। স্বায়ত্তশাসন, জয় বাংলা হল এ জাতীয় শ্লোগান। এসব শ্লোগান গালভরা শ্লোগান, লোক মাতানো শ্লোগান। অথচ এর দ্বারা জনগণের কাছে কোন নির্দিষ্ট ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতিও দিতে হচ্ছে না। কাজেই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে তারপর বাঙ্গালী পুলিশ দিয়ে যখন বাঙ্গালী শ্রমিক বা কৃষকদের ঠ্যাঙ্গানো হবে তখন তা জয় বাংলার নামেই করা যাবে, যখন বাঙ্গালী মুনাফাখোর-কালোবাজারীকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে তখন তা জয় বাংলার নামেই করা হবে। কেননা জয় বাংলা কিম্বা ছয় দফার কোথাও এসব করতে মানা নেই। জয় বাংলা কিম্বা ছয় দফার কোথাও জনগণের কথা নেই, রুটি- রুজি কিম্বা জমির কথা নেই। কাজেই জয় বাংলার নামে যা খুশি করা যাবে, ঠিক পাকিস্তান ও ইসলামের নামে মুসলিম লীগ যা করেছিল।

পাকিস্তান হাতী হবে না ব্যাঙ হবে, গণতন্ত্র হবে না রাজতন্ত্র হবে, এর আদৌ কোন শাসনতন্ত্র থাকবে নাকি আমলার হুকুমে চলবে, দেশটা জনগণের ইচ্ছায় চলবে না কর্তার ইচ্ছায় চলবে, এখানে রুটি-রুজি ও জমির ব্যবস্থা করা হবে নাকি তেলে মাথায় তেল দেয়া হবে - লীগের মধ্যে বা বাইরে কাউকে এসব প্রশ্ন করতে দেয়া হত না। যারা এ ধরণের প্রশ্ন করত তাদেরকে ইসলামের দুশমন এবং গাদ্দার বলে লাঠিপেটা করা হত। এর পরিণতিতে কী হয়েছে সেটা আমরা গত ২৩ বছর ধরে প্রত্যক্ষ করেছি - এখনও দেখছি।

পাকিস্তান ও ইসলামের নামে যেকোন সমালোচনার কণ্ঠ রোধ করা হয়, চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার উপর পাথর চাপা দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্র আজও হয়নি। স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করা হয়, জমিদার পুঁজিদারের বল্গাহীন শোষণের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ করে দেয়া হয়। অন্যদিকে ভূমি সংস্কার, শ্রমিক-কৃষকের রুটি-রুজির প্রশ্ন যে শুধু চাপাই দেয়া হল তাই নয়, এসব বেয়াড়া কথা যারা বলে তাদের জন্য জেলের ভাত পাকাপাকি করে রাখা হল। ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে এই হল মুসলিম লীগের কীর্তি। জয় বাংলা ও ছয় দফার নামে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে এই কীর্তিগুলোরই পুনরাবৃত্তি করা হবে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাদের নির্বাচনী নীতির মাধ্যমে সেটাই প্রকাশ করে দিলেন।

আরও একটা ব্যাপারে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মারাত্মক মিল রয়েছে। সেটা হল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। মুসলিম লীগের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মীর অস্তিত্ব ছিল ঠিকই। এরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গিত ছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ভুলেও কোনদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। তাদের কথা ছিল যদি স্বাধীনতা দাও-ই, তবে আমাদের হিস্যাটা দিয়ে যাও। সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেন-দরবারটাই ছিল মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রধান কাজ।

আজ স্বাধীনতার ২৩ বছর পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছে। তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে নারাজ। অথচ এদেশ এবং এদেশের মানুষ দুশো বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদের শাসনে লাঞ্ছিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শোষণে নির্যাতিত হয়েছে। আমাদের সভ্যতা কৃষ্টি অর্থনীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অধীনতার অভিশাপে। পাকিস্তান হবার পরও এই অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি।

পাকিস্তানকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলছে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সদা সর্বদা গুটি চালিয়ে আসছে এবং নানাবিধ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উস্কানি দিয়েছে। আজ যে এ দেশে গণ-অধিকার লুণ্ঠিত ও পদদলিত তার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ। অথচ সাম্রাজ্যবাদকে বিরোধীতা করা এমনকি একটু সমালোচনা করতেও আওয়ামী নেতৃত্ব গররাজি। নির্বাচন উপলক্ষে তাদের বড় এবং ছোট নেতারা কত শত বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু একটা বক্তৃতায়ও দেখলাম না তারা পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন। একটা দল

বা ব্যক্তি কতটা খাঁটি এবং দেশপ্রেমিক তার অন্যতম মাপকাঠি হল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সেই ব্যক্তি বা দলের দৃষ্টিভঙ্গি কি? এই মাপকাঠিতে আওয়ামী লীগ বরবরই সাম্রাজ্যবাদ প্রীতির দোষে দুষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে তাই আজ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ভোটারের কাজ হল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী প্রার্থীদের নির্বাচিত করা। যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই তা হলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আমরা এক মারাত্মক ভুল করব এবং সে ভুলের খেসারত হিসাবে আর একবার আর এক ধরণের স্বেচ্ছাচারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হব এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের শিকার হব, জেনেশুনে দেশবাসী এত বড় ভুল করবেন না এ বিশ্বাস আমরা পোষণ করি'॥" (*দৈনিক সংবাদ* - ০৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০)[২৪৬]

দুই.

নির্বাচনী প্রচার : একটি ঘূর্ণিঝড়, একটি পোস্টার এবং একটি বিজয়

০১.

"... খুলনায় কার্যকালে আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ১৯৭০ সালে উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংসযজ্ঞ-পরবর্তী ত্রাণকাজে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা। ১৩ নভেম্বরের গভীর রাতে খুলনা বিভাগাধীন সমগ্র ভোলা মহকুমা, পটুয়াখালী জেলার সমুদ্র তীরবর্তী কয়েকটি থানা এবং সংলগ্ন চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত নোয়াখালীর কিছু অংশ উক্ত প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার নির্মম ছোবলে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বঙ্গোপসাগর কূলবর্তী ভূখণ্ডের জনপদগুলোকে যুগে যুগে আঘাত করেছে। অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড় যখন সামুদ্রিক ঢেউগুলোকে উত্তাল গতিতে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দিকে ধাবিত করে, তখন বাঁচার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম। সুদূর অতীতে ঐসব এলকায় ঘন বনাঞ্চল ছিল। তার ফলে ঝড়ের গতিবেগ অনেকটা ব্যাহত হতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজঙ্গল কেটে বসতি ও চাষের জমি উদ্ধার করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার উপকূলীয় বেড়িবাধ (coastal embankment) প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালায়। এই কাজে প্রধানত ওলন্দাজ অভিজ্ঞতা ও কারিগরি সহযোগিতা কাজে লাগানো হয়। পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদার তত্ত্বাবধানে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেলেও ঐ সময় পর্যন্ত সবক'টি ঝুঁকিপূর্ণ (uvlnerable) এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

বেড়িবাঁধ ব্যতীত ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হিসেবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস একটি কার্যকর পন্থা। তবে সেকালে এর তেমন কার্যকারিতা ছিল না প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, আমাদের আবহাওয়া দপ্তরের কারিগরি ব্যুৎপত্তি ছিল সীমিত। দ্বিতীয় সে সময় আজকের মতো গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ট্রানজিস্টার রেডিওর আধিক্য ছিল না। তার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে সময়মতো পৌঁছত না। আজকে সে পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি ঘটেছে, যার ফলে জানমালের ক্ষতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো সম্ভব হয়েছে।

১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ছিল অসাধারণ প্রলয়ঙ্করী। বাতাসের গতিবেগ ছিল শ'খানেক মাইলের কাছাকাছি এবং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা প্রায় ১৮-২০ ফুট। বলতে গেলে নিমেষের ব্যবধানে তার দুর্বার গতি লাখ লাখ মানুষ ও গবাদিপশুকে ডাঙ্গা থেকে সমুদ্রের গভীরে শুষে নিয়ে যায়। দেখা গেছে, ঘূর্ণিঝড়ের

[২৪৬] শহীদুল্লা কায়সারের নির্বাচিত কলাম : উনসত্তর থেকে একাত্তর/গ্রন্থণা : শমী কায়সার ও অমিতাভ কায়সার ॥ [মাওলা ব্রাদার্স - এপ্রিল, ১৯৯৪। পৃ. ৭৩-৭৪/৮৭-৮৮/১২২-১২৫]

ছোবল উপকূলীয় স্থলভাগের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে গিয়ে হানা দিয়েছে। ফলে গ্রামের সাধারণ মাটির ঘর তো বটেই, এমনকি সম্পন্ন গৃহস্থের টিনের ঘরবাড়ি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে ঝড়ো হাওয়ার দুর্বার গতিতে পরিবারের যাবতীয় সম্বলসহ বহুদূরে উড়ে গেছে।

নভেম্বরের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা সর্বস্তরের প্রশাসন যন্ত্রকে কেবল অপ্রস্তুত ও হতবুদ্ধিই করে দেয় নি, তাদের কর্মক্ষমতাকেও অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাহত করে। টেলিযোগাযোগসহ সে-সময়কার যাতায়াত ব্যবস্থা এতই পশ্চাৎপদ এবং ধীরগতি ছিল যে, এতবড় ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ প্রাদেশিক ও বিভাগীয় সদরে পৌঁছতে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। ঢাকা থেকে ১৫ নভেম্বর সকালে আমার জন্য একটি সরকারি উভচর উড়োজাহাজ পাঠিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলায় পৌঁছে উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণকাজ সংগঠন করতে।

... যেহেতু ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে সামান্যই পূর্বপ্রস্তুতি ছিল, ত্রাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে কয়েকদিন কেটে গেল। ইতোমধ্যে বন্যাপীড়িত এলাকার মানুষ অসহনীয় জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছিল। যেহেতু প্লাবিত এলাকাগুলোর অনেক টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বিশুদ্ধ পানীয়জলের সঙ্কট দেখা দিল। খাদ্যশস্যের অবস্থাও তথৈবচ। তাৎক্ষণিকভাবে জেলা কর্তৃপক্ষের সীমিত সম্পদের দ্বারা কিছু কিছু ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হলো।

... প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী একটিমাত্র ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার আন্তরিকতার অভাব ও অবহেলা সম্বন্ধে দ্রুত বিরূপ বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে থাকে। কেবল তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানে এই ব্যাপারটি চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঘটনাটি ছিল, ঘূর্ণিঝড়ের কয়েকদিন পরই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীনে এক রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ঢাকা হয়ে ইসলামাবাদ ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ ধরনের চরম দুর্যোগের পর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধারের ন্যূনতম মানবিক কর্তব্য হচ্ছে উপদ্রুত এলাকা স্বচক্ষে দেখা এবং সরেজমিন ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও একাত্মতা প্রকাশপূর্বক সম্ভাব্য সব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া। ইয়াহিয়া খান কোন্ বিচারে বা কাদের পরামর্শে সেটা না করে প্লেনযোগে উপকূলীয় এলাকায় কিছুক্ষণ উড়াল দিয়ে দায়সারাভাবে তার কর্তব্য সেরে পশ্চিমে ফিরে গেলেন, তা আমাদের কাছে বোধগম্য হলো না। সামরিক আইন জারির পরই তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্তত বাহ্যিকভাবে হলেও যে রকম অনুকূল মনোভাব দেখিয়েছিল, ইয়াহিয়ার এ একটিমাত্র কাণ্ড বাঙালিদের মনকে বিষিয়ে দিল।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, সামরিক আইন জারির অল্পদিন পরই ঢাকার অদূরে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা হয়েছিল। তাতে কিছু লোক মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়। এ খবর পেয়ে ইয়াহিয়া খান পিণ্ডি থেকে অবিলম্বে ঢাকায় ছুটে আসেন এবং উপদ্রুত এলাকা দেখার পর মহাখালীর এক সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত ব্যক্তিদের দেখতে যান। প্রাদেশিক স্বাস্থ্য সচিব হিসেবে আমি এবং হাসপাতালের পরিচালক ডা. শামসুদ্দীন (সে যুগে আমাদের একমাত্র হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) তাঁকে স্বাগত জানাই। প্রতি রোগীর পাশে তিনি কিছু সময় কাটান এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ খোঁজখবর নেন। অথচ উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ের এত বিরাট ধ্বংসলীলার পর তাঁর এই ব্যবহার ছিল অত্যাশ্চর্য বটে। দিন দশেকের মধ্যে সরকারি ত্রাণ প্রচেষ্টা সংগঠিত হয়ে উঠলো।

... বিলম্বে হলেও ওদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের তৎপরতা প্রদর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কয়েকটি এলাকায়, যেমন মনপুরা, ঢালচর, কুকরিমুকরির মতো প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলে কিছু কিছু সেনা ক্যাম্প বসানো হলো। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল দুর্গম এলাকাগুলোতে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশের সৎকার, ঐসব জায়গার বাসিন্দাদের মধ্যে দ্রুত ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি। জওয়ানদের সঙ্গে প্রায়ই হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি র‍্যাংকের কর্মকর্তা থাকতেন; পুরো ভোলা এলাকায় দু'তিনজন মাত্র কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের মিলিটারি প্রশাসকরা প্রায় ঘনঘন হেলিকপ্টারযোগে ভোলাসহ অন্যান্য উপদ্রুত এলাকায় সফর শুরু করলেন।

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	১০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পোস্টার।

সামরিক সাহায্যের একটি প্রশংসনীয় দিক ছিল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ কয়েকটি মেডিক্যাল টিম পাঠানো। প্রাদেশিক মার্শাল ল প্রশাসক লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব কয়েকবার ভোলায় এসেছিলেন সরেজমিন ত্রাণ পরিস্থিতি দেখার জন্য।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। ততদিনে ভোলাসহ বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ী ত্রাণভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। চাহিদা অনুযায়ী কমিশনারের হুকুমে থানাওয়ারি বরাদ্দ এবং বিতরণ করা হয়। সে যুগে আইয়ুববিরোধী সফল ছাত্র আন্দোলনের জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন ভোলারই সন্তান তোফায়েল আহমেদ (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অন্যতম)। স্বভাবতই এত বিরাট দুর্যোগের পর তিনি ভোলায় এলেন এবং তার দলীয় সহযোগীদের নিয়ে ত্রাণকাজে ব্যাপৃত হলেন। এ ব্যাপারে তিনি তরুণ মহকুমা অফিসার তওফিক আলীকে (সিএসপি, ১৯৬৮) চাপ দিতে লাগলেন, যাতে ত্রাণসামগ্রী তাঁর কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে বিলিকৃত হয়। এটা ছিল প্রশাসনিক নীতিবিরুদ্ধ। তাছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলও একই দাবি জানাতে পারে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভোলা ডাকবাংলোয় মোকাম্মেল হকের (সিএসপি, ১৯৬০। 'জাতীয় মঙ্গল'-এর কবি হিসেবে খ্যাত মোজাম্মেল হক-এর পুত্র) সঙ্গে তোফায়েল আহমেদের বৈঠক বসলো। মোকাম্মেল কড়া ভাষায় তোফায়েলকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করলেন।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর জেনারেল ইয়াকুব ভোলা সফরে এলে তোফায়েল প্রকাশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে রিলিফ বিতরণে ত্রুটি হচ্ছে বলে নালিশ করলেন। বিষয়টি নিয়ে বেশ হৈচৈ হলো। খুলনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার দুররানী যশোর সেনাছাউনি থেকে বিষয়টি যাচাই করতে এলেন। দুররানী মোটামুটি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা বলতে গেলে সন্তোষজনক ছিল। লাট সাহেব এডমিরাল আহসান নৌবাহিনীর ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন 'গানবোট' (Gun Boat) নিয়ে ভোলায় এসে উপস্থিত হতেন প্রায়ই। শুনেছি যে ঐ নৌযানগুলো আমাদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদীনালা, খালবিল অধ্যুষিত প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল।

... তোফায়েলের সঙ্গে গণ্ডগোলের পর লাট সাহেব ও আহসান সাহেবও একদিন আমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে এলেন। তার দু'চারদিন পরই জেনারেল ফরমান আলী এসে উপস্থিত হলেন একই ব্যাপারে জানার জন্য। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আহসান সাহেব অকপটে আমাকে পরামর্শ দিলেন বিষয়টা পারস্পরিকভাবে মিটিয়ে ফেলতে। অবাক হয়ে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব ওদের হাতে ন্যস্ত করব কি না। কোনো স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। পরে ফরমান আলীর সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল, তাতেও একই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। বোধহয় ফরমান আলী আহসান সাহেবের তুলনায় অতি ধূর্ত প্রকৃতির ছিলেন, তাই তার মুখের হাবভাব ছিল আপাতদুষ্পাঠ্য। যা হোক, অখণ্ড পাকিস্তানের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন ও তৎপরবর্তী রাজনৈতিক বিবর্তন এবং পরিণতিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এসব ঐতিহাসিক ঘটনা বহু আলোচিত এবং সর্বজনবিদিত।

... আমার যতদূর মনে পড়ে সেকালের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য ত্রাণ তৎপরতা গ্রহণ করা হয়নি। ন্যাপ (ভাসানী) সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব দু'তিন দিনের ঝটিকা সফর এবং কিছু প্রতীকী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছিলেন। বোধহয় তারা প্রত্যাসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রদেশব্যাপী সফর করার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন॥"[২৪৭]

০২.

"... কোন পক্ষই অবলম্বন না করে একজন বিদেশী হিসাবে যে বিগত ষোল বছর ধরে নিয়মিত বিরতিতে পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেছে, তার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের এই মন মানসিকতা নিঃসন্দেহে মূল্যবান

---

[২৪৭] সুলতান-উজ জামান খান/স্মৃতির সাতকাহন : এক আমলার আত্মকথা ॥ [সাহিত্য প্রকাশ - জানুয়ারি, ২০০৭। পৃ. ২৬৯-২৭৮]

গবেষণার বিষয় মনে হয়েছিল। পরিসংখ্যানের সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াও যা প্রমাণ করেছিল তা ছিল বেশ দীর্ঘ দিন ধরে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রের অর্থনীতিতে যা অবদান রেখেছিল তা অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থনৈতিক সহায়তা সে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়েছিল। আমার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলাম যে, পাকিস্তান একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রহিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা উন্নতি সাধন করেছিল গত ২০/২২ বছরে, তা তার দীর্ঘ ইতিহাসে কখনই সম্ভব হয়নি। কাপ্তাই বাধের ন্যায় বৃহৎ ও সফল প্রকল্পের কথা বাদ দিয়েও অন্যতম বড় সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামে সমুদ্রবন্দর স্থাপনা, চন্দ্রঘোনা কাগজ কল, ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা এবং পাকিস্তানের প্রথম ইস্পাত কারখানা স্থাপন এসবই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সফল স্থাপনা।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল ব্যক্তি মালিকানায় অসংখ্য সফল শিল্প প্রতিষ্ঠান। জীবন যাত্রার মান ও মাথা পিছু আয় যদিও কম ছিল তথাপি তা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। রাজধানী ঢাকা আকারে ছোট হলেও তা দ্রুতগতিতে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছিল যা পূর্ব পাকিস্তানীরা গর্ব করতে পারত! খুলনায় নদী বন্দর স্থাপন হওয়ার পর নৌপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সড়ক ও রেলপথের বিস্তৃতি ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। খুব কম সময়ে আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল শুরু হয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছোট ছোট শহরে বিমান ভ্রমণের এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের দুই অংশের বিমান ভাড়ায় সরকার পর্যন্ত ভর্তুকী দিয়ে সাধারণ যাত্রীদেরও বিমানে পূর্ব থেকে পশ্চিম ও পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। এতসব সুযোগ সুবিধা, অবকাঠামো উন্নয়ন সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরাট একটি গ্রুপ সর্বদাই বঞ্চনার কথা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা শোষণের কথা বলতো ও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতো, অথচ এখানকার সাধারণ জনগণ তাদের নেতৃত্বের জন্য ঐসব উচ্চ শিক্ষিত লোকদের পানে চেয়ে থাকতো।

আমার ইতিহাস জ্ঞান আমাকে বলে যে বিষয়টি দুঃখজনক, তবে আশ্চর্যের কিছুই নয়। যে জনপদটি নির্যাতিত ছিল ও দারিদ্রের কষাঘাতে ডুবেছিল তাদের অস্থিরতা থাকবেই এবং থাকবে না ধৈর্য্য ও শক্তি। যখন এই অবস্থার উন্নতি শুরু হয়েছিল ও আরও উন্নয়নের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন তাদের অস্থিরতা ও অধৈর্য্য প্রকট হয়েছিল। এবং এই আবেগকে উসকে দিয়ে আরও উত্তেজিত করতে সীমান্তের অপর পার থেকে অবিরাম মনস্তাত্তিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে, এবং যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার পথে বিরাট বাধা তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার তার সাধ্যের মধ্যে পরিমিত সম্পদ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে আগিয়ে নিয়ে যা করেছিল তার চেয়েও বেশি করতে পারত কিনা আমার খুব সন্দেহ হয়। পাঠক যারা এই প্রশ্নের ব্যাপারে উৎসাহী এবং যারা খুব যত্নের সাথে নির্বাচিত পরিসংখ্যান দেখেছে, যার উপর ভিত্তি করে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির নায়করা পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশিক কায়দায় শোষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেছিল তারা এই বইটিতে সপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃত তথ্য ও সংখ্যাগুলো দেখে নিতে পারে। এইগুলো আমার বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছে, এবং আমি নিশ্চিত অন্যান্য বিদেশী পর্যটকরাও সম্প্রতি বছরগুলোতে পূর্ব পাকিস্তান যে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি সাধন করেছিল তা নিশ্চিত করেছিল। এই বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত বৃটিশ, মার্কিন ও কানাডিয়ান ব্যবসায়ীদের দেওয়া সাক্ষ্যই একজন পক্ষপাতহীন অনুসন্ধানকারীকে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যথেষ্ঠ ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই লাভবান হয়নি বরং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সময় থেকেই পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারগুলো জাতীয় পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান যাতে তার ন্যায্য অংশ পায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সব সময় সচেষ্ট থেকেছে। জাতীয় সংসদে তাদের আসন সংখ্যা ছিল বেশি। বিদেশ মন্ত্রণালয়ে তারা কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত ও কাউন্সিলর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তারা কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসে প্রবেশ করে প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ

ও অন্যান্য উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার প্রাদেশিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের একচেটিয়া দখলে ছিল; পশ্চিম পাকিস্তানীরা যেমন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের অধীনে উচ্চ পদে থাকতো, তেমনি উল্লেখযোগ্য হারে পূর্ব পাকিস্তানীরাও পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানকার প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কাজ করতো। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশেষ করে সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানীদের মেধার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নিকট অঙ্গীকার করেন যে, তাদের শাসন করার জন্য বহিরাগতদের সেখানে পাঠানো হবে না। গভর্ণর, মুখ্য সচীব এর ন্যায় সর্বোচ্চ পদগুলো পূর্ব পাকিস্তানীদের মাঝ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কেবিনেটের অর্ধেকই পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিল, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সচীব ছিল পূর্ব পাকিস্তানী।

সশস্ত্রবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়োগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় এটা ছিল দুঃখজনক বিষয়, যা ১৯৭১ সালে ঘটেছিল। সেনাবাহিনী গঠনে পাকিস্তান বৃটিশ পদ্ধতি অনুসরণ করেনি, পাকিস্তান মিলিটারী ও প্যারা মিলিটারী ফোর্স পূর্ব পাকিস্তানে গঠন করেছিল যেখানে প্রায় সবই পূর্ব পাকিস্তানী ছিল অর্থাৎ বাঙ্গালী ছিল, অন্য কোন তেমন জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ছিল না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তানীদের উপলব্ধি করাতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন যে, তারা নিজেদের মালিক নিজেরা এবং তারা পাকিস্তানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তিনি তাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে অনেক বেশি দিয়েছিলেন, পাকিস্তান শিল্প সংস্থার (PIC) পৃথক পূর্বাঞ্চল শাখা যা শিল্প স্থাপনায় এতটাই অবদান রেখেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানসহ গোটা দেশকে সামনের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়েছিল। ওয়াপদার পৃথক পূর্বাঞ্চল কার্যক্রম, পাকিস্তান রেলের ইষ্টার্ন রেলওয়ে সিস্টেমসহ ঢাকায় অন্যতম দৃষ্টিনন্দন রেলওয়ে স্টেশন স্থাপন। ঢাকাকে দেশের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেইভাবে জাতীয় সংসদ ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল যা তাবৎ দুনিয়ায় অন্যতম একটি আধুনিক স্থাপনা। ইসলামাবাদের ন্যায় প্রশাসনিক সহ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য সকল দফতরের ইমারত দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করার মাস্টার পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সভাপতিত্বে হয়েছিল। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে উন্নয়ন অনুদানের সিংহভাগ অংশ দেওয়া হয়েছিল।

ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপনায় সরকার পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তানীদের বেশি উৎসাহিত করেছিলেন ও অধিক ভর্তুকী দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে বিদেশী বিনিয়োগকারী অপেক্ষা বেশি সময়ের জন্য। সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও তার উপদেষ্টা পরিষদের দৃষ্টিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে সম্পর্ক মজবুত ও সৌহাদ্যপূর্ণ রাখতে যা যা করা প্রয়োজন তার কিছুর বাকী রাখেননি।

সেপ্টেম্বর মাসে ভয়াবহ বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে যায় এবং দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এইরূপ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করেন যাতে সবকিছু ঠিক করতে সময় পাওয়া যায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বন্যা দুর্গতদের জন্য রিলিফ কাজকে তরান্বিত করার যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। দুঃখজনকভাবে এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে সহসাই আর একটি স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে ১১ই নভেম্বর। সমুদ্রের জোয়ারের ঢেউ ৩০ ফুট উচ্চতায় উঠে সমুদ্র উপকূল ও উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলের যা কিছু ছিল সব ধুয়ে মুছে সমুদ্রে নিয়ে যায়, এতে উপকূলের চারটি জেলার সম্পদের অকল্পনীয় ক্ষতি ছাড়াও পাঁচ লাখের অধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। উপকূল অঞ্চলের সমুদ্র ও নদী পথে চলাচল করার যাবতীয় নৌযান ধ্বংস হবার ফলে দুর্গত এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছিল।

সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার যার যা ছিল তাই নিয়ে শত বাধা বিপত্তির মধ্যে সাহায্যের কাজে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ৩রা ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং দুর্গতদের খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয় কিভাবে দেয়া দরকার সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেন এবং জাতির এই দুঃসময়ে যারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এতবড় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেবলমাত্র ৮টি জাতীয় সংসদ আসন ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদের আসন এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আর কোনভাবেই স্থগিত করার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে তার সদিচ্ছার কথা। ১৯৬৯ সালের মার্চে ঘোষণা দেবার পর দেশ এই ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে আইনগত কাঠামো আদেশের (এলএফও) আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয় সংসদদ্বারা সংবিধান গঠন হবে, তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে; এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংসদকে সর্বময় ক্ষমতাসহ সার্বভৌমত্ব দেওয়া হবে ও সামরিক আইনের অবসান হবে।

ঘূর্ণীঝড়ের ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিলে বহুদিক থেকে সাহায্য আসা আরম্ভ হয়েছিল; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক বিশেষ পুনর্গঠনের একটি ঋণের প্রস্তাব দিয়েছিল, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থা প্রস্তাব দিয়েছিল, বিদেশী অনেক সরকার এবং অনেক ব্যক্তি পর্যায়ে সাহায্য এসেছিল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা যেমন এসেছিল, তেমন দলে দলে বিদেশী সাংবাদিকরাও এসেছিল; কিন্তু চলমান রাজনৈতিক প্রচারভিযানের উত্তপ্ত পরিবেশে বিদেশী সাংবাদিকরা যারা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের জন্য দলে দলে এসেছিল তারা সরকারি সংস্থার লোকজনের কাজে সকল যানবাহন নিয়োজিত হবার ফলে ঐ সব এলাকা যেতে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল, আর উদ্ভূত এই পরিস্থিতির জন্য প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনার শিকার হয়েছিল।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিজেই শেখ মুজিবর রহমানের ঠিক আরও একটি আইটেম হয়েছিল যা তার ঘৃণীত প্রচারাভিযান ও অসত্য গল্পগুলো ঠিকমতো প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অভিযোগ আনা হয়েছিল এই বলে যে, সাহায্য সামগ্রী বহনে কর্তৃপক্ষ হেলিকপ্টার দিতে অস্বীকার করেছিল, এবং সকল হেলিকপ্টার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পশ্চিম পাকিস্তানে রাখা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ আরও অভিযোগ এনেছিল যে, পাকিস্তান নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী ত্রাণ তৎপরতায় তেমন কোন ভূমিকা রাখেনি। এমনকি অভিযোগে এ পর্যন্তও বলেছিল যে, সেনাবাহিনীর লোকজন বিদেশ থেকে দুর্গতদের জন্য পাঠানো কম্বলও চুরি করেছিল। শেষের এই অভিযোগটি ছিল একদম অসম্ভব, কেননা কোন সৈনিক, নাবিক বা বিমান সেনা তার নিজস্ব ব্যবহৃত কম্বল ব্যাতীত অতিরিক্ত কম্বল সাথে রাখলেই কোর্ট মার্শাল এড়াতে পারতো না।

১৯৭১ সালের বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের শুরুতে আমি পাকিস্তান দুদফায় ভ্রমণ করলে এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে একটি খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজনীয়তা মনে করেছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগের জন্য মানসিকভাবে পীড়িত হয়েছিল, কেননা তারা রাত দিন আন্তরিকভাবে ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত থেকে তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে যা ছিল তাই কাজে লাগিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ত্রাণকাজে আত্মনিবেদনের ব্যাপারে সেখানে কর্মরত বিদেশী সাহায্য সংস্থার কর্মীদের নিকট আমরা পক্ষপাতহীন অনেক প্রমাণ পেয়েছিলাম, বিদেশীরা পাকিস্তান সেনা সদস্যদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল যা ছিল চিন্তারও বাহিরে। সেনা সদস্যরা নিজেরা অনেক গল্পই করেছিল সেই সময়। সেনাসদস্যরা অনেক সময় মৃতদেহ নিজেরাই দাফন করতে বাধ্য হতো, কেননা তার আত্মীয় স্বজন যারা সেই সব দুর্গত এলাকায় বেঁচে ছিল তারা প্রতিটি মরদেহ দাফনের জন্য সেনাকর্তৃপক্ষের নিকট দশ টাকা দাবি করেছিল। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আমায়

জানিয়েছিল যে, ঢাকায় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা থেকে সাহায্য নিতে দলে দলে ভিক্ষুক এমনভাবে আসছিল, যেন মনে হচ্ছিল ঢাকা পেশাদার এক ভিক্ষুকের শহর।

প্রকৃতপক্ষে দুর্যোগ মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা ছিল ত্বরিত ও ফলপ্রসু। ঘুর্ণিঝড় থেমে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম হেলিকপ্টার নিয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌছেছিল। সেনাবাহিনীর সিগন্যাল বাহিনী ত্বরিত বেগে জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেছিল, ঢাকায় তাৎক্ষণিকভাবে একটি সেনাকেন্দ্র কাজ শুরু করেছিল সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করার জন্য। দুর্ঘটনা স্থলের নিকটে অবস্থানরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ দ্রুত হাতিয়া, চরসাইবাণী, সন্দীপ ও কুতুবদিয়া সাহায্য সামগ্রী, ওষুধ ও কাপড় নিয়ে অতি দ্রুত পৌছায় এবং চট্টগ্রামে নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষ একটি বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিয়ে যেখানে যা সাহায্য প্রয়োজন তা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছিল। ভাসমান অনেক লোককে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হয়েছিল, পাকিস্তান বিমানবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে এই দুর্যোগ মোকাবিলার কাজে যোগ দিয়েছিল, সকল সহজ প্রাপ্য পরিবহন বিমানকে এই ত্রাণকাজের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সেগুলো থেকে সাহায্য সামগ্রী যেমন খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ ও কাপড়চোপড় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চর ফ্যাসন, ইস্ট চর, চর ল্যাংগাথায় ও অনেক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ফেলা হচ্ছিল। আবার যে সকল স্থান তখনও পানির নিচে ছিল সেখানে পৌছাতে সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী বিভাগ বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহার করে সাহায্য সামগ্রী পৌছে দিয়েছিল ও গৃহহীন ও ক্ষুধার্ত মানুষকে সম্ভাব্য সবধরনের সহায়তা দিয়েছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাত দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছিল কখনও হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে, আবার কখনও সারা রাত ভাঙ্গা কালভার্ট মেরামত করার মত কাজও করতে হয়েছিল। পদাতিক বাহিনী, সিগন্যালস, প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও নার্সরা তাদের নিজ নিজ বিভাগ থেকে পর্যাপ্ত সামগ্রী নিয়ে নিয়মিত সেনাবাহিনীর মত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে অসংখ্য অসহায় লোকের জীবন রক্ষা করেছিল। এছাড়া বিদেশ থেকে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে আসা বিমানগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলোতে জ্বালানী সরবরাহ করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও পাকিস্তান বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর দায়িত্বে ছিল। প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন এবং ত্রাণকার্যে নিয়োজিত সকলকে উৎসাহিত করেছিলেন। আর এই দুর্যোগে দেশের প্রশাসন ও সেনাকর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালনে যে আন্তরিকতা ও দক্ষতা দেখিয়েছিল তা ছিল সত্যই এক বিরল ঘটনা।

প্রাদেশিক সরকারের সকল প্রয়োজন যাতে দ্রুত মিটে যায় কেন্দ্রীয় সরকার সেটাই চেয়েছিল। প্রয়োজনের স্থানে সবচেয়ে কম সময়ে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ও সাহায্য সামগ্রী যাতে ঠিকমত পৌছাতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে একটি আর্থিক সমন্বয়কারী ও বহিঃসাহায্য বিভাগের বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছিল। অধিকাংশ সাহায্য সামগ্রী সরাসরি আকাশ পথে ঢাকায় পৌছে যেত। বড় আকারের সাহায্য সামগ্রী যেমন চাউল, গম ও ভোজ্যতৈল সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পৌছাত; কিন্তু বীজ বপনের সঠিক সময়ের বিবেচনায় ধান বীজ বিমানে আকাশ পথে সরাসরি ঢাকা পৌছাত। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স বিনা ভাড়ায় হাজার হাজার কেজির ত্রাণ সামগ্রী প্যারিস, লন্ডন, রোম, ইস্তাম্বুল, আমস্টারডাম, ফ্র্যাংফুর্ট, বৈরুত, কুয়েত, দামাস্কাস, দোহা, টোকিও ও ম্যানিলা থেকে বয়ে এনে পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বড় বড় শহর থেকে সংগৃহীত দান সামগ্রী করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডি থেকে বহন করে ঢাকায় পৌছায়। এছাড়া প্রেসিডেন্ট তার নিজের ত্রাণ তহবিল গঠন করেছিলেন যাতে দেশ বিদেশ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দান এসে জমা হতো যা তাৎক্ষণিক পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হতো। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দায়িত্ব ছিল সকল সংগৃহীত অর্থ ও দান সামগ্রী দুর্গতদের মাঝে বিতরণ করা। গৃহহীন ও অসহায় লোকদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

দুঃখজনকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ভাল কাজগুলো বহিঃবিশ্বে খুব কমই প্রচার পেয়েছিল, অপরপক্ষে ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকরা আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের দ্বারা সযত্নে প্রচারিত সরকারের নির্মম, পাশবিকতা, ডাকাতি ও অব্যবস্থাপনার গল্প জানতে পেরেছিল। এই ধরনের বানোয়াট গল্পগুলো সহজেই গ্রহণ করে বিদেশী সাংবাদিকরা তাদের স্বদেশে টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কেহই যাদের এইসব মিথ্যা গল্প শোনান হয়েছিল তারা, আওয়ামী লীগের ও তাদের যুবকর্মীদের জিজ্ঞাসা করেনি কেন তারা নিজেরা ঘুর্ণিঝড়ের পর ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ব্যাপারে সেনাসদস্য ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের লোকদের সাথে সহযোগিতা করেনি। অনেক আগেই বিদেশী ত্রাণ কর্মীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু হবার পর ঐসব দুর্গত এলাকায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছিল, প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীদের ত্রাণ কাজে নিয়োজিত থাকার ব্যাপারে তাদের স্বীকৃতির বিষয়টি কারও তেমন গোচরে আসেনি, কেননা তারা তেমন নাটকীয় কোন গল্প ঐ সব সেনা সদস্যদের ব্যাপারে প্রচার করেনি। কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন বিদেশী সাংবাদিক যারা নির্বাচন এর উপর রিপোর্ট করার জন্য ঢাকা এসেছিল তারা ত্রাণকাজে কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার বিষয়টি তাদের প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরেছিল, কিন্তু তাদের এই পাঠানো সংবাদ আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকদের পূর্বের প্রচারিত বানোয়াট গল্পের উপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি অর্থাৎ ততক্ষণে বহিঃবিশ্বে খারাপ ধারণা যা যাবার তা ইতিমধ্যে পৌছে গিয়েছিল।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের লোকজনের দুঃখ কষ্টের ঘটনাগুলোকে শেখ মুজিবর রহমান ও শীর্ষ অনুচররা লুফে নিয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের জন্য কোন প্রকার যুক্তি ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের দায়ী করতো। কর্তৃপক্ষকে কোন কারণ ছাড়াই অভিযুক্ত করতো এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অবহেলা করার জন্য দায়ী করতো। যদিও ঐ সব গলাবাজ নেতাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হতো কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল তখন তারা নিরব থাকতো। নির্বাচনের আগে ও পরে ঘুর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক এই দুর্যোগটাকে একটি শক্তিশালী উত্তেজক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য অভিযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যেন পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা ও ঘূর্নিঝড়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানই দায়ী।

... ১৯৭০ সালের শেষ দিকে সমগ্র পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটিতে ছিল কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ... যতদূর সম্ভব একটা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মকাল থেকেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) এবং তার দুজন সহকর্মী বিচারক একজন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ও অপরজন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী এলাকা নির্ধারনের কাজগুলো কঠোর পরিশ্রম করে প্রস্তুত করছিলেন, এবং নিশ্চিত করছিলেন যাতে পাকিস্তানের ২১ বছর বয়সের উর্ধে প্রতিটি নারী পুরুষ তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে অবগত হয় ও তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে। ক্ষমতায় যাবার প্রতিযোগীতায় দেশের ২৪টি রাজনৈতিক দলকে তাদের নিজস্ব নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়েছিল - যেমন নৌকা, ছাতা, বাঘ, সাইকেল ইত্যাদি যাতে নিরক্ষর ব্যক্তিরাও তাদের সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধায় না পড়েন। সারা দেশে ভোটার সংখ্যা ছিল ৫,৬০,০০০০০ জন। ১৩,৫০,০০০০০ এর অধিক ব্যালট পেপার ছাপানো হয়েছিল, এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৬০০০ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪০০০ ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। অস্থায়ীভাবে ৩০০,০০০ পোলিং অফিসার, ৩০,০০০ প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রায় ২০০০ রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের ব্যবস্থা সহজলভ্য করা হয়েছিল। ভোট কেন্দ্রে প্রভাব খাটানো ও জাল ভোট প্রদানের ন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে সব ধরনের সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল।

... ১৯৭০ সালে প্রথম কয়েক মাস ব্যাপী শেখ মুজিবর রহমান ও তার শীর্ষ অনুচররা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তান যাবার নামও মুখে আনেনি তারা, এবং তাতেই ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য

যে ধারণাটি ছিল তা হচ্ছে তিনি ও তার আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকারের কথাই বলেছিলেন, এবং তার ছয় দফায় যা চাওয়া পাওয়া ছিল তাও পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকারের চিরদিনের নিশ্চয়তার কথাই বলা হয়েছিল। তার সমর্থকরা বিশ্বাস করেছিল বা তাদের যেভাবেই হোক বিশ্বাস করান হয়েছিল যে, যদি তারা শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তাহলে তাদের কমপক্ষে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, পূর্ব পাকিস্তান হবে সমৃদ্ধশালী ধনী একটি দেশ, প্রত্যেকে পাবে পর্যাপ্ত খাদ্য, বাড়িঘর আর কাপড়চোপড়।

এই ধরনের প্রচারাভিযানে একটি বিশেষ পোস্টার আওয়ামী লীগ ছাপিয়েছিল যার শিরোনাম ছিল 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' এই গ্রন্থের অনেক পাঠকের সেই বিখ্যাত পোস্টারটির কথা মনে থাকতে পারে। পোস্টারের বাম দিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও ডান দিকে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নাম। ঐ পোস্টারে কি লেখা ছিল তা মাত্র দুএকটি উদাহরণ দিয়ে লিখছি এখানে। যেমন চাউল পূর্ব পাকিস্তানে বারো আনা প্রতি কেজি, অন্য দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে চাউল আট আনা প্রতি কেজি, সোনা প্রতি ভরি পূর্ব পাকিস্তানে আশি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ষাট টাকা এইরূপ। পোস্টারে লিখিত তাবৎ তথ্যই ছিল মিথ্যা। এইভাবে শেখ মুজিবর রহমান সামগ্রীকভাবে একটি রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের নাগরিককে অন্য অঞ্চলের নাগরিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল এবং এই ভাবেই এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সরাসরি উসকে দিয়েছিল। অনেকেই ছিলেন যারা এইসব বিশ্বাস করতেন না, তারা ভালভাবেই জানতেন যে পূর্ব পাকিস্তানের দরিদ্রতা এত সহজে দূর হবে না, তারা বুঝতে পারতো না কেন শেখ মুজিব এই অঞ্চলটার দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দুদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল কলিকাতাকে কেন্দ্র করে, সেই বিষয়টি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লেগেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়নের পূর্ব শর্ত মোতাবেক ১৯৪৭ সাল পূর্ব কোন অবকাঠামোই ছিল না। সেই বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতারা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করতেন না কোন এক রহস্যময় কারণে। আওয়ামী লীগের এই সমালোচকরা লক্ষ্য করেছিল যে, এ ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি; আবার জনসম্মুখে এ ব্যাপারে মুখ খোলাও অসম্ভব ছিল। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা অন্যান্য দলের জনসমাবেশ ভেঙ্গে দিত ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্ধীকে হুমকি দিত। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অবধি বিপক্ষদলের নেতাকর্মীদের বিরতিহীনভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছিল ও তাদের আতংকের মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছিল।

নির্বাচন পূর্ব প্রচারাভিযানে শেখ মুজিবর রহমানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা সতর্কতার সাথে লক্ষ করা উচিত। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার দাবি বা এমনকি এ ব্যাপারে কখন কোন ইঙ্গিতও করেন নি। আওয়ামী লীগের অনেক ভোটারই যারা মনে প্রাণে কায়েদ-ই-আজমের পাকিস্তান সমর্থন করতেন তাদের জন্য শেখ মুজিবর রহমনের আবেদন ছিল এই রূপ যে, তার ছয় দফা পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে তাদের কার্যকর সহযোগীতার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারভিযান ছিল অবশ্যই ব্যয়বহুল; আওয়ামী লীগ হাজার হাজার আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রছাত্রীকে তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অর্থের বিনিময়ে কাজে লাগিয়ে ছিল এবং তাদের নেতারা দেশব্যাপী ভোটার সংগ্রহের কাজে ভ্রমণ করেছিল। তবে দলের বাহিরে কেহই জানত না এই অর্থ আসছিল কোথা থেকে। কিন্তু ইহা পরিস্কার ব্যাপার যে তাদের অনেক বিত্তবান হিন্দু সমর্থক ছিল এবং ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে আবেদনও ছিল। সীমান্তের অপর পার থেকে কি তারা আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল? কেউ তা জানত না, তবে এই ব্যাপারে সবার মাঝেই সেই রকমই একটা ভাল ধারণা ছিল। কেমলমাত্র একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ অধিকার আদায়ের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের প্রচারাভিযান ও ছয় দফার ছিল অসম্ভব এক আবেদন; শুধুমাত্র সাধারণ জনগণই নয় বরং বাঙ্গালী পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও এই ছয় দফা তথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারের ব্যাপারেও প্রচণ্ড আগ্রহী ছিল। ফলাফল ছিল এইরূপ যে, সব শ্রেণীর সরল মনের সাধারণ জনগণও এই জোয়ারে গা ভাসিয়ে

ছিল এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের পিছনে সেই হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালার পিছনে পিছনে যাবার ন্যায় চলেছিল। এর ফলে নির্বাচনের আগে থেকেই শেখ মুজিবর রহমানের দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান তার অতি উৎসাহী অনুসারীদের দ্বারা উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তার বক্তৃতায় জনগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে তারা সংযত করতে পারত না।

... ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মকর্তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে, নির্বাচন একদম স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কোন রকম চাপ ছাড়াই; আবার জুলাই মাসে আমাকে দুঃখের সাথে জানিয়েছিল যে, সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী তার বিবৃতি সঠিক ছিল, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কৌশলের জন্য এই বিবৃতি প্রযোজ্য ছিল না। বিশেষ করে বড় ভোট কেন্দ্র গুলোতে আওয়ামী লীগ ভীতিপ্রদর্শন ও সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করতো, এটা তখনই মাত্র জানা গিয়েছিল যখন ভুক্তভোগীরা সাহস করে এইরূপ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলোর অভিযোগ দিয়েছিল। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে কেবলমাত্র চাপ প্রয়োগেই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, তারা প্রথম সুযোগেই ১৯৭১ এর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের প্রথম দিকে বিরোধী পক্ষের নেতাদের খুন, তাদের ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐসব স্থানে সেনাবাহিনী পৌছেছিল। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যা ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেও জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ন্যায় আওয়ামী লীগ একচেটিয়া আসন লাভ করেছিল। এটা সত্য যে, স্থানীয় রাজনীতিতে পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যারা দুটি আসন অর্জন করেন, দুটি আসন যায় বিশেষ ধর্মীয় দলে এবং ৭টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা। অনেকে ছিলেন যাদের নির্বাচনে জেতার সুযোগ খুব কমই ছিল, যদি না তারা আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না পেতেন। এবং এইভাবেই আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের ২৮৮টি পেয়েছিল। এদের বিশাল একটা অংশ ছিল সম্পূর্ণ নবাগত, যাদের আওয়ামী লীগ সমর্থক হবার প্রধান যোগ্যতাই ছিল দলটির প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, যদিও এদের জীবনে রাজনীতির কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিত প্রাণ, যারা শেখ মুজিবর রহমানকে তাদের ত্রাণকর্তা মনে করেছিল ও তার প্রতিটি কথাকে আইন মনে করতো।

... ১৯৭১ সালে বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছিল বিধায় পাকিস্তানের উভয় অংশের মাঝের বাণিজ্যিক বৈষম্যের বিষয়টি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছিল এবং তা অংশত বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে পৌছেছিল। পূর্ব পাকিস্তান ভৌগোলিক দিক দিয়েও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলার সাথে পরিচিত, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় ১৯৪৭ সালের পরই পশ্চিম পাকিস্তানও নিজেদের এই পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিল নিয়মিতভাবে! এতসব পরেও পূর্ব পাকিস্তানের একটা শক্তিশালী মহল তাদের স্বভাবসিদ্ধ আচরণে সর্বদা পশ্চিম পাকিস্তানকে শোষক হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। উভয় অঞ্চলের মাঝে বাণিজ্যের পরিসংখ্যান ১৯৭১ সালে জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছিল যে, বেশ কিছুদিন উভয় অংশ নিজ নিজ অংশের উৎপাদিত দ্রব্য প্রায় সমান মূল্যে একে অপরকে বিক্রয় করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, অনেক বছর এই ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান কিছুটা এগিয়ে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান তার আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক করেছিল খাদ্যশস্য, কাঁচা তূলা ও তৈলবীজ পূর্ব পাকিস্তানে, অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা পাট উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল না, কাঁচা পাট সম্পূর্ণটা সরবরাহ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তান পান, মশলা, কাঠ, ফল, শাকসবজি ও ডাউল পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানী করেছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কারখানায় কোন কাচামাল সরবরাহ করতে পারেনি।

তাহলে উপনিবেশক ধরনের শোষণের কথা যা আওয়ামী লীগ নেতারা গলার জোরে প্রচার করেছিল তা আদৌও সত্যি ছিল না। সাধারণত শোষক গোষ্ঠি কাচামাল সস্তায় খরিদ করে উৎপাদিত দ্রব্য আবার চড়া

মূল্যে ঐ কাচামাল উৎপাদনের দেশে বিক্রয় করে থাকে যা আদৌও পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনীতিটা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিপূরক।

এখানে বলা ছিল না যে, দুটি অর্থনীতিই সমানভাবে বিবিধ প্রকৃতির বা সমানভাবে অগ্রসর। মাথাপিছু আয়ের একটি তুলনা দেখানো হয়েছিল - পূর্ব পাকিস্তানে ৪৮০ টাকা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৬০ টাকা, বেলুচিস্তানে ৪৫৫ টাকা, করাচিসহ সিন্ধুর ৮৫৪ টাকা (করাচিতে সেই সময় পাকিস্তানের ৬৫% তহবিল জমা থাকত) এবং পাঞ্জাবে ৬১৪ টাকা। কেন্দ্রিয় সরকারের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা ছিল এই বৈষম্যের অবসান ঘটান, বিশেষ করে গত দশকে; এখানে আরও দেখানো হয়েছিল যে, কেন্দ্রিয় সরকার রাজস্ব দায়িত্বের (Revenue assignment) আকারে পূর্ব পাকিস্তানে দেওয়া সহায়তা ১৯৬০-৬১তে ৩৮% থেকে ১৯৬৮-৬৭তে ৫০% বৃদ্ধি করেছিল। উন্নয়ন সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ঐ একই সময় ৩৮% থেকে ৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সব সংখ্যার বিপরীতে যে সত্য তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তা কেন্দ্রিয় করের মোট পরিমাণে লোক সংখ্যা অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক কম কর পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৮-৬৯ এর মাঝে যখন পূর্ব পাকিস্তানে রাজস্ব দায়িত্ব (Revenue assignments) ও উন্নয়ন ঋণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখনও পূর্ব পাকিস্তানের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৬.১% থেকে ২৬.৩%। বিষয়টি অন্যভাবে বলা হয়েছিলঃ ১৯৬০-৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তান উন্নয়ন ঋণ পেয়েছিল ৩০০ মিলিয়ন টাকা, এর বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিল ৩৪০ মিলিয়ন টাকা; কিন্তু ১৯৬৫-৬৬তে পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল ৩৭০ মিলিয়ন, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ১৫০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৬৮-৬৯ উন্নয়ন ঋণের অংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ১০৬০ মিলিয়ন, পশ্চিম পাকিস্তানের ৭৮০ মিলিয়ান টাকা! ১৯৬৯-৭০ তে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ঋণ ছিল ১২৯০ মিলিয়ন, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৯১০ মিলিয়ন টাকা। একই অবস্থা ছিল রপ্তানী ঋণের ক্ষেত্রেও, ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৯-৭০, পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পশ্চিম পাকিস্তানে পেয়েছিল ১৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য সঙ্গতিপূর্ণভাবে কমিয়ে আনতে কেন্দ্রিয় সরকারের এইসব প্রচেষ্টায় লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। এইজন্য কয়েকটি লক্ষণীয় কারণসমূহ ব্যবসায় অভিজ্ঞতার অবকাঠামো সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তার উপর জোর, মূলধন সঞ্চয় এবং কোন প্রকৃত অগ্রগতির পূর্বে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণ, যা পূর্বের পাতায় উল্লেখ করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান কলিকাতার স্রেফ একটা পশ্চাদপদ অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল যেখানে উন্নয়নের সুযোগের অভাব ছিল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলার অন্য কোন অঞ্চল থেকে অনেক পিছনে পড়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে বিবিধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাৎসরিক উন্নতির হার ৪.১% তে পৌছেছিল যা এত কম সময় বিশ্বের অনেক স্থানেই সম্ভব হয়নি, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ সময় বাৎসরিক উন্নতির হার ছিল ৬.১% যা পূর্ব পাকিস্তানীরা ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু তারা বুঝতে চেষ্টা করেনি তাদের প্রদেশের প্রকৃত আস্থা কি ছিল ঠিক ১৯৪৭ সালের পূর্বে।

শত বাধা সত্ত্বেও কেন্দ্রিয় সরকারের এই কাজে অটল থাকার জন্য ধন্যবাদ পাবার অধিকার ছিল, যদিও এই প্রতিকূল অবস্থা আস্তে আস্তে অতিক্রম করছিল, তথাপি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব অস্থিতিশীল ছিল। ১৯৭০ সালের শেষে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছিল এবং বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াও প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় সরকারের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুর্যোগ কেবলমাত্র শত শত লোক হারিয়ে যায়নি, শত শত হাজার লোক একবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছিল। শস্য বীজ, গবাদিপশু ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছিল, কৃষি জমি ধ্বংশ হয়েছিল এবং শীতকালীন শস্য সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার আগেই শুরু হয়েছিল জাতীয় নির্বাচন, হয়েছিল নির্বাচনের ফল এবং অবশেষে আরম্ভ হয়েছিল আওয়ামী লীগের অযথা বিদ্রোহ, যা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, আইন শৃংখলা

পরিস্থিতির চরম অবনতি, শিল্প কলকারখানা বন্ধ এবং দেশের দুটি প্রধান বন্দর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যাদের কঠোর পরিশ্রম ও ব্যবসায়ীক অভিজ্ঞতায় পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল ও প্রদেশটিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থানে পৌছে দিয়েছিল, তারাই আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের প্রথম শিকার হয়েছিল।

... অবাক করার মত প্রকৃত তথ্য যা প্রকাশ হয়েছিল তা ছিল কেন্দ্রীয় কর বিভাগে বার্ষিক জমাকৃত মোট করের ২৬.৩% কর যেত পূর্ব পাকিস্তান থেকে, অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্র থেকে রাজস্বের অংশ হিসাবে মোট রাজস্বের ৫০% গ্রহণ করতো।

'পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা' শিরোনামের পুস্তিকাতে যে তথ্য দেওয়া ছিল তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও মেনে নেওয়া তথ্যের বিপরীত, এসবই ছিল রাজনৈতিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে সাহায্যে অনুদান, পাবলিক সেক্টরে ব্যয় ও কেন্দ্রিয় করে এর অংশ ইত্যাদিতে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরে মোট উন্নয়ন কর্মসূচী যা ১৯৬০-৬১ তে ১২৬০ মিলিয়ন রুপী থেকে ১৯৬৭-৭০ তে ৩৭৬২ মিলিয়ন রুপীতে উন্নীত হয়েছিল, এবং ১৯৭০-৭১ তে হিসাব করা হয়েছিল ৫২৮০ মিলিয়ন রুপী পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এবং এই বর্ধিত অর্থ ছিল প্রায় ১৯৯% এবং বিশেষ করে খুব দ্রুত বর্ধিত হয়েছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সময়।

যা আমি আগেই উল্লেখ করেছিলাম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মাথা পিছু আয়ের বৈষম্য দূর করতে এখন একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে পূর্ব পাকিস্তান তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছিল, অন্যদিকে চতুর্থ পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনা করেছিল বার্ষিক ৭.৫% এবং এর বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫.৫%।

বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক, পাকিস্তান শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন, হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বড় আকারের ঋণ সরবরাহ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি স্রেফ প্রাইভেট সেক্টরই মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৪১% ভাগ পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান॥"[২৪৮]

০৩.

"... With a higher share of the total resources than before, the prospect of getting more from the reserve fund, and the opportunity to press its case for higher allocations in the annual development programme, a working agreement on public sector development was arrived at between East Pakistan and the Centre under Prime Minister Suhrawardy.

While the public sector plans were being formulated, discussed, and revised, private enterprise in West Pakistan proceeded to fill the vacuum caused by the migration of Hindus in trade, banking, industry and other fields. The visible and rapid rate of industrial progress in Karachi and other parts of West Pakistan caused bitterness and heart-burning among the Bengalis. They charged the central government with neglect and deliberate adoption of policies to divert East Pakistan resources for the development of West Pakistan.

This charge was not wholly justified. The fact of the matter was that the Bengali middle classes had failed to take advantage of the tremendous opportunities offered by the

[২৪৮] এল. রাশব্রুক উইলিয়ামস/দি ইস্ট পাকিস্তান ট্রাজেডি (অনু : বোহেমিয়ান) ॥ [ড্রেক পাবলিশার্স ইন. (নিউইয়র্ক) - ১৯৭২। পৃ. ২৯-৩১/৪৩-৪৬/৪৭-৪৮/৫০-৫৩/১১৫-১১৭/১২১-১২২]

departure of Bengali Hindu businessmen. They failed to exert themselves to learn new trades, and did not develop entrepreneurial flair as the locals and migrants from India did all over West Pakistan. There was no indigenous capital or enterprise in East Pakistan to set up industries or take over the trade. Yet, when one of the few Muslim business houses, the Ispahanis, which had always had all its interests in Bengal, undertook jute marketing in the difficult circumstances following the non-devaluation decision, one member asked in the East Pakistan Assembly, 'What business have they to come here'?

On the other hand, the Chief Minister of East Pakistan complained that he had failed to attract industrialists from West Pakistan to subscribe 51 per cent of the capital in a cotton-spinning mill sponsored by the provincial government, and could not get a technical manager to prepare the project. Another member thought that there has been a conspiracy of capitalists not to invest in the industrial development of East Pakistan. But the xenophobia that was freely expressed by the local leadership from public forums was not conducive to a favourable investment climate. The 'exploitation' syndrome took a violent turn in the killings of the non-Bengali management of the Chandragona Paper Mills, and ethnic rioting in the Adamjee Jute Milis in 1954. The United Front leadership did nothing to create a suitable environment for industrial development. On the other hand, there were no such inhibitions in West Pakistan; Ghulam Muhammad, the Finance Minister, made the point that some people 'brought large sums of money with them (from India). All that flows here (in West Pakistan) and could have flown also to East Bengal but for the policies adopted by certain Ministers...'.

The two Wings were one country. Unless they were treated as two economies, industrialization in the first phase had to be, as a matter of survival, on a 'first come first served' basis as far as the issue of sanctions, release of foreign exchange, and choice of location were concerned. East Pakistanis missed the opportunities by not coming forward themselves, and not encouraging 'outsiders' to undertake their development. In the alternative, the logic of the Bengali grievances was two economies and a confederation between the two Wings. In the 1950s it was a bit too early for East Pakistan to seriously press its demands in such stark terms but, looking back, this seems to be the route which the frustrations of the East Wing were taking. Perhaps this might have come about through the constitutional process if it had been allowed to take its normal course.

... The Bengali grievance that West Pakistani capitalists were taking the profits away to West Pakistan had a basis, but was not wholly true. There is no denying that, but for the enterprise of non-Bengalis, there would have been very little industrialization in East Pakistan, and internal and foreign trade would have continued to remain in the hands of Calcutta capitalists. In the industrial sector alone, six non-Bengali industrialists with assets in East Pakistan (Adamjee, Dawood, Bawany, Ispahani, Amin, and Karim) controlled over 40 per cent of the total assets, 32 per cent of production in the large manufacturing sector, and 81.5 per cent of the jute industry of the country. Three houses (Adamjee, Ispahani, and Amin) accounted for 69.1 per cent of the total jute manufacture, Adamjee alone holding the major share of 49 per cent. Out of the six industrial houses, four had their entire holdings in East Pakistan in 1961. Each of the other two houses (Adamjee and Dawood) had about 50 per cent of their total net assets located in East Pakistan. A comparative study of 1961 and 1970 shows that, except for a few changes in relative rankings in terms of value of assets and dispersal of holdings, the top houses remained the same over the decade. The heavy stakes of non-Bengali capitalists in East Pakistan no doubt emerged from the windfall profits they made, but the growth in their assets showed that most of these earnings were being ploughed back into East Pakistan. The big business houses, the degree of concentration of wealth in them, and the kind of

windfall profits which enabled them to increase their capital assets were the same in both the Wings. Reforms were needed at the national level."[২৪৯]

০৪.

"... ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কলমের এক আঁচড়ের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশটির অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে যখন নানা সমস্যা বিস্ময়কর গতিতে ভিড় করতে থাকে এই ভূখণ্ডে, যেখানকার জনসংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ, যাদের মধ্যে ২,৯৪,৮১,০০৯ জন মুসলমান, ১,১৭,৩৬,০২৯ জন হিন্দু, ৫৬,৮৮২ জন খৃস্টান এবং ১,১৭৯ জন শিখ। ঐ সময়ে মাইলপ্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৭৭৫ জন, যা ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ ঘনবসতি। কেবলমাত্র ৫০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং অসংখ্য আঁকাবাঁকা নদ-নদী ও খাল এই ভূখণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ তৈরি করেছিল।

পূর্ববাংলা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল ভারতের ৪০০ সুতাকলের মধ্যে মাত্র ১০টি, ১০৬টি পাটকলের একটিও না, লোহা ও ইস্পাত কারখানা, কাগজ কল, রাসায়নিক শিল্প, কয়লা খনি কিংবা পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প একটিও না। কেবল ছিল ৪৯টি অস্থায়ী (ঋতুভিত্তিক) পাটের গাঁইট বাঁধার কারখানা (সমগ্র দেশের এতদসংক্রান্তকর্মকাণ্ডের ২০ শতাংশ মাত্র), ৫৮ টি ক্ষুদ্র চাউলকল, ৩টি চিনির কল ও ১টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী।

এতদ্‌সত্ত্বেও সমসাময়িক সরকারি বিবরণীতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটি আশাবাদী চিত্র তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতার পরপরই প্রকাশিত একটি সরকারি দলিলে উল্লেখ করা হয় যে, এসব উপেক্ষিত অঞ্চলের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা সংক্রান্ত আশা, যা নিয়ে নতুন রাষ্ট্র তার যাত্রা শুরু করে, তা কোন মূল্যহীন বিশ্বাস নয় এবং ঐ দলিলে চা, তামাক, চামড়া, কাগজ ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এতে জনগণের আস্থা ও মনোবল অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, দশকের পর দশক ধরে পাট উৎপাদনকারী এই প্রদেশটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল কলকাতার সমৃদ্ধির পশ্চাদভূমি হিসাবে।

পূর্ব বাংলায় কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও ঘাটতি ছিল, যেমন ভোজ্যতেল, চিনি এবং বস্ত্র। এখানকার ৪টি চিনির কলে বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২৫,০০০ টন, যা প্রয়োজনের অর্ধেক। পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে অবিভক্ত বাংলার মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাত্র ১২ শতাংশ। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০০।

স্বাধীনতার সময়কালকে সরকারি প্রতিবেদনসমূহে সাধারণত 'সমস্যা জর্জরিত' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যেই প্রথমে বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় যখন চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ও পাঁচ লক্ষের অধিক জনগোষ্ঠী প্রবল বন্যায় আক্রান্ত হয়। শত শত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য গবাদি পশু ভেসে যায় বন্যার পানিতে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় শস্যসম্পদ ফলে নতুন দেশে সৃষ্টি হয় খাদ্য সংকটের সমস্যা। বন্যার পানি নেমে না যেতেই নজিরবিহীন এক ঘূণিঝড় পূর্ববঙ্গের সর্বদক্ষিণের অঞ্চল কক্সবাজারের উপর দিয়ে বয়ে যায়, যাতে প্রায় এক লক্ষ মানুষ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বার্ষিক পলিজ বৃদ্ধি ছাড়াও নদীসমূহে অব্যাহত ক্ষয়প্রক্রিয়ার কারণে পূর্ববাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

তবে দেশের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠে খাদ্যসংকট। ৭.৮ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদনকারী এবং ৮ মিলিয়ন টন ধানের চাহিদাসম্পন্ন এই অঞ্চল দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন হলো, অথচ তখনো জনগণের

[২৪৯] Hasan Zaheer / The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism \ [Oxford University Press - March, 1994| p. 56-57/144-145]

স্মৃতি থেকে ১৯৪৩-এর ভয়াল দুর্ভিক্ষের ছবি মুছে যায়নি। বিভাজনের পর পূর্ববঙ্গ বরাদ্দ হিসেবে পায় মাত্র ১৮,০০০ টন ধান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কোন মজুদ ময়দার অস্তিত্বই ছিল না এই প্রদেশে। এমনকি এই তারিখের চার মাস আগে থেকেই ঢাকায় কোন রুটির সংস্থান করা সম্ভব ছিল না। তদানীন্তন ধানের মজুদ আর মাত্র দুই সপ্তাহ শহরের চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল, এবং তাও শহরের রেশনিং সিস্টেমের অধীন ছিল। প্রদেশের মোট ৩৯,০০০ টন খাদ্যের চাহিদায় ঘাটতি ছিল ৯,০০০ টন। যেহেতু সম্পূর্ণ পরিবহনব্যবস্থাই হিন্দু কর্মীরা দেশান্তরী হওয়ার ফলে অচল হয়ে পড়েছিল, তাই ঘাটতি এলাকাগুলি খাদ্য বিতরণকারী সংস্থার আয়ত্তের বাইরেই চলে যায়। অথচ একটি বাস্তব সত্য এই যে, সেই সময় খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয়ই প্রাদেশিক সরকারকে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সচল রেখেছিল।

যখন ঔপনিবেশিক শক্তি দেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন জনগণের পরিবর্তে অনেকাংশে নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণই সরকারের শাসনভার গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া ভারাক্রান্ত ও দুর্বহ হয়ে উঠেছিল অসংখ্য প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যার দ্বারা। এক সরকারি প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, বিভাগীয় জটিলতা ও অস্পষ্টতার কারণে ১৫ আগস্ট প্রাদেশিক রাজস্ব দফতরের তহবিল একদম শূন্য হয়ে পড়ায় একজন বিশেষ গুপ্তচরকে করাচীতে পাঠানো হয়েছিল ত্রাণসাহায্য চাওয়ার জন্য। কর্মকর্তার অভাব নিয়েও সমস্যা ছিল। কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রের সূচনা ছিল এই রকম :

'আগস্ট ১৪, ১৯৪৭। কলকাতার কাছাকাছি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে একটি ডাকোটা বিমান অনিচ্ছুকভাবে রওয়ানা দিল ঢাকার উদ্দেশে... বিমানটি ভূমি স্পর্শ করার পর দুই ডজন কর্মকর্তা তা থেকে নেমে এলেন। এঁরা ছিলেন পাকিস্তানে চলে আসতে ইচ্ছুক কিছু সিনিয়র কর্মকর্তা যারা পূর্ব বাংলার কিছু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ পূরণ ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন।... এ রকম একটি ঢাকাগামী ডাকোটা ফ্লাইটই যথেষ্ট ছিল ঐ পর্যায়ের যোগ্যতার অধিকারী কর্মকর্তাদের অভাব পূরণের জন্য।'

এমনকি কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গে সরকারি প্রশাসন প্রায় অস্তিত্বহীন এবং ভয়ানকভাবে অদক্ষ হয়ে পড়লো। ৯ মার্চ, ১৯৪৮-এর 'Statesman' পত্রিকা (কলকাতা) এক সমালোচনায় লিখেছিল, 'কিছু রাষ্ট্র শূন্য তহবিল নিয়ে কাজ শুরু করে, যেমন পূর্ববঙ্গ কাজ শুরু করেছে একটি ভেঙ্গে পড়া প্রশাসনযন্ত্র নিয়ে।' প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়ায় অসহায়ত্ব প্রতিভাত হয়েছে, কেননা তাদেরকে হঠাৎ নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের পদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এর চেয়ে বেশি ভিন্ন ছিল না :

'ঢাকা একটি ছোট্ট বিভাগীয় শহর...হঠাৎ করেই সেখানে কেবল প্রাদেশিক সরকার নয়, এর বিশাল কর্মচারীবাহিনী, আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম এবং এমনকি কতিপয় কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগের জন্য স্থান সংকুলানের প্রয়োজন হলো...নতুন সরকার নিজের দেশেই ছিল পলায়নপর...আদেশ কখনো ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় লিখিত হতো, তথ্যবিনিময় হতো ছেঁড়া সিগারেটের প্যাকেটে, টাইপরাইটার মাঝে মাঝে মিলতো, টেলিফোন ছিল এক দুর্লভ সামগ্রী...প্রশাসনের সুবিধাদায়ক যন্ত্র না হয়ে তা পরিণত হয়েছিল বিলাসসামগ্রীতে...কর্মকর্তারা নিজেরাই প্রায়শ নিজেদের বার্তাবাহকের ভূমিকা পালন করতেন। আসবাবপত্র বলতে বস্তুত কিছুই ছিলনা।'

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) স্মরণ করেন,

'স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই সেখানে কেবল দুই ব্যাটালিয়ন পদাতিক বাহিনী ছিল। এদের একটিতে ছিল তিনটি কোম্পানি, যাদের সৈনিক হওয়ার মত যোগ্যতার যথেষ্ট অভাব ছিল। সদর দফতরে কোন টেবিল, চেয়ার, সাজসরঞ্জামাদি, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র কোন কিছুই ছিল না। কর্মকর্তারা কুঁড়ে ঘরে বাস করতো, মুষলধারে বৃষ্টি হলে তাতে ক্রমাগত পানি পড়তো, কখনো ত্রিপলঢাকা ছাদ উড়ে যেত।

১৯৪৭-এর আগস্টে ঢাকায় চাকুরিরত একজন সামরিক কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী : '১৯৪৭ সালের আগস্টে মনে হচ্ছিল, প্রদেশটি অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কবলে পড়েছে।' তিনি আরো মন্তব্য করেন: 'সেই অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ সাফল্যের জন্য যা পাওয়া গিয়েছিল, তাও ছিল তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল, এক কথায় একেবারেই অপর্যাপ্ত।'

পুলিশবাহিনী তাদের নিজেদের মূল্যায়নে অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল। আইনের প্রয়োগ এবং শৃঙখলা রক্ষা উভয় দায়িত্বই বৃটিশ আমলের মত তখনো পুলিশ বাহিনী পালন করতো। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ প্রশাসনের প্রতিবেদনে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বাধীনতার প্রথম বছর সম্পর্কে বলেন, এটি নজিরবিহীন প্রবল চাপ ও সংকটের বছর। মজার ব্যাপার এই যে প্রারম্ভিক অনিশ্চয়তার এ সময়ে সরকারি প্রতিবেদনসমূহ নতুন দেশকে অভিহিত করেছে 'শিশুরাষ্ট্র' বলে॥"[২৫০]

০৫.

"... পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল (পূর্ববাঙলা) ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতি, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই বৈষম্যের কারণে পূর্ববাঙলার জনগণের, পশ্চিমাদের ওপর বিক্ষুব্ধ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা যতই সত্য হোক, সেটি হ'ল ঘটনার এক দিক। এর বিপরীতে আরও যে অনেক সত্য ও বাস্তব ঘটনা আছে তা পাকিস্তানের প্রতি চরম বিদ্বেষের কারণে কখনও আমরা তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। পাঠকদের এখন আমরা সেই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাই।

ইতিহাসের অপর পিঠ হ'ল : পশ্চিম পাকিস্তানীদের নির্মম শোষণ-লুন্ঠন এবং পূর্ব-পশ্চিমের অনেক বৈষম্যের পরও পূর্ববাঙলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ১৯৪৭ সালের আগেকার বৃটিশ শাসনামলে যেরকম ভয়াবহ রকমের পশ্চাৎপদ ছিল - সে তুলনায় সাতচল্লিশ-উত্তর তেইশ বছরে বহুগুণ উন্নত হয়েছিল।

আমরা জানি, ৪৭-এর পর মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে বৃটিশ আমলের পান্ডববর্জিত, পশ্চাৎপদ, হতদরিদ্র পূর্ববাঙলায় গড়ে উঠেছিল এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুটমিল, উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম টুলস ফ্যাক্টরি জয়দেবপুর মেশিন-টুলস ফ্যাক্টরী, চিটাগাং স্টীল মিল, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি, বাওয়ানী জুটমিল, করিম জুটমিল এবং পাকশী ও কর্ণফুলী পেপারমিল সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কারখানা। ঢাকায় স্থাপিত হয়েছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী (যেটি আজকের শেরেবাঙলা নগর এবং আমাদের গর্বের সংসদ ভবন)। এমনকি ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে ঢাকায় ডিআইটি ভবনে যে টিলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি ছিল সমগ্র পাকিস্তানের প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র (তখনও পশ্চিম পাকিস্তানে কোন টেলিভিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি)।

যাদের বয়স আজ ষাটের কোঠায় তাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, তখন ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ববাঙলার রাস্তাঘাটে চলাচল করতো চট্টগ্রামের প্রগতি ইন্ডাস্ট্রির বাস ও ট্রাক। এমনকি আজ শুনলে অলীক স্বপ্নের মতই মনে হবে - ১৯৭২-৭৩ সালেও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি চালু ছিল এবং সে সময় শোনা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিকে দিয়ে একটি প্রাইভেট কার তৈরীরও নাকি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আর সেই অপার সম্ভাবনাময় প্রগতি ইডাস্ট্রি আজ এক ধ্বংসস্তূপ, কেবলই এক বিস্মৃত ইতিহাস। আদমজী জুটমিল, চিটাগাং স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, বাওয়ানী জুটমিল, মেশিন-টুলস ফ্যাক্টরি, পাকশী পেপার মিলসহ বড় বড় শিল্পকারখানাগুলো সব আজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

---

[২৫০] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : বামপন্থীদের ভূমিকা/সম্পা : মেসবাহ কামাল ॥ [সম্পর্ক (কলকাতা) - ২০০০। পৃ. ৩১-৩৪]

অথচ পাকিস্তান আমলেই এইসব শিল্পকারখানায় লক্ষ লক্ষ বেকার, হতদরিদ্র বাঙালীরা চাকুরী করে আধুনিক শিল্পশ্রমিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার বাঙালীর কর্মসংস্থান হয়েছিল। সেসব শিল্পকারখানার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল অনেক ব্যবসাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান - সেখানেও বিপুলসংখ্যক বাঙালীর কর্মসংস্থান হয়েছিল। এর ফলে ওই ২৩ বছরেই পূর্ববাঙলায় বিকাশ ঘটেছিল এবং মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

পূর্ববাঙলার শিক্ষা, শিল্প, চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস, কবিতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছিল সেই আমলেই। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, এস. এম. সুলতান, কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক, শামসুর রহমান, আল-মাহমুদ, আব্বাসউদ্দিন, মুনির চৌধুরী, আলতাফ মাহমুদ সকলেই ওই আমলের। তাদের সকলেরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরে। স্বাধীন বাংলাদেশের তেতাল্লিশ বছরে যার বিকাশ আরও বহুগুণ ও বহুমাত্রিক হওয়া উচিত ছিল - সেখানে তেতাল্লিশ বছরে একজন জয়নুল আবেদীন, এস. এম. সুলতান, কামরুল হাসান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আলতাফ মাহমুদ, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ তৈরী হয়েছে কি? তৈরী হয়েছে কি লালসালু, আব্দুল্লাহ, সূর্যদীঘল বাড়ী, চিলেকোঠার সেপাইয়ের মত কোন কালজয়ী উপন্যাস?

আমরা জানি, পাকিস্তানী আমলের ২৩ বছর পূর্ববাঙলার মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের মান প্রতিবেশী ভারতের অনেক রাজ্যের চেয়ে ওপরে ছিল। টাকার মান ভারতীয় রুপীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। অথচ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বিপুল স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আজ তেতাল্লিশ বছরে আপেক্ষিক মাত্রায় শুধু অসচ্ছল নয়, চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বেড়েছে হয়তো পঞ্চাশ গুণ, কিন্তু ব্যয় বেড়েছে দেড়শ' গুণ। আজ ঢাকা শহরে যে দশ লক্ষ রিক্সা শ্রমিক রয়েছে তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিবার পাকিস্তান আমলে ছিল মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত।

ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে উত্তেজনাকর শ্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগ যে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামে পোস্টার প্রচার করেছিল, সেটি ছিল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য রাজনৈতিক শ্লোগান। প্রকৃতপক্ষে অতীতের (ছোলতানী-নবাবী আমলের) 'সোনার পূর্ববাঙলা' শ্মশানে পরিণত হয়েছিল বৃটিশ আমলের দু'শ' বছরে। বৃটিশ শাসনাধীন দু'শ বছরের সেই 'শ্মশান পূর্ববাঙলা' পাকিস্তান আমলের মাত্র তেইশ বছরে সোনার বাঙলা না হোক, অন্তত শ্মশান থেকে উঠে এসে সোনার বাঙলা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। শেখ মুজিব যে 'ছয় দফা'র মাধ্যমে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্য থেকেই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্বপাকিস্তান (পূর্ববাঙলা) চেয়েছিলেন এবং সেই বাঙলাকেই 'সোনার বাঙলা' বানাতে চেয়েছিলেন, তার মনস্তাত্ত্বিক মর্মার্থ বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সাতচল্লিশ-পূর্বকালের সেই পান্ডববর্জিত ভূখন্ডের ম্লেচ্ছ-যবনরা সাতচল্লিশের পর কীভাবে উষার আলোর মত জেগে উঠেছিল তার একটি ক্ষুদ্র চিত্র ফুটে উঠেছে হাল আমলের বাংলাদেশের বিদগ্ধ লেখক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি বক্তব্যের মধ্যে। অতি সম্প্রতি জনাব মনজুরুল ইসলাম দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত তার এক নিবন্ধে সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ববাঙলা (পূর্ব পাকিস্তান) সম্পর্কে বলেছেন :

'... কী এক রসায়নে এর শিল্প-সাহিত্যে শুরু হল জোয়ার। এক দশকেই-পঞ্চাশের দশকে আধুনিকতার বড় বড় সব ঢেউ আমাদের চিত্রকলা, গল্প, উপন্যাসে-শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির সৈকতে আছড়ে পড়ল, যেন নতুন শক্তি নিয়ে জাগল। ... ষাটের দশকে এসে বুঝলাম, আমরা বিশ্বের সঙ্গে আছি, গন্ডগ্রামে পড়ে থাকার মানুষ নই আমরা। আমরা এখন একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের জাতি।'

কেউ আমরা স্বীকার করি না করি - সৈয়দ মনজুরুলের ভাষায় যে 'রসায়ন' আমাদের শিল্প-সাহিত্যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই 'রসায়নে'র নাম 'সাতচল্লিশ'।

পাঠক যেন ভুল না বুঝেন - অতীতের এসব ইতিহাস বয়ানের উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া নয়। তার কোন অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে নতুন প্রজন্মকে এসব ইতিহাস অবশ্যই পাঠ করতে হবে। প্রজন্মকে ইতিহাস পাঠ করাতে হবে তাদেরকে 'পাকিস্তানপ্রেমী' বানানোর জন্য নয়, বরং তাদেরকে ইতিহাস সচেতন করে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সুসংহত করে তোলার জন্যই॥"[২৫১]

০৬.

"ষাটের দশকে নৌকা কিংবা হাঁটাপথ যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল, যে জন্য কৃষিজাত পণ্যের ভালো বাজার ধরা কঠিন ছিল। প্রতিমাসে থানা কাউন্সিলের সভা করার জন্য আমাকে অন্তত একবার প্রতি থানায় যেতে হতো। আমার মনে আছে, মোল্লাহাটে চার আনায় এক হালি ডিম পাওয়া যেত।

এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দেশে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল এবং বর্তমান সময়ের তুলনায় খুন-রাহাজানিসহ মারাত্মক ধরণের অপরাধ সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। রাজনৈতিক সন্ত্রাস তো দূরের কথা, দুর্বৃত্তদের মধ্যেও বর্তমান স্টাইলের সন্ত্রাস আমাদের কাছে অজানা ছিল। দেশে দারিদ্র্য অসহনীয় পর্যায়ে ছিল - শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ মহকুমা আর থানা সদরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এত কষ্টের মধ্যেও মানুষের মনে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল না; ছিল না মাঠেঘাটে সর্বত্র পাল্লা দিয়ে দুর্বৃত্তায়ন আর অপশাসনের উর্ধ্বগতি॥"[২৫২]

০৭.

"... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিগত ২৩ বৎসরে গোটা পাকিস্তানে সাড়ে ছয় হাজারের বেশী ছোট ও বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। আর এই গুলিতে ও প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ দশ হাজার কোটি টাকারও বেশী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পুঁজি আসলো কোথা থেকে অর্থাৎ এই পুঁজি কাদের? পাকিস্তানে এ পর্যন্ত গত তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়েই বেশির ভাগ শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন শিল্পে পুঁজি নিয়োজিত হয়েছে। এই পুঁজির বৃহদাংশ এসেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে, তথাকথিত 'সাহায্য বাবদ' লগ্নীকৃত পুঁজির মাধ্যমে। তিনটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় চড়া সুদে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এসেছে ৪৫০০ কোটি টাকারও বেশী। এ ছাড়া পাকিস্তানে লগ্নীকৃত বিদেশী ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে ১৫০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন শিল্পে স্বনামে ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বেনামে নিয়োজিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির পরিমাণ আরও ১০০০ কোটি টাকার বেশী। অর্থাৎ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানে নিয়োজিত ব্যবসা ও শিল্প পুঁজির ভিতর শতকরা ৭০ ভাগ এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। তাই মার্কিন লগ্নী পুঁজির শোষণই পাকিস্তানে প্রধান।

এই বৎসর থেকেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন পর্যন্ত আগত সাহায্য বাবদ লগ্নীকৃত সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির সুদ বাবদ ২২০০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে শতকরা ১০ টাকা হারে। অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে 'সাহায্য' বাবদ লগ্নীকৃত ৪৫০০ কোটি টাকার ভিতর আদতে শতকরা ৬০ টাকা পৌঁছায় নাই। তথাকথিত 'সাহায্য' প্রাপ্তির শর্তসমূহের অধীনে, তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের খরচ বাবদ শতকরা ২০ ভাগ অগ্রিম কেটে রাখা, অসম চুক্তি অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ক্রীত পণ্যের জন্যে বাজার দর অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ মূল্য বেশী নেওয়া এবং শতকরা ৩৩ ভাগ বেশী জাহাজী ভাড়া আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেটে রেখেছে। অথচ আমাদের সুদ গুণতে হবে পুরো টাকার। ইহা মহাজনী প্রথার সুদকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[২৫১] রইসউদ্দিন আরিফ (সাবেক সম্পাদক, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি)/অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ : বাঙালী ও বাংলাদেশ ॥ [পাঠক সমাবেশ - ফেব্রুয়ারি, ২০১৫। পৃ. ১২৬-১২৯]

[২৫২] এ টি এম শামসুল হুদা (সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার)/ফিরে দেখা জীবন ॥ [প্রথমা প্রকাশন - ফেব্রুয়ারী, ২০১৪। পৃ. ১১৬]

... পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে আমাদের দেশের সম্পদ প্রধানত: লুটে নিয়ে যাচ্ছে শতকরা ৩০ ভাগেরও কম নিয়োজিত পুঁজির অবাঙ্গালী মালিকেরা নয়, শতকরা ৭০ ভাগ নিয়োজিত লগ্নীকৃত পুঁজির মালিক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা। এই কথা গোটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সত্য এবং পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার সম্পদ প্রধানত: অবাঙ্গালী পুঁজিপতিরা নিয়ে যাচ্ছে - পুঁজিবাদী স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার পুঁজিবাদী দলগুলি, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ মহল কর্তৃক বহুল প্রচারিত এই কথা আদৌ সত্য নহে। দেশীয় পুঁজি, এবং তার ভিতর প্রধানত: অবাঙ্গালী পুঁজির শোষণ আছে, এই কথা সত্য, কিন্তু প্রধানত: বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীকৃত পুঁজি, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিই হচ্ছে পূর্ব-বাংলা ও পাকিস্তানের সম্পদের সবচেয়ে বড় শোষক।

... পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির দাবিকৃত পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী ইত্যাদি ধুয়া তুলে বিভক্ত করতে সাহায্য করছে। পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি শ্রমিক কৃষকের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বদলে জাতিগত বিভেদ ও শোষণকেই বড় করে তুলে ধরছে এবং এইভাবে গোটা পাকিস্তানের শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলনে ঐক্যের বদলে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টির সাহায্য করছে। বিশেষ করে যেখানে পূর্বেই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক কৃষকের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ছাড়া পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্বশাসনের অর্থই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ (যা কিনা শ্রমিক কৃষকের উপর চেপে থাকা প্রধান শোষণ ও নিপীড়ন) ঠিক রেখে শুধু দেশীয় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী মালিকের রদ-বদল শ্রমিক কৃষকের গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবিদার পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির কিছু বামপন্থী পুঁজিবাদী দল মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথা বললেও পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্ব শাসন সম্পর্কে সবচেয়ে মুখর আওয়ামী লীগ পন্থী তথাকথিত 'বঙ্গবন্ধু'দের নিকট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ তোলা তো হারাম স্বরূপ। এই সমস্ত 'বঙ্গবন্ধু'রা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে কোনও আওয়াজ তুলতে এতো নারাজ কেন তা খুবই স্পষ্ট। ইহারা আদতে শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর থেকে কোনও প্রকার শোষনের উচ্ছেদ চান না। ইহারা আসলে যা চান, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সঙ্গে শ্রমিক কৃষক ও জনগণের উপর শোষণে ছোট ভাগীদার হতে।

এদের বাঙ্গালীর স্বায়ত্ত্ব শাসনের আসল অর্থ হচ্ছে শ্রমিক কৃষকের উপর সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় পুঁজির শোষণকে বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের দেশীয় সহযোগীদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা লাভ করা। অপর অর্থে এদের পুঁজিবাদী বাঙ্গালী স্বায়ত্ত্ব শাসনের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনগণকে শোষণকারী দেশীয় শোষকদের বেলায় বাঙ্গালী পুঁজিপতি বা মালিকদেরই প্রধান অধিকার থাকবে শ্রমিক কৃষকদের শোষন করার। এই দাবির সঙ্গে এই দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের উপর থেকে প্রধান শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের, অবসানের কোনও সম্পর্ক নাই। শ্রমিক কৃষকদের নিকট এর অর্থ হচ্ছে শুধু মাত্র দেশীয় শোষক ও মালিক পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়।

পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির এই পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। কারন এদের দাবি ও কার্যকলাপ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের ভিতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যের বদলে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। ইহা গোটা পাকিস্তানের শ্রমিক ও কৃষকের - তাদের মূল শত্রু ও শোষক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে - ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা ও বিভেদ সৃষ্টি করছে। এ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলনকে বিভেদ সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার সঙ্গে ভালোভাবেই খাপ খায়।

তাই এই কথা স্পষ্ট যে, এই ধরণের পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবিতে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক ও মেহনতি জনগণের কোনও স্বার্থ নাই। এর ফলে তাদের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী বা দেশীয় কোন ধরণের শোষণের অবসান তো হবেই না, উপরন্তু আরও বেশী করে সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজির শোষণ চেপে বসবে। তাই সচেতন শ্রমিক ও কৃষক এই ধরণের ভুয়া ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবি সমর্থন করবে না এবং এর দ্বারা কিছুতেই প্রতারিত হবে না। শ্রমিকেরা নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ পন্থী ভুয়া 'বঙ্গবন্ধু'দের মুখোশ শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের নিকট খুলে ধরবে। এরা 'বঙ্গবন্ধু' বটে, তবে বাঙ্গালী শ্রমিক কৃষকের নয় বাঙ্গালী পুঁজিপতি শোষক ও মালিকদের বন্ধু হতে পারে। এই সমস্ত ভুয়া জনদরদীরা তাদের নিজেদের মালিক বা পুঁজিপতি শোষক হবার ব্যক্তিগত স্বার্থকেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বার্থ, শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ বলে জাহির করবার প্রতারনামূলক কাজেই লিপ্ত রয়েছে।

... সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে বজায় রেখে পুঁজিবাদী স্বায়ত্ত্ব শাসনের সহজ অর্থ হচ্ছে শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর প্রধান শোষণকে বজায় রেখে শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দেশীয় পুঁজিপতি পাহারাদারদের নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা ভাগ করে নেওয়া। যেমন, পূর্ব-বাংলায় বাঙ্গালী পুঁজিপতি শ্রেণী ও মালিকেরা পূর্ব-বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী-পুঁজি ও পুঁজির শোষণের পাহারাদারী করবে এবং বাঙ্গালী শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ছোট অংশীদার হিসাবে প্রধানতঃ নিজেদের শোষণ প্রতিষ্ঠা করবে, অবাঙ্গালী মালিকেরা প্রধান অংশ নিতে পারবে না। তেমনি পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী মালিকরা, সিন্ধুতে সিন্ধী মালিকেরা এই ভাবে গোটা পাকিস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিপতি শোষকেরা ভাগ করে নেবে। অবশ্য সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সমানভাবে বজায় থাকবে।

আওয়ামী লীগ পন্থী তথাকথিত 'বঙ্গবন্ধুরা' শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের উপর প্রধান শোষক সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি ও নিয়োজিত পুঁজির শোষণকে বজায় রেখে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার পাহারাদারী ও নায়েবীর জন্য পাকিস্তানে কালনেমির লঙ্কা ভাগ করতে ব্যস্ত। এরা বাঙ্গালীর স্বায়ত্ত্ব শাসনের নামে পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পাহারাদার দেশীয় মালিক ও শোষক হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উচ্ছিষ্ঠের অংশ পাবার সুখ স্বপ্নে বিভোর রয়েছে। হ্যাঁ, এরা ঠিক এই স্বপ্নই দেখছে॥" (৩০/০৪/১৯৭০)[২৫৩]

০৮.

"... একই রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে আমাদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করছিল তাতে তাদের সঙ্গে যে একসঙ্গে বেশী দিন থাকা চলবে না সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জনসংখ্যায় আমরা অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসন ও দেশ শাসনের উপর আমাদের কোন অধিকার ছিল না। স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ অধিকার পাওয়ারও ভবিষ্যতে তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'দিন আগে-পরে স্বাধীন আমাদের হতেই হতো।

তাই বলছি স্বাধীনতা আসতোই, তবে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে স্বাধীনতাটা আট-দশ বছর আগে এসে গেছে। স্বাধীনতার জন্যে মনেপ্রাণে চরিত্রের দিক থেকে উপযুক্ত হওয়ার আগেই আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। স্বাধীনতাকে উপযুক্তভাবে ধারণ করার ক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই স্বাধীনতা এসে গেছে। এটা অনেকটা পাঁচ বছরের ছেলের হাতে ছুরি পড়ার মত। ছুরি একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, এ দিয়ে অনেক কাজ হয়। কিন্তু সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বয়স অন্তত দশ-বার বছর হতে হবে। না হলে অবোধ শিশুর হাতে ছুরি পড়লে নিজের নাক কান গলা কেটে মহা অনর্থ ঘটিয়ে বসে। বাষট্টি সালের পর থেকে আমাদের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনায় যোগ্য অল্প কিছু

[২৫৩] সইফ-উদ-দাহার/রাষ্ট্রভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তারপর॥ [নওরোজ কিতাবিস্তান - নভেম্বর, ১৯৮৬। পৃ. ১২-১৭]

লোক সৃষ্টি হচ্ছিল। এদেশের প্রশাসনে অবাঙ্গালী অফিসার ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে কমে গিয়ে বাঙ্গালী অফিসারদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এভাবে প্রশাসনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে বাঙ্গালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে এমন একটা সময় আসতো যখন জাতিগত বৈষম্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকতো। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের উঠতি পুঁজিপতিদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ক্রমাগত তীব্রতর হতে হতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো যখন অবাঙ্গালীরা তাদের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকলকারখানা ধীরে ধীরে বিক্রি করে দিয়ে তাদের অধিকাংশ পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতো। এটা হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের জন্য মঙ্গল হতো। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পুঁজির বিকাশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজি স্থানান্তর স্বাভাবিকভাবে ও সময়ের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে যদি ঘটতো তবে পূর্বাঞ্চল একদিন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলেও আজ শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে অরাজকতা দেখছি এটা ঘটতো না। বর্তমানে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর নামে যে দেশপ্রেমহীন লুটেরা গোষ্ঠী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসেছে এদেরকে দেখতে পেতাম না। সেস্থলে দেখতে পেতাম দেশপ্রেমিক জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একটি শিল্পগোষ্ঠী যারা দেশের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতো।

একাত্তরের যুদ্ধের পর পশ্চিমারা তাদের শত শত কোটি টাকার বিশেষ সম্পত্তি কলকারখানা ফেলে পালিয়ে যাওয়ার ফলে এগুলো গিয়ে পড়লো এমন সব লোকের হাতে যাদের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তো ছিলই না বরং এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নিঃস্ব, দালাল ও টাউট। ফলে গত পনর-ষোল বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সত্যিকার চরিত্রবান তেমন কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পগোষ্ঠীর আগমন জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে বর্তমানে চলছে স্রেফ লুটপাট যা জাতীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়ে সামাজিক জীবনে সৃষ্টি করছে অনন্ত সমস্যা।

ষাট দশকের প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক থেকে বোঝা মনে করে আসছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায় শিল্পায়িত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে পাটের বিকল্প বের হওয়ার পর পাটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিকভাবে অনেকটা কমে যায় এবং ইতিমধ্যে গোলাম মোহাম্মদ ব্যারেইজ, তারবেলা বাঁধ প্রভৃতি হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান শিল্প ও কৃষিতে প্রভূত উন্নতি করে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছিল। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা নিজেদেরকে অনেক বেশী স্বাবলম্বী ভেবে আমাদেরকে লায়াবিলিটি মনে করতে লাগল।

উনিশশ চৌষট্টি সনের মাঝামাঝি মতিঝিল আমিন কোর্টের নীচ তলায় মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেকটর ছিলেন আমানুল্লা খান নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ডঃ কামাল হোসেনের ভায়রা ভাই হতেন। একদিন মনে আছে তার অফিসে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করতে করতে পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণের কথা উঠতেই আমানুল্লাহ খান বললেন, 'Mr. Mohaimen you do not know. Today West Pakistan thinks East Pakistan is liability to them. They like to get rid of you.' শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমার ধারণা পাকিস্তান এখনো আমাদের পাটের টাকায় চলছে, তাই উষ্মার সঙ্গে আমি বললাম, 'What stops you to get rid us?' আমানুল্লা খান তখন বললেন, 'East Pakistan is serving as a bondage between different states. If East Pakistan is allowed to get separated, then all the other states will clamour for seperation and Pakistan will vanish. So to keep Pakistan united you will be kept together if necessary by force.'

এ অলোচনার সময় অন্য কারা তখন উপস্থিত ছিল এতদিন পরে মনে নেই তবে সংবাদের ম্যানেজার নাসির ভাই উপস্থিত ছিলেন এটা স্পষ্ট মনে আছে। বছর দুই আগে নাসির ভাই মারা গেছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে এই আলোচনার কথা তাকে আমি স্মরণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি স্বীকার করেছিলেন তার মনে আছে।

আমানুল্লা খানের কথা যে কতটুকু সত্য সেটা টের পেয়েছিলাম স্বাধীনতার পরে যখন দেখলাম ছ'মাসের মধ্যে আমাদের দুবার ডিভ্যালুয়েশন করতে হলো এবং পাকিস্তান মাত্র একবার ডিভ্যালুয়েশন করলো। এখন আমাদের টাকায় ডলারের দাম পঁয়ত্রিশ টাকা আর তাদের হলো ষোল-সতর টাকা। তাদের বাৎসরিক বিদেশী মুদ্রার আয় আমাদের দ্বিগুণেরও বেশী। আমানুল্লা সাহেবের মন্তব্য - যে পশ্চিম পাকিস্তান আমাদেরকে বোঝা মনে করে আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল এ সম্পর্কে আর একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম কয়েক বছর আগে এককালের যুবলীগের সেক্রেটারী মরহুম মোহাম্মদ সুলতানের একটি স্মরণ সভা উপলক্ষে। কথায় কথায় আমানুল্লা খানের এই মন্তব্যের কথা উঠলে অ্যাডভোকেট গাজিউল হক ষাট দশকের প্রথম দিকে তার এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, বাষট্টি সনের দিকে আইয়ুব খান মওলানা ভাসানীকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, 'মওলানা সাব, হিঁয়া দো চার জেনারেল ইস্ট পাকিস্তান কো কাশ্মির কা সাথ ইকুয়েশন করনে মাংতা। আপ আঁকে ইনলোগ কো সমজাইয়ে।'

অ্যাডভোকেট গাজিউল হক তখন মওলানা ভাসানীর সেক্রেটারী ছিলেন। তাই তার হাতের ভিতর দিয়ে এই পত্র যাওয়ার সময় চিঠির বিষয়বস্তু তিনি জানতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে মওলানা ভাসানী এই পত্রের জওয়াব দিয়েছিলেন যেটা গাজিউল হকের হাতের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল বলে উত্তরটা দেখারও সুযোগ তার হয়েছিল। মওলানা ভাসানী তাতে লিখেছিলেন, 'খান ছাব, ইয়ে আপ কা মামলা হ্যায়, আপ ইছকো সামালিয়ে। মায় ইছমে দাখেল হোনে নেহি চাঁতে হয়'। অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে ষাট দশকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে কাশ্মির-এর বিনিময় করে পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে বলে বাজারে একটা গুজব রটে গিয়েছিল। এ গুজবের পেছনে সত্যতা কতটুকু ছিল সেটা সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এ গুজব থেকে ষাট দশকের প্রথম থেকে অখন্ড পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক কমে গিয়ে রাজনৈতিক গুরুত্বই যে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানীর কাছে আমরা সম্পদের চাইতে লায়াবিলিটি বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এ ধারণাটার আঁচ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আমাদের অনেকেরই ধারণা ছিল বাংলাদেশের পাট ও অন্যান্য সম্পদ হারাবার ফলে এবার পাকিস্তানের অর্থনীতি হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু পরবর্তীতে ফলাফল দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের মুদ্রামান আমাদের মুদ্রার দ্বিগুণ হয়ে গেল। সত্তরের নির্বাচনের সময় 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' এ মর্মে যে পোস্টার ছাপিয়ে দেশব্যাপী হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিয়ে নির্বাচনী রায় আমাদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হয়েছিলাম সেটা যে কতটা বাস্তবতাবর্জিত ছিল এটা সে সময় বুঝতে পারিনি।"[২৫৪]

---

[২৫৪] এম. এ. মোহাইমেন (এমএলএ - লক্ষীপুর)/ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর (প্রথম খন্ড) ॥ [পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স - ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯। পৃ. ১৪৪-১৪৮]

তিন

নির্বাচনী ফলাফল : বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা

০১.

"... ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠনের এবং "এক ব্যক্তি এক ভোট"-এর ভিত্তিতে নয়া জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য আগামী বৎসর (১৯৭০) ৫ই অক্টোবর দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে যাবতীয় বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি দেয়া হবে। উক্ত ঘোষণায় তিনি আরও বলেন যে, আগামী বৎসর অক্টোবর মাসে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে প্রথম অধিবেশন শুরুর দিন থেকে ১২০ দিনের ভেতরে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভের পরক্ষণেই উহা পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পরক্ষণেই প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই সমুদয় দায়িত্ব পালনকালে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামরিক আইনই দেশে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে বহাল থাকবে।

ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ

* ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
* ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে অন্তবর্তীকালীন আইনগত বুনিয়াদ প্রস্তুত হবে।
* একজন এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হবে।
* এক ইউনিট ভেঙ্গে দিতে হবে।
* প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, যে পর্যন্ত না তা' জাতীয় সংহতি ও অখন্ডতার পরিপন্থী হয়।

  প্রেসিডেন্ট বলেন, মতভেদ না থাকার দরুন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্থিরীকৃত ধরে নেওয়া যেতে পারেঃ

  (ক) পার্লামেন্টারী ফেডারেল সরকার।

  (খ) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোট।

  (গ) জনসাধারণের মৌলিক অধিকার এবং আদালতের মাধ্যমে তার প্রয়োগ।

  (ঘ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তার ভূমিকা।

  (ঙ) শাসনতন্ত্রের ইসলামী চরিত্র যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে সংরক্ষণ করবে।
* ১৯৭০ সালের ১লা জুনের মধ্যে ভোটার তালিকা তৈরী হতে হবে।
* জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ করতে হবে, অন্যথায় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
* শাসনতন্ত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নয়া সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।
* জনসাধারণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন বহাল থাকবে।
* ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হবে।
* গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় নির্দেশিকা অদূর ভবিষ্যতে জারি করা হবে।

এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলো তীব্র প্রতিবাদ জানায় এ ঘোষণার। এমনকি জামাতে ইসলামীও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সবগুলো রাজনৈতিক দলই এ ঘোষণাকে জনপ্রতিনিধিদের স্বার্বভৌম অধিকারের অমর্যাদাকর বলে বর্ণনা করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দুইদিনব্যাপী যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাংখা বানচালের দরুণ যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা এড়াবার জন্য এবং গণতন্ত্রের মূল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো আদেশের যথাযথ পরিবর্তন করতে হবে।'

সরকার তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। জনগণের দাবি হয় উপেক্ষিত। তবুও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বৈর শাসকের অধীনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে তখনকার প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে শেখ মুজিবের মতবিরোধ দেখা দেয়। শেখ মুজিব তাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সংসদে বসে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তিনি পূর্বাঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন আনবেন। আওয়ামী নেতাদের যুক্তি ছিলো : স্বায়ত্বশাসন শেখ মুজিব আনতে পারবেন না। কারণ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যারা সংসদে আসবেন তারা কখনো ইয়াহিয়ার পছন্দের বাইরে কিছু করতে যাওয়ার রিস্ক নেবেন না। ইয়াহিয়া যেমন শাসনতন্ত্র চাইবেন তেমন শাসনতন্ত্র সই করতেই তারা প্রস্তুত থাকবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক সরকারের এখতিয়ার ছিলো নির্বাচনের নীতিমালা প্রণয়ন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নীতিমালা বা অবকাঠামো নীতি তৈরী করে দেয়া ছিল এখতিয়ার বহির্ভুত। মজার ব্যাপার এই যে, ১৯৫৬ সালের প্রণীত শাসনতন্ত্র ছিলো জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত। এই শাসনতন্ত্র পুণর্জীবনের বিরোধিতা করেছিলেন শেখ সাহেব। অথচ ৬ দফার সাথে সংঘর্ষিক ছিলো ইয়াহিয়া খানের 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার।' অথচ আইয়ুব খানের আহুত গোলটেবিল বৈঠক যে কারণে ভন্ডুল হয়েছিল এবং সামরিক শাসন জারি হয়েছিল তা থেকে সরে এসে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে এই L.F.O-এর অধীনে নির্বাচনে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নির্বাচনের কিছুদিন আগে হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, কোন দল নির্বাচনের পর তার এলএফও'র উল্লেখিত নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও পরিষদ কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পাবে না। তাদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ, মুসলিম লীগের মোহন মিঞা, নান্না মিঞা, নেজামে ইসলামের দুদু মিয়া নির্বাচন হতে সরে দাঁড়ান। মওলানা ভাসানী তো 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগান দিয়ে আগেই নির্বাচন বয়কট করে। আওয়ামী লীগের জন্য মাঠ খালি হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, ওয়ালী ন্যাপ ও পিডিপি'র কয়েকজন ছাড়া নির্বাচনে আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি।

পি.ডি.পির জনসভা পন্ড

১৯৭০ সালের ২ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে পি.ডি.পি. জনসভা আহ্বান করে। প্রথিতযশা এডভোকেট আব্দুস সালাম ক্ষুরধার প্রতিভা শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে আনতে সাহায্য করে। পরবর্তীকালে নেহায়েত রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে এডভোকেট সালামের জনসভার উপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় হামলা চালিয়ে এ জনসভা পন্ড করে। এই হামলার কিছু বিবরণ তৎকালীন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জাতীয় আর্কাইভ থেকে সংগ্রহীত কিছু তথ্য এখানে উদ্ধৃত হলো :

পিডিপি'র জনসভায় গোলযোগ : কয়েকজন আহত শিরোনামে ২ ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) দৈনিক পাকিস্তান লিখেনঃ

'... রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হওয়ার ঠিক একমাস পর পিডিপি গতকাল পয়লা ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে তাদের দলীয় বক্তব্য পেশ করতে এসে একশ্রেণীর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর হট্টগোলে বারম্বার বাধাপ্রাপ্ত হন। সভার শুরুর মুহূর্ত থেকেই কোনরূপ প্ররোচণা ব্যতিরেকেই ডজন দেড়েক লোককে প্রথমে নানাধরনের শ্লোগান দিতে ও নৃত্য করতে দেখা যায়। ফলে, গোড়া থেকেই শ্রোতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাঠে ছোটাছুটি করতে থাকেন। একবার সভার উদ্যোক্তারা শান্ত হয়ে জমায়েত হওয়ার অনুরোধ জানালে তারা কিছুটা মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসেন, আবার শ্লোগানধারীদের হট্টগোলে পিছু হটে যান। এভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে হট্টগোলের মধ্য দিয়ে পিডিপির জনসভা চলতে থাকে এবং সমাপ্ত হয়। পিডিপির কর্মীরা এইদিন চরম সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রমাণ দেন। এদিনের জনসভায় জনাব নূরুল আমীন শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হননি। হট্টগোলে পিডিপি নেতা মওলবী ফরিদ আহমদ, জনাব ফজলুল হক, জনাব এ এস এম সোলায়মান সহ আরো অনেকে আহত হন।

বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে সভার কাজ শুরু হয়। সভার সভাপতি হিসেবে জনাব আবদুস সালাম খানের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করার পর সভার কাজ শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কোরান তেলওয়াত হয়। এ সময় বেশ কিছু লোককে মাঠ ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। খানিক পর স্টেডিয়ামের উপর লোকজনকে জড়ো হতে দেখা যায়। বোধ হয়, ময়দানের লোকজনই নিরাপদ দূরত্বের জন্যে স্টেডিয়ামের উপরে স্থান নেয়। জনাব আবদুস সালাম খান বক্তৃতার শুরুতে গণআন্দোলনের শহীদানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তার বক্তৃতা শুরু হতেই মাঠের এককোণ থেকে খানিকটা হল্লা ওঠে এবং দুয়ো ইত্যাদি ধ্বনি ওঠে। জনাব সালাম খান এসব কর্ণপাত না করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, দেখা গেছে গত গণআন্দোলনের স্বর্ণফসল গণতন্ত্র আমাদের ভুলেই আমাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে গেছে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জাগ্রত জনতা কখনো ভুল করে না এ বিশ্বাস তার আছে। ১৯৪৬ সালে, ১৯৬৫ সালে, ১৯৬৮-৬৯ সালে তারা ভুল করেনি। আমার ধারণা পূর্ববাংলার মুসলমান এবারো ভুল করবে না। দীর্ঘ ১০-১২ বছর অন্ধকার যুগের পর আবার আমরা গণতন্ত্র ফিরে পেতে যাচ্ছি; ৫ই অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আমার প্রার্থনা - শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমার অনুরোধ - ভেবে দেখুন, সত্যি কি আমরা গণতন্ত্র চাই? যদি চাই তবে যদি আমাদের পরমত সহিষ্ণুতা না থাকে তবে আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে কি করে যাবো?

এ পর্যায়ের বেলা প্রায় ৩-৪০ মিনিটের সময় মঞ্চ থেকে প্রায় ৩০ গজ দূরে লাউড স্পীকারের খুঁটির সাথে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ক্যালেন্ডারে মরহুম মানিক মিয়ার পাশে উপবিষ্ট শেখ মুজিবের একটি বৃহৎ ছবি এবং মরহুম সোহরাওয়ার্দীর ছবিও ছিল। শ্রোতাদের একটি অংশকে সেখানে নৃত্য করতে ও ৬ দফা জিন্দাবাদ শ্লোগান দিতে দেখা যায়। জনাব সালাম খান এসব উপেক্ষা করে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, সভায় যদি মুষ্টিমেয় কেউ ইচ্ছে করেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান তা সভার উদ্যোক্তাদের কলংক হবে না। তার বক্তৃতা চলাকালে সেই লোকজনকে শ্লোগান দিয়ে মঞ্চের আরো খানিকটা কাছে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এসময় জনাব সালাম খান বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখে বসে পড়েন।

তখন জোর শ্লোগান চলছে। পিডিপি'র জনাব নুরউল্লাহ এসময় মাইক নিয়ে বক্তৃতা করতে চেষ্টা করেন। শ্লোগানকারীরা এসময় মঞ্চের আরো কাছে এগিয়ে আসে। এবার সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া মাইক হাতে নেন। শ্লোগানকারীরা তখন মঞ্চের মাত্র হাত দুয়েক দূরে। নান্না মিয়া তখন বলছিলেন, ভাইসব আমরা হিংসায় বিশ্বাস করি না। যদি মনে করবেন সভা পন্ড করবেন তবে ভুল করবেন। দয়া করে আমাদের কথাও বলতে দিন ...। এসময় কোন কোন নেতার কল্লা চাই বলে শ্লোগান উঠছিল।

জনাব নান্না মিয়া বলেন, কল্লা নিতে চান নেবেন, কিন্তু কথা শুনুন। গণতন্ত্রের এটা নীতি নয়। মঞ্চের পাশে সাংবাদিকদের দিকে ফিরে বলেন, চেয়ে দেখুন। উদ্যোক্তাদের কেউ বাধা দিচ্ছে না। তিনি বলেন, যাদের ছবি হাতে নিয়ে আপনারা শ্লোগান দিচ্ছেন তাদের ছবি অবমাননা করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। মরহুম মানিক মিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয়, শেখ মুজিব আমার বন্ধু। জনাব নান্না মিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী আবার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে শ্লোগানদানকারীরা মঞ্চে একটি ক্যালেন্ডার ছুঁড়ে মারেন। জনাব নান্না মিয়া বলেন, এই ছবি আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কথা শুনুন। যতই শ্লোগান দিন যতই কিছু ছুঁড়ুন আমি বক্তৃতা দেবোই। এ আমার অধিকার। প্রত্যেকের বক্তব্য শুনতে হবে। আমাকে বলতে দিন। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের জন্যে লিয়াকত থেকে পরবর্তীকালে গণতন্ত্র হত্যা হয়েছে।

এ পর্যায়ে ৩.৫০ মিনিটে বিক্ষোভ ও শ্লোগান দানকারীরা মঞ্চের পাদদেশ ধরে মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। মঞ্চে ঢিল পড়ে। জনাব নান্না মিয়া তখনো বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলছিলেন, ভাইসব! দেশে বিশৃঙ্খলাকারী থাকলে গণতন্ত্র আসবে না। আমরা তো কারো বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। বিনীত নিবেদন আমাদের বক্তব্যও শুনুন। এ পর্যায়ে ৩.৫৫ মিনিট শ্লোগানধারীরা মঞ্চ দখল করে নেয়। কেউ মাইক্রোফোন ছিঁড়তে থাকে। সারা মাঠে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় পিডিপি'র কিছু নেতাকে পুলিশ পুলিশ বলে ষ্টেডিয়ামের গেটের দিকে ছুটতে দেখা যায়। ৩.৫৭ মিনিটে ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মাঠে ছুটে আসেন এবং মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন। এ সময় বহুলোককে ছুটে দূরে সরে যেতে দেখা যায়। কিন্তু মাঠ ছেড়ে তারা যাননি। উদ্যোক্তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই হোক কিম্বা তামাশা দেখা কিম্বা বক্তাদের বক্তব্য শ্রবণের উদ্দেশ্যেই হোক তারা ময়দানেই থেকে যান। ইতিমধ্যে পুস্তক বাধাই সমিতির এক নেতার নেতৃত্বে ক্ষুব্ধ শোভাযাত্রাকারীর একটি দল সভাস্থলে আসে। একজন মাইক্রোফোনও উদ্যোক্তাদের ফিরিয়ে দেয়। মিনিট চারেক পর ৪টা ২ মিনিটে ভাংগা সভা পুনরায় শুরু হয়। বক্তৃতা শোনার জন্যে উদ্যোক্তা লোকজনকে স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করতে থাকেন। পিডিপি'র জনাব নুরউল্লাহ ও জনাব মুনসুর আলী এসময় প্রায় ৮ মিনিট বক্তৃতা দেন। কিন্তু গোলমাল থামেনি। বক্তৃতা শুরু হতেই আবার শ্লোগান, হল্লা শোনা যায়, ঢিল ও জুতা প্যান্ডেলের দিকে শূন্যে ধাবিত হয়ে আসতে দেখা যায়। এ সময় শ্রোতাদের একাংশের মধ্যে শ্লোগানধারীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে।

বেলা ৪টা ১০ মিনিটে মওলবী ফরিদ আহমদ মাইকে আসেন। তিনি দাঁড়াতেই সভার পরিবেশ সম্পূর্ণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়ে। দাঁড়িয়েই মওলবী ফরিদ আহমদ শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি আমার বক্তৃতা শুনতে চান? যারা চান হাত তুলুন। অমনি গোটা শ্রোতামন্ডলী হাত তুলে বিরূপ ধ্বনি ও বক্তৃতা শুনবে না বলে হাত নাড়তে থাকে। মওলবী ফরিদ বক্তৃতা করতে বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এদিকে সমানে শ্লোগান চলছে। পুলিশ বিক্ষোভকারী ও সভামঞ্চের সম্মুখের লোকদের মধ্যে একপাশে বেষ্টনী দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে! মাঠের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বহুলোক স্টেডিয়ামের উপরে। মাঠের মধ্য থেকে মঞ্চের দিকে ঢিল ও জুতা ছোঁড়া হচ্ছে। মওলবী ফরিদ আহমদ বলেন, আপনারা এদেশে আরেকটি মার্শাল ল চান? আজ যদি পল্টনে জনসভা না হয় তবে গণতন্ত্রের আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করা হবে। ঢিল মেরে আমাদের ঠেকানো যাবে না। পুলিশ বাহিনীকে জিজ্ঞেস করছি - মার্শাল ল'এর ৬০ নম্বর রেগুলেশন কি মান্য করা হচ্ছে? এ সময় একের পর এক ঢিল আসছিল। মওলবী ফরিদ আহমদ বলছিলেন - মারো আরো মারো! আসো আগাইয়া আসো! সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, দেখুন! কে ঢিল মারে। এ সময় পুলিশ দু'তিনজন লোককে ধরে ফেলে।

ফরিদ আহমদ সাহেবের কাছ থেকে মাইক নিয়ে এ সময় মওলানা আবদুল মতিন বক্তৃতা শুরু করেন। তাকে বলতে শোনা যায়, ন্যাশনাল প্রিন্টিং কর্পোরেশন চাই না। পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক সমিতি জিন্দাবাদ। ফরিদ আহমদ আবার মাইক নেন। তখনো শ্লোগান চলছে - জাগো বাংগালী, তোমার দেশ আমার দেশ

বাংলা দেশ বাংলা দেশ, ছয়-দফা এগার দফা মানতে হবে মানতে হবে, তোমরা নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব, পিন্ডি না বাংলা বাংলা বাংলা, দালালী চলবে না ইত্যাদি। এ পর্যায়ে নান্না মিয়া বক্তৃতা দিতে ওঠেন। তিনি বক্তৃতা দিতে পারলেন না। আবার মওলবী ফরিদ আহমদ উঠলেন। তাকেও সাথে সাথে বসে পড়তে হলো। জনাব মাহমুদ আলী বলেন, দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একাত্মবোধ চাই, বিরাট বিভেদের মধ্যে চাই মহামিলন। ন্যায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করেই আমরা একত্রিত হতে চাই। বাংলা, পাঞ্জাব, সরহদ ইত্যাদি অঞ্চলের লোককে রাজনৈতিক দলভুক্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তিনি আহবান জানান। জনাব মাহমুদ আলীর বক্তৃতা চলাকালেও সেই আগের শ্লোগান চলতে থাকে, টিল পড়তে থাকে। দূরে সরে যাওয়া লোকজন আবার মঞ্চের নিকটতর হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। তবে মাহমুদ আলী একনাগাড়েই বক্তৃতা শেষ করতে পারেন।

জনাব আবদুস সালাম খান ৪-৫৫ মিনিটে আবার বক্তৃতা দিতে উঠেন। তিনি দাড়াতেই হৈ হৈ শুরু হয়। তিনি বলেন, ৬ দফা পছন্দ করি কি না, কেন ত্যাগ করলাম শুনবেন তো, আমার কথা না শুনলে জওয়াব দেবেন কি করে? আবার হট্টগোল তীব্র হয়। কিছু লোকজন বলতে থাকেন 'চাই না, চাই না'। এদিকে জনাব মোহন মিয়া বক্তাকে পয়েন্ট জুগিয়ে দিচ্ছেন। জনাব আবদুস সালাম খান বলেন, সাধারণ নির্বাচনের সাথে জড়িত রয়েছে জনগণের সার্বভৌমত্ব। এর বিপক্ষে একদল প্রকাশ্যে বলছে - নির্বাচন চাই না বিপ্লব বিপ্লব, আরেক দল নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অথবা অন্য কারণে পরোক্ষভাবে নির্বাচন বানচাল করতে চান। মওলানা ভাসানী সাহেবের দল এসে যদি এই সভা পন্ড করে দেয়, মঞ্চ পুড়িয়ে দেয়, তবে না হয় বোঝা যেত কথায় কাজে এক। কিন্তু মুখে এক কথা বলে পরোক্ষে নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাদের কথা ভেবে বিস্ময় হয়, লজ্জা হয়। এ সময় শ্লোগান তীব্রতর হয়ে ওঠে। একটি শ্লোগানের জবাবে জনাব আবদুস সালাম বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের নেপথ্য কাহিনী বলতে হবে ভাবিনি, বলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আজ বলবো। আমরা সব কিছু এমন কি স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত পেতে যাচ্ছিলাম তখন আমার বন্ধু, ইউসুফ হারুন প্রমুখ আইয়ুবের সাথে গোপন বৈঠক করলেন। কেউ আবার ওয়াক আউট করলেন। গোলটেবিল বৈঠক ভেঙ্গে দেয়া হল। একটি শ্লোগানের জবাবে জনাব আবদুস সালাম খান বলেন, মীরজাফর কারা তা জনগণ জানে। যারা আমেরিকা ও ভারতের দালালী করে তারা মীরজাফর নয়, তবে কারা জনগণের বিশ্বাসঘাতক? ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে। জনাব আবদুস সালাম খান বলেন, শিল্পপতিদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খেয়ে কারা সভা করে, অন্যের সভায় গোলযোগ করে তা আমরা জানি, জনগণও জানতে পারবে।

এ পর্যায়ে ৫টা ৫ মিনিটে হট্টগোল আবার তীব্র হয়। শ্লোগান উঠতে থাকে। পুলিশ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এ সময় পর পর জনাব শামসুর রহমান, জনাব দলিলুর রহমান, জনাব শফিকুর রহমান আর নূরউল্লাহ বক্তৃতা দেন। ঘোষণা করেন, গণতন্ত্রের সংগাম চলবেই। এদেশে আর কোথাও এ ধরনের ফ্যাসীবাদী কার্যক্রম হলে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুশিয়ারী জানান। জনাব মোহন মিয়া বক্তাদের বক্তৃতার পয়েন্ট জুগিয়ে দিতে দেখা যায়। সভায় গোলযোগের জন্য জনাব নান্না মিয়া ও মওলবী ফরিদ আহমদ বসে পড়লে এবার মাইক হাতে নেন জনাব রফিকুল হোসেন। তিনি বলেন, সন্তানদের আমার কথা শুনতে হবে। চিৎকার ওঠে - বইয়া পড়েন। টিল আসছে। জনাব রফিকুল হোসেন বলে চলছেন, সন্তানদের কাছে কি গুরুজনের বক্তব্য পেশ করা যাবে না? আপনাদের কথা শুনলাম। এখন আমাদের কথা শোনেন। বলতে দেবেন না এটা কেমন কথা। তিনি বলেন, পল্টনের অমর্যাদার ফলে গত ১২ বছর পল্টনের লাঠি আমাদের পিঠে পড়েছে। ফ্যাসিজম বাদ দিন। হিটলারের দুষ্টবুদ্ধি ও পাগলামীর কাছে জার্মানী হেয় হয়েছে। এ সময় বিদ্যমান হল্লা আরো তীব্ররূপ ধারণ করে। শ্রোতাদের কেউ কেউ দড়ি তুলে বলে অমুকের ফাঁসী চাই। জনাব রফিকুল হোসেন বলতে থাকেন, গেষ্টাপো পার্টি যতই বিশৃঙ্খলা করুক না কেন আমরা ধৈর্য ধরবো। আপনারা বাংগালী জাগো বাংগালী জাগো বলছেন কিন্তু বাংগালীর

চরিত্র কোথায় দেখাচ্ছেন? বাংগালীর চরিত্রের সেই শ্রদ্ধাবোধ কোথায়? আমরা মুসলিম আমরা বাংগালী। কোথায় সেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ? বাংগালী হতে রাজী আছি পাশবিক হতে রাজী নই।

এসময় বেলা চারটা আটাশ মিনিটে নিক্ষিপ্ত ঢিলে মঞ্চের সামনে ও পাশে পরপর দুজন লোক আহত হয়। মওলবী ফরিদ আহমদ মাইক নিয়ে বলতে থাকেন, পুলিশ দাঁড়িয়ে কি করছে? এসময় একটি ঢিল তার গায়ে পড়ে। মঞ্চেও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। চারটা তিরিশ মিনিটে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হতে লোকজন মাঠ ছেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে ছুটে যায়। মঞ্চ থেকে শ্লোগান ওঠে, ফরিদ আহমদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই বৃষ্টি থেমে যায়। চারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে জনাব নূরউল্লাহ ও চারটা চল্লিশ মিনিটে জনাব রফিকুল হোসেন বক্তৃতা শুরু করেন। এসময় খানিকক্ষণ মাইক বিকল থাকে। জনাব রফিকুল হোসেন তখন বলছিলেন, ছয় দফা মানি কিনা জিজ্ঞেস করছেন? কার ব্যাখ্যা মানবো? মরহুম মানিক মিয়ার ব্যাখ্যা অথবা যে ব্যাখ্যা মোজাফফর আহমদ দিচ্ছেন তা? আমার কথা হলো - যে ব্যাখ্যায় কলকাতা ও ওয়াশিংটন খুশী হবে তা গ্রহণ করতে পারি না। মাঠে হল্লা চলছে। বেলা চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে জনাব মাহমুদ আলী বক্তৃতা দিতে ওঠেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র আদায়ের জন্য আমরা নতুন পরিবেশে সংগ্রাম শুরু করেছি। নির্বাচনকে যারা বানচাল করতে চায়, যারা ফ্যাসিজম প্রয়োগ করছে তাদেরকে রুখে দাঁড়ান। জনাব মাহমুদ আলী বলেন যে, আইয়ুব খান বেয়নেট দিয়ে কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছেন, আরেক দল ফ্যাসিবাদের নগ্ন আশ্রয় নিচ্ছে স্তব্ধ করার। এই দুই ধরনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবেই। তিনি বলেন, আমাদের অপকর্মের জন্য যদি নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়, সামরিক শাসন আরো দশ-বারো বছরের জন্যে চেপে বসে তার জবাব কে দেবে? একথা স্মরণ রাখা দরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বেচে থাকতে পারে।'

জামায়াতের জনসভায় হামলা

১১ জানুয়ারী (১৯৭০) পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী জনসভা আহ্বান করে। ১৮ তারিখ জনসভা আহ্বান করে জামায়াতে ইসলামী। এই জনসভা আহ্বানকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে। জনসভার আগে জামায়াতের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়। জনসভার আগে থেকেই শহরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে, জামায়াতের জনসভায় হামলা হবে। তাই আত্মরক্ষার্থে তারাও গজারী লাঠিসহ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ১৮ তারিখে জনসভার আয়োজন করে।

নির্ধারিত দিনে জনসভা শুরু হতেই স্টেডিয়াম ও অন্যান্য দিক হতে ইস্টক বর্ষন শুরু হয়। লোকজন ছুটাছুটি শুরু করে। এক পর্যায়ে স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে লাঠিয়াল বাহিনী মাঠে প্রবেশ করে বেধড়ক জামায়াত কর্মীদের প্রহার করতে থাকে। আত্মরক্ষার্থে জামায়াত কর্মীরাও পাল্টা আঘাত হানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুরো মাঠ একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। এই হামলায় পাঁচশত লোক আহত এবং পরের দিন আহতদের মধ্যে থেকে দু'জনের মৃত্যু হয়। পরদিন বিভিন্ন আওয়ামীপন্থী দৈনিকে জামায়াতের উপর দোষ চাপিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করা হয়। আক্রমণকারীদের ছবি না ছেপে আত্মরক্ষায় নিয়োজিত জামায়াত কর্মীদের ছবি ছাপিয়ে গণতন্ত্রের মুখোশধারী তাত্ত্বিকেরা তাদের নগ্ন স্বরূপ উন্মোচিত করেছিল। তবে দু'একটি পত্রিকা ছিলো এর ব্যতিক্রম। এই জনসভা ভন্ডুল করার জন্য পুর্বাহ্নেই যে একটি বিশেষ গোষ্ঠি সক্রিয় ছিলো এর প্রমাণ মিলে রাও ফরমান আলীর বক্তব্যে। তিনি লিখেছেন :

"সম্ভবতঃ '৭০ সালের ১৮'ই জানুয়ারীতে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার সূত্রপাত হলো। জামাতে ইসলামীর প্রথম নির্বাচনী জনসভা সন্ধ্যার দিকে পল্টন ময়দানে হবার কথা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এই সভায় ভাষণ দেয়ার জন্য মওলানা মওদুদী এসেছেন। চারদিকের হাবভাব দেখে আমার মনে হচ্ছিল, আওয়ামী লীগ এই সভা লন্ডভন্ড করে দেবে। কিন্তু আমাকে ধারণা দেয়া হলো, এমনটি হবে না। এ সময় ঢাকাতে মার্শাল ল'র দুটো উইং ছিল - প্রথমটি সম্পূর্ণ সামরিকপর্যায়ের, দ্বিতীয়টি ছিল 'সিভিল এফেয়ার্স'।

সিভিল এফেয়ার্সের দায়িত্ব ছিল আমার উপর এবং অপরটির দায়িত্ব ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাজেদুল হক। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী (প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে উপদেষ্টা ও মেজর জেনারেল, বর্তমানে মরহুম)। সম্ভবতঃ ১৪ বা ১৫ই জানুয়ারী তিনি আমাকে বললেন, পররাষ্ট্র দফতরে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে, আমাকে যেতে হবে। কিন্তু আমার এক নিকটাত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে আমাকে ওখানে থাকতে হচ্ছে; আপনি বরং এই বৈঠকে যোগ দিন। আমি তা মেনে নিলাম এবং পরদিন ইসলামাবাদ পৌঁছেই খবর পেলাম, আওয়ামী গুন্ডারা জামাতে ইসলামীর সভা লন্ডভন্ড করে দিয়েছে এবং বহু লোক হতাহত হয়েছে। ঢাকা ফিরে এসে জানলাম, পুলিশের লোকেরাও আওয়ামী লীগের সাথে সহায়তা করেছে। ব্রিগেডিয়ার মাজেদুল হকের কাছে রিপোর্ট পৌঁছার পর তিনিও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি; বরং এটাকে মামুলী ঘটনা বলে আখ্যা দেন। এখন মনে হচ্ছে, সভা পন্ড করার জন্য আগাগোড়া সুপরিকল্পিত ভাবে মাজেদুল হকই আমাকে ইসলামাবাদ পাঠিয়েছেন। কারণ, আমি থাকলে এমনটি হতে পারতো না।" (ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ, রাও ফরমান আলী, পৃ. ৫৮-৫৯)।

সুতরাং জামায়াতের সভা পন্ড করা হবে তা আগেই ছক অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এছাড়া জনসভার আগের দিন জনমনে বিদ্বেষ ছড়ানোর অসৎ উদ্দেশ্যে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদুদীর ঢাকা আগমনের খবরের উপর একটা কার্টুন ছাপা হয়। একটা বিরাট শকুন পাখা মেলে উড়ে আসছে। শকুনের চেহারাটা মাওলানা মওদুদীর। এই ভাবে জামায়াতে ইসলামী দলটির প্রতি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে জনসভা পন্ড করার যৌক্তিকতা দাঁড় করিয়েছিল।

ভোটের আগে ভাত চাই

নির্বাচনী জনসভায় প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনায় জনমনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা। অন্যদিকে ১৯ জানুয়ারী ('৭০) সন্তোষে (টাঙ্গাইল) মাওলানা ভাসানী আহুত কৃষক সম্মেলনে যোগদানকারী ভলান্টিয়াররা ছিলো রাম দা, লাঠি ও সড়কিতে সজ্জিত। যা ২০/১/৭০ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক রিপোর্ট মতে (১) ভোটের আগে ভাত চাচ্ছেন মাওলানা ভাসানী। ভোট বর্জন করতেও চাচ্ছেন তিনি। মওলানা ভাসানী দেশে দশ লাখ লোকের একটি লাঠি ও লাল টুপিধারী কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করতে বলেছেন! বাকী খাজনা ও খাজনার সুদ চাইতে আসলে ওরা সরকারি কর্মচারীদের মাথায় লাঠি মারবে। (২) সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে না, এরাই দেশ রক্ষা করবে। (৩) সমাজতন্ত্র ছাড়া দেশের মুক্তি আসবেনা। (৪) কৃষক ও শ্রমিকদের জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। আর দৈনিক পাকিস্তান লিখেঃ 'ভোটের এখনও দশ মাস বাকী, ভোটের আগেও ভাতের প্রয়োজন এবং পরেও ভাতের প্রয়োজন।'

নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ

১৯৭০ সালের জুলাই-আগস্টে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যার কারণে ১৫ আগস্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় নির্বাচন পিছিয়ে দেন। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৯ ডিসেম্বর অথবা এর আগে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করেন। প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তে জনাব নুরুল আমিন, মাহমুদ আলী, কাউন্সিল লীগ নেতা খাজা খয়েরুদ্দিন, জামাত নেতা মওদুদী, অধ্যাপক কোরেশী, জামাতে ওলামায়ে নেতা পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদুমিয়া), জনাব কাইয়ুম খান সেদিনই প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানান। রাজনৈতিক দলগুলো সারা দেশে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করে। রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা বেতার ও টিভিতে দলীয় কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে।

প্রলংঙ্কারী ঘুর্ণিঝড় ও নির্বাচনী প্রচার

নির্বাচনের এই ডামাডোলের মধ্যে এবং বন্যার ধকল সামলাতে না সামলাতেই ১২ নভেম্বর এক প্রলংঙ্করী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস উপকূলবর্তী জেলা সমূহে আঘাত হানে। নিহত হয় অন্ততঃ বারো লক্ষ বনি আদম। আহত এবং ঘর ছাড়া হয় আরো লক্ষ লক্ষ বনি আদম। পশু আর মানুষের লাশ পাশাপাশি ভেসেছিল বা গাদাগাদিভাবে পড়েছিল। যারা সৌভাগ্যক্রমে কোনো মতে বেঁচে ছিল তারা খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে তীব্র শীতের মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছিল। সারি সারি লাশ এবং বেঁচে যাওয়া নগ্ন, ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি দেখে বিশ্ব বিবেক সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো, বিশ্ব বিবেক তখন কেঁদেছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খান তখন এদিকে দৃষ্টি ফেরাবার সময় পাননি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চীন থেকে ফেরার পথে ঢাকায় অবতরণ করেন এবং ঘুর্ণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এ নিয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ ক্ষুব্ধ হন পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকদের প্রতি। পরবর্তীতে এই ক্ষোভ প্রশমনে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে হেলিকপ্টারে চক্কর দিয়ে দুর্গত এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। অন্যদিকে শেখ মুজিব দুর্গত এলাকা সফর করে তৎকালীন সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের দুর্গত মানুষকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে রাজনীতি করার হীন মানসিকতা দেখে সচেতন জনগণ তখন বিস্মিত হয়েছেন। একদিকে যখন লক্ষ লক্ষ বনি আদম খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করেছিল, লাশের গন্ধে উপকূলীয় অঞ্চলের বাতাস দুর্গন্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, শোকার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষগুলো যখন খাদ্য ও কাপড়ের অভাবে আহাজারি করছিল, ঠিক তখন আমাদের দেশের চাপাবাজ, শঠতায় চ্যাম্পিয়ন ও ধাপ্পাবাজ নেতারা এটাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। তখন বর্ণাঢ্য রঙের কাপড়ে নির্মিত শত শত প্যান্ডেল অতিক্রম করে সুদৃশ্য বাহারী রঙের মঞ্চে দাড়িয়ে দুর্গত মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু করেছে। পরস্পরকে দোষারোপ করা হয়েছে - দুর্গত মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করাই তাদের কর্ম; আর দুর্গত মানুষের ত্রাণবিতরণ শুধু মাত্র পাকিস্তানী শাসকদের দায়িত্ব। সে সময় দুর্গতের ত্রান বিতরণে দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে যেভাবে প্রশংসনীয় তৎপরতা দেখা গেছে রাজনৈতিক নেতাদের সেভাবে দেখা যায়নি।

১২ নভেম্বর জলোচ্ছাসে পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটলে রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানায়। মওলানা ভাসানী দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করে দুর্গত এলাকাবাসীর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান সবাইকে। তিনি ঘোষণা করেন 'ভোটের আগে ভাত চাই'। জলোচ্ছাস প্লাবিত এলাকার দুর্গত মানুষের প্রতি পাকিস্তান সরকারের দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদে নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়া হয়। অন্যদিকে শেখ মুজিব নির্বাচন বর্জন ও পিছানোর যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেন।

ক্ষমতায় যাবার উদগ্র বাসনায় শেখ মুজিবের কাছে সেদিন লক্ষ লক্ষ শোকার্ত মানুষের আহাজারি ক্রন্দন তার মনে মোটেও রেখাপাত করতে পারেনি। নির্বাচন পিছালে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবারও হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। সেদিন ক্ষমতায় যাবার লোলুপ দৃষ্টি তাকে অমানবিক নির্মম করে তুলেছিলো। এ সময়ে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগে। ইংল্যান্ডে বসে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠকে তার কি এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল যে, দেশের ১২ লক্ষ লোক জলোচ্ছাসে প্রাণ দেয়ার পরও নির্বাচন না পেছানোর জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর রইলেন? জনগণের মধ্যে প্রচার হয় যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলেই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন বলেই দলীয় বাধা উপেক্ষা করে, ১২ লক্ষ লোকের লাশের ওপর দিয়ে তিনি নির্বাচনে যেতেও কুণ্ঠিত হননি।

অন্যদিকে মওলানা ভাসানী দুর্গত এলাকায় ত্রানকার্য পর্যবেক্ষণ করে ঢাকায় এসে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তা শুনে কবি শামসুর রহমান উপহাস করে বলেন - 'হায়, আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।' ২৩ নভেম্বর আকাশবাণী দিল্লী থেকে প্রচারিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তানে বর্ষিয়ান মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' ২৪ নভেম্বর দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় ফলাও করে চার কলাম জুড়ে ছবি সহ একটি রিপোর্ট ছাপে। রিপোর্টের শিরোনাম ছিলো 'সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসুন, বাঙালির জীবন আজ মহা দুর্যোগ নেমে এসেছে।' মওলানা ভাসানী এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ নভেম্বর সাংবাদিকেরা শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন 'আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানিয়েছি, স্বাধীনতা নয়।'

অপপ্রচার

নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিলো ১০ টাকা মণ দরে গম ও ২০ টাকা মণ দরে চাল খাওয়াবে। এক বছরের পাট বিক্রি করে দশ বছরের চাল ক্রয় করবে। এরা আরো প্রচার করে যে, কর্ণফুলী পেপার মিলের কাগজ জাহাজ বোঝাই করে করাচী নিয়ে যাওয়া হয় সিল মারার জন্য। এর ফলে কাগজের দাম করাচী থেকে ঢাকায় বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি। নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' শিরোনামে একটি পোষ্টার ছেপে সারা দেশে লাগিয়ে দিয়েছিলো। এই পোষ্টারটি পূর্ব বাংলার জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ সম্পর্কে রাও ফরমান আলীর মন্তব্য হলো :

'শেখ মুজিবের রাজনৈতিক শক্তি কানায় কানায় বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র কারণ, আর তা হলো তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার কাহিনী বড় দরদ দিয়ে লোকদের শুনাতেন। পত্র-পত্রিকায় তা আবার ফলাও করে ছাপা হতো। শেষে কথা দাড়াল, পূর্ব পাকিস্তানের সহায়-সম্পদ পুঁজি বিনিয়োগ-এর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হজম করে ফেলছে। ফলে, এখানকার লোক দিন দিন গরীব হয়ে যাচ্ছে। এই প্রপাগান্ডাকে মিথ্যে প্রমাণিত করার জন্য আমরা ইসলামাবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিশনের কাছে সঠিক ডাটা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কোনমতে তাদের টনক নড়েনি। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা মনে করতো, এতে কোন কাজ হবেনা। রাজনীতিকেরা এটাকে আবার অন্য কালার দেবে। অবশ্য কথাটা এক অর্থে সত্য ছিল। তবু যদি সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যেতো, তাহলে বিদেশী সাংবাদিকেরা বিভ্রান্ত হতো না এবং দেশের আবেগবিবর্জিত জ্ঞানী লোকেরাও সঠিক তথ্য পেতেন।

সেকালে জনসংযোগের মাধ্যমেও নানা আজগুবি খবর ছাপানো হতো। একবার খবরের কাগজে ছাপানো হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকার মতো খরচ হচ্ছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটি মৎস হিমাগার তৈরী হচ্ছে মাত্র ৫ লাখ টাকা খরচে। এ-ধরনের মুখরোচক খবর শেখ মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করতো সন্দেহ নেই। বারংবার উচ্চারিত এসব কথা মুর্খ লোকদের সাথে সাথে শিক্ষিত লোকেরাও বিশ্বাস করে। তারপর এ-ধরনের খবরও শোনা গেছে, ওখানকার মেয়েরা তিনটে কাপড় (শেলোয়ার, কামিজ, ওড়না) এবং এখানকার মেয়েরা মাত্র একটা (শাড়ী) কাপড় পরিধান করে। পোস্টার লাগানো হলো - ওখানে চাউল আট আনা, আর এখানে ২টাকা। এসব অতিরঞ্জিত কথার ওপর ভিত্তি করে দিন দিন পারস্পরিক ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শিথিল হতে থাকে।" (ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ, রাও ফরমান আলী পৃ. ৫৬)

মানুষের লাশের গন্ধে যখন বাংলার বাতাস ভারী হয়েছিলো তখন ৭ ডিসেম্বর '৭০ নির্ধারিত তারিখে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে স্মরণ কালের ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে এবং ব্যাপকভাবে অন্যান্য বিরোধী দলের নির্বাচনী ঐক্য ও কর্মতৎপরতা না থাকার ফলে আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে

জয়লাভ করে। সেদিন আওয়ামী সমর্থকরা ভুয়া ভোট দেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কে কতটা ভোট দিয়েছে এ নিয়ে বড়াই করেছে। কেউ বলেছে আমি একাই ৫০টি, কেউ সেঞ্চুরী করেছি বলে এক জনের উপর আরেক জন হেসে গড়িয়ে পড়েছে। বিরোধী দলের কোন পোলিং এজেন্ট কোন বুথ কেন্দ্র দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগকে যারা অপছন্দ করেছে তারা ভোট প্রদানে বিরত ছিলেন। এছাড়া নির্বাচনের আগে বিরোধী দলকে নির্বাচনী প্রচারণা করতে দেয়া হয়নি। নির্বাচনের আগে অনেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী জনসভা গায়ের জোরে ভন্ডুল করে দেয়া হয়েছিলো। এসব কারণে নিরাপত্তার ভয়ে অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রচারনা থেকে বিরত ছিলো। এছাড়া আওয়ামী লীগের বিপুল ভাবে জয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের নানা রকম কাল্পনিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে প্রলুব্ধ করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়ে তিলকে তাল বানিয়ে জনগণের কাছে প্রচার এবং আগরতলা মামলার কারণে রাতারাতি আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠিয়ে দিয়েছিল। কারণ সেদিন জনগনকে লোভ দেখানো হয়েছিল তারা সত্যিকার সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন। সুখ এনে দিবেন। আরো সুখ। সব কিছু অর্ধেক দামে পাওয়া যাবে। দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখালেন আরও সমৃদ্ধি এনে দিবেন। শিল্পকারখানা বাড়বে, শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি হবে, দেশের মানুষ সুস্থ সংস্কৃতিবান স্বাধীন জাতির মর্যাদা নিয়ে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারবে।

মানুষ ভুলে গিয়ে কপট রাজনীতিবিদদের স্রোতবাক্যে. দু'চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে, বুক ভরা আশা নিয়ে সর্বস্ব উজাড় করা ত্যাগের অনুভূতি নিয়ে সাধারণ জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছেন। জনগণের একাংশের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট, ভুয়া ভোট, আওয়ামী বিরোধী জনগণের ভোট দান থেকে বিরত থাকা এবং পেশী শক্তির ভয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিষ্ক্রিয়তার ফলে আওয়ামী লীগকে বিপুল বিজয়ের মাল্য এনে দেয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট ১৬২ আসনের ১৬০টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট দু'টি আসনের জন্য নির্বাচিত হন যথাক্রমে পিডিপি'র জনাব নূরুল আমিন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন নির্দলীয় ব্যক্তি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের ৮৩টি আসন জুলফিকার আলীর ভুট্টোর পিপলস পার্টির অধীনে যায়।

বহুল আলোচিত পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর বিজয়ী দল শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অভিনন্দন বার্তা পাঠান। নিয়তি হয়তো তখন অলক্ষ্যে মুচকি হাসছিলো। নির্বাচনের অনাকাঙ্খিত ফলাফলে তৎকালীন শাসকেরা হয়েছিলো বিস্মিত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা হয়েছিলো উল্লসিত; আর সচেতন জনগণ এবং রাজনীতিবিদেরা হয়েছিলো শংকিত ও উদ্বিগ্ন। পূর্ব পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটি আসনও পায়নি, আর শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। নির্বাচনের ফলাফল দু'জনকে দু'মেরুতে ঠেলে দেয়॥"[২৫৫]

০২.

"... ইত্যবসরে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়া হয় - যা এতদিন ধরে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এক দীর্ঘ নির্বাচনী অভিযান শুরু করেন। সত্যি কথা বলতে কি এটা ছিল খুবই দীর্ঘ সময়ের জন্য যা - পুরো এক বছর স্থায়ী হয়। প্রথম দিকের এক জনসভা

২৫৫ সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ/আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল (২য় খন্ড) ॥ [বুকস ফেয়ার - মে, ২০০৪। পৃ. ৩৬৯-৩৯৩]

বক্তৃতায় মুজিব ঘোষণা করেন যে, 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই এসেছে এবং কোনশক্তিই একে ধ্বংস করতে পারবে না।' ('বাংলাদেশ ডকুম্যান্টস'-এ আওয়ামী লীগ মেনিফেস্টো - ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, সংগ্রহ-১ এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৮২)

'এক পাকিস্তান' এর পক্ষে এ সব বক্তব্যের আলোকে কেউ কি সেই মর্মান্তিক ঘটনাবলী আগেভাগে দেখতে বা জানতে পারত যা শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে এবং শেষ হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ঢাকায় ভারতীয় সৈন্যদের বিজয়ী প্রবেশের মধ্য দিয়ে?

মুজিব জনসমক্ষে যেভাবে বলছিলেন ব্যাপার কিন্তু সেভাবে গড়াচ্ছিল না। তাঁর দল যখন ১৯৭০ সালের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (LFO)-এর উপর বিতর্কে লিপ্ত ছিল - সে সময়ে নাকি তিনি তার ইনার কেবিনেটকে বলেছিলেন যে তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে - বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করা। ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সাথে শেখ মুজিবের কথোপকথনের টেপরেকর্ড ইয়াহিয়া খানকে দেয়া হয়। তাতে মুজিবকে পরিষ্কারভাবে বলতে শোনা যায় যে, 'আমার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন হয়ে গেলেই আমি এলএফও কে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিব।' তিনি তার সহকর্মীদের 'বাইরের' সাহায্যের দিকেও ইংগিত দেন, ধরে নিতে হয় - তা ভারত হতে। (নিজ লোকদের নিকট মুজিবের বক্তৃতার এ বর্ণনা ইয়াহিয়ার কাছে রিপোর্ট করে তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ। কোন কারণে সম্ভবতঃ আলোচনার রাস্তা পরিষ্কার রাখতেই তিনি এটাকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেন।)

ইয়াহিয়া খান যখন তার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস কর্তৃক বাজানো এ 'রাজনৈতিক বাজনা' শুনেন - তখন তিনি হতভম্ব হয়ে যান। তিনি সহজেই মুজিবের গলা চিনতে পারেন এবং তার কথাবার্তার সারমর্মও ধরতে পারেন। পরের দিন সকালে যখন আমি তাকে দেখি তখনও তিনি সেই হতভম্ব অবস্থাতেই ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই ঐকান্তিক প্রশাসক ছিলেন না, সুতরাং তিনি শীঘ্রই তার মর্মাঘাত হতে আরোগ্য লাভ করেন এবং আমাকে বলেন, 'যদি মুজিব আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে - তাহলে আমি তাকে নিশ্চল করে দিব।' মুজিবের মত ইয়াহিয়ারও একাধিক আকস্মিক পরিকল্পনা আছে বলেই মনে হল।

বিভ্রান্তিকর দৃশ্য

রাজনৈতিক কথাবার্তায় এবং নির্বাচনী অভিযানে মুজিব এবং তার অনুসারীরা প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ঘরে বাংলাদেশের ধারণা অবাধে প্রচারে ছিল মুক্ত; 'জয় বাংলা' চিৎকার সর্বত্র শোনা যেত। আবারো অতীতের সাথে তুলনা করলে - মুজিবের নির্বাচনী অভিযান ছিল ১৯৪৫-৪৬ সালে জিন্নাহর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অভিযানেরই অনুরূপ। প্রচারাভিযান যতই এগিয়ে চলছিল - ততই এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, মুজিবের আওয়ামী লীগই পূর্ব-পাকিস্তানে একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল দল। অন্যান্য দল কদাচিৎ কোন জনসভার আয়োজন করতে পারত এবং যখন তারা তা করত তখন জংগী আওয়ামী লীগাররা তা পন্ড করে দিত।

একটি সামরিক আইনবিধি ছিল যে, যে কেউ 'আঞ্চলিক অখন্ডতার' বিরুদ্ধে কথা বলবে - তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে - তথাপি বাংলাদেশের জন্য প্রচারাভিযানকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া হয়। মাঝে মধ্যে ইয়াহিয়া খান তার কিছু বক্তৃতায় দেশ ভাংগার যে কোন হুমকির বিরুদ্ধে দেশকে 'রক্ষায়' তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা প্রবলভাবে ব্যক্ত করতেন; তা সত্ত্বেও মুজিবের তরুণ ও ছাত্র অনুসারীরা বাংলাদেশের বার্তাকে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র মুক্তভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭০ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাদেশের সৃষ্টি দেখিয়ে একটি নতুন ম্যাপ প্রদর্শন করে এবং অভ্যুদয়রত দেশের পতাকা লক্ষণীয়ভাবে প্রদর্শিত হয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের এক জনসভায়। এ মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী - বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। সামরিক আইন প্রশাসক তাঁকে ডেকে পাঠান - দেশের সংহতি

কেন্দ্রের গাফিলতি- বাংগালীদেরকে পৃথক রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে দৃঢ়বিশ্বাস উৎপাদক যুক্তি সরবরাহ করে - যেমনটা ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট হতে ব্যাপক হিন্দু মুসলিম দাংগা (কলিকাতার বিরাট হত্যাকান্ড) জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগকে - এ শক্তিশালী প্রমাণ সরবরাহ করেছিল যে, তারা কোনক্রমেই আর হিন্দুদের সাথে একত্রে বসবাস করতে পারে না।

ইয়াহিয়া-মুজিব গোপন আলোচনা

মাওলানা ভাসানীসহ সমস্ত অ-আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, নির্বাচন আবারও স্থগিত করা উচিৎ। কিন্তু মুজিব তার বাংলাদেশের স্রষ্টা হওয়ার কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী ছিলেন না। সমস্ত প্রমাণ এবং রিপোর্ট এ কথার ইংগিত দেয় যে, তিনি তখন এ সিদ্ধান্তে পৌছে গেছেন যে, বাংলাদেশের সৃষ্টিই বাংগালীদের জন্য একমাত্র সমাধান। যদিও বা আগে তাঁর কোন রাখ-ঢাক কিংবা সন্দেহ থেকেও থাকত এ ব্যাপারে কষ্টক্লিষ্ট বাংগালীদের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানীদের 'ক্ষমার অযোগ্য অনীহা' তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি মুজিব ১৯৭০ সালের নভেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খানের ঢাকা অবস্থানকালে তিনটি গোপন বৈঠক করেন। ইয়াহিয়া ইত্যবসরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, নির্বাচন আর স্থগিত রাখা হবে না। যে সিদ্ধান্ত মুজিবের অনুকূলে ছিল। ইয়াহিয়া খান এমন কি পূর্ব-পাকিস্তানের 'এগার নেতা'কে সাক্ষাৎকার দিতেও অস্বীকার করেন - যার মধ্যে নুরুল আমিনও ছিলেন - যিনি তার কাছে নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁরা ইয়াহিয়া খানের এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন যেমনটা তা মুজিবকে খুশী করে। মাওলানা ভাসানী ইয়াহিয়ার কাছে তাঁর এক গোপন লোক পাঠিয়ে এটা স্পষ্ট করে দেন যে, যদি ইয়াহিয়া খান নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বাদ দিয়ে তার সমস্ত প্রশাসনকে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ কাজে কেন্দ্রীভূত করেন এবং তখন যদি মুজিব নির্বাচন স্থগিত রাখার জন্য তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে তিনি এবং তাঁর দল ইয়াহিয়াকে সমর্থন দিবেন - মুজিবকে নয়। সে সময় তাঁর দলের শ্লোগান ছিল - 'ভোটের আগে ভাত চাই।' যদি ইয়াহিয়ার স্থলে আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকতেন তাহলে - ভাসানীর প্রস্তাব খুব সম্ভব তিনি গ্রহণ করতেন। অনুরূপভাবে নির্বাচন স্থগিতের বিরুদ্ধে মুজিব উত্তেজনা সৃষ্টি করলে, অন্যান্য সমস্ত দল ও গোষ্ঠী ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন দানে প্রস্তুত ছিল। মুজিব প্রকাশ্য হুমকি দেন যে, যদি নির্বাচন স্থগিত রাখা হয় তাহলে সংঘর্ষে দশ লক্ষ লোক নিহত হবে। ভুট্টোসহ পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতারা নির্বাচন মূলতবীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এত সব সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান জাতিকে দেয়া 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন' এর অংগীকার নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার বড় আশা ছিল যে, এটা মুজিবকে খুশী করবে এবং একটি আপোষ সম্ভবপর হবে। ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাঁর এবং মুজিবের মাঝে গোপন বার্তা আদান-প্রদান চলে - যা 'পাকিস্তান ভাংগা হবে না' - মুজিবের এ কথার উপর ইয়াহিয়াকে বিশ্বাস স্থাপনে পরিচালিত করে।

সুতরাং ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে নভেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তিনটি গোপন বৈঠক সর্বাধিক আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। অল্প শীতের শুরুতে ঢাকার বাইরের আবহাওয়া ছিল খুবই চমৎকার এবং প্রেসিডেন্ট ভবনের সম্মেলন কক্ষের ভিতরের চিত্রও তার চেয়ে কম চমতকার ছিল না। মুজিব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সংসদে পেশের পূর্বে তাঁর খসড়া শাসনতন্ত্র দেখাবেন। তিনি নাকি ইয়াহিয়া খানকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তাঁর ছয় দফা কার্যক্রম দেশকে বিভক্ত করার জন্য ছিল না এবং ইয়াহিয়ার পাঁচ দফা যেমনটা এল. এফ. ও. তে আছে তা এবং তাঁর নিজের ছয় দফা - এ উভয়টাই ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র স্থান পাবে। মুজিবের সাথে তিনটি বৈঠকের পর ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং উল্লসিতভাবে আমাকে বলেন যে, 'পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।' তিনি আরো গর্ব করে বললেন যে, তার নির্বাচন স্থগিত না করার সিদ্ধান্ত ছিল 'সঠিক এবং দূরদৃষ্টি প্রসূত।' আমি কিন্তু ইয়াহিয়ার

এবং অস্তিত্বের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য হুমকির ব্যাপারে 'ব্যাখ্যা' দিতে। ধন্যবাদ গভর্ণর আহসানের হস্তক্ষেপকে, যার ফলে ব্যাপারটা এক কাপ চায়ের উপরেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

অল ইন্ডিয়া রেডিও - তার কলিকাতা কেন্দ্র হতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' নামের অনুষ্ঠান প্রচার করতে থাকে - খোলাখুলি বাংলাদেশের জন্য সমর্থন জানিয়ে। কেবল মাত্র পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা হতেই নয় - বরং কিছু বন্ধু দেশসহ অন্যান্যদের কাছ হতেও খবর আসে যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সফলতার জন্য এবং ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অর্থ-অস্ত্র দুটোই পূর্ব-পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তানে ভারতের জড়িত থাকার ব্যাপারে প্রমাণ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের অ-আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও ইয়াহিয়া খানের কাছে অনুরূপ খবর দেন।

আহসান ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের একমাত্র আশাবাদী ব্যক্তি এবং তিনি ইয়াহিয়া খানকে বলতেন, 'শেখ সাহেব (মুজিব) পাকিস্তানকে ভাংগবেন না।' ইয়াহিয়া হয়ত সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন তাতে; তিনি নিয়মিত পূর্ব-পাকিস্তান সফরে যেতেন এবং সব সময় মুজিবের সাথে 'দীর্ঘ ও বন্ধুত্বমূলক' আলোচনা করতেন। প্রতিবারেই মুজিবের সাথে আলোচনা করে তিনি সন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া যে ঐ সব রিপোর্ট (অর্থাৎ সেই সব ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ও অন্যান্য সূত্র কর্তৃক সরবরাহকৃত রিপোর্ট) সত্য নয়।' ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আমার ব্যাখ্যা হল - তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা কিংবা গতিশীলতা বুঝতে সক্ষম ছিলেন না। আহসানই ইয়াহিয়াকে মিথ্যা আশাবাদের দিকে চালিত করার ব্যাপারে বেশী দায়ী ছিলেন; কিন্তু মনে হচ্ছিল ইয়াহিয়া কিংবা আহসান কারোরই অন্য কোন বিকল্প ছিল না। মুজিবকে বড় বেশী ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং এখন কোন মোকাবিলা ছাড়া তার পক্ষে পিছুহটা ছিল কঠিন - যা ইয়াহিয়া কিংবা অন্য কেউ - যারা পাকিস্তানকে অখন্ড রাখতে আশান্বিত ছিলেন - তাঁরা কেউই তা চিন্তা করতে পারতেন না।

এরপর পূর্ব-পাকিস্তানে আসলো দু'টি মারাত্মক দূর্যোগ - ১৯৭০ সালের আগস্টে বন্যা এবং নভেম্বরে ঘূর্ণীঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস। আগস্ট মাসে বন্যার প্রাক্কালে ইয়াহিয়া এবং তার সরকার পরিস্থিতিকে ভালভাবেই মোকাবিলা করেন - তিনি এবং তার কেবিনেট মন্ত্রীরা পূর্ব-পাকিস্তানের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফর করে জনগণের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। এতে করে ইয়াহিয়ার ভাবমূর্তির উন্নতি হয়; ভাবপ্রবণ বাংগালীদের কাছ হতে প্রশংসা কিংবা নিন্দা পাওয়া কঠিন কিছু নয়। সুতরাং এতে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে না। ইয়াহিয়াকে নির্বাচন মূলতবী করতে হয়েছিল, কিন্তু কেউই সে সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি এজন্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানের বিরাট অঞ্চল পানির নীচে রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব ছিল না। মুজিবকেও সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছিল।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে যখন ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস দেখা দিল- তখন পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে যখন ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলো - তখন ইয়াহিয়া খান পিকিং ছিলেন। রাওয়ালপিন্ডি ফেরার পথে তিনি ঢাকায় যাত্রা বিরতি করেন এবং দু'দিন থাকেন। গভর্ণর আহসান এবং প্রাদেশিক সরকার তাঁকে বলেন যে, ঢাকায় তার উপস্থিতি জরুরী ছিল না এবং ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি খবরের কাগজে অনেক ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়েছে। সুতরাং ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। কিন্তু শীঘ্রই সর্বত্র চিৎকার ও প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে থাকে। ইয়াহিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন - কিন্তু ইত্যবসরে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ব্যাপক প্রতিবাদ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয় - তার জন্য যাকে অভিহিত করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাথে 'অপরাধমূলক' না হলেও চরম অবজ্ঞাসুলভ আচরণ বলে। বাংগালী জাতীয়তাবাদী এবং শেখ মুজিবের জন্য বাংগালীদের নিমিত্ত এক পৃথক রাষ্ট্রের ধারণা প্রচার করার জন্য এর চেয়ে আর বেশী অনুকূল পরিবেশ হতে পারত না। পরিস্থিতি সামলাতে অভিযোগকৃত

আশাবাদে শরীক হতে পারলাম না। আমি কেবল এটাই আশা এবং দোয়া করলাম যে, তিনি যেন সঠিক হন। তিনটি গোপন বৈঠকের কথাবার্তা সচরাচর যেমনটা হয় - তেমনি টেপরেকর্ড করা হয় এবং আমি সে টেপরেকর্ডকৃত কথা-বার্তা শুনেছিলাম। টেপরেকর্ডকৃত আলাপ শুনে কেউই ইয়াহিয়াকে দোষ দিতে পারবে না। যা হোক আমিও আওয়ামী লীগের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী প্রাথমিক খসড়া শাসণতন্ত্র হাতে পাই - যাতে অখন্ড পাকিস্তানের কোন আশা ছিল না। দেশবিভাগকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব করা না হলেও ছয় দফার অনমনীয় ও ব্যাপক ব্যাখ্যা ছিল ঐ খসড়ায়। যদি ছয় দফার পুরোটাই শাসনতন্ত্রে স্থান পেত তাহলে কদাচিৎ একটি ফেডারেল ইউনিয়ন থাকতে পারত।

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা

ইয়াহিয়া খানের প্রত্যক্ষ ভোটাভুটির ভিত্তিতে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন এবং প্রথম বারের মত বাংগালীদেরকে 'একব্যক্তি একভোট' এর ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল এক হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক ঘটনা।

ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮শে জুলাই তাঁর ভাষণে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একজন বাংগালী বিচারক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। বিচারপতি সাত্তারের সাথে আমার নিয়মিত ও ঘন ঘন বৈঠক হয়েছে এবং আমি একথা বলতে পারি যে, তিনি একটি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কোন পর্যায়েই নির্বাচন কমিশন চাপের সম্মুখীন হয়নি এবং এমনকি কোন ইংগিত দেয়া হয়নি কিভাবে এর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিচারপতি সাত্তার আমার ও অন্যান্যদের মতই ছিলেন যারা আন্তরিক ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক ফয়সালার ব্যাপারে আশান্বিত ছিলেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি তার সম্পূর্ণ মুক্ত-স্বাধীন ভূমিকা নিয়ে পুরোপরি তুষ্ট ছিলেন। ইয়াহিয়া খান তাঁকে সব রকমের সৌজন্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন; কোন কোন সময় বিচারপতি সাত্তারকে মন্ত্রীসভার যে সব বৈঠক নির্বাচন সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যেত সেখানে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে নেয়া হত; তার মতামত এবং সুপারিশের প্রতি সব সময়েই খুব অগ্রাধিকার ও মনোযোগ দেয়া হত।

নির্বাচন কমিশনের সর্ব প্রথম কাজ ছিল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জন্য আইয়ুবী পদ্ধতির অধীনে যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল তা গ্রহণ করবে কিনা। বর্তমান ভোটার তালিকা গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল - আইয়ুবের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল পরোক্ষ; সুতরাং এ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে - প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্যদের নির্বাচনের নিমিত্ত নয়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে ইয়াহিয়া অংগীকার করেছিলেন - প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের। দ্বিতীয়তঃ আইয়ুবের অধীনে নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে কোন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন না বরং ছিলেন একজন নির্বাহী কর্মকর্তা - যিনি ছিলেন কয়েক বছর আইয়ুবের প্রধান সচীব এবং তাঁর ইনার কেবিনেটের একজন সদস্য। আইয়ুবের নির্বাচন কমিশনের কাজ-কর্ম জনগণের আস্থার সৃষ্টি করেনি - আর এ আস্থা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় - এ সন্দেহ দূর করতে যে, সামরিক জান্তা আদৌ আন্তরিক ভাবে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক কিনা। সুতরাং সতর্ক বিবেচনার পর বিচারপতি সাত্তার নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য অগ্রসর হতে সিদ্ধান্ত নিলেন। সাড়ে এগার কোটি (১৯৬১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক) লোক অধ্যুষিত দেশে ভোটার তালিকা প্রণয়ন খুব সহজ কাজ নয় - যার অধিকাংশই অশিক্ষিত, সুদূর পল্লীতে বসবাসরত - সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ।

তথাপি নির্বাচন কমিশন এ কাজ প্রশংসনীয় দ্রনততার সাথে এবং যথাযথ সতর্কতার সাথে - আঞ্জাম দেয় 'ভূয়া ভোটারদের তালিকাভূক্ত করা হয়েছে' - এ সমালোচনা এড়াতে - যেমনটা অতীতে পাকিস্তানে হয়েছে।

সব ধরনের সতর্কতা নেওয়া হয় এবং সারাদেশব্যাপী স্থাপন করা হয় এক বিরাট কার্যকরী ব্যবস্থা যাতে ছিলেন ২৮৫ জন রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ১৪০৪ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ১৪,১২১ জন সুপারভাইজার এবং ৪৫,৭৬৬ জন গণনাকারী। সারাদেশে ৫,৬৪,২১,১৯৮ জন ভোটার গণনার বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে।

নির্বাচন কমিশন ১৯৭০ সালের ১৫ই জুনের মধ্যে এ কাজ শেষ করে যা ছিল এক অসাধারণ কৃতিত্ব। নতুন ভোটার তালিকার প্রস্তুতি চলছিল ১৯৬৯ সালের ২৭শে আগষ্ট হতে। নির্বাচনী তালিকা প্রকাশ করা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, যদি কোন দাবি কিংবা আপত্তি থেকে থাকে তা সত্তর নিষ্পত্তি করা যায় ৩১৫জন 'রিভাইজিং অথরিটিস' কর্তৃক, যাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের হাইকোর্টের সহায়তায় রিক্রুট করা হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে সর্বমোট ২০,৬৫০ টি 'দরখাস্ত' দেয়া হয় যার মধ্যে ১৫,০০৭টি গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানে অনুরূপভাবে ৬,৯০৪টি দরখাস্ত দেয়া হয় - যার মধ্যে ৫,৭৭৬টি গৃহীত হয় এবং ১,১২৪টি প্রত্যাখ্যান করা হয়। তালিকাভূক্ত সর্বমোট ভোটারের মধ্যে ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন ছিল পূর্ব-পাকিস্তান হতে এবং ২,৫২,০৬,২৬৩ জন ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান হতে। তালিকাভূক্ত ভোটার সংখ্যা ছিল দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০% - যা ছিল এক 'আদর্শ' অনুপাতে।



পাকিস্তান পিপলস পার্টির নির্বাচনী পোস্টার

১৯৭০ সালের নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাভুটি কিছু উপজাতীয় এলাকায়ও সম্প্রসারিত করা হয় - যা অতীতে সব সময়ই বাদ দেয়া হয়েছে। আজাদ কাশ্মীরে যা বিতর্কিত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশবিশেষ এবং ১৯৪৮ সালের যুদ্ধবিরতি হতে পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে তার জনগণকেও ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী কাজ ছিল নির্বাচনী এলাকার চৌহদ্দি ঠিক করা যা কেবল ইয়াহিয়া খানের ১৯৭০ সালের মার্চের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা বরাদ্দ করার পরই শুরু হতে পেরেছে।

একটি সীমা নির্দেশকরণ কমিশন স্থাপন করা হয় বিচারপতি আব্দুস্ সাত্তারকে চেয়ারম্যান করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের হাইকোর্টের প্রত্যেকটি হতে একজন করে বিচারপতি নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকার ব্যাপারে আপত্তি ও পরামর্শ কমিশন কর্তৃক শোনা হয় ১৯৭০ সালের ১১ই মে হতে ২২শে মে পর্যন্ত। পূর্ব-পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৫৮টি নির্বাচনী এলাকা এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৯৬টি নির্বাচনী এলাকার ব্যাপারে পরিবর্তন আনা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয় ১৯৭০ সালের ৫ই জুন। কমিশন কর্তৃক অনুরূপ পদ্ধতি গৃহীত হয় পশ্চিম-পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের ক্ষেত্রেও ২৬শে মে হতে ২০শে জুন পর্যন্ত। পশ্চিম-পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৩৯টি নির্বাচনী এলাকা এবং ৪টি প্রাদেশিক পরিষদের ৮৯টি নির্বাচনী এলাকার ব্যাপারে পরিবর্তন আনা হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয় ১৯৭০ সালের ২৫শে জুন।

ভোটার তালিকা প্রণয়নে নির্বাচন কমিশন এবং সীমা নির্দেশকরণ কমিশনের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণের কাজ দেশে স্বাগত জানানো হয়। কোন বড় রাজনৈতিক দল কিংবা কোন পত্র-পত্রিকাই বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত দু'টি কমিশনের সদিচ্ছার ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি। প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন প্রস্তুতিতে খুশীই মনে হল।

সর্ববৃহৎ নির্বাচনী প্রচারাভিযানঃ জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর ১৯৭০

যে কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে - ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চে সামরিক শাসন আরোপের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। যেমনটা তিনি ১৯৭০ সালে তার এক ভাষণে বলেছিলেনঃ 'এটা যুগপৎ বিস্ময় ও স্বস্তির উদ্রেক করেছে...যেকোন সামরিক শাসনের প্রথম কাজ হল রাজনৈতিক দল সমূহ নিষিদ্ধকরণ, কারণ সামরিক সরকার ও তার সংগে রাজনৈতিক দল সমূহের অস্তিত্ব হচ্ছে সবচেয়ে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।' অনেক বছর নিয়ন্ত্রিত ও আধা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের পর যখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রচার করতে এবং তাদের নীতিকৌশল ও কর্মসূচী অবাধে ব্যাখ্যা করতে পারেনি, পাকিস্তানে পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকান্ড পুনরারম্ভ করা হয় ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী। যা ১৯৬৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'সামরিক আইনবিধি-৬০' ঘোষিত হয়ে দেশে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়। এটা সত্য যে, সামরিক আইনবিধি-৬০ রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য কিছু নীতিমালা দেয়, যেমন:-

কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষকে দাংগা হাংগামা বা আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রচারের অনুমতি দেয়া হবে না, বা পাকিস্তানের আদর্শ - ইসলামী আদর্শ - যার উপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে দাবি করা হয় - তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যাবে না।

কিন্তু এ বিধিকে লংঘন করেই কেবল এর প্রতি সম্মান দেখানো হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রধানতঃ মুজিবের দল কর্তৃক খোলাখুলি ও প্রচণ্ড আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রচারিত হয়। তরুণ ও জংগী গোষ্ঠী - প্রধানতঃ ছাত্র ও

শিল্প শ্রমিকরা - অন্যান্যদের রাজনৈতিক সভা ও মিছিল পন্ড করতে ফ্যাসীবাদী কায়দা অবলম্বন করে। বিভিন্ন দল অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ জানায় গুন্ডামী ও বর্বরতার। সরকারকে দোষারোপ করা হয় বিশেষতঃ পূর্ব-পাকিস্তানে মুজিবের দলের প্রতি অতিমাত্রায় দুর্বল বলে। ইয়াহিয়া খান তার সরকার সত্যিকারের উভয় সংকটের সম্মুখীন বলে উল্লেখ করেনঃ 'যে পরিকল্পনার অধীনে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষকে কোন কোন সময় সামরিক আইনবিধি ও আদেশ লঙ্ঘনকে উপেক্ষা করতে হয়েছিল আমি জানি তা কোন কোন মহলে ভ্রান্তভাবে দুর্বলতা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সব লোকেরা জানেন যে এ মনোভাব ছিল স্বেচ্ছাকৃত এবং দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে সহজাত। আমার সরকারের কাজ হচ্ছে এক জটিল ও স্পর্শকাতর কাজ। একদিকে নৈরাজ্যমূলক শক্তিগুলোকে দমিয়ে রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হচ্ছে যে, কোন ক্রমেই যেন রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করা না হয়।'

যারা অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সহজভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের আন্তরিকতায় সন্দেহ ও চিন্তায় ভোগে - তাদের উচিৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি তার পুনঃ পুনঃ সহিষ্ণুতার আবেদন অনুধাবন করা। তিনি উল্লেখ করেন -গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে সহিষ্ণুতা - 'চলুন আমরা দেখাই আমরা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত' রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরসহিত তার গোপন আলাপে, বিশেষতঃ যাদের ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন ছিল যেমন - মুজিব ও ভূট্টো, তিনি তাদের প্রতি পরস্পর সহিষ্ণুতা ও সমঝোতার জন্য আহবান ও আবেদন জানান এবং একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খেলার মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে বলেন। দূর্ভাগ্যক্রমে সংযম ও সহনশীলতার এ সব উপদেশ বধির কানে পতিত হয়।

ঘটনাক্রমে এটা ছিল এমন এক নির্বাচন যাতে শাসক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করছিল না। সত্যিকারের 'কেয়ারটেকার সরকার' হিসেবে ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রীসভার কাউকেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। এটা এল. এফ. ও. তে বিশেষভাবে শর্তারোপ করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি নির্বাচিত ও সদস্য হওয়ার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন যদি তিনি ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্টের পর কোন সময় প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভার সদস্য হয়ে থাকেন - যতক্ষণ না তার মন্ত্রী হওয়ার সময় হতে দু বছর কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে অনুরূপ কিছু কম সময় অতিবাহিত হয়। যেমনটা কোন ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট অনুমতি দেন, (বিধিঃ ৯ম) এটা করা হয়েছিল যাতে করে কোন মন্ত্রীসভার সদস্যই রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে পারেন এবং সেটি ছিল নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষপাতহীনতা দেখানোর খাতিরেও। অনুন্নত দেশে নির্বাচনে কারচুপি হতে পারে এবং প্রায়শঃই তা হয়ে থাকে। পাকিস্তানের অতীত রেকর্ড যা উল্লেখিত হয়েছে তা ছিল খুবই হতাশামূলক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি সে পরিমাণে গণতন্ত্রের দিকে ইয়াহিয়ার ব্যাপক ও সদুদ্দেশ্যপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন?

দলসমূহ এবং তাদের কর্মসূচীঃ

২৪টি দল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক দলকে প্রতীক বরাদ্দ করেছিল। পাকিস্তান কিংবা ভারতের মত একটি এশীয় দেশের অধিকাংশ ভোটার এমনকি পড়তেও পারে না যে, কোন্ প্রার্থী কোন্ দলের - যার জন্য সে ভোট দিতে ইচ্ছুক হতে পারে। সুতরাং আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জন্য নৌকা ও ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির জন্য তরবারি প্রতীক বরাদ্ধ করা হয়। এ চব্বিশটি দলের অনেকগুলোই ছিল খুব কম গুরুত্বের। পশ্চিম-পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের জন্য বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র হতে ৮০০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্ধিতা করে। আর পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের জন্য ৭৮১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্ধিতা করে।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে কিছু দল কোন গুরুত্বেরই অধিকারী ছিল না। কিছু দলের ছিল দীর্ঘ অতীত ইতিহাস - যেমন মুসলিম লীগ - যা তিনটি উপদলে বিভক্ত ছিল। দু'টি ডানপন্থী দল - জামায়াতে ইসলামী

এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ হতে কাজ করছিল। ১৯৪৭ সালের পর হতে যেসব দলের সৃষ্টি তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ছিল সবচেয়ে পুরানো এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি। সবচেয়ে নুতন কিন্তু উদীয়মান শক্তি ছিল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি (পিপিপি)। পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি হতে- যখন পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র' তে পরিণত হয়। কিন্তু কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত ভূয়া বামপন্থী দলের অভাব ছিল না। ন্যাপ যা গঠিত হয়েছিল এর মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে - ১৯৫৬-৫৭ সালে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে মত পার্থক্যের কারণে, তা দুটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল- জনগণের কাছে গ্রুপ দু'টি 'পিকিংপন্থী' ও 'মস্কোপন্থী' বলে পরিচিত ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অংশ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিজে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস বলে পূনঃ নামকরণ করে; কিন্তু ১৯৬০ সালের শুরু হতে এর শক্তি ছিল খুবই কম।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সবচেয়ে উদ্বেগজনক বৈশিষ্ট্য ছিল - এটা যে, কোন জাতীয় নেতা কিংবা কোন জাতীয় দল ছিল না। কিছু দল যেমন মুসলিম লীগ (তিন উপদল), জামায়াতে ইসলামী এবং পিডিপি-র নিঃন্দেহে সারা পাকিস্তান ব্যাপী সংগঠন ছিল এবং তারা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এসব দলের কোনটারই পূর্ব-পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা ছিল না এবং তারা পশ্চিম-পাকিস্তানেও তাদের কর্তৃত্ব দ্রুততার সাথে ভুট্টোর দলের নিকট হারাতে থাকে। যে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল নির্বাচনে সফলকাম হিসেবে আবির্ভূত হয় সে সব ছিল আঞ্চলিক দল, জাতীয় দল নয়। আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে তার পূর্ণ- কর্তৃত্ব লাভ করে, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে কোনই সমর্থন পায়নি। অন্য দিকে উদীয়মান পশ্চিম-পাকিস্তানী নেতা ভূট্টো পূর্ব-পাকিস্তানে একজন প্রার্থী দাঁড় করাতেও সাহস পাননি। যতই নির্বাচনী প্রচারাভিযান বাড়তে থাকে আঞ্চলিক মেরুকরণ ক্রমেই বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এটা ছিল আমার মত তাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা - যারা পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছিল।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র ছিল তার ছয় দফার উপর ভিত্তিশীল। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের গঠণতন্ত্রে এটাও অন্তর্ভুক্ত হয় যে - 'ইসলাম হচ্ছে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গভীরভাবে লালিত বিশ্বাস। আওয়ামী লীগ এটা দৃঢ়তার সাথে স্বীকৃতি দেয় যে, শাসনতন্ত্র এটা পরিষ্কারভাবে নিশ্চয়তা থাকবে যে, ইসলামী আদর্শ - পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় যেমনটা আছে তার বিপরীত কোন আইনই পাকিস্তানে কার্যকর কিংবা চালু করা হবে না।' এভাবে মুজিব পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের নিকট ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিতে আবেদন রাখেন; তথাপি পাকিস্তান ভেংগে যাওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেন। অনুরূপভাবে যদিও তার ছয় দফা একটি লুকায়িত বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পণা বৈ কিছুই ছিল না, তবুও মুজিব তার এক প্রাথমিক নির্বাচনী বক্তৃতায় ঘোষণা করেনঃ 'পাকিস্তান টিকে থাকতেই এসেছে এবং কোন শক্তিই একে ধ্বংস করতে পারবে না।' সত্যি কথা বলতে কি যদিও মুজিব অনেকবারই দাবি করেছেন যে, নির্বাচন হবে তার ছয় দফার উপর গণভোট - তিনি বারবার এ আশ্বাস দিয়েছেন যে, তার নীতিমালা ও কর্মসূচী 'পাকিস্তান ফেডারেল সরকারের টিকে থাকাকে রক্ষা করবে।' আবার বাংলাদেশ সৃষ্টির পর মুজিব বলেন যে, তিনি ১৯৬৮ সাল হতেই পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেনঃ 'স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালের আন্দোলনসমূহের মধ্য দিয়ে।' এসব হচ্ছে কিছু জাজ্বল্য দৃষ্টান্তের নমুনা যা মুজিবের নির্বাচনপূর্ব কাজ ও অংগীকারের মধ্যকার ফারাক এবং পাকিস্তান ভাংগায় তার সত্যিকারের ভূমিকা নির্দেশ করে।

মুজিবের নির্বাচনী প্রচারাভিযান এবং কৌশল ছিল সহজ : তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংগালী জাতীয়তাবাদের শুভবার্তা ও বাংলাদেশের আদর্শকে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া।

ধন্যবাদ জানাতে হয় গভর্ণর আহসানের অযোগ্যতা ও সরলতাকে; মুজিব ও তার অনুসারীরা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত এবং কোন বিন্দু মাত্র বাধার সম্মুখীন না হয়েই বিচ্ছিন্নতার বাণী প্রচারে সমর্থ হচ্ছিল। ভাসানী আমাকে বলেছিলেন যে, যদি সরকার মুজিবকে বাংলাদেশের ধারণা প্রচারে স্বাধীনতা দেয় তাহলে তাঁর 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান' বলা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। যাহোক 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের' পক্ষে তাঁর ভাষণকে সরকারি এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণের কিছু মহলে ভুলভাবে বুঝা হয়। তিনি পাকিস্তান ভাংগার অনুকূলে ছিলেন না, কারণ তিনি দুরদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে, বাংলাদেশ- ভূটান ও সিকিমের মত নয়াদিল্লীর একটি অনুচর রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই হবে না। 'স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান' এর পক্ষে তাঁর ডাক ছিল এক মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ও সরকারের প্রতি হুশিয়ারী। আবারো আহসান ভাসানীর সাথে কোন বোঝাপড়ায় বাধা দেন। 'লাল মাওলানার' সাথে আমার বৈঠকসমূহে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং সে সবকে ইয়াহিয়ার নিকট রিপোর্ট দেন এ হিসেবে যে, এ সব মুজিবের সাথে বোঝাপড়া আলাপ-আলোচনার জন্য খুবই ক্ষতিকারক। গভর্ণর আহসান হতে পারেন - তার এ বিশ্বাসে আন্তরিক যে, মুজিবের সাথে সমঝোতা দরকার, কিন্তু তার সেরকম রাজনৈতিক সূক্ষ্ণ বিচারশক্তির অভাব ছিল যা আওয়ামী লীগের অত্যন্তরে সক্রিয় অখন্ড পাকিস্তানের বিরুদ্ধ শক্তিগুলোকে বোঝার জন্য জরুরী ছিল। আমি বারবার ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিয়েছি যে, তাঁর উচিৎ মুজিবের সংগে সরাসরি আলোচনা করা এবং যদি মুজিব রাজী হন তাহলে ছয় দফার পরিবর্তন অন্বেষণ করা। যদি মুজিব এতে অস্বীকৃতি জানান, আমি সুপারিশ করি বাংগালী মুসলমানরা আদৌ অখন্ড পাকিস্তানে বসবাস করতে চায় - নাকি বিচ্ছিন্ন হতে চায় তা নিশ্চিত হতে ইয়াহিয়ার উচিৎ গণভোটের আয়োজন করা। আমি ইয়াহিয়া খানকে আলজিরিয়া সংকটের প্রাক্কালে দ্যা গলের সাহসী পদক্ষেপের কথা স্বরণ করিয়ে দেই। কিন্তু ইয়াহিয়া তো বুদ্ধিমত্তায় দ্যা গলের সমমানের ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি মুজিব এবং তাঁর নিজের গভর্ণর আহ্সান - উভয় কর্তৃক বিভ্রান্ত হন।

অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাজের তুলনায় মুজিবের কাজ ছিল সাধারণ ও সহজ। তার বক্তব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু পশ্চিম-পাকিস্তানীদের দ্বারা বাংলার শোষণের ব্যাপার আর তার আদর্শ ছিল 'সোনার বাংলা'। এটা ছিল সাড়ে সাত কোটি দারিদ্রতাক্লিষ্ট জনগণের জন্য সবচেয়ে সার্থক আবেদন। যেমনটা অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা এ কথায় আস্থাবান হয়েছিল যে, তাদের একটি পৃথক রাষ্ট্র তাদের জন্য সুযোগের এক ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে; তেমনি গ্রামাঞ্চলের বাংগালীরা যাদের কাছে মুজিবের আবেদন ছিল খুবই প্রচণ্ড - তারা মুজিবের সোনার বাংলার কথায় কর্ণপাত করে। কেবলমাত্র দরকার ছিল নির্বাচনে তাঁকে এবং তাঁর দলকে ভোট দেয়া। ১৯৪৬ সালে জিন্নাহর কৌশলও ছিল অনেকটা অনুরূপ এবং তিনিও ভোট পেতে বেগ পাননি। অনুরূপ ভাবে মুজিবও ডানপন্থী কিংবা বামপন্থী কারো কাছ হতেই হুমকির সম্মুখীন হননি।

পরবর্তী কালে ভাসানী নির্বাচন হতে সরে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তার দলের প্রতি আহসানের নির্যাতনী নীতির কারণে এবং সব শেষে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। মস্কোপন্থী ন্যাপের কোন জনপ্রিয় নেতা ছিলনা, এর স্ব-বৈশিষ্টযুক্ত 'প্রফেসর' মুজাফ্ফর আহমদের জনগণের উপর প্রকৃত কোন প্রভাব ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের বামপন্থী শক্তিগুলোও ছিল দ্বিধাবিভক্ত এবং কোন সুসংগঠিত বা বিশ্বস্ত শক্তিভিত ছিল না তাদের। উপদলীয় কোন্দলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ভাসানী গ্রুপ মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে একটি উপদল বেরিয়ে যাওয়ার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। তোয়াহা ছিলেন নির্বাচন পদ্ধতির বিরোধী। তিনি গ্রামীণ জনতার মাঝে রাজনীতি সচেতনকরণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যান্য পিকিংপন্থী উপদলগুলো ভাসানীর সাথে রয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর ছিল প্রচুর কৃষক অনুসারী; কিন্তু তোয়াহার পদত্যাগের পর ভাসানী ন্যাপ ক্রমাগতভাবে ভাগ হয়ে যেতে থাকে। আব্দুল মতিনের নেতৃত্বের উপদল ভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিম-বাংলার নক্সালীদের মত একইরূপ বিপ্লবী কৌশলের ওকালতি করতে থাকে।

তাদের আভ্যন্তরীণ বিভক্তির কথা বাদ দিলেও প্রাদেশিক গভর্ণর আহসান পূর্ব-পাকিস্তানে বামপন্থী শক্তিগুলোকে ধ্বংস করতে সব ধরণের ব্যবস্থাই নেন। কেন আহসান এ পলিসি নেন তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু এটা হতে পারে 'সিয়াটোর' সাথে তার সাবেক দীর্ঘ সম্পর্কের কারণে। একটা বড় সমস্যা ছিল সামরিক জান্তার সদস্যদের নিয়ে - আর তা হল আন্তর্জাতিক বিষয়াদি বোঝার ক্ষেত্রে তাদের কমতি ছিল। সিয়াটোর সমৃদ্ধির যুগে হয়তঃ পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল পিকিংপন্থীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা; কিন্তু চীন যখন পাকিস্তানের প্রকৃত এবং সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু হয়ে পড়ে তখন আহসানের এ নীতি ছিল হয় নিছক নির্বুদ্ধিতা প্রসূত কিংবা কোন বিদেশী প্রভাব দ্বারা উৎসাহিত। আহসানের অভিপ্রায়ের ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন 'লাল মাওলানার' প্রতি তার পলিসি পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের জন্য আত্মঘাতী বলেই মনে হয় এবং এটা মুজিবকে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় - বিচ্ছিন্নতার বাণী প্রচার করতে। ডানপন্থী কিংবা মধ্যপন্থী দলগুলো মুজিবের জন্য হুমকি ছিল না; একমাত্র একজন ব্যক্তি যিনি মুজিবের লুকায়িত বিচ্ছিন্নতা ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতে পারতেন তিনি ছিলেন মাওলানা ভাসানী। আহসান তাঁর সাথে সমঝোতার সব রকমের সুযোগই বাঞ্চাল করে দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে একটি বন্ধু ভাবাপন্ন শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ছিলেন তা প্রতীয়মান হয় গৃহযুদ্ধের সময় তাদের দ্বারা বহু পিকিংপন্থী নেতৃবৃন্দের হত্যার মাধ্যমে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ভূট্টো যখন পিকিং যান আসন্ন ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীনা সমর্থন আদায়ের জন্য, তখন চীনা কর্তৃপক্ষ ভূট্টোকে ৬০ জন পিকিংপন্থী নেতাদের একটি তালিকা দেন যাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যা করেছিল। সামরিক বাহিনীর এ কার্যক্রম ছিল আহ্সানের নীতিরই উত্তরাধিকারীত্ব; যিনি তাঁর রিপোর্টে পিকিংপন্থী নেতৃবৃন্দকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে চিহ্নিত করেন, আর আসল রাষ্ট্রবিরোধী গ্রুপগুলিকে উপেক্ষা করেন। ভূট্টো সঠিকভাবেই অভিযোগ করেছিলেনঃ 'প্রাদেশিক প্রশাসন (পূর্ব-পাকিস্তানে) আওয়ামী লীগকে পূর্ণ সমর্থন যুগিয়েছে এবং নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ কর্মীদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তারা এটার সুযোগ গ্রহণ করে...অনেক কারণই আছে, কিন্তু প্রধান কারণ হচ্ছে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল ধারণা... । মুজিবুর রহমান গর্ব করেছিলেন যে, তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে বামপন্থীদের শেষ করে দিবেন... । এ পুরো সময়টাই সামরিক গভর্ণর আহসান মুজিবের আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।'

মোটের উপর নেতৃবৃন্দের টেলিভিশন-বক্তৃতা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে এক নতুন প্রেরণা প্রদান করে, যদিও তাদের কতক ছিল নিরস ও বিরক্তিকর। উত্তেজনা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড ভরা একটি পরিবেশে এসব বক্তৃতা পাকিস্তানীদেরকে - বিশেষ করে শহুরে জনগণকে ক্রমবর্ধমান নির্বাচনী প্রচারাভিযানের একটি ভাল চিত্র প্রদান করে - যা দেশে এক বছর ধরে চলছিল। সবশেষে ৩রা ডিসেম্বর নির্বাচনের মাত্র চার দিন পূর্বে ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এক আবেগপ্রবণ আবেদন রাখেন - 'দেয়া এবং নেয়ার মনোভাবের জন্য এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করার জন্য ... আমাদের ইতিহাসের এ বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে।' তিনি স্মরণ করেন 'অনেক সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়েছিল এ সরকারের আন্তরিকতা এবং উদ্দেশ্যের ব্যাপারে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অটল ছিলাম।'

১৯৭০ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়াহিয়া খান পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য সর্বাধিক মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন তাঁর এ অংঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের পথে তিনি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবেন না। বরঞ্চ তিনি একে উৎসাহিত করবেন - যাতে করে 'তারা তাদের লক্ষ্যের, পরিকল্পনার এবং সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে পুরোপুরি মালিক হতে পারে পাকিস্তানী ধারণার মধ্যে থেকে।' তিনি আরো বলেন যে, ভৌগলিক দূরত্বের কারণে 'এক পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বশাসন থাকা দরকার তার নিজের ব্যাপারগুলো পরিচালনার জন্য'। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্য তার চেয়ে আর বেশী দ্ব্যর্থহীন অংগীকার কি হতে পারতো? যদি মুজিব কেবল স্বায়ত্তশাসনের জন্য আগ্রহী হতেন - যেমনটা তিনি বাংগালী

মুসলমানদেরকে তাদের ভোটের জন্য বলেছিলেন, তাহলে কোন সংঘর্ষ হত না, ইয়াহিয়া স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যাপারে এর চেয়ে বেশী স্পষ্টভাষী হতে পারতেন না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল - ব্যাপারটি আদৌ একটি 'সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের' ব্যাপার ছিল নাকি তা দেশকে বিখন্ড করার এক বিবাদ ছিল।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর এবং যেকোন মানদন্ডেই তা ছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ। ভাগ্যের পরিহাস এটাই ছিল অখন্ড পাকিস্তানে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ প্রকৃত নির্বাচন। নানা মহলে ব্যক্ত অভিমতের বিপরীতে নির্বাচনী ফলাফল অন্ততঃ পূর্ব- পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শাসক মহল কিংবা সেখানকার রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের যেকোন ঐকান্তিক পর্যবেক্ষকের কাছেই কোন বিস্ময় উদ্রেককারী ছিল না। প্রচন্ড পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে যা জন্ম নিয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড়ের পরে, ইয়াহিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তের পর কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, মুজিব সেখানকার সব আসনই দখল করবেন। ভাসানীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন হতে সরে দাঁড়ান। কেবলমাত্র নূরুল আমিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং একমাত্র আসনে জয়লাভ করেন। আরেকটি আসনে জয়লাভ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা উপজাতীয় 'রাজা'।

কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানের নির্বাচনী ফলাফল বিস্ময়ের উৎপাদন করে বিশেষ করে সেখানে ডানপন্থী ও ধর্মীয় দলগুলোর সম্পূর্ণ পরাজয়ে এবং একজন অ-পাঞ্জাবী ভূট্টোর পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতা হিসেবে - আরো সঠিকভাবে বললে পাঞ্জাবের নেতা হিসেবে উত্থানে। মুজিবের সাফল্য ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা ও হিসেব-নিকেশকে উলট-পালট করে দিয়েছিল - একথা বলা ঠিক হবে না। যখন তিনি নভেম্বরের ঘূর্ণীঝড়ের পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এগুবার সিদ্ধান্ত নেন তখন আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম - "আমি আশা করি আপনি আপনার সিদ্ধান্তের তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝেন"। তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যহীন উত্তর ছিল - 'আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা মুজিবের সার্বিক সাফল্য নিশ্চিত করবে? হ্যা, আমি এ ব্যাপারে সচেতন আছি এবং তাতে উৎকণ্ঠিত নই। আহসান এবং পীরজাদা শেখের (অর্থাৎ মুজিব) সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যেমনটা মুজিব আমার নিজেকেও আশ্বাস দিয়েছেন - তিনি তার ছয় দফায় পরিবর্তন আনবেন। ইনশাআল্লাহ্ পাকিস্তান রক্ষা পাবে। দুশ্চিন্তা করবেন না॥"[২৫৬]

০৩.

"... এ কথা সকল মহলে স্বীকৃত যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী অভিযান ছিল মাত্র এক ব্যক্তির প্রদর্শনী বিশেষ। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের মুসলমানদেরকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এমনকি যদি ল্যাম্পপোস্টকেও মনোনয়ন দিয়ে থাকে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য বলা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকায় ভোট দিতে বলা হয়। আগের বেলায় এ নির্দেশ আসে কায়েদ-ই-আযমের কাছ থেকে। পরের বেলায় এ নির্দেশ দেন বঙ্গবন্ধু। শেখ মুজিবের নিজের একটা আবেদন তো ছিলই, সবচেয়ে ফলদায়ক নির্বাচনী প্রচার মাধ্যম ছিল একটি পোস্টার যার শিরোনাম ছিল: 'সোনার বাংলা শ্মশান হইল কেন?'

অবশ্য কতিপয় মহল আওয়ামী লীগের কার্যকারিতাকে তেমন আমল দেয়নি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, রাজশাহীর একজন 'ধনী' ও 'প্রভাবশালী' কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিশ্বাস ছিল যদি তিনি মুসলিম লীগ ও জামায়াত-ই-ইসলামীর মতো ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তাকে সমর্থন দেয় তাহলে আওয়ামী লীগ, পিডিপি, ন্যাপ (ওয়ালী) ও ন্যাপ (ভাসানী)-র মধ্যে বিরোধীদলীয় ভোট ভাগাভাগির ফাঁকে তিনি সুনিশ্চিতভাবেই নির্বাচনে জয়ী হবেন। ঐ একই জেলায় নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে এমনকি

---

২৫৬ অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি (মূল : The Last Days of United Pakistan/G W Choudhury)/অনু. সিদ্দীক সালাম ॥ [হক কথা পাবলিকেশন্স - জানুয়ারি, ১৯৯১। পৃ. ৯৬-১২৩]

অনেকের এ ধারণাও জন্মে যে, শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ভাটার টান পড়েছে কেননা তিনি সব গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একত্রিত করার মতো দূরদর্শিতা দেখাতে পারেননি। আরো মনে করা হয় যে, 'জয় বাংলা' শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ওয়ালী ন্যাপের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী এ কথা বলেন বলে উল্লেখ করা হয় যে, জয় বাংলা শ্লোগানের মাধ্যমে লাখো নির্যাতিত মানুষের অধিকার বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না। রাজশাহীকে ওয়ালী ন্যাপের তুলনামূলকভাবে শক্ত ঘাটি মনে করা হতো। ওয়ালী ন্যাপ এই জেলা থেকে জেলার মোট নয়টি জাতীয় পরিষদ আসনের মধ্যে ছয়টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ জেলায় ওয়ালী ন্যাপের জেলাওয়ারি প্রতিদ্বন্দ্বিতার শতকরা হার (৬৬) গোটা প্রদেশে সর্বোচ্চ ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা যায় রাজশাহী জেলায় জেলার মোট নির্বাচন প্রার্থীর (৫০) ১৮ শতাংশ তথা নয়জন ছিলেন আওয়ামী লীগের। কিন্তু তারা জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে এই জেলায় প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের শতকরা ৭৪.৫৯টি ভোট পেয়েছে। আর ৩৭ জন প্রার্থীর (৭৪ শতাংশ) জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

... বহুদলীয় প্রতিযোগিতায় একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নাও পেতে পারে। কিন্তু ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আসন জয়ে আওয়ামী লীগের অসাধারণ সাফল্য প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হারে আরো মজবুত হয়ে ওঠে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ১৬২ জন প্রার্থী ছিল প্রদেশে ঐ সব আসনের মোট প্রার্থী সংখ্যার ২০.৭৪ শতাংশ। আর প্রদেশে জাতীয় পরিষদের আসনগুলিতে মোট যে বৈধ ভোট পড়ে তার ৭৫.১১ শতাংশ পায় এই দলের প্রার্থীরা। কোনো রকমের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাথে ভোটের ব্যবধান ছিল অনেক। আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য বিরোধী শিবিরের দলগুলিতে তীব্র মতানৈক্য ছিল। ফলত জাতীয় পরিষদের ৮২ শতাংশ আসনের প্রতিটিতে তিনের বেশি প্রার্থী এবং ৫৫ শতাংশ আসনে চারের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অবশ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সত্যও এই যে, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও তাতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সাফল্য খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো না।

... জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে আওয়ামী লীগ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রে সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে। অবশ্য, জাতীয় পরিষদে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ছিল একান্তই আঞ্চলিক কেননা, এ দল পশ্চিম পাকিস্তানে এমনকি একটি আসনও পায়নি যদিও আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে নামেমাত্র হলেও আটটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এটি আবারও আওয়ামী লীগের একান্তই আঞ্চলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও, পূর্বাঞ্চলের কোনো বিশিষ্ট আওয়ামী লীগারই, এমনকি, প্রতীকী অভিব্যক্তি হিসেবেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। এতে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের আদৌ আস্থাযোগ্যতা নেই - কেবল এ কথাই প্রমাণিত হয়নি বরং এ ধরনের প্রয়াস নিষ্ফল হবে বলে আওয়ামী লীগের যে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল সে কথাও প্রকাশ পেয়েছে। এদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে পিপিপির পরিপূর্ণ অনুপস্থিতি এ সবের সাথে যোগ হওয়ায় এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে যে, পাকিস্তানী জনসমাজে সংহতি বিধায়ক রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ফলে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার স্বকীয় স্ববিরোধিতারই শিকার হয়েছে।"[২৫৭]

০৪.

"... As the evening of December 7 passed into night and Radio Pakistan began issuing bulletins on the early returns it soon became clear that the Awami League, as expected, was winning much more than a working majority of the seats in East Pakistan, and that the People's Party was achieving surprisingly strong support in Punjab and Sind. The list of the fallen 'Old Guard' included the names of many who were prominent in the fifties while the

[২৫৭] শ্যামলী ঘোষ/আওয়ামী লীগ (১৯৪৯-১৯৭১) ॥ [ইউপিএল - ২০০৭। পৃ. ২১৬-২১৯]

names of the winners were often unfamiliar to those who listened to the continual outpouring of election data. The leaders of the two parties were eminently successful themselves. Mujib won two resounding victories in Dacca while Bhutto won five of the six seats he contested, including two in Punjab and three in Sind, losing only a seat in the Frontier by a small margin. (Of the other prominent candidates Qayyum was the only one to contest more than one seat and he won three out of three in the Frontier.) Because of the polarization of the results between the two wings it will perhaps be most useful to comment on them on a province-by-province basis.

The sweep of the Awami League was about as complete as it could have been. The AL won all but two of the 162 seats (and about 72% of the vote) in the National Assembly, possibly the greatest victory of any party in a free and contested election anywhere. The provincial election produced a victory only marginally smaller. Only one member of the 'Old Guard' survived the onslaught in the national polling, former Chief Minister Nurul Amin, who had been defeated in the 1954 election by the United Front. The only other non-Awami League winner was a traditional leader of the Buddhist tribal community in the Chittagong Hill Tracts who chose to contest as an independent but who is expected to support the AL.

Most of the candidates elected are persons without previous experience in legislative bodies at the provincial or national level. The gap of twelve years of martial law and indirect, controlled elections of the Ayub period had the effect of preparing few in East or West Pakistan for democratic political life. The Awami Leaguers elected are mostly young. The median age for the new MNA's is in the forties and that for MPA's in the thirties, meaning that they — especially the MPA's — were barely active in politics before the Ayub coup.

The Awami League as a party captured the imagination of the Bengalis and their grievances and demands for provincial autonomy were personified by Sheikh Mujibur Rahman. The election displayed a 'single issue' phenomenon, not entirely dissimilar from that of 1945-46 when the Muslims of northern India voted on the 'single issue' of Pakistan. As the Muslim League in 1945-46 campaigned almost exclusively on the issue of 'Pakistan,' the AL fought the elections essentially on the issue of 'provincial autonomy'. The character of the government's response to the cyclone disaster of November 1970 also became a last minute election issue, accenting the AL program.

Following the cyclone many non-Awami League political groupings suggested that their candidate retire from the election on grounds that it was not proper to conduct an election in the midst of such devastation. Despite claims by candidates of these parties, the retirement had little effect on the outcome. Realistically, almost all of those who retired had little hope of winning against the rising support for the AL. Awami League votes in individual National Assembly contests ran from 60% to as high as 90% and more and no race in the province could be considered close. Mujib himself won two seats, one of them by a margin of 60-1. The popularity of the AL can be measured partly by the fact that the seat which Mujib surrendered was won unopposed by his economic adviser, Kamal Hussain. Although against the tide, even Nurul Amin won his seat by a wide margin against the AL.

The sweeping victory of the AL is seen by Mujib as a clear mandate to demand full implementation of the Six Points. He and his colleagues pledged to carry out the program at a rally in Dacca on January 3, 1971.

... The Government of Pakistan, the candidates and the parties, and the people can be justifiably proud that Pakistan's first truly national election was carried out with complete

freedom, order, and almost no complaint of irregularity. It is a significant and successful first step toward the restoration of democratic, representative, civilian government in a country which has experienced authoritarian government for so long.

However, it is just the initial step. The next one will be the framing of a constitution which will be generally accepted throughout Pakistan and workable in governing the country. This will not be an easy task and will require a broad spirit of cooperation if the country is to make a success of returning to a democratic system."[২৫৮]

০৫.

"... ফেরার পথে আমি একটি খবরের কাগজের অফিসের গেলাম। সেখানে একজন বাঙালি ব্যারিস্টারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি খবরের কাগজে লিগ্যাল নোটিশ লেখেন। স্বাভাবিক কারণেই বিরাজমান অবস্থা আলোচনায় এলো। তিনি বললেন, 'আইন নিয়ে তামাশা করবেন না। সামরিক আইন নিয়েও না। হয় সঠিকভাবে প্রয়োগ করুন নতুবা তুলে নিন।'

একটি একান্ত ঘরোয়া বৈঠকে আমি জেনারেল ইয়াকুবকে সামরিক আইনের দন্তহীনতা সম্পর্কিত সাধারণ্যের আলোচনা জ্ঞাত করলাম। তিনি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এবং ঢাকার পত্রিকা সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী মাসিক বৈঠকে উত্থাপন করলেন। তিনি সামরিক শাসন আইনের 'দন্তহীনতা' সম্পর্কে এভাবে ব্যাখ্যা দিলেন।

পাকিস্তানের জনগণের কাছে সামিরক আইন একটি ভীতির প্রতিমূর্তি। কিন্তু তারা এও ভুলে গেছে যে, এই সামরিক সরকার দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মূলত সামরিক আইন এবং গণতন্ত্রের সম্পর্ক বৈরিতামূলক। সামরিক আইনের ঐতিহ্যগত ধারা গণতন্ত্রের অঙ্কুরোদগমন করতে দেয় না। সুতরাং এই দেশে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সামরিক আইন তার চিরপরিচিত বাঁধনকে আলগা করেছে। আমাদেরকে অতি কর্মতৎপরতা এবং আলস্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কখনো কখনো আপনারা মনে করতে পারেন যে, 'আমরা কর্মতৎপরতার অভাব দেখাচ্ছি। কিন্তু আমাদের বিচার করতে হবে সেটাও অতি কর্মতৎপরতার পর্যায়ে পড়ছে কী না। উল্টোও অবশ্য সত্য। আমরা বিমান চালনা কৌশল থেকে উপমা গ্রহণ করতে পারি। বৈমানিক কল্পনা করতে পারে তার বিমান ঠিকই কাজ করছে কিন্তু ডাইনে ঘুরতেই সেটা খাড়া পাহাড়ের সাথে লেগে ধ্বংস হলো। অন্যথায় তার যন্ত্রটি নিরাপদে উপত্যকাটি পেরিয়ে যেতে পারতো।'

সম্পাদকরা তার যুক্তি ও উপমায় অভিভূত হয়ে গেলেন। তারা জেনারেলের প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার প্রশংসা করলেন। তথাপি সবাই অনুভব করলেন তরী মারাত্মক দিকে মোড় নিচ্ছে। যদি ঠিক সময় এটাকে ঠিকঠাক না করা যায় তাহলে আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং ধ্বংস হবে। বেসরকারি কিংবা সামরিক আইন সরকার কেউই কোন সংশোধনযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকলো। শিল্পাঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। শিক্ষাবিষয়ক লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষাঙ্গনগুলো বন্ধ রইল। আওয়ামী লীগের উৎকট স্বাদেশিকতা বাড়তে থাকলো। প্রতিদ্বন্দ্বিদের অধিকাংশই একে একে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে সরে এলো।

নির্বাচন : সবকিছুর জন্য মুক্ত

এই পরিবেশে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনের দিকে পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে চললো। বস্তুত নির্বাচনের আগের দিনই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গেল। ৭ ডিসেম্বর মুজিবুর

[২৫৮] Craig Baxter/Pakistan Votes -1970 \ [Asian Survey (Vol. 11, No. 3) - March, 1971| p. 210-218]

রহমানের প্রকৃত বিজয়কে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মালা পরানো হলো। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হবে–অনেকেই নভেম্বরের শেষাশেষি থেকে তাদের এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে।

১ ডিসেম্বর ঢাকা টেলিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বললেন, আমার অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য অবশ্যই আমি শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো। আমি মফস্বল এলাকায় অনুষ্ঠিত তার সভাগুলোর বিবরণী টিভিতে আনতে পারছি না। কেননা, রাওয়ালপিন্ডি তার প্রচার প্রধান প্রধান শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। নিশ্চয়ই শেখ সাহেব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। যখন তিনি ক্ষমতায় আসবেন তখন তিনি হয়তো আপনাদের (ইউনিফরমাধারীদের) স্পর্শ করবেন না কিন্তু আমাকে তো ছাড়বেন না। ঢাকার একজন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ একই ধরনের আশংকা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, '২২ মে'র পোস্তাগোলার ঘটনায় আমি মুজিবপন্থী শ্রমিকদের ওপর লাঠি চার্জের আদেশ দেই। তারা তার কাছে আমার নামটি বলে দিয়েছে এবং শেখ সাহেবের স্মৃতিশক্তি দারুণ। মি. রহমান নামের এক বেসামরিক কর্মকর্তা সাধারণের মোটামুটি বর্ণনা দিলেন। বললেন, 'দেশ সংকটের দিকে এগোচ্ছে। যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনা হয় তাহলে বিরুদ্ধবাদীদের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠবে। যদি বিপরীতটা ঘটে তাহলে সহিংসতার আশ্রয় নেবে। কেননা, দেশ শাসনের চাবি সে ভাবেই ঘুরানো হয়েছে।'

এই ভীতি শুধু বেসরকারি জনগণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল না। এর প্রকাশ সামরিক পরিমণ্ডলেও পরিলক্ষিত হলো। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসারের কথা মনে পড়লো। তিনি বলছিলেন, 'ক্ষমতায় যাওয়ার পর শেখ সাহেব যদি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সমস্ত কাগজপত্র চেয়ে পাঠান তাহলে নিশ্চয়ই বেশ কয়েক জায়গায় আমার নাম দেখতে পাবেন। এবং ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করার মত উদার মুজিব নন।' সামরিক বাহিনীর যে সব অফিসার তাদের চাকরি জীবনে কখনোই মুজিবকে অসন্তুষ্ট করেননি, তারা ছয় দফার পক্ষে উচ্চ কণ্ঠে প্রচারাভিযানে নেমে পড়লেন। আওয়ামী লীগের কর্মসূচির গুণাগুণ নির্ণয়ের ব্যাপারে বক্তব্য রাখাকালে তারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। বক্তব্য রাখতো তারাই–যারা ছয় দফার সন্দেহজনক বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রচণ্ড রকমের বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলো। তারা ভেবেছিলে, এই কৌশলে তারা দেশের ভবিষ্যৎ শাসকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবে।

আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে একে একে সবাই যখন এই পার্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত তখন পার্টির মধ্যেই আশংকার বিস্তার ঘটলো। নির্বাচন কি আদৌ অনুষ্ঠিত হতে দেয়া হবে? আওয়ামী লীগ কি তার এই প্রচারাভিযানের ফসল ঘরে তুলতে পারবে? এগুলো ছিল কাল্পনিক ভীতি। চরম উত্তেজনাকর ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিই এর জন্ম দেয়। এই ভীতি এ গুজব পল্লবিত করে যে, সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে সকল ক্ষমতা দখল করে নিয়েছেন। তিনি নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দেবেন এবং নতুন আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলবেন। তারা দু'জনেই তখন ঢাকায়।

এ নিয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন। কেউ করলেন সরাসরি কেউবা ঘুরিয়ে। তারা অন্যান্য জায়গায়ও খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোন সন্তোষজনক জবাব পেল না। অবশেষে একজন বিদেশী সাংবাদিক এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। ১৯৭০ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পথে যখন বিমানে উঠছিলেন, সে সময় তিনি তার কাছে প্রশ্ন রেখে।

সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, দেশের পুরো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কী আপনার হাতে আছে?' 'হ্যাঁ-হ্যাঁ-সম্পূর্ণই' প্রেসিডেন্ট তার ভুরু নাচিয়ে বললেন। 'কিন্তু ভীষণ রকম গুজব যে....' সাংবাদিক কথা শেষ করতে পারলেন না। প্রেসিডেন্ট ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বললেন, 'এটা অলীক কল্পনাপ্রসূত। নেহায়েতই বাজে।' বলেই তিনি ঝট করে বাঁয়ে মুখ ঘুরালেন–যেদিকে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের

সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়েছিলাম এবং বললেন, 'কে আমার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করছে...? যতক্ষণ আমি না সরে দাঁড়াই ততক্ষণে কেউই আমাকে সরাতে পারবে না।' বলে শূন্যে ছড়ি ঘুরিয়ে এবং ঠোঁট কুঁচকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে পিআইএ বোয়িংয়ের ভেতরে ঢুকলেন। তার একথায় গুজব প্রশমিত করে।

নির্বাচনের তারিখ কাছাকাছি আসতেই একশো'র ওপর বিদেশী সংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ঢাকায় এসে জড় হলেন। জাতীয় কোন দুর্যোগকালে যেমন, বন্যা কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের ছোবলের পরেও এত সাংবাদিকের ভিড় আমি দেখিনি। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় ৬ ডিসেম্বর হোটেল পূর্বাণীতে তাদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করে। সে ভোজে আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম।

খাবার টেবিলে পাশ্চাত্যের তিনজন সংবাদপত্র প্রতিনিধির সাথে বসেছিলাম। এবং আগামীকাল অনুষ্ঠেয় নির্বাচনই স্বাভাবিক কারণে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজর, কোন্ দলে তুমি ভোট দিচ্ছো?' বললাম, 'একটাই তো দল আছে। আর সেটা আওয়ামী লীগ।' মনে হলো আমার এই কৌতুককে কৌতুক হিসেবে নিলেন না। গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করলেন।

ভোজ শেষে আমি সংসদ ভবনে মার্শাল ল' হেড কোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে তখন ১৪৪ ধারা (যা নির্বাচনের দিনের চার বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ এবং অস্ত্রশস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করে) জারি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। এই ঐতিহাসিক দিনে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে ১৪৪ ধারা জারির সপক্ষে ছিলেন কয়েকজন অফিসার। অন্যদিকে, অন্যরা এর অকার্যকরতার প্রেক্ষাপটে বিরোধিতা করছিল। সেই বড়সড় অফিস ঘরে যেইমাত্র আমি প্রবেশ করেছি সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো, এই যে এসে গেছেন আমাদের জনমত বিশেষজ্ঞ, তার কাছ থেকে কিছু শোনা যাক। আমিও নিজেকে বিশেষজ্ঞের আবরণে ঢেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, 'বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার হিসাব মতে, যে কোন ধরনের বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিচ্ছে। এ ইতিমধ্যে অতি উত্তজনাকর হয়ে থাকা পরিস্থিতিকে চরমে নিয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ অবশ্যই জিতে যাচ্ছে। সুতরাং শান্তি রক্ষা তারাই করবে।' তারা আমার উপদেশ মেনে নিল। আমার মজাই লাগলো। এই ভেবে যে, একজন নবিশও নির্দেশ দিতে পারে যদি সে বিশেষজ্ঞের মত ভাবসাব দেখাতে পারে।

আগেই রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, সশস্ত্রবাহিনী (প্রধানত সেনাবাহিনী) নির্বাচনের তদারকে থাকবে। কিন্তু ঢাকায় যে নির্দেশ এলো তাহলো : (ক) নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই নিজেকে জড়িত করবে না, (খ) প্রধান প্রধান কেন্দ্রের প্রতি নজর রাখ, (গ) সর্বক্ষণ জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকবে যাতে তারা তোমাদের দেখতে না পায়, তাতে জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের উপস্থিতি তাদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক না ঘটায়; এবং (ঘ) দাঙ্গা দমনের জন্যই মাত্র নামবে। এ নির্বাচনে সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধান সমন্বয়ের জন্য সামরিক আইন সদর দপ্তরে একটি 'অপারেশন রুম' সৃষ্টি করা হয়। জেনারেল ইয়াকুব সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্রের ওপর দিয়ে উড়ে এলেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং শৃংখলা মেনে চলা জনতাকে দেখে তিনি খুশি হলেন।

দিনের বাকি সময় আমি 'অপারেশন রুমে' কাটালাম। প্রথমদিকে এখানকার পরিবেশ ছিল উত্তেজনাময়। দুপুর পর্যন্ত কোনখান থেকে যখন কোন রকমের সহিংসতার খবর এলো না তখন সবাই গা এলিয়ে দিল। গল্পগুজব শুরু করলো। মাত্র একজন স্টাফ অফিসার টেলিফোন ও বেতার যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত বলে মনে হলো। খবর গ্রহণ করছিল বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার খবর আসছিল সবখান থেকে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দপ্তরের খোঁজ-খবরের জবাব একই ভাষায় আশ্বাস দিয়ে (রাওয়ালপিন্ডি) পাঠানো হচ্ছিল।

এ নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোর যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনী কৌশলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হবার ব্যাপারটিতে অবদান রাখলো। পোলিং এবং প্রিসাইডিং অফিসাররাও তাদের ভবিষ্যৎ শাসকদের বিরক্তভাজন হতে চাইলো না।

বস্তুত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেসব প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন তাদের জন্য সময়টা ছিলো কঠিনতর। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের সামনে দাঁড়াবার মত অনুরূপ শক্তিও ছিল না তাদের। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে ছত্রছায়ামূলক রক্ষাবরণীও তারা লাভ করেনি। কয়েকজন বিক্ষুব্ধ প্রার্থী এসেছিল সেনাবাহিনীর কাছে কিন্তু কোন প্রতিবিধানই তারা পেল না। কেননা, সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ ছিল একমাত্র ব্যাপক সহিংসতা ছাড়া সেনাবাহিনী যেন নির্বাচন সংক্রান্ত আর কোন বিষয়েই নিজেদেরকে জড়িত না করে। আমি দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই।

চৌমুহনীতে (নোয়াখালী) বার বছর বয়স্ক একটি বালক 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে ভোট কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আওয়ামী লীগ বিপক্ষ একজন প্রার্থী তাকে ধরে ফেলেন এবং ভোট কেন্দ্র ভবনের পিছনে তাকে নিয়ে আসেন। সেখানে ক্যাপ্টেন চৌধুরী তার প্লাটুন নিয়ে বসেছিলেন। প্রার্থী অভিযোগ করেন (ক) বালকটির বয়স এতই অল্প যে সে ভোট দেবার উপযুক্ত নয় (খ) আইন উপেক্ষা করে সে ভোট কেন্দ্রের মধ্যে গিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিলো। ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করুন। এই ধরনের বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না।'

দ্বিতীয় ঘটনাটি টাঙ্গাইলের। সেখানে জনৈক রহমানকে মেজর খানের সামনে এনে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে পঞ্চমবার ভোট দিতে যাচ্ছিল পোলিং অফিসারের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে। মেজর বললেন, হয়তো আপনি সঠিক বলেছেন। কিন্তু এ নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। বলুন, কোন দাঙ্গা ফ্যাসাদ হয়েছে? কোন দাঙ্গা ফ্যাসাদ হয়নি। আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের (শক্তিধর সশস্ত্র বালক) ধন্যবাদ।

দিনের শেষে ভোট গণনা যখন শেষ হয়ে গেল সে সময় জেনারেল ইয়াকুব হেঁটে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর অফিস কক্ষে গিয়ে ঢোকেন। তিনি সামরিক আইন সদর দপ্তরে বেসামরিক বিষয়াবলির দায়িত্বে ছিলেন। জেনারেল ইয়াকুব স্পষ্টতই গর্বিত কণ্ঠে বললেন, 'সবকিছুই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমি আনন্দিত। ভোটপর্ব অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে' ফরমান শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, তারা মুক্ত ছিলো, সব কিছু করার জন্য মুক্ত।'

চার দিন পর (১১ ডিসেম্বর) প্রেডিসেন্ট ইয়াহিয়া খান সেনাপ্রধানদের নিম্নলিখিত বাণী পাঠান 'সাধারণ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করার নিশ্চয়তা বিধান করাতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্তরের সকল সদস্য যে নিরপেক্ষতা, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার জন্যে সবাই প্রশংসার পাত্রে পরিণত হয়েছেন এবং তার স্বীকৃতি দিচ্ছি।' শান্তিপূর্ণ পরিবেশের দরুণ আওয়ামী লীগ উপকৃত হলো। পূর্ব পাকিস্তানে দু'টি বাদে : আর সবগুলো আসনই সে দখল করলো। বেসরকারি গণনা শেষ হতেই একটা টেলিফোন এলো। টেলিফোন করলেন সেই ইউরোপীয় সাংবাদিক–যার সাথে আমি ৬ ডিসেম্বর নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলাম। সাংবাদিক তার হোটেল রুম থেকে বললেন, 'তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, মেজর তোমার দল নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে গেছে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দনটি পকেটস্থ করলাম। বিজয়ী ঘোড়াকে উপেক্ষা করে কে!

আওয়ামী লীগের মেজাজ এখন কী হবে? জনগণের আবেগকে যে পুঁজি করেছে, সে কী নমনীয় হবে? ডক্টর কামাল হোসেনের কথা আমার মনে পড়লো। এক মাস আগে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তিনি মুজিবের প্রধান পরামর্শদাতা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বারে বসে তাকে বললাম, 'আওয়ামী লীগের বিজয়ের ব্যাপারটি নির্ধারিত এখন যদি আপনারা

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি জাতীয় নেতা (প্রাদেশিকের চেয়ে) হিসেবে তুলে ধরার পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তার জন্যও যেমন এবং দেশেরও জন্যে তেমন ভালো হতো, যদি তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে যেতেন, এবং সেখানকার প্রধান প্রধান শহরে জনসভায় বক্তৃতা করতেন। পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য।'

তিনি বললেন, 'একটি ভাল পরামর্শ। নির্বাচন শেষ হবার পর আমরা এই কার্যক্রমে নামবো। আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেছি ছয় দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঘিরে। যদি আমরা আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাই তাহলে নির্বাচনে হেরে যেতে পারি। যখন একবার আমরা জনগণের আবেগকে পাকাপাকিভাবে ভোট প্রাপ্তিতে পরিণত করতে পেরেছি তখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নেও ছয় দফাকে সংশোধন করতে পারবো।' নির্বাচন শেষ হবার পর আমি আবার তার সাথে দেখা করলাম এবং তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের খামখেয়ালি আবহাওয়ার ধরনে মত বদলে ফেলেছেন। তিনি বললেন, 'না, ছয় দফায় পরিবর্তন আনা যাবে না। এটা এখন জনগণের সম্পত্তি। যে কোন ধরনের সংশোধন জনগণের আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হবে।' তার পার্টিপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আরো কঠিন হয়ে গেলেন। নির্বাচন শেষ হবার দু'দিন পরেই তিনি ঘোষণা করলেন, 'ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে প্রণীত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন এই গণভোট....সুতরাং ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।'

এই ছিল জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার রায়। যদি তিনি একাই চলতে চান তাহলে এমন কেউ কী আছে যে তাকে পাকিস্তানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে? সেনাবাহিনী কি বিনম্র বদনে ঘটনার কেন্দ্র থেকে সরে আসবে এবং নির্বাচিত নেতাদের তাদের নিজের মতো করে কাজ করার সুযোগ দিয়ে চলে আসবে? নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় আমাদের মনে এই ধরনের প্রশ্ন আলোড়ন তুললো॥"[২৫৯]

০৬.

"... সংশ্লিষ্ট সকলের, রাজনৈতিক নেতাদের তো বটেই, বিজ্ঞজনোচিত পরামর্শ গ্রহণ করে প্রেসিডেন্ট ২৮ নভেম্বর ঘোষণা দেন যে, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যা সাম্যের পুরনো নিয়ম পরিত্যক্ত হবে। নির্বাচন হবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে এক ইউনিট বিলুপ্ত হবে। পূর্বেকার মতো পাঞ্জাব, সিন্ধ, বেলুচিস্তান ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হবে। ঘোষণাটা পূর্ব পাকিস্তানে ভালভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা হয়ে পড়েন হতাশ। তাদের হতাশ হবার কারণ বুঝে ওঠা সহজ নয়, যেহেতু তাদের দৃষ্টি কোন পর্যায়েই নিজেদের প্রাদেশিক সীমানার বাইরে প্রসারিত হয়নি।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা আবার শুরু হবে। ১৯৭০-এর মার্চে ঘোষিত হয় 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার'। এতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধান রচনার মূল নিয়মগুলো স্থির করে দেয়া হয়। নির্ধারণ করে দেয়া হয় জাতীয় সংসদে কোন্ প্রদেশের আসনসংখ্যা কত হবে। বলা হয় যে, পাকিস্তানের ইসলামী সত্তা বজায় থাকবে। জোর দেয়া হয় পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, প্রদেশগুলোর জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন এবং ফেডারেল সরকার যাতে ক্ষমতা-প্রভাব-শক্তিহীন না হয় তার ওপর। বলা হয় যে, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঐ বছরের ডিসেম্বরে।

---

[২৫৯] সিদ্দিক সালিক/নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল (মূল : Witness To Surrender/অনু. মাসুদুল হক) ॥ [জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। পৃ. ৩৩-৩৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চে ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাবার জন্য ইয়াহিয়া খানের সরকার একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছিল। তবে যে রকম ধীরে সুস্থে গদাইলস্করী চালে নিচ্ছিল তার সাথে দেশে বিদ্যমান জরুরী পরিস্থিতির কোন সঙ্গতি ছিল না।

সিএমএলও হেড কোয়ার্টার এগুচ্ছিল টিমে তালে পিএসওপির (জে. পীরজাদার) মেজাজের সাথে মিল রেখে। অসীম ক্ষমতাবান এ লোকটি মনে করছিলেন তার পায়ে পা মিলিয়ে গোটা জাতি চলবে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের তীক্ষ্ণ নজরে এটা কেন পড়েনি তা দুর্বোধ্য। প্রেসিডেন্ট পদের দায়ভার কাঁধে চাপার আগে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে এবং স্বচ্ছভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারতেন। কিন্তু মাত্র এক বছরের মধ্যেই যেন তিনি হারিয়ে ফেললেন সেসব গুণ। আমার মতে, তার এই মানসিক স্থবিরতা দেখা দেয় ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা পিএনওপি আর সিওএস (জে. হামিদ)-এর নেতিবাচক, অপরিপক্ক ও অবাঞ্ছিত প্রভাবের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণের কারণে। এ দু'জনের মধ্যে চলছিল ঘোরতর রেষারেষি। ইয়াহিয়ার কার্যকলাপ অধিকতর ইতিবাচক আর ফলপ্রসূ হতো যদি তিনি আমাদের সমাজের সুস্থমস্তিষ্ক লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও তাদের পরামর্শ নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু কার্যত যা ঘটল তা হচ্ছে এই যে, সেই হতবুদ্ধিকর ও বিভ্রান্তিজনক পরিবেশে আমাদের পেশাদার চাটুকাররাই প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার সহজ সুযোগ পায় এবং মদমত্ত অবস্থায় তাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

সবকিছু বলা কওয়ার পরেও যে কথাটা থেকে যায় তা হলো এই যে, ইয়াহিয়া খান ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তার দায়সারা ভাবকে কোনক্রমেই ক্ষমা করা যায় না। নির্বাচনের পূর্বেকার দীর্ঘ ও প্রলম্বিত সময়টা তরুণতর রাজনৈতিক নেতা মুজিবুর রহমান এবং জেড. এ. ভুট্টো ভালভাবেই কাজে লাগান। প্রথম জনকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও বিষ ছড়াবার বিশেষ কাঙ্ক্ষিত সময় দেয়া হয় এমন প্রবল উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সাথে তার ছয় দফার প্রচার চলে যার কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন গোয়েবলসীয় প্রচারণাও হার মানে। ভুট্টো ছিলেন অধিকতর সতর্ক। তিনি নিজ দলের ওপর ক্ষমতা দৃঢ়তর করেন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রসহ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রচারণা চালান। ঝানু রাজনীতিবিদরা ব্যাপারটাকে নেন সহজ ভাবে। তাদের বিরাট অভিজ্ঞতাই ভোট এনে দেবে - এটাই ছিল তাদের আশা।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ২টি ছাড়া সবগুলোই দখল করেন মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৮টি আসনের মধ্যে ৮৮টি পান ভুট্টো। দু'জনের কেউই অপরের অংশে (অর্থাৎ শেখ সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ভুট্টো সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে) একটি আসনও পাননি। তার মানে চূড়ান্ত মেরুকরণ সম্পন্ন হয়।

শেখ আর ভুট্টোর মধ্যে মিল ছিল অনেক বিষয়ে। দু'জনই ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং অগ্নিবর্ষী বক্তা। দু'জনই ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তারা চলে এলেন রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে। পছন্দ হোক বা না হোক, এদেরকে সামলানোই হয়ে দাঁড়ালো প্রেসিডেন্টের কাজ। পাকিস্তানের ভাগ্যের পাল্লা হয়ে উঠল টলমল।

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ঢাকা গেলেন। সেখানে তিনি শেখকে জানালেন যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হবে ফেব্রুয়ারির প্রথমে। বিদায়কালে তিনি শেখকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। এতে ভুট্টোর অহমিকায় নিশ্চিত ঘা লেগেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে এসেই তিনি ভুট্টোর লারকানায় যাবার এক আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেখানে প্রচুর পরিমাণে উচুমানের রাজনৈতিক 'অক্টেন' গলাধঃকরণ করে ফিরে যান রাওয়ালপিন্ডিতে। রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সংসদের বৈঠক বসবে ৩ মার্চ ঢাকায়। এই ঘোষণা তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশের উভয় অংশে। দেরিতে সংসদ অধিবেশন ডাকাকে পূর্ব পাকিস্তানে দেখা হলো সংখ্যাগুরু পার্টির হাতে ক্ষমতা না দেয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আরেকটি চক্রান্ত রূপে। প্রেসিডেন্টের লারকানা সফর তাদের

সন্দেহকে জোরদার করে। ৩ জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে মুজিবুর রহমান সকল নির্বাচিত সদস্য কে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করান যে, তারা ছয় দফা থেকে বিচ্যুত হবেন না। এটা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়।

পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর আশা-আকাঙ্ক্ষা এক প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, সংবিধান প্রণয়ন কিংবা সরকার গঠনে তার কোন হাত থাকবে না। কাজেই ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, সংসদ যদি ঢাকায় বসে তাহলে খাইবারপাস থেকে করাচি পর্যন্ত আগুন জ্বলবে। পরে যখন সংখ্যালঘু দলগুলোর সদস্যরা বলেন যে, তারা ঢাকা অধিবেশনে যাবেন, তখন ভুট্টো এই মর্মে হুশিয়ারি দিলেন যে, তিনি তাদের পা ভেঙ্গে দেবেন এবং তাদের উচিত হবে বিমানের ওয়ানওয়ে টিকিট কিনে যাওয়া। এ উক্তিগুলো তার আগের উক্তি 'কোন পার্টি যেন পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে সংবিধান তৈরি করার কথা চিন্তাও না করে,' এর সাথে মশলা হিসাবে যুক্ত হলো॥"[২৬০]

০৭.

[আমানুল্লাহ্ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) চিফ রিপোর্টার এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হকের কেএসপি পার্টির নেতা ও তাঁর জীবনীকার বি ডি হাবীবুল্লাহর ছেলে।]

"... ম. আ. : আচ্ছা, ওই যে ঘটনাটা, একবার আপনি বলেছিলেন, প্লেনে আপনি শেখ মুজিবের সঙ্গে বসে আছেন ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময়?

আমানুল্লাহ্ : হ্যাঁ, সত্তর সালের ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময় শেখ সাহেবের সঙ্গে মোস্ট অব দ্য জায়গায় আমি যাচ্ছি। তো সিলেটে যাচ্ছি আমরা। সিলেটে, সুনামগঞ্জে, তারপর ওই যে চা-বাগানের হেডকোয়ার্টার, কোন জায়গাটা?

- শ্রীমঙ্গল।

- হ্যাঁ, শ্রীমঙ্গল গেছি। সুনামগঞ্জ গেছি, ছোট লঞ্চে, রাতের বেলায়।

- আপনার সঙ্গে জার্নালিস্ট আর কে কে ছিল?

- ওই সময় জার্নালিস্ট তো বেশ কয়েকজন ছিল। হাসান সাঈদ ছিল ওই টাইমে। আমির হোসেন ছিল। আমির হোসেন সিলেটে ছিল না। ও মাদারীপুর ছিল। হাবিবুর রহমান বলে ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির একজন ছিল। তবে সিলেট ট্রিপে হাসান সাঈদ ছাড়া আর কে ছিল মনে পড়ছে না।

আমরা যাচ্ছি প্লেনে। ওনার সিটটা পড়ছে সাইডে। ওনার ঠিক পেছনের সিটটাতে আমি। পুরো জার্নিটায় উনি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, বাবার কথা। সেভেনটিতে আমার বাবা তখন এয়ার মার্শাল আজগর খানের–কী পার্টি করেছিল?

- তেহরিকে ইস্তিকলাল।

- সেইটায় ওনার সঙ্গে ছিলেন। এবং উনি ইস্ট পাকিস্তান তেহরিকে ইস্তিকলালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। উনি সেভেনটিতে নির্বাচন করবেন, ঠিক করেছেন এবং প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আজগর খানের নমিনি হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখলেন যে জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে একচেটিয়া, নির্বাচনে

---

[২৬০] লে. জেনারেল গুল হাসান/পাকিস্তান যখন ভাঙ্গলো (মূল : Memoirs of Lt. Gen. Gul Hassan Khan/অনু. এ টি এম শামসুদ্দীন) ॥ [ইউপিএল - ১৯৯৬। পৃ. ১৭-১৯]

জয়ের কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন উনি সরে দাঁড়ালেন। হি উইড্র হিজ ক্যানডিডেচার। এর আগে, যখন উনি দাঁড়াবেন শুনেছেন, যেহেতু উনি আওয়ামী লীগবিরোধী, কিন্তু শেখ সাহেবের একটা পার্সোনাল রিগার্ড ছিল আমার বাবার প্রতি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল। মাঠের বক্তৃতায়, অ্যাসেম্বলিতে অন্য রকম ছিল। উনি আমাকে বলতেছেন, 'আমানউল্লাহ, আমরা তো জাতীয় পরিষদে একচেটিয়াই হয়ে গেলাম, প্রভিন্সিয়ালেও হয়ে যাব। তাই না, কী বলে?' 'জি, তাই মনে হচ্ছে।' 'এত কিছু বিজয়ের মধ্যেও আমার মনে একটু দুঃখ রয়ে গেল। দুজন ব্যক্তির জন্য আমার দুঃখ। দুজনই ভালো লোক। দুজনকেই আমি সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁরা যে নির্বাচিত হতে পারবে না, এইটা মনে করে খারাপ লাগছে।' তখন আমি কিছু বলি নাই। নিজেই বললেন উনি, 'এক হলো বদু ভাই, তোমার বাবা, আর হলো খয়রাত হোসেন।'

- রংপুরের না খয়রাত হোসেন?

- হ্যাঁ।

- এই দুই জন যে হতে পারবেন না, এইটা মনে করে আমার খারাপ লাগছে। আমার বাবা ঘূর্ণিঝড়ের পরে সরে দাঁড়ালেন। ঝড়টা আওয়ামী লীগের ফেভারে চলে গেল, ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে। ঝড়টা কিন্তু নির্বাচনকে অনেকটাই বদলে দিল। তা না হলে আওয়ামী লীগের হয়তো এইটি-নাইনটি পার্সেন্ট হইতো, কিন্তু একেবারে অলমোস্ট সেন্ট পার্সেন্ট, এটা কিন্তু শেখ সাহেব নিজেও এক্সপেক্ট করেন নাই একটা টাইমে। আমার মনে আছে। খুলনায় আমরা যাচ্ছি। সাতক্ষীরার দিকে বোধ হয়। গাড়িতে যাচ্ছি। হাজি সাহেব বলে এক ভদ্রলোক, উনি ড্রাইভ করছেন। উনি শেখ সাহেবের খুব ভক্ত। সামনের সিটে শেখ সাহেব বসা। পেছনের সিটে আমরা দুজন সাংবাদিক। আমি আর সৈয়দ নজমুল হক। যাকে মেরে ফেলেছে আলবদররা। সে আবার শেখ সাহেবের কেইসেও সাক্ষী দিতে গেছিল। ওদের কথামতো সাক্ষী দেয় নাই সে।

- উনি কি এপিপির ছিলেন?

- ও ছিল পিপিআই-এর। আর আমি ছিলাম এপিপির। ওর বড় ভাই আমার ক্লাসমেট ছিল, আমজাদুল হক। ওই যে ডিপ্লোম্যাট, যে প্রথম ইন্ডিয়ায়, নিউদিল্লিতে, বেরিয়ে আসল স্বাধীনতার পক্ষে, একাত্তর সালে। ওরই ছোট ভাই হলো নজমুল। ও শেখ সাহেবের খুব প্রিয় ছিল। কাছাকাছি ছিল। আওয়ামীপন্থী ছিল সাংবাদিক হিসেবে। শেখ সাহেব খুব রিল্যাক্সড মাইন্ডে ছিলেন তখন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনটা সামনে। উনি ভাবছেন, কত পার্সেন্ট ওনার পার্টি পাবে। উনি বলছেন যে, 'তোমাদের কী মনে হচ্ছে, আমরা কত সিট পাব?' নজমুল বলছে, বাড়িয়ে বলছে আর কী? অবশ্য ওর কথাটাই ঠিক হয়েছিল। আমার এস্টিমেটটা কারেক্ট হয় নাই। আমি বোধ হয় বলছিলাম, সিক্সটি-ফাইভ টু সেভেনটি পার্সেন্ট, এ ধরনের একটা রিজোনেবল এস্টিমেট করেছিলাম। আর ও বোধ হয় বলছিল এইটটি টু নাইনটি পার্সেন্ট। তখন শেখ সাহেব নিজে বলল যে, 'আমার তো কমের পক্ষে সেভেনটি-ফাইভ পার্সেন্ট না হলে চলবে না?' তখন আমি বললাম যে, 'নির্ভর করে আগামীতে কী অবস্থা দাঁড়ায়।' এটাও হতে পারে। আমি রিজার্ভডলি বলছি। পরে তো দেখা গেল যে, কারও এস্টিমেটই ঠিক হয় নাই। শেখ সাহেবের এস্টিমেশনের চেয়ে অনেক বেশি হইছে, আমার এস্টিমেটের চেয়ে অনেক বেশি হইছে, আর নজমুল তো বেশি বলছে, তার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে। আনথিংক্যাবল ছিল। ওই মেজরিটিটা শেখ সাহেব–উনি নিজে কনজারভেটিভ এস্টিমেট করেছিলেন। মিনিমাম কত ওনার দরকার।

- আমি যদ্দুর জানি, আপনি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন না। তো আপনি কি কখনো ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগ এ রকম একচেটিয়া জয় পাবে?

- লোকজনের সঙ্গে কথা বললে অনেকটাই আন্দাজ করা যায়। শেখ মুজিবের উত্থানের পেছনে বড় কারণ হলো, সাধারণ মানুষ তাকে বিশ্বাস করত। তার ওপর আস্থা রেখেছিল। তিনিই বেঙ্গলি ইন্টারেস্টকে সবচেয়ে বেশি রিপ্রেজেন্ট করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

- কখন বুঝলেন যে আওয়ামী লীগ জিততে যাচ্ছে?

- তাহলে একটা ঘটনা বলি। গল্প না, সত্যি। সত্তরের নির্বাচনের ঠিক আগে আগে। পুরানা পল্টনের এপিপি অফিস থেকে আজিমপুরের বাসায় ফিরছি। শাহবাগের কাছে যখন এসেছি, রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই মিয়া, নির্বাচন তো আইতাছে, কারে ভোট দিবা বইলা ঠিক করছ?' সে অবলীলাক্রমে বলল, 'আর কারে, যে পশ্চিমাগো খেদাইতে পারবে, তারে।' আমি আবার তাকে বললাম, 'আচ্ছা যে নেতারা আছে, এদের মধ্যে কে পারবে?' কয়, 'আর কে? মুজিবুর পারবে।' 'তাহলে মুজিবুররেই দিবা ভোট?' 'আর কারে দেব'?"[২৬১]

০৮.

"... When Yahya visited Dacca for the first time after becoming President in April or June, 1969 I had an hour long talk with him at his request and tried to understand his thinking regarding restoration of civil government. He had two choices, either to restore the constitution of 1956 after suitable amendments to allow representation on the basis of population and dissolution of the one unit and parity between East and West Pakistan or to have a new constitution altogether.

... I advised Yahya to continue the process Ayub had started, get together all the parties, including Bhashani and Bhutto, and give them three to five months, as they wanted, to evolve an agreed constitution. Thereafter the constitution should be approved by the people through a referendum. This would have placed the responsibility squarely on the shoulders of the politicians. I felt the task of framing a new constitution could be completed in a year's time by the end of October and then the elections could be held. I warned Yahya that if the constitution was to be framed wholly by an elected body there was no chance of having an agreed constitution. And election was bound to arouse extreme emotions and the political parties would be making all sorts of promises to get their candidates elected. This would eventually make their task of constitution framing well nigh impossible.

I also warned Yahya that constitution making was a very complex matter and in order to make it durable it had to be approved by as nearly as possible unanimous political opinion. Any constitution which was adopted by a simple majority would not have the strength and its existence would be in great doubt. The general electorate in their present stage of education were in no position to formulate an opinion on a highly technical matter like the constitution. The Government of India Act of 1935, also the Indian constitution, had between three and four hundred clauses, many of which were of the highest importance. It might not be possible for the people in general to appreciate that. A constitution should be evolved by the wisdom of the real intellectual elements in the community in whom the people have trust. And then the people might give their verdict on the constitution that had been formulated. However, much to my dismay, in November 1969 he announced his intention an elected body to frame the constitution and set the election date in October, 1970.

[২৬১] মহিউদ্দিন আহমদ/ইতিহাসের যাত্রী ৷৷ [বাতিঘর - ফেব্রুয়ারি, ২০১৯/পৃ. ৩৫-৪০]

Yahya allowed representation according to population which we had been demanding the body to be elected would have to frame the constitution four months and after that it would function as the national parliament. The thing that I apprehended most was that in election no party would be interested except in emotion slogans with the main purpose of being elected to run government rather than in framing the constitution. Further the election was to be held almost after one year during which time the parties would be continuously dishing out their propaganda to generate extreme heat. And predictably the Awami League took upon itself to champion an extreme position to rouse emotion in East Pakistan at the cost of possible future cooperation between the people of East Pakistan and West Pakistan in resolving the real economic problems of the people.

The decision to hold elections in October was a blunder. It was the period of monsoon and cyclonic storms. But none of the parties raised any objection till March/April 1970 when there was an unusually big and heavy flood soon after April 1970. When I met Yahya earlier again in November 1969, I urged him to have an advisory body of old politicians. The provincial Governors could also have similar bodies to advise them and keep them in touch with public opinion in the country. Yahya was again quick in expressing his agreement. He told me he had read criticisms of the October election in the columns of the Observer but he had been advised that in the past, elections were held in October. This was not true. We had consulted the record of elections in Bengal since 1945 and found that not a single general election was held in October. After the shock of mid-year floods, the government shifted the general elections to December which met with fresh criticisms.

The date of the election having been announced the Awami League mounted a campaign on known lines. It had to create an enemy and it set about conjuring up one as big and as quickly as possible. It took charge of all the accumulated grievances of the past 20 years and became the champion of the people's cause. In fact it took credit for opposing some of the things its own leaders were responsible for, such as the one unit and parity. Both measures were pushed through by Suhrawardy with the support of the Awami League when he was inducted as law minister in 1954 by Ghulam Mohammad. In the face of the Awami League onslaught the other parties remained silent as they did not feel responsible for the creation of either the one unit or parity. The Awami League thus had a field day denouncing the measures which deprived the people of East Pakistan of their majority and covering up the fact that it was the Awami League leadership that was responsible for it. The Observer wrote several articles urging the government to reply to the charges levelled by the Awami League and to tell the people how those things happened. The government remained completely silent. It did not publish a single contradiction or denial as it thought it was not responsible for anything said.

The Awami League printed a big coloured broadsheet containing 22 charges under the heading 'Shonar Bangla Sashan Keno' (How Golden Bengal has been turned into a graveyard). Thousands of these broadsheets were distributed throughout the country containing such stories as that rice was bought in Karachi at Rs. 10 and sold in Dacca at Rs.30, gold was available in Karachi at Rs. 120 but in Dacca it cost Rs. 160 a tola, jute was purchased from the poor growers at Rs. 12-15 and exported by West Pakistanis for Rs. 40, foreign exchange worth Rs. 3000 crores were spirited away from East to West Pakistan and so forth. Strangely, the Government remained absolutely silent and indifferent to the charges on the plea that it did not wish to interfere in the elections. This was hardly a plausible reason as the Government was being accused of serious offences against the people. The other political parties would not deny or challenge these allegations as they would not take the responsibility by trying to deny them. Politics gradually degenerated into unbridled emotionalism and violence. It was quite clear the way the country was heading.

... The law and order situation in the province deteriorated alarmingly, particularly towards the end of 1969 and the beginning of 1970. Various groups, some without connection to any particular party, started taking the law into their own hands as the administration relinquished its responsibility to the people. The provincial Governor, Admiral Ahsan, had no capacity nor experience to run the administration. He seemed to float with the current looking more than anything else to his personal interest. The government in Pindi seemed to be totally unconcerned with the growing disorder. Had it intervened to maintain law and order leaving the field open to politicians to tackle the constitutional issue, the disaster that I saw coming would not have happened.

In West Pakistan also the suppressed expectations of the people during ten years of Ayub's rule created a similar situation. And there also men who had actually collaborated with Ayub's dictatorial rule became the staunchest critics of the government and became public heroes.

The general election that was held in 1970 took place in an atmosphere charged with emotion, bitterness, hatred and mutual recriminations. It totally lacked a national perspective. In the circumstances the votes could not have been a judicious expression inion by the people at large. The total number of votes cast in Pakistan was 62 per cent of the total of registered voters. The mi League received 42 per cent of the votes cast. Of this about per cent belonged to the Hindu minority community who wortedly voted en bloc for the Awami League. They thought the story of the Awami League would be victory for India.

Most of the political parties were severely restrained from election participation in the campaign due to organized hooliganism unleashed against them by the Awami League either directly or indirectly. Complaints were frequently heard of large-scale recording of false votes by sympathetic election officials. In many places party workers not belonging to the Awami League were beaten up and scared away.

Future historians should analyse the circumstances under which the elections took place and the prevailing political tension and emotionalism which had risen to a frenZz, in order to determine the verdict of the majority of the people of East Pakistan. The election issues were never clear-cut. The question of secession was not placed before the people even in a remote way. It was only the question of autonomy which was to solve all the problems of the province coupled with fantastic and impossible promises made by the Awami League. With the experience of ten years of Bangladesh one could perhaps judge the party programme and promises of the Awami League with greater clarity than was possible in those emotion-charged times.

Although Yahya Khan laid down in his Legal Framework Order many provisions which would be part of the constitution, he left undecided a few vital ones crucial to the success of constitution making and to stem the emotional undercurrent which ultimately wrecked the country. While he dissolved the One Unit and the system of parity between East and West Pakistan (both introduced by the Awami League government), he failed to define provincial autonomy and the voting procedure in the new constituent assembly. As regards the latter, in the absence of any definition to the contrary, the constitutional provisions and the constitution bill could be passed by a simple majority. Bhutto took full advantage of this situation when the Awami League captured the majority of seats in the constituent assembly all in East Pakistan. He (Bhutto) declared that East Pakistan could impose upon the people of West Pakistan without regard to their wishes any constitution it pleased through its majority in the assembly. That being so Bhutto refused to attend the assembly and be a party to the surrender of the legitimate rights of the people of West Pakistan. This made Bhutto a great hero in the eyes of most in West Pakistanis who believed he was fighting for their rights against the brute

majority of East Pakistan. The Awami League added fuel to Bhutto's propaganda by declaring that it would make any kind of constitution it liked without reference to the views of West Pakistan. A greater blunder could not be conceived.

As I have said earlier, unlike normal legislation the constitution of a country cannot be changed by a simple majority. A constitution to be durable has to receive the approval of an overwhelming majority of the people and there has to be wide consensus in framing its provisions. Therefore, had Yahya Khan in his Legal Framework Order provided for a two-thirds or threefourths majority in the Assembly as was essential for the passage of the constitutional amendment bill the controversy which Bhutto exploited to wreck the assembly would not have arisen. It would have also concentrated the attention of the representatives towards a compromise formula and given a sense of security to every section of the nation.

The Awami League also lacked the necessary foresight to forestall Bhutto's maneuvering. It had a majority in the assembly with which it could dictate to any party with a little subtleness. Instead of trying to be moderate and accommodating in order to give a sense of confidence and security to the people of West Pakistan by assuring them that solutions would be found through argument and acceptance, it went to the extreme by emphasizing and flaunting its majority in the assembly which could deprive the people of West Pakistan of their rights."[২৬২]

০৯.

"... আওয়ামী লীগ তাদের ৬-দফা যেভাবে জনগণের কাছে পেশ করেন তাতে পাকিস্তানের সার্বভৌম মর্যাদায় কোন রকম পরিবর্তন সাধনের দাবি ছিল না। প্রথম দফায় বলা হয়, 'সরকারের ধরণ হবে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির।' শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহে বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন, দেশকে ভাগ করা কিংবা তার ইসলামী আদর্শকে দুর্বল করা তাঁর লক্ষ্য নয়।

১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, '৬-দফা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে এবং তাতে পাকিস্তানের সংহতি কিংবা ইসলাম বিপন্ন হবে না।' ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি নির্বাচনকে 'প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে একটি গণভোট' বলে অভিহিত করেন। ৬ই নভেম্বর ১৯৭০ সিলেটে আরেক ভাষণে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের ৬-দফা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা।' আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও একই ধরনের কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তানে অওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরও নারায়ণগঞ্জে বলেন যে, '৬-দফা আদায়ের প্রশ্নটি অখণ্ডতা ও সংহতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।'

নিখিল পাকিস্তান অওিয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে এক জনসভায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা তাঁর দলের উদ্দেশ্য নয়। এর আগে ১৯৭০ সালের ২১শে জুন রাজশাহীতে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ ১৯৭০ সালের ২০শে মার্চ ফেনীতে এক জনসভায় বলেন, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী পাকিস্তান গঠন করা। তিনি বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একটি শক্তিশালী জাতি গঠন সহায়ক হবে।

[২৬২] Hamidul Huq Chowdhury/Memoirs \ [Associated Printers Ltd - 1989| p. 308-314]

যাহোক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের এসব বক্তৃতার মধ্যে এমন সব কথা ছিল যা অত্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং তথ্যের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের হাজারীবাগ পার্কে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মওলানা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রমুখের কাছে জানতে চান যে তাঁরা তাঁদের প্রভুদের মাধ্যমে বাংলার যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তা ফিরিয়ে দিতে আর কত সময় নিবেন। তিনি বাঙালীদেরকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলার পবিত্র মাটি থেকে রাজনৈতিক মীরজাফর এবং পরগাছাদের নির্মূল করার আহ্বান জানান। ১৯৭০ সালের ১০ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, 'বিগত বৎসরগুলোতে শোষক এবং ডাকাতরা বাঙালীদের রক্ত মাংস চিবিয়ে খেয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক গগন থেকে তাদেরকে বিদায় করতে হবে।'

পরদিন ঢাকা জেলার কাপাসিয়ায় কালালেশ্বর হাই স্কুলে আরেক জনসভায় তিনি বলেন 'পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর শোষণকারী পূর্ব বাংলাকে গত ২৩ বছর ধরে শোষণ করেছে। পাকিস্তানের ইতিহাস একটি ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, অব্যাহত নির্যাতন ও শোষণের ইতিহাস।'

এরপর পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বাচনী অভিযান শুরু হয় তাতে আওয়ামী লীগ এমন অসংযমের পরিচয় দেয় যে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য সব দল অভিযোগমুখর হয়ে উঠে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অভিযানের বিরুদ্ধে যারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানান তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ

(১) জনাব নূরুল আমীন - পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্য উজীর।

(২) জনাব আবদুস সালাম - পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তানি শাখার সভাপতি।

(৩) জনাব মাহমুদ আলী - পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শাখার সহ-সভাপতি।

(৪) প্রফেসর গোলাম আযম - পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর।

(৫) সৈয়দ আলতাফ হোসেন - পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক।

(৬) পীর মহসিনউদ্দিন - পূর্ব পাকিস্তান জমিয়াতে উলেমায়ে ইসলামের সভাপতি; এবং

(৭) মিসেস আমেনা বেগম - পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের উর্ধ্বতন সহ-সভানেত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী।

১৯৭০ সালে এঁরা এবং অন্যান্য নেতারা জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জবরদস্তি মূলক পদ্ধতি, জনসভা পণ্ড করে দেওয়া, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর দৈহিক আক্রমণ এবং পার্টির দফতর লুট ও বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সমালোচনা দিন দিন বাড়তেই থাকে। কিন্তু পাছে নির্বাচন অভিযানে সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন বলে মনে করা হয়, এ জন্য সরকার এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

ঢাকার পুরানা পল্টন ময়দানে ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য একটি দলের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে, একজন লোক নিহত এবং পাঁচ শতাধিক লোক আহত হয়। জামাত-ই-ইসলামী এই সভার আয়োজন করেছিলো। জামাত-ই-ইসলামী প্রমাণ করেছিলো যে, 'ময়দানে ঢুকে যারা শ্রোতাদের উপর হামলা চালিয়েছিলো, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছিলো এবং গুণ্ডাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতবোমা ছিলো।'

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা পাকিস্তান অবজারভার এ ঘটনাকে নিন্দা করে ১৯৭০ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রকাশ করে যে, 'সন্ধ্যার পর ঘটনাস্থলে দলে দলে লোকের পুনরাগমন, সভা পণ্ড করা, মঞ্চ পুড়িয়ে ফেলা এবং কয়েক হাজার শ্রোতাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটা প্রমাণ করে যে, এটা একটা সুপরিকল্পিত এবং সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা। তা না হলে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বিনষ্ট করা সম্ভব হতো না।'

যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাদের নিন্দা করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেনঃ- 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কেউ হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাহায্য নেয়, তাহলে মনে করা হবে যে সে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাকে জনমতের সামনে জবাবদিহি করতে হবে।' তিনি আরো বলেনঃ 'যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ দিয়ে তর্কের মীমাংসায় পৌঁছুতে চায়, তারা যে শুধু তাদের দাবির প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ করে তাই নয়, গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের আস্থার অভাব প্রমাণ করে - একথা তারা যতোই অস্বীকার করুক না কেনো।'

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে আর একটি দলের একটা জনসভায় মারপিট হয়। ১৭ জন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুক্ত এশতেহারে এর নিন্দা করে বলেন, 'কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী এবং গুণ্ডারা সুসংবদ্ধভাবে ১৯৭০ সালের ২১শে জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভা পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করে।' সেই একই দিন (২১শে জানুয়ারী ১৯৭০) পৃথক একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে গুণ্ডামী এবং সন্ত্রাসনীতি অবলম্বন করার জন্য বিশেষভাবে দোষারোপ করেন।

১৯৭০ সালের ২২শে জানুয়ারী ঢাকায় জামাত-ই-ইসলামীর দফতরে হামলা করা হয়। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, 'আমাদের দফতরে হামলা চালানোকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে আসবাবপত্রাদি ভেঙ্গে তছনছ করে, সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলে এবং পার্টির কাগজপত্র, দলিল, এবং পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়।'

১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক জনসভায়ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেয়। গোলযোগের মধ্যে নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির নেতা, মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রমুখসহ কিছু লোক আহত হন। পিডিপির প্রেসিডেন্ট মিঃ নুরুল আমীন এক বিবৃতিতে বলেনঃ 'আওয়ামী লীগের এসব কার্যকলাপের নিন্দা করার মতো ভাষাও আমার নেই। পরিষ্কার মনে হচ্ছে - আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি অনুসারে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অন্যের উপর চাপানোর সংকল্প করেছে। আওয়ামী লীগ এই প্রথমবার নীতি অনুসরণ করেনি।'

১৯৭০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, চট্টগ্রামে, দৈনিক 'বুনিয়াদ' এবং দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার দফতর দুটির উপর হামলা করা হয়। এই দুটি পত্রিকার আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত ছিলো। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ মাহমুদ আলী এই হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেনঃ 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হীন একটা হামলা।' তিনি আরও বলেন, যদি 'বুনিয়াদ' ও সংগ্রামের সঙ্গে আওয়ামী লীগের আদর্শের মিল না হয়, তাহলেই কি তাকে ধ্বংস করতে হবে? এই কি পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রদত্ত গণতন্ত্রের নমুনা?

১৯৭০ সালের ৩১শে জুলাই ঢাকার পাকিস্তান অবজারভারসহ কয়েকটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, 'আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক সশস্ত্র কর্মীরা হালিশহর হাউসিং এস্টেটের অধিবাসীদের আক্রমণ করে। এর ফলে ২২ জন আহত হয়। তার মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর। খবরে জানা যায় যে আওয়ামী কর্মীরা চেয়েছিলেন যে উল্লেখিত লোকেরা ধর্মঘট পালন করুক। কিন্তু সে এলাকার অধিবাসীরা তা করতে অস্বীকার করে।'

১৯৭০ সালের ৭ই আগষ্ট 'দৈনিক পূর্বদেশ' এর খবর প্রকাশ - '২রা আগস্ট ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ টাউন ময়দানে পিডিপির এক জনসভা হয়। সে সভায় আওয়ামী লীগের একটি দল এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করে। খবরে প্রকাশ, সভাস্থানের সন্নিকটে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপালগঞ্জ বাসভবন থেকে সভায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী আওয়ামী লীগ কর্মীদের বের হয়ে আসতে দেখা যায়।

১৯৭০ সালের ২৩শে আগষ্ট দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার খবরে জানা যায় যে চট্টগ্রামের দৈনিক 'আজান' পত্রিকার দফতর এর পূর্বদিন ছাত্র বলে পরিচিত একদল যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দুষ্কৃতিকারীরা ৬ দফার সমর্থনে এবং 'জয়-বাংলা'র স্লোগান দিচ্ছিলো। আজান কর্তৃপক্ষকে তারা ৬ দফা সমর্থন করে তাদের পত্রিকায় লেখার হুকুম করে। পত্রিকার একজন কর্মচারী হামলার সময় আহত হন।

ঈশ্বরদীর ইসলামী ছাত্র সংঘের জেনারেল সেক্রেটারীকে ১৯৭০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণ করে। চাঁদপুর শহরের কাছে বাহুরীবাজারে ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিজাম-ই-ইসলামের অফিসে হামলা করে এবং অফিসের আসবাবাদি বিনষ্ট করে বলে খবর পাওয়া যায়।

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ' এর ১৯৭০ সালের ২০শে অক্টোবর খবরে প্রকাশ যে - '১৯৭০ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার হাজারীবাগ এলাকার ১৩নং রাস্তার বাচ্চু মিয়ার বাসভবন আওয়ামী লীগের একদল দুষ্কৃতিকারী আক্রমণ করে। দুষ্কৃতিকারীরা বাড়ীর উপর পাথর নিক্ষেপ করে, বাড়ীর মেয়েদের গালিগালাজ করে এবং দুটি নাবালক ছেলের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়।'

১৯৭০ সালের ৫ই নভেম্বর, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগের এক প্রাক্তন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট মিসেস আমেনা বেগম, এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা তাঁর মাতুয়াইলস্থ নির্বাচন দফতর আক্রমণের নিন্দা করেন। এক সপ্তাহ পরে (১৯৭০ সালের ১০ই নভেম্বর) 'পূর্বদেশে'র এক খবরে প্রকাশ যে - ঢাকার অন্তর্গত জিঞ্জিরার কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রার্থী খাজা খয়েরউদ্দিনের সমর্থকগণ বিরাট এক মিছিল বের করেন। গত রাতে আরামবাগ গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মিছিলের উপর হামলা চালায়। ফলে ৫ ব্যক্তি আহত হয়।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বন্যায় পূর্ব পাকিস্তান ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়। বন্যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের যাতে ভোটদানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সে জন্য জনসাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি জানায়। সে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করলেন ১৯৭০ সালে ৭ই ডিসেম্বর। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হলো ১৭ই ডিসেম্বর। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়-দুর্যোগের কবলে পড়ে। বর্তমানে যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে অভিহিত এই ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় বাঁধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতাগণ সাহায্য এবং পুনর্বাসনের কাজে মনোযোগ দেয়ার জন্য নির্বাচন আরো পিছিয়ে দেবার জন্য আবেদন জানান। নির্বাচন অভিযান স্থগিত করার নানা অসুবিধা থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ নির্বাচন স্থগিত করায় তাদের সম্মতি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কিছুকাল একেবারে নীরব থাকার পর, প্রস্তাবিত স্থগিতের বিরুদ্ধে শুধু যে প্রতিবাদ জানালেন তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বললেন - পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপায়ণের জন্য আরো লক্ষ লক্ষ জীবন উৎসর্গ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্থগিত করলেন না। ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর এক ভাষণে তিনি বলেন - 'এই সরকারের উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য আর সে লক্ষ্যে আমরা অটল থাকবো।'

সেই একই ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তিনি বরাবরই বলে এসেছেন যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং 'একসঙ্গে বসবাস করা একটা চুক্তি'। অরি সেই জন্যই শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মতৈক্য বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমি এ কথাই বলতে চাই যে তারা তাদের নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময় বেশ কাজে লাগাতে পারেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিধানগুলোর ব্যাপারে একমত হতে পারেন। এজন্য কিছুটা আদান-প্রদান দরকার, দরকার পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করাও দরকার।'

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে। জাতীয় পরিষদের ভোটে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাদের একটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ, যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যটি হচ্ছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি, যে ৮৫টি আসন লাভ করে। দুটি দলই সংগঠনের দিক থেকে আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী।

নির্বাচনের শেষে আশা করা হয়েছিলো যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই আইনগত কাঠামো আদেশে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় এসে পৌঁছুবেন। আওয়ামী লীগ জোর দিয়ে একথাটাই বোঝাতে চাইছিলো যে এক পাকিস্তান কাঠামোর বাইরে ৬ দফায় কোন কিছুর পরিকল্পনা করা হয়নি। প্রেসিডেন্টকেও তারা এই ধারণা দিয়েছিলো। ১৯৭১ সালে ২৮শে জুনের বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেনঃ 'আমাদের আলাপ আলোচনা চলাকালে আমি যখন মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে সেগুলোর রদবদল সম্ভব। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান বিধানগুলো পরিষদের বাইরে ছোট ছোট বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মীমাংসা করবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা মিঃ ভুট্টো সমেত, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছুনোর জন্য ঢাকায় যান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফলপ্রসূ শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্যই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টও বেশ কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তান সফরে যান। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষৎ প্রধানমন্ত্রী বলে প্রকাশ্য ভাবে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করার জন্য কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তিনি ৬ দফা সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে ৬ দফা এখন জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তাঁর রদবদল করা সম্ভব নয়।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের ভোল সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেলো। ১৯৮১ সালের ৭ই জানুয়ারীর প্রকাশিত 'অটোয়া, গ্লোব ও মেল' পত্রিকার খবরে প্রকাশঃ 'মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন যে প্রয়োজন হলে আমি বিপ্লবের আহ্বান জানাবো।' ১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, 'ব্যাঙ্কক পোষ্ট'-এর এক খবরে জানা যায় 'আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে ৩১৩টি আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের মধ্যে তাঁর দলটির স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার দলের ৬ দফা কার্যসূচী পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।'

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে বলা হয় যে আগামী ৩রা মার্চ ঢাকায় অধিবেশন শুরু হবে। ১৯৭১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছ থেকে কিছুটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের আশ্বাস না পেলে, তাঁর দল অধিবেশনে যোগদান করবে না।'

তিনি আরো বলেনঃ 'আমার মনে হয় আমরা এমন কিছু করতে পারি যা আমাদের উভয়কেই খুশী করবে। কিন্তু যে শাসনতন্ত্র ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে ফেলেছে এবং যে শাসনতন্ত্রের কোথাও এক চুল পরিমাণ কোন অদলবদল করা চলবে না, সেই শাসনতন্ত্রকে শুধু মেনে নেওয়ার জন্যই যদি আমাদের ঢাকায় যেতে বলা হয়, তাহলে আপনারা আমাদের ঢাকায় দেখবেন না।' ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন - 'আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার। ৬ দফা ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।'

পাঁচটি ফেডারেটিং ইউনিট সমন্বিত পাকিস্তান ফেডারেশনের জন্য জাতীয় পরিষদ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কোন ইউনিট এককভাবে তাঁর ইচ্ছে অন্য চারটি ইউনিটের উপর চাপাতে পারবে না। ফেডারেশনের অন্য সব ইউনিটের পক্ষে শাসনতন্ত্রটি গ্রহণযোগ্য করতে হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল নীতিগুলোর ব্যাপারে সব ইউনিটের মধ্যে মতৈক্যের একটা ব্যাপক ভিত্তি থাকা দরকার।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি কোন সমাঝোতায় না আসেন, তাহলে জাতীয় পরিষদের পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না এবং জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহলে ভোটদাতাদের আশা-আকাঙ্খা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপরিকল্পিত কার্যসূচী উভয়ই নিস্ফল হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মোকাবিলা সারাদেশের উপর একটা বিষাদের ছায়া ফেলেছে। তিনি আরো বলেন যে - 'সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালে ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্তান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সে জন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'আমি বার বার বলেছি যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং এক সঙ্গে বসবাস করার একটা চুক্তি। সুতরাং সুষ্ঠু ও প্রয়োগযোগ্য একটি শাসনতন্ত্রের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে - শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যথাযথ পরিমাণে অংশগ্রহণের উপলব্ধি।'

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সাথে পরিষ্কারভাবে আশ্বাসও দেওয়া হলো যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ব উল্লেখিত পরিস্থিতি অনুকূল হলেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরই আমাদের চরম লক্ষ্য - আর তা সবকিছুর উর্ধ্বে।

শেখ মুজিবুর রহমান এর জবাব দিলেন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চের বিবৃতিতে তিনি বলেন - 'এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীর পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে - গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া।'

আওয়ামী লীগের ধর্মঘটের আহ্বান ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযান সারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু করে দিলো। আইন ও শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো॥"[২৬৩]

---

[২৬৩] স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (সপ্তম খণ্ড)/সম্পা : হাসান হাফিজুর রহমান ॥ [তথ্য মন্ত্রণালয় - নভেম্বর, ১৯৮৪। পৃ. ৩৮৪-৩৮৮]

১০.

"...The Awami league entered the election campaign of 1970 on the basis of spreading hatred against West Pakistan. Exploiting the economic grievances of the Bengali populace, Mujib made West Pakistan the sole author of every wrong in East Pakistan. In his speeches, Mujib lambasted the central government being a tool for East Pakistan's exploitation. He would blame West Pakistan for robbing East Pakistan of her capital, foreign exchange, and economic progress. He spoke the same language, which was being used in the Indian newspapers, and thus provided legitimacy to India's baseless claims.

The Awami League organized its party workers from early 1970 and under the leadership of Mujib; the party covered almost all of the East Pakistan and poisoned the simple Bengali people in considering West Pakistan is their sole enemy. The whole campaign of Mujib resembled the Indian campaign against Pakistan. He convinced his listeners to believe that only he and his party could end their economic marginalization. He claimed that his six points are the only solution for East Pakistan's problems. Another important aspect of Mujib's election campaign has always been neglected; the sources of finance for the election campaign of the Awami league. His and his party leaders' extensive travelling, propaganda campaign, payment to party supporters, etc., in fact the whole election campaign was quite expensive. Most of the finances for Mujib's campaign were from the Hindu community who had direct links with the Indian establishment.

(William Rushbrook, The East Pakistan Tragedy, Tom Stacey Ltd., London, 1972, p. 44)

...Although, the election of 1970 were considered as free and fair, there were reports of a mass rigging taking place particularly in East Pakistan. To illustrate, a large numbers of the registered voters in East Pakistan had reportedly confessed that their votes were cast even before they could reach the polling station. Apart from the actual rigging by the Awami League volunteers, violence was also used as a tool to get more support. Pressure of every kind was exerted by the fanatic volunteers of the Awami League. The situation reported after the elections proves that, organized violent campaigns were led by the Awami League volunteers to terrorize the common people. Moreover, those who rejected Mujib's mandate were targeted, murdered, and looted in the riots and killings of early 1971."[২৬৪]

১১.

"...সত্তর সালে ভুট্টো তৎপর হয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা হবার জন্য, যেমনটা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ইতিমধ্যেই একচ্ছত্র হয়ে গেছেন বলে ভুট্টো দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাই বলে মওলানা ভাসানী কি চাচ্ছিলেন দুই পাকিস্তানকে এক রাখতে? মোটেই না। অনেক আগেই, সেই ১৯৫৭ সালেই তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যেতে পারে, তাঁর আগে অমনভাবে সে-কথা অন্যকোনো নেতার মুখে শোনা যায়নি। ওই ঘোষণার পরেই তো ন্যাপ গঠিত হয়, যে দলকে তখনকার প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দী বিদ্রুপ করে অভিহিত করেছিলেন নেহরু-এইডেড পার্টি বলে। কিন্তু মওলানার তো অন্য একটি লক্ষ্যও ছিল, সেটা হলো ওই যে গরিব মানুষের মুক্তিকে সম্ভব করে তোলা, যে জন্য কেবল পূর্ব পাকিস্তানের নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের মেহনতি মানুষের বিষয়েও তিনি ভাবতেন। পাকিস্তানকে একত্র রাখার ব্যাপারে তাঁর যেটুকু আগ্রহ তার বিস্তার ওই রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করা পর্যন্তই, তার বাইরে নয়। সত্তরের নির্বাচনে তার দল অংশ নিক এটা তিনি চাননি, তিনি চেয়েছিলেন ওই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার মানুষের একটি রায়ই বের হয়ে আসুক, সেটি হলো স্বাধীনতার। ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নিলে ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাবে,

---

[২৬৪] Junaid Ahmad/Creation of Bangladesh : Myths Exploded \ [AJA Publishers (Karachi) – 2016| p. 128-130]

এই আশঙ্কাতেই তিনি আওয়ামী লীগের জন্য পথ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি তার দলের ওপর চাপিয়ে দিতে চাননি, যে জন্য ঢাকায় জলিল সাহেবের ওই বাসাতেই ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত - নির্বাচনের পক্ষে এবং বিপক্ষে তর্কবিতর্কের দরুন।

... নির্বাচনে যোগদানের প্রশ্নটাকে অমীমাংসিত রেখেই বৈঠক শেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যখন চলে যাচ্ছেন তখন মওলানাকে তারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এর পরে কি ঘটতে যাচ্ছে এবং বিন্দুমাত্র দেরি না করে মওলানা বলেছিলেন, 'বাংলা একদিন স্বাধীন রাষ্ট্র হবেই, যা ১৯৪৭ সালেই হবার কথা ছিল।' সত্তর সালের অক্টোবর মাসে তিনি একথা বলেছেন। পরের বছর ডিসেম্বরে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে॥"[২৬৫]

১২.

"... Early in the morning, in the last week of November 1970, my company and I left for Gournadi. We crossed the streams in a launch, with our jeeps on board, and reached Gournadi within a few hours. My company was billeted in a school building, since the schools had been shut down during the elections, and I set up my HQ in a veterinary hospital building nearby. The entire area was lush green and absolutely breathtaking. The local population that I came across looked well-off, well-dressed and content with their lives, or perhaps they only seemed this way to us because recently all we had seen were people living in the disaster-stricken areas.

... Upon our arrival we were joined by the SHO, a magistrate on election duty and a security inspector. With them I discussed the overall conditions of the local residents, important details about the town, the extent of the population and the number of polling stations that were located in the vicinity.

Sheikh Mujibur Rehman also belonged to that area and was not too far from where we were. I also came across another Mujibur Rehman, a candidate of the National Assembly belonging to the AL; he seemed well-mannered, nice and rather civilized. The area itself appeared to be the residence of peaceful and cultured families, apart from just a few criminals whose names were available with the SHO.

... On December 4th, 5th and 6th, the police inspector, the magistrate and I began inspecting the polling stations. After scrutiny, the arrangements and everything in respect to the stations seemed to me to be in order. Each time we visited the polling stations we would call out the local population, urging and pleading with them to remain peaceful, and encouraging them to continue cooperating with us. Though I noticed something strange – each polling station was under the control of a non-Muslim. Nevertheless, I met with my juniors and explained to them in thorough detail what their responsibilities would be during the elections, urging them to follow the instructions to the letter.

... As I mentioned earlier, though the majority of Gournadi was dominated by non-Muslims and was a central stronghold of the AL, the enormous banners of the PML and the JI gave us the impression that even they had a lot of support from these areas; the banners of JI were particularly prominent. It was certain though that the victor would be from amongst the AL as they had almost one hundred percent support from the non-Muslim population in East Pakistan, and, of course, they were backed by the people in India also.

Unlike the aggressive followers of the other political parties, the supporters of the PML seemed like dignified people; their timid people would often approach me with complaints

---

[২৬৫] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/দুই যাত্রায় এক যাত্রী ॥ [পার্ল পাবলিকেশন্স - ফেব্রুয়ারি, ২০১০। পৃ. ১২৮-১২৯]

regarding the intimidation of the AL supporters. It was anticipated even by the SHO and the security inspector that the supporters of the AL might get uncontrollably aggressive during the actual elections. In order to give them some peace of mind, I instructed the security inspector to make a list of the individuals he feared would resort to severe aggression during the elections. Once the list was formulated, I ordered these individuals to temporarily be placed behind bars on December the 6th. I called together all the student leaders, guaranteed my support and advised them to maintain law and order during the elections, while also warning them of the grim consequences of any unlawful disturbances; each student leader assured me of their cooperation. I could not control all the polling stations given that we were so few in number, so I made up a number of mobile squads and allotted them certain areas. I instructed them to immediately inform me over the wireless in case of insurgency or disruption of law and order. I also ensured that I was assisted by a squad big enough to control law and order during anticipated emergencies, and I ordered a few jawaans to guard some polling stations that were in particularly sensitive positions. Due to my arrangements and frequent reconnaissance and warnings, I believe it became clear to everyone that no aggression, terrorist act, destruction of property or breaking of law and order would be tolerated.

On December 7th, before the polling began, I conducted frequent surveys of the area. I was well aware of the fact that I could not inspect or control the entire area on my own, but I still wanted to do the best I could. Thanks to God, the day ended peacefully; I was especially grateful to the student leaders as they kept their promises and cooperated with us fully. Despite their cooperation, however, the supporters of the AL behaved as we feared; they assaulted the supporters of the other parties and rigged the voting to the extent that their relatives came in from India just to cast votes. I kept track of the whereabouts of the troublemakers, and I frequently updated the HQ on the actions of the AL supporters, but was ordered not to intervene and let the rigging go on. I was told that, regardless of the circumstances, the elections had to be completed. We were particularly ordered not to get involved with the incidents occurring inside the polling stations; our job was to maintain stability outside.

And thus, the so-called 'fairest and freest elections in the history of Pakistan' were accomplished. At several locations | was met with distressed and weeping villagers who recounted how when they went to vote, their votes had already been cast. Despite knowing who did it, we were ordered to do absolutely nothing about the matter. I do not know how the elections took place in West Pakistan, but what I witnessed in East Pakistan cannot be declared as rightful, free and fair casting of votes. It is indisputable that Indian citizens came to help the AL, assisted the supporters and, alongside the non-Muslim polling officers, carried out massive rigging openly and without fear. Though this made it obvious that the AL would achieve the maximum number of votes, it was truly surprising to learn of the number of votes the other parties managed to achieve. Our claims and the constant complaints made by the supporters of the other political parties remained unheard and, at the end of the elections, General Yahya Khan declared them to be the 'fairest and the freest in Pakistan's history'.

After the announcement of the unofficial results, the MNA Mujibur Rehman came to me, hugged me and congratulated me after his victory. I congratulated him as well. Any rally or procession was still prohibited and warned him regarding this. I advised them all to celebrate in a civilized manner and to remain indoors with their supporters.

At around 2300 hours I heard a group of people chanting with joy in front of our HQ. Although the procession might have been an unplanned one, it was still a large crowd and

against the security policies so, to further assess the situation, I sent my hawaldaar to see who the group of people was representing. I was astonished to hear that they were the supporters of the AL and were chanting 'Jay Bharat, Jay Indira.' The incident so disturbed me that I was inclined to take extreme action, but instead I tolerated it to maintain stability. However, I anticipated calamity and anarchy in the future. I was dismayed and could only wonder how much damage the Pakistani brothers' chants for India would cause to the land. Nonetheless, I sent some of my jawaans to stop the chanting. I called the MNA and yelled at him for breaking his promise. He apologized and promised that it would not happen again. Though our aim was discipline and order, all I wanted to do was rip out the tongues of the people chanting for and praising the enemy. The Bengali brothers had now made their future plans obvious to us and, had our rulers even realized the sensitivity of the situation at that time, the forthcoming disaster might not have been so atrocious."[২৬৬]

১৩.

"... নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঝড়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের অনেক নেতাই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। এঁদের মধ্যে মওলানা ভাসানী ছিলেন অন্যতম। সাইক্লোনের পর উপকূল অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অবস্থাও ছিল না। কিন্তু মুজিব নির্বাচন পিছানোর ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি একে ষড়যন্ত্র বলে রা রা করে উঠলেন। পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা নির্বাচন পিছানোর গোপন সিদ্ধান্ত নিয়েও পরে সেখানে থেকে পিছিয়ে গেল। পরে শুনেছি এর পিছনে অনেক দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল। মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার এই মর্মে একটা আঁতাত হয়েছিল নির্বাচনে জিতলে তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী আর ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্টই থেকে যাবেন। মুজিব তাতে বাদ সাধবেন না। ক্ষমতার রাজনীতিতে কত বিচিত্র ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তা ভেবেই পাওয়া যায় না। এই জন্যই দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সে সময় আর্মি যেন একটা গা ছাড়া ভাব দেখাতে শুরু করল। আমরা বলেছিলাম ভোট কেন্দ্রগুলোতে আর্মি দিতে। যাতে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। সামরিক প্রশাসন আমাদের কথায় আমল দেয়নি। যার ফলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক গুন্ডামী করেছে। ভোট কারচুপি করেছে। নির্বাচনের সময় বিরোধী দলগুলোর মিটিংএ হামলা করেছে। যেহেতু নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ জিতেছিল এবং তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশ হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত সে কারণে এ সব কথা চাপা পড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছে। নির্বাচনের রায়ের পর কেন ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে হস্তান্তর করা হচ্ছে না। এ সময় ইয়াহিয়া খান নিজেই অনেকবার পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন দেয়ার কথা বলেছেন। আওয়ামী লীগ এতকাল স্বায়ত্বশাসনের কথা বলত। দেশের মানুষ দেখল স্বয়ং প্রেসিডেন্টই যখন স্বায়ত্বশাসনের কথা বলছেন তখন আওয়ামী লীগের দোষ কি। ইয়াহিয়ার এ ধরণের ভূমিকা প্রকারান্তরে মুজিবের বিচ্ছিন্নতার দাবিকেই পূর্ণ করেছে মাত্র।

ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হল। আর্মির অদূরদর্শিতা ও মুজিবের ব্যাপারে সীমাহীন উদাসীন মনোভাব এবং ডানপন্থী দলগুলোর নজিরবিহীন অনৈক্যের মুখে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬০টি আসনের মধ্যে ১৫৮টিতেই জয় লাভ করল। বাকী দুটো আসনের একটিতে জিতেছিলেন নুরুল আমীন আর অন্যটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভোটে জিতেছিলেন রাজা ত্রিদিব রায়।

পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এই নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই অবিভক্ত পাকিস্তানকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিল।

---

[২৬৬] Major Iftikhar-Ud-Din Ahmad (Retired)/Memories of a Lacerated Heart (1971) : A War Memoir (from East Pakistan to Bangladesh) \ [Trafford Publishing (USA) - March, 2017| p. 17-21]

নির্বাচনে জিতেই মুজিব ও ভুট্টো দুজনেই তাদের গোপন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন আওয়ামী লীগের কোন অস্তিত্ব ছিল না তেমনি পূর্ব পাকিস্তানেও পিপিপি কোন সমর্থন পায়নি। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বসে মুজিব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বসে ভুট্টো ষড়যন্ত্র শুরু করলেন।

মুজিবের দাবি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করে অবিলম্বে ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তর করা। ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে তার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি নিয়েই বাধল গোলযোগ। মুজিব বললেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ইয়াহিয়ার উচিত তার কাছে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। শাসনতন্ত্র নিয়ে আলাপ করার ইয়াহিয়ার কোন এক্তিয়ার নেই। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্য হলেও এর মধ্যেই ছিল মুজিবের গোপন ইচ্ছা। ড. কামাল হোসেন প্রমুখকে দিয়ে তিনি একটা শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করে ফেলেছিলেন। এটা ছিল তার গোপন স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণীত যার মানে অবিভক্ত পাকিস্তানের দাফন-কাফন সম্পন্ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ওদিকে ভুট্টো আরও এক পা এগিয়ে দুটো কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর কথা ঘোষণা করলেন। দু'জন প্রধানমন্ত্রীর কথাও বললেন। যার মানে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়া।

মুজিব ও ভুট্টো দুজনের কেউই পাকিস্তানের সংহতি কামনা করেননি। দুজনেই আপাতদৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন গরীবের বন্ধু ও ত্রাতা হিসেবে। মূলতঃ এরা ছিলেন মীর জাফর।

নির্বাচনের পর পরই একদিন আমি আবুল হাশিমের বাসায় বসা। হঠাৎ দেখি মুজিব ও জহিরুদ্দীন হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় নির্বাচনে জিতে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এসেছিলেন তারা। হাশিম সাহেব চোখে দেখতেন না। মুজিবের গলার আওয়াজ পেয়েই তিনি বললেন মুজিব তুমি এসেছ। আমি খুব খুশী হয়েছি।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুজিব হাশিম সাহেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পর তিনি তাকেই গুরু হিসেবে মানতেন। হাশিম সাহেবকে তিনি সব সময় স্যার স্যার বলে ডাকতেন। হাশিম সাহেব বললেন 'মুজিব আমি শুনেছি কাইয়ুম ও দৌলতানার মুসলিম লীগ তোমাকে ভুট্টোর বিরুদ্ধে সমর্থন দিতে রাজি হয়েছে। খেলার মাঠে ভাল দল কখনও মারামারি করে না। তুমিতো ভাল খেলেছো এবং সামনেও ভাল খেলবে আশা করি। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ তুমি কোন প্রোভোকেশনে যাবে না। আমি দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি। আমি জানি তোমাকে অসৎ পরামর্শ দেয়ার লোকের অভাব নেই, আশা করি সেটা থেকে তুমি দূরে থাকবে। তুমি তো জান আমি এখানে এসেছি সর্বহারা মুহাজির হয়ে। পশ্চিমবঙ্গে আমার সবই ছিল। ওখানে আমি থাকতে পারিনি। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও ওখানে অনেকে আছে। যতদূর জানি তাদের অবস্থা ভাল না। তুমি নিজেও পাকিস্তান আন্দোলন করেছ। হয়ত পাকিস্তান পেয়েও আমাদের অনেকের অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তা সত্ত্বেও এ দেশ আমরাই তৈরী করেছি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এটা আরও সুন্দর হবে।'

আবুল হাশিম মুহাম্মদ (সা.)-এর একটা বাণী শুনালেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। 'তোমরা পাকিস্তানের কোন ক্ষতি করো না।' আমার মনে পড়ছে মুজিব যতক্ষণ ছিলেন তিনি প্রায় নীরব ছিলেন। হাশিম সাহেবের কথার কোন প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেননি। তবে এসব উপদেশ শোনার মত তার কোন অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না॥"[২৬৭]

---

২৬৭ ইব্রাহিম হোসেন/ফেলে আসা দিনগুলো ॥ [নতুন সফর প্রকাশনী - সেপ্টেম্বর, ২০০৩। পৃ. ৮৭-৮৯]

নোট লিখুন

সময়ের বিচূর্ণ আয়নায় বর্তমানের চোখে অতীতকে দেখাই ইতিহাস। অতীতের একই ঘটনাপ্রবাহকে একেক সময়ে একেক ব্যক্তি একেক চশমায় দেখেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। যার প্রত্যেক বয়ানই স্থান-কাল-পাত্রের স্বাক্ষরে বয়ে যায় একেক ধারায়। ইতিহাসের এই বহুধা বয়ানই ইতিহাস পঠনের অন্যতম আকর্ষণ। বদলে যাওয়া আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ছুড়ে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর খোঁজার তাগিদেই আমাদের লভ্য সব চশমাই হাতের কাছে রাখা প্রয়োজন। আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সময়কালকে ফিরে দেখতে এখানে সমাবেশ ঘটানো হয়েছে সর্বাধিক চশমার। সাম্প্রতিক সময়ের এ এক বর্ণাঢ্যতম অতীতবীক্ষণ।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

02-57163214, 01710 197558
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com



9 789849 696872